বিশ্ব-জিজ্ঞাসা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৬৭

প্রকাশক
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

মুদ্রক
তুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশানাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩ডি মদন মিত্র লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
তরুণ দাস

আমার পরম আত্মীয় —

ডঃ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

এম বি, এম আর সি পি (লণ্ডন)

এম আর সি পি (এডিনবরা)

এফ সি সি পি (আমেরিকা)

কে

ঐকান্তিক স্নেহের নিদর্শন হিসাবে

গ্রন্থখানি দিলাম

ভূমিকা

মনে পড়ে বাল্যে আমার পিতৃদেব যখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উপনিষদ পাঠ করতেন তার শব্দমাধুর্য আমাকে আকর্ষণ করত। কিছু বুঝতাম না, তবু শুনতাম। যখন কৈশোর উত্তীর্ণ হলাম তখন কিছু কিছু বুঝে দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। ফলে সারা জীবন দর্শনের আকর্ষণ তীব্রভাবে অনুভব করেছি। যে মহাশক্তি বিশ্বকে এবং পৃথিবীর বক্ষে প্রাণের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁর স্বরূপ কি জানবার তীব্র কৌতূহল অনুভব করেছি। বিশ্বের নানা মনীষী এ বিষয় যে আলোকপাত করেছেন তাকে অনুসরণ করে বিশ্বরহস্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছি।

তার পর যেটুকু জেনেছি, যেটুকু বুঝেছি তাকে লিপিবদ্ধ করবার আকাঙ্ক্ষাও তীব্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাকে কার্যে পরিণত করবার সুযোগ দীর্ঘদিন কর্মজীবনে পাই নি। তার পর যখন হঠাৎ আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সক্রিয় কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করলাম তখন সে সুযোগ এল। তার পর গত কয় বছর ধরে বর্তমান গ্রন্থরচনায় আমার সমস্ত অবসর সময় নিযুক্ত হয়েছে। তার মধ্যেও ছেদ পড়েছে। পঙ্গু হৃদ্‌যন্ত্র মাঝে মাঝে বিকল হয়ে পড়েছে এবং শয্যায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থ শেষ করতে পেরেছি বলে পরমতৃপ্তি লাভ করেছি। আমার জীবনের একটি মূল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে।

এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও আলোচনারীতির বিষয় মূল গ্রন্থের প্রথম অংশে সবিস্তারে উল্লেখ আছে। তবে এখানে সংক্ষেপে তার আভাস দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। মোটামুটি এই গ্রন্থের আলোচনার ক্ষেত্র খুব ব্যাপক। তাতে দর্শনের সকল মৌলিক সমস্যাগুলির আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বতত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক সমস্যাগুলি ত আছেই, অতিরিক্তভাবে দর্শনের ব্যবহারিক সমস্যাগুলিও আলোচিত হয়েছে। ফলে ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বও স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় কথা, এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের আলোচনা পৃথক ভাবে করা হয় নি। সমস্যা যখন এক তখন প্রাচ্য মনীষীর স্থাপিত তত্ত্ব আর পাশ্চাত্য মনীষীর স্থাপিত তত্ত্বের আলোচনা পৃথকভাবে করার অর্থ হয় না। তৃতীয় কথা, এটি দর্শনের ইতিহাস নয়। এটি মৌলিক দার্শনিক সমস্যাগুলির সমস্যাওয়ারি আলোচনা। বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বের সকল

বিশিষ্ট দার্শনিক যে আলোকপাত করেছেন তা একত্র স্থাপন করা হয়েছে, তুলনা করা হয়েছে এবং তার মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ সমস্তার সমাধান যেখানে মিলে গেছে, সেখানে তার স্পষ্টভাবে যুক্তিসহ উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে যায় নি, সেখানে একটি সমাধান বিবেচনার জন্ত স্থাপিত হয়েছে। মোটামুটি এখানে দেশ-কাল নির্বিশেষে দর্শনের এক সামগ্রিক এবং তুলনামূলক পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে। বিশ্ব রহস্তকে ভেদ করবার চেষ্টায় সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক উদ্যমের এটি একটি পরিচয় গ্রন্থ।

শেষকালে একটি কর্তব্য বাকি রয়ে গেছে। যাঁদের সেবা ও যত্নে এই পঙ্গু দেহ নিয়ে এই মহৎকার্য সম্পাদন সম্ভব হ'ল, তাঁদের কথা স্মরণযোগ্য। তাঁরা একান্ত আপনজন; তাই নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রশ্ন ওঠে না। তবে আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডঃ রতীশচন্দ্র মজুমদারের কথা স্বতন্ত্র। তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থের প্রকাশনের ভার গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রকাশন সম্পাদক পরম প্রীতিভাজন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এর প্রকাশ ত্বরান্বিত করে আমার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন।

ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর কর্তৃপক্ষ ছাপা ত্বরান্বিত করায় কাজের সুবিধা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের দুই তরুণকর্মী শ্রীস্বপন বক্সী ও শ্রীতপন বক্সীর সক্রিয় সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ সুনীল চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট রচনা করে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন।

সর্বশেষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে সকল মনীষীর প্রদর্শিত পথে তাঁদের চরণ চিহ্ন অনুসরণ করে বিশ্বরূপকে ধারণা করবার চেষ্টা করেছি তাঁদের সকলকে স্মরণ করে ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম জানাই। আর প্রণাম জানাই সেই অদৃশ্য শক্তিকে যিনি 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎশাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিশ্ব-জিজ্ঞাসা

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক কথা

(১)

কৌতূহল মানুষের সহজাত বৃত্তি

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে বর্তমান যুগে মানুষ নিজের রচিত পরিবেশে আবদ্ধ। সে যে নগরভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার মধ্যে প্রকৃতির বিশেষ স্থান নেই। ইট আর কংক্রীটের সাহায্যে সে অভ্রলেহী বাড়ী তোলে; তাকে নানা অংশে বিভক্ত করে ছোট ছোট ফ্ল্যাটে বাস করে। ঘরে উজ্জ্বল নিয়নের আলো। সামর্থ্যে যদি কুলায় ঘরকে যন্ত্র বসিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। জানলা খোলা রাখলে তা সম্ভব নয়; তাই তাকে দিনরাত বন্ধ রাখতে হয়। সুতরাং তার মধ্যে বাতাসের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বসন্তকালে দক্ষিণের বাতাস সে জানলায় বারবার করাঘাত করে ফিরে যায়। সেই ঘরে আবদ্ধ হয়ে যারা বাস করে তাদের কাছে সে বাতাস শুধু অনাহূত নয় অবাঞ্ছিত।

বাহিরেব পরিবেশের অবস্থাও শহরে প্রায় অনুরূপ। সেখানে নদী শস্য-মণ্ডিত কর্ষিত ভূমির মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয় না। সেখানে অবারিত মাঠ নেই যে গগন-ললাটকে স্পর্শ করবার সুযোগ পাবে। যেটুকু খোলা জায়গা আছে তা মানুষের পায়ের তলায় এমন নির্মমভাবে দলিত হয় যে ঘাস মরে যায়, তার শ্যাম-শোভা বিস্তার করবার সুযোগই পায় না। তার পথ আছে কিন্তু তা পিচ দিয়ে মোড়া, সে পথের দু'পাশ পাথর দিয়ে বাঁধানো। সে পথে জনস্রোত নিত্য প্রবাহিত; মানুষের ঠেলাঠেলি করে চলতে হয়। পথের প্রান্তে কোথাও কোথাও গাছ লাগাবার চেষ্টা হয়, কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতায় পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায় না। নাগরিক জীবনের প্রয়োজনে তার শাখা-প্রশাখা প্রায় কাটা পড়ে। তার গায়ে সিনেমা পোস্টার আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এই অবস্থায় রাতের আকাশের মহিমাও এই শ্রেণীর নগরবাসী মানুষের চোখে অনাবিষ্কৃত রয়ে যায়। বদ্ধ পরিবেশে নিতান্তই কীটের মত মানুষ

বাস করে। রাতে চাঁদের আলো তাদের চোখে ধরা পড়ে না; এমন কি কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার প্লাবনও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। পারবে কি করে? আপন রচিত পিঞ্জরের মোহ তাকে প্রথমত আকাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে উৎসাহ দেবে না। যদি বা কেউ সে মোহ হতে মুক্ত হয়ে আকাশ পানে নয়ন মেলে চায়, তাও বৃথা। কারণ রাস্তার এবং দোকানের অগণিত বৈদ্যুতিক আলোর প্রভা আকাশকে ব্যাপ্ত করে সমস্ত নগরের ওপর এমন একটা পর্দা টেনে দেয় যে জ্যোৎস্নার আলোর সে ব্যবধান ভেদ করবার ক্ষমতা থাকে না। শীতের শেষের সকালের ঘন কুয়াশার মতই তা চোখের সামনে দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে।

সুতরাং শ্যাম-শোভায় মণ্ডিত প্রকৃতির নয়নরঞ্জন রূপ দেখতে বা নক্ষত্র-খচিত আকাশের মহিমায় চোখ ডুবিয়ে দৃষ্টিশক্তিকে সার্থক করতে আমাদের গ্রামের পরিবেশে যেতে হবে। যে নগরবাসীর তা দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, আমরা বলব তিনি দুর্ভাগা। কবি কালিদাস যেমন নির্বাসিত যক্ষের মুখ দিয়ে মেঘকে বলেছিলেন তেমন করে বলব যে তা হলে তার নয়ন দুটি একান্তই বৃথায় গেল।[১] ধরণীর বক্ষে সবুজের অবারিত বিস্তার সেখানে নয়নকে স্নিগ্ধ করে। পায়ের তলায় তৃণের নরম আস্তরণ, গাছের শাখা সবুজ পাতায় মণ্ডিত, তাতে ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে। প্রাণের বন্যায় ধরণী যেন প্লাবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> তৃণের সারি তুলছে মাথা,
> তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
> আলোয় চরা ধেনু এরা
> ভিড় করেছে ফুলে ফলে।[২]

নীচে ধরণী উপরে আকাশ। ধরিত্রীমাতার বক্ষে বিরামহীন প্রাণের প্রবাহ। ঊর্ধ্ব গগনে অগণিত নক্ষত্রমালা রচিত নয়নরঞ্জন দীপাবলী। নীচে বিস্ময়, উপরে বিস্ময়, চারিপাশে বিস্ময়। এই মহাবিস্ময়বোধ সকল মানুষেরই মনকে দোলা দেয়। বিশ্বের মানুষের সেই মহাবিস্ময়ের গভীর অনুভূতি একই কবির ভাষায় ধরা পড়েছে এই ভাবে:

১ লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥ মেঘদূত॥ পূর্ব মেঘ॥ ২৭

২ গীতি মাল্য

আকাশ-ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।[৩]

বিশ্বের চারিদিকে এই বিস্ময়ের ছড়াছড়ি। এই বিস্ময়বোধ হতেই মানুষের মনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে জিজ্ঞাসা। তাকে ঘিরে তার চারিপাশে এই যে বিস্ময়কর সৃষ্টির বিস্তার, তা হল কি করে? মানুষের মন তার উত্তর খোঁজে। কে দেবে সে উত্তর? নিজেকেই সে প্রশ্ন করে। এইভাবেই বিস্ময় হতে কৌতূহল এবং কৌতূহল হতে মানুষের মনে মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। এই প্রশ্ন স্বতঃই উচ্চারিত হয়; কারণ মানুষের প্রখর দৃষ্টিশক্তি আছে, ফলে বিস্ময়বোধ আছে এবং বিস্ময়ের কারণ অনুসন্ধানের আকুতি আছে। তার প্রতিধ্বনি আমরা সুপ্রাচীন ঋগবেদের বচনেও খুঁজে পাই। সেখানে বলা হয়েছেঃ কেই বা ঠিক জানে, কেই বা বলবে? কোথা হতে এই সৃষ্টির উদ্ভব? কোথা হতে তা জন্মাল?[৪]।

এই ভাবেই এই মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মহাজিজ্ঞাসা মানুষের মনকে চিরদিন দোলা দিয়ে এসেছে। এই প্রশ্ন যেন মানুষের চেতনা শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হিসাবে আমাদের নিকট স্থাপিত হয়েছে। সেই কথা প্রতি রজনীতে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই যেন উত্তর আকাশে ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডলী আবর্তিত হয়। আকাশজোড়া মহাজিজ্ঞাসার চিহ্ন তা না হলে তাদের আকৃতি হতে ফুটে ওঠে কেন? তা যেন মানুষকে আহ্বান জানায়, এই আকাশজোড়া নক্ষত্ররাজি তোমার মনে যে বিস্ময়ের সঞ্চার করে, তার রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করবার উপযুক্ত ধী শক্তি তুমি কি ধারণ কর? সে রহস্য তুমি ভেদ কর দেখি। সপ্তর্ষি নামকরণের মধ্যেও যেন একটা তাৎপর্য আছে। যে সাতটি নক্ষত্র নিয়ে এই নক্ষত্র-মণ্ডলী রচিত, তারা সকলেই সেকালের বিশিষ্ট মনীষী। অঙ্গিরা তাঁদের নেতা, বশিষ্ঠও দলে আছেন। এঁরা যেন বলতে চান, আমরা যে প্রশ্ন নিয়ে জীবনব্যাপী সাধনায় চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছাতে পারি নি, দেখত, আমাদের উত্তর পুরুষ মানুষ তোমরা এ বিষয় আলোকপাত করতে পার কিনা।

৩ গীতি মালিকা

৪ কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ॥ কুত আ বভূব
কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ॥ ঋগ বেদ॥ ১০॥ ৯০॥

এই ভাবেই বিস্ময় হতে কৌতূহলের উৎপত্তি হয় এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান-পিপাসার জন্ম হয়। এই জ্ঞান-পিপাসা মানুষের একটি সহজাত মৌলিক বৃত্তি, তা আবহমান কাল মানুষকে জ্ঞান অর্জনে প্রেরণা দিয়েছে। এ বৃত্তির মূল চলে গেছে তার সত্তার অন্তরতম দেশ পর্যন্ত। তা যে মানুষের মনে কত গভীরভাবে প্রোথিত এবং কত শক্তিমান তা যে-কোন শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়। শিশু যখন কথা বলতে শেখে, তার ইন্দ্রিয়গুলি সচেতন হয় এবং মনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বর্ধিত হয়, তখন সে নানা প্রশ্ন তুলে আত্মীয়স্বজনদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। প্রধানত তার মা ও বাবাকেই সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। যদি সামনে প্রথম বাতি বা প্রদীপ জ্বলতে দেখে, জিজ্ঞাসা করে, ওটা কি? যদি বলা হয় ওটা আগুন সে তাতে হাত দিতে যাবে। মা যদি বলেন হাত দিও না, বলবে কেন দেব না? উত্তরে বলতে হবে হাত পুড়ে যাবে। তখন জিজ্ঞাসা করবে, পুড়ে গেলে কি হয়? বলতে হবে হাত জ্বালা করে। যদি তাতে সন্তুষ্ট হয় ত চুকে গেল। কিন্তু পোড়া ব্যাপারটি কি দেখবার জন্য যদি অতিরিক্ত কৌতূহলে পীড়িত হয়ে সে শিখায় হাত দিয়ে বসে, সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠবে। তখন মায়ের নিষেধ বাণীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে সে বলে উঠবে, আগুনে হাত দিতে নেই, পুড়ে যায়। এই ভাবেই অভিজ্ঞতা ও কৌতূহল-প্রণোদিত প্রশ্নের ভিত্তিতে তার জ্ঞানের পরিধি ধীরে ধীরে বিস্তারিত হয়। একটি বিষয় লক্ষ্য করবার যে, কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত নয়। কেবল জানতেই সে উৎসুক, জ্ঞান সঞ্চয় হলেই তার পরিসমাপ্তি, কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য তার পশ্চাতে নিহিত নেই।

এই সম্পর্কে আইনস্টাইন-এর একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, যেমন সঙ্গীতের প্রতি মানুষের গভীর অনুরাগ আছে তেমন জানবার প্রতি আছে। সেই অনুরাগ প্রায় সব কিছুর মধ্যেই লক্ষিত হয়। তবে পরবর্তী জীবনে বেশীর ভাগ মানুষ তা হারিয়ে বসে।[৫]

আইনস্টাইন যা বলেছেন, তার সবটুকুই সত্য। এ কথা ঠিক যে শিশুর

৫ "There exists a passion for comprehension, just as there exists a passion for music. That passion is rather common in children, but gets lost in most people later on."

Ideas and Opinions, On the Generalised Theory of Gravitation.

মধ্যে যে কৌতূহলবৃত্তি ক্রিয়া করে তার আকর্ষণ সে যখন বড় হয় তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিথিল হয়ে যায়। তার কারণ বোধ হয় দুটি। জীবনের পরিবেশে শিশু যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন চারিপাশে যা কিছু দেখে সবই তার নূতন ঠেকে। তাই বিস্ময়ের পর বিস্ময় তার মনে সংঘাত সৃষ্টি করে নিত্য নূতন কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশু যখন বড় হয়, তখন ধীরে ধীরে তার পরিবেশ তার নিকট পরিচিত হয়ে পড়ে এবং সেই কারণে কৌতূহল বৃত্তি শিথিল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত মানুষ যেমন বড় হয় তেমন নিজেকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে নানা কাজে নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়। যে বালক সে পাঠে মন দেয়; যে যুবক সে জীবিকা অর্জনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে; যে প্রৌঢ় সংসারের নানা জটিলতা তার মনকে অধিকার করে বসে থাকে। সুতরাং প্রথমত তাদের অবসর জোটে না, দ্বিতীয়ত অন্য বস্তু তাদের মনকে আকৃষ্ট করে বসে। কাজেই কৌতূহল বৃত্তি একরকম অনাদরে অক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে।

তা বলে এই তথ্যগুলি আমাদের মূল প্রতিপাদ্যকে খণ্ডন করে বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, এমন অতিরিক্ত প্রমাণ স্থাপন করা যেতে পারে যা দেখিয়ে দেবে যে মধ্যজীবনের পর এই বিকর্ষণ সাধক শক্তিগুলি শিথিল হয়ে গেলে আবার মানুষের মনে কৌতূহল বৃত্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। সেটা ঘটে মানুষ যখন বৃদ্ধ বয়সে অসমর্থ হয়ে পড়ে সংসার জীবন হতে দূরে সরে আসে। তখন আর ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের তাগিদ তাকে পীড়া দেয় না। জীবনে অফুরন্ত অবসর। সংসারের প্রান্তে বসে মন তখন দর্শকের ভূমিকা নিয়ে সংসারের রঙ্গমঞ্চে জীবনের অভিনয় দেখে। কৌতূহল বৃত্তি তখন সুযোগ পেয়ে মনে আবার উঁকি মারে। আবার বিশ্ব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন মনে উদয় হয়। সেগুলি শিশুর প্রশ্ন হতে আরও জটিল আকার ধারণ করে, কারণ তারা পরিণত মনের প্রশ্ন। জীবনটা কি সত্যই অভিনয় না তার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে? পরলোক কি আছে? ঈশ্বর কি আছেন? বিশ্বের প্রকৃতি কি রূপ? এই ধরণের নানা প্রশ্ন তাঁদের মনে উদয় হয় এবং তার সন্তোষজনক উত্তর পাবার জন্য তাঁদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

এই কারণেই দেখা যায় বার্ধক্যে মানুষের মন দার্শনিক আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অবসর সময় বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগার হতে রসসাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ না পড়ে দর্শনের গ্রন্থ পাঠ করবার জন্য তাঁরা আগ্রহশীল হন।

অভিনয় বা চলচ্চিত্র হতে তখন তাঁরা বেশী আকৃষ্ট হন দার্শনিক বা ধর্মবিষয়ক আলোচনা বা বক্তৃতার প্রতি।

(২)

কৌতুহল হতে বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ম

এই কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করবার চেষ্টা হতেই বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ম হয়েছে। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে কিছু প্রাথমিক কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মানুষের মনে তিনটি মূলবৃত্তি ক্রিয়াশীল। তারা হল বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি। প্রথমটির স্থূলতম প্রকাশ দেখা যায় যে কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি হতে; কারণ ইন্দ্রিয়গুলির সাধারণ কাজ হল বাহিরের পরিবেশ সম্বন্ধে মনকে অবহিত করা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মিষ্টদ্রব্য আস্বাদন করে আমরা মিষ্টতার অনুভূতি পাই। এই মিষ্টত্ব উপলব্ধি করতেই আবার মনের পূর্বের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে হয়। অতীতে বিশেষ মানুষটি অনেক মিষ্টদ্রব্যের আস্বাদ পেয়েছে, কখনও বাতাসা খেয়ে কখনও সন্দেশ খেয়ে, কখনও বা রসগোল্লা খেয়ে। প্রতি ক্ষেত্রেই যে বিশেষ শ্রেণীর আস্বাদনবোধ রসনায় উপলব্ধি হয়েছে তাকে একটি সংজ্ঞা দ্বারা চিহ্নিত করে মিষ্টতা সম্বন্ধে একটা ধারণা মনে গড়ে উঠেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে যে আস্বাদন করল তার সঙ্গে অতীতের মিষ্টতার সাদৃশ্য উপলব্ধি করেই তার মিষ্টতার জ্ঞানের এখানে উদ্ভব হল।

এই মিষ্টতার আস্বাদন হতে যে জ্ঞান আহৃত হল তাকে ভিত্তি করে সুখের অনুভূতি ঘটে। এটি হৃদয়বৃত্তির জিনিষ। ফলে যে ব্যক্তি মিষ্টদ্রব্যটি আস্বাদন করল সে সুখ পায়। আবার এই সুখের অনুভূতি হতে সেই মিষ্ট দ্রব্যটি আবার আস্বাদন করতে ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছাবৃত্তিই আমাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। তখন হাত আর একটি মিষ্ট দ্রব্য মুখের মধ্যে তুলে দেয়।

উপরের এই স্থূল উদাহরণটি হতেই হৃদয়ঙ্গম হবে যে আমাদের এই তিনটি মৌলিক বৃত্তি আমাদের মনকে শুধু অধিকার করে বসে নেই, তারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করবার ক্ষমতা রাখে এবং সেই হিসাবে পরস্পরের সহিত নিবিড় ভাবে সংযুক্ত। ঠিক বলতে কি আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি, আমাদের মন যতক্ষণ সক্রিয় থাকে, ততক্ষণ এই তিনটি বৃত্তির ক্রিয়া অব্যাহত

থাকে। এমন কি স্বপ্নাবস্থায়ও এই ক্রিয়ার বিরাম ঘটে না। কেবল গভীর নিদ্রার মধ্যে, ভারতীয় দর্শন যাকে সুষুপ্তি বলে সেই অবস্থাতেই তার বিরাম ঘটে। সেই জন্যই মার্কিন দার্শনিক উইলিয়ম জেমস এই তিনটি বৃত্তি প্রণোদিত মানসিক জীবনকে একটি গতিশীল ধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমাদের মন সত্যই একটি প্রবহমান স্রোতস্বিনীর মত। তা নিত্য চঞ্চল, তা নিত্য গতিশীল। গভীর নিদ্রায় সংঘটিত বিরাম ভিন্ন তার বিরাম নেই। কি জাগরণে, কি স্বপ্নে অবিরাম গতিতে মন হয় মনন করে, না হয় অনুভব করে, না হয় কাজ করে। মনের মধ্যে যেন বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং ইচ্ছাবৃত্তির তিনটি স্রোত পরস্পরকে জড়িয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মনে অবিরাম ত্রিবেণী সঙ্গম চলেছে। এরাই আমাদের জাগ্রত মনের আধেয়।

এখন সব মানুষের মনেই এই তিনটি বৃত্তি সমান শক্তি ধারণ করে না। কারও বুদ্ধিবৃত্তি তুলনায় প্রবল, কারও হৃদয়বৃত্তি কারও বা কর্মবৃত্তি। যার বুদ্ধিশক্তি প্রখর, সে বেশী আকৃষ্ট হয় জ্ঞান আহরণে। সেইরূপ যার হৃদয়বৃত্তি প্রবল তার মন হয় সংবেদনশীল এবং স্বভাবতই সে শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর মানুষই কবি বা রসসাহিত্যিক বা চিত্রশিল্পী বা অভিনেতা হয়। হৃদয়ের অনুভূতিকে বিষয় করে শিল্পসৃষ্টি করা তাদের কাজ হয়। অনুরূপভাবে যার কর্মবৃত্তি প্রবল সে কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে রাজনৈতিক নেতা হবার জন্য সাধনা করে বা সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করে বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে পুল গড়ে, শহর বানায়। এই ভাবেই বৃত্তিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মানুষের মতিগতি বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়।

বর্তমান আলোচনায় আমাদের বিশেষ সম্পর্ক প্রথম শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে। এদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল হওয়ায় তা এমন এক অনুকূল মনোভাব রচনা করে যে শৈশবের কৌতূহলবোধ এবং অনুসন্ধিৎসা তাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিথিল হয় না। এরাই ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হয়ে বসে। যে বিশ্বের বিশেষ অংশ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে আগ্রহশীল হয় সে গড়ে তোলে বিজ্ঞান, আর যে সাধারণভাবে বিশ্বের মৌলিক প্রশ্নগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে গড়ে তোলে দর্শন। এই দুই শাস্ত্রই কৌতূহলবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি রূপ, বা তাদের বিষয়বস্তু কি, বা তাদের আলোচনা রীতি কি—এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বর্তমান প্রসঙ্গেই আমাদের পরে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। এখন এটুকু পরিষ্কার করে নিলেই

চলবে যে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশ্বের অংশের সহিত আর দর্শনের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক, তার আলোচনার বিষয় বিশ্বসম্পর্কিত সকল মৌলিক সমস্যা।

তাদের আলোচ্য বিষয়ের এই ধরণের ভিন্নতা হতে তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য স্বভাবতই এসে পড়ে। যেহেতু বিজ্ঞান বিশ্বের অংশ নিয়ে অনুসন্ধান করে, তা যে তথ্য আহরণ করে তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ সম্ভব। অপরপক্ষে যেহেতু দর্শন মৌলিক তত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব নয়। অর্থাৎ বলা যায় যে বিজ্ঞানের আহৃত তথ্যকে প্রয়োগ করে মানুষের কাজে লাগে এমন যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা সম্ভব হয়। তাকে ভিত্তি করে প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে ওঠে। দর্শনের আহৃত তথ্যের এমন প্রয়োগ সম্ভব নয়, তা কেবল কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করবার ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞান এই তথ্য আহরণ করল যে জলকে বাষ্পীয় পদার্থে রূপান্তরিত করলে তা স্ফীতি লাভ করে। এই তথ্যকে প্রয়োগ করে গড়ে উঠল বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। তার সাহায্যে যেমন পবিবহণ সহজ হল তেমন শিল্প উৎপাদনের ক্ষমতাও মানুষের বৃদ্ধি পেল। কিন্তু বিশ্ব চৈতন্যময় পদার্থ কি জড় পদার্থ, এ বিষয় একটি মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভব হলেও তা মানুষের কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে না। এখানে জ্ঞান-অর্জনই চরম সার্থকতা, তার অতিরিক্ত কোন পরোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নেই।

বিজ্ঞান ও দর্শনের এই গুণগত পার্থক্য সূচিত করতে উপনিষদে দর্শনের একটি বিশেষ পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়েছে। অন্য বিদ্যা হতে পৃথক করবার জন্য তাকে বলা হয়েছে 'পরাবিদ্যা'। আমাদের দেশে 'দর্শন' শব্দটির প্রচলন হয়েছে অনেক পরে, ষড়দর্শনের যুগে। মনে হয় 'দর্শন' হতে 'পরাবিদ্যার' পারিভাষিক শব্দ হিসাবে যোগ্যতা অনেক বেশী। উপনিষদে তার বিষয়-বস্তু হিসাবে 'অক্ষর' শব্দটিরও উল্লেখ আছে। অক্ষর সম্বন্ধে জ্ঞানই পরাবিদ্যা। অক্ষর অর্থে বুঝি যার ক্ষয় নেই। যা সীমিত বস্তু, যা বিশ্বের অংশ, তার মধ্যে যেমন বিকাশ আছে একসময় তেমন বিনাশও আছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে জড়িয়ে নিয়ে যে সত্তা আছেন তাঁর মধ্যে বিনাশ নেই। যেহেতু তিনি সব কিছু জড়িয়ে নিয়ে আছেন, তাঁর মধ্যে ধ্বংস আছে, সৃষ্টি আছে স্বীকৃত, তাঁর মধ্যে জন্ম আছে মৃত্যু আছে, তাও স্বীকৃত; কিন্তু তা সত্ত্বেও সব জড়িয়ে বিশ্ব নিত্য আছে। অংশের বিনাশ আছে সমগ্রের বিনাশ নেই; তাই তিনি অক্ষর। অর্থাৎ দর্শনের বিষয় হল সমগ্র বিশ্ব, তা বিশ্বদর্শন।

তাই তার সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব নয়। অথচ বিষয়-বস্তুর দিক হতে তার মহিমার অন্ত নেই। তাই তা পরাবিদ্যা।[১]

উপনিষদে অপরাবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি, তবে কোন কোন বিদ্যা অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত তার একটি তালিকা দেওয়া আছে। তাদের সাধারণ ধর্ম হতেই যে গুণ তাদের বিশিষ্টতা দান করে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরাবিদ্যার তালিকায় আছে ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।[২]

এই শ্রেণীবিভাগের একটি তাৎপর্য আছে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি উপরের তালিকায় সব মূল গ্রন্থগুলির উল্লেখ আছে। এরা হয় বেদ, না হয় তার আনুষঙ্গিক গ্রন্থ। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে চারটি বেদ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে সেই সব বিদ্যা যা বৈদিক ধর্ম পালনে সাহায্য করে। বেদ ঠিকমত পাঠ করবার জন্য শিক্ষা; কল্পসূত্রে বিভিন্ন সংস্কারে কোন যজ্ঞ প্রযোজ্য তার নির্দেশ দেওয়া আছে; ব্যাকরণের প্রয়োজন উচ্চারণ প্রভৃতির শুদ্ধতার জন্য; নিরুক্ত মন্ত্রগুলির সঠিক অর্থবোধের জন্য; ছন্দ বেদপাঠের সহায়ক; আর জ্যোতিষ সাহায্য করে তিথি ঠিক করতে যাতে যজ্ঞ নির্দিষ্ট তিথিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং এদের মধ্যে দুটি ভাগ পাই: প্রথম, মূল বেদগুলি এবং দ্বিতীয়, তার সহায়ক গ্রন্থগুলি। সেই জন্য এই আনুষঙ্গিক গ্রন্থগুলিকে বেদাঙ্গ বলা হত।

সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগের একটি তাৎপর্য পাওয়া যায়। বেদের কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত যে বিদ্যাগুলি আছে সেগুলি বেদসমেত অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক জীবনে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে যে বিদ্যা কাজে লাগে তাই অপরাবিদ্যা। তার ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। বর্তমান যুগের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে এরা ব্যবহারিক বিদ্যা। অপরপক্ষে দর্শনকে বলতে পারি বিশুদ্ধ বিদ্যা, কারণ তা কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে না। কৌতূহল বৃত্তির তৃপ্তিসাধনের অতিরিক্ত তার কোন সার্থকতা নেই।

১ অথাপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ মুণ্ডক ॥ ১ ॥ ৫

২ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্ম ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা বৈ চাপরা চ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ, সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ মুণ্ডক ॥ ১ ॥ ১ ॥ ৪—৫

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে কিন্তু ঠিক এ কথা বলা চলে না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান যে সমস্ত তথ্য আহরণ করে তার অনেকগুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লেগে যায়। জলের বাষ্পরূপের মধ্যে আত্মস্ফীতির প্রচণ্ড আকুতি আছে, এই তথ্য যখন বিজ্ঞান আহরণ করল, তখন তাকে প্রয়োগ করে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হল। সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে কারখানার কাজ যন্ত্রে চালিত হল, রেলগাড়ি নিজের শক্তিতে চলে দ্রুতগামী অশ্বকে পরাস্ত করল, জাহাজে সমুদ্রযাত্রা সহজ হল। অনুরূপভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানী যখন জ্ঞান আহরণ করলেন তাকে প্রয়োগ করে বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন, বেতারবার্তা প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে এমন নানা যন্ত্র-চালিত ব্যবস্থার উদ্ভব হল। আর উদাহরণের তালিকা লম্বা করে লাভ নেই; এইটুকু বললে চলবে যে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রয়োগ করে মানুষ যে প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করল, তার প্রভাবে বর্তমান কালে মানুষের পরিবেশ একেবারে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছে। ফলে দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক জীবনে রীতিমত কাজে লাগে। অপরপক্ষে দর্শনের জ্ঞান মানুষের কাজে লাগে না। জ্ঞান আহরণেই সেখানে তৃপ্তি, অতিরিক্ত লাভ কিছু নেই।

এমন কি আজকাল এমনও ঘটে থাকে যে ব্যবহারিক প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা-বোধই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের প্রেরণা হয়ে কাজ করে। তার সুন্দর উদাহরণ মেলে গত মহাযুদ্ধের আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে কতকগুলি বিস্ময়কর আবিষ্কার এবং তাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে নিয়োগ হতে। আঘাতের বা জীবাণুঘটিত রোগের চিকিৎসার জন্য ফ্লেমিং পেনিসিলিন জাতীয় জীবাণুনাশক ঔষধ উদ্ভাবিত করলেন। এই জন্য একটি বিশেষ শ্রেণীর ছত্রাকের নির্যাসের জীবাণুর ওপর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যে গবেষণার ব্যবস্থা হয়েছিল, ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা-বোধই তার প্রেরণা-অনুরূপ ভাবে ভীষণতর ধ্বংসাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবনের তাগিদে পরমাণু সম্বন্ধে নিবিড় গবেষণা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা চালিয়েছিলেন। ফলে এই তথ্য আহৃত হয়েছিল যে বড় পরমাণু ভেঙে বা ছোট পরমাণুর সঙ্গে বৈদ্যুতিক কণা যোগ করে বৃহত্তর পরমাণু গঠন করে প্রচণ্ড শক্তির উৎপাদন হয়। সেই তথ্যকে প্রয়োগ করে আণবিক বোমার উদ্ভাবন হয়েছিল।

ব্যবহারিক প্রয়োজন এইভাবে যে মানুষের জ্ঞান-পিপাসার প্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে, তা ভাবলে মনে হবে যে জ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক নাও হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের প্রতিপাদ্য মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু তা ঠিক নয়। এখানে দুটি বিভিন্ন অবস্থা আছে। প্রথমে আসে বিশুদ্ধ তথ্য আবিষ্কারের অবস্থা। সে অবস্থায় বৈজ্ঞানিকের একমাত্র প্রেরণা জ্ঞান পিপাসার তৃপ্তি সাধন করা। এখানে আমরা পাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। তার পর সেই আবিষ্কৃত তথ্যকে ব্যবহার করে নানা যন্ত্রাদির সাহায্যে তাকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়। তার ফলেই নানা যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়। এটি হল আবিষ্কৃত তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগের অবস্থা। এটিকে বলা যায় প্রযুক্তি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা।

বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে যন্ত্রাদির উদ্ভাবন বিভিন্ন জিনিষ। দ্বিতীয়টির নিয়ন্ত্রক শক্তি নিশ্চিত মানুষের ব্যবহারিক সুখসুবিধা ; কিন্তু প্রথমটির প্রেরণা কেবলমাত্র মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব-জাত জ্ঞানপিপাসা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর একটি সুন্দর উদাহরণ মেলে। জেমস্ ওয়াটস্ তাঁর মায়ের কেটলির জল ফুটে উঠলে তা হতে সঞ্জাত বাষ্পকে যখন কেটলির ঢাকনা ঠেলে তুলে দিতে দেখলেন, তখন তাঁর মনে জেগে উঠল দুর্বার কৌতূহল। তার প্রেরণা হতেই তার পর পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তার ফলে তিনি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন যে জল বাষ্পের আকারে পরিণত হলে নিজের সম্প্রসারণ সাধনের চেষ্টায় বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে। এই আবিষ্কারের প্রেরণা হল তাঁর কৌতূহল, জানবার ইচ্ছা, কেন জল ফুটলে কেটলির ঢাকনাকে তুলে দেয়: পরবর্তী জীবনে তিনিই যখন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন উদ্ভাবন করলেন তখন নিজেরই আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে তিনি প্রয়োগ করলেন। এখানে একই ব্যক্তি দুটি বিভিন্ন অবস্থায় দুটি বিভিন্ন প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কাজ করেছিলেন। প্রথমটিতে তার ভূমিকা ছিল বিশুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসুর, কৌতূহলই সেখানে প্রেরণা। দ্বিতীয়টিতে তিনি ব্যবহারিক প্রয়োজন বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথমটিতে তিনি আবিষ্কারক, দ্বিতীয়টিতে তিনি উদ্ভাবক।

সুতরাং বিশুদ্ধভাবে কৌতূহলবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়েও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আকৃষ্ট হন। এখানে তিনি দার্শনিকের অনুরূপ মনোভাব নিয়ে কাজ করেন। উভয়েরই জ্ঞানের প্রতি অহেতুক আকর্ষণই প্রেরণা। তাই দেখা যায় যে

বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার যুগের ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক এমন সব গবেষণার কার্যে আকৃষ্ট হন, যার সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োজনের কোন সংযোগ নেই। নক্ষত্রগুলির বিকাশের ইতিহাস খুঁজতে বিজ্ঞানী এখনও আগ্রহশীল, মহাবিশ্বের উৎপত্তি কি করে হল তা নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে এখনও রীতিমত আলোচনা চলে। এ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সঞ্চিত তথ্যের কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগবার সম্ভাবনা নেই। এখানে বিজ্ঞানী আকৃষ্ট হন বিশুদ্ধ জ্ঞানপিপাসার প্রেরণায়।

(৩)

বিজ্ঞান ও দর্শনের সমধর্মিতা

উপরের আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ম একই প্রেরণা হতে। তা হল কৌতূহলবৃত্তি নিবারণের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ। তবে তাদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন। একটি আকৃষ্ট পরাবিদ্যার প্রতি, অপরটি আংশিক জ্ঞানের প্রতি। তবু যেহেতু তারা একই বৃত্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত তারা খানিক পরিমাণে সমানধর্মী।

এই সমধর্মিতা অন্যভাবেও প্রকট হয়। তা বিশেষভাবে প্রকট হয় তাদের আলোচনার রীতি হতে। সত্যানুসন্ধানের কাজে তারা মূলত যে মার্গ অবলম্বন করে তা একই। তাকে আমরা বলতে পারি যুক্তিমার্গ[১]। অনুমানই তার অবলম্বন এবং তর্কশাস্ত্র সম্মত যুক্তিই তার প্রধান অস্ত্র। মনের যে অংশ চিন্তা করে কেবল সেই অংশের সহিত তার সম্বন্ধ। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান আহরণ করি সেখানে অনুমানের প্রয়োগের কোন অবসর নেই; কারণ সেখানে আমরা যা জানি তা প্রত্যক্ষভাবে জানি। প্রত্যক্ষজ্ঞানকে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করেই বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞান গড়ে ওঠে। কোন একটি বিশেষ প্রশ্ন সম্বন্ধে উত্তর দিতে সাহায্য করে এমন সকল তথ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান হতে আহরণ করে সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য একত্র স্থাপন করা হয়। তার পর তাদের মূল্য বিচার করে একটি মীমাংসায় উপনীত হতে হয়। এমনও হতে পারে সংগৃহীত তথ্য পরস্পরের বিরোধী হয়। সেক্ষেত্রে চিন্তা-শক্তির সাহায্যে যুক্তির তুলাদণ্ডে বিচার করে ঠিক করতে হয় কোন তথ্যের ইঙ্গিতকে গ্রহণ করতে হবে। এখানে বিজ্ঞানের একটি সুবিধা এসে পড়ে

১ Rational method

যা হতে দর্শন বঞ্চিত। বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় সন্দেহের ক্ষেত্রে আরও পর্যবেক্ষণের[২] এমন কি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বাস্তব প্রতিক্রিয়া অবলোকনের[৩] সুবিধা আছে। দর্শনের কিন্তু সে সুবিধা নেই, কারণ তার আলোচ্য বিষয় এমন মৌলিক সমস্যা নিয়ে যে সেখানে পর্যবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরীক্ষণের অবস্থা থাকে না। সে পার্থক্য বিষয়ের প্রকৃতি হতে উদ্ভূত; তা তাদের সমধর্মিতাকে খণ্ডন করে না। উভয়েরই লক্ষ্য কিন্তু সত্য আহরণ করা।

সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান প্রতিপাদ্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ বিষয় যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের প্রবেশ করতে হবে। এখানে প্রাথমিক পরিচয় হিসাবে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু মৌলিক কথা বলা হবে।

আমাদের সকল জ্ঞানেরই বিষয় হল সত্য। সত্য বলতে বুঝি দুটি সংজ্ঞার মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশক এমন একটি বাক্য যা তাদের সম্বন্ধের প্রকৃত পরিচয় দেয়। আমার টেবিলের সামনে এক গেলাস জল রয়েছে। আমি তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যখন বলি 'এটা জল' তখন আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়েছে যে বস্তুটি তাকে নির্দেশ করতে 'এটা' এই বিশেষক সর্বনাম পদটি ব্যবহার করি। অতিরিক্তভাবে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'জল' সম্বন্ধে আমার যে ধারণা মনে গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে এই বস্তুটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাকে চিনতে পেরে তার সঙ্গে 'জল' পদার্থের সম্বন্ধ স্থাপন করি। এইভাবেই আমরা ইন্দ্রিয় হতে সঞ্জাত অনুভূতিগুলি হতে জাগ্রত অবস্থায় অনুক্ষণ বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি।

এই ধরণের জ্ঞান কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূত বিশেষ বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার ক্ষেত্র অতি সংকুচিত। প্রাত্যহিক জীবনধারণের কাজে সহায়তা ছাড়া আর কিছু তার করণীয় নেই। বিজ্ঞান বা দর্শন যে জ্ঞানকে সঞ্চয় করে সকল মানবজাতির জন্য গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত করে সে জ্ঞান ভিন্ন ধরণের। তার ভিন্নতা সূচিত হয় তার ব্যাপকতা দিয়ে। তা যে তথ্য আহরণ করে তা সর্ব-ক্ষেত্রে সর্বকালে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে উপরের দৃষ্টান্তই প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমি যদি বলি 'জল তরল পদার্থ' তা হলে যে জ্ঞান আহরণ করি, তা

২ Observations
৩ Experiment.

জলের একটি বিশেষ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান। তা শুধু আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট গেলাসের জলেই সীমাবদ্ধ নয়। তা সকল দেশের, সকল কালের, সকল জল সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এই ধরণের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্ঞানই বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুসন্ধানের বিষয়।

এই ভাবে সার্বিক জ্ঞান সঞ্চয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তার মনের একটি বিশেষ ক্ষমতা হতে। তা হল সার্বিক সংজ্ঞা [১] গড়বার ক্ষমতা। এই সার্বিক সংজ্ঞা এমন একটি বস্তু যাব প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পবে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে তাব একটি সংক্ষিপ্ত বিববণ দেওয়া দরকার। এটি এমন একটি বস্তু যার মনের বাহিরে বিশেষ আকারে প্রকাশ আমরা পাই না, অথচ অন্য পদার্থের আধার হিসাবে আমরা তাকে পাই। আমরা শত শত মানুষ দেখি। ইন্দ্রিয় তাদের সম্বন্ধে যে অনুভূতি পাঠায় তাদের বিশ্লেষণ করে তাদের সকলের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করি যা তাদেব সকলের মধ্যে আছে, যেমন তারা এক বিশেষ শ্রেণীব জীব, তারা চিন্তা করে, তারা কথা বলে ইত্যাদি। এই সকল সাধাবণ গুণগুলিকে একত্রিত করে তাদের সকলের উপর প্রয়োগ কবা যায এমন একটি মানসিক ছবি গড়ে তুলি। তার নাম দিই 'মানুষ'। এই ভাবেই মানুষ এই সাধারণ সংজ্ঞা গড়ে ওঠে। এটাও একটা নাম; কিন্তু ব্যক্তিবাচক নাম হতে তা স্বতন্ত্র। যখন আমার ভাই এর নাম রাখি 'রাম' তখন তা কেবল তাকেই নির্দেশ কবে। কিন্তু এই ধরণের নাম সকল মানুষের উপর প্রযোজ্য, তাই তা সার্বিক সংজ্ঞা। সুতরাং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা।

সার্বিক সংজ্ঞা শুধু জীব বা বস্তুকে চিনতে সাহায্য করে না। তা আরও সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে গড়ে উঠতে পারে এবং তার সাহায্যে আমাদের বস্তুর বিশেষ গুণ, ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধেও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়। আমরা জানি পাথর ভারি, সীসা ভারি, লোহা ভারি। এই জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হত না, যদি না ভারিত্ব এই সার্বিক সংজ্ঞা গড়ে তোলবার ক্ষমতা আমাদের মনে থাকত। এই ভাবে দয়া, মায়া, মমতার মত সূক্ষ্ম চারিত্রিক গুণ বুঝতেও আমাদের সার্বিক সংজ্ঞার আশ্রয় নিতে হয়। অনুরূপ রীতিতে বিভিন্ন প্রকৃতির ক্রিয়া সম্বন্ধে ও সার্বিক সংজ্ঞার সাহায্যে জ্ঞান

১ Universal term

আহরণ সম্ভব। কোন্‌টা মারামারি, কোন্‌টা খেলা, কোন্‌টা পতন কোন্‌টা উত্থান, তাও এই ভাবে বুঝি। এক কথায় বলা যায় সার্বিক সংজ্ঞা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে বলেই মানুষের ভাষার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা গড়ে উঠেছে এবং গভীর সূক্ষ্ম মননশীল চিন্তা সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং এক কথায় বলা চলে এই সার্বিক সংজ্ঞা আমরা যাকে জ্ঞান বলি তার মৌলিক উপাদান। ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তার বিশেষ কার্যকারিতা পরোক্ষ অনুমানভিত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে। রাজমিস্ত্রির বাড়ী নির্মাণ করতে যেমন প্রধান উপকরণ হল ইট, মানুষের জ্ঞান-সৌধ নির্মাণ করবার তেমন প্রধান উপকরণ হল এই সার্বিক সংজ্ঞা। সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শনের কাজ হল এই ভাবে সার্বিক সংজ্ঞার সঙ্গে সার্বিক সংজ্ঞার সত্য সম্পর্ক আবিষ্কার করে নানা তথ্য সংগ্রহ করা। তার পর সেই তথ্যগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে এক-একটি বিজ্ঞান বা এক-একটি দর্শন গড়ে ওঠে। সুতরাং এক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ও দর্শনের সমধর্মিতা লক্ষণীয়। তাদের উভয়েরই মূল উপকরণ হল সার্বিক সংজ্ঞা।

উপরের আলোচনা হতে আমাদের একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই আমাদের সকল জ্ঞানের ভিত্তি। তাকে অবলম্বন করেই সার্বিক সংজ্ঞা গড়ে ওঠে। আবার সার্বিক সংজ্ঞার ভিত্তিতে ইন্দ্রিয় দত্ত জ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান কেবল বিশেষে সীমাবদ্ধ। সার্থক জ্ঞান তাই যা সর্বক্ষেত্রে স্থান কাল নির্বিশেষে প্রযোজ্য। সেটা কিন্তু অনুমান-ভিত্তিক।

আমরা যখন বলি 'সকল মানুষ মরে', তখন আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করি; কারণ ব্যক্তিবিশেষের মানুষের মৃত্যু ঘটতে দেখার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। একজন ডাক্তার হয়ত কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুর সাক্ষ্য হতে পারেন, তার বেশী নয়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মরণের সংযোগসূচক উক্তিটির এই প্রয়োগ তার থেকে ব্যাপক। এখানে কাজেই ঝুঁকি নিয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন এই ধরণের অনুমানের উপর নিভর করেও অনুমান করে। সূক্ষ্মতর চিন্তায় আমরা ক্রমশ প্রত্যক্ষ হতে দূরে সরে আসি এবং প্রধানত অনুমানের ওপরই নিভর করি।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়েই জ্ঞান আহরণের কাজে দুটি রীতি অবলম্বন করে: প্রত্যক্ষ এবং অনুমান।

অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে। পাশ্চাত্য দর্শন তাদের অতিরিক্ত কোন অবলম্বন সাধারণত স্বীকার করে না। ভারতীয় দর্শন কিন্তু করে। ভারতীয় দর্শনে তার অতিরিক্তভাবে কয়েকটি জ্ঞানের সহায়ক রীতির উল্লেখ করা হয়েছে।

ন্যায় দর্শনের তালিকায় দুটি অতিরিক্ত রীতির উল্লেখ আছে: উপমান ও শব্দপ্রমাণ। পূর্বমীমাংসা দর্শনে এদুটির উল্লেখ ত আছেই; অতিরিক্তভাবে অর্থাপত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় ষড়দর্শনে সর্বত্রই শব্দ-প্রমাণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত আরও তিনটি অতিরিক্ত জ্ঞানরীতির প্রয়োগ আছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উপমান ও অর্থাপত্তিকে অনুমানেব অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কারণ তারা অনুমানের প্রকারভেদ মাত্র। উপমান হল সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান। তা পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রেও স্বীকৃত। অনুরূপভাবে অর্থাপত্তিও এক শ্রেণীব অনুমান, কারণ তা যা বলা হচ্ছে তা হতেই প্রতীয়মান হয়। যেমন, 'দেবদত্ত দিবসে আহার করে না অথচ সে রোগা হয়নি', এই অবস্থা হতে অনুমান করা যায় যে সে রাত্রে আহার করে। যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা হতেই সেটি সূচিত হয়। এও এক প্রকার অনুমান। সুতরাং তাদের অনুমানের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

যাকে বলা হয় শব্দপ্রমাণ তা হল ভিন্ন জিনিষ। শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি কর্তৃক বা গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তাকেই বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ কবার রীতিকেই তা সূচিত করে। একে তাই আপ্তবাক্য ও বলা হয়ে থাকে। বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই তাকে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এ হল যুক্তি মার্গের মূল ধর্মেব বিরোধী এবং স্বাধীন চিন্তার গতিকে ব্যাহত করে। সেই কারণে পশ্চিমের দর্শন তাকে সঙ্গত রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক যুগের প্রবর্তক দে কার্ত উপদেশ দিয়েছেন সব মত সন্দেহের ভিত্তিতে পরীক্ষা করে তার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে তা গ্রহণ করা উচিত। যুক্তিমার্গের এই ত ধর্ম। কোন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি কোন উক্তি করে থাকলে তা সত্য হতেও পারে, নাও পারে; বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করলে যেখানে তা ভ্রান্ত সেখানেও তাকে গ্রহণ করবার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের দেশে শাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক ভক্তিবোধ থাকার জন্যই এই ধরণের মার্গ স্বীকৃতি পায়। যুক্তিসম্মত ভাবে তাকে সে মর্যাদা দেওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে দে কার্ত যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঈশ্বর যখন আমাদের মনের মধ্যেই জ্ঞানের আলোকবর্তিকা স্থাপন করেছেন তখন অন্যের মতকে সোজাসুজি গ্রহণ করা উচিত হবে না।[১]

(৪)

বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য

বিজ্ঞান ও দর্শন সমধর্মী বটে, তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। তাদের সম্বন্ধ ভালরূপে বোঝবার জন্য তাদের কোথায় পার্থক্য, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হার্বার্ট স্পেনসার-এর একটি উক্তি দিয়ে আমরা এই আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। তিনি বলেছেন, নিম্নতম শ্রেণীর জ্ঞান হল অসন্নিবদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান হল আংশিকভাবে সন্নিবদ্ধ জ্ঞান আর দর্শন হল পূর্ণভাবে সন্নিবদ্ধ

ব্যাপকতার ভিত্তিতে জ্ঞানের এর থেকে সুন্দর বিশ্লেষণ হতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিবিশেষ তার জ্ঞানকে সাজিয়ে গুছিয়ে আলাদা করে লিখে রাখে না, সে তার স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে। যখন যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তখন সেটাকে স্মৃতির ভাণ্ডার হতে সংগ্রহ করে নিয়ে ব্যবহার করে। বাড়ীতে কোথায় আগুন জ্বলে উঠল আমি সঙ্গে সঙ্গে বালতি করে জল নিয়ে তার উপর ঢালতে লাগলাম, কারণ আমার মনে পড়ে গেল জল আগুনকে নির্বাপিত করবার ক্ষমতা রাখে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দেখে আমি জানালা বন্ধ করে দিলাম, কারণ জানি, তা না হলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হতে পারে। এই ভাবেই সাধারণ অবস্থায় বিভিন্ন সঞ্চিত জ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের মনে বিশ্লিষ্ট আকারে সঞ্চিত হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হয়।

অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিক তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানকে সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে একটা সুসংবদ্ধ রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এটার প্রয়োজন হয় দুই কারণে। প্রথমত,

১ For since God has endowed each of us with some light of reason by which to distinguish truth from error, I could not have believed that I ought for a single moment to rest satisfied with the opinions of another." Discourse on Method, II

২ Herbert Spencer, First Principle.

কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে এত তথ্য সংগৃহীত হয় যে তাদের সুসংবদ্ধ করে না সাজালে তারা বোধগম্য হয় না। দ্বিতীয়ত, চিন্তাকে স্বচ্ছ রূপ দিতে হলেও যুক্তির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করে, তার বিভিন্ন অংশ পৃথকভাবে আলোচনা করে, তাদের একটা সামগ্রিক রূপ দেবার প্রয়োজন হয়। আমরা যখন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের আলোচনা করি তখন তার বিষয়বস্তুকে ভাগ করে নিই। যেমন উদ্ভিদের প্রকৃতি কি, তার দেহের কি কি অংশ আছে, তাদের প্রত্যেকের কি কাজ, তারা খাদ্য সংগ্রহ করে কি করে, তারা বংশবিস্তার করে কি ভাবে, তাদের কেমন ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায় ইত্যাদি। এইভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের একটি বিশেষ অংশ সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান আহরণ করাই বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং বলা যায় এখানে সামঞ্জস্য স্থাপন অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

দার্শনিকের বিভিন্ন সংগৃহীত তথ্য সম্বন্ধে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে কাজ করে। কারণ, তাঁর কাজ হল সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আহরণ করা। তিনি তাঁর অনুসন্ধান কোন অংশবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তিনি সমগ্র বিশ্বকে আলোচনার বিষয় করে নিয়ে তার যা মূল সমস্যা সে সম্বন্ধে সকল সম্ভাব্য তথ্য আহরণ করে তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কাজেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকতম হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে দার্শনিকের জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জসীকৃত বলে বর্ণনা করা অসঙ্গত নয়।

একটি উপমা প্রয়োগ করে বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করা যাক। রাজমিস্ত্রি যে বাড়ী নির্মাণ করে তার একটি ভিত থাকে। তার ওপরে বাড়ী গড়ে ওঠে। সেই বাড়ীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকে। আবার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ জড়িয়ে বাড়ীর একটি সামগ্রিক রূপ গড়ে ওঠে। বাড়ী যদি বাস করবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা হলে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত করে গড়া হয়, যাতে প্রয়োজন মত ব্যবস্থা তাতে থাকে। এই ভাবে শোবার ঘরের ব্যবস্থা থাকে, বসবার ঘরের ব্যবস্থা থাকে, খাবার ঘরের ব্যবস্থা থাকে ইত্যাদি। আর তার ফলে সমগ্র বাড়ীটি সাধারণ ভাবে বাসের উপযোগিতা লাভ করে।

মানুষ জ্ঞানকে উপাদান করে যে সৌধ নির্মাণ করে তার সম্পর্কেও বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুরূপ একটি অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। সার্বিক সংজ্ঞা যদি সে সৌধের মৌলিক উপকরণ হয়, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ যা জ্ঞানাত্মক বাক্য সূচিত করে তাই হল তার গাঁথবার মশলা। আমরা যেমন বালি ও

সিমেণ্টের মশলা দিয়ে ইটের পরে ইটকে যুক্ত করে বাড়ী নির্মাণ করি, তেমন সম্বন্ধ সূচক শব্দের সাহায্যে সার্বিক সংজ্ঞার সঙ্গে সার্বিক সংজ্ঞা যুক্ত করে জ্ঞানের সৌধটি গড়ে তুলি। তলায় তার যে ভিত থাকে তাই হল যেন অসংনিবন্ধ সাধারণ মানুষের জ্ঞান, সেখানে আলাদা প্রকোষ্ঠের চিহ্ন বিশেষ থাকে না। তার পর যখন তা খানিক গড়ে ওঠে, তখন বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে পৃথক করে নিয়ে আলাদা ভাবে সাজিয়ে এক-একটি বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। তারা যেন এক-একটি প্রকোষ্ঠ। আর তাদের ওপর দর্শনের ক্ষেত্রে সঞ্চিত যে সামগ্রিক জ্ঞান সকল অংশের জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তা তার একটি সমগ্র রূপ গড়ে তোলে।

বিজ্ঞান ও দর্শনের সীমা এইরকম সুস্পষ্ট ভাবে কিন্তু প্রথম হতেই নির্দিষ্ট হয় নি। ঠিক বলতে কি এদের জন্মের ইতিহাস বড় বিচিত্র। মনে হয় ধর্মই এদের আদি জননী। মানুষের সীমিত জ্ঞানশক্তি তাকে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে যে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আকাশ গ্রহ-নক্ষত্রে ভরা, ধরণীর বুকে প্রাণের প্রবাহ, প্রকৃতির মধ্যে কি বিরাট শক্তির সমাবেশ। মানুষ তার খানিকটা বোঝে, খানিকটা বোঝে না। তাই তার যেমন বিস্ময়ের অবধি থাকে না, তেমন রহস্যকে ভেদ করতে পারে না। এই পরিবেশেই তার ধর্মবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে। খানিকটা ভয়, খানিকটা বিস্ময়ের অনুভূতি তার মনকে উদ্‌গ্রীব করে তোলে এমন একটি শক্তির আবিষ্কারের জন্য যা তাকে রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করবে এবং একটি নির্ভর-যোগ্য আশ্রয়স্থলের সন্ধান দেবে। এই ভাবেই একটি জটিল পথে ধর্মের বিকাশ সুরু হয়। এই সূত্রে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের একটি ধারণা মানুষের মনে গড়ে ওঠে। তিনি চূড়ান্ত শক্তির আধার হয়ে পরিকল্পিত হন। কাজেই একাধারে তিনি বিস্ময়কর বিশ্বের সৃষ্টির কারণ হতে পারেন আবার বিপদে আশ্রয়স্থলও হতে পারেন।

এই ভাবে ধর্মের দুটি দিক গড়ে ওঠে। একটি দিক মানুষকে তার ঐহিক প্রয়োজন চরিতার্থ করতে সাহায্য করে। অপরটি তার জ্ঞানপিপাসা দূর করতে সাহায্য করে। ঈশ্বরভক্তির স্থূলতম প্রকাশ হল আর্ত অবস্থায় পরিত্রাণের আকুতি। এখানে একান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনেই ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয়। ঈশ্বরের আদিম রূপ হল বিপদবারণ রূপ। তার পর ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ব্যবহারিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠতে শেখে। প্রথমে বিপদ

হতে ত্রাণের জন্য মানুষ ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তার পর ঐহিক সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তার বিভিন্ন কামনা পূরণের জন্য ঈশ্বরের দ্বারস্থ হয়। তারও পর ধর্মবোধ আরও মার্জিত রূপ ধারণ করলে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি পোষণ করতে শেখে। এটি হল ধর্মের একান্তই নিজস্ব রাজ্য। তা হতে তাকে কেউ বিচ্যুত করতে পারে না।

ধর্মের অপর দিক হল মানুষের মানসিক বিকাশের প্রথমযুগে তার কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ করার ক্ষমতা। ঈশ্বর এখানে অপরিসীম শক্তির আধার রূপে কল্পিত হন। তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা। বিশ্বের চারিদিকে যে বিস্ময়কর সৃষ্টি নয়নগোচর হয়, তা তাঁরই শক্তির প্রয়োগে সম্ভব হয়েছে। এইভাবে এই অবস্থায় ধর্মকে আশ্রয় করে জ্ঞান চর্চাও গড়ে উঠেছে। তাই দেখি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিরহস্য ভেদেরও একটা চেষ্টা হয়েছে। ধর্মের এই অঙ্গ একান্ত ভাবে তার নিজস্ব নয়, আনুষঙ্গিকভাবে গড়ে উঠেছে।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাবে। পুরাতন বাইবেলে যেমন ঈশ্বরের মহিমা কীর্তিত হয়েছে, তাঁর প্রতি মানুষের কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে, তেমন কি ভাবে বিশ্বসৃষ্টি হল, দিন রাত্রি সৃষ্টি হল, আদিম মানব দম্পতী সৃষ্টি হল, এদের একটা ব্যাখ্যা আছে। মানসিক বিকাশের প্রথম অবস্থায় এই ধরণের ব্যাখ্যাই মানুষের জ্ঞান-পিপাসা দূর করত।

প্রথম অবস্থায় ধর্মের সঙ্গে যে দার্শনিক চিন্তাও জড়িয়ে থাকে তার সুন্দর দৃষ্টান্ত হল হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদ। বলা হয়ে থাকে বেদের দুটি অঙ্গ আছে, একটি কর্মকাণ্ড এবং অপরটি জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডের অঙ্গ হিসাবে আরণ্যক ও উপনিষদের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মনে হয় মূল সংহিতার মধ্যেও জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছে। সাধারণভাবে ঋগবেদ সংহিতার সূক্তগুলি বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত এবং তাদের বিষয়-বস্তু হল এই বিশেষ বিশেষ দেবতাগুলির স্তুতি গান এবং তাঁদের কাছে প্রার্থনা নিবেদন। সে প্রার্থনা বিপদ হতে মুক্তির জন্য বা বিশেষ কামনা পূরণের জন্য। এই হল প্রকৃত কর্মকাণ্ড। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় দার্শনিক চিন্তাও সূক্তগুলির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কোথাও এই সৃষ্টি কোথা হতে এল, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, কোথাও বিভিন্ন দেবতা সম্ভবত একই দেবতার বিভিন্ন প্রকাশ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এমন কি কয়েক ক্ষেত্রে একটি সমগ্র সূক্ত জুড়ে দার্শনিক বিষয় আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে

পুরুষ-সূক্ত (১০ | ৯০), প্রজাপতির উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত (১০।১২) আত্মার উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত (১০।১২৫) এবং নাসদীয় সূক্তের (১০।১২৯) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের লেশমাত্র সংস্রব নেই। এগুলির আলোচনার বিষয় বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব।

মনে হয় ধর্মের এই জ্ঞান সম্পর্কিত অঙ্গই পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে দর্শনের উৎপাদন করেছিল। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাচীন উপনিষদগুলি। বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চাই তাদের আলোচ্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ধর্মসম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞান হতে তাকে পৃথক করবার জন্যই তাকে পরাবিদ্যা বলা হয়েছিল। এই পরাবিদ্যারই পরে দর্শন নামকরণ হয়েছিল।

এইভাবে বিশ্বকে জানার আকুতি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে। তার পর যখন আনুষ্ঠানিক অঙ্গ প্রাধান্য পেল এবং যুক্তি মার্গের ভিত্তিতে বিশ্বসম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা শক্তিমতী হয়ে উঠল, তখন দর্শনের সৃষ্টি হল। দর্শনেরই ওপর ভার পড়ল বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করবার। এইভাবে যেমন একদিকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হয়ে দাঁড়াল, তেমন বিশ্বের মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানও দর্শনের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে নির্ধারিত হল। এই হল বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্মের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই অবস্থায় দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র ছিল খুব ব্যাপক। যেমন বিশ্ব-সত্তার স্বরূপ বা সৃষ্টির রহস্য তার আলোচনার বিষয় ছিল, তেমন বর্তমানে যেগুলি বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেগুলিও তার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হত। উদ্ভিদতত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতিষ, মনের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, সব কিছু দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার পর তৃতীয় অবস্থায় যেমন বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্টতর এবং অধিকতর তথ্য সংগৃহীত হয়ে উঠল তেমন তারা পৃথক শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি পেল। এই ভাবেই বিজ্ঞানের জন্ম হল। এই প্রসঙ্গে দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। জ্যোতিষ পূর্বে ছিল দর্শনের অঙ্গ। তার পর যখন সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটনের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলি প্রকাশ হল তখন তা পৃথক শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি পেল। বর্তমানে তা পদার্থ বিজ্ঞানের অঙ্গ হয়ে আছে। এমন কি নিউটনের সময়ও যে তা দর্শনের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হত তার

প্রমাণ মিলবে নিউটনের গ্রন্থের নামকরণ হতে।[১] অনুরূপভাবে মানুষের মন সম্পর্কিত সকল আলোচনা প্রথম অবস্থায় দর্শনের অঙ্গ হিসাবেই পরিগণিত হত। পরে যখন অনেক তথ্য সংগৃহীত হল, তখন তার পৃথক স্বীকৃতি দিয়ে নামকরণ হল মনোবিজ্ঞান।[২] তা সত্ত্বেও এখনও তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে দর্শনের অঙ্গীভূত বিষয় বলেই পরিগণিত হয়।

দর্শনের আশ্রয়েই যে এইভাবে বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল তার কিছু প্রমাণ পশ্চিমের ভাষাগুলিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের নামকরণরীতি হতে সূচিত হয়। এখনও অনেক বিজ্ঞান আছে যার নামের শেষ অংশ হল 'ওলজি' এই কথাটি। যেমন বায়লজি, প্যাথলজি, সাইকলজি প্রভৃতি। 'লজিক' অর্থে বোঝায় যুক্তিশাস্ত্র, দর্শন যুক্তিশাস্ত্রেব প্রয়োগে গঠিত। কাজেই দর্শনের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে 'লজিকের' ব্যবহার আছে। হেগেল তাঁর দর্শনের গ্রন্থখানির নাম দিয়েছিলেন 'লজিক'। এই বিশেষ বিষয়গুলি যে এককালে দর্শনের অঙ্গ ছিল তা স্মরণ করিয়ে দিতেই যেন এই বিজ্ঞানগুলির শেষে 'ও লজি' অর্থাৎ 'অফ লজিক' এই অংশটি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ 'বায়লজি' অর্থে আমরা বুঝব দর্শনের প্রাণবিষয়ক অঙ্গ। এই ভাবে তাদের জন্মকাহিনীর স্মারক হিসাবে তাদের নামের সঙ্গে দর্শনের নামও যুক্ত হয়ে গেছে।

সুতরাং এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে দর্শন হল জননী আর বিজ্ঞানগুলি তার সন্তান। মায়ের কোলে মেয়ের জন্ম হয় এবং মায়ের আশ্রয়ে সে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিজ্ঞানগুলিও তেমন প্রথমে দর্শনের অঙ্গ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে তারই আশ্রয়ে পরিবর্ধন লাভ করেছিল। তার পর মেয়ে বড় হলে যেমন মার থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন সংসার পাতে, বিজ্ঞানগুলিও তেমন পরিণতি লাভ করে দর্শনের আশ্রয় ত্যাগ করে স্বতন্ত্র নাম নিয়ে যেন আলাদা সংসার পেতেছে।

১ নিউটন তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন "The Mathematical Principles of Natural Philosohpy."

২ Psychology.

(৫)

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের সীমা

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে বিজ্ঞানের কাজ হল বিশ্বের বিশেষ বিশেষ অংশকে পর্যবেক্ষণ করে তার সম্বন্ধে সুবিন্যস্ত আকারে জ্ঞান সংগ্রহ করা। সেই চেষ্টা হতে বিজ্ঞানের কতকগুলি অসুবিধা এসে পড়ে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করে যা পান তা হতে যা তাঁর অনুসন্ধানের বহির্ভূত তাকে বর্জন করেন। তার পর যে তথ্য প্রাসঙ্গিক শুধু সেইটুকুর মধ্যে নিজের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন।

কাজেই বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত সংকুচিত। বাস্তব জগতে নানা তথ্য পরস্পর মিশিয়ে আছে। তিনি তাদের পৃথক করে কেবল যেটুকু তাঁর আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিষয় শুধু সেইটুকু গ্রহণ করেন। যে মানুষ দুধ হতে মাখন তোলে সে শুধু মাখন তোলা নিয়েই ব্যস্ত, দুধের আর কি উপাদান আছে তাতে তাঁর নজর নেই। বৈজ্ঞানিকের কাজ অনেকটা এই ধরনের। তা হল বিশ্লেষণাত্মক। অপরপক্ষে দর্শনের কাজ সংশ্লেষণাত্মক। তার ফলে বিজ্ঞানের আহৃত জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় বিশেষের জ্ঞান। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে তা বিচ্যুত হয়। এ যেন অনেকটা একটি পূর্ণাঙ্গ বাড়ীকে ভেঙে এক একটি পৃথক প্রকোষ্ঠে রূপান্তরিত করা। এই সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গিব ফলে বিজ্ঞান বিশ্ব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা দিতে সক্ষম হয় না।

এই প্রসঙ্গে উইল ডুরাণ্ট-এর একটি মন্তব্যের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন বিশেষজ্ঞ হওয়ায় বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের চোখের ওপর এমনভাবে পর্দা তুলে দেন যে একটি নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া তাঁদের দৃষ্টিপথ হতে সমগ্র বিশ্ব সরে যায়। ফলে আনুপাতিক দৃষ্টিক্ষমতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। বোধের বদলে তাঁরা পান তথ্য এবং জ্ঞান সহস্রখণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়ে আর প্রজ্ঞার উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে না।[১]

বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল বিশেষ বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরণ করা। সেই কারণে তার জ্ঞান সংগ্রহের উপায় সীমাবদ্ধ। তা প্রধানত প্রত্যক্ষ

১ "The specialist put on blinders in order to shut out from his vision all the world but on little spot, to which he glued his nose. Perspective was lost. 'Facts' replaced understanding; and knowledge split into a thousand isolated fragments, no longer generated wisdom."

The Story of Philosophy, Preface to Second Edition

জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। তার অতিরিক্তভাবে তা অনুমানের ওপর নির্ভর করে। জ্ঞানের অন্য কোন মার্গ তা স্বীকার করে না। অনুমানের ক্ষেত্রেও তা অবরোহ প্রণালী[১] অপেক্ষা আরোহ প্রণালীর[২] ওপর বেশী নির্ভর করে। বহু দৃষ্টান্ত হতে একটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্ঞানবাক্যে যখন আমরা উপনীত হই তখন এই আরোহ প্রণালী পাই। বিভিন্ন গ্যাস জাতীয় পদার্থ উত্তাপে স্ফীতিলাভ করে দেখে আমরা এই সার্বিক জ্ঞানবাক্যে উপনীত হই যে উত্তাপ গ্যাসকে স্ফীত করে।

সংগৃহীত জ্ঞানের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হবার জন্য বিজ্ঞান আরও একটি সাবধানতা অবলম্বন করে। আরোহপ্রণালী প্রয়োগ করে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য বিজ্ঞানী শুধু পর্যবেক্ষণ করেন না, কৃত্রিম উপায়ে পরিবেশকে সৃষ্টি করে যা তিনি দেখেছেন তা ফোটাতে পারেন। যখন এই ভাবে কোন সন্দেহের অবকাশ আর থাকে না, তখনই তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ফলে বিজ্ঞানের কাজ হয় পর্যবেক্ষণ[৩] এবং পরীক্ষার[৪] ভিত্তিতে আরোহমূলক জ্ঞানবাক্য সংগ্রহ করে তাকে সুসংবদ্ধভাবে সাজানো। এই ধরনের সিদ্ধান্ত সাধারণত কার্য-কারণ সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে; কারণ ওই সম্বন্ধের ভিত্তিতেই তার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব হয়।

এর ফলে কোন বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আমরা পাই তা খুব সন্তোষজনক হয় না। তাতে আমাদের কৌতূহল বৃত্তির একটা আংশিক তৃপ্তি হয় মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ দু'-একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের সহিত দৈনন্দিন জীবনে যে নিত্য পরিচয় ঘটে তাতে আমরা পাই হয় বস্তু, না হয় ঘটনা। এই বস্তুর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি কতকগুলি গুণের একত্র সমাবেশ সূচিত করে। যেমন এক তাল লোহা বোঝাতে বলি তা এমন একটি পদার্থ যা কঠিন, যা ভারি ইত্যাদি। কিন্তু এ যেন ঠিক ব্যাখ্যা নয়; এ যেন একটি ধারণাকে বিশ্লেষণ করে তার আশ্রয়ে তার প্রকৃত পরিচয় দেবার অক্ষমতাকে ঢাকবার চেষ্টা।

কোন ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা আরও অসন্তোষজনক। যখন একটি ঘটনা কেন ঘটল ব্যাখ্যা করতে বলি, বিজ্ঞান তার পূর্ববর্তী একটি

১ Deduction
২ Induction.
৩ Observation
৪ Experiment

ঘটনা দেখিয়ে বলে এটির জন্য তা ঘটল। যদি প্রশ্ন করি জল কেন ফুটল, উত্তর হয় উত্তাপ পেল বলে। কিন্তু উত্তাপ কেন জলকে ফোটায় জিজ্ঞাসা করলে বিজ্ঞান উত্তর দিতে পারবে না। অর্থাৎ বিজ্ঞান আনুপূর্বিক কোন্‌টার পর কোন্‌টা ঘটে বলে যেতে পারে, কিন্তু তার থেকে গভীরে প্রবেশ করতে পারে না।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য হেতু এবং তার নির্বাচিত জ্ঞান সংগ্রহরীতির প্রকৃতি হেতু বিজ্ঞান নিজেকে সব থেকে নিরাপদ জ্ঞান করে জড়পদার্থের রাজ্যে। কারণ, জড় পদার্থ স্থূল এবং সহজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। তাকে নিয়ে যেমন পর্যবেক্ষণ করা যায়, তেমন কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করবার পূর্বে তাকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। তাকে নানা যন্ত্র দিয়ে মাপা যায়। ফলে জড় জগৎ সম্পর্কে তা খানিকটা সাফল্য অর্জন করে সত্য, কিন্তু এক অর্থে তা একদেশদর্শী হয়ে পড়ে।

যেহেতু স্থূল বস্তুর ওপর তার নির্বাচিত জ্ঞান সংগ্রহরীতি সহজেই প্রয়োগ করা যায়, তার চেষ্টা হয় বিশ্বকে কেবলমাত্র জড়পদার্থের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করার। তার ধারণা হয় বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্য তত্ত্ব হল তার পরিমাপগত রূপ। স্থূল পরিমাপের মধ্যে যা ধরা পড়ে না তাকে বিজ্ঞান স্বীকৃতি দিতে চায় না। স্থূল-পরিমাপ-বিশিষ্ট সত্তার অতিরিক্ত ভাবেও যে বিশ্বে অনেক জিনিষ আছে তা স্বীকার করতে বিজ্ঞান প্রস্তুত নয়। সৃষ্টি রহস্যের পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা বিজ্ঞান সে বিষয় দৃষ্টিপাত করতে চায় না। কারণ জড়পদার্থের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না। তাই বিজ্ঞানের অভিধানে উদ্দেশ্য কথাটি স্থান পায় নি। যান্ত্রিক ভাবে কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির পরস্পর ক্রিয়া হতে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে—এই ধরনের একটা ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠে। সে ব্যাখ্যায় যে-তত্ত্ব বোঝা যায় না তার সত্যতা স্বীকার করতে বিজ্ঞান সম্মত নয়।

যেহেতু বিজ্ঞানের পক্ষপাত জড়বস্তুর প্রতি এবং যেহেতু জড়বস্তুর নানা-ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব, সেই হেতু বিজ্ঞানের গণিতের ভাষা অবলম্বন করার দিকে একটা ঝোঁক আসে। জড়বস্তুর যেগুলি গুণ বলে গৃহীত হয় তাদেরও পরিমাপ করা সহজ। দয়া, মায়া, মমতা শ্রেণীর মানসিক গুণের পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু ঘনত্ব, ব্যাপকতা, গতি প্রভৃতি জড়পদার্থের গুণগুলির গাণিতিক পরিমাপ করা যায়। তাই দেখি পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষা গণিতের ভাষায়

পরিণত হয়েছে। এমন কি তা যে তথ্য দেয় তা কতকগুলি যন্ত্রে যে তথ্য সূচিত হয় তাকেই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাই এডিংটন তাকে সংকেত পাঠের রীতি[১] বলে বর্ণনা করেছেন। ফলে আমরা বিশ্ব সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, তাও ঠিক সোজাসুজি পাই না, পাই যন্ত্রের পাঠানো সংকেত। পরিণতিতে জড়পদার্থের গভীরেও প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে এডিংটন-এর একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তিনি মোটামুটি বলেছেন পদার্থ বিজ্ঞান আমাদের পরিবেশের দুর্জ্ঞেয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা না করে, কেবল যন্ত্র কি বলে তা পাঠ করে, কারণ তা দেখা যায়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য এই পাঠ বিশ্বের গুণাবলীর তারতম্যকে প্রতিফলিত করে; কিন্তু ফলে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান কেবল এই পাঠেই সীমাবদ্ধ থাকে, গুণে বিস্তৃত হয় না। কিন্তু পাঠের সঙ্গে গুণাবলীর সেইটুকু সাদৃশ্য আছে যেটুকু একটি টেলিফোনের নম্বরের সঙ্গে তার মালিকের থাকে।[২]

এইভাবে বিজ্ঞানের এই বিশেষ অনুসন্ধান রীতির প্রয়োগের ফলে তার জ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে যায়। যে অনুমানের সত্যতা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় গোচর প্রমাণের সাহায্যে পরীক্ষা করা যাবে না তা বর্জন করতে চায়। ফলে বিশ্বের এক বিরাট অংশ তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রের বাহিরে রয়ে যায়। যেখানে তার আত্মনির্বাচিত নীতি প্রয়োগ করা যায়, সেখানেও তা একই কারণে পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারে না। সেখানেও ব্যাখ্যাকে রীতির সহিত খাপ খাইয়ে নেবার জন্য গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্জন করে কেবল পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নিজের নির্বাচিত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা খোঁজে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তা বিশ্বের বিকৃত ছবি দিয়ে বসে। তার ব্যাখ্যা তাই অনেকটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় পরিণত হয়।

এটা স্বীকৃত যে বিশ্বের প্রকটতম প্রকাশ তার জড়রূপে; কিন্তু সেই জড়কেই অবলম্বন করে তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন নানা মানসিক স্তরে বিকশিত

১ Pointer reading.

২ "And so in its actual procedure physics studies not the inscrutable qualities, but pointer-readings which we can observe. The readings it is true reflect the fluctuations of the world-qualities, but our exact knowledge is of the readings, not of the qualities. The former have as much resemblance to the latter as telephone number has to a subsoscriber.

Science, Religioun and Reality, The Domain of Physical Scince.

যার নাগাল জড়ের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যায় না। জড় বস্তুকেই অবলম্বন করে প্রকৃতির বক্ষে প্রাণ বিকশিত হয়েছে। সেই প্রাণ-শক্তি ত ঠিক যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয় না; তার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে। সেই প্রাণ-শক্তি মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়ে আরও জটিল রূপ ধারণ করে। সেখানে তার মনের মধ্যে কত কি ঘটে যায় যার সঙ্গে জড়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ পাওয়া যায় না। মানুষের মনে এমন ইচ্ছাশক্তি আছে যা জড়ের রূপকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা রাখে। শুধু কি তাই? তার মনে ভক্তি আছে, শ্রদ্ধা আছে, প্রীতি আছে। তাদের দিশা জড়পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে আলোচনা তা দিতে পারে না।

তার ওপর বিস্ময়ের পর বিস্ময়, মানুষের মনে এমন কতকগুলি মৌলিক বোধ গ্রথিত আছে যাদের অবলম্বন করে তার ব্যবহারিক জীবন নানাভাবে গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে ধর্মবোধ অন্যতম। বিশ্বসত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে তার কৌতুহলবৃত্তির তৃপ্তি ঘটলেও তার ধর্মবোধের তৃপ্তি হয় না। বিশ্ব-সত্তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতির তৃপ্তির জন্য সে নানা ধর্ম গড়ে তোলে। অনুরূপভাবে তার মধ্যে নীতিবোধ প্রোথিত আছে। মানুষ ইচ্ছা প্রণোদিত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে একটি নৈতিক আদর্শ গড়ে তুলতে চায়। বিশ্বসত্তার কল্যাণ রূপের একটি পরিচয় এই প্রসঙ্গে তার দরকার হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত-ভাবে তার একটি শিল্পবোধ আছে। সেই বোধ তাকে শিল্পী করে গড়ে তোলে এবং শিল্পবস্তুর রসাস্বাদন করে আনন্দ অনুভব করতে আগ্রহশীল করে। এও বিশ্বের এক অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ের গুণগত বৈশিষ্ট্য।

বিজ্ঞান কিন্তু এদের পরিহার করে চলে। কারণ, তার যা অনুসন্ধান রীতি তা এই সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োগের অনুপযুক্ত। সুতরাং বিজ্ঞানের অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায় সেকালের ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়ার চোখে ঠুলি বাঁধা অবস্থায় যা হত তার মত। এমন ভাবে ঠুলি বাঁধা হত যাতে ঘোড়া কেবল যে পথে সে ছুটবে সেইটুকুই দেখতে পায়, তার দুপাশে কি আছে তা না দেখতে পায়। বিজ্ঞানও যেন স্বেচ্ছায় এইভাবে চোখের ওপর ঠুলি পরিয়ে দেয়। তা কেবল সেই পথেই হাঁটবে যেখানে বিশ্বের জড়রূপ এমন ভাবে পরিস্ফুট যে তার অনুসন্ধান রীতি তার ওপর প্রয়োগ করা যায়।

বিজ্ঞানের এই দুর্বলতা সম্বন্ধে অনেক মনীষী অনেক মন্তব্য করেছেন। তাদের দু'একটি নির্বাচন করে এখানে উদ্ধৃত করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিংটন ক্ষোভ করে বলেছেন যে পদার্থ বিজ্ঞান, আয়তন, ঘনত্ব, বিস্তার এবং সাময়িক অবস্থিতি প্রভৃতি জড়বস্তুর পরিমাপক গুণগুলির মধ্যেই তার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে এবং শিল্পতত্ত্ব, নীতিবোধ এবং অনুরূপ মানসিক গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা বর্জন করে।[৩]

একই কারণে দার্শনিক হোয়াইটহেড এই মন্তব্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে প্রাণশক্তির আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান একেবারেই নৈরাশ্যপূর্ণ। তার কারণ, তার মতে, প্রাণশক্তির মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল; সেই উদ্দেশ্যই বিশেষ বিশেষ জীবকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের মতিগতির সঙ্গে তা সামঞ্জস্য রক্ষা করে না বলে বিজ্ঞান কিছুতেই তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না এবং পরিবর্তে একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা তার ওপর আরোপ করে।[৪]

সুতরাং দেখা যাবে যে বিজ্ঞান তার সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। বিশ্বে যেমন স্থূল জড়বস্তু আছে, তেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসিক বস্তুও আছে। জড় সহজে চোখে পড়ে, কিন্তু যা মানসিক তা পড়ে না। কিন্তু তা বলে তা তাকে বর্জন করা যায় না। ঠিক বলতে কি মানুষের কাছে তার তাৎপর্য অনেক বেশী, কারণ তাকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন আবর্তিত। এই যে মানুষের মন তা এক অতি জটিল বস্তু। জড়বস্তুকে ব্যবহার করে তার প্রাণশক্তি প্রবাহিত হয়, কিন্তু তার বিস্তার তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর ব্যাপ্ত। মনে যেমন ইচ্ছাশক্তি আছে তেমন দয়া মায়া মমতা বোধ আছে। যেমন শ্রদ্ধাবোধ আছে তেমন কল্যাণবোধ আছে। আর বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তি, কল্পনাশক্তি তাকে নানাভাবে পরিচালিত করছে। তার ফলে বহু ও বিচিত্র ক্ষেত্রে মানুষের

৩ "Leaving out all aesthetic, ethical or spiritual aspects of our environment, we are faced with qualities such as massiveness, substantality, extension, duration, which are supposed to belong to the domain of physics."

(Ibid)

৪ "There is clear evidence that certain operations of certain animal bodies depend upon the foresight of an end and the purpose to attain it. It is no solution of the problem to ignore this evidence because other operations have been explained in terms of physical and chemical laws. The existence of a problem is not even acknowledged. It is vehemently denied."

Quoted in Sullivan's The Limitations of Science.

অভিজ্ঞতা বিস্তারিত। সে ভক্ত হয়, শিল্পী হয়, সে মানবপ্রেমিক হয়, আবার অপরদিকে সে বৈজ্ঞানিক হয়, দার্শনিক হয়, স্থপতি হয়। এই বিষয়গুলি বর্জন করেত কোন বিশ্বতত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং কেবল বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্পূর্ণ বিশ্বতত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

(৬)

দর্শনের ক্ষেত্রের ব্যাপকতা

সুতরাং বিশ্বের পরিপূর্ণ পরিচয় গড়ে তোলবার ভার দর্শনের নিতে হয়। কাজেই বিভিন্ন বিজ্ঞান বিশ্বের অংশ সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞান দেয় শুধু তাদের পরস্পরের সামঞ্জস্যবিধান করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তা হলে ত বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তাকে আবদ্ধ থাকতে হয়। তা হলে দর্শন ঠিক বিশ্বরূপের দর্শন হয় না, বিশ্বের আংশিক রূপের দর্শন হয় মাত্র।

কাজেই দর্শনের একটি অতিরিক্ত কাজ এসে পড়ে। তা হল বিশ্বের যে মৌলিক সমস্যাগুলি বিজ্ঞান বর্জন করেছে তাদেরও আলোচনার ভার নেওয়া। পূর্বের আলোচনা হতেই হৃদয়ঙ্গম হবে এই সমস্যাগুলি প্রধানত মানুষের মনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত শক্তির প্রকাশ ঘটে তাদের সম্পর্কিত। এক কথায় তাকে বিশ্বের মানসিক দিক বলা যায়। মানুষের মন, সেই মনে যে সব সূক্ষ্ম বোধ বা অনুভূতি আছে, যেমন ধর্মবোধ, নীতিবোধ, এগুলি তার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের আত্মা আছে কিনা, মৃত্যুর পর পরলোক আছে কিনা, এগুলিও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যু রহস্য মানুষের মনকে চিরকাল নাড়া দিয়ে এসেছে। এখানে তার মন একটি দোটানায় জড়িত হয়ে পড়ে। প্রাণকে মানুষ এমন ভালবাসে যে বিশ্বাস করতে চায় না যে মৃত্যু তার ওপর ছেদ টেনে দেয়। অথচ আপাত-দৃষ্টিতে মৃত্যুর পর তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইচ্ছার সঙ্গে, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্ভাবিত সত্যের একটা দ্বন্দ্ব এসে পড়ে। এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা মানুষ করতে চায়। সুতরাং এই সমস্যাগুলি অতিরিক্তভাবে দর্শনের আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে।

শুধু কি তাই? মানুষ জ্ঞান অর্জন করবার ক্ষমতা রাখে সেটাও একটা মস্ত বড় রহস্য। বিশ্বের কোলে এক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হয়ে

সে জন্মগ্রহণ করে। একদিকে সে আর অন্যদিকে তার পরিবেশ। সেই পরিবেশ হতে খাদ্য সংগ্রহ করে তার জীবন ধারণ করতে হয়। সেই পরিবেশে তার প্রতিকূল নানা প্রাকৃতিক শক্তি ক্রিয়াশীল। জল আছে, ঝড় আছে, ভূমিকম্প আছে, বন্যা আছে। আত্মরক্ষার জন্য তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে তার অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অপরপক্ষে তার মত অন্য প্রাণীও আছে যারা তার সহিত শক্রতা মূলক আচরণ করতে প্রস্তুত। কত হিংস্র প্রাণী আছে যাদের হাত হতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থার তার প্রয়োজন। সুতরাং নিজের পুষ্টির জন্য, আত্মরক্ষার জন্য তার পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। এই জ্ঞান আমরা এমনিই আহরণ করি, কিন্তু এ যে এক বিস্ময়কর বস্তু সে বিষয় আমরা সাধারণত সচেতন নই।

বিষয়টি যে কত বিস্ময়কর এবং রহস্য জড়িত তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে। বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য প্রকৃতি আমাদের দেহে কতকগুলি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত করে দিয়েছে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি অনুক্ষণ আমাদের জন্য আমাদের পরিবেশ সম্বন্ধে সংবাদ এনে দিচ্ছে। তারা যে খবর এনে দিচ্ছে তার ওপর নির্ভর করেই আমাদের জীবন ধারণ ক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। আমরা যখন নিতান্তই প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ ছিলাম তখন চোখ দিয়ে দেখতাম কোথায় ফল পেকেছে, তার পর তা সংগ্রহ করতাম। কোন উদ্ভিদের মূল খাওয়া যায় তাকে আবিষ্কার করে তার গোড়ার মাটি সরিয়ে তাকে নিয়ে আসতাম। কোথায় হিংস্র প্রাণী আছে আবিষ্কার করে তার কাছ হতে পালিয়ে আসতাম। কোন প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য তার সঙ্গে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করে হক, লাঠি দ্বারা আঘাত করে হক যুদ্ধ করতাম। এই সব ক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য স্থাপন করত। এখনও তারা তাই করে, তবে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাবে পরিবেশ অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন হল কি করে আমরা জানি। পরিবেশ ত বাহিরের জিনিষ। তারা পৃথক জিনিষ, তবু তাদের সঙ্গে সংযোগ হয় কি করে? মন কি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে বাহিরের বস্তুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে? ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু সোজা-সুজি বাহিরের বস্তুর খবর মনকে এনে দিতে পারে না, তারা মাত্র কিছু সংকেত সংগ্রহ করে এনে দেয়, যার সাহায্যে মন তাদের সম্বন্ধে একটি পৃথক ধারণা গড়ে তোলে। অর্থাৎ মনের সঙ্গে বাহিরের বস্তুর কি সোজাসুজি সাক্ষাৎকার

হয়? এই ধরণের নানা প্রশ্ন এই ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত আছে। এইভাবে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান একটি জটিল রহস্যজালে আবৃত হয়ে পড়ে।

সুতরাং বিশ্বসম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান সংগ্রহ করতে হলে জ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক প্রশ্নগুলির আলোচনারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জ্ঞানের প্রকৃতি কি, তার উপাদান কি, তা সংগ্রহ করবার কত ধরণের রীতি থাকা সম্ভব, জ্ঞান অর্জনের কাজে মনের ভূমিকা কি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এসে পড়ে। বিশ্বকে আশ্রয় করে বিশ্বকে জানবার চেষ্টা হতে একটি যেন স্বতন্ত্র রহস্যাবৃত পৃথক জগৎ আমাদের চোখের সামনে স্থাপিত হয়। তার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর ভার ত বিজ্ঞান নেবে না, কারণ এ যে সকল বিজ্ঞানের জ্ঞানের মূলে। দ্বিতীয় কথা, এ বিষয় আলোচনা এমন সূক্ষ্ম পর্যায়ে এসে পড়ে যে বিজ্ঞানের নিরীক্ষা ও পরীক্ষামূলক আলোচনা রীতি ও প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং জ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক সমস্যাগুলির আলোচনার ভার দর্শনেরই নিতে হয়।

এই ভাবে দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞান যে তথ্য সংগ্রহ করে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা দর্শনের যেমন বিশেষ কাজ হয়ে দাঁড়ায়, তেমন এমন অনেকগুলি মৌলিক বিষয় আছে বিজ্ঞান যাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অক্ষম। তার ভারও দর্শনের নিতে হয়। এইভাবে প্রাণশক্তির রহস্য, মনের রহস্য, আত্মার রহস্য, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব— এগুলি অতিরিক্তভাবে দর্শনের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্তভাবে জ্ঞান সম্বন্ধে সকল সমস্যার আলোচনার ভারও দর্শনের ওপর এসে পড়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানগুলি পৃথক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দর্শনের সংসার বেশ বড়ই থেকে যায়। দর্শন-জননীর যেন অগণিত কন্যা। তাদের কতকগুলি বিকাশলাভ করে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষমতা রাখে। তারাই হল বিভিন্ন বিজ্ঞান। তারা ছাড়া দর্শনের আরও অনেকগুলি কন্যা আছে, যারা স্বাবলম্বী হয়ে পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষমতা রাখে না। তার কারণ দুটি হতে পারে। এমন হতে পারে যে তারা অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ের বস্তু নিয়ে আলোচনা করে এবং সেই কারণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তারা বিজ্ঞানের মত পর্যবেক্ষণ[১]

১ Observation

ও পরীক্ষার[২] সাহায্যে নিজেদের সিদ্ধান্তগুলি যাচাই করবার ক্ষমতা রাখে না। এ বিষয় তারা দর্শনের সমধর্মী। এ যেন মায়ের প্রাচীন ধরণের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে তারা অভ্যস্ত এবং তাদের মতিগতিও ওই পথে। সেই কারণে মাকে পরিত্যাগ করে পৃথক হতে তারা আগ্রহশীল নয়। অপরপক্ষে বিজ্ঞানগুলির যেন রুচি বিভিন্ন। তারা হাল ফ্যাশানের মেয়ে; তাই মায়ের প্রাচীন রীতিনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। সেই কারণে পৃথকভাবে বাস করাই তারা পছন্দ করে।

দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে এই বিষয়গুলি বিশ্বের মৌলিক তত্ত্বের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে তাদের দর্শন হতে পৃথক করা শক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে তারা বিশ্বের মানসিক রূপের ক্ষেত্রেই তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু সেটাই কারণ নয়। মনোবিজ্ঞানও মানসিক বিষয়ের আলোচনায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু তা একটি পৃথক বিজ্ঞানের মর্যাদা পেয়েছে। এমন কি এক শ্রেণীর মনোবিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক রীতি প্রয়োগ করে মানুষের মনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতেও চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় আচরণবাদের[৩] উল্লেখ করা যেতে পারে। অপরপক্ষে ধর্মতত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্মতত্ত্ব এককালে দার্শনিক তত্ত্বেরও আলোচনা করত। বিশ্বের উৎপত্তি কি করে হল বিভিন্ন ধর্মে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অবশ্য তা যুক্তিভিত্তিক নয়, বিশ্বাসভিত্তিক। এই অর্থে ধর্মকে দর্শনের আদি জননী বলা যেতে পারে। তাকে বাদ দিলেও ধর্মতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় থেকে যায়। তা হল, বিশ্বসত্তার সহিত ভক্তের সম্বন্ধের স্বরূপ কি? তা কি ব্যক্তিগত সম্পর্ক, না নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক? এ প্রশ্নও বিশ্বের মূল তত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেই কারণেই তাকে দর্শন হতে পৃথক করা শক্ত হয়ে পড়ে।

সুতরাং দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র বিজ্ঞান হতে অনেক ব্যাপক। বিজ্ঞান যা আলোচনা করে তাও দর্শনের আলোচনার অঙ্গ। অবশ্য এখানে বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। বিশ্বের একটি বিশেষ অংশ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিজ্ঞান বিস্তারিত আলোচনা করে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের এই বিস্তারিত আলোচনার ফলে যে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত

২ Experiment

৩ Behaviourism

স্থাপিত হয়, দর্শনের কাজ হয় তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে তাদের একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়া। এ যেন পৃথক ভাবে নির্মিত অংশ জোড়া দিয়ে বাড়ী নির্মাণের রীতির[১] মত বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ঠাটের সাহায্যে বিভিন্ন রাগ সৃষ্টি করার মত। বিজ্ঞান ও দর্শন এখানে হাত মিলিয়ে কাজ করে।

আমাদের কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে তার বাহিরেও অনেক বস্তু আছে যা দর্শনের আলোচনার অঙ্গ হয়ে পড়ে। তারা প্রধানত মানসিক পর্যায়ের বস্তু। বিজ্ঞানের অনুসন্ধানরীতি তাদের ওপর প্রয়োগ করা যায় না বলে বিজ্ঞান তাদের বর্জন করে। কিন্তু তা বলে দর্শন ত তাদের ত্যাগ করতে পারে না। কারণ তারাও বিশ্বের অঙ্গীভূত। তাদের বাহিরে রেখে ত বিশ্বের সামগ্রিক রূপ গড়ে তোলা যায় না। এইভাবে সমগ্র বিশ্বই দর্শনের আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বসম্পর্কিত সকল জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে বিশ্বের একটি সমগ্ররূপ রচনা করাই দর্শনের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দর্শনের আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞান হতে ব্যাপক, তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে।

এই কথাটি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মনে রাখা হয় না। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে এ বিষয় একটু বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা না হলে দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমরা ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে পারি।

এই প্রসঙ্গে জার্মান দার্শনিক ভুণ্ড দর্শনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি দর্শনকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখেছেন এবং তাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞানরূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে দর্শনের কাজ হল বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলি যে তথ্য আহরণ করে, সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তাদের একটি মিলিত রূপ দেওয়া।[২] ভুণ্ড-এর মন্তব্য এক দিক থেকে সমর্থন করা যায়। কারণ বিশ্বের যে অংশ নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করে, দর্শনের তার সম্পর্কে একটি সামঞ্জস্য সাধনের কর্তব্য এসে পড়ে। কিন্তু দর্শনের এই ব্যাখ্যা এমন ধারণা উৎপাদন করতে পারে যে দর্শনের আলোচনার

১ Prefabrication

২ "The general science whose business it is to unite the general truths furnished by the particular sciences into a consistent system."

Vundt, System of Philosophy.

ক্ষেত্র এবং বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র একই। এ বিষয়েই আমাদের সাবধান হতে হবে। দর্শন দর্শনই, উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান নয়। সমগ্র বিশ্বের সকল তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই দর্শনের কাজ। দর্শনের ক্ষেত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে তাকে অতিক্রম করে।

দেখা যায় এ বিষয় বিখ্যাত দার্শনিক পাউলসেনও একই ধরনের মন্তব্য করে বসেছেন। তাও এই ধরনের একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র এবং দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র একই, কেবল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। তিনি বলেছেন দর্শন হল সকল বিজ্ঞানের যোগ-ফল।[১] এ মন্তব্যও ঠিক কথা বলে না, তা কেবল আংশিকভাবে সত্য। ভুণ্ড-এর মন্তব্য সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য।

(৭)

দর্শনের দুর্বলতা

দর্শনের ক্ষেত্রের এই ব্যাপকতাই তার গুণ। এ বিষয় তুলনায় বিজ্ঞান দুর্বল। কিন্তু পরোক্ষভাবে দর্শনেব এই গুণই তার দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান এমন ক্ষেত্র নির্বাচন কবে নেয় যেখানে নির্দিষ্ট জ্ঞান সম্ভব এবং কোন প্রতিপাদ্য স্থাপন কবা হলে তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থাপন করা সম্ভব। অপর পক্ষে দর্শনেব আলোচ্য বস্তু এত সূক্ষ্ম পর্যায়ের যে সেখানে অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই তা কল্পনার[২] ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে দার্শনিকদের মতিগতি তাঁদের বিভিন্ন পথে টেনে নিয়ে যায়। অথচ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিযোগী মতগুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করা যায় না।

পদার্থবিজ্ঞান যখন বলে গ্যাস জাতীয় বস্তু উত্তাপ পেলে বিস্তারিত হয়, সে বিষয় কারও সন্দেহ উপস্থিত হলে তার হাতে হাতে প্রমাণ দেওয়া যায়। একটি বেলুনে আবদ্ধ গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটি স্ফীতিলাভ করবে এবং বেশী মাত্রায় উত্তাপ প্রয়োগ করলে চাপ বৃদ্ধির ফলে তা ফেটেই

১ "Now it seems to me that Philosophy must take courage and reestablish its ancient definition. Philosophy is the sumtotal of all scientific knowledge." Paulson, Introduction to Philosophy, Introductory.

২ Speculation

যাবে। দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন হাতে হাতে প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয় না। যদি প্রশ্ন তোলা যায় মৃত্যুর পরে আত্মা বর্তমান থাকে কি না, তা হলে পরস্পর বিরোধী মতের উৎপত্তি হবে। কেউ বলবেন, দেহকে আশ্রয় করেই আত্মা থাকে, কাজেই দেহ মরে গেলে আত্মা থাকবে কি করে? লোকায়ত দর্শনত এক রকম সেই কথাই বলে। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'? দেহ ভস্ম হয়ে গেলে তার পুনরাগমন হবে কি করে? অপরপক্ষে কেউ বলবেন আত্মার দেহমুক্ত হয়েও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন কি দেহান্তরেও তা আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু এ বিষয় সুস্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। দর্শনের সিদ্ধান্ত তাই কল্পনা-আশ্রয়ী হয়। ফলে বিভিন্ন দার্শনিকের প্রদত্ত একই বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পরস্পর-বিরোধিতা দেখা যায়। চূড়ান্ত প্রমাণের অভাবে কেউ কাউকে স্থানভ্রষ্ট করতে পারে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্ত অন্যরকম ঘটে। একটি প্রতিপাদ্য গৃহীত হলে সাময়িকভাবে তার সাহায্যেই সম্পর্কিত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। তার পর আরও নির্ভরযোগ্য প্রতিপাদ্য স্থাপিত হলে প্রথমটিকে প্রত্যাখ্যান করে নূতনটিকে গ্রহণ করা হয়। এককালে ধারণা ছিল মহাশূন্য ইথার নামক পদার্থে ভরা, এখন প্রমাণের অভাবে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে।

দর্শনের ক্ষেত্রে এই অসন্তোষজনক পরিস্থিতির কারণ তার বিষয়বস্তুর দুরূহতা। তা বিশ্বের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান খোঁজে; কিন্তু যেহেতু এগুলি মৌলিক, এগুলি হয়ে দাঁড়ায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ের বিষয়। কাজেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন বিশেষ প্রতিপাদ্যের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। বিজ্ঞানের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি কাছের জিনিসের ওপর এবং জড়পদার্থের ওপর প্রযোজ্য। যা সূক্ষ্ম জিনিস বা চেতন পদার্থকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে তাদের ওপর প্রয়োগের তা উপযুক্ত নয়। কাজেই অনুমানকে অবলম্বন করেই দর্শনের এগিয়ে যেতে হয় এবং ফলে বিভিন্ন দার্শনিকের মতিগতির প্রভাবে তা খানিক পরিমাণ কল্পনাদুষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের জটিলতার জন্যই তা কল্পনাপ্রবণ[১] হয়ে পড়ে। ফলে দেখা যায় একই সমস্যাকে কেন্দ্র করে নানা মতের আবির্ভাব

১ Speculative

ঘটেছে। মহাভারতে যথার্থ কথাই বলা হয়েছে যে বেদ বিভিন্ন, শ্রুতি বিভিন্ন, মুনিদের মত বিভিন্ন।[১]

মার্কিন দার্শনিক উইল ডুরাণ্ট দর্শনের এই দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন এবং একরকম উপরের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান সুস্পষ্ট জ্ঞানের যেখানে সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রই বেছে নিয়েছে। ফলে তা নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত স্থাপন করে এগিয়ে চলতে পারে, আর দর্শন দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বলে বিরোধে ডুবে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে।[২]

দর্শন প্রধানত অনুমানের ওপর নিভরশীল হয় বলেই তার মধ্যে এই দুর্বলতা এসে পড়ে; কিন্তু অনুমানকে বর্জন করবার কোন উপায় আছে কি? বৈজ্ঞানিক ত সেই অনুমানের উপর নিভর করেই তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। তবে এ কথা সত্য যে অনুমানের ভিত্তিতে তিনি যে প্রতিপাদ্য গ্রহণ করেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করতে তিনি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার[৩] দ্বারা তার সমর্থন সংগ্রহ করেন। সেই কারণেই অনুমান এখানে নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং বেশী কল্পনাপ্রবণ হবার সুযোগ পায় না। অপরপক্ষে দর্শনে এই ধরনের কোন নিয়ামক ব্যবস্থা সম্ভব নয় বলেই সেখানে অনুমান অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কল্পনামুখী হয়। তা প্রগ্রহমুক্ত ঘোড়ার মত ইচ্ছামত পথে বিচরণ করবার সুযোগ পায়।

তা বলে বিজ্ঞানও যে একেবারে কল্পনার প্রভাবমুক্ত এমন কথাও বলা যায় না। যখনই বিজ্ঞান স্থূল পর্যায়ের আলোচনা হতে সূক্ষ্ম পর্যায়ের আলোচনায় প্রবেশ করেছে বা বিশ্বের মৌলিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছে, তখনই তার মধ্যে কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার দু' একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। সূক্ষ্ম পর্যায়ের আলোচনা হিসাবে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে জড় পদার্থের নূতন যে রূপ কল্পিত হয়েছে তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের ধারণা জড় পদার্থ

১ বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ।
না সৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

২ "Science seems always to advance while Philosophy seem always to lose ground. Yet this is only because philosophy accepts the hard and hazardous task of dealing with problems not yet open to the methods of Science."

Story of Philosophy, Introduction

৩ Experiment

এখন আর নিরেট কঠিন পদার্থ নয়। তা এত সূক্ষ্ম পর্যায়ের জিনিস যে তার প্রকৃতি এক রহস্যে আবৃত থেকে যায়। বলা হয় তা স্থান-কালের পরিবেশে একটি জটের মত, একঝাঁক বৈদ্যুতিক কণার সমষ্টি মাত্র, তা প্রায় শূন্যেরই সমস্থানীয়। এই বর্ণনায় কল্পনার যে অনেকখানি অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা স্বীকার না করে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ দার্শনিক জোড-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞানের ধারণায় জড়বস্তুর যে নূতন ব্যাখ্যা তা এত রহস্যাবৃত হয়ে পড়েছে যে মনের ভিত্তিতে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করবার চৈতন্যবাদের যে চেষ্টা তা হতেও তা আরও অপরিচিত রাজ্যে আমাদের টেনে নিয়ে যায়।[১]

বিশ্বের মৌলিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটি বিষয়ে বলা যায় যে বিজ্ঞানের নিশ্চিতভাবে দর্শনের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেটি হল বিশ্বের সৃষ্টি-সম্পর্কিত রহস্য। ঋগবেদে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল 'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত আবভূব' তার সমাধানের ভার প্রথম নিয়েছিল বিভিন্ন ধর্মগুলি। তার কারণ মানুষের জ্ঞানবিকাশের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে অন্য কোন শাস্ত্র ছিল না যা তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। সে অবস্থায় মানুষের বুদ্ধিশক্তিও তত জাগ্রত ছিল না। যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ লাভ ঘটে নি। কাজেই ব্যাখ্যাগুলি কল্পনাভিত্তিক হয়েছিল। যুক্তির সঙ্গে তাদের কোন সংস্পর্শ ছিল না। পরে দর্শন যখন পরিণতিলাভ করে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার এসে পড়ে তার ওপব। দর্শনের আলোচনাগুলি যুক্তিনির্ভর কিন্তু কল্পনাভিত্তিক।

কিন্তু বর্তমানে বিষয়টি উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের এলাকায় এসে পড়েছে। তার কতকগুলি কারণ আছে। এ কথা স্বীকার্য যে বিশ্বে দুটি মৌলিক পর্যায়ের সত্তার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তাদের একটি হল জড় পদার্থ এবং অপরটি হল চেতন পদার্থ। তাদের একটির দ্বারা অন্যটির ব্যাখ্যা হয় কিনা বা উভয়েরই সহাবস্থিতি স্বীকার করা উচিত কি না—এ সব প্রশ্ন বর্তমান প্রসঙ্গে উত্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এইটুকু লক্ষ্য করবার যে চৈতন্যের বিকাশ জড়কে অবলম্বন করেই ঘটেছে এবং আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় জড়ের মধ্যে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হলে চেতনার আবির্ভাব ঘটে না। সে

১ "So mysterious indeed has it become that the modern tendency to explain things in terms of mind is little more than a preference for explanation in terms of the less unknown rather than the more.'

C. E. M. Joad, Guide to Modern Thought.

কারণে সম্ভবত বিশ্বে জড়রূপের চেতন রূপের পূর্বে উৎপাদন হয়েছে। তাও যদি অস্বীকার করা করা যায়, তা হলেও অন্তত বিশ্বের জড়রূপের উৎপত্তির প্রশ্ন স্বভাবতই পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে এসে পড়ে।

এই পথেই পদার্থবিজ্ঞান সৃষ্টিরহস্য ভেদের চেষ্টা করেছে। তা গ্রহ উপগ্রহ হতে আরম্ভ করে সৌরজগতের আলোচনার মধ্য দিয়ে নক্ষত্রমণ্ডলীতে এসে পড়ে এবং নক্ষত্রমণ্ডলী হতে সমগ্র বিশ্বের আলোচনায় এসে পড়ে। গ্রহ-উপগ্রহ সমেত কোটি কোটি সূর্য নিয়ে নক্ষত্রমণ্ডলী, কোটি কোটি নক্ষত্রমণ্ডলী নিয়ে বিশ্ব। এই প্রসঙ্গেই বিশ্বের উৎপত্তি কি করে হল সে প্রশ্ন এসে পড়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করে তার উত্তর বিভিন্ন বিজ্ঞানী দিতে চেষ্টা করেছেন। এর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা অনেকটা দর্শনের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সহিত তুলনীয়। আলোচ্য বিষয়টি এত সূক্ষ্ম এবং এত বিরাট যে তার সম্বন্ধে অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এখানে পরীক্ষা ও নিরীক্ষার প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। ফলে একই প্রশ্নের সমাধানে পরস্পর বিরোধী মতের উদ্ভব ঘটেছে। এদের মধ্যে কোনটি ঠিক তা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা দ্বারা ঠিক করবার উপায় নেই।

এদের একটি মত বলে বিশ্ব উৎপাদিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে একটি প্রচণ্ড মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।[১] যাঁরা এই মত পোষণ করেন তারা বলেন বিশ্বের সমস্ত জড়পদার্থ একদিন একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং তার পর এক আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে পদার্থগুলি পরস্পর হতে ক্রমশ দূরে সরে যেতে আরম্ভ করল এবং পরবর্তী অবস্থায় শত শত কোটি বৎসরের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ[২] নিয়ে গঠিত এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করল। অপর মতটি ভিন্ন কথা বলে। এই মত অনুসারে বিশ্ব অপরিবর্তিত অবস্থায় অবস্থান করছে তা স্থিতিশীল, আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে বিশ্ব উৎপাদিত হয় নি।[৩] বিশ্বে বিভিন্ন নক্ষত্র শৈশব হতে বিকাশলাভ করে যৌবনে উপনীত হয়, পরে তাদের বার্ধক্য আসে এবং পরিণতিতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্ব কেবল ধ্বংসমুখী নয়, সঙ্গে সঙ্গে নূতন নক্ষত্র সৃষ্টি হয় নূতন ধূলিকণা জমাট বেঁধে।

১ Big bang theory

২ Galaotic system

৩ Steady universe theory.

এই বিশ্বে সৃষ্টি এবং ধ্বংস একসঙ্গে ক্রিয়া করে সামগ্রিক ভাবে বিশ্বকে অপরিবর্তিত অবস্থায় রেখে দেয়। এই ভাবে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে দুটি পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের সহাবস্থিতি ঘটেছে। বিজ্ঞানের রাজ্যে এমনটি ঘটবার কথা নয়, কিন্তু এখানে এই কারণে ঘটেছে যে এখানে আলোচ্য বস্তুর প্রকৃতি দর্শনের আলোচ্য বস্তুর মত। ঠিক বলতে কি সমস্যাটি ত দর্শনেরই আলোচনার বিষয়, তবে জড়ের দৃষ্টিভঙ্গি হতে বিজ্ঞান তার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছে।

(৮)

এই দুর্বলতার প্রতিকার কি

এই ভাবে আমরা দেখলাম যে দর্শনের আলোচ্য বস্তুর প্রকৃতি হতেই তার সিদ্ধান্তে কল্পনার[১] অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ফলে ভিন্ন ভিন্ন মতের উৎপত্তি হয়। এখন এর প্রতিকার আছে কি, এই প্রশ্নটি মৌলিক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে এই আলোচনার প্রসঙ্গেই উপনীত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এর একটা সমাধান হতে পারে। তা হল দার্শনিক আলোচনায় অনুমানকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা। তাতে একটা দর্শন যে খাড়া করা যায় না তাও নয়। তার ভাল উদাহরণ হল চার্বাক দর্শন। তাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে দার্শনিক আলোচনার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনুমানকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে। অনুমান স্বীকৃতি পায় নি বলে যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয় সেই তত্ত্বের সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নি, আত্মা স্বীকৃত হয় নি, চেতন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নি। জড়পদার্থ স্থূল, তা সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; তাই তাকে অবলম্বন করে একটি জড়ভিত্তিক দর্শন স্থাপিত হয়েছে। ফলে তা এমন সংকুচিত হয়ে পড়েছে যে বিশ্বের অনেকখানি অংশ তার আলোচনা হতে বাদ পড়ে গেছে। এমন দর্শনে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু মানুষের তৃপ্তি আসে না।

কিন্তু একটা প্রশ্ন ওঠে যে জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টায় আমরা কি সত্যই অনুমানকে বর্জন করে চলতে পারি? অনুমানকে চার্বাক দর্শন যে যুক্তি

১ Speculation

দিয়ে বর্জন করেছে তার যে গুরুত্ব নেই তা নয়। ঠিক বলতে কি পাশ্চাত্য দর্শনে অনুরূপ যুক্তির ভিত্তিতে এক শ্রেণীর দার্শনিক তার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন। আমরা যে অনুমান করি তার অবলম্বন হল সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করা যায় এমন একটি সম্বন্ধসূচক বাক্য গড়ে তোলার ক্ষমতায় বিশ্বাস হতে। এখানে ভারতীয় যুক্তিশাস্ত্রে যে উদাহরণটি সাধারণত প্রয়োগ করা হয় তার উল্লেখ করতে পারি। পর্বত দূরে অবস্থিত, তার দেহ হতে ধূম নির্গত হচ্ছে ; এই অবস্থা হতে আমরা অনুমান করতে পারি যে পর্বতে আগুন লেগেছে। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। এখানে যে নিত্য-সম্বন্ধসূচক বাক্যটির ওপর নির্ভর করে এই অনুমানটি গড়ে উঠেছে, তা হল অগ্নি থাকলেই ধূম নির্গত হয়। আমাদের ধারণা, অগ্নি ও ধূমের মধ্যে এই সম্বন্ধ সর্বক্ষেত্রে বর্তমান, তার ব্যতিক্রম নেই, তা ঘটতে বাধ্য।[১] ভারতীয় দর্শনে তাকে ব্যাপ্তির সম্বন্ধ বলে।

চার্বাক দর্শন বলে কিন্তু এই ব্যাপ্তির সম্বন্ধ বিষয়ে নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ, অতীতে, বর্তমানে, বা ভবিষ্যতে এই ধরণের সহাবস্থিতি যত ঘটছে বা ঘটবে, তা ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নাগালের মধ্যে আসতে পারে না। কাজেই এ বিষয় একটা অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। ইংরেজ দার্শনিক হিউমও একটি অনুরূপ যুক্তির সাহায্যে অনুমান-ভিত্তিক সকল জ্ঞানের নিশ্চয়তা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, এই ব্যাপ্তির সম্বন্ধ সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য বলে আমরা ধরে নিই অভ্যাসের বশে, তা না হলে প্রকৃতপক্ষে তা ধরে নেবার সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য যুক্তি পাওয়া যায় না। এ যুক্তি চার্বাক দর্শনের অনুরূপ।

কিন্তু সত্যই কি অনুমানকে একেবারে বর্জন করা যায়? দর্শনের তাই প্রধানত অবলম্বন, কারণ তার আলোচ্য বস্তুর সমাধান কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও অনুমানের ওপর প্রধানত নির্ভর করে যদিও সমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আশ্রয় নেয়। চার্বাক শ্রেণীর সাবধানী দার্শনিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া অন্য প্রমাণকে গ্রহণ করতে চান না, কারণ তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনুমানের উপর নির্ভরশীল। বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে কিছু নেই।

১ Universal and necessary relation

সেটা সহজে বোঝা যায় আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান আহরণ করি তার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে। ব্যক্তিরূপী মানুষ তার পরিবেশ হতে একটি স্বতন্ত্র সত্তা। সেই পরিবেশের মধ্যে যা প্রতিকূল তার বিরুদ্ধে তার রক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়, আবার সেই পরিবেশ হতেই জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। সেই কারণে তার পরিবেশ সম্বন্ধে অনুক্ষণ জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সেই কাজে সাহায্যের জন্য প্রকৃতি তার দেহে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থাপন করে দিয়েছে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বাহিরের পরিবেশের প্রত্যক্ষ সংযোগ। তারা যে সংবাদ বহন করে এনে মনের নিকট স্থাপন করে, তা হতেই মন সেই পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে। একেই আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলি, কারণ ইন্দ্রিয়ের সহিত সোজাসুজি সংযোগ হতে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই শ্রেণীর জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত জ্ঞান বলে প্রতীয়মান হলেও এর মধ্যে একটি অনুমানের প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। আমি যখন মাঠ দিয়ে যেতে যেতে একটা সাপ দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠি, ওরে বাবারে, একটা সাপ, তখন এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির মধ্যে একাধিক প্রক্রিয়া কাজ করে। এখানে প্রথম চক্ষুরিন্দ্রিয় কাজ করে। তা কতকগুলি সংবাদ মনকে এনে দেয়, যেমন একটি লম্বা সরু জিনিস, আঁকা-বাঁকা ভাবে মাটিতে গা ঘসে চলছে; তার মাথা আছে, চোখ আছে, মুখের সামনে জীব লক লক করছে। এতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য মনের কাছে স্থাপিত হল। এখন অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনের নিজের গড়া সাপের একটি রূপ তার স্মৃতির ভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল। তাকে আমরা পারিভাষিক নাম দিয়েছি সার্বিক সংজ্ঞা[১]। এই সংজ্ঞা যে মানসিক রূপটি সূচিত করে, মন দেখল তার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যগুলি মিলে যায়। তখন মন বলল, এটা একটা সাপ। এইভাবেই সাপের প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটল।

কিন্তু সত্যই কি এটা প্রত্যক্ষ দর্শন? যারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হল তারা ত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য। তাদের জোড়া দিয়ে একটি মানসিক ছবির সঙ্গে তাদের মিলিয়ে তবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে জীব ধারণ করে তাকেই সাপ বলে চিনতে পারল। তবেই মন বলল এটা একটা সাপ।

১ Universal

সুতরাং এর মধ্যে একটি অনুমানের প্রক্রিয়াও অনুপ্রবেশ করেছে স্বীকার করতে হয়। মনের পূর্ব হতে আবিষ্কৃত সার্বিক সংজ্ঞার সঙ্গে এই তথ্যগুলির সাদৃশ্যকে সংযুক্ত করেই তবে এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে প্রক্রিয়াটি এই রকম দাঁড়ায়ঃ ইন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য বহন করে আনে, মন দেখে তার সঙ্গে সাপ এই সার্বিক সংজ্ঞাটির গুণগুলি মিলে যাচ্ছে, এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মন অনুমান করে এই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তুটি সাপ। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যেও একটি অনুমানের ক্রিয়া বর্তমান থাকে। এখানে ইন্দ্রিয়ের গোচর তথ্যের ভিত্তিতে অনুমানের সাহায্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঘটে সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই অনুমানকে বর্জন করে জ্ঞান সঞ্চয় সম্ভব হয় না।

দার্শনিক আলোচনায় যে সিদ্ধান্তগুলি আসে তারা মূলত অনুমানের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাদের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে যে সন্দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে তা খণ্ডনের জন্য অন্যভাবেও চেষ্টা হয়েছে। এইবার সেই চেষ্টার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দর্শনের ইতিহাসে এই ধরনের দুটি চেষ্টা পাই। তারা সমাধান খুঁজেছে দর্শনের আলোচ্য বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে, তবে তাদের প্রস্তাবিত সমাধান ভিন্ন ধরনের। তাদের প্রথমটি হল ফরাসী দার্শনিক কোঁত-এর নিশ্চিত্তিবাদ[১]। এবং অপরটি হল অষ্ট্রিয় দার্শনিক ভিটগেনষ্টাইন-এর নৈয়ায়িক নিশ্চিত্তিবাদ[২]।

উভয়ের নামকরণের সাদৃশ্য হতে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে দর্শনের আলোচিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক তবে বিষয়বস্তু পরিবর্তন সম্বন্ধে তাদের প্রস্তাব বিভিন্ন। উভয় তত্ত্বই দর্শনের স্থাপিত সিদ্ধান্তগুলির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্দেহ পোষণ করে; কিন্তু দর্শনের দুর্বলতা এই শ্রেণীর দার্শনিকের মনকে এত বেশী মাত্রায় ক্লুষ্ট করে যে তাঁরা দর্শন সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতে অভ্যস্ত হন। দর্শনের অপরাধ হল তার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি হেতু তা নিশ্চিত সন্দেহাতীত তত্ত্ব স্থাপন করতে পারে না। অতএব তাঁরা তার দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করেন। তাঁদের ধারণায় যে জ্ঞান নিশ্চিতভাবে সত্য তা ভিন্ন অপর শ্রেণীর জ্ঞান গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের নিশ্চিত্তির ওপর ঝোঁক অত্যন্ত বেশী; কারণ তাঁদের মতিগতি তাঁদের এই পথে টানে। সুতরাং তাঁদের উপদেশ হল দর্শনের

১ Positivism

২ Logical Positivism

নূতন পথে চলতে হবে, পুরাতন বিষয়বস্তু ত্যাগ করে নূতন বিষয়বস্তুর উপর মনোনিবেশ করতে হবে। তা এমন হওয়া চাই যে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। এই পর্যন্ত উভয় চিন্তা একই পথে প্রবাহিত। তার পর বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্বন্ধে তারা ভিন্ন পথ ধরে। তাদের মধ্যে এই পার্থক্য মতিগতির ভিন্নতা হেতু নয়, রুচির ভিন্নতা হেতু। বর্তমান রীতিতে দার্শনিক আলোচনা কেন পরিত্যাগ করতে হবে সে সম্বন্ধেও তাদের যুক্তি ভিন্ন, তবে প্রেরণা একই।

কোঁত-এর মনে দুটি প্রেরণা এক সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। তাদের একটি হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের রীতির ওপর গভীর শ্রদ্ধা এবং দ্বিতীয়টি হল মানবজাতির ওপর প্রগাঢ় প্রীতি। প্রথমটি তাঁকে প্রচলিত দার্শনিক আলোচনার প্রতি উদাসীন করেছিল আর দ্বিতীয়টি দর্শনের আলোচনার বিষয় কি হবে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছিল। প্রথমে আমরা আলোচনা করব কি কারণে তিনি দার্শনিক রীতিতে আলোচনা রীতি এবং তার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন।

কোঁত-এর মধ্যে মানুষের সত্যসন্ধানের চেষ্টা তিনটি ভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম অবস্থায় আমরা পাই ধর্মতত্ত্বের অঙ্গ হিসাবে বিশ্বের মৌলিক সমস্যার আলোচনা। এই অবস্থায় বিশ্বের ব্যাখ্যায় বিশেষ বিশেষ দেবতারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রীকদের প্রচারিত পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন; যেমন সেখানে বিভিন্ন নক্ষত্র দেবতারূপে কল্পিত হয়েছে। এর উদাহরণ অন্যদেশের ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়। যেমন বাইবেল স্রষ্টার ভূমিকায় এক ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের দেশে পুরাণগুলিতেও অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে।

তাঁর মতে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টার দ্বিতীয় অবস্থা আমরা পাই প্রচলিত দার্শনিক আলোচনায়। এখানে বিভিন্ন সমস্যার ব্যাখ্যায় আর দেবতাদের ব্যবহার করা হয় না; তাঁরা নির্বাসিত হয়েছেন। এখানে দেখা যায় তাঁদের পরিবর্তে তাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেছে নানা দার্শনিক কূটতত্ত্ব[১]। চিন্তাগুলি এবং ব্যাখ্যাগুলি এখানে এমন বিমূর্ত ও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব হতে দর্শন দূরে সরে যায়। এখানে ঈশ্বরের শক্তির স্থান

১ Metaphysical abstractions

নেয় প্লেটো-এর পরিকল্পিত 'সামান্য রূপে'র[১] তত্ত্ব বা হেগেল পরিকল্পিত চূড়ান্ত চিন্তার[২]। আমাদের দেশের দর্শন হতে উদাহরণ উদ্ধৃত করতে হলে এই প্রসঙ্গে শংকরের মায়াবাদ বা বুদ্ধের প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বের উল্লেখ করতে হয়। এদের বৈশিষ্ট্য হল ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার মত এরাও অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করে এবং সেই কারণে তাদের সত্যতা নির্ধারণের জন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থাপন করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তারা কল্পনাপ্রবণতা দোষে দুষ্ট।

তৃতীয় অবস্থায় সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা সার্থকরূপ নেয়। এটি হল বিজ্ঞানের রূপ। এখানে কল্পনার অবাধ বিচরণের সুযোগ নেই, এখানে মানুষের মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পরিবেশে ক্রিয়াশীল। ফলে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কারণ এখানে পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার সাহায্যে তথ্যগুলি নির্ধারিত হয় এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধে গ্রথিত হওয়ায় তাদের ব্যাখ্যা যতখানি সম্ভব নির্ভরযোগ্য হয়। সুতরাং এখানে জ্ঞান-অনুসন্ধানের চেষ্টা এমন একটি ক্ষেত্র পায় যেখানে সুস্পষ্ট জ্ঞান আহরণ সম্ভব এবং বৈজ্ঞানিক রীতি প্রয়োগ করাও সম্ভব। এখানেই নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। এই কারণেই বিজ্ঞানগুলিকে তিনি নিশ্চিত জ্ঞান-ভিত্তিক[৩] শাস্ত্র বলেছেন। দর্শনও তাঁর ধারণায় এক শ্রেণীর বিজ্ঞান তবে তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কারণ, দর্শনের অর্জিত জ্ঞানকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং দর্শন তাঁর মতে দর্শন অনিশ্চিত-জ্ঞান-ভিত্তিক বিজ্ঞান।

কাজেই তাঁর সিদ্ধান্ত হল দর্শনকে আত্মোন্নয়ন সাধন করতে হলে তার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে নিতে হবে। আকাশচারী চিন্তাকে ত্যাগ করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর মানব দরদী মন বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করেছিল। তাঁর ধারণায় মানুষই বিশ্বের কেন্দ্র এবং মানবজাতির সেবারই ধর্মানুষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং যে বিজ্ঞান মানবজাতির সেবায় কাজে লাগে তাকেই দর্শনের বিষয় বলে গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানই হবে দর্শনের প্রস্তাবিত নূতন বিষয়।

১ Idea

২ Absolute Idea

৩ Positive

অন্য বিজ্ঞানগুলির ভূমিকা তাঁর মতে হওয়া উচিত গৌণ। যে পরিমাণে তারা সমাজবিজ্ঞানের পরিপোষক সেই পরিমাণেই তারা সার্থক[১]। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে দর্শনের কাজ হল মানবজাতির কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা।[২]

কোঁত খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। জীবনব্যাপী পরিশ্রম করে তিনি বিরাট আকারের গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ বিষয় তাঁর অধ্যবসায় ও কর্মক্ষমতা সম্ভবত একমাত্র ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার-এর সঙ্গে তুলনীয়। তবু এ কথা নিশ্চিত যে তাঁর মতিগতির পথেই তিনি তাঁর দুটি মূল সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লব্ধ জ্ঞান তুলনায় নির্ভরযোগ্য বলে তিনি দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। মানবজাতির প্রতি গভীর প্রীতি বহন করতেন বলেই তিনি দর্শনকে সমাজবিজ্ঞানে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। দর্শনকে যে তিনি সম্মান দেখান নি তা নয়। তাকে তিনি বিজ্ঞানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।

কিন্তু—এ প্রস্তাবে একটি বড় ত্রুটি যে থেকে যায়। বিশ্বগত মৌলিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সঞ্চয়ের আকূতি যে একটি মৌলিক বৃত্তি। সে বৃত্তি কি তা হলে উপবাসে রয়ে যাবে? সেই বেদের যুগ হতে মানুষ প্রশ্ন তুলেছে 'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত আবভূব', তার মীমাংসা ত মানুষ এখনও চায়। আকাশ-ভরা সূর্য-তারা মনে যে বিস্ময়ের সঞ্চার করে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ভেদ করতেও ত মানুষ চায়। মানুষের মনে যে সব গভীর অনুভূতি জাগে যেমন ধর্মচেতনা, শিল্পচেতনা, নীতিবোধ—এগুলির পরিচয়ও মানুষ যুগ যুগ ধরে খুঁজে এসেছে। মানুষের এই সূক্ষ্ম ও মৌলিক পর্যায়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানবার প্রবল আকুতি কি তা হলে অতৃপ্ত রয়ে যাবে? এর কোন উত্তর কোঁত আমাদের দেন নি।

দর্শনের জ্ঞান সংগ্রহের রীতি সম্বন্ধে কোঁত কটাক্ষপাত করেছেন। কিন্তু মূলত দর্শন ও বিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধানের মান ত একই। উভয়েই অনুমানের ওপর নির্ভরশীল। তবে পার্থক্য এই যে দর্শনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ

১ "Therefore sociology was the apex of the sciences and the others had their reasons only in so for as they could provide illuminations for the science of society."

Will Durant, The Story of Philosophy Chap. VIII

২ এই প্রসঙ্গে Comte রচিত Positive Philosophy এবং Positive Polity দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ দিয়ে তার সত্যতা দেখানো যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা দ্বারা চাক্ষুষ প্রমাণ করা যায়। এই পার্থক্য প্রকৃতিগত নয়, বিষয়গত। বিষয়ের ব্যাপকতা এবং দুরূহতা হেতুই দর্শনের ক্ষেত্রে এমন প্রমাণ স্থাপন করা যায় না।

এ বিষয় কোঁত-এর অভিযোগ হল, দর্শন আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করে কতকগুলি কূটতত্ত্ব উদ্ভাবন করে। কিন্তু বিজ্ঞানও কি সেই দোষে দোষী নয়? বিজ্ঞান যেখানে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করে[১] ঘটনা পরম্পরার ব্যাখ্যা করে সেখানে পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনার কার্য-কারণ সম্বন্ধ আরোপ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা পরম্পরার উপর এই ব্যাখ্যা আরোপ করা চলে এবং এখানে বিজ্ঞান নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার ক্ষমতা রাখে। দর্শনের এই ধরনের কাজের সহিত সংযোগ নেই, কারণ তার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। অপর পক্ষে যেখানে অনেকগুলি ঘটনার ব্যাপক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে সেখানে দর্শনেরই মত তাকেও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব[২] বা বিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় মহাবিস্ফোরণ-তত্ত্ব[৩] উল্লেখ করা যেতে পারে। নভোমণ্ডলে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক বিভিন্ন কক্ষপথে কেন বিচরণ করে, তার ব্যাখ্যায় নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। গ্রহকে ঘিরে উপগ্রহ, নক্ষত্রকে ঘিরে গ্রহ, কেন্দ্রকে ঘিরে নক্ষত্র মণ্ডলী অল্পবিস্তর চক্রাকার কক্ষপথে কেন ঘোরে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় তা ব্যবহৃত অনুরূপ ভাবে বর্তমানকালে বিশ্ব কেন নিত্য-স্ফীতিশীল অবস্থায় বর্তমান তার ব্যাখ্যায় মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে। বহু জটিল ঘটনা জড়িয়ে নিয়ে তাদের আচরণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে গেলেই তা এই ধরনের জটিল তত্ত্বের রূপ নেয়। ইংরেজি বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাকে 'থিয়োরি' বলে। আমাদের দেশে যাকে তত্ত্ব বা বাদ বলে তাও এই ধরনের জিনিস। তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য কিছু নেই। মানুষে মানুষে সামাজিক পরিবেশে এত পার্থক্য কেন হয় বা তাদের মধ্যে এত গুণগত পার্থক্য কেন হয় (যেমন কেহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে, কেহ জড়বুদ্ধি, কেহ সুন্দর, কেহ বা কুৎসিত) এর ব্যাখ্যায় পরজন্মতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। তা কতখানি গ্রহণযোগ্য সে ভিন্ন কথা। মানুষের মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার

১ Laws of Nature ২ Theory of Gravity
৩ Bring Bang Theory.

মধ্যে কি ভাবে সামঞ্জস্য সাধিত হয় তার ব্যাখ্যায় আত্মা-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এদের সঙ্গে কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে? জটিল ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় কি বিজ্ঞান কি দর্শন, উভয়েরই তত্ত্বাশ্রয়ী হতে হয়।

দ্বিতীয়ত কোঁত যে প্রস্তাব করেছেন দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র পরিবর্তিত করে তাকে সমাজবিজ্ঞান রূপে গড়ে উঠতে দেওয়া হক, তার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মানুষের জগৎকে কেন্দ্র করে নানা সমাজবিজ্ঞান আপনি গড়ে উঠতে বাধ্য। কারণ, মানুষের গোষ্ঠীগত আচরণ বা উৎপাদক রূপে আচরণ বা ভোক্তারূপে আচরণ এগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা। এগুলির ওপর বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা রীতি প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং তাদের বিষয় করে বিভিন্ন বিষয় গড়ে উঠতে বাধ্য। ঘটেছেও তাই। সমাজ-বিজ্ঞান একটি পৃথক গোষ্ঠীর বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে উঠেছে। মানুষের গোষ্ঠীগত আচরণের বিভিন্ন তথ্যকে বিষয় করে নানা অনুরূপ প্রকৃতির বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। যেমন রাষ্ট্রগত আচরণকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভোগীমানবের আচরণকে ভিত্তি করে অর্থনীতি, সামাজিক মানুষকে ভিত্তি করে সমাজনীতি ইত্যাদি। এগুলি বিজ্ঞানের নিজস্ব ক্ষেত্র। এখানে দর্শনের অনুপ্রবেশ অনধিকার চর্চা হয়ে দাঁড়াবে। দর্শনের এই উপদেশ গ্রহণ করবার প্রয়োজনও নেই, অধিকারও নেই।

সুতরাং দর্শনের বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্রেই দর্শনকে কাজ করে যেতে হবে। যিনি সে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানের সংরক্ষিত ক্ষেত্রের একটি অংশকে নিয়ে কাজ করতে উপদেশ দেন তিনি দর্শনের প্রতি অবিচার করেন। এর থেকে দর্শনকে আত্মহত্যা করার উপদেশ দেওয়া বোধ হয় আরও সম্মানজনক হত।

অবস্থাটা দাঁড়ায় যেন অনেকটা এই ধরনের: যে মানুষ সমতলভূমিতে বাস করতে অভ্যস্ত তার অনতিদূরে পর্বতমালা দেখে আরোহণ করতে ইচ্ছা জাগে। বনরাজিশোভিত তার ঈষৎ নীলাভ দেহের রূপ তাকে আকর্ষণ করে, তার ধ্যান-গম্ভীর অচল রূপ তার মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। দূর হতে দেখে তার মন তৃপ্তি পায় না। সে তার উপর চড়তে চেষ্টা করে, খানিকটা ওঠেও। কিন্তু পদে পদে তার পদস্খলন হয়; সমতল ভূমিতে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলার সুযোগ এখানে ত নেই। তার পর কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, একেবারে শিখরে ওঠা ত একরকম অসাধ্যই মনে হয়। এ

অবস্থায় তাঁর সমতলভূমিবাসী বন্ধু উপদেশ দেন, ওঠা যখন এমন দুঃসাধ্য ঠেকছে, কাজকি পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করে? যেখানে সহজে বিচরণ করা যায়, যেখানে পায়ের নীচের মাটি সমতল, সেখানে বেড়ানই ত প্রশস্ত।

যিনি দর্শনকে নিজস্ব আলোচনা ক্ষেত্র বর্জন করতে উপদেশ দেন, তাঁর আচরণ অনেকটা এই ধরনের হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উদাহরণের ক্ষেত্রে পর্বতমালার সঙ্গে পরিচয় যেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তেমন দর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের মৌলিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কৌতূহলের তৃপ্তির আর উপায় থাকে না। উচ্চশিখরে আরোহণ সম্ভব হলে যেমন চারিপাশের একটা সামগ্রিক রূপ চোখের সামনে ধরা পড়ত, তেমন দর্শনের স্তরের আলোচনায় বিশ্বসম্বন্ধে একটি সামগ্রিক রূপ মনে গড়ে উঠতে পারত। যা দুরূহ তাকে বর্জন করব, যা দুর্লভ তাকে পেতে কঠোর সাধন করব না—এ মনোভাবে মানুষের অন্তরাত্মার অনুমোদন নেই। মানুষের মন আবহমানকাল অজানাদের দেশে অভিযান চালাতে উৎসুক।

এইবার নৈয়ায়িক নিশ্চিত্তিবাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পাবে। এই তত্ত্বটি গড়ে উঠেছিল ভিয়েনার একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন তরুণ দার্শনিকের হাতে।[১] এঁদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি এক হলেও সূক্ষ্মবিষয় নিয়ে এঁদের নানা মত ছিল। তবে এঁদের চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য হল তা প্রচলিত দার্শনিক সমস্যার আলোচনার বিরোধী এবং দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র পরিবর্তনের পক্ষপাতী। এ বিষয় তা কোঁত-এর নিশ্চিত্তিবাদের সমধর্মী তবে এঁদের দর্শনের বর্তমান রূপকে প্রত্যাখ্যান করবার যুক্তি আলাদা এবং পরিবর্তে যে নূতন বিষয়বস্তু প্রস্তাব করেছেন তাও ভিন্ন প্রকৃতির।

ভিটগেনস্টাইন-এর ধারণায় বিশ্ব অগণিত মৌলিক তথ্যের সমষ্টি[২]। এখানে বিশ্ব কতকগুলি বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টিরূপে কল্পিত হয় নি। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকেই বিশ্বের উপাদান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। জ্ঞানের দিক থেকে দেখলে সেই উপাদানের প্রতিরূপ হল বাক্য। সুতরাং বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ হয়েই বিশেষ্য পদের অর্থ আছে, বিশ্লিষ্ট আকারে

১ এঁদের মধ্যে মরিট্‌জ শ্লিক; অটো নয়রাথ, রুডোল্ফ কারনাপ এবং লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন—এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ভিটগেনস্টাইন-এর Tractus Logico-Philosophicus এই তত্ত্বের মূল গ্রন্থ।

২ Atomic facts

তা অর্থহীন।[১] একটি সম্বন্ধ সূচিত করে মৌলিক বাক্য গড়ে উঠতে পারে বা বহু মৌলিক বাক্যের সংযোগে যৌগিক বাক্য গড়ে উঠতে পারে। তাদের সত্যতা নির্ভর করে তাদের বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত তথ্যের সহিত মিল থাকার ওপর। ভিটগেনস্টাইন-এর ধারণায় বিশ্বগত তথ্যগুলি[২] তথ্য-বহনকারী বাক্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এই অর্থে যে উভয়ের গঠন প্রকৃতি[৩] একই। কাজেই এই শ্রেণীর বাক্যের মধ্যে বিশ্বের ন্যায়গত রূপকে পাওয়া যায়।[৪]

এই তথ্যের সঙ্গে তথ্যবহনকারী বাক্যের সম্বন্ধ নিয়ে জটিলতর আলোচনায় বর্তমান প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে বলা যায় যে তাঁরা বলতে চান যে তথ্যগুলি সরল এবং সেই কারণে আণবিক আকারে ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য। তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে তাদের সত্যতা পরীক্ষা করবার সুযোগ আছে। সুতরাং অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরীক্ষা করে যে জ্ঞানাত্মক বাক্য পাই তার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। এমন বাক্য থাকতে পারে যার একটা অর্থ আছে, কিন্তু যা অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাচাই করা যায় না। তাঁদের মতে এমন জ্ঞানাত্মক বাক্য অর্থহীন। যে যে বাক্যের বিষয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানা সম্ভব নয়, তা তাই সত্য নয়। সুতরাং কোন জ্ঞানাত্মক বাক্যের অর্থ নির্ভর করে তার সত্যতা নির্ধারণের কার্যকর উপায়ের ওপর।[৫] এখন দর্শনে যে সমস্ত তত্ত্ব আলোচনা করা হয় এবং প্রতিপাদ্য স্থাপিত হয়, তারা আণবিক তথ্য হতে অনেক দূরে সরে আছে। কাজেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাদের সত্যতা পরীক্ষা করার উপায় নেই। যেমন উদাহরণ স্বরূপ কান্ট-এর মৌলিক সত্তা[৬] তত্ত্বটি। এটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অগোচর। সুতরাং এটি অর্থহীন। কাজেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে দর্শনের আলোচিত সকল তত্ত্বগুলি অর্থহীন। এক্ষেত্রে এই ধরনের আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং দর্শনের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১ Tractus 3- 3, ২ States of affairs ৩ Structure

৪ 'Propositions show the logical form of reality.' Tractus 4. 121.

৫ 'The sense of a proposition is the method of its verification.' Tractus, 4. 21

৬ Thing-in-itself

এঁদের মতে দর্শনের কাজ হওয়া উচিত বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। তাঁরা মনে করেন যে সকল বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধনের জন্য তাদের প্রযুক্ত ভাষার প্রয়োগরীতি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। সুতরাং দর্শনের কাজ হবে বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ভাষার বিশ্লেষণ, তার প্রকৃতি এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ এবং তার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত পদগুলির বিশ্লেষণ। মোটকথায় আমাদের কথোপকথনের বা ভাবপ্রকাশের ভাষার যেমন ব্যাকরণ আছে তেমন বিজ্ঞানের ভাষার একটি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ গড়ে তুলতে হবে। এটির প্রধান অস্ত্র হবে নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ[১]। তাই তাঁরা এর নাম দিতে চান বিজ্ঞানের ন্যায়[২]। এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে এই ধরনের একটি পৃথক ব্যাকরণ গড়ে তোলা কতখানি সম্ভবপর তা দেখা এখনও ঘটে ওঠে নি। ঠিক বলতে কি এই গোষ্ঠী কর্তৃক প্রবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ দানা বাঁধে নি এবং তত্ত্বটি দর্শনের ইতিহাসে একটি কৌতূহল-উদ্দীপক বিষয় হিসাবেই তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এ হেন তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মোটামুটি বোঝা যায় এঁরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস রাখেন না। এ বিষয় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি চার্বাক দর্শনের অনুরূপ। পার্থক্য এই যে চার্বাক দর্শন এ বিষয় তার যুক্তি সরল ভাষায় প্রয়োগ করেছে, অপর পক্ষে এঁরা সে যুক্তিকে একটি দুর্বোধ্য জটিল সজ্জায় সাজিয়েছেন। কিন্তু কেবল প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল হলে তো বিজ্ঞানকেও প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কারণ, বিজ্ঞান কার্য-কারণের ভিত্তিতে যে সার্বিক তথ্য গড়ে তোলে তাও ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে গড়ে তোলা যায় না। তা হলে কি তারা অর্থহীন? উচ্চতর পদার্থ বিজ্ঞানে যে-সব তত্ত্ব গড়ে ওঠে তাদের প্রকৃতিও ত দার্শনিক তত্ত্বের অনুরূপ। তারাও কি অর্থহীন? এঁরা নিশ্চয় সে কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এঁদের এই বৈষম্যমূলক আচরণ অনেক সমালোচক লক্ষ্য করেছেন। আসলে হয়েছে কি, এটি ততখানি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের কথা নয়, যতখানি রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গির অনুমোদিত পথে গড়ে তোলা মত। সেই কারণেই এই ধরনের অসামঞ্জস্য এসে পড়ে।

বিষয়বস্তু পরিবর্তন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সেটিও কোঁত-এর প্রস্তাবের

১ Logical analysis.

২ Logic of Science,

অনুরূপ। কাজেই কোঁত এর প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্বে যা বলা হয়েছে এখানেও সে মন্তব্যগুলি প্রযোজ্য। অধিকন্তু অতিরিক্তভাবে বলা উচিত যে এই গোষ্ঠী দর্শনের জন্য যে বিশেষ ক্ষেত্রটি প্রস্তাব করেছেন তার প্রকৃতি অস্পষ্ট এবং তার গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

(৯)

কাণ্ট-এর সমাধান কতখানি গ্রহণযোগ্য

কাণ্ট এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন ভিন্ন পথে। তিনি নিজে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম। কাজেই তিনি দর্শনকে কখনও অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারেন না। তিনি দর্শনের সত্যানুসন্ধানের রীতিকে বর্জন করতে বলেন নি। তিনি কি দর্শনের, কি বিজ্ঞানের সার্বিক তথ্যবাহী বাক্যের নিশ্চয়তা ও বৈধতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করতেন না বরং তাঁর জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা তার সমর্থক সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিল। তিনি দর্শনের আলোচনা ক্ষেত্রেরও আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে তিনি দর্শনের ক্ষেত্রের সংকোচনের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় তাঁর প্রস্তাব ছিল দর্শনের ক্ষেত্রকে আংশিক বর্জন করে তার আলোচনা একটি বিশেষ অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন দর্শনের যে অংশ বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং বিশ্বসত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খোঁজে সেই অংশ বাদ দেওয়া হোক আর দর্শনের যে অংশে জ্ঞান সম্পর্কিত যে নানা সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধানে দার্শনিক চিন্তা বিশেষভাবে নিযুক্ত হোক। বিশ্বতত্ত্বকে[১] বর্জন করে জ্ঞানতত্ত্বের[২] মধ্যে দার্শনিক আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন।

তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তাঁর নিজের দার্শনিক চিন্তার ফলে। সুতরাং তাঁর দার্শনিক চিন্তার মধ্যেই এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। কাজেই দর্শন সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্তগুলির এখানে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যথাস্থানে অবশ্য এদের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের করতে হবে।

ঘটনাচক্রে কাণ্ট জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।

১ Ontology ২ Epistemology

জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা দর্শনে যে পূর্বে হয় নি তা নয়। এমন কি প্রাচীন উপনিষদেও তার আলোচনা আছে। ভগবান বুদ্ধের কথোপকথনে তার আলোচনা আছে।[১] এরিস্টটল-এর দর্শনে ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কিত গভীর আলোচনা আছে। ভারতীয় ন্যায় দর্শনেও আছে। কিন্তু কাণ্ট যে-প্রশ্নটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন তা পূর্বে ঠিক এইভাবে আলোচিত হয় নি। ঠিক বলতে কি এই ভাবে উত্থাপিতও হয় নি। উত্থাপিত হয়েছিল বলেই তা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই বলছিলাম ঘটনাচক্রেই তিনি এই আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।

কাহিনীটি এই। ব্রিটিশ দার্শনিক হিউম কার্য-কারণ সম্বন্ধে গ্রথিত সার্বিক জ্ঞান বাক্যগুলির[২] সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান পাওয়া যায় কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে তা যায় না। তিনি তাই বলেছিলেন যে আমরা যে তাকে নিশ্চিত সত্য বলে ধরে নিয়ে থাকি তা অভ্যাসের দোষে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এদের সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যায় না, কারণ এর প্রয়োগ অতীত ঘটনা ও ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বন্ধেও করা হয়ে থাকে।

হিউম-এর দৃঢ় ভাষায় ঘোষিত এদের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশই কাণ্ট-এর এই প্রশ্নটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে তিনি প্রশ্নটি সম্বন্ধে চূড়ান্ত আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত করেন।[৩] তার ফলে তিনি জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক সমস্যার একটি অংশের প্রতি বিস্ময়কর ভাবে নূতন আলোক-পাত করতে সক্ষম হন। তার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার প্রয়োজন হবে না। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে যে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আমাদের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের তথা সকল জ্ঞানের দুটি উপাদান আছে। একটি উপাদান হল ইন্দ্রিয়লব্ধ বিভিন্ন অনুভূতি এবং অপরটি হল আমাদের মনের দেওয়া কতকগুলি ছাঁচ। এই ছকের মধ্যে অনুভূতিগুলিকে স্থাপন করে আমরা বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি এবং সেই ছাঁচে ফেলেই আমরা বিভিন্ন তথ্যবাহী সার্বিক বাক্য গড়ে তুলি।

১ এই প্রসঙ্গে সুরঙ্গম সূত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

২ Universal judgments

৩ এই প্রসঙ্গে কাণ্ট-এর এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "Hume's scepticism roused me from my dogmatic slumber. (Critique of Pure Reason)

সুতরাং জ্ঞানের মধ্যে একটি দ্বৈত ভাব আছে। একটি দিকে তার উপাদান আসে বহির্জগৎ হতে; আর অপর দিকে তার ছাঁচ আসে মন থেকে। দুয়ের সংযোগে প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং পরোক্ষ অনুমানভিত্তিক জ্ঞান, উভয়ই গড়ে ওঠে। সার্বিক জ্ঞান-বাক্যগুলি যে প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তার কারণ মন হতে তা আসে বলে।

কাণ্ট শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনার ফলে আরও একটি অতিরিক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনা করে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে একদিকে মন ও অপরদিকে বহির্বিশ্ব এদের প্রদত্ত উপাদান নিয়ে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা জ্ঞান গড়ে ওঠে তার মধ্যেই আমাদের বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান সীমাবদ্ধ। দুই প্রান্ত থেকে যে দুটি সত্তা উপাদান যোগায় তারা আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যায়, তাদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আহরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একদিকে এই মানসধর্মী সত্তা, অপর দিকে বহিঃসত্তা, দুই-ই মৌলিক এবং স্বয়ংনির্ভর। এদের তাই তিনি মৌলিক সত্তা[১] বলেছেন। এদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ একেবারেই সম্ভব হয় না। এই হল তাঁর সিদ্ধান্ত। এ যেন এক দিক হতে কোন অজ্ঞাত ময়রা চিনিমিশ্রিত ছানা জোগান দিচ্ছে এবং অপর দিক হতে আর এক অজ্ঞাত শিল্পী ছাঁচ দিচ্ছে এবং তাদের সংযোগে সন্দেশ গড়ে উঠছে। কিন্তু কে যে ময়রা আর কে শিল্পী জানবার উপায় নেই। তাদের উভয়েই বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের প্রভাবেই কাণ্ট এই প্রস্তাব করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে দর্শনের আলোচ্য বিষয়কে সংকুচিত করে কেবলমাত্র জ্ঞান-বিষয়ক সমস্যাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। বিশ্বতত্ত্বের সমস্যাগুলি যখন মৌলিক সত্তা সম্পর্কিত সমস্যা এবং সেই মৌলিক সত্তাকে জানা সাধ্যাতীত, তখন তার আলোচনা নিরর্থক হয়ে পড়ে। কেহ যদি এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পর্বতে আরোহণ করা মানুষের সাধ্যাতীত তা হলে তিনি উপদেশ দেবেন পর্বতে আরোহণ করবার চেষ্টা অর্থহীন, তা শক্তির অপচয় মাত্র। কাণ্টও নিজের সিদ্ধান্তের তাৎপর্যের জালে জড়িয়ে পড়ে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং দর্শনের অবশিষ্ট যেটুকু অংশ থাকে তাতেই তিনি দর্শনের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।

১ Thing-in-itself

তাঁর এই প্রস্তাব দর্শনের জগতে কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু বড় রকমের কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এর সব থেকে লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া হল জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকের কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ প্রশ্ন দার্শনিকদের বিশেষ আলোচনার বিষয় হবার সম্মান লাভ করেছে। যেমন সত্যের স্বরূপ কি—এই প্রশ্নটি। তা কি বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে পরস্পর সংগতি[১], না মানসিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃত সত্তার সাদৃশ্য[২], না অন্য কিছু? জ্ঞান কি মানসিক বস্তু না বাইরের বিশ্বে তার প্রকাশ আছে? জ্ঞানের নাগালের মধ্যে কি বাইরের বস্তু সোজাসুজি ধরা পড়ে? এই প্রশ্নগুলি আধুনিক দর্শনে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং আলেকজাণ্ডার-এর বিস্তারিত আলোচনা আছে। সত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে উইলিয়ম জেমস এক নূতন তত্ত্ব স্থাপন করলেন এই বলে যে, কোন তথ্যের নগদ মূল্যই[৩] তার সত্যতার পরিচয়। ফলে দর্শনের জগতে ব্যবহারিক মূল্য তত্ত্ব[৪] গড়ে উঠেছিল। মনে হয় মার্কিন দার্শনিকদের মধ্যেই এর প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। উইলিয়ম জেমস ছিলেন মার্কিন দেশবাসী। শুধু তাই নয়, জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রে দুটি নূতন দার্শনিক গোষ্ঠীও আমেরিকায় গড়ে উঠেছিল। তাদের অন্যতম হল নববস্তুবাদ[৫]। হোল্ট এবং আরও পাঁচজন দার্শনিকের মিলিত আলোচনার মাধ্যমে এই গোষ্ঠীটির জন্ম হয়। জ্ঞান তত্ত্বের একটা প্রশ্ন ওঠে যে জ্ঞানের বস্তুগুলির মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্ব থাকে কিনা। এঁদের মূল সিদ্ধান্ত হল জ্ঞান মানসিক নয়, তা মনের বাইরে যে বস্তু আছে তারই অঙ্গীভূত। দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি যে নূতন তথ্য স্থাপন করল তার নাম দেওয়া হল সমালোচনা-মূলক বস্তুবাদ[৬]। সাতজন মার্কিন অধ্যাপকের মিলিত চিন্তার ফলে তার জন্ম। তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন ড্রেক এবং স্যানটায়ানা। এঁদের প্রতিপাদ্য হল বাহিরের বস্তু হতে ইন্দ্রিয়গুলি যে উপাদান[৭] সংগ্রহ করে, তা বাইরের বস্তুর মৌলিক পরিচয় বহন করে। সুতরাং এক রকম বলা যায় যে বাইরের বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সঞ্জাত জ্ঞানে মনের সাক্ষাৎ মিলন ঘটে। জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে এই ধরনের নিগূঢ় এবং গভীর আলোচনা কাণ্ট-এর প্রস্তাবেরই পরোক্ষ ফল বলে মনে হয়। তিনি জ্ঞানতত্ত্বের ওপর

১ Concurrence Theory ২ Correspondence Theory ৩ Cash value
৪ Pragmatism ৫ New Realism ৬ Critical Realism ৭ Sense datum

এত জোর দিয়েছিলেন এবং তার সম্বন্ধে নিজে গভীর আলোচনা করেছিলেন বলেই তাঁর পরবর্তী দার্শনিকগণ এই বিষয়ে গভীর আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে-, ছিলেন। সেটা ভালই হয়েছিল।

অপর পক্ষে দর্শনের আবহমান কাল স্বীকৃত মূল বিষয়গুলির প্রতি তা বলে অবহেলা দেখানো চলে না। সত্তাতত্ত্বই[১] দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়। সত্তার প্রকৃত রূপ জানবার আকূতি হতেই দর্শনের জন্ম। সত্তা সম্পর্কিত আলোচনাই দর্শনের মুখ্য বস্তু। জ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনা গৌণ বস্তু। তা জানতে সাহায্য করে আমাদের অর্জিত জ্ঞান কতখানি নির্ভরযোগ্য বা কোন বিশেষ জ্ঞান-অর্জনের রীতি সব থেকে বেশী কার্যকর। সত্তাকে জানতে সাহায্য করে বলেই তার মূল্য। নিজের মনের ভাবের নির্ভুলভাবে প্রকাশ করবার জন্যই আমরা ব্যাকরণ শিখি। এখানে নির্ভুল ভাবে ভাষাকে ব্যবহার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তাকে সাহায্য করে বলেই ব্যাকরণের সার্থকতা। সুতরাং ভাবপ্রকাশ মুখ্য বিষয়, ব্যাকরণ গৌণ। এখন কেউ যদি বলেন সাহিত্য রচনা পরিত্যাগ করে ব্যাকরণ চর্চাতেই কেবল মনোনিবেশ কর, তা হলে তার কোন সার্থকতা থাকে না। তাতে মুখ্য বিষয়কে নির্বাসিত করে গৌণ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয় মাত্র। কান্ট-এর উপদেশ অনেকটা সেই ধরনের হয়ে দাঁড়ায়। তিনি যখন বলেন সত্তাতত্ত্বের আলোচনাকে বর্জন করে কেবলমাত্র জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে দর্শনের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হোক, তখন দর্শনের মুখ্য বস্তুকে বর্জন করে গৌণ বস্তুকেই গ্রহণ করতে বলেন।

তাই দেখা যায় তাঁর এই উপদেশ তার পরবর্তীকালের দার্শনিকগণ গ্রহণ করেন নি। এর প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায়। তার কয়েকটি এখানে আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে স্থাপন করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর যাঁরা বিশিষ্ট দার্শনিক ছিলেন তাঁরা সে উপদেশ পালন করেন নি। হেগেল তাঁর ত্রিভঙ্গী ন্যায়ের ভিত্তিতে বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। শেলিং এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন চিৎশক্তি-বিশিষ্ট সত্তার অভিব্যক্তিরূপে বিশ্বকে কল্পনা করেছেন। শোপেনহাওয়ের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ওপর ভগবান বুদ্ধের দর্শন এবং শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের প্রভাব স্পষ্টই চোখে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাউলসেন সর্বচেতনাবাদের[২] একটি পরিকল্পনার সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা

১ Ontology ২ Panpsyohism

দিয়েছেন। এঁদের রচিত দর্শনগুলি প্রাচীন দার্শনিকদের অনুসরণে সত্তাতত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকেই সম্মানের আসন দিয়ে এসেছে।

বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা বেশী নজর পেলেও এই ধারা অক্ষুণ্ণ আছে। এখানেও দেখি সত্তাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় বিশিষ্ট দার্শনিকগণ আত্মনিয়োগ করেছেন। বের্গসঁ প্রাণশক্তি ও জড়ের সহযোগিতায় এক নূতন দ্বৈতবাদ রচনা করেছেন। ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজাণ্ডার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর দর্শনে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমন কি ভারতবর্ষেও অনেক কাল পরে একটি সমগ্র দর্শনের সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে। দর্শনের মুখ্য সমস্যাগুলির প্রতি দার্শনিকের মন এখনও আকৃষ্ট হয়।

এমনটি হওয়ার সংগত কারণ আছে। জানবার আকুতি মানুষের সহজাত এবং মৌলিক বৃত্তি। ঠিক বলতে কি প্রাণবিশিষ্ট সত্তার জানবার আকৃতি ব্যবহারিক কারণেই তার মনের মধ্যে গ্রথিত। ধর্মবোধ বা শিল্পবোধ হতেও তার মূল মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত। প্রাণবিশিষ্ট সত্তার সঙ্গে জড় সত্তার এইখানেই পার্থক্য। জড় সত্তা প্রকৃতির সহিত একীভূত, পরিবেশ হতে তার কোন পৃথক সত্তা নেই। বালি, পাথর, জল, মাটি, বাতাস এরা জড় প্রকৃতির অঙ্গ, ওতপ্রোতভাবে তার সঙ্গে মিশে আছে। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখবার কখনো প্রয়োজন হয় না। নানা প্রাকৃতিক শক্তি যখন যে ভাবে তাদের পরিচালিত করছে তারা সেই ভাবেই পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাণসত্তা কিন্তু হাজার ক্ষুদ্র হোক, তার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এক দিকে তা আছে তার অন্যদিকে তার পরিবেশ। তার প্রাণশক্তিকে সংরক্ষিত ও বিকশিত করবার জন্য তার বহির্জগতের সঙ্গে অনুক্ষণ সংযোগ ঘটছে। এই সংযোগ দুটি প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথম, বাইরের পরিবেশ হতে তার পুষ্টি সঞ্চয় করতে হয়। দ্বিতীয়, প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে তার আত্মরক্ষা করতে হয়। এ কথা যেমন সামান্য কীটের সম্পর্কে খাটে তেমন মানুষের মত উন্নত জীবের সম্পর্কেও খাটে। একটি কীটের কোথায় তার খাদ্য আছে জানতে হয়। খাদ্যের সন্ধান পেলে সেখান থেকে তা পুষ্টি সঞ্চয় করে। শত্রুর সন্ধান পেলে সে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে বা নিতান্ত কোণ-ঠাসা হলে প্রতি-আক্রমণ করে। মানুষের আচরণও অনুরূপ, তবে তার প্রকৃতি হেতু তা বহুগুণ জটিলতা ধারণ করেছে।

সুতরাং প্রাণ-বিকাশের অনুরোধে মানুষকে অহরহ বাহিরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। অর্থাৎ একটি মৌলিক ব্যবহারিক প্রয়োজনে মানুষের নানাভাবে জ্ঞান সঞ্চয়ের দরকার হয়ে পড়ে। সেই মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকৃতি তাকে কতকগুলি সূক্ষ্ম এবং নিজ কর্তব্য সম্পাদনে অত্যন্ত নিপুণ ইন্দ্রিয় দিয়ে সজ্জিত করেছে। তাদের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয় ও চক্ষুরিন্দ্রিয় অন্যতম। স্পর্শেন্দ্রিয়ের জ্ঞান ঘনিষ্ঠ নৈকট্যের ওপর নির্ভর করে। তবু তার ক্ষমতা অসাধারণ। অন্ধ ব্যক্তির তা সব থেকে নির্ভরযোগ্য ইন্দ্রিয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তো তুলনাই হয় না। তা দূরের জিনিসের পরিচয় এনে দিতে পারে। শতশত কোটি আলোক বৎসরের দূরত্বে অবস্থিত নক্ষত্রের অস্তিত্বের পরিচয় তা মানুষের কাছে এনে দেয়।

এখন ইন্দ্রিয়গুলি যে-সংবাদ বহন করে আনে, মনের কাজ হল প্রথমত তার অর্থ গ্রহণ করা এবং পরে সেই অনুসারে নিজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা। এই জন্যই জীবদেহের মধ্যে মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে। তা অনেকটা পুলিশের কেন্দ্রীয় আপিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মত[১] ক্রিয়া করে। তা মানসিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রস্বরূপ। তাই তাকে ভারতীয় দর্শনে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলা হয়েছে। সকল জীবের দেহেই মস্তিষ্ক আছে। তবে মানুষের দেহে জটিলতায় এবং আকারের অনুপাতে সব থেকে সূক্ষ্ম এবং বড়। এমন কি হাতীর মত বিরাট জন্তুর থেকেও তার দৈহিক অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজন অনেক বেশী।

এই মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে মনোবিজ্ঞানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাতে দেখা যায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কর্তৃক প্রদত্ত সংকেতগুলির অর্থ গ্রহণের জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ নিযুক্ত থাকে। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কিত কাজ তার এক অংশে সম্পাদিত হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্পর্কিত কাজ অন্য অংশে, চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্পর্কিত কাজ আর এক অংশে ইত্যাদি। মানুষের জীবন ধারণের রীতি জটিল হওয়ায় এবং বৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় তার বুদ্ধিবৃত্তির কাজ অনেক পরিমাণে বেশী হয়ে দাঁড়ায়। সেই প্রয়োজনের উপযুক্ত করে তাকে গড়ে তোলবার জন্য তার মস্তিষ্কের একটি বিরাট অংশকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

ঠিক বলতে কি মানুষের ক্রমবিকাশ যেন এই পথেই পরিচালিত হয়েছে। তাই জন্যই তার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। দেহকে বহন করবার কাজ তার ক্ষেত্রে দুটি পায়ের ওপর ন্যস্ত হয়েছে এবং ঊর্ধ্বাঙ্গের দুটি পায়ের সমস্থানীয় অঙ্গ দুটি

১ Control room

হাতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর তার মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে। তার মস্তিষ্ক কপালের দিকে পরিবর্ধিত হয়েছে। বানরের বা বনমানুষের[১] সঙ্গে তার এইখানেই পার্থক্য। এমন কি প্রাচীন মানুষের সহিত তুলনায়ও বর্তমান মানুষের কপালের দিকে অতিরিক্ত স্ফীতি ঘটেছে। চীন দেশে পিকিং-এর নিকট চুকো টিয়েন নামক স্থানে কতকগুলি অতিপ্রাচীন নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। তাদের বয়স আড়াই লক্ষ বৎসরের মত। তাতে দেখা যায় সে যুগের মানুষের কপালে চোখের ওপরের হাড় এবং চোয়ালের ওপরের হাড় বেশ উঁচু ছিল, এখনকার মত মাথার খুলির এই অংশ সমতল ছিল না।[২] সুতরাং অনুমান করা যায় যে ক্রমবিকাশের পথে মাথার খুলির সামনের দিকের হাড়ও পাতলা এবং হাল্কা হয়ে গিয়েছে, যাতে মস্তিষ্কের সামনের দিকের পরিবর্ধন সম্ভব হয়।

মনে হয় মানুষের এই দেহগত বৈশিষ্ট্যের একটি তাৎপর্য আছে। যে শক্তি বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে মানুষকে স্থাপন করেছেন তাঁর যেন নূতন পথে একটি পরীক্ষা করবার ইচ্ছা জেগেছে। মানুষের মধ্যে এমন একটি জীব সৃষ্টির চেষ্টা আছে, যা পরিবেশ হতে সংবাদ সংগ্রহ করে নিজেই নিজের সকল জৈবিক সমস্যার শুধু অক্লেশে সমাধান করবে না, অতিরিক্তভাবে অবাধ চিন্তাশক্তির বিলাসের মধ্যেও গা ঢেলে দেবার ক্ষমতাও তার থাকবে। মনোবিজ্ঞান বলে মানুষের মস্তিষ্কের অনেকখানি অংশ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে। তার ইঙ্গিত বুদ্ধিশক্তির অবাধ পরিচালনা করবার পথে তার বাধা রক্ষা হয় নি। তাই সহজেই প্রকৃতির তথা পশুর সহিত যুদ্ধে মানুষ অনায়াসে জয়লাভ করে বুদ্ধিমান জীব[৩] বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার মস্তিষ্ক-শক্তির প্রাচুর্য তার বুদ্ধিকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার সুযোগ দিয়েছে। ফলে সে চিন্তাশীল জীব হয়ে দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে, শিল্পী হয়ে নিজেও স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিধাতার অভিপ্রায়ের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি হল এই :

এসেছে প্রথম যুগে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংসস্তূপ
পঙ্কিল ধরণী পৃষ্ঠে। প্রাণের সে সন্দিগ্ধ স্বরূপ

১ Anthropoid ape.

২ Paul Sanet, In Search of Man's Ancestor

৩ Rational animal.

স্বষ্টির তিমির রাত্রে। ক্ষুদ্র-তনু মানুষ তাহার
মনের আনিল দীপ্তি। সংশয় ঘুচিল বিধাতার।[১]

সেই কারণেই মানুষের অহৈতুক জ্ঞানের আকাজ্ক্ষা এমন দুর্নিবার। তার প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে মানুষ তার বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রকে বিস্তারিত করবার প্রয়োজন বোধ করে। জীবনধারণের প্রয়োজনে তার যেটুকু বুদ্ধিশক্তি ব্যয়িত হয় তার অতিরিক্ত বিপুল পরিমাণ বুদ্ধিশক্তি অব্যবহৃত থেকে যায়। সেই কারণেই মানুষের মধ্যে জানবার আকুতি এত প্রবল। বিশাল বিশ্বের বিস্তার তার চোখের সামনে বিপুল বিস্ময়রূপে নিত্য প্রসারিত। তাকে ঘিরে যে রহস্য অনুক্ষণ তার বুদ্ধিশক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করছে তাতে সাড়া না দিয়ে সে পারে না। তা যেন মানুষকে বলছে, দেখ তো, আমাকে বুঝতে পার কি? তোমার বুদ্ধিশক্তি কি আমাকে ধারণা করতে পারে? মন বলছে, আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিলাম, আমার পণ তোমাকে আমি জানবই। হয়ত অনেক ভুল করব, হয়ত আমার অভিযানের পথ হবে কণ্টকাকীর্ণ, তবু আমি তোমাকে জানবই। মানুষের মনে তাই এই অহৈতুক জানবার ইচ্ছা একটি প্রবল মৌলিক ইচ্ছা। ধর্মবোধের থেকেও মৌলিক, তা তার প্রাণশক্তির সঙ্গে গ্রথিত বৃত্তি।

সুতরাং সত্তাতত্ত্ব বিষয়ক সমস্যার প্রতি মানুষের আকর্ষণও মৌলিক আকর্ষণ। সে আকর্ষণ শুধু কয়েকজন মুষ্টিমেয় দার্শনিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা সর্বজনীন। যে-কোন মানুষের বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা জাগে এবং তার মতিগতি, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের পরিমাপের ভিত্তিতে নিজের মনকে তৃপ্তি দেয় এমন একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা সে করে নেয়। দার্শনিকের কাজ হল সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য একটি যুক্তিসম্মত দর্শন সাধারণ মানুষের জন্য স্থাপন করা। দর্শন মানুষের নিত্যসঙ্গী। জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা তার না হলেও চলে, কারণ তা গৌণ; কিন্তু সত্তাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা অপরিহার্য। জার্মান দার্শনিক পাউলসেন তাই বলেছেন যে, মানুষের কাছে দর্শন এমন অপরিহার্য বিষয় যে তাকে ইচ্ছামত বর্জন করা যায় না। নিতান্ত জৈবিক স্তরে যে মানুষ আবদ্ধ নয় তার দর্শন না হলে চলে না।[২]

১ চিত্রলিপি, প্রথম খণ্ড

২ "Philosophy is not something that one may or may not have at will. In a certain sense, every human being that rises above the dull level of animal life has a philosophy." —Introduction to Philosophy, Introductism.

দেখা যায় ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর মতে নিতান্তই যারা চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়, তারা ব্যতীত সকল মানুষেরই দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি একটি আগ্রহ বর্তমান।[১]

সুতরাং সত্তাতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা মানুষ কোনদিন বর্জন করতে পারবে না। কান্ট-এর উপদেশ মানুষের মৌলিক প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখে না বলেই বিভিন্ন দেশের দার্শনিক তার অনুসরণ করতে পারেন নি। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে সত্তাতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক সমস্যাগুলি গভীর রহস্যে আবৃত। তাই তা দুর্জ্ঞেয়, কারও মতে অজ্ঞেয়ও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতি আকর্ষণ মানুষের এত তীব্র যে সে রহস্য উন্মোচনের চেষ্টায় মানুষ আত্মনিয়োগ না করে পারে না। সেক্ষেত্রে দর্শনের মূল সমস্যাগুলির সমাধানের প্রশ্ন এড়িয়ে না গিয়ে তাদের সমাধানের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাই দার্শনিকের কর্তব্য। সত্তাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা বর্জন করা কোনমতেই প্রশস্ত হবে না।

এ কথা নিশ্চিত সত্য যে বিষয়বস্তুর জটিলতা হেতু সব সমস্যার সমাধান হয়ত হবে না, কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিছু যাবে না। নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য জ্ঞান হয়ত মিলবে না, তবু মানুষের অন্তরের তৃপ্তির জন্য সে চেষ্টা করে যেতে হবে। কারণ মানুষের স্বভাবই হল, যে বিপুল রহস্যের মধ্যস্থলে সে স্থাপিত হয়েছে তার গোপন কথা শোনা। তাই মানুষ নিত্যকাল কান পেতে থাকবেই, শ্রদ্ধাস্পদ মনীষীর নিষেধ বাক্য মানবে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মনে হয় যেন মানুষের অন্তরের সে অনির্বাণ আকূতির স্বরূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রাসঙ্গিক অংশটি হল এই:

> আমি কান পেতে রই আমার আপন
> গহন হৃদয় দ্বারে
> কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির
> গোপন কথা শুনিবারে॥[২]

হয়ত সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির সব কথা শোনা যাবে না, কিছু হয়ত অনুমানে বোঝা যাবে, কিছু হয়ত অজানাই থেকে যাবে; তবু তা সার্থক। তাঁর ভাষায়:

১ "Some kind of Philosophy is a necessity to all but the most thoughtless.
—Unpopular Essays, Philosophy for Laymen

২ গীতবিতান, পূজা, ৫৪১

কিছু তার দেখি আভা,
কিছু পাই অনুমানে,
কিছু তার বুঝি না বা।

তবু সেই গোপনবাসীর গোপন কথা শোনবার চেষ্টা মানুষের করে যেতে হবে।

বিজ্ঞানের মতে যেটা দর্শনের দুর্বলতা তা সত্ত্বেও বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দর্শনের আলোচনা করে যেতে হবে। মনে হয় তার এই দুর্বলতাই তার বড় গুণ। তা সোজাসুজি ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয় বলেই তার জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। সেই কারণেই তা বিশ্বসম্বন্ধে একটি সামগ্রিক পরিচয় দিতে সক্ষম। অপরপক্ষে বিজ্ঞানদত্ত জ্ঞান অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে না, তা পরোক্ষভাবেও মানুষের জীবনকে সংকুচিত এবং নানা ভাবে বিড়ম্বিত করে।

বিজ্ঞানের প্রদত্ত জ্ঞানের প্রয়োগে মানুষের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে মানুষের ভোগের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক বলতে কি উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের উদ্দেশ্যে তার ভোগস্পৃহা কৃত্রিম উপায়ে বর্ধিত করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশের তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তো শুধু ভোগী নয়, তার মনে আরও কত আকৃতি গ্রথিত হয়ে আছে। তার পরম সত্তাকে জানবার আগ্রহ আছে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকৃতি আছে, শিল্পী হয়ে আনন্দলোকের দ্বার উন্মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা আছে। অল্প কথায় বলা যায় যে সে একটি জটিল সত্তা। তার নানা ক্ষুধা, নানা তৃষ্ণা—শুধু ভোগী হয়ে তার অন্তর তৃপ্তি পায় না। তাতে তার মানবত্ব খর্ব হয়। অথচ ব্যবহারিক-প্রয়োজন-নিয়ন্ত্রিত হয়ে অত্যধিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার ফলে মানুষের জীবন অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং তা ক্রয় করে ভোগ—এই দুটি কাজের মধ্যে এখন তার কর্ম, চিন্তা ও হৃদয়বৃত্তি একরকম অবরুদ্ধ। ভোগের বণ্টনবিধি কি হবে তাই নিয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আত্মঘাতী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা-রচিত এই কারাগার হতে মুক্তির আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মনে হয় এই মুক্তি অর্জন করে এনে দেবার ক্ষমতা দার্শনিক জ্ঞান রাখে;

কারণ তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে কতকগুলি বিশেষ গুণে ভূষিত করেছে। দার্শনিক জ্ঞান আর দার্শনিক চিন্তার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য মননশীল আলোচনায় নেই। তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু বিশ্বসম্বন্ধে একটি সমগ্র ধারণা দিয়ে আমাদের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করে না, পরোক্ষ ফল হিসাবে মানব হৃদয়ের ভাবাবেগগুলিকে সঠিক আকারে দেখতে পায় এবং ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতিগত বিবাদ-বিসম্বাদের অর্থহীনতা হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।

বর্তমান পরিবেশে আকাশ-ভরা সূর্যতারা দেখে কবির হৃদয়ে আর গান জেগে ওঠে না। হিংসা ও বিদ্বেষ বোধ এমন তীব্র রূপ ধারণ করেছে যে মানুষের হৃদয় হতে প্রীতি, করুণা, মমতা প্রভৃতি কল্যাণধর্মী অনুভূতিগুলি নির্বাসিত হচ্ছে। শ্রেয়ের পথ আজ নিরুদ্ধ। সেই কারণেই দার্শনিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মানুষ অতি ভাগ্যবান জীব। তার জন্য যে ব্যাপক জীবনের সম্ভাবনা রচিত হয়েছে তার সন্ধান তাকে দিতে হবে। প্রযুক্তিবিদ্যার চোখ ঝলসানো আবরণী শক্তি তার দৃষ্টিকে খর্ব করেছে বলে সে অধিকারের পরিচয় সে পায় না। তার দৃষ্টিশক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। মুক্ত গগনে পাখীর বিহার করবার অধিকার জন্মগত। তাকে সোনার খাঁচায় স্থাপন করলে সে যা হারায় তার পরিবর্তে যা পায় তা নগণ্য। কেবল পণ্যদ্রব্য ভোগের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করলে মানুষ তার বিরাট অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। কেবল পঞ্চেন্দ্রিয় যেটুকু দেয় মানুষের অধিকার তা হতে অনেক বেশী। তাই তো উপনিষদে এই বাণী ঘোষিত হয়েছিল যে কেবল বিত্তের দ্বারা মানুষের তৃপ্তি হয় না, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'। মানুষ আনন্দলোকের অধিকারী। সেই আনন্দলোকের পরিচয় এবং সন্ধান তাকে এনে দিতে হবে।

সুতরাং এই আনন্দলোকের স্বরূপটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। মানুষের হৃদয় আছে, মন আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে। তার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, তার হৃদয়ে যেখানে মহত্ত্ব দেখা যায় সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতি আছে। তার মনে জ্ঞানশক্তি আছে। সেই জ্ঞানশক্তি কেবল ব্যবহারিক কাজে লাগে এমন জ্ঞান সঞ্চয়ে তৃপ্তি পায় না। তার যে জ্ঞান-পিপাসার অন্ত নেই, জ্ঞান-আহরণের জন্যই তার মন জ্ঞান-আহরণে আগ্রহশীল। তার মনে ইচ্ছাশক্তি আছে। সেই ইচ্ছাশক্তি কর্মে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টির আনন্দের

আস্বাদন-প্রয়াসী। কেবল স্থূল উপাদানে যে নির্মাণ সম্ভব তা তাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। বড় অট্টালিকা, বিরাট সেতু বা আকাশযান নির্মাণ করে সে কর্মশক্তি তৃপ্তি পায় না। অবাস্তব উপাদান নিয়ে সূক্ষ্মতর ভিত্তিতে আরও বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভব। সেখানেই যেন শিল্পীর ভূমিকায় মানুষের সৃষ্টিশক্তি অবাধ ক্ষেত্র পেয়ে অনন্ত তৃপ্তির আস্বাদ পায়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', শেক্সপীয়ার-এর 'ম্যাকবেথ', রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' তার নিদর্শন। শংকরের 'অদ্বৈতবাদ', কাণ্ট-এর 'ক্রিটিক' তার প্রমাণ। নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যা, আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতাবাদ তার দৃষ্টান্ত। এই যে ভালবেসে আনন্দ, শক্তির আধারকে, কল্যাণের উৎসকে শ্রদ্ধা নিবেদনে আনন্দ, কেবল কৌতূহল বৃত্তি নিবৃত্তির জন্যই জ্ঞান-সঞ্চয়ে আনন্দ, সর্বজনীন কল্যাণ-কর্মে আত্মনিয়োগ করে আনন্দ, শিল্পরচনায় আনন্দ—এত যে আনন্দের আয়োজন আছে তার সন্ধান মানুষকে দিতে হবে। দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের দ্বারাই মানুষকে তার এই জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তাতে অধিষ্ঠিত করা সম্ভব।

সেই কারণেই মনে হয় দার্শনিক জ্ঞানের প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুধু প্রচার নয়, তাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবারও বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দার্শনিক জ্ঞান কেবল সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ সমাজে অবরুদ্ধ রাখলে চলবে না। সেকালে তো আমাদের দেশে তা সম্ভব হয়েছিল। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই যে চিত্তবিনোদনের জন্য সেকালের রাজারা দার্শনিক আলোচনার জন্য তর্কসভা ডাকতেন। আলোচনায় যিনি জয়ী হতেন তাকে পুরস্কার দেওয়া হত। রাজর্ষি জনক এই ধরনের সভা ডেকে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গী এই ধরনের সভায় যোগ দিতেন। সাধারণ মানুষ সে আলোচনা শোনবার জন্য দলে দলে এসে এই ধরনের সভায় যোগ দিত। পশ্চিমে সেকালে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা জানি গ্রীক দর্শনের জনক সক্রেটিস্ তরুণদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দার্শনিক তত্ত্ব-প্রচারে আনন্দ পেতেন এবং তার জন্যই তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোচনার রীতি ও ক্ষেত্র

(১)

দর্শনে মতের বিভিন্নতার কারণ

মহাভারতে বলা হয়েছে 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্' বাংলায় তার অনুসরণে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, নানা মুনির নানা মত। উক্তিটি দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির ওপর সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা যায়। দর্শনের ক্ষেত্রে এক একটি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে কত ধরনের যে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবিত হয়, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তুলনায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। এক একটি সমস্যা সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত হলেও বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে একটিমাত্র ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে আরও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিললে পূর্বেরটিকে প্রত্যাখ্যান করে নূতনটিকে গ্রহণ করে। যেমন নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ব্যাখ্যা এককালে চূড়ান্ত মীমাংসা হিসাবে বিজ্ঞানে গৃহীত হয়েছিল; কিন্তু এখন আইনস্টাইন-এর ব্যাখ্যা বরমাল্য পেয়েছে। বিজ্ঞানের রাজ্যে একটি সমস্যা সম্বন্ধে একটিমাত্র ব্যাখ্যাই গৃহীত হয়ে থাকে। তাই সেখানে এমন বিভ্রান্তি ঘটে না এবং তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়।

দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু একই সমস্যা সম্বন্ধে সব রকম সম্ভাব্য মত স্থাপিত হতে পারে। অথচ তাদের কোনটিকেই চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কাজেই তারা সকলেই স্বীকৃতির দাবি করবার জন্য রয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট উদাহরণ দিয়ে আমাদের প্রতিপাদ্যকে সহজবোধ্য করা যেতে পারে। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা, এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। এর উত্তর দুভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত বলা যায় অস্তিত্ব থাকে, এবং দ্বিতীয়ত বলা যায় থাকে না, দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মারও বিলুপ্তি ঘটে। দার্শনিক আলোচনায় এই দুটি মতই স্থান পেয়েছে এবং তাদের কোনটিই চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় নি। উভয় পক্ষই নানা সম্ভাব্য যুক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের প্রতিপাদ্য সমর্থন করেছেন। এ অবস্থায় শুধু বিস্ময় নয়, বিভ্রান্তি এসে পড়ে এবং ফলে অনেকে

দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। যেমন ফরাসী দার্শনিক কোঁত হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে প্র'সদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাডলির একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি দিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। তিনি সম্ভবত একটু পরিহাস ছলেই বলেছেন যে দর্শনের সংজ্ঞা হল, আমরা সহজাত বৃত্তি[১] পরিচালিত হয়ে যা বিশ্বাস করি তার জন্য দুর্বল যুক্তি সংগ্রহ করা; আবার এই যুক্তিগুলিও সংগৃহীত হয় সহজাত বৃত্তির প্রভাবে।[২] সহজ কথায় তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে দার্শনিকের ব্যবহার অনেকটা আদালতে বিশেষ পক্ষের সমর্থক উকিলের মত। ব্যবহারজীবীর কর্তব্য দুটি বিবদমান দলের মধ্যে যেদল তাঁকে নিয়োগ করে তার পক্ষ সমর্থনে নিজের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি নিয়োগ করা। কোন্ পক্ষ সত্য বলছে, তা তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় নয়। নিজের পক্ষের কাহিনীকে সত্য বলে বু'দ্ধশক্তির প্রয়োগে প্রমাণ করাই নিজের কর্তব্য বলে তিনি গ্রহণ করেন।

কাজেই ব্র্যাডলির মন্তব্য অনুসারে কার্যত দার্শনিকের ব্যবহার অনেকটা সেই রকম হয়ে দাঁড়ায়। তি'নি যে ইংরেজি শব্দটি ব্যবহার করেছেন অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান তার অর্থ করেছে মনের মধ্যে প্রোথিত আকৃতি বলে।[৩] আমরা তাকে সহজাত বৃত্তি বলতে পারি। বৃত্তি কখনও যুক্তির ভিত্তিতে কোন ধারণা গড়ে তোলে না। বিনা যুক্তিতেই তা গঠিত হয়। সুতরাং তা আদালতে বিবদমান একটি বিশেষ পক্ষের সমস্থানীয় হয়ে দাঁড়ায়। অপর পক্ষে তার দ্বারা নিযুক্ত ব্যবহারজীবীর যেমন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় দুর্বল হোক, সবল হোক যে-কোন যুক্তিদ্বারা নিজের পক্ষকে সমর্থন করা, তেমন দার্শনিকের আচরণ হয়ে দাঁড়ায় যে-কোন যুক্তির সাহায্যে বৃত্তিদ্বারা গঠিত একটি বিশেষ মতকে সমর্থন করা। অবশ্য যুক্তি যেখানে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে দুর্বল হতে বাধ্য।

১ Instinct.

২ "Metaphysics is the finding of bad reasons for what we believe upon instinct, but to find these reasons is no less an instinct."

—Appearance and Reality, Preface

৩ ব্রাডলি ব্যবহার করেছেন 'Instnict' শব্দটি; অক্সফোর্ড অভিধান তার ব্যাখ্যা করেছে 'Innate impulse' বলে।

অথচ আদর্শ দার্শনিকের আচরণ কখনই এমন হওয়া উচিত নয়। সত্যকে অনুসন্ধান করতে বিচারমার্গই তাঁর অবলম্বন হওয়া উচিত। অর্থাৎ কোন বিশেষ পক্ষ দ্বারা নিযুক্ত ব্যবহারজীবীর আচরণ যেমন হবে তা তেমন হবে না, তা হবে বিচারের আসনে অধিষ্ঠিত বিচারকের আচরণের মত। কোন কাহিনী সত্য কিনা সে সম্পর্কে বিচারক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যে সমস্ত প্রমাণ তাঁর কাছে স্থাপিত হয়েছে, যুক্তির সাহায্যে তার মূল্য নির্ণয় করে, নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এখানে মানসিক যুক্তিই তাঁর প্রধান অস্ত্র। মনের যে অংশ চিন্তা করে, কেবল সেই অংশকেই অবলম্বন করে তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেন। তাঁর নিজের রুচি, নিজের মতিগতি, নিজের অনুরাগ ও বিদ্বেষ বোধকে তিনি সত্যনির্ণয়ে কোন প্রভাব বিস্তার করতে দেন না। আদর্শ দার্শনিকের সত্যানুসন্ধান রীতিও এই ধরনের হওয়া উচিত।

কিন্তু যা হওয়া উচিত তা এক কথা, আর যা হয়ে থাকে তা ভিন্ন কথা। যা হওয়া উচিত তা কচিৎ হয়, যা ঘটে থাকে সংসারে পনেরো আনা ক্ষেত্রে তাই হয়। ব্র্যাডলি যা বলেছেন তা মোটামুটি ঠিক হলেও তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষা অবস্থাটির সঠিক পরিচয় দেয় না। তাঁর ধারণায় দার্শনিকের মনের মধ্যে প্রোথিত সহজাত বৃত্তি[১] তাকে এ বিষয় পরিচালিত করে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিককে যা বিভিন্ন পথে পরিচালিত করে তা ঠিক সহজাত বৃত্তি নয়। যা পরিচালিত করে তা হল মতিগতি বা রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গি। সহজাত বৃত্তি অন্ধ, কিন্তু মনের এই বৃত্তিগুলি অন্ধ নয় তারা পক্ষপাত দোষদুষ্ট। দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করলে আমাদের প্রতিপাদ্য বোঝা অনেক সহজ হবে।

মতিগতি বলতে আমরা বুঝি মনের একটি স্বাভাবিক ঝোঁক। তা খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হয় মানসিক গঠনের দ্বারা। মনের তিনটি মৌলিক বৃত্তি আছে—বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তি। সকলের মনেই এগুলি সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকে না। কারও মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল, কারও মধ্যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল, কারও মধ্যে কর্মবৃত্তি প্রবল। দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় কর্মবৃত্তির প্রয়োগের কোন সুযোগ ঘটে না। তাই দার্শনিকের মতিগতি নিয়ে আলোচনায় তার কোন ভূমিকা নেই। অপর দুটি বৃত্তির প্রভাব কিন্তু বিলক্ষণ বিদ্যমান থাকে। তাই দার্শনিকের মতিগতি নিয়ন্ত্রিত করতে তাদের পৃথক পৃথক ভূমিকা থাকতে দেখা যায়। যে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল সে

১ Instinct

দর্শনে বা বিজ্ঞানে অনুরাগী হয়, আর যে মানুষের হৃদয়বৃত্তি প্রবল সে রস সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়। দর্শনের ক্ষেত্রেও দুটি বৃত্তি অনুরূপ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে দার্শনিকের মতিগতি নিয়ন্ত্রিত করে। যাঁর বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল তিনি তথ্যানুসন্ধানে অনুরাগী হন, আর যাঁর হৃদয়বৃত্তি প্রবল তিনি ভক্তি, অনুকম্পা প্রভৃতি হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।

আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের মধ্যে এই দুই বৃত্তির ভিন্নমুখী ক্রিয়াহেতু তাদের প্রভাবের সুন্দর উদাহরণ মেলে। ধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নে রামকৃষ্ণের মত খুবই উদার ছিল, তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নির্বিরোধ সহাবস্থিতি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর একটি পক্ষপাতহীন উদার মনোভাব ছিল। কিন্তু তাঁর হৃদয়বৃত্তি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ভক্তিমার্গে সাধনার প্রতি। বিশ্বসত্তাব মাতৃরূপে পরিকল্পনা এবং তাঁর সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধ্যেই তিনি নিজের মনের মত সাধনমার্গ খুঁজে পেয়েছিলেন।

অপরপক্ষে তাঁবই ভক্ত শিষ্য বিবেকানন্দ ঠিক ভক্তিমার্গে তৃপ্তি পান নি। তাব মনে বুদ্ধিশক্তি ছিল প্রবলতব। তাই দেখি তার প্রভাবে তাঁর মতিগতি তাকে আকৃষ্ট করেছিল বেদান্ত দর্শনের প্রতি। তাই দার্শনিক হিসাবে মূলত তাঁর আত্মনির্বাচিত ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অদ্বৈত বেদান্তের ভাষ্যকার রূপে। পশ্চিমের মানুষেব কাছে তাঁব ধীশক্তি এই পথেই তাঁকে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

পাশ্চাত্য দর্শনে এর একটি সমস্থানীয় দৃষ্টান্ত মেলে ফরাসী দার্শনিক কোঁত-এর দর্শন হতে। মনে হয় তাঁর মনে হৃদয়বৃত্তি তুলনায় বেশী শক্তিশালী ছিল। তাই তাঁর দার্শনিক চিন্তা মানবজাতির কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর মতিগতির প্রভাবেই তাঁর দার্শনিক চিন্তা একটি বিশেষ পথে প্রবাহিত হয়ে মানবিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

রুচি বলতে বুঝি তাই যা মানুষকে কোন যুক্তি বা কারণ ব্যতীত একটি বিশেষ ধরনের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। যেমন স্থূল উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কারও মিষ্ট খাদ্যে রুচি থাকে, কারও বা তিক্ত খাদ্যে। এই রুচির কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যের আস্বাদের অনুভূতি সুখকর হওয়ার ওপরেও তা নির্ভর করে না। তা যদি করত তা হলে তিক্ত দ্রব্যের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হত না। সুতরাং রুচি মানসিক গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

নয়। তা কোন যুক্তির দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়। কোন যুক্তি তার খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই তাকে রুচি বলে। মহাকবি কালিদাস এই অর্থেই যে রুচি শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন তা তাঁর রচিত রঘুবংশে বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের বর্ণনা হতে পাওয়া যাবে।[১]

রুচির প্রভাবে দার্শনিকের চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হবার অনেক উদাহরণ পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে পাওয়া যাবে। তার দু একটি উদাহরণ এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। প্লেটো-র বিশেষ পক্ষপাত ছিল যা ধ্রুব, যা স্থির, যা পরিবর্তনশীল নয়, তার ওপর। তার জন্যই মনে হয় তিনি মৌলিক সত্তার সন্ধান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তনশীল বিশ্বে পান নি। যা বিশেষ তা পরিবর্তনশীল, যা বিশেষ তা জন্মায়, বিকাশলাভ করে, তারপর একদিন ধ্বংস হয়ে যায়। তাই তাঁর ধারণায় তারা মৌলিক সত্তা নয়, তারা অনুকরণ; তারা প্রকৃত কায়া নয়, তার ছায়া। সার্বিক সংজ্ঞা[২] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান জগতের বাহিরে অবস্থিত, তা ধ্রুব, তাই তাকে মৌলিক সত্তা হিসাবে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

এ বিষয় আমাদের দেশের শকংরাচার্যের সঙ্গে তাঁর বেশ তুলনা চলে। শংকরাচার্যের পক্ষপাত ছিল যা ধ্রুব, যা নিঃসঙ্গ মহিমায় এককরূপে বিরাজমান তার প্রতি। তাঁর রুচি ছিল এই দিকে। তাই দেখি তিনি অদ্বৈতবাদ গড়ে তুলেছেন। এই দর্শনে তাই বহু নির্বাসিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু ও নানার জগৎ প্রপঞ্চ বলে উপেক্ষিত। দ্বৈতভাব বর্জিত বিশুদ্ধ একক সত্তা হিসাবে বিশ্ব-সত্তা এখানে পরিকল্পিত। এই দুই দার্শনিকের রুচি একই ধরনের ছিল বলে তাঁদের প্রবর্তিত দর্শনে কিছু সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই গতিশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে স্বীকৃতি দেন নি। প্লেটো-র ধারণায় তারা ছায়া, মূল সত্তা নয়; শংকরের মতে তারা মায়া, স্বপ্নে দৃষ্ট জিনিসের মত অলীক। উভয়েরই পক্ষপাত ধ্রুব, স্থির, এককের প্রতি। শংকরের পরিকল্পনায় ব্রহ্ম আক্ষরিক অর্থে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। প্লেটো-র সার্বিক সংজ্ঞাকে প্রকৃত সত্তার মর্যাদায় স্বীকৃতি দেবার মধ্যে এতে অহৈতুক রুচির প্রভাব সুস্পষ্ট।

দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাও দার্শনিকের চিন্তাধারা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয়।

১ অথাঙ্গরাজাদবতীর্য চক্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী।
নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যগ্ দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ॥ রঘুবংশম্ ॥৬॥৩০

২ Universal

দর্শনের ইতিহাসে তারও প্রচুর উদাহরণ মেলে। উপনিষদের ঋষিরা ছিলেন আনন্দবাদী। তাই তাঁদের চিন্তায় বিশ্বের একটি মাধুর্যমণ্ডিত রূপ ধরা পড়েছে। তাঁদের নয়নে এই পৃথিবী মধুময়, এই পৃথিবীর সকল জীব মধুময়[১]। তাঁদের ধারণায় বায়ু মধু ছড়ায়, নদী হতে মধু ঝরে।[২] এই দৃষ্টিভঙ্গি হেতুই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে যে সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান তাঁর বাহিরের প্রকাশকে আনন্দ এবং অমৃতরূপে[৩] তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

ষড় দর্শনের যুগে ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তখন দুঃখবাদ তাঁদের মনকে এমন আচ্ছন্ন করেছিল যে পার্থিব জীবন যন্ত্রণাদায়ক বলে তাঁদের ধারণা হয়েছিল। সেই জন্য মুক্তিই তাঁদের কাছে পরমার্থ বলে গৃহীত হয়েছিল। জন্ম বন্ধন হতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই তাঁরা দর্শনের চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। অথচ উপনিষদের যুগের দৃষ্টিভঙ্গি আনন্দবাদী হওয়ায় সেখানে ঋষি উপদেশ দিতেন ইহজীবনকেই উপযুক্ত কর্মস্থান হিসাবে গ্রহণ করে শত বৎসর ধরে বাঁচবার ইচ্ছা পোষণ করতে[৪]। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে দার্শনিক চিন্তায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ এসে পড়ে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও সহজাত, কোথাও বা পরিবেশের প্রভাবে তা সৃষ্ট হয়। সহজাত দৃষ্টিভঙ্গির সুন্দর উদাহরণ মেলে বুদ্ধের ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন স্নেহপরায়ণ রাজার পরম প্রীতিভাজন তনয়। তাঁর পরিবেশ তাঁর মনকে সুখের প্রতি অনুরাগী করতে পারত। পাছে তাঁর মনে কষ্ট হয় তাই পিতা তাঁকে দুঃখের স্পর্শ হতে যথাসাধ্য দূরে রাখতে চেষ্টা করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি যখনই নগরপরিক্রমায় প্রাসাদ হতে বাইরে গেছেন, তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছে বেছে বেছে ঠিক যেখানে দুঃখের প্রকাশ তার প্রতি। জরা, মৃত্যু, রোগ প্রভৃতির প্রতিই তিনি নজর দিয়েছেন। সেই নগরে নানা সুখের বা উৎসবের দৃশ্যও তো ছিল ; সে সব কিন্তু তিনি নজর করেন নি। এই সহজাত মানসিক

১ ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু ॥ অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ সর্বাণি ভূতানি মধু ॥
বৃহদারণ্যক ॥২॥৫॥১

২ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ॥
বৃহদারণ্যক ॥৬॥৩॥৬

৩ আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥
মুণ্ডক ॥২॥৭

৪ কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ ॥ ঈশ ॥ ২

দুঃখপ্রবণতা তাঁর দর্শনের মূল প্রেরণা হয়েছিল এবং তার প্রভাবেই তিনি তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। মানবজীবন যে দুঃখময় তাকে অবধারিত সত্য বলে গ্রহণ করে যা মানুষকে জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে সেই তৃষ্ণারূপী মহাশক্তিকে খণ্ডন করতেই তাঁর দার্শনিক চিন্তা নিযুক্ত হয়েছিল।

পরিবেশের প্রভাব হেতু দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার দৃষ্টান্তও দর্শনের ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে যাঁর কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যায় তিনি হলেন জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ের। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত কিছু তথ্য এখানে স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁর মা ছিলেন একজন গুণী মহিলা। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্রের মিল ছিল না। স্বভাবগত পার্থক্যের জন্য উভয়ের মধ্যে প্রচুর বিসম্বাদ ঘটত। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, তাঁর মা পুত্রের প্রতিবাদ সত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করার ফলে তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক রীতিমত বিষিয়ে উঠেছিল। কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে প্রথম জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবান্বিত করে তাঁর চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি একান্ত ভাবেই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন। কোন মানুষকে জীবনে তিনি সঙ্গী বা বন্ধুর আসনে বসাতে পারেন নি। তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল একটি কুকুর।[১]

তাঁর দার্শনিক চিন্তা যে তাঁর বিষাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর মূল দার্শনিক গ্রন্থ বিশ্বকে এক অন্ধ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ব্যাখ্যা করেছে। এই অন্ধ শক্তিই তার ধারণায় বলপূর্বক মানুষকে জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখে। তা না হলে জীবনের অভিজ্ঞতা এমন দুঃখময় যে কেউ স্বেচ্ছায় বাঁচতে চাইত না। তাই তার ধারণায় জীবনে এমন কিছু পাওয়া যায় না যা কষ্ট করে, চেষ্টা করে, প্রতিযোগিতা করে, পাবার যোগ্য ; জীবন এমন এক ব্যবসায় যা লোকসানে পর্যবসিত হয়।[২]

১ **Will Durant, The Story of Philosophy, Chap. VII**

২ **"Nothing at all is worth our striving, our efforts and struggles; that all good things are vanity, the world in all its ends bankrupt and life a business which does not cover expenses."**

—Counsels and Mayims, III, p. 383

আমাদের প্রতিপাদ্য হল শোপেনহাউয়ের-এর এই দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধের মত স্বভাবগত নয়, তা পরিবেশের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। তার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে তাঁর প্রথম জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় বিখ্যাত দার্শনিক উইল ডুরাণ্টও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর ধারণায় যে মানুষ জীবনে মায়ের ভালবাসা পায় নি, পেয়েছে বিদ্বেষ, তার চোখে বিশ্ব রঙীন ঠেকতে পারে না।[১]

আমরা পূর্বে বলেছি যে মানসিক গঠন দার্শনিকের মতিগতি নির্ধারণ করে। যাঁর বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল তিনি সত্যকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে চান, আর যাঁর হৃদয়বৃত্তি প্রবল তিনি বিশ্বসত্তাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে চান। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে কোন কোন দার্শনিকের বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি উভয়ই প্রবল। ফলে দেখা যায় তাঁরা দোটানায় পড়ে যান। তাঁদের বুদ্ধি তাঁদের চিন্তাকে এক পথে টানে, আর হৃদয়বৃত্তি অন্য পথে টানে। কাজেই তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না এবং ফলে পাঠক বিভ্রান্ত হয়। দু একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য বোঝা সহজ হবে।

পাশ্চাত্য দর্শনে এর সুন্দর উদাহরণ মেলে কাণ্ট-এর দর্শনে। মনে হয় তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি দুটিই প্রবল ছিল। প্রথমটির প্রভাবে তিনি যুক্তির উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। অপর পক্ষে তাঁর হৃদয়বৃত্তির প্রভাবে তিনি ঈশ্বরভক্তও ছিলেন। এখন ঈশ্বর আছেন কি নেই, এই প্রশ্নের সমাধানে তিনি রীতিমত দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। খ্রীস্টধর্মের প্রভাবে পশ্চিমের দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ একটি মূল দার্শনিক প্রশ্নের স্থান অধিকার করে বসেছিল। আমাদের দেশেও যে তার আলোচনা হয় নি তা নয়। তবে তা কেবলমাত্র ন্যায় দর্শনে সীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে কাণ্ট তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণে ব্যবহৃত প্রচলিত যুক্তিগুলি একে একে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে তাদের কোনটিই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে না। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির নির্ধারিত পথে চলে এই ফল দেখে তিনি সম্ভবত আতঙ্কিত হয়েছিলেন।

আতঙ্কিত হয়েছিলেন এই কারণে অনুমান করছি যে তিনি স্বভাবত ঈশ্বর-

১ "A man, who has not known a mother's love and worse, has known a mother's hatred has no cause to be infatuated with the world."

The Story of Philosophy, Chap. VII

ভক্ত, ধার্মিক এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সম্ভবত আবিষ্কার করলেন যে বিশুদ্ধ বুদ্ধি-শক্তির প্রয়োগে যুক্তি দিয়ে তিনি নিজেই ঈশ্বরে বিশ্বাসের মূল কেটে ফেলেছেন। অপরপক্ষে তাঁর হৃদয়বৃত্তি বলে ঈশ্বর আছেন, তাঁর অধিকার অক্ষুন্ন রাখা একান্তই প্রয়োজন। কাজেই তিনি অন্য পথে তাঁকে পুনরায় স্থাপিত করলেন। এবার বিশুদ্ধ যুক্তির পথ অবলম্বন না করে তিনি ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে তাকে স্বীকৃতি দিলেন। এইভাবে তাঁর দর্শনে ঈশ্বরের প্রশ্নের মীমাংসায় বুদ্ধিশক্তির ওপর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার[১] প্রাধান্য স্বীকৃতি পেল। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় এই অসঙ্গতি স্পষ্টতই তাঁর মনের দোটানার আনুষঙ্গিক ফল। একই দার্শনিকের চিন্তাধারায় এই ধরনের অসঙ্গতিও দার্শনিক সিদ্ধান্তের ওপর মানুষের আস্থাকে দুর্বল করে দেয়।

ভারতীয় দর্শনে এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায়। তাঁর মধ্যেও বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি, মনীষা ও মমতা সমান শক্তিশালী ছিল মনে হয়। প্রথম জীবনে দেখা যায় তাঁর মতিগতি ছিল বিশুদ্ধ চিন্তার পথে। শংকরাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্তে মনীষার গভীর পরিচয় পেয়ে তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পশ্চিমের মানুষের কাছে তার ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের হৃদয় জয় করেন। শংকরাচার্য যাকে বলা যায় বিশুদ্ধ একবাদ তাই প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে বিশ্ব জুড়ে একটিমাত্র সত্তা বর্তমান এবং তা হল চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ। তার মধ্যে দ্বৈতভাবের কোন অবকাশ নেই। তা যদি হয়, তা হলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বর্ণ-গন্ধ-রূপে বিচিত্র যে বহুসত্তা বিশিষ্ট বিশ্বের পরিচয় এনে দেয়, তার ব্যাখ্যা কি হবে? শংকরাচার্য বলেন, মায়ায় বিভ্রান্ত করবার শক্তি একক ব্রহ্মকে বিবর্তিত করে বহুরূপে দেখায়। বিশ্বে বহুকে যে দেখি তা স্বপ্নের মত অলীক। স্বপ্নেও তো একই মন বহুকে শোনে, জানে, দেখে, কিন্তু একটি চৈতন্যময় মন ছাড়া তো সেখানে বাস্তবে আর কিছু নেই। ব্রহ্মকেও আমরা বিভ্রান্তির ফলে বিশুদ্ধভাবে এক হলেও বহুরূপে প্রত্যক্ষ করি।

বিবেকানন্দ যে শংকরাচার্যের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর রচনা ও বক্তৃতাবলীর মধ্যে এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। অতিরিক্তভাবে তাঁর রচিত একটি কবিতার স্তবকের মধ্যে এই অদ্বৈতবাদের

১ Primacy of Practical Reason

স্বীকৃতির সুন্দর স্বাক্ষর আছে। যেন সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদের মর্মকথাটি তাঁর বাণী রূপে আমাদের কাছে স্থাপন করে। প্রাসঙ্গিক স্তবকটি এই :

একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম, অরূপ, অক্লেদ নিশ্চয় ;
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপ্নের ছায়া।[১]

কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের বিশুদ্ধ-একত্ব-বাদের গলায় বরমাল্য দিয়ে মনে হয় বিবেকানন্দও এক দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। বিশ্ব যদি প্রপঞ্চময় হয়, তা যদি স্বপ্নের মত অলীক হয়, তা হলে মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট ভোগও তো অলীক। কিন্তু তাঁর করুণাসিক্ত মন বুদ্ধিবৃত্তি প্রণোদিত এই যুক্তি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারে নি। এই দোটানায় পড়ে তিনি নূতন করে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার ফলে পরবর্তী জীবনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বহুদ্বারা বিখণ্ডিত বৈচিত্র্যময় বিশ্বও তো পরমসত্তাতেই অবস্থিত, তা হতেই তা উদ্ভূত, সুতরাং তাও সত্য, তা ঠিক প্রপঞ্চময় নয়। মানুষ সত্য, মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভোগও সত্য। সুতরাং মানুষের দুঃখে সহানুভূতির প্রকাশ হৃদয়বৃত্তির অপচয় নয়।

এই চিন্তাধারার পরিণত রূপে দেখি তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি উপলব্ধি করেছেন এবং মানুষের পক্ষে মানুষের মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রকাশ স্বীকার করেছেন।[২] এই নূতন উপলব্ধিকে ভিত্তি করেই বিবেকানন্দের দর্শনে মানবিকতার জন্ম হল। সকল জীবেই যখন ঈশ্বরের প্রকাশ, মানুষের মধ্যে যখন তাঁর বিশেষ প্রকাশ, তখন বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগই ঈশ্বরসেবার প্রকৃষ্ট রীতি বলে স্বীকৃতি লাভ করল। এই দৃষ্টি-ভঙ্গিই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সেই প্রেরণা জুগিয়েছে যা তাঁদের আদর্শ সমাজকর্মী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এইভাবে মতি-গতি, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গি দার্শনিকদের বিভিন্ন পথে টানার ফলে দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে পরস্পর অনৈক্য এসে পড়ে। প্রত্যেকেরই স্বীকৃতির দাবি করে পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে

১ জ্ঞানযোগ

২ "ঈশ্বর সর্বব্যাপী তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন ; কিন্তু মানুষের পক্ষে তিনি মানুষের ভিতরেই প্রকাশিত।" —ভক্তিরহস্য

এইরূপ নানা মুনির নানা মত অবস্থার সৃষ্টি আদৌ সম্ভব হত না যদি তার অনুকূল একটি পরিবেশ না থাকত। একই সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রতিযোগী সিদ্ধান্তের সহাবস্থিতি সম্ভব হয়েছে, তার অনুকূল পরিবেশ আছে বলেই। তুলনায় বিজ্ঞান এই পরিবেশ হতে এক রকম মুক্ত। একরকম বলছি এই কারণে যে বিজ্ঞান যেখানে বিশ্বের মৌলিক সমস্যার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে সেখানে সেই পরিবেশের অনুকূলতা পায় নি ; তাই পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগী মতের সহাবস্থিতি ঘটেছে। যেমন সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হল কিভাবে এ প্রশ্ন সম্বন্ধে একাধিক মত স্থাপিত হয়েছে।[১৩] তাদের কোনটিই প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হচ্ছে না চূড়ান্ত প্রমাণের অভাবে। তবে প্রধানত এই পরিস্থিতি হতে বিজ্ঞান মুক্ত। এখানে সাধারণ ক্ষেত্রে দুটি প্রতিযোগী মতের সহাবস্থিতি ঘটে না, চূড়ান্ত প্রমাণের কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে মত জয়ী হয় তাকেই গ্রহণ করা হয় এবং অন্যটিকে সরে যেতে হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না ; তার কারণ পরিবেশ তার সহায় নয়। সুতরাং এই বিভ্রান্তিকর মতানৈক্যের মূল কারণ এই প্রতিকূল পরিবেশ।

এই প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে দুটি কারণে। প্রথম কারণ হল দর্শনের বিষয়ের বিরাটত্ব এবং জটিলতা। তার আলোচনার বিষয় সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কিত সকল মৌলিক সমস্যা। জ্ঞানতত্ত্বের মত একটি জটিল তত্ত্বও তার আলোচনার বিষয়। তার প্রকাশ বহু ও বিচিত্ররূপে। কেবল একটি মানুষের ধীশক্তি বা পর্যবেক্ষণ শক্তি, তা সে যতই প্রখর হোক ; তাকে অবধারণা করবার সামর্থ্য রাখে না। এ ক্ষেত্রে তার সামগ্রিক রূপ একটি দার্শনিকের সংগৃহীত তত্ত্বে পাওয়া অসম্ভব। ফলে অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞানে পরস্পরের অসঙ্গতি এসে পড়ে। সমগ্র দর্শনে সে অসঙ্গতি আপনি সরে যেতে পারত। এখানে বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের অবস্থাটি সত্যই গল্পে প্রচারিত পাঁচটি অন্ধ ব্যক্তির হাতী দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনীয়। হাতী বিরাট জন্তু। অন্ধ হওয়ায় এক নজরে দেখবার সুযোগ হতে এরা বঞ্চিত। তাই কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাদের হাতীর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ফলে হাতীর যে অংশটা তাদের নাগালে পড়ে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্ধদের কেউ ভাবে হাতী থামের মত, কেউ ভাবে কুলোর মত ইত্যাদি। বিশ্ব সম্বন্ধে কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক ধারণা করা সম্ভব

১৩ এই প্রসঙ্গে জেমস্ জীনস্ ও গামাউ-এর পরস্পরবিরোধী প্রতিপাদ্য স্মরণীয়।

নয়। ফলে বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের অভিজ্ঞতায় যে খণ্ড জ্ঞান সঞ্চিত হয় তার ভিত্তিতেই তিনি তাঁর দর্শন গড়ে তোলেন। এই খণ্ড জ্ঞান আরও খণ্ডিত হয়ে যায় মতি-গতি, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে। মনের এই শক্তিগুলি মানুষের মনকে নির্বাচিত পথে খণ্ড জ্ঞান অর্জনে নিযুক্ত করে। ফলে আপনি যা খণ্ড আকারে আসতে বাধ্য তা আরও খণ্ডিত হয়ে যায়।

যে-কোন বিরাট বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গেলেই অবস্থাটা এই ধরনের হয়ে দাঁড়ায়। ধরা যাক আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান সঞ্চয় করতে চেষ্টা করছি। যে মানুষ ঘুরে ঘুরে সমগ্র দেশটি দেখবার মত আর্থিক সঙ্গতি রাখে না তার জ্ঞান স্বভাবতই তার অধ্যুষিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তার ভিত্তিতেই সে তার বর্ণনা দেবে। যদি পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে এমন মানুষকে প্রশ্ন করা যায় ভারত কেমন দেশ, সে বলবে তা পর্বতময়। যদি গাঙ্গেয় উপত্যকার কোথাও বাস করে এমন মানুষকে প্রশ্ন করা যায় সে বলবে, ভারত সমতল শস্যমণ্ডিত ভূমি দিয়ে গঠিত। যদি রাজস্থানের বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা করা যায় তার মাতৃভূমির প্রকৃতি কি, সে বলবে তা উষর মরুভূমির বিস্তার মাত্র। আর যার আর্থিক সঙ্গতি আছে সে নিজের বাসভূমিতে আবদ্ধ না হলেও নির্বাচন করে সেই সেই অঞ্চলে যাবে যার প্রতি তার আকর্ষণ আছে এবং তার ভিত্তিতেই কেউ বলবে ভারত সুন্দর দেশ, কেউ বলবে ভারত শ্রীহীন দেশ ইত্যাদি।

একটি বিরাট দেশ সম্বন্ধে যে-কথা প্রযোজ্য সে কথা সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে আরও বেশী রকম প্রয়োগযোগ্য। তার বিরাটত্বই মানুষের পক্ষে তার সম্বন্ধে খণ্ড জ্ঞান অর্জনে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করে। নির্বাচিত পথে গেলে তো খণ্ডজ্ঞানের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কাজেই এই সীমিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে দর্শন ব্যক্তিবিশেষের হাতে গড়ে ওঠে তা অন্যের বর্ণিত অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। ফলে অনৈক্য এসে পড়ে।

এই অনৈক্য দূর করা সম্ভব হত যদি সমগ্র বিশ্বে সকল বৈচিত্র্যকে ব্যাপ্ত করে সমগ্র জ্ঞান একটি দর্শনের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হত। কিন্তু তা ত সম্ভব নয়; তাই এই অনৈক্য। এক নজরে দেখা না গেলেও যদি সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে অংশত বিভিন্ন সময় জ্ঞান অর্জন স্পষ্টভাবে সম্ভব হত তা হলেও এই অনৈক্য দূর হত; কিন্তু তাও সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্যকে

সহজবোধ্য করবার জন্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টার উদাহরণটি আর একবার উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা পরস্পরবিরোধী জ্ঞান এনে দেয় সত্য ; কিন্তু সে বিরোধের মীমাংসার সুযোগ আছে। কারণ, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তৃতীয় ব্যক্তি সত্য কিনা দেখে নিতে পারেন। অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পরবিরোধী অথচ খণ্ডভাবে সত্য প্রমাণিত হলে তৃতীয় ব্যক্তি এই বলে মীমাংসা করে দিতে পারেন যে ভারত বিচিত্র দেশ, তা সমতলও বটে, পর্বতাকীর্ণও বটে, মরুময়ও বটে। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়। এই কারণে পরস্পরবিরোধী মতের সমন্বয় সাধনও কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে পড়ে।

আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই ভাবে দার্শনিক আলোচনায় মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণটিও বলে ফেলেছি। তা হল বিশ্বের নিগূঢ় অংশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়। সেই কারণে পরস্পরবিরোধী মতের কোনটি ঠিক, কোনটি নয়, তা চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তারা কেউই একেবারে প্রত্যাখ্যাত হয় না। দর্শনকে অতিরিক্ত মাত্রায় পরোক্ষ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয় বলেই তার আলোচনায় কল্পনা অবাধ গতি পায়, অথচ তাকে সংযত রাখবার কোন উপায় থাকে না। দর্শনের এই দুর্বলতাকে লক্ষ্য করেই বৈজ্ঞানিক দর্শনকে কল্পনা-নির্ভর[১] বলে অপবাদ দেবার সুযোগ পায়।

(২)
আলোচনার রীতি

দর্শনের সামগ্রিকভাবে আলোচনার জন্য এ পর্যন্ত নানা রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে কোন্ রীতি অবলম্বিত হবে তা একটি মুখ্য প্রশ্ন হিসাবে আমাদের কাছে এসে পড়ে। সুতরাং তার মীমাংসা প্রথমেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়েই তার আলোচনা শেষ করে দেওয়া প্রশস্ত বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে যে সকল রীতি সামগ্রিক দার্শনিক আলোচনায় এ পর্যন্ত অবলম্বিত হয়েছে তার একটি মূল্যায়নের দরকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের

১ Speculative

সমালোচনার মধ্য দিয়ে কোন্ রীতি সব থেকে সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা রাখে তাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে।

দার্শনিক সমস্যার আলোচনা বিভিন্ন রীতিতে করা যায়। একই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে করেছেন। এইটিই দর্শনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা। এ ক্ষেত্রে দর্শনের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করতে বিভিন্ন দার্শনিকের সিদ্ধান্তের সহিত পরিচিত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা সম্ভব হতে পারে বিভিন্নভাবে। সেই কারণেই দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন রীতি গড়ে উঠেছে। দর্শনের আলোচনায় যে যে রীতি গড়ে উঠেছে তাদের প্রথমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তারপর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে উদাহরণ সহ বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে তার সমালোচনার সাহায্যে তাদের উৎকর্ষ নিরূপণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন রীতিগুলি এই:

১। ব্যক্তিভিত্তিক বা প্রতি দার্শনিকের মত পৃথক ভাবে আলোচনা।

২। দর্শনের ইতিহাসের আকারে গ্রথিত করে বিভিন্ন দার্শনিকের মত আলোচনা।

৩। ইয়োরোপীয় দর্শনের এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের আকারে পৃথক আলোচনা।

৪। বিশেষ ছকে ফেলে আলোচনা।

৫। সমস্যাভিত্তিক আলোচনা।

ব্যক্তিভিত্তিক আলোচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে মার্কিন দার্শনিক উইল ডুরাণ্ট-এর গ্রন্থে[১]। গ্রন্থখানির উৎকর্ষ সহজেই প্রমাণিত হয় তার জনপ্রিয়তার দ্বারা। সমস্ত বিশ্বে এই গ্রন্থের লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রয় হয়েছে। জনসমাজের মধ্যে এমন জনপ্রিয় দার্শনিক গ্রন্থ দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। জনপ্রিয় উপন্যাসের মত তার কাটতি। এটি সম্ভব হয়েছে তার কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্য।

সে কথাটি বুঝতে প্রথমে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থটিতে কতকগুলি বিখ্যাত দার্শনিককে নির্বাচিত করে তাঁদের দর্শন সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা হয়েছে। সঙ্গে প্রত্যেক দার্শনিকের জীবনী সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা আছে। তারপর তাঁদের প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্বগুলির সরল, সহজ এবং সরস ভাষায় ব্যাখ্যা আছে। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার মূল

১ The Story of Philosophy

কারণ হল তার সরলতা ও সরসতা। গ্রন্থকারের রচনারীতি ও কঠিন বিষয়কে সহজ করে বোঝাবার ক্ষমতা অনস্বীকার্য। মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ততখানি দার্শনিক আলোচনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া নয়, যতখানি তাকে সহজবোধ্য ও সরস আকারে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।[১] এই ভাবে একটি গৌণ উদ্দেশ্য গ্রন্থকারের মনে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানির মূল উদ্দেশ্য খানিক পরিমাণে অবহেলিত হয়েছে। চিত্তাকর্ষক করবার চেষ্টায় প্রতি নির্বাচিত দার্শনিকের জীবনের কথা সরসভাবে বলা হয়েছে। এই আনুষঙ্গিক আলোচনা অনেকখানি জায়গা নিয়ে বসায় তাঁকে মূল বিষয়ের অনেক প্রয়োজনীয় আলোচনা বাদ দিতে হয়েছে। সমগ্র স্কলাসটিক দর্শনকে তিনি বর্জন করেছেন বলে অবশ্য তাঁর ওপর বিশেষ দোষারোপ করা যায় না। কারণ তাকে বিশুদ্ধভাবে দর্শন বলা যায় না। এখানে খ্রীস্ট ধর্ম সংক্রান্ত কতকগুলি বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল তত্ত্বকে যুক্তির সাহায্যে সমর্থনের চেষ্টা হয়েছে। দর্শনকে এখানে একটি গৌণ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে; ধর্মই এখানে প্রধান। কিন্তু অনেক বিশিষ্ট দার্শনিক বাদ পড়ে গেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও একরকম অবহেলিত হয়েছে। তার কিছু দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

ডুরাণ্ট স্পষ্টই বলেছেন যে তাঁর আলোচনা কতকগুলি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অনেক শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক সত্যই এখানে স্থান পেয়েছেন; কিন্তু প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকদের কেহ কেহ বর্জিতও হয়েছেন। ফরাসী দার্শনিক দে-কার্ত-কে কেউ শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক নন বলে অস্বীকার করতে পারবেন না। এ কথা সর্ববাদি-স্বীকৃত যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের তিনি জনক। তিনিই প্রথম শিক্ষা দেন যে যুক্তিসঙ্গত বিচারের দ্বারা সমর্থিত না হলে কোন প্রতিপাদ্যকে গ্রহণ করা উচিত হবে না[২]। বিশুদ্ধযুক্তির ভিত্তিতে তাঁর প্রদর্শিত পথেই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন গড়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁকে বর্জন করায় গ্রন্থখানির অঙ্গহানি ঘটেছে।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল একেবারে বর্জিত না হলেও উপেক্ষিত হয়েছেন। জার্মান চৈতন্যবাদ[৩] যে অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে তার শেষে

১ "It is an attempt to humanise knowledge by centering the story of speculative thought around certain dominant personalities."

—Preface to the Second Edition.

২ Discourse on Method. ৩ Idealism

একটি অনুচ্ছেদে তাঁর স্থান হয়েছে। হতে পারে তাঁর দর্শন এখন তেমন আদর পায় না; কিন্তু তাই বলে কেউ তাঁকে নগণ্য দার্শনিক বলে অপবাদ দিতে পারবেন না। তাঁর দর্শনের ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিরাট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর প্রভাব দার্শনিক জগতে এত শক্তিশালী ছিল যে তাঁর অনুগামী একটি দার্শনিক গোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। গ্রীন্, বোসাংকেট এবং ব্র্যাডলি-র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং ব্র্যাডলি নিজেই তাঁর চিন্তার উৎকর্ষের গুণে একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। সুতরাং মনে হয় হেগেল-এর আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। জ্ঞান নামক বিষয়টি যেমন সূক্ষ্ম তেমন রহস্যময়। বিশ্বের নানা অঙ্গের মধ্যে তাও একটি বিশেষ অঙ্গ। তার আলোচনার ভার দর্শন নেবে না তো কোন্ শাস্ত্র নেবে? দার্শনিক জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কোন্ জ্ঞান-অর্জন রীতি সব থেকে নির্ভরযোগ্য, সত্যের সংজ্ঞা কি, যা জানলাম তা কতখানি নির্ভরযোগ্য—এই ধরনের প্রশ্নগুলি দার্শনিক আলোচনার মৌলিক বিষয় না হয়ে যায় না। কিন্তু দেখা যায় ডুরাণ্ট-এর জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার প্রতি অনুরাগ নেই, অবজ্ঞা আছে। এটা সম্ভবত ততখানি যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয়, যতখানি তাঁর রুচির দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাই দেখি তাঁর গ্রন্থে জ্ঞানতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা একরকম বর্জিত হয়েছে। অবশ্য কাণ্ট-কে তিনি বর্জন করতে পারেন নি, কারণ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে তার স্থান শীর্ষদেশে এবং তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞানতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় ডুরাণ্টকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এরপর তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা বর্জন করেছেন। বিষয়টির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এত বেশী যে তার জন্য তিনি জবাবদিহি করবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নি।[১]

এতগুলি যে প্রতিকূল মন্তব্য করা হল তার উদ্দেশ্য এই নয় যে তাঁর রচিত সুন্দর গ্রন্থখানিকে লোকচক্ষে হেয় করা। তার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু বোঝান যে তাঁর অবলম্বিত রীতিতে দার্শনিক সমস্যাগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়।

১ No apology is offered for the neglect of epistemology."

—Preface to the Second Edition

কেন সম্ভব নয় বলা হচ্ছে তার এখানে কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে দর্শনের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে প্রথমে সকল মৌলিক সমস্যাগুলিবে আলোচনায় স্থান দিতে হবে। কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তা কাজে লাগবে এবং সেই কারণে কোনটিকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। এখানে নিজের রুচি ও মতিগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে আলোচনার অঙ্গহানি ঘটবে।

মনে হয় আর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে নজর রাখা কর্তব্য। দর্শনের আলোচনাগুলি যাতে সরল, সরস ও চিত্তাকর্ষকভাবে করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত। এই প্রসঙ্গে হেগেল বা কাণ্ট-এর আলোচনা রীতির সঙ্গে শোপেনহাওয়ার-এর বা আমাদের কালের বের্গসঁ-এর আলোচনা রীতির তুলনা চলতে পারে। শেষোক্ত দুজনের আলোচনা রীতি ভারি চিত্তাকর্ষক, অথচ বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তা নিয়ে তা সীমাবদ্ধ। এই ধরনের আলোচনার রীতি নিশ্চয় আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু আলোচনা রীতিকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য অবান্তর বিষয় এমন কি গৌণ বিষয়ের অবতারণা করাও যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। তাতে চিত্তবিক্ষেপ না ঘটুক পাঠকের মনকে যা অল্পবিস্তর অপ্রাসঙ্গিক সেই বিষয় দিয়ে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয়।

এই কারণেই মনে হয় দার্শনিক সমস্যার আলোচনায় দার্শনিক বিশেষের জীবনী আলোচনা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে যেখানে একটি বিশেষ দার্শনিকের আলোচনায় একটি গ্রন্থ সীমাবদ্ধ সেখানে তাঁর জীবনী আলোচনাও প্রশস্ত। কারণ, নির্বাচিত ব্যক্তির চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সহিত পরিচিত হওয়া, উভয়ই এখানে প্রাসঙ্গিক এখানে আলোচনায় আমরা যে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিচ্ছি সে ব্যক্তির চিন্তা ও জীবনী তার বিভিন্ন অংশ কিন্তু যেখানে বিশুদ্ধভাবে কেবল ব্যক্তির চিন্তার সহিতই আমাদের আলোচনার সংযোগ সেখানে ব্যক্তিগত জীবন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার কৌতুহল মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ দর্শনের আলোচনায় তার স্থান নেই।

আমাদের বক্তব্যকে পরিষ্কার করবার জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। সিনেমা জগতে যাঁরা তারকা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নানা খবর জানবার কৌতুহল তাঁর ভক্তদের

সীমাহীন। তাই দেখা যায় নানা পত্রিকায় এবং বিশেষ করে সিনেমা সম্পর্কিত পত্রিকায় তাঁদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী একটি বড় অংশ অধিকার করে বসে থাকে। সেখানে তা থাকা প্রশস্ত, তাতে আপত্তি জানাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু যেখানে কোন বিশেষ চলচ্চিত্রের শিল্পহিসাবে আলোচনা হবে বা সাধারণ ভাবে শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রের আলোচনা হবে সেখানে তা অবান্তর এবং বর্জনীয়। কোন বিশেষ চিত্রতারকা প্রাতঃকালে ভ্রমণ করেন কিনা বা দিবানিদ্রা উপভোগ করেন কিনা তা শিল্প সমালোচনায় কোন আলোকপাত করে না।

ঠিক সেই কারণেই বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনায় বক্তিগত তথ্য পরিবেশন করাও প্রশস্ত হবে না। দার্শনিক সমস্যার সমাধানে এই শ্রেণীর তথ্য কোন আলোকপাত করবে না। কাণ্ট এত নিয়মানুবর্তী ছিলেন যে প্রতিবেশীরা তাঁকে বেড়াতে বাহির হতে দেখে সময় নির্ণয় করত বা শোপেনহাওয়ের তাঁর প্রিয় কুকুরটির নাম রেখেছিলেন ব্রহ্ম, এই ধরনের খবর তাঁদের দার্শনিক চিন্তাকে বোঝা সহজ করবে না। অপরপক্ষে এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা এত বিস্তৃত স্থান জুড়ে বসে যে প্রকৃত আলোচনার বিষয়ের পরিপূর্ণ আলোচনা সম্ভব হয় না। এই কারণে মনে হয় বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনায় জীবনী আলোচনা বর্জন করাই বিধেয়।

আমাদের অতিরিক্ত প্রতিপাদ্য হল দর্শনের ব্যক্তিনির্ভর আলোচনাও প্রশস্ত নয়। কারণ, প্রত্যেক দার্শনিকের চিন্তাগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা রীতি তাঁদের চিন্তাকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন রাখে। ফলে কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানে তারা ততখানি ফলপ্রদ হয় না। কথাটি সহজবোধ্য করার জন্য একটি উদাহরণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। পথে অন্ধকারে গ্রামের পরিবেশে হয়ত একটা জিনিসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা গেল; কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল না। তখন প্রতিবেশীদের ডাকা হল তাদের প্রদীপ আনবার জন্য। গ্রামের প্রদীপের আলোর জ্যোতি বড় ক্ষীণ। একটি বা দুট আলোকেও জিনিসটির প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হল না। তখন আরও প্রদীপ আনা হল। সবগুলির মিলিত আলোকে তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল।

দর্শনের সমস্যাগুলির আলোচনায়ও একটি অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশেষ সমস্যার রহস্যভেদ করা সাধারণত কোন বিশেষ দার্শনিকের চিন্তায়

সম্ভব হয় না ; কারণ তা জটিল, তা নিগূঢ়। একাধিক দার্শনিকের সম্মিলিত চিন্তার আলোকে হয়ত তার সমাধান হতে পারে। প্রত্যেক দার্শনিকের চিন্তার পৃথক এবং বিশ্লিষ্ট আলোচনার রীতি অবলম্বন করলে তা সম্ভব হয় না। এ যেন প্রতিটি প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে অন্ধকারে অবস্থিত একটি রহস্যময় বস্তুর প্রকৃত পরিচয় লাভের চেষ্টার মত। তাদের পৃথক আলোকে যখন তা সম্ভব হয় না তখন অনেকগুলি প্রদীপ এক সঙ্গে আনাই প্রশস্ত। এই কারণেই বিভিন্ন দার্শনিকের মতের পৃথক আলোচনা ততখানি সার্থক হয় না।

এই রীতি প্রয়োগ করলে বিভিন্ন দার্শনিক কে কি বলেছেন সে সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই বটে, কিন্তু তাঁরা বিশেষ সমস্যার সমাধানে কতখানি সাহায্য করলেন তা জানা যায় না। অপর পক্ষে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে যাঁরা চিন্তা করেছেন তাঁদের মতগুলি একসঙ্গে স্থাপন করে তাদের পরস্পরের যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় এবং তাদের পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে আলোচনা করে তাদের মিলিত চিন্তার মধ্যে হয়ত সমাধানের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। এই পথে শুধু বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার মিলন ঘটে না দার্শনিকদেরও মিলন ঘটে এবং তাঁদের মিলিত চেষ্টা একীভূত হয়ে সার্থকতার পথে এগিয়ে যায়। দার্শনিক বিষয়গুলি এত জটিল যে একক চেষ্টায় তাদের সমাধান সম্ভব নয়, সকলের মিলিত চেষ্টার ফলেই তা সম্ভব। কাজেই পৃথকভাবে জেনে তাদের সার্থকতা নেই ; কারণ এই আলোচনা রীতি অবলম্বন করলে গভীরে প্রবেশ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ কথিত একটি কাহিনীর এখানে উল্লেখ করতে পারি। তা আমাদের বক্তব্যকে বুঝতে সাহায্য করবে। গল্পটি হল এই : এক বনে একটি বিচিত্র জীব বাস করত। সেই বনের ভিতর যাদের যাতায়াত ছিল তারা পৃথকভাবে তাকে বিভিন্ন সময়ে দেখেছে। তাদের কেউ দেখেছে তার রঙ সবুজ, কেউ দেখেছে নীল, কেউ দেখেছে রাঙা, কেউ হলদে, কেউ সাদা। যে যেমন দেখেছে সে সেই জন্তু সম্বন্ধে তেমনি ধারণা পোষণ করে এসেছে। তাতে কোন গোলমাল হয় নি। কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে তাদের সকলের একত্র সমাবেশ ঘটল এবং প্রসঙ্গক্রমে সেই জন্তুটির পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। কিন্তু দেখা গেল প্রত্যেকে তার সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করে এবং কারও সঙ্গে কারও মতের মিল হয় না, অথচ প্রত্যেকেরই

ধারণা সে যা বলেছে ঠিক। এখন সেখানে এক সাধু এসে হাজির হলেন। তিনি সকলের কথা শুনে বললেন, তোমরা সকলেই এক হিসাবে ঠিক বলছ অথচ ঠিক বলছ না। আমি এই বনে সর্বক্ষণ বাস করি। তোমরা যে জন্তুটির কথা বলছ আমি তাকে সব সময় দেখছি। সেটা বহুরূপী, রঙ বদলায় বলে ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন রূপ দেখায়।[১]

কাহিনীটি ভারি তাৎপর্যপূর্ণ। তা দেখায় যে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা পৃথক করে দেখলে একটি জটিল বস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় না, কেবল বিতর্কের সুযোগ দেওয়া হয়। অথচ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একত্র স্থাপন করে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলে তবেই বস্তুটির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাহিনীতে এই মানুষগুলির একত্র মিলন এবং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা না ঘটলে এই বিচিত্র জীবটির প্রকৃত পরিচয় অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। দর্শনের সমস্যা সম্বন্ধে এই কথাগুলি আরও জোরের সঙ্গে খাটে। বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তার বিশ্লিষ্ট আলোচনা সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে না, বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাঁদের চিন্তা একত্রিত করে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সমস্যার সমাধান কোন্ পথে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই কারণে বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তার পৃথক আলোচনার রীতি প্রশস্ত নয়।

দর্শনের আলোচনার দ্বিতীয় রীতি হল ইতিহাসের সূত্রে গ্রথিত করে বিভিন্ন দার্শনিকের আলোচনা। বিভিন্ন দার্শনিকের মতের সহিত পরিচিত হতে এই ধরনের গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক। এ বিষয় প্রথম পথপ্রদর্শক হলেন ভারতীয় দার্শনিক মাধবাচার্য। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে তিনি ষোলটি বিভিন্ন দর্শনের তত্ত্বগুলি স্থাপন করেন। এখানে অবশ্য তিনি কালানুক্রমিক পর্যায়ে তাদের স্থাপন করেন নি। তাঁর পক্ষে তা করা সম্ভবও ছিল না; কারণ, বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে নির্ভরযোগ্য তথ্য ছিল না। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক নিজের পরিচয় দিতে তেমন আগ্রহ বোধ করতেন না। তাঁর চিন্তা উত্তরপুরুষের জন্য রেখে যেতে তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় দিতে বিশেষ উৎসাহ পেতেন না। ফলে এবিষয় তথ্য সংগ্রহ করা শক্ত এবং যেটুকু পাওয়া যায় তাও অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া বড় কারণ মনে হয় তিনিও

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ

প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সম্ভবত এ বিষয় প্রভাবান্বিত ছিলেন। এ ধরনের তথ্য স্থাপন করবার তিনি কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি।

ইয়োরোপে, ইতিহাসের আকারে দর্শনের সামগ্রিক আলোচনার রীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর্ডম্যান, থিলি ফলকেনবুর্গ প্রভৃতির দর্শনের ইতিহাসের গ্রন্থ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষীর দার্শনিক চিন্তা একত্র স্থাপন করে দর্শনের আলোচনাকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। একটি গ্রন্থে সকল দর্শনের একত্র আলোচনা থাকায় বিভিন্ন দর্শনের সহিত পরিচয় সংঘটিত হয়েছে। এমনকি নানা কাজে ব্যস্ত মানুষের পক্ষেও তেমন আগ্রহ থাকলে দর্শন সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক পরিচয় সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট দার্শনিকের মূল গ্রন্থ পড়ে তার থেকে তাঁর চিন্তা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে চেষ্টা করলে সেটা সম্ভব হত না। কারণ 'পঞ্চতন্ত্রের' রচয়িতা বিষ্ণুশর্মার অনবদ্য ভাষার অনুসরণে এখানে বলা যায় দর্শনশাস্ত্র অপার, অথচ আয়ু সীমিত, জীবনে বিঘ্নও অনেক ; এক্ষেত্রে সার সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নেই। এই অবস্থায় ইতিহাসের আকারে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার সার সংগ্রহ করে একত্রে স্থাপিত হলে সামগ্রিকভাবে দর্শনের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়।

এই দার্শনিক ইতিহাসগুলির রচনা বিন্যাস মোটামুটি একই ধরনের। বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তার আলোচনা কালের অনুক্রমে স্থাপিত হয়েছে। যতখানি সম্ভব প্রতি দার্শনিকের সংক্ষিপ্তভাবে জীবনী দেওয়া হয়েছে। কোথাও অতিরিক্তভাবে সমসাময়িক পরিবেশেরও বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই দার্শনিক ইতিহাসগুলির মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ করে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এগুলি দশনের ইতিহাস বলেই প্রচারিত হয়েছে। অথচ তাদের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তার আলোচনায় সীমাবদ্ধ।[১] অথচ দর্শনের আলোচনা ইয়োরোপের বাহিরের মানুষও করে গেছেন। চৈনিক বা আরবীয় দার্শনিক চিন্তাকে উপেক্ষা করবার কিছু যুক্তি পাওয়া গেলেও কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাকে উপেক্ষা করা যায় না। ভারতের দর্শন বিরাট এবং বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। কাজেই যে গ্রন্থ ভারতের দর্শনকে বর্জন করেছে অথচ সমগ্র মানবজাতির দার্শনিক

১ অবশ্য মার্কিন দর্শনও স্থান পেয়েছে, কিন্তু তারা একই সংস্কৃতির ধারক বলে পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

চিন্তার আলোচনার দাবী করছে তা যে যথার্থ অবস্থার পরিচয় দিচ্ছে তা বলা যায় না।

এর নানা সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে তা উন্নাসিক মনোভাব প্রসূত নয়। ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচয় ইয়োরোপীয় দার্শনিকের না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ তা বিদেশের দর্শন, তা রচিত এমন এক বিদেশী ভাষায় যাকে আয়ত্ত করা কঠিন। অনুবাদেও ত সব গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কাজেই ইয়োরোপীয় দার্শনিকের পক্ষে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রণীত দর্শনের ইতিহাসেই এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে দেখে আমরা তৃপ্তি পেয়েছি। তিনিই প্রথম তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেন 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'[১]। এই নামকরণ যথার্থই ন্যায়দর্শিতার পরিচয় দেয়। এর উৎপ্রেক্ষা এই যে এই আলোচনায় সমগ্র পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তা স্থান পায় নি, স্থান পেয়েছে নির্বাচিতভাবে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তা। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির দার্শনিক চিন্তার সহিত পরিচিত হতে হলে অন্যত্রও সন্ধান করতে হবে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর দর্শনের ইতিহাসের আরও কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্বে রচিত দর্শনগুলির মত তাতে প্রতি দার্শনিকের যতখানি সম্ভব ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় দেওয়া ত আছেই, অতিরিক্ত ভাবে তাতে আছে যে পরিবেশে তাঁদের মনীষা বিকাশ লাভ করেছে তার বিস্তারিত পরিচয়। সামাজিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক পরিবেশ বিস্তারিতভাবে প্রতি ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এই নূতন রীতি অবলম্বন করেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর ধারণায় প্রতি দার্শনিক তাঁর পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং তাঁর যুগের সমাজ, রাজনৈতিক চিন্তা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তেমন ভাগ্যবান হলে অবশ্য তাঁরা নিজের চিন্তা দ্বারা পরবর্তীকালের সমাজকে প্রভাবান্বিত করেন। তাঁর আরও ধারণা পরিবেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে তাঁদের দেখলে তাঁদের শূন্যে স্থাপন করে দেখানোর মত হয়। তাই তিনি এই বিশেষ রীতি তাঁর দার্শনিক ইতিহাসে প্রয়োগ করেছেন।[২]

১ **History of Western Philosophy**

২ **"I have tried, on the contrary, to exhibit each philosopher as far as truth permits as an outcome of his milien"**

—History of Western Philosophy, Preface

একই পথের অনুসরণে সম্প্রতি ভারতীয় দর্শনেরও অনুরূপভাবে ইংরেজী ভাষায় ইতিহাস রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন রচিত 'ভারতীয় দর্শন'। দুটিরই প্রথম খণ্ড বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণনের গ্রন্থখানি অধিক জনপ্রিয় হয়েছে সম্ভবত তাঁর রচনারীতির গুণে। তিনি এমনভাবে গ্রন্থখানি লিখতে চেয়েছিলেন যাতে পশ্চিমের মানুষ ভারতীয় দর্শনের সহিত সহজে পরিচয় লাভ করতে পারে। তার জন্য তিনি যেমন চিত্তাকর্ষক ভাষা প্রয়োগ করেছেন তেমন এমন ভাবে বিভিন্ন চিন্তার ব্যাখ্যা করেছেন যাতে তা পশ্চিমের মানুষের কাছে সহজগ্রাহ্য হয়। মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। একখানি গ্রন্থের উপর নির্ভর করে পশ্চিমের মানুষ এখন ভারতের দার্শনিক চিন্তার একটি সমগ্র ধারণা করে নিতে পারে। তার ফলে সম্ভবত ভারতের দর্শনের ওপর তাঁদের শ্রদ্ধা বেড়েছে। এমনও হতে পারে যে এই নূতন পরিবেশ রচিত হবার ফলেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর গ্রন্থটিকে স্পষ্টভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ বলে সূচিত করতে চেয়েছিলেন।

যদিও রাধাকৃষ্ণন তাঁর গ্রন্থটিকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস বলে দাবী করতে সংকোচ বোধ করেছেন ইয়োরোপে প্রচলিত দর্শনের ইতিহাসগুলিতে যে রীতি অবলম্বিত হয়েছিল তা এখানেও বিলক্ষণ বর্তমান। এখানেও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা যতখানি সম্ভব কালানুক্রমে স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য প্রতি দার্শনিকের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, কারণ ভারতীয় দার্শনিকদের সাধারণত ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত তথ্য বড় একটা পাওয়া যায় না। তবু যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাই দেখি বুদ্ধ, বর্ধমান, শংকর ও রামানুজের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

দর্শনের আলোচনার ঐতিহাসিক রীতিও খুব সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। কেবল ব্যক্তিনির্ভর আলোচনায় প্রতি দার্শনিকের মত বিশ্লিষ্ট আকারে পাঠকের নিকট স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক রীতিতে আলোচনায় সেই মত-গুলি কালানুক্রমে ধারাবাহিক রূপে স্থাপিত হয়। বিভিন্ন যুগের দার্শনিক মত-গুলির মধ্যে কিছু কিছু যোগসূত্রও লক্ষ্য করা হয়। তা সত্ত্বেও এখানে আলোচনা প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমস্যাকেন্দ্রিক নয়। দর্শনের আলোচনায় বিশেষ বিশেষ সমস্যাই আলোচনার মূল বিষয়। সে ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা

সম্বন্ধে কোন্ দার্শনিক কি বলেছেন সেটাই জানা দরকার। তারপর বিভিন্ন দার্শনিক সে সমস্যা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন তার সমালোচনা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমাধানের চেষ্টাই যুক্তিসঙ্গত। ঐতিহাসিক রীতিতে আলোচনায় সমস্যা প্রাধান্য না পেয়ে ব্যক্তিবিশেষ প্রাধান্য পায়। তার সাহায্যে কে কি বলেছেন তা আমরা একসঙ্গে জানি, যা বলেছেন তার মূল্য কতখানি বা তা বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানে কতখানি আলোকপাত করে সে বিষয় জানতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দার্শনিকের মত সংগ্রহ নয়, দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা। ঐতিহাসিক রীতি তথ্য স্থাপন করে প্রচুর কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয়ে খুব সাহায্য করে না।

এই প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্যক্তিনির্ভর আলোচনায় যেমন দার্শনিকদের জীবনী আলোচিত হয় ঐতিহাসিক রীতিকে আলোচনায়ও জীবনীর পরিচয় থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে এগুলি সমস্যার আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং এ অংশটি গৌণ। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে তার সাহায্যে আলোচনাকে চিত্তাকর্ষক করা যায় এবং পাঠকের কৌতূহলবৃত্তিও চরিতার্থ হয়, কিন্তু সমস্যায় আলোকপাত হয় না। তাই তা না হলেও চলত। বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনায় তা বর্জন করাই প্রশস্ত। সুতরাং ঐতিহাসিক রীতিতে আলোচনায় কোন্ দার্শনিক কি বলেছেন তা জানা যায় কিন্তু দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধানে কতখানি সহায়তা করেছেন তা বোঝা যায় না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল রচিত দর্শনের ইতিহাসে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাতে প্রতি দার্শনিকের আলোচনার সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশেরও উল্লেখ হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে পরিবেশই দার্শনিক বিশেষের মতের রূপ নির্ণয় করে। এ কথা হয় ত খানিকটা সত্য এবং তাঁর এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিতর্ক শুরু করবার কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু এ কথাও উল্লেখ করতে হয় যে দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধানে এই ধরনের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করে না। কোন দার্শনিকের মনে কোন একটি বিশেষ মত কি কারণে গড়ে উঠল তা অবশ্য জানা যায়, কিন্তু তা জেনে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। হেগেল কেন তাঁর রচিত ইতিহাসের দর্শনে প্রুশিয়াকে সবার শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলে স্বীকৃতি দিলেন তা হয়ত তাঁর কালের ঐতিহাসিক পরিবেশ জানলে বোঝা যায়, কিন্তু তিনি যা বললেন তা কতখানি গ্রহণযোগ্য সেটা বোঝা যায় না।

দ্বিতীয়টি দার্শনিক সমস্যার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, প্রথমটি নয়। তা গৌণ বস্তুর আলোচনা।

এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ভারতীয় দর্শন ও ইয়োরোপীয় দর্শনকে পরস্পর পৃথক রেখে আলোচনার একটি রীতি দার্শনিক মহলে গড়ে উঠেছে। এরা যেন পরস্পরের অপাংক্তেয়, এদের এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করা যায় না। কেন যে এমন রীতি গড়ে উঠল বোঝা শক্ত। অথচ প্রথম যখন ইয়োরোপীয় দার্শনিক ভারতীয় দর্শন আবিষ্কার করলেন তখন উভয় দর্শনের এক সঙ্গে আলোচনার প্রতি একটা ঝোঁকও দেখা গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে ভারতীয় দর্শনের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর, দেখা যায় ইয়োরোপীয় দার্শনিক শুধু ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন নি নিজেদের চিন্তায়ও তার উল্লেখ করেছেন। ঠিক বলতে কি এই দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতেই শোপেনহাওয়ের-এর দর্শন গড়ে ওঠে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে[১] হিন্দু দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শনের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। ফরাসী দার্শনিক আঁকেতিল ডুপেরঁ কৃত উপনিষদের অনুবাদ পড়ে যে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। এমনকি এমন আশাও পোষণ করেছিলেন যে ভারতীয় চিন্তার অনুপ্রবেশ ইয়োরোপীয় দর্শনকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করবে এবং তার ফলে গ্রীক সংস্কৃতির সহিত মিলনে সেখানে যেরূপ সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল তার অনুরূপ সংঘাত ঘটবে।[২]

ভারতীয় চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ইয়োরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ প্রকট ছিল। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার-এর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় দর্শন নিয়ে জীবনব্যাপী সাধনা। তিনি উপনিষদগুলির ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন, ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করেছিলেন এবং ভারতীয় ষড়্‌-দর্শনের ওপর গ্রন্থ লিখেছিলেন। ফলে ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচিত হবার সুযোগ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অথচ দেখি বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শন হতে ইয়োরোপীয় দর্শন সরে এসেছে। ইয়োরোপীয় দার্শনিক যে ভারতীয় দর্শনের আলোচনা করেন নি

১ Das Welt als Wille and Vorstellung.

২ "The influence of the Sanskrit literature will peneterate not less deeply than did the revival of Greek letters in the fifteenth century."

—Essays, Religion

তা নয়, কিন্তু পৃথকভাবে ভারতীয় দর্শন হিসাবেই। এই প্রসঙ্গে ডয় সেন-এর বেদান্তের আলোচনা, রিজ ডেভিডস দম্পতীর বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা, কীথের ভারতীয় দর্শনের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শোপেন হাওয়ের-এর প্রদর্শিত পথে কেউ উভয় দেশের দর্শনের একত্র আলোচনা করেন নি। এর ফলেই সম্ভবত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি। অবশ্য এ কথা স্বীকৃত যে উভয় দেশের দর্শনের সহিত নিবিড় পরিচয় না থাকলে দুই দেশের দর্শনের যুগপৎ আলোচনা সম্ভব হয় না। এ বিষয় ভারতীয় দার্শনিকের অবস্থা তুলনায় এই ধরনের আলোচনার অনুকূল। কারণ, দুই দেশের দর্শনের সহিত তাঁর পরিচিত হওয়া সহজ। তা সত্ত্বেও ভারতীয় দার্শনিকও উভয় দর্শনের একত্র আলোচনায় ব্রতী হন নি, দুই দর্শনকে পৃথক রেখে আলোচনা করেছেন।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে দর্শনের ঐতিহাসিক রীতিতে আলোচনায় বিশ্লিষ্ট এবং পৃথক আলোচনাই প্রশস্ত। কারণ, ভিন্ন পরিবেশে তারা স্বতন্ত্র ভাবে গড়ে উঠেছে এবং সেইজন্য পরস্পরের মধ্যে সংযোগ সূত্রের অভাব আছে। এক সঙ্গে আলোচনায় জটিলতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ দর্শনের সমস্যাকেন্দ্রিক আলোচনায় এ কথা খাটে না। দর্শনের সমস্যা উভয় দেশে একই, কারণ সমগ্র মানবজাতির মনে বিশ্বের মৌলিক পরিচয় পেতে যে সমস্যাগুলির উদ্ভব হয় তারাই দর্শনের আলোচনার বিষয়: জীবাত্মা আছে কিনা, পুনর্জন্ম আছে কিনা এ প্রশ্নের উদয় সকল দেশের মানুষের মনে হয় এবং এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরও উভয় দেশের দার্শনিকই দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে পৃথক আলোচনার কোন অর্থ হয় না। অথচ দেখি যেখানে সাধারণ ভাবে দার্শনিক আলোচনা হয়েছে সেখানেও পাশ্চাত্য দর্শন ও প্রাচ্য দর্শন পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমেও এই পৃথক ভাবে আলোচনার রীতি সম্মানিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্য পুস্তকও সেইভাবে গড়ে উঠেছে।

অথচ এই পৃথক আলোচনার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের গঠনপ্রকৃতি এমন স্বতন্ত্র নয় যে তাদের একত্র আলোচনা সম্ভব হয় না। তাদের মধ্যে আদা এবং কাচকলার সম্বন্ধ নিশ্চয় আবিষ্কার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারতীয় সঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত এমন ভিন্ন পথে গড়ে

উঠেছে যে তাদের পৃথক ভাবে চর্চা করা ছাড়া উপায় নেই। যদিও দুই দেশের সঙ্গীত একই স্বরসপ্তককে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে[১] তাদের বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন পথে। ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি হল স্বরসঙ্গতি[২]। আর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অবলম্বন হল সুরসঙ্গতি[৩]। ফলে উভয়ের প্রকৃতি এমন বিভিন্ন হয়ে গড়ে উঠেছে যে তাদের এক সঙ্গে চর্চা করা যায় না। তাদের পৃথক ভাবে আলোচনা করা ছাড়া উপায় নেই।

ভারতীয় দর্শন এবং ইয়োরোপীয় দর্শনের প্রকৃতি কিন্তু এমন ভাবে বিভিন্ন নয় যে তাদের এক সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। তা হল বিশ্ব সম্বন্ধে মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করা। এই মৌলিক প্রশ্নগুলি উভয়ক্ষেত্রেই এক। কাজেই একই প্রশ্নের উত্তর উভয় দেশের দার্শনিকের দিতে হয়েছে। উত্তর দেবার রীতিতে হয়ত কিছু পার্থক্য লক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তা ত গৌণ জিনিস। এখন দার্শনিক জ্ঞানলাভ করতে আমাদের যা প্রয়োজন তা হল বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন সম্বন্ধে যে সব উত্তর বিভিন্ন দার্শনিক দিয়েছেন তাদের আলোচনা করে একটি সন্তোষজনক উত্তর গড়ে তোলা। এটা ভালভাবে করা যায় প্রশ্নটি সম্বন্ধে সকল উত্তর সংগ্রহ করে তাদের আলোচনার মাধ্যমে। কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদ রাখলে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। কাজেই দার্শনিক আলোচনায় আমরা যদি কেবল ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের মন্তব্যের মধ্যে বা কেবল ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখি তা ভুল হবে। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই ভাবেই আমরা দর্শনের সমস্যাগুলির আলোচনা করে থাকি। এই ধরনের পৃথক আলোচনার কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

এই রীতির সপক্ষে যে কোন শক্তিসম্পন্ন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না, তা বোঝা আরও সহজ হবে এ বিষয় আমরা যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখি। এই দুই দেশের দর্শনের আলোচ্য বিষয় শুধু এক নয়, তাদের আলোচনার রীতিও মূলত এক। উভয় দেশের দর্শনই যুক্তি মার্গকে সাধারণত অবলম্বন করেছে। সাধারণত বলছি এই কারণে যে কোন কোন দার্শনিক অনুমানকে উপেক্ষা করে অপরোক্ষ অনুভূতি জাতীয় রীতিকে বেশী নির্ভরযোগ্য

১ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে Octave কথাটি ব্যবহৃত হলেও মূলত উভয় দেশই একই স্বরসপ্তককে গ্রহণ করেছে।

২ Melody ৩ Harmony

বলে গ্রহণ করেছেন। যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে ভারতীয় দার্শনিকও আছেন আবার পশ্চিমের দার্শনিকও আছেন। যোগ দর্শন মৌলিক সত্তাকে প্রত্যক্ষ করবার একটি বিশেষ রীতির প্রস্তাব করেছে। তাও এই শ্রেণীতে পড়বে। শঙ্করাচার্যের প্রস্তাবিত 'অনুভব' রীতিও এই শ্রেণীতে পড়বে। আবার পশ্চিমের দার্শনিক বেগসঁও অনুরূপ পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন। সুতরাং এই ব্যতিক্রমও উভয় দেশেই বর্তমান। সেখানেও পার্থক্য কিছুই নেই।

দর্শনের আলোচনা রীতি যুক্তিভিত্তিক হওয়াই প্রশস্ত। কারণ, সেই পথেই নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। এই যুক্তিমার্গ মূলত উভয় দেশের দার্শনিকই গ্রহণ করেছেন। যুক্তিমার্গে জ্ঞান আহৃত হয়ে থাকে প্রধানত দুটি পথে: প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই দুটি পথই উভয় দেশে স্বীকৃত। ভারতীয় দর্শনে উপমান ও অর্থাপত্তিও অতিরিক্ত পথ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য যুক্তি শাস্ত্রে উপমান স্বীকৃত। কাজেই এখানেও কোন পার্থক্য নেই। অর্থাপত্তির পৃথক স্বীকৃতি ইয়োরোপীয় দর্শনে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে তাও অনুমানেরই একটি বিশেষ প্রকার। কাজেই তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই রীতিতে লব্ধ অনুমানকে অবরোহভিত্তিক অনুমানের রূপে[১] সাজান যায়। সুতরাং তার পৃথক নামকরণের অপেক্ষা রাখে না।

কেবল একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়, জ্ঞান অর্জনের রীতি হিসাবে একটি অতিরিক্ত পথকে ভারতীয় দার্শনিকগণ অতিমাত্রায় ব্যবহার করেছেন: তা হল কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের উক্তি বা কোন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবিশেষের উক্তি। একে কোথাও শব্দপ্রমাণ, কোথাও বা আপ্তবাক্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনে তাকে একটি মূল অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় উপনিষদের কয়েকটি আপ্তবচনকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনও আপ্তশ্রুতি ও আপ্ত বচন দুই স্বীকার করে।[২] ন্যায় দর্শনেও শব্দপ্রমাণ একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণের রীতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এটা অনস্বীকার্য যে অন্যের উক্তির ওপর নির্ভর করে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা আদৌ যুক্তিসম্মত নয়। যাঁদের উক্তির ওপর নির্ভর করে বিনা বিচারে একটি মত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে তাঁরা শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি হতে

১ Syllogism

২ আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনঞ্চ ॥ সাংখ্যকারিকা ॥৫

পারেন, তাঁদের বুদ্ধিশক্তি প্রখর হতে পারে, তবু তাঁদের ওপর বিনা দ্বিধায় নির্ভর করা উচিত হবে বলে মনে হয় না। মানুষের বুদ্ধিশক্তি একটি প্রকৃতিদত্ত অস্ত্র, কিন্তু তা একাই কাজে লাগে না। অভিজ্ঞতাও একটা মূল্যবান জিনিস। মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করে সত্যানুসন্ধানের পথে এগিয়ে চলে। কারণ, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ফলে প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও প্রকৃত সত্যে উপনীত হতে পারে না। একটি সহজ উদাহরণ প্রয়োগ করলে আমাদের প্রতিপাদ্য বোঝা যাবে। এককালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীরা ভাবতেন যে বিশ্বের কেন্দ্র হল পৃথিবী। তা প্রথম যুগের মানুষের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় যুক্তিসম্মত। কিন্তু পরবর্তী যুগে যত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল তার ফলে মনে হল সূর্যই বিশ্বের কেন্দ্র। এখন নূতন লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মনে হয় যে সূর্যও নয়। তা আমাদের সৌর জগতের কেন্দ্র মাত্র। এখন অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বোঝা যায় যে আমরা যে নক্ষত্রমণ্ডলীর[১] অন্তর্ভুক্ত কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে তা একটি সাধারণ নক্ষত্র মাত্র। এখন অতীতের মনীষীর আপ্তবাক্যের ওপর নির্ভর করে পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক যদি নূতন তথ্য অনুসন্ধান হতে বিরত হতেন, তা হলে বিশ্বসম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণাকে অবলম্বন করেই আমাদের থাকতে হয়। আপ্তবচনে বিচার-নিরপেক্ষ বিশ্বাস স্থাপন এইভাবে সত্যানুসন্ধানকে ব্যাহত করে।

শুধু তাই নয়। বিশ্ব এমন জটিল বস্তু যে তা যত বড় মনীষীই হন তাঁর একার বিচার বুদ্ধির নাগালে আসতে পারে না। বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে যত অনুসন্ধান হবে, যত বিভিন্ন পথে আলোকপাত হবে ততই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন সহজসাধ্য হবে। এ বিষয় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর অন্ধ এবং ব্যক্তি-বিশেষের আপ্তবচনের ওপর নির্ভর করে পথ চললে অন্ধেনৈব নীয়মানের অবস্থা ঘটবে। যা প্রয়োজন তা একজনের মনীষায় প্রজ্বলিত আলোক বর্তিকা নয়, বহু মনীষীর প্রজ্বলিত আলোক-বর্তিকা। তবেই সত্যের পথ আবিষ্কার করা সহজ হবে। এখন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত যে বুদ্ধিশক্তি রূপ জ্ঞান-বর্তিকা প্রোথিত আছে তাকে ব্যবহার না করা একান্তই যুক্তিহীন হবে।

এই কারণে বর্তমান কালের ইয়োরোপীয় দার্শনিক আপ্তবচনকে একেবারেই সত্য নির্ধারণের উপায় হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি। এ বিষয় পথপ্রদর্শক হলেন

১ Galaxy

পাশ্চাত্য দর্শনের বর্তমান যুগের প্রবর্তক দে-কার্ত। তিনিও এই দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে একই যুক্তি ব্যবহার করেছেন যে আমাদের মনে যখন প্রকৃতিদত্ত জ্ঞান-বর্তিকা রয়েছে, তখন, অন্যের উক্তির ওপর নির্ভর করার কোন অর্থ হয় না। আমার যখন নিজের দৃষ্টিশক্তি বর্তমান, আমি নিজের চোখের সাহায্যে পথ দেখে চলব; অন্ধ হলে না হয় অন্যের হাত ধরে চলতাম। যুক্তিটি অনেকটা এই ধরনের।[১]

এই কারণেই পশ্চিমের দর্শন আপ্তবাক্যকে সত্যতা নির্ধারণের রীতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নি। অপরপক্ষে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন আলোচনায় আপ্তবাক্যকে যুক্তিহিসাবে ব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। বাদরায়ণ রচিত 'ব্রহ্মসূত্রকেই' উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বেদান্ত দর্শনের সত্যতা প্রমাণের জন্য শঙ্করাচার্য তাঁর সম্পর্কিত ভাষ্যে উপনিষদে উক্ত অনেকগুলি আপ্তবচনের ওপর নির্ভর করেছেন। এইভাবে আপ্তবচনকে বহুক্ষেত্রে অবলম্বন করার ফলে ভারতীয় দর্শনের অনেকখানি মর্যাদা হানি হয়েছে।

তবে মনে হয় ভারতীয় দর্শনের প্রথম যুগে তা এই দোষ হতে মুক্ত ছিল। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাচীন উপনিষদগুলি। এই প্রসঙ্গে দুখানি বৃহত্তম উপনিষদ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনকের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনায় যুক্তিমার্গই এক মাত্র অবলম্বন। যাজ্ঞবল্ক্য যখন যা বলতে চেয়েছেন তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই রীতি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। এখানে পিতা আরুণি ও পুত্র শ্বেতকেতুর পরস্পর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আরুণি তাঁর প্রতিপাদ্য স্থাপিত করেছেন। এমন কি প্রত্যক্ষ উদাহরণও প্রয়োগ করা হয়েছে। যখন আরুণি বলছেন যে ব্রহ্ম বিশ্বের নানা বস্তুর মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়ে আছেন, তাঁর পৃথক প্রকাশ নেই, তিনি জলে লবণ মিশিয়ে তাঁকে জলের আস্বাদ গ্রহণ করতে বলছেন। তাৎপর্য এই যে জলে যেমন লবণ অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে থাকে, বিশ্বসত্তাও তেমন

১ "For since God has endowed each of us with some light of reason by which to distinguish truth from error, I could not have believed that I ought for a single moment to rest satisfied with the opinions of another unless I had resolved to exercise my own judgment in examining these."

—Discourse on Method II

ভাবে বিশ্বের মধ্যে মিলিয়ে গেছেন, তাঁর পৃথক প্রকাশ নেই। এখানে যুক্তি মার্গই একমাত্র অবলম্বন।

উপনিষদের যুগের এই দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধের চিন্তায়ও প্রতিফলিত ছিল। তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা সুরঙ্গম সূত্রের উল্লেখ করতে পারি। এখানে প্রিয়শিষ্য আনন্দের সঙ্গে বুদ্ধের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে উচ্চপর্যায়ের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এখানে যে রীতি অবলম্বিত হয়েছে তার সঙ্গে প্লেটো রচিত ডায়ালগ-এর সুন্দর সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধের পরবর্তী কালে সূত্র ও ভাষ্যের যুগেই আপ্তবচন প্রমাণ-রীতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

তবে এ দোষ হতে ইয়োরোপীয় দর্শন যে একেবারে মুক্ত সে কথা বলা যায় না। গ্রীক দর্শনে যুক্তিমার্গই দার্শনিক বিচারে প্রধান অবলম্বন ছিল। বর্তমান যুগে দে-কার্ত প্রদর্শিত পথে তাকে অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু যাকে স্কলাসটিক যুগ বলে তখন ইয়োরোপীয় দর্শনেও আপ্তবচন দার্শনিক সিদ্ধান্তের সত্যতা বিচারের জন্য অন্যতম রীতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমরা টমাস একুইনাস-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মূল গ্রন্থের[১] উদ্দেশ্য হল যারা খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী নয় তাদের কাছে খ্রীস্ট ধর্মে গৃহীত দার্শনিক তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দুটি পথ অবলম্বন করেছেন। যেহেতু তাঁর পাঠকেরা ক্রিশ্চান নয় তিনি যুক্তির সাহায্যে বাইবেলের আপ্তবচনগুলির সত্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। অতিরিক্তভাবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে কেবল যুক্তিমার্গের ওপর নির্ভর করে অনেক তত্ত্ব জানা যায় না এবং সে ক্ষেত্রে আপ্তবচনের ওপর নির্ভর করতে উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপ্তবচনে নির্ভরশীলতা উভয় দেশের দর্শনেই বর্তমান। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় দর্শনে তা অতি বেশী পরিমাণে ক্রিয়াশীল।

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় দর্শনের মূল পার্থক্য খুঁজতে হবে অন্যখানে। তা হল তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

ভারতীয় দর্শন গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। তা এক একটি বিশেষ দার্শনিক মতকে গ্রহণ করে তাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সেখানে প্রতি দার্শনিক তাঁর নিজের স্বাধীন চিন্তাকে

১ Summa Contra Gentiles

অবলম্বন করে নিজস্ব দর্শনকে গড়ে তুলেছেন। ফলে ভারতীয় দর্শন গড়ে উঠেছে দল হিসাবে আর ইয়োরোপীয় দর্শন গড়ে বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে।

ভারতীয় দর্শনের যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হবার দিকে প্রবণতা আছে তা ভারতীয় দর্শনের বিকাশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা যায়। ভারতীয় দর্শনের জন্ম বেদে। বেদে ধর্ম এবং দর্শন যে এক সঙ্গে গড়ে উঠেছে সে কথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। অথচ সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বেদকে দুইভাগে ভাগ করে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম-কাণ্ড। কর্মকাণ্ড দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত ঋগবেদের সূক্তগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। জ্ঞানকাণ্ড ও বেদের সংহিতা অংশে আরম্ভ হয়েছে এবং বিকাশলাভ করেছে উপনিষদে। ঋগবেদের নাসদীয় সূক্তে বা পুরুষ সূক্তে যে দার্শনিক চিন্তা আরম্ভ হয়েছে তা উপনিষদে বিকাশলাভ করে একটি পূর্ণাবয়ব দর্শনের রূপ নিয়েছে। এখানে চিন্তা স্বাধীন পথে প্রবাহিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দার্শনিকদের নাম পাওয়া যায় না; কিন্তু যেখানে নাম পাওয়া যায় সেখানে তাঁর দার্শনিক মতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিভিন্ন অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্যের যে সব মন্তব্য পাই তার ভিত্তিতে তাঁর বচন হতে একটি স্বতন্ত্র দর্শন গড়ে তুলে তাকে যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শনরূপে চিহ্নিত করা যায়। কাজেই উপনিষদের দর্শনকে স্বাধীন চিন্তাভিত্তিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা যায়।

এমন কি উপনিষদের পরবর্তী যুগেও ভারতীয় দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল এবং আপ্তবচনের ভিত্তিতে পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথে ঠিক চলতে চায় নি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভগবান বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তা। তিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ত গ্রহণ করেনই নি, অনেক প্রচলিত তত্ত্বও গ্রহণ করেন নি। একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে তিনি জীবাত্মাকে স্বীকার করেন নি। সম্পূর্ণ নূতন পথে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে তিনি বিশ্বের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্ব তার মূল নিদর্শন।

তারপর হতে দেখা যায় ভারতীয় দর্শন তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ পরিহার করে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক রূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। ভারতীয় ষড়-দর্শনের যুগ হতেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এক একটি দর্শন এক একটি

গোষ্ঠীর হাতে পুরুষাণুক্রমে বিকাশলাভ করেছে। ফলে ঠিক বলতে কোন নূতন দর্শন জন্মগ্রহণ করে নি। যে কয়টি দর্শন সূত্র আকারে[১] প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি তার অনুবর্তীদের হাতে পুরুষানুক্রমে বিকাশলাভ করেছে ও পরিবর্ধিত হয়েছে। সেই বিকাশ ও পরিবর্ধন ঘটেছে দুই ভাবে। প্রথমত, মূল ভাবটিকে সহজবোধ্য এবং পরিস্ফুট করবার জন্য নানা ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগী পক্ষের মত খণ্ডনের জন্য নানা যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থন এবং প্রতিযোগী পক্ষের মত খণ্ডনই দার্শনিকদের মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন পথে নূতনভাবে চিন্তা করবার অবকাশ ঘটে নি।

এই আত্মপক্ষ সমর্থন এবং প্রতিপক্ষের মতকে খণ্ডনের কাজ সম্পাদিত হয়েছে ভাষ্য, টীকা, কারিকা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। এমন কি মূলসূত্রেও পরপক্ষ খণ্ডনের চেষ্টা আছে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থ বাদরায়ণ রচিত ব্রহ্মসূত্রের কথা উল্লেখ করতে পারি। ব্রহ্মসূত্র চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রথম অধ্যায়ে বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্বগুলিকে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের বিরোধের খণ্ডন হয়েছে। তার দ্বিতীয় পাদে সাংখ্য ও বৈশেষিক মতের খণ্ডন করা হয়েছে। এই সব তথ্য হতে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে হিন্দু ষড়-দর্শনের মধ্যে বেদান্ত দর্শন সর্বাপেক্ষা নবীন।

এই পরপক্ষ খণ্ডন অন্যান্য দর্শনেও একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে বসেছে। দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দর্শন প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেখা যাবে যেখানে একটি দর্শনের প্রতিপাদ্য অন্য একটি বিশেষ দর্শনের প্রতিপাদ্যের বিপরীত সেখানে এই দুটি দর্শন পরস্পরের মত খণ্ডনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ওপরে লক্ষ্য করা হয়েছে বেদান্ত দর্শনে সাংখ্য দর্শনের মত খণ্ডন করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে দেখা যাবে সাংখ্য দর্শনের সমর্থক বেদান্ত দর্শনের মত খণ্ডনে ব্রতী হয়েছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যে সাংখ্য ও বেদান্তের বিতর্কের আলোচনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসেছে। অনুরূপভাবে দেখা যায় ন্যায় দর্শনের সহিত বৌদ্ধদর্শন বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েছে। ন্যায় দর্শনের বিভিন্ন ভাষ্য ও কারিকায় বৌদ্ধ মত খণ্ডনের রীতিমত চেষ্টা হয়েছে।

১ কপিল রচিত 'তত্ত্বসমাস' ও 'সাংখ্যপ্রবচন সূত্র' সাংখ্যের ক্ষেত্রে সূত্রের সমস্থানীয়।

এই ধরনের আলোচনা যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের পথকে বিঘ্নিত করে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। মানুষকে যদি বাঁধাধরা পথে চলতে বাধ্য করা হয় এবং অজানা পথে চলতে না দেওয়া হয়, তা হলে জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবল বিশ্বের যে অংশে পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথ চলে গেছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষানুক্রমে আলোচনা ও বিতর্কের ফলে হয়ত নির্বাচিত অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্টতর হতে পারে, কিন্তু যে অংশ পূর্ব চিহ্নিত পথের বাহিরে পড়ে গেছে সে অংশ অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। এই রকম ঘটা দর্শনের ভাগ্যে একটি শোচনীয় পরিস্থিতি। ফলে দেখি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ষড়-দর্শনের আবির্ভাবের পর নূতন পথে মৌলিক চিন্তা একরকম থেমে গিয়েছে। পরস্পর বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে বিতর্কের জাল সৃষ্টি করে প্রকৃত তথ্য সন্ধানে সাহায্য না করে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে। বুদ্ধিশক্তি সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত না হয়ে তর্কশক্তির পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। তাতে পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে প্রচুর কিন্তু জ্ঞানগর্ভবচন একান্তই দুর্লভ।

এই রকম পরিবেশে মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা যে দার্শনিক রাখেন তিনি স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করবার সুযোগ পান না। এই হল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দার্শনিক আলোচনার কুফল। তার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে যদি কোন অনন্যসাধারণ মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তা ক্বচিৎ ঘটে থাকে। মনে হয় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তা একবার ঘটেছিল। মহামনীষী শংকরাচার্যের চিন্তার মৌলিকতা এত বেশী যে এই প্রতিকূল পরিবেশ তাঁকে খর্ব করতে পারে নি। তাই দেখা যায় তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে একটি অভিনব দর্শন জন্মলাভ করেছে। তাকেই আমরা অদ্বৈতবাদ বলে থাকি।

কিন্তু এটি একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। ষড়-দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের উৎপত্তির পর আমাদের দেশে দর্শন চর্চা গোষ্ঠীবদ্ধ আকারে শৃঙ্খলিত ছিল। স্বাধীন পথে কোন দার্শনিক সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেন নি। বোঝাই যায় পরিবেশ তার একান্তই প্রতিকূল ছিল। কেবল যখন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ক্ষুরধার-বুদ্ধি কোন মনীষীর আবির্ভাব ঘটত তখনই তার ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা ক্বচিৎ ঘটে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শংকরাচার্য।

সৌভাগ্যক্রমে মনে হয় অতি সম্প্রতি এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আলোচনা রীতির নাগপাশ হতে ভারতীয় দর্শন ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করছে। সম্প্রতি দু-এক

জন মনীষী আত্ম-নির্বাচিত পথে দার্শনিক সমস্তার সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। উভয়েই ছিলেন অনন্ত-সাধারণ ধীশক্তি মণ্ডিত। তবে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন পণ্ডিত। তিনি নানা দর্শন পড়েছেন তাদের আলোচনা করেছেন তবে নিজস্ব দর্শন রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর রচনার মধ্যেই বর্তমান যুগে প্রথম দেখি একটি সমগ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। তার মধ্যে নানা বিরোধী তত্ত্বের সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। তাতে যেমন একেশ্বরবাদের উপাদান আছে, তেমন উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের উপাদান আছে; যেমন চৈতন্তবাদের উপাদান আছে তেমন জড়বাদের উপাদান আছে। মোটামুটি তা সমন্বয়ধর্মী। ঋগবেদের অনুসরণে একটি মূল তত্ত্বের অবলম্বনে তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছে। তা হল ঋত-সত্য। তা একাধারে চৈতন্তধর্মী ও সৃষ্টিধর্মী।[১]

রবীন্দ্রনাথের দর্শন গড়ে উঠেছে ভিন্ন পথে। তিনি গতানুগতিক পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত নন। তিনি দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থগত আলোচনার সহিতও বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। স্বভাবতই তিনি ছিলেন কবি। তাঁর কল্পনাশক্তি অনন্তসাধারণ, তাঁর সংবেদনশীল মন বিশ্বের নানা ও বিচিত্র প্রকাশে সহজেই আন্দোলিত হত। ফলে যে গভীর অনুভূতি উদ্ভূত হত তা তিনি কবিতায় ও সঙ্গীতে প্রকাশ করতেন। অপর পক্ষে তাঁর মনীষাও ছিল অসাধারণ। ফলে স্বাভাবিক পথেই তাঁর কবিতার দর্শনের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটত। অতিরিক্তভাবে তিনি স্বভাবত ছিলেন ঈশ্বরভক্ত। এই বিভিন্ন শক্তির একত্র সমাবেশের ফলে তাঁর কবিতায়, সঙ্গীতে, চিন্তায়, বিশ্বের বিভিন্ন মৌলিক সমস্তা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত আত্মপ্রকাশ করেছে। সেগুলি ততটা গতানুগতিক পথে যুক্তি দিয়ে লব্ধ সিদ্ধান্ত নয় যতটা কবিসুলভ মনোভাবে অনুভূতি দিয়ে লব্ধ। এ বিষয় মনে হয় তিনি উপনিষদের ঋষির দর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন। ফলে তাঁর স্থাপিত তত্ত্বগুলি আরও মৌলিক রূপ নিয়েছে। এইভাবে তাঁর দার্শনিক চিন্তা ভারতে স্বাধীন পথে দার্শনিক সমস্তার সমাধানের একটি সুন্দর আদর্শ স্থাপন করেছে।

তুলনায় ইয়োরোপীয় দর্শন পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের মধ্যে আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। প্রাচীন গ্রীক দর্শনের দুই দিকপাল প্লেটো এবং এরিস্টটল প্রায় একই সময়

১ Life Divine, Chap. XV

এবং একই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁদের দর্শন বিভিন্ন পথে বিকাশলাভ করেছে। যা বিশেষ যা পরিবর্তনশীল তাকে প্লেটো মূল সত্য বলে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। সার্বিক সংজ্ঞাকেই তিনি প্রকৃত এবং মূল সত্য বলেছেন; কারণ, তা ধ্রুব তা পরিবর্তনশীল নয়। যা বিশেষ তাঁর মতে তা তার অনুকরণ মাত্র। অপরপক্ষে এরিসটটল বিশেষকে, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুধারা খণ্ডিত বিশ্বকেই মৌলিক সত্তা হিসাবে স্বীকার করেছেন। তাঁর ধারণায় সার্বিক সংজ্ঞা বিশেষের মধ্যেই ক্রিয়াশীল, তা হতে সার্বিকের পৃথক অস্তিত্ব নেই। পরবর্তীকালেও ইয়োরোপের গ্রীক প্রভাবিত দর্শনে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা রীতি প্রচলিত ছিল।

ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে এই স্বাধীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল একবার। তখন খ্রীস্টধর্মের প্রভাব এত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে ধর্মকর্তৃক দার্শনিক চিন্তা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল। একরকম বলা যায় যুক্তি ও দার্শনিক চিন্তাকে ধর্ম কর্তৃক প্রবর্তিত তত্ত্বের সমর্থনে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই যুগকে স্কলাসটিক যুগ বলা হয়। তাকে আঁধারের যুগও বলা হয়, কারণ এই নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে স্বাধীন চিন্তার পথ একরকম অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। একরকম বলছি এই কারণে যে ইয়োরোপের মানুষের স্বাধীন পথে চিন্তার আগ্রহ একেবারে স্তিমিত করতে পারে নি। তার সুন্দর সমর্থন মেলে জিয়োদার্নো ব্রুনোর দৃষ্টান্ত হতে। তিনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। তবু খ্রীস্টধর্মের নেতাদের নির্দেশ অস্বীকার করে এমন সব কথা বলতে শুরু করলেন যা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের সহিত সংগতি রক্ষা করে না। ফলে তিনি কর্তৃপক্ষের বিদ্বেষভাজন হলেন। ইতালির মানুষ হয়েও তিনি বিতাড়িত হয়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে বাস করতে লাগলেন। পরে একরকম চক্রান্ত করে তাঁকে ভেনিসে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁর ধর্মদ্রোহিতার জন্য বিচার হয়[১]। সে বিচারে সক্রেটিস-এর মত তাঁরও প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

তারপর দে-কার্ত-এর আবির্ভাবের পর তাঁর প্রদর্শিত পথে আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক রীতিতে স্বাধীন চিন্তার পথে ইয়োরোপীয় দর্শন বিকাশ লাভ করতে লাগল। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তা মানুষের স্বাধীন চিন্তার পথে খানিকটা বাধা সৃষ্টি করে। কারণ নূতন দার্শনিক অনুসন্ধিৎসু কতকগুলি

১ Inquisition

গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট পথ সামনে পান, তাঁর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাদের একটিকে নিজের মস্তিগতি এবং রুচি অনুসারে নির্বাচন করে নিয়ে তার সমর্থনে আত্মনিয়োগ করা। এখানে যে অবস্থাটি সৃষ্টি হয় তা বর্তমানকালে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অবলম্বিত তর্করীতির সঙ্গে তুলনীয়। একটি প্রস্তাব স্থাপন করে তার সপক্ষে বা বিপক্ষে যাঁরা তর্কে প্রতিযোগিতা করবেন তাঁদের যোগ দিতে বলা হয়। এমনও হতে পারে যে একটি তৃতীয় মত সম্ভব, কিন্তু যিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সেই মত সমর্থন করতে চান তাঁর প্রতিযোগিতায় স্থান হয় না। গোষ্ঠীভিত্তিক দার্শনিক চিন্তা একটি অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে যিনি স্বাধীনভাবে চিন্তাশক্তির প্রয়োগের ফলে নূতন পথে চিন্তা করতে পারতেন তাঁর সে সুযোগ মেলে না। অপর পক্ষে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে এমন কোন বাধা আরোপিত হয় না। পূর্বে অনুসৃত পথে হোক, নূতন পথে হোক, স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে অবারিত থাকে।

ইয়োরোপীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগের রীতি অবাধ স্বীকৃতি পেয়েছিল বলেই সেখানে দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠেছে। আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে বিকাশ লাভ করেছে বলেই এমন বহু ও বিচিত্র পথে নিত্য নূতন দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করতে পেরেছে। হতে পারে তাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়, কিন্তু নূতন পথ আবিষ্কারের সম্ভাবনাও ত থাকে। অপর পক্ষে গতানুগতিক পথে চললে সে সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়।

সেই কারণেই দেখি ইয়োরোপীয় দর্শন এত সতেজ, প্রাণবান এবং বিচিত্র। কত ধরনের বিপরীতধর্মী মতের সেখানে অবতারণা হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি দার্শনিক চিন্তায় সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সহায়ক। কারণ, দর্শনে বিজ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমর্থন পাওয়া যায় না। অনুমানকে অবলম্বন করেই সেখানে কোন সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। নানা বিরোধী মতের সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়েই এক্ষেত্রে নির্ভর-যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

ইয়োরোপীয় দর্শনে যে দার্শনিক চিন্তা একেবারেই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে নি তা নয়। তবে তা ব্যতিক্রম এবং ইয়োরোপীয় দর্শনের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি নূতন তত্ত্বের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে যথাস্থানে এদের সম্বন্ধে প্রসঙ্গত বিস্তারিত

আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কাজেই এখানে তাদের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই চলবে। এই দুটি তত্ত্বকে নিজেদের চিহ্নিত করবার জন্য যে নাম দেওয়া হয়েছে তা হল নববস্তুবাদ[১] এবং সমালোচনামূলক বস্তুবাদ[২]। উভয় মতই কতকগুলি মার্কিন দার্শনিকের গোষ্ঠীগত চিন্তার ফলে গড়ে উঠেছে।

নববস্তুবাদ যে ছয় জন দার্শনিকের সংযুক্ত চিন্তার ফলে গড়ে উঠেছে তাঁদের নাম হল হোল্ট, মার্ভিন, মণ্টেগু, পেরী, পিটকিন ও স্পলডিং। এঁদের প্রতিপাদ্য হল আমরা যাকে জ্ঞান বলি তা মনের জিনিস নয়, তা মানসিক প্রকৃতির নয় তা বস্তুই। মানসিক চিন্তার যা বিষয় তা মানসিক নয়, তা বস্তুধর্মী। জ্ঞান উৎপাদিত হয় মনে নয় বস্তুর মধ্যেই।

সমালোচনামূলক বস্তুবাদ ড্রেক প্রমুখ সাতজন মার্কিন দার্শনিকের সামবায়িক চিন্তার ফলে গড়ে উঠেছে।[৩] নববস্তুবাদ চৈতন্যবাদ বিরোধী। তা প্রমাণ করতে চায় চৈতন্যবিশিষ্ট সত্তা ব্যতিরেকে বস্তু থাকতে পারে। কিন্তু সমালোচনামূলক বস্তুবাদে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। তা সত্তার রূপ কি, তা জড় না চৈতন্যময়, এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে নি। তার বিশেষ আলোচ্য বিষয় হল আমাদের মন যে জ্ঞান অর্জন করে তার সঙ্গে জ্ঞানের বস্তুর সম্বন্ধ কিরূপ। তা বলতে চায় যে আমাদের মন সোজাসুজি জ্ঞানের বস্তুকে পায় না, তা পায় জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য[৪]। সুতরাং যদিও মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তু হল জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞানের অঙ্গ হল বা উপাদান হল এই ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য। তা সত্ত্বেও তাঁদের ধারণা আমরা প্রকৃত বস্তুর সোজাসুজি পরিচয় পেয়ে থাকি। কারণ, ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য প্রকৃত বস্তুর সারাংশ আমাদের কাছে স্থাপন করতে সক্ষম।

এই দুটি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দার্শনিক তত্ত্ব দুটি বিষয়ে আলোকপাত করে। প্রথমত তা দেখায় দার্শনিক চিন্তা কত বিচিত্র পথে যেতে পারে। জ্ঞান নামে পদার্থটি যে মানসিক প্রকৃতির, এ বিষয়ে কচিৎ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু নববস্তুবাদে সে মত গ্রহণ করা হয় নি। দ্বিতীয়ত এগুলি ইয়োরোপীয় দর্শনে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তার বিরল দৃষ্টান্ত। তবে এখানে এটুকু বলা যেতে পারে যে

১ New Realism
২ Critical Realism
৩ The New Realism—Co-operative studies in Philosophy.
৪ Critical Realism—A co-operative study in the problems of knowledge.
৫ Sense data

আমাদের দেশে একটি বিশেষ তত্ত্বকে পুরুষানুক্রমে দার্শনিক গোষ্ঠী যেভাবে সঞ্জীবিত করে রাখে সেইভাবে এই চিন্তার সংরক্ষিত হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

(৩)

প্রস্তাবিত আলোচনা রীতি

উপরের দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রশস্ত মনে হয় যে দর্শনের সমস্যাভিত্তিক আলোচনাই সব থেকে ফলপ্রদ। বিশ্ব সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা পেতে এই পথই সব থেকে যুক্তিসম্মত। প্রথমে দর্শনের মৌলিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে বার করে নিয়ে, তারপর প্রতিটি সমস্যার পৃথক আলোচনা করলে, তার সম্বন্ধে মন ভালরকম অবহিত হয় এবং সম্পর্কিত সকল মতের আলোচনার ভিত্তিতে সব থেকে সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই পথেই প্রতি সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বের সকল বিশিষ্ট দার্শনিকের এবং দার্শনিকগোষ্ঠীর মন্তব্য একত্র স্থাপন করে তাদের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হয়। দর্শনের সমস্যাগুলি এতই জটিল এবং সূক্ষ্ম যে এই ভাবে সামবায়িক চেষ্টার ফলেই তাদের সমাধান সম্ভব। কোন বিশেষ দার্শনিকের একক চেষ্টায় তার সমাধান সম্ভব নয়। অনন্যসাধারণ মনীষার অধিকারী হলেও তাঁর ক্ষমতা নানাভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বিভিন্ন মানুষের একই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা যখন ভিন্ন পথে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সকল চিন্তাগুলি একত্রিত করে তাদের সমালোচনার মধ্য দিয়েই সমাধানের সূত্র খুঁজতে হবে। অন্য পথে সমাধানের সন্ধান মিলবে না।

এই কারণেই মনে হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক দার্শনিক আলোচনা এ বিষয় তেমন সাহায্য করতে পারে না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা দুইভাবে হতে পারে। এক, প্রতি দার্শনিকের দর্শন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা এবং দুই, দর্শনের ইতিহাসের আকারে সময়ানুক্রমে বিভিন্ন দার্শনিকের মতের ধারাবাহিক আলোচনা। উভয় রীতিই মূলত এক; কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই আলোচনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের দৃষ্টি ব্যক্তিবিশেষের মন্তব্যের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সমস্যাবিশেষের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। সেটা সম্ভব হয় সমস্যাভিত্তিক আলোচনায়।

ঠিক একই কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পৃথক আলোচনা রীতি সমর্থন করা যায় না। উভয় দেশের দার্শনিক একই সমস্যার বিষয় চিন্তা করে যখন সে বিষয় আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন তখন তাদের পৃথক আলোচনা যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। সামবায়িক চেষ্টার মধ্যেই যখন সব থেকে সন্তোষজনক ফল পাবার সম্ভাবনা, তখন সকল সম্ভাব্য মতকে একত্র স্থাপন করে আলোচনা করাই প্রশস্ত।

এই সমস্যাভিত্তিক আলোচনার মধ্যেও একটি ছক আরোপ করা যায়। ঠিক বলতে কি এই পথে একাধিক চেষ্টা হয়েছে। তখন বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তার একটি বিকাশের ক্রম আবিষ্কার করা যায়। একটি উদাহরণ স্থাপন করলে এই কথাটি আরও ভাল বোঝা যাবে। বিশ্বের গঠন সম্পর্কিত একটি সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে: বিশ্ব কি একটিমাত্র সত্তা দিয়ে গঠিত না বহু সত্তা তার উপাদান? এই প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বিশ্ব সরলভাবে একক সত্তা নয়, জটিলভাবে এক। বিশ্ব বহু বিচ্ছিন্ন সত্তার সমাবেশে গঠিত হয়েও মূলত একই। যেমন নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে একটি বৃক্ষের একত্ব। বিভিন্ন বস্তু বিশ্লিষ্ট নয়, তারা অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ বিশ্বের একটি সামগ্রিক একতা আছে, বহুকে জড়িয়ে নিয়ে বিশ্ব এক।

এই সিদ্ধান্তটি এই বিশেষ সমস্যা সম্পর্কিত পরিণত মতটিকে আমাদের কাছে স্থাপন করে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই মত হঠাৎ একদিনে গড়ে ওঠে নি। বিভিন্ন ধরনের চিন্তার পারস্পরিক প্রভাবের ভিতর দিয়ে এবং অভিজ্ঞতার বিস্তারের মধ্য দিয়ে তা বিকাশলাভ করেছে। অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে সমাধানের পথে এই সমস্যা সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তা তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। প্রথম অবস্থায় মনে হয়েছে যে বিশ্ব বহু বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট বস্তুর সমষ্টিমাত্র। তারপর আরও অভিজ্ঞতা লাভের পর মনে হয়েছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিশ্বের যে পরিচয় এনে দেয় তা বলে বিশ্ব বহু ও বিচিত্ররূপে প্রকট এবং তা দ্রুত পরিবর্তনশীল। তা চঞ্চল, তা অস্থির, তা ধ্রুব নয়। কাজেই বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় দেয় না। সুতরাং বিশ্বের প্রকৃত রূপ খুঁজতে হবে পরিবর্তনশীল বহুকে বর্জন করে অবিনাশী একের মধ্যে। এই ভাবেই শংকর বা প্লেটো-র মতের উদ্ভব হয়েছিল।

এই অবস্থায় দার্শনিক আলোচনায় একটি দ্বন্দ্বের ভাব এসে পড়ে। দার্শনিক

মত তখন দুই ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। এক পক্ষ বলে বিশ্ব একটি একক বস্তু, আর অপর পক্ষ বলে ঠিক তার বিপরীত কথা যে বিশ্ব বহু বিশ্লিষ্ট বস্তুর সমাবেশ। আরও বিতর্ক ও আলোচনার পর আরও নূতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৃতীয় একটি মত আসবে যা এই দুই ভিন্নমুখী মতের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে বলবে বিশ্ব এক হিসাবে এক বটে আবার অন্য হিসাবে বহুও বটে, তা বহুকে অঙ্গীভূত করে এক। এটি সিদ্ধান্তের পরিণত রূপ এবং সমাধানের বিকাশের পথে তৃতীয় অবস্থার নিদর্শন। এখানে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়। ফলে বিরোধী মতগুলির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

উপরের দৃষ্টান্ত হতে দেখা যাবে যে, কোন দার্শনিক সমস্যার সমাধান তার পরিণত রূপে উপস্থিত হতে তিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় মন অপরিণত থাকায় ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ থাকায় প্রথম দৃষ্টিতে যে সমাধান মনে লাগে তাকে গ্রহণ করা হয়। কাজেই এখানে মনের একটি শান্ত অবস্থা পাওয়া যায়[১]। দ্বিতীয় অবস্থায় অভিজ্ঞতা বাড়লে এবং প্রশ্নটি সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করার ফলে একটি বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়[২]। তখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং মতিগতির পথে বিভিন্ন দার্শনিক পরস্পর-বিরোধী পথে সমাধান খোঁজেন। কাজেই মতগুলির মধ্যে একটা বিরোধের অবস্থা এসে পড়ে। তৃতীয় অবস্থায় এই পরস্পর বিরোধের ফলে পরস্পরের একদেশদর্শিতার দোষ চোখে পড়ে যায় এবং সমন্বয়ের পথে একটি মীমাংসার চেষ্টা হয়। এইভাবেই পরিণত সিদ্ধান্তটি গড়ে ওঠে। তখন বিরোধ তিরোহিত হবার ফলে মন আবার দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় ফিরে যায়[৩]। প্রথম অবস্থাটিকে আমরা দ্বন্দ্বপূর্ব অবস্থা বলতে পারি, দ্বিতীয়টিকে দ্বন্দ্বাবস্থা বলতে পারি এবং তৃতীয়টিকে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা বলতে পারি।

দার্শনিক সমস্যার আলোচনা এই ভাবেও হতে পারে। এই রীতি সমস্যাভিত্তিক আলোচনারই পক্ষপাতী। অতিরিক্তভাবে তা বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে সকল দার্শনিক সমাধানগুলিকে শুধু একত্রিত করে না, তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখায়। প্রথম শ্রেণীতে অপরিণত মতগুলি স্থাপিত হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরস্পরবিরোধী মতগুলি স্থাপিত হয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে

১ **Stage of Harmony**

২ **Stage of conflict**

৩ **Stage of reestablished Harmony**

সমন্বয়সাধক মতগুলি স্থাপিত হয়। এর সুবিধা এই যে সমাধান কি ভাবে বিকাশলাভ করেছে তা চোখের সামনে ধরা পড়ে। এই আলোচনা রীতিকে জননানুক্রমিক রীতি নাম দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয় ডঃ বলডুইন প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁর গ্রন্থে[১] ১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিপাদ্য হল শিল্পরসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বের আলোচনার মধ্যেই মৌল সত্তার প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে। সে কথা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। যা উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে এখানে তিনি এই জননানুক্রমিক রীতি প্রয়োগ করেছেন।

এই জননানুক্রমিক রীতি আমার পিতা মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দর্শনের গ্রন্থেও আর একটু পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করেছেন।[২] গ্রন্থখানির নাম হল 'দার্শনিক সমস্যার জননানুক্রমিক ইতিহাস'। গতানুগতিক অর্থে দর্শনের ইতিহাস বলতে যা বুঝি, এ তা নয়। এখানে আলোচনা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়, কালানুক্রমিকও নয়। আলোচনা এখানে সমস্যাভিত্তিক এবং সমাধানের জননানুক্রমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে বলেই তার নাম ইতিহাস। তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সমাধানগুলি সমস্যা অনুসারে বিশ্লেষণ করে ক্রমবিকাশের পথ সূচিত করতে সাজানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা দর্শনের সমস্যার ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা। এই ভাবে তিনি যে রীতি প্রয়োগ করেছেন তাকে জননানুক্রমিক রীতি বলেছেন এবং বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানের বিকাশের পথ তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে সূচিত করতে তিনটি অবস্থার যথাক্রমে নাম দিয়েছেন (১) শান্ত অবস্থা অর্থাৎ দ্বন্দ্বপূর্ব অবস্থা, (২) বিতর্কের অবস্থা অর্থাৎ দ্বন্দ্বাবস্থা ও (৩) সমন্বয়ের অবস্থা অর্থাৎ দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা।

হেগেল প্রবর্তিত ত্রিভঙ্গী নয়ের[৩] সঙ্গে এর কিছু মিল আছে কিছু পার্থক্যও আছে। হেগেল দেখিয়েছেন যে চিন্তা তিনটি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে পরিণতির পথে এগিয়ে চলে, অনেকটা তিন তাল সমন্বিত নৃত্যের মত। প্রথম পদক্ষেপ যে দিকে যায় দ্বিতীয় পদক্ষেপ তার বিপরীত দিকে যায়। তৃতীয় পদক্ষেপ তাদের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান

১ J. M. Baldwin, Genetic Logic and Pancalism, 1914

২ Muralydhar Banerjee, A Genetic History of the Problems of Philosophy. —Calcutta University, 1935

৩ Dialectic Method

করে। কথাটি আরও ভাল বোঝা যায় দোলার উপমা ব্যবহার করলে। দোলায় বসিয়ে কাউকে একদিকে ঠেলে দিলে প্রতিক্রিয়ার ফলে আপনিই তা বিপরীত দিকে চলে যাবে। তারপর যদি আর শক্তি প্রয়োগ না করা হয় দেখা যাবে যে দুই বিপরীত দিকে গতি ক্রমশ দুর্বলতর হয়ে শেষে মাঝখানে এসে দোলা থেমে যাবে। তিনি প্রথম পদক্ষেপের নাম দিয়েছেন 'থিসিস' বা পূর্বপক্ষ, দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছেন 'এন্টিথিসিস' বা প্রতিপক্ষ এবং তৃতীয়টির 'সিনথিসিস' অর্থাৎ সমন্বয়।

হেগেল-এর ব্যবহৃত ত্রিভঙ্গী নয়ের সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও জননাক্রমিক রীতির তিনটি বিষয়ে তার সহিত পার্থক্য আছে। হেগেল-এর পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ জননানুক্রমিক রীতির দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ দ্বন্দ্বাবস্থার সঙ্গে তুলনীয় এবং তাঁর পরিকল্পিত সমন্বয় এর তৃতীয় অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। এখানে তার অতিরিক্ত অবস্থা একটি সংযুক্ত হয়েছে। তা হল দ্বন্দ্বপূর্ব অবস্থা। দোলায় ঠেলা দেবার পূর্বে যে সাম্যাবস্থা ছিল তার সঙ্গে এটি তুলনীয়। দ্বিতীয়ত, হেগেল-এর ত্রিভঙ্গী নয় ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কিত। তার প্রয়োগ যুক্তি হিসাবে, কাজেই তা কাল নিরপেক্ষ। জননানুক্রমিক রীতির প্রয়োগক্ষেত্র দর্শনের আলোচনা ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের ক্রমবিকাশ নিয়ে ব্যাপ্ত। তাই তা কালাশ্রয়ী। তৃতীয়ত, সব থেকে যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই যে তা সকল দেশের সকল দর্শনের আলোচনা ও মূল্যায়নের কাজে ব্যবহৃত হয়। হেগেল-এর ত্রিভঙ্গী নয় তাঁর নিজস্ব দর্শনের বিন্যাসের কাজে মাত্র প্রযুক্ত হয়েছে। অবশ্য রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে কার্ল মার্কস তাকে প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়।

জননানুক্রমিক রীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল এখানে দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন রূপের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দার্শনিক চিন্তা যে বিতর্কের পথ দিয়েই পরিণতির পথে এগিয়ে চলে এখানে তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। চিন্তার পরিণতি সংঘটিত হয় তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে—এই হল তার প্রতিপাদ্য। এই ভাবধারার সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের গুণতত্ত্বের কিছু ভাবগত সাদৃশ্য দেখা যায়। গুণ বলতে সাংখ্য দর্শনে বস্তুর পরিচায়ক বিশেষণের কথা বলে না। এগুলি বিশ্বের অন্যতম মূলতত্ত্ব প্রকৃতির অঙ্গীভূত উপাদান স্থানীয়। তাদের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি স্থির হয়ে থাকে; তখন সৃষ্টির প্রবাহ থেমে যায়। তাদের এক একটির প্রাধান্যের ফলে সৃষ্টিপ্রবাহের রূপ পরিবর্তিত হয়।

তিনটি গুণের লক্ষণ ভিন্ন প্রকারের। তমঃগুণ মোহাত্মক এবং জ্ঞানকে আবৃত করে। রজঃগুণ গতিমান এবং বস্তুতে গতিসঞ্চার করে। সত্ত্বগুণ জ্ঞানের প্রকাশ করে। তমঃগুণের প্রভাবে বস্তু অবসাদগ্রস্ত হয়। রজঃ নানা কর্মের আবর্তে মানুষকে জড়ায় এবং দুঃখ উৎপাদন করে। সত্ত্বগুণ আনন্দ উৎপাদন করে। এখন জননানুক্রমিক রীতি সমস্যার সমাধানের পথে যে তিনটি অবস্থার উল্লেখ করে তাদের মধ্যেও এই গুণগুলির এক একটির প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে। দ্বন্দ্বপূর্ব অবস্থায় বুদ্ধিশক্তি তত সক্রিয় নয়; তাই চিন্তায় জড়তা আসে এবং গভীরে প্রবেশ না করে আপাতদৃষ্টিতে যা গ্রহণযোগ্য মনে হয় তাকেই সমাধান হিসাবে গ্রহণ করে। এখানে তমঃ গুণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় চিন্তাশক্তির প্রখরতার ফলে এবং অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের কথা মনে উদয় হয়। ফলে একটি দ্বন্দ্বাবস্থা এসে পড়ে। এই ভাবে যে বিতর্ক ওঠে তাতে অধিক মাত্রায় মানসিক চাঞ্চল্য উদ্ভূত হয় এবং বিভ্রান্তিকর পরিবেশে মন বিষাদগ্রস্ত হয়। তৃতীয় অবস্থায় সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে যখন একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তখন মন বিষয়টি সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করে এবং ফলে একটি মানসিক তৃপ্তি উৎপাদিত হয়। কাজেই মনে হয় সাংখ্যদর্শনের ত্রিগুণ-তত্ত্ব জননানুক্রমিক রীতির প্রতিপাদ্যকে খানিকটা সমর্থন করে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়ও একটি অনুরূপ মনোভাব পাওয়া যায়। তাঁর নিজের বক্তব্যকে পরিষ্কার করবার জন্য তিনি উপনিষদের দুটি বচনকে গ্রহণ করে তাদের নিজের মনের মত করে একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই মনোভাবটি তাঁর কাব্যে, প্রতীকধর্মী নাটকে এবং অন্যত্র নানাভাবে প্রচারিত হয়েছে। উপনিষদের যে বচন দুটি অবলম্বন করে তাঁর এই মন্তব্যটি আত্মপ্রকাশ করেছে তারা হল: 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্'[১] এবং 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'.[২] দুয়েরই তিনি এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মোটামুটি তিনি বলতে চেয়েছেন যে মানুষের মন পরিণতির পথে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় চিন্তাশক্তি স্তিমিত থাকায় জড় ও জীবের সঙ্গে তার পার্থক্য মানুষ অনুভব করে না। প্রকৃতির অঙ্গ হয়েই সে শান্তিতে বাস করে। দ্বিতীয় অবস্থায় তার জ্ঞানশক্তির

১ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥১

২ শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা ॥ মাণ্ডুক্য ॥৭

প্রখরতার বৃদ্ধির সঙ্গে সে প্রকৃতির সঙ্গে তার পার্থক্য বোধ করে; ফলে একটি বিরোধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। পরের অবস্থায় ব্যাপকতর উপলব্ধির ফলে বৃহতের মধ্যে তার সার্থক স্থান সে খুঁজে পায়। তখন তার মনে বিরোধের ভাব দূরীভূত হয় এবং শান্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি হল এই: 'প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলের সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়।"[১]

প্রথম অবস্থায় জড়তার প্রভাবে একটি শান্ত অবস্থা বিদ্যমান। তাকে সূচিত করে সত্য এবং শান্ত শব্দ দুটি। দুটিকেই তিনি সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞান গভীরে প্রবেশ করার ফলে দ্বন্দ্ব আসে। তা জ্ঞানের ফলে আসে বলে তাকে তিনি জ্ঞান কথাটির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। দ্বন্দ্বের সঙ্গে দুঃখ আসে, বিভ্রান্তি আসে বলে মানুষ তখন শিবের কামনা করে। তাই শিব কথাটির সঙ্গে দ্বিতীয় কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। পরিপূর্ণ জ্ঞানের ফলে বিরোধবোধ খণ্ডিত হয়। তাকে সূচিত করে অনন্ত শব্দটি। এই অবস্থায় সমন্বয়ের ফলে বিরোধের সমাধান ঘটে বলে তাকে অদ্বৈত শব্দটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ মানুষের বিশ্বসত্তা সম্বন্ধে উপলব্ধির পথ নির্দেশ করেছেন এবং তাঁর মন্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য উপনিষদের বচন দুটি নিজের মনের মত করে ব্যাখ্যা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে এইভাবে জননানুক্রমিক রীতির একটি ভাবগত সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় চিন্তা পরিণতির পথে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় জ্ঞানের গভীরতার অভাবহেতু মনে একটা শান্তভাব বিরাজ করে। পরের অবস্থায় জ্ঞানশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পেলে মানুষের মন নানা বিপরীত মত পোষণ করে বিভ্রান্ত হয়। মানুষ তখন শিবকে স্মরণ করে। পরে ব্যাপকতর জ্ঞানের ফলে বিপরীত মতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে আবার শান্তির অবস্থায় ফিরে আসে। ব্যাপক জ্ঞানের মধ্য দিয়ে মন এই অবস্থায় উন্নীত হয় বলে তাকে সূচিত করতে অনন্ত ও অদ্বৈত শব্দ দুটির ব্যবহার করা হয়েছে। জননানুক্রমিক রীতিও অনুরূপ সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বন্দ্ব-পূর্ব অবস্থা শান্ত অবস্থার সমস্থানীয়, দ্বন্দ্ব অবস্থা

১ আত্মপরিচয়, ৩

রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দ্বিতীয় অবস্থার সমস্থানীয় এবং দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা অদ্বৈত অবস্থায় সমস্থানীয়।

সুতরাং জননানুক্রমিক রীতি যুক্তিসম্মত। তা বিশিষ্ট মনীষীদের চিন্তায় স্বীকৃত হয়েছে। তবু মনে হয় তাকে সোজাসুজি দার্শনিক সমস্যার আলোচনায় প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। তার কারণ দুটি। প্রথমত লক্ষ্য করা যেতে-পারে যে এই রীতির ব্যবহৃত দ্বন্দ্ব-পূর্ব অবস্থাটি কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানের আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগে না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে দার্শনিক সমস্যার সমাধানের ইতিহাস বুঝতে তার একটি সার্থক স্থান আছে। কিন্তু আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এখানে সিদ্ধান্তের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া নয়, আমাদের উদ্দেশ্য বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে সব থেকে সন্তোষ-জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। সে বিষয় দ্বন্দ্বপূর্ব অবস্থায় আলোচনা বিশেষ কাজে লাগে না। কারণ তা প্রধানত সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অগভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সমাধান হিসাবে তার দার্শনিক মূল্য যৎসামান্যই। সুতরাং প্রস্তাবিত আলোচনায় তার অবতারণা সার্থক হবে না। অপরপক্ষে তা অনেকখানি স্থান অধিকার করে বসবে। এই রীতির প্রয়োগের বিপক্ষে এই হল প্রথম যুক্তি।

আরও বড় যুক্তি হল এই রীতি দার্শনিক সমস্যাকে একটি ছকে ফেলে আলোচনার প্রস্তাব করে। কিন্তু মানুষের চিন্তা এমন বিচিত্র পথে চলে যে তাকে সর্বক্ষেত্রে ঠিক ছকে ফেলে সাজানো যায় না। কোথাও যায়, কোথাও যায় না। কাজেই ছকে ফেলে সাজানোর চেষ্টা সর্বক্ষেত্রে সফল হয় না। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

বিশ্ব সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রশ্ন হল বিশ্বের প্রকৃতি কি। তা কি জড় না চৈতন্যময়। এই সমস্যা নিয়ে দর্শনে নানা জটিল বিতর্ক আছে। এখন তাদের মধ্যে কারও পক্ষপাত জড়ত্বের প্রতি কারও চৈতন্যের প্রতি। আবার বিতর্কের ফলে কোন মতকেই যুক্তিযুক্তভাবে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা যায় না দেখে এমন তৃতীয় মতেরও উদয় হয়েছে যা বলতে চায় যে বিশ্ব ঠিক জড় পদার্থও নয়, চৈতন্যময় পদার্থও নয়, তার মৌলিক অবস্থায় তা একটি তৃতীয় পদার্থরূপে ছিল এবং তা হতেই এই দুই ভিন্নধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে। এই তৃতীয় মতে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে

এখানে জননানুক্রমিক রীতি সহজেই প্রয়োগ করা যায়। কারণ এই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা বিরোধের ভিতর দিয়ে সমন্বয়ের পথে এগিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু সবক্ষেত্রে তা ঘটে না। তার উদাহরণ স্বরূপ এই প্রসঙ্গেই একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। চেতন পদার্থের সার্থক দৃষ্টান্ত হল মানুষের মন। তা বড় বিচিত্র জিনিস। তা চিন্তা করে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ করে আবার অনুভব করে। তার মধ্যে এই ত্রিমুখী ধারা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবাহিত হয় না। মনের মধ্যেই একটি নিয়ন্ত্রক শক্তি আছে যা তাদের বিশেষ পথে প্রবাহিত করে। এই নিয়ন্ত্রক শক্তিকে কেন্দ্র করে বিশেষ মানুষের মন একটি বিশেষ সত্তারূপে চিহ্নিত হয়। তাকে চিহ্নিত করতে আমরা তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করি। তা যেন সমগ্র বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র একটি সত্তা। এখন প্রশ্ন হল তাকে আত্মা বলব কিনা, মানুষের আত্মা আছে কিনা। এ প্রশ্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই আলোচিত হয়েছে। এখানে চিন্তা দুটি বিপরীত পথে প্রবাহিত হয়। একটি মত বলে মানুষের আত্মা আছে, আর অপরটি বলে মানুষের আত্মা বলে কিছু নেই, যা আছে তা কেবল উপলব্ধি পরম্পরা। এখন এই দুই মত এত বেশী মাত্রায় বিপরীত-ধর্মী যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব হয় না। যুক্তির ভিত্তিতে এদের মধ্যে একটিকেই নির্বাচন করে নিতে হয়; সমন্বয়ধর্মী তৃতীয় মত স্থাপনের এখানে সুযোগ নেই। সুতরাং এই অবস্থায় এই সমস্যাটিকে জননানুক্রমিক রীতি প্রবর্তিত ছকের মধ্যে ফেলে আলোচনা করা যায় না। তাই মনে হয় সর্বক্ষেত্রে এই রীতির প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং তাকে বর্জন করাই বিধেয়।

এখন তাহলে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনার রীতি সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে স্থাপন করতে পারি। এখানে আমরা ব্যক্তিভিত্তিক আলোচনা রীতি বা ঐতিহাসিক আলোচনা রীতি প্রয়োগ করব না। এই সিদ্ধান্তের কারণ ওপরের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা এখানে প্রত্যেক দার্শনিক সমস্যাকে পৃথকভাবে নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ আমাদের আলোচনা সমস্যাকেন্দ্রিক হবে। তাতে জননানুক্রমিক রীতিও প্রযুক্ত হবে না। কারণ আমাদের ধারণায় আলোচনার জন্য তাতে প্রস্তাবিত যে ছক আছে তার মধ্যে সকল দার্শনিক সমস্যার আলোচনা সাজানো যায় না।

আমরা প্রথমে দর্শনের মৌলিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে নির্বাচন করে নেব। তারপর প্রতি সমস্যা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান দার্শনিক মতগুলি একত্র স্থাপন করব। তারপর তাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে তা হতে একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হতে চেষ্টা করব। যেখানে সংগৃহীত মতগুলির মধ্যে সন্তোষজনক সমাধান মিলবে না মনে হবে, সেখানে যুক্তি দিয়ে বিচার করে যতদূর সম্ভব একটি মীমাংসায় পৌছানোর চেষ্টা হবে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশেষ সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন দার্শনিকের মতের আলোচনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের দর্শন হতেই মতগুলি সংগ্রহ করা হবে। সমস্যাভিত্তিক আলোচনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শনকে পৃথক করে আলোচনার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। একই সমস্যার সমাধানে যখন উভয় দেশের দার্শনিক তাঁদের প্রতিপাদ্য স্থাপন করেছেন, সেগুলি একত্র স্থাপন করে আলোচনা করাই বিধেয়। এই হিসাবে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের আলোচনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের যুগপৎ আলোচনা হয়ে দাঁড়াবে। সেই পথেই দর্শনের সামগ্রিক আলোচনা সম্ভব।

(৪)

আলোচনার ক্ষেত্র

এইবার বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলির একটি বিবরণ দেবার সময় হয়েছে। তাই এই গ্রন্থের ক্ষেত্র এবং তার ব্যাপকতা সূচিত করবে। এই প্রসঙ্গে দর্শনের সমস্যাগুলিরও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়বে; কারণ আমাদের আলোচনা এই সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে।

সাধারণভাবে বলা যায় বিশ্বের মূলগত সকল সমস্যাই দর্শনের আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। কারণ বিশ্বকে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা হতেই দর্শনের উৎপত্তি। বিশ্বের মৌলিক সমস্যা বলতে বুঝি বিশ্বের প্রকৃতি কিরূপ, তা জড় না চিৎ শক্তিবিশিষ্ট; বিশ্বের গঠন কিরূপ, তা একটি সত্তার একক প্রকাশ না বহু বিশিষ্ট সত্তার সমষ্টি; বিশ্বের উৎপত্তি হল কি করে। এই-গুলিই হল বিশ্ব সম্পর্কিত মৌলিক সমস্যা। বিশ্বের অঙ্গগুলি সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞানও আহরণ করা যায়। সে কাজের দায়িত্ব বর্তমানে নিয়েছে বিজ্ঞান;

কারণ বিজ্ঞানের যা সত্যানুসন্ধান রীতি তা এই বিষয়গুলিতে প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান আহরণ করতে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয় তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার এবং কল্পনাভিত্তিক অনুমানের ওপর নির্ভর করে সমাধান করতে হয় বলে সেগুলি বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রের বাহিরে রয়ে যায়। বিশ্বের সামগ্রিক জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিই দর্শনের বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের খানিকটা সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। উভয়েরই উদ্দেশ্য হল তথ্যগত জ্ঞান সঞ্চয় করা। তবে জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

এখন বিশ্বের পরিচয় লাভ করতে আমরা নির্ভর করি জ্ঞান নামক বস্তুটির ওপর। এটি সত্যই একটি বিস্ময়কর বস্তু। মানুষের মনে তার উৎপত্তি হলেও তার বিষয় হল সমগ্র বিশ্ব; মানুষের মন এবং মনের বাহিরে অবস্থিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ উভয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মনের জানবার চেষ্টা হতেই তার উৎপত্তি। একটি দ্বৈতভাবকে ভিত্তি করেই এই জ্ঞান সম্ভব। উপনিষদে এই বিষয়টি ভাল করে লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং সেই কারণে দৃশ্যমান বিশ্বকে দুটি ভিন্নধর্মী সত্তার সংযোগে উৎপন্ন হয় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।[১] একদিকে জ্ঞাতা ও অপরদিকে জ্ঞেয়ের পরস্পর সংযোগ না ঘটলে বিশ্ব প্রকাশ হয় না। জ্ঞাতা ব্যতিরেকে জ্ঞেয় পদার্থ থাকে কিনা সে প্রশ্ন এখানে না উত্থাপন করেও বলা চলে যে জ্ঞানের মধ্যে বিশ্বের দুটি দিক একসঙ্গে ধরা পড়ে। এই কথাগুলি উত্থাপন করার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু দেখানো যে বিশ্বে জ্ঞান নামক পদার্থটি একটি মৌলিক স্থান অধিকার করে আছে। এই কারণে জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিও বিশ্বের মৌলিক প্রশ্নগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, এ কথাও বলা যায় যে মানুষ যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তা কতখানি নির্ভরযোগ্য, তাও এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন যে তা সঙ্গতভাবেই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হয়ে পড়ে। দর্শনের উদ্দেশ্য বিশ্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান আহরণ করা। সেই জ্ঞান কতখানি নির্ভরযোগ্য তার ওপর নির্ভর করে দার্শনিক জ্ঞানের সার্থকতা। সুতরাং প্রসঙ্গতই জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যাগুলির বিস্তারিত আলোচনা দর্শনে এসে পড়ে।

তৃতীয়ত জ্ঞান বিষয়টি এমন সূক্ষ্ম যে তার আলোচনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি

১ যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তত্র ইতর ইতরং পশ্যতি ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক। ২।। ৪।। ১৪

এবং তর্কের প্রয়োগ স্বভাবতই এসে পড়ে। এই আলোচনা করতে বৈজ্ঞানিক রীতি সমর্থ নয়। দার্শনিক রীতিই এখানে প্রশস্ত। সুতরাং জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার দায়িত্ব দর্শনেরই গ্রহণ করা উচিত।

জ্ঞান বিষয়ক সমস্যাগুলির আলোচনায় দর্শনের অগ্রাধিকার এমন সকল যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখেই কাণ্ট প্রস্তাব করে বসেছিলেন যে দর্শনের অন্য সব বিষয় আলোচনা, বিশেষ করে বিশ্বগত সমস্যার আলোচনা ত্যাগ করে, কেবলমাত্র জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

কিন্তু কাণ্ট-এর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নিজের চিন্তার ফলে উপনীত সিদ্ধান্তেরই প্রতিক্রিয়া। তিনি বিশ্বসম্পর্কিত জ্ঞান কি ভাবে উৎপাদিত হয় এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এক দিকে জ্ঞাতৃরূপী মন এবং অন্যদিকে জ্ঞেয়রূপী বিশ্বের সংযোগে এই জ্ঞান উৎপাদিত হয়। বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের চেষ্টায় আমাদের মন যা পায় তা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার যুক্ত প্রচেষ্টায়। জ্ঞেয় দেয় জ্ঞানের কাঁচা মাল যাকে আমরা বলি ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য[১], এবং মন তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের গড়া ছাঁচে ফেলে জ্ঞান সৃষ্টি করে। কিন্তু যে সত্তা দুটির সহযোগে এই জ্ঞান উৎপাদিত হয় তাদের প্রকৃত পরিচয় আমাদের নিকট অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিশ্ব সম্বন্ধে যে তথ্য আহরণ করে তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে আমাদের মন বহির্জগতের পরিচয় সংগ্রহ করে, কিন্তু তার নাগালের বাহিরে যেমন একদিকে জ্ঞেয়রূপী বহির্বিশ্ব রয়ে যায় তেমনি অন্যদিকে জ্ঞাতারূপী মনও রয়ে যায়। এই দুই পদার্থকে তিনি স্বস্থিত সত্তা[২] এই নাম দিয়েছিলেন; কারণ তাঁর ধারণায় এই দুটি সত্তা বিশ্বের মূলগত সত্তা। তাঁর মতে এই দুটি সত্তাই মনের নাগালের বাহিরে রয়ে যায়।

প্রকৃত সত্তাকে এইভাবে ধরা যায় না বলে মনে হয় তাঁর মনে একটি তীব্র হতাশা বোধ গড়ে উঠেছিল এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন যে বিশ্বের মূল সত্তা যখন জানা সম্ভব নয় তখন দর্শনের সে বিষয় অনুসন্ধান করা অর্থহীন। সে ক্ষেত্রে তাঁর ধারণায় জ্ঞান-তত্ত্বকে দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। তাঁর মনে

১ Sense data
২ Thing in-itself

যে গভীর হতাশা বোধ জেগেছিল তার সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। পাউলসেন এক জায়গায় উক্তি করেছেন যে তাঁর মনের এই অবস্থায় কাণ্ট বিশ্ব-তত্ত্বকে অতল গর্তের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অন্যত্র তাকে একটি আঁধার ভরা মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন যার না আছে তটভূমি না আছে আলোকস্তম্ভ।[১] সুতরাং একরকম নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি দর্শনের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু বাস্তবিকই যে মূল সত্তাকে জানা যায় না এমন নিশ্চিত ধারণা করে বসবার আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। এ বিষয় যথাস্থানে আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় নামতে হবে। এখানে এইটুকু বললেই হবে যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটি একটি একদেশদর্শী মত। বরং সম্ভবত বিশ্বরহস্যকে ভেদ করবার ক্ষমতা মানুষের যে আছে তা ধরে নেওয়া যুক্তিদ্বারা বেশী সমর্থনযোগ্য। প্রকৃত অবস্থাটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে :

কে সে মোর কেই বা জানে,
কিছু তার দেখি আভা
কিছু পাই অনুমানে
কিছু তার বুঝি না বা।[২]

দ্বিতীয়ত বিশ্বসম্পর্কিত আলোচনাগুলিকে যদি দর্শনের আলোচনার বিষয় না করা হয় তা হলে দর্শনের কোন সার্থকতা থাকে না। বিশ্বতত্ত্বই দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়, জ্ঞানতত্ত্ব নয়। জ্ঞানতত্ত্ব আনুষঙ্গিক। বিশ্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহৃত হয় তা কতখানি নির্ভরযোগ্য, বা জ্ঞান সংগ্রহের রীতি কতখানি নির্ভরযোগ্য, এই ধরনের প্রশ্নই তার আলোচ্য বিষয়। সুতরাং তার স্থান গৌণ। মূল বিষয়কে পরিত্যাগ করলে গৌণ বিষয়ের আলোচনার কোন অর্থ হয় না। আমি যদি কোন দূর দেশে যেতে ইচ্ছা করি আমি একটি উপযুক্ত ভাবে শক্তিশালী পরিবহন যন্ত্র খুঁজব। সেই যন্ত্রের কলকব্জা কেমন ভাবে কাজ করে, তার ইঞ্জিন কতখানি শক্তি ধরে, এ সব আলোচনার অর্থ

১ "He (Kant) spoke in those days of 'the bottomless abyss of metaphysics' and of metaphysics as 'a dark ocean without shores or light house' strewn with many philosophic shipwrecks."

—Quoted by Durant in the story of Philosophy, VI

২ গীতিমাল্য, পূজা, ৫৬

হয় যদি গন্তব্য স্থানে যাবার জন্য তাকে ব্যবহার করি। যদি সেখানে যাবার সংকল্প ত্যাগ করি তা হলে যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়। এ অবস্থায় বিশ্বতত্ত্বকে বর্জন করে দর্শনের আলোচনার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত এবং তাকে গ্রহণ করা যায় না। তাকে বাদ দিলে দার্শনিক আলোচনার অঙ্গহানি ঘটে।

সুতরাং আমাদের আলোচনায় বিশ্বতত্ত্ব[১] অগ্রাধিকার পাবে। সেই সঙ্গে জ্ঞানতত্ত্বও[২] সবিস্তারে আলোচিত হবে। এই জ্ঞানবস্তুটি সত্যই অত্যন্ত জটিল জিনিস। আমাদের পরিবেশকে জানবার চেষ্টা হতে এই জ্ঞানের উৎপত্তি, কিন্তু তাকে ঘিরে কত যে রহস্য তার অন্ত নেই। জ্ঞান কি ভাবে উৎপাদিত হয়, তার উপাদান কি, আমাদের ইন্দ্রিয়বাহিত জ্ঞানে বাহিরের বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় কিনা, যাকে সত্য বলি তার প্রকৃতি কি—ইত্যাদি নানা দুরূহ প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। ফলে এমন নানা জটিল তর্কে জড়িয়ে পড়তে হয় যেখানে কেবলমাত্র যুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে অনুমান করা ছাড়া গতি থাকে না। বিজ্ঞানের রীতি এখানে আদৌ প্রযোজ্য নয়। অধিকন্তু জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি এমন একটি মৌলিক বিষয় যে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবেই তার আলোচনা প্রশস্ত।

ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব প্রাচীন কাল হতেই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করে আসছে। তার বহু উদাহরণ ভারতের তথা পশ্চিমের দর্শনের ইতিহাসে মিলবে। ঈশ্বরতত্ত্ব প্লেটো-র দর্শনে স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগে পশ্চিমের দর্শনে ধর্মতত্ত্বই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান যুগে উইলিয়ম জেমস-এর মত বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক ও ধর্মসম্বন্ধে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে নীতিতত্ত্ব ও বিভিন্ন দার্শনিকের আলোচনার বিষয় হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে এপিকিউরাস, মার্কাস অরেলিয়াস প্রভৃতির গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানকালে বেনথাম ও মিলের নীতি বিষয়ক আলোচনার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্পতত্ত্ব ও প্রাচীন গ্রীক দর্শনে এরিসটটল-এর বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর 'পোয়েটিকস' শীর্ষক গ্রন্থখানি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে ফরাসী দার্শনিক

১ Ontology
২ Epistemology

কুজ্যাঁ এবং ইতালির দার্শনিক ক্রোচে শিল্পতত্ত্বকে দর্শনের মর্যাদা দিয়ে আলোচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন।

ভারতীয় দর্শনেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছিল। বিশ্বসম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভারতীয় দর্শনে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ধর্মসম্পর্কিত সমস্যাও আলোচিত হয়েছে। ঋগবেদের কথা না হয় বাদ দিলাম, কারণ সেখানে দর্শন এবং ধর্ম এক রকম জড়িয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ্বসত্তার স্বরূপ কি, তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বা তাঁর ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় কিনা, এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব চিন্তা প্রভাবান্বিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত আলোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতির ব্যাখ্যায় বিশ্বসত্তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করবার চেষ্টা হয়েছে। ন্যায় দর্শনে ইয়োরোপীয় দর্শনের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বের নানা প্রমাণের উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে নীতিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা ও ভারতীয় দর্শনে সম্মানের স্থান অধিকার করেছে। এই প্রসঙ্গে উপনিষদে শ্রেয় ও প্রেয় বিষয়ক আলোচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে মানুষের পুরুষার্থ কি তা নানা দৃষ্টিভঙ্গি হতে আলোচিত হয়েছে। 'ভরত-নাট্যম্' শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি বিরাট গ্রন্থ। তার রচনাকাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর ফেলা যায়। তার পূর্বেও ভারতবর্ষে শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক একটি আলোচনার ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তীকালে আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ কবিরাজের বিভিন্ন গ্রন্থে শিল্পতত্ত্ববিষয়ক অতিসূক্ষ্ম ও নিগূঢ় আলোচনা সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের গৌরব বর্ধন করেছে।

ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বকে যে এইভাবে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় করে নিয়ে আলোচনার রীতি গড়ে উঠেছে তা খেয়াল-পরিচালিত নয়। মনে হয় তার পেছনে প্রবল যুক্তি আছে। তারা পরস্পরের সহিত জড়িত বলেই এই রীতি গড়ে উঠেছে। তারা সমধর্মী এবং তাদের আলোচনা রীতি একই। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় হতে তারা স্বতন্ত্র; কারণ তারা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। অপর পক্ষে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা তার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের কোন সম্পর্ক নেই; সেগুলি কেবল কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই আলোচিত হয়ে থাকে। সেগুলি সম্পূর্ণ তথ্যগত সমস্যা আর এরা ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বে

তারা যে ঘনিষ্ঠ ভাবে সমধর্মী তা একটু গভীরভাবে আলোচনা করলেই বোঝা যায়।

মানুষ যে বিশ্বের মধ্যে একটি নগন্য জীব, সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সে কীটেরও অধম তা সর্বথা স্বীকার্য। সৌর জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র গ্রহ। এমন ছোট-বড় গ্রহ সমন্বিত কোটি কোটি সূর্য নিয়ে আমাদের ছায়াপথ[১] নামে নক্ষত্রমণ্ডলী। আমাদের সূর্য তাদের মধ্যে একটি অতি সাধারণ-নক্ষত্র। এমন কোটি কোটি নক্ষত্রমণ্ডলী নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব রচিত। সুতরাং পৃথিবী বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ, একটি ধূলিকণার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। তার কোলে আশ্রিত মানুষ একটি জীব। সুতরাং বিশ্বের অনুপাতে মানুষের স্থান যে কত নগন্য তা কল্পনা করা যায় না। তবু মানুষের এই গৌরব যে তার মানসপটেই এই বিরাট বিশ্বের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। বিশ্বের এই প্রকাশ মানুষের মনকে কেন্দ্র করে। সুতরাং এক হিসাবে বিশ্বের ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র অংশ হলেও মানুষের মন বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত।

সেই মনের মধ্যে কতকগুলি আকূতি প্রোথিত আছে দেখা যায়। তারা তার সহজাত বৃত্তির মতই ক্রিয়া করে। এই আকূতি চারটি : প্রথম, জানবার আকূতি বা কৌতূহল বৃত্তি; দ্বিতীয়, বিশ্বের মূল সত্তাকে পাবার আকূতি বা ধর্মবৃত্তি; তৃতীয়, নিজের সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ের আকূতি বা নীতিবোধ; এবং চতুর্থ, শিল্পরচনা করে তার মধ্য দিয়ে শিল্পরসিকের সহিত আনন্দের সম্পর্ক স্থাপনের আকূতি বা শিল্পবোধ। মানুষ যখন প্রথম বিশ্বের কোলে স্থাপিত হয় তখন সে পৃথক। এক দিকে সে এবং অপর দিকে বিশ্ব। তার পর মানুষের জীবন যেন গড়ে ওঠে বিশ্বের পৃথক পৃথক অঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধের যোগসূত্র স্থাপন করবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এইভাবে তার একাকিত্ব খণ্ডন করে সে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। এই পথেই ব্যক্তি মানুষের জীবনের বিকাশ তথা সমগ্র মানবজাতির জীবনের বিকাশ ঘটে। উভয়কে জড়িয়ে নিয়ে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে।

মানুষের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের পরিচয় বা সম্বন্ধ গড়ে ওঠে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে। কৌতূহল বৃত্তি বা বিশ্বকে জানবার আকূতি তার প্রেরণা। যুগ যুগ ধরে কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক বিশ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় বিজ্ঞান ও দর্শন গড়ে উঠেছে। কোন ব্যবহারিক

১ Galaxy

প্রয়োজনের চাপে তা গড়ে ওঠে নি। জানবার আকৃতির তৃপ্তির জন্যই এই বিরাট সাধনা। মানুষ এই ভাবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছে তাকে জানবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

মানুষের মনের মধ্যে প্রোথিত আর একটি মূল আকৃতি হল বিশ্বের মধ্যে যে মৌলিক শক্তি ক্রিয়া করছেন তাঁকে পাবার চেষ্টা হতে। সে শক্তির বিরাটত্ব এবং কল্যাণরূপ যেমন মানুষের কাছে প্রকট হয়েছে, তেমন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার আকৃতি তার মনে তীব্র হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মানুষ তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চেয়েছে। এই চেষ্টা হতেই নানা দেশে নানা ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এই চেষ্টাকেই আমরা ধর্মবোধ বলি। তা একটি জটিল বিষয়। তাকে ভাল করে বোঝবার জন্যই ধর্মতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন হয়।

অনুরূপভাবে সমাজের সঙ্গে বিরোধহীন সংযোগ স্থাপনের আকৃতি হতে নীতিবোধের উৎপত্তি হয়। মানুষ সমাজের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সমাজের মধ্যেই বাস করে। সুতরাং সমাজের অন্য মানুষ বা মনুষ্য গোষ্ঠীর সঙ্গে তার নিত্য সংযোগ ঘটে। সেই সংযোগ যাতে না বিরোধ সৃষ্টি করে; তার জীবনের বিকাশের অন্তরায় হয়, দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই কারণে নিজের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার একটা আকৃতি মনে জাগে যাতে এই সংঘাতকে এড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তিবিশেষের সহিত সমাজের মিলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একেই আমরা নীতিবোধ বা বিবেকবুদ্ধি বলি। এই নীতিবোধের প্রবর্তনায় নানা নৈতিক আদর্শ সূচিত হয়েছে। কোথাও তা ধর্মের অঙ্গ হিসাবেও গড়ে উঠেছে; যেমন ভগবান বুদ্ধ স্থাপিত আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ। এই নীতিবোধের প্রকৃতি কি, তা কোন উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত কিনা, ইত্যাদি নানা মৌলিক প্রশ্ন ওঠে যার একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া দরকার। এই প্রশ্নসমষ্টিকে আমাদের দেশে পুরুষার্থ নামে সূচিত করা হয়েছে। পশ্চিমেও তার অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ আছে[১]। তা প্রমাণ করে মানুষের মন সকল দেশে একই ভাবে কাজ করে। এই প্রশ্নকে নিয়েই নীতিতত্ত্ব গড়ে উঠেছে।

চতুর্থ মৌলিক আকৃতি হল শিল্পবস্তু সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের আনন্দের সংযোগ স্থাপন করা। একদিকে শিল্পী ও অপরদিকে শিল্পরসিক। শিল্পী যে শিল্পবস্তু সৃষ্টি করেন তা যেন উভয়ের মধ্যে মিলনসেতু। তার মধ্য

১ Summum Bonum

দিয়েই উভয়ের আনন্দের সংযোগ ঘটে। শিল্পী শিল্পবস্তু সৃষ্টি করে শুধু আনন্দ পান না, শিল্পরসিকের সংবেদনশীল মনে তার অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখেও আনন্দ পান। শিল্পীর মনের এই যে শিল্পসৃষ্টির আকৃতি তার প্রেরণা হল আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়া। তাকে ভিত্তি করে মানুষের মনে শিল্প বোধ গড়ে ওঠে[১]। তাকে কেন্দ্র করেও মনে নানা প্রশ্ন জাগে, যেমন তার প্রকৃতি কি, শিল্পবস্তু আনন্দ দেয় কেন ইত্যাদি। এদের আলোচনা নিয়ে শিল্পতত্ত্ব গড়ে ওঠে। এর সমস্যাগুলিও মৌলিক সমস্যা।

এই ভাবে মানুষের মনের মধ্যে প্রোথিত চারটি মৌলিক আকৃতিকে ভিত্তি করেই এই বিভিন্ন তত্ত্বগুলি গড়ে ওঠে। তাদের যা প্রেরণা তা মোটামুটি একই ধরণের। সর্বক্ষেত্রেই একটি ব্যক্তিবিশেষের মনকে কেন্দ্র করে বিশ্বের নানা দিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ইচ্ছাই তাঁদের সাধারণ প্রেরণা। মানুষ এই ভাবে তার পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে নানা ভাবে সংযোগ স্থাপন করতে চায়। বিশ্বকে সামগ্রিকভাবে জানার চেষ্টায় সে জ্ঞানের পথে তার সহিত মিলিত হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের পথে সে মূল সত্তার সহিত মিলিত হয়। বিরোধহীন কর্মের পথে সে সমাজের সহিত মিলিত হয়। আর আনন্দের পথে শিল্পবস্তু সৃষ্টি করে সে শিল্পরসিকের সহিত মিলিত হয়। এই ভাবে তারা সকলেই সমধর্মী হয়ে পড়। প্রথমটিতে ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রশ্ন ওঠে না কারণ সেখানে জানার পথে মিলন। অন্য তিনটিতে ব্যবহারিক প্রয়োজন এসে পড়ে, কারণ সেখানে তিনটি ক্ষেত্রেই কর্মের পথে মিলন। ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্ম, শিল্পসৃষ্টি ও কর্ম, নীতির প্রয়োগ ত কর্মেরই ওপর। সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োজনের সহিত সম্পর্কিত হওয়া বা না হওয়া তত্ত্বগুলির গৌণ-পার্থক্য, তাদের সমধর্মী আকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা তাদের মৌলিক সাদৃশ্য সূচিত করে।

মৌলিক ব্যবহারিক সমস্যাগুলিকে দর্শনের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার সপক্ষে আরও কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। প্রথম কথা, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ববিষয়ক সমস্যা'গুলিও মৌলিক সমস্যা এবং তাদের আলোচনাও এমন সূক্ষ্ম পর্যায়ের যে তাতে বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানরীতি প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং দর্শনেরই এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনার ভার নিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাদের তথ্যগত সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১ Aesthetic Sense

দ্বিতীয় কথা, দর্শন যখন মানুষেরই বিশ্বদর্শন, মানুষকে কেন্দ্র করে যত মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির আলোচনা দর্শনেই হওয়া উচিত। দর্শনের আলোচনা কেবলমাত্র তথ্যগত[১] সমস্যায় সীমাবদ্ধ রাখলে তা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়বে। অপর পক্ষে ব্যবহারিক সমস্যার আলোচনা সংযুক্ত থাকলে, সাধারণ মানুষের কাছে তার আকর্ষণ বাড়বে। এই ব্যবহারিক সমস্যাগুলি এমন মৌলিক এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে এ বিষয় নির্ভরযোগ্য কিছু চিন্তা পেলে জীবনের নিঃসহায়তা বোধ অনেকখানি কেটে যায়। সাধারণ মানুষকে এ বিষয় চিন্তামুক্ত করবার ভার আগে ধর্মের ওপর গিয়ে পড়ত। ধর্মই তাকে এই বোধগুলির, বিশেষ করে ধর্মবোধ ও নীতিবোধের তৃপ্তি কোন্ পথে সে বিষয় উপদেশ দিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারের সঙ্গে এ বিষয় ধর্মের আবেদন শিথিল হয়ে পড়েছে; কারণ প্রচলিত ধর্মগুলি বিশ্বাসভিত্তিক এবং বিজ্ঞান যুক্তিভিত্তিক। সুতরাং এক্ষেত্রে দর্শনেরই এই দায়িত্ব নেওয়া যুক্তিসম্মত। বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই মতের সমর্থন করেন। তিনি এই কথাই বলেন যে এখন ধর্মের পরিবর্তে দর্শনের এই সমস্যাগুলির আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত[২]।

সুতরাং আমাদের আলোচনায় যেমন তথ্যমূলক[৩] সমস্যাগুলির স্থান থাকবে তেমন ব্যবহারিক সমস্যাগুলিরও[৪] আলোচনার ব্যবস্থা হবে। তথ্যমূলক সমস্যার দুটি অঙ্গ থাকবে। তাদের একটি বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবে এবং অপরটি জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে করবে। অতিরিক্তভাবে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে যে তিনটি মৌলিক আকৃতির উদ্ভব হয় তাদেরও আলোচনা থাকবে। অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব এবং শিল্পতত্ত্বও আমাদের আলোচনার বিষয় হবে।

১ Theoretical Problems

২ "If Philosophy has to play a serious part in the lives of men who are not specialists, it must not cease to advocate some way of life. In doing this, it is seeking to do something of what religion has done but with certain difference." —Unpopular Essays, Philosophy for Laymen

৩ Theoretical Problems   ৪ Practical Problems

(৫)

দর্শনের সমস্যা

এইবার আমাদের দার্শনিক সমস্যাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার সময় হয়েছে। তাতে দর্শনের ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া সহজ হবে। দর্শনের সমস্যাভিত্তিক আলোচনারীতি যতদূর জানা আছে জার্মান দার্শনিক পাউলসেনই বোধহয় প্রথম প্রবর্তন করেন।[১] সুতরাং তাঁর প্রদত্ত সমস্যাগুলির তালিকার ভিত্তিতেই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে।

পাউলসেন তালিকাটি প্রণয়ন করেছেন একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি হতে। ফলে যুক্তিভিত্তিক সকল আলোচনাই তাঁর তালিকায় স্থান পেয়েছে। সেই প্রসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানও তার মধ্যে এসে পড়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর প্রস্তাবিত তালিকার একটি কাঠামো এখানে স্থাপন করা যেতে পারে:
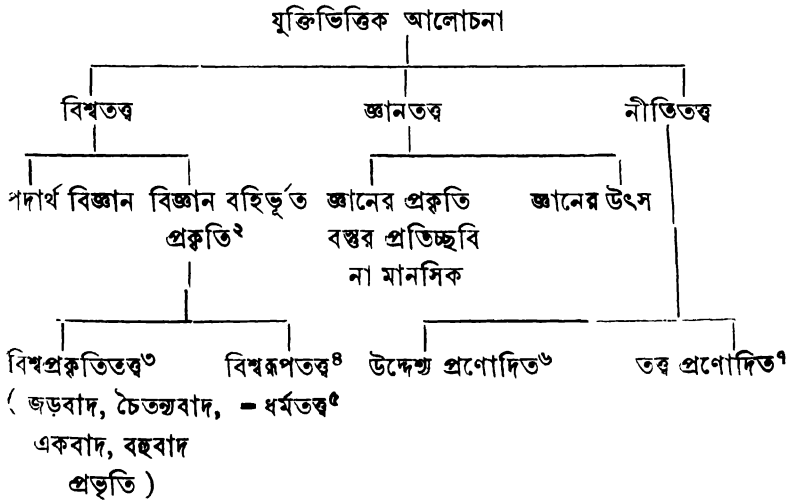
পাউলসেন-এর বিশ্লেষণের উৎকর্ষ সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া যায়। তবে মনে হয় কয়েকটি ক্ষেত্রে আরও উৎকর্ষ সাধনের অবকাশ আছে।

১ Introduction to Philosophy, Introduction
২ Metaphysics
৩ Ontology
৪ Cosmology
৫ Theology
৬ Teleological
৭ Formalistic

পূর্বেই বলা হয়েছে যে তাঁর বিশ্লেষণটি একটি অতি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি হতে করা হয়েছে। সকল যুক্তিভিত্তিক আলোচনাকেই মূল বিষয় বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় তার দরকার ছিল না। বিজ্ঞান ও দর্শনের এমন কতকগুলি প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে যা তাদের স্বভাবতই পৃথক করে দেয়। তার আলোচনা এত বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বে করা হয়েছে যে তার পুনরালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান ক্ষেত্রে দার্শনিক সমস্যাই যখন আমাদের আলোচনার বিষয় তখন বিজ্ঞানকে বাহিরে রাখাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। সেই কারণে দার্শনিক আলোচনাকেই আমরা মূল বিষয় করবার প্রস্তাব করি। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনার দর্শনে স্থান নাই।

পদার্থবিজ্ঞান বহির্ভূত বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনাকে তিনি দুটি শাখায় ভাগ করেছেন। একটির বিষয়বস্তু হল বিশ্বের প্রকৃতি, অর্থাৎ তা জড়ধর্মী না চৈতন্যধর্মী এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা তার বিষয়। অন্যটির আলোচ্য বিষয় হল তার গঠনপ্রকৃতি কিরূপ, অর্থাৎ তা একটিমাত্র উপাদানে গঠিত না বহু উপাদানে গঠিত। বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদয় হয়। তা হল সৃষ্টির উৎপত্তি কি করে হল। সম্ভবত তা হল মানুষের মনে উদ্ভূত বিশ্ব সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদেও তা উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার বর্তমানে নিয়েছে পদার্থবিজ্ঞান। কতকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হবার ফলে পদার্থবিজ্ঞানের নক্ষত্রলোকেও অনুসন্ধান চালিয়ে যাবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই বিশ্বের জড়রূপে প্রকট যে অংশ তার উৎপত্তির সন্ধানের ভার তার ওপর এসে পড়েছে। সুতরাং এই সমস্যার আলোচনা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। মনে হয় এই উদ্দেশ্যেই সম্ভবত পাউলসেন পদার্থবিজ্ঞানকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয় আমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ না করে বর্তমান আলোচনায় প্রশ্নটিকে বর্জন করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি প্রস্তাব যুক্তিসম্মতভাবে গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। তিনি বিশ্বরূপতত্ত্বকে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। কিন্তু এ দুটি বিষয়ের কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তারা পৃথক জিনিস এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। বিশ্বের রূপ বা গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমরা ভাবি, বিশ্ব কি একটিমাত্র সত্তার প্রকাশ, না বহু সত্তার প্রকাশ, না একই সত্তার অঙ্গ হিসাবে বহুকে জড়িয়ে নিয়ে এমন প্রকাশ যা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি

বস্তু। ধর্মতত্ত্বের মূল প্রশ্নগুলি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের। সেখানে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করেই প্রশ্ন ওঠে। আমরা তখন ভাবি ঈশ্বর এক না বহু; ঈশ্বরের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় কি যায় না; ঈশ্বর কি তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব হতে পৃথক না তার মধ্যেও তিনি প্রচ্ছন্নরূপে বর্তমান। সুতরাং প্রশ্ন দুটির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে ঈশ্বর তত্ত্বের কোন সংযোগ না রেখেও আলোচনা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ শংকরাচার্যের ব্রহ্মতত্ত্বের কথা উল্লেখ করতে পারি। সেখানে বিশ্বকে 'নির্বিশেষ চিন্মাত্র' বলে কল্পনা করা হয়েছে। বিশ্ব তাঁর মতে অবিভাজ্যভাবে এক। তাকে ঠিক সর্বেশ্বরবাদ বলা যায় না, তাকে বিমূর্ত একবাদ[১] বলা যায়। ধর্মতত্ত্বে এই মতের স্থান নেই, কিন্তু বিশ্বরূপতত্ত্বে এর স্থান আছে। সুতরাং ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে না রাখাই ভাল। সেই কারণে আমরা বর্তমান গ্রন্থে এই দুটি তত্ত্বের পৃথকভাবে আলোচনার প্রস্তাব করি।

পাউলসেন-এর বিশ্লেষণে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে দুটি মৌলিক প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে: **প্রথম**, জ্ঞানের প্রকৃতি ও দ্বিতীয়, জ্ঞানের উৎস। **প্রথম** প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে জ্ঞানের সঙ্গে কি বহির্বিশ্বের কোন সম্পর্ক আছে না তা একেবারেই মানসিক সৃষ্টি। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, জ্ঞান আমাদের বিশ্বসম্বন্ধে যে পরিচয় দেয় তা কি বহির্বিশ্বের প্রতিচ্ছবি না সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। দ্বিতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে জ্ঞানের উৎস কি ইন্দ্রিয় নিচয় কর্তৃক সংগৃহীত বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতা না তাতে মানসিক উপাদানও আছে। এই দুটি যে মূল প্রশ্ন তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু মনে হয় আর একটি মূল প্রশ্ন তাঁর বিশ্লেষণে বাদ পড়ে গেছে। সে প্রশ্নটি হল জ্ঞানের রীতি বা মার্গ নিয়ে। জ্ঞানের নানা রীতির কথা বিভিন্ন দার্শনিক উল্লেখ করেছেন। তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি হল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের রীতি। দ্বিতীয়টি হল পরোক্ষ জ্ঞানের রীতি। আর তৃতীয়টি হল খানিকটা উভয়েরই সমধর্মী অথচ উভয় হতে পৃথক। বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন রীতির ওপর আস্থা রাখে। চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষ রীতি ভিন্ন অন্য কোন রীতিকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞান প্রধানত প্রত্যক্ষরীতির ওপর নির্ভরশীল তবে অনুমানকে বর্জন করে না। দর্শন সাধারণত উভয়কেই গ্রহণ করে তবে তার সমস্যাগুলির প্রকৃতি মূলত

১ Abstract monism

তাকে অনুমানের ওপর নির্ভরশীল করে। কোন কোন দার্শনিক বিশ্বের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমানের পরিচয় এনে দেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। এঁদের মধ্যে শংকরাচার্য, বের্গসঁ ও ব্র্যাডলি পড়েন। তাঁদের ধারণায় এমন একটি তৃতীয় রীতির প্রয়োজন আছে যা মূল সত্তা সম্বন্ধে পরিচয় এনে দিতে পারবে। তা অনুমানের মত বিশ্লেষণধর্মী হবে না, হবে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের মত অথচ এনে দেবে বিশ্বের মৌলিক রূপের বা সমগ্র রূপের সাক্ষাৎ পরিচয়। এই তৃতীয় রীতিকে আমরা অপরোক্ষানুভূতি বলতে পারি।

এই তিনটি রীতির প্রকৃতি এবং তাদের দোষগুণ বিচার ও দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। দার্শনিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে সে আলোচনা বর্জন করলে চলবে না। তাই বর্তমান আলোচনায় এটিকে জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

ব্যবহারিক সমস্যার আলোচনার যুক্তিযুক্ততা পাউলসেন স্বীকার করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে নীতিতত্ত্ব স্থান পেয়েছে। পরোক্ষভাবে ধর্মতত্ত্বও স্থান পেয়েছে; তবে তিনি তাকে বিশ্বরূপতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে আলোচনার প্রস্তাব করেছেন। তার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে তার পৃথক আলোচনাই প্রশস্ত। সুতরাং তাকে পৃথকভাবে ব্যবহারিক সমস্যাগুলির অঙ্গীভূত করে আলোচনা করা হবে।

তাঁর তালিকায় শিল্পতত্ত্ব স্থান পায় নি। অপরপক্ষে শিল্পতত্ত্ব যে মানুষের মৌলিক বোধগুলির অন্যতম তা স্বীকার করতে হয়। এ বিষয় আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে আলোচনা করেছি; সুতরাং তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্যবহারিক সমস্যার আলোচনাকে পরিপূর্ণ করতে শিল্পতত্ত্বের আলোচনাকেও দর্শনের অঙ্গীভূত করতে হয়।

শিল্পতত্ত্ব আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হতে আলোচিত হয়ে আসছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শিল্পের উৎকর্ষের আলোচনা আছে। ইয়োরোপীয় দর্শনেও শিল্পতত্ত্ব প্রাচীনকাল হতে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। শিল্পতত্ত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে এরিস্টটল-এর মৌলিক আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্পতত্ত্বকে পাশ্চাত্য দর্শনে ঈসথেটিক[১] বলা হয়। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় সৌন্দর্য বিজ্ঞান। তার অনুসরণেই এই শাস্ত্রের বাংলা

১ Aesthetic

নামকরণ করা হয় সৌন্দর্যতত্ত্ব। কেউ বা তাকে নন্দনতত্ত্বও বলেন। কিন্তু মনে হয় তাকে শিল্পতত্ত্ব বলাই বেশী প্রশস্ত। তার সপক্ষে প্রথম যুক্তি এই যে এই শাস্ত্র শিল্পবস্তুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শিল্পবস্তু সুন্দর কিনা, বা শিল্পবস্তু আনন্দ দেয় কিনা সেগুলি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন; মূল প্রশ্ন হল শিল্পবস্তুর প্রকৃতি কি। তাই প্রকৃত বিষয়কে ভিত্তি করে নামকরণ হওয়া উচিত শিল্পতত্ত্ব। দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে এই প্রস্তাবের সপক্ষে নজির আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই প্রসঙ্গে প্রাচীনকালে নন্দন বা সৌন্দর্যের উল্লেখ পাই না, পাই শিল্প কথাটির। শিল্পবস্তুর সৌন্দর্য বা নন্দিত করবার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রাচীনকালে যে কথাটির উল্লেখ পাই তা হল রস। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে 'রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। এই রসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে।

এখন তা হলে আমাদের বর্তমান আলোচনায় দর্শনের কোন্ মূল সমস্যাগুলির আলোচনা হবে সে বিষয় একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সেই আলোচনা দুই ভাগে ভাগ হতে পারে। প্রথম আলোচ্য দার্শনিক তত্ত্বগুলির একটি তালিকা স্থাপিত হতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত মূল প্রশ্নগুলি স্থাপিত হতে পারে। তত্ত্বগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে। সুতরাং দার্শনিক প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই আলোচনা শেষ হতে পারে।

দর্শনের আলোচনাকে পরিপূর্ণ করতে হলে যে মৌলিক প্রশ্নগুলির আলোচনা প্রয়োজন হবে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সূচিত করতে আমরা নীচে স্থাপিত কাঠামোটি ব্যবহার করতে পারি :
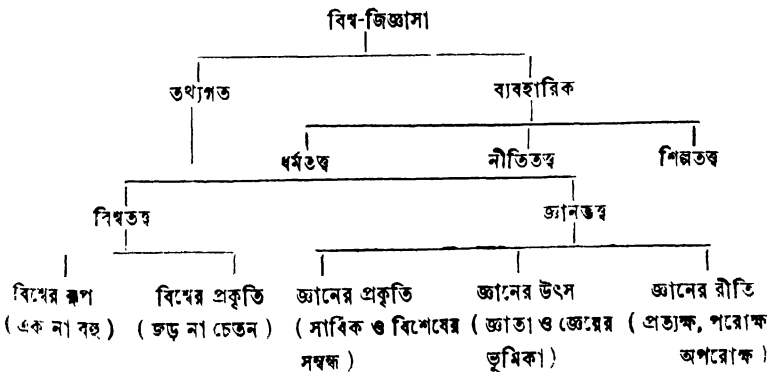
উপরের বিশ্লেষণ হতে দেখা যাবে দর্শনের বিষয়কে পাঁচটি মূল তত্ত্বে ভাগ করা যায়। তারা হল বিশ্বতত্ত্ব[১], জ্ঞানতত্ত্ব[২], ধর্মতত্ত্ব[৩], নীতিতত্ত্ব[৪] ও শিল্পতত্ত্ব[৫]। প্রত্যেকটি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে আমাদের পরবর্তী আলোচনার পথ প্রস্তুত হয়ে যাবে। আনুষঙ্গিক ভাবে তা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় দেবে। আমরা এখন প্রত্যেকটি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত মূল সমস্যাগুলির পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি।

বিশ্বতত্ত্বের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে তিনটি মূল প্রশ্ন এসে পড়ে: বিশ্বের রূপ বা গঠন কি ধরনের, বিশ্বের প্রকৃতি কি এবং বিশ্বের উৎপত্তি হল কি ভাবে। এদের প্রথম দুটি প্রশ্নকে আমরা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তৃতীয়টিকে করি নি, কারণ পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিষয়টির মীমাংসার দায়িত্ব এই যুগ্ম বিজ্ঞানের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

বিশ্বের রূপ বা গঠন কি ধরনের তার উত্তরে দুটি বিপরীতধর্মী মত স্বীকৃতি পাবার জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করে। তাদের একটি বলে বিশ্ব বহু বিশ্লিষ্ট সত্তার সমাবেশে গঠিত, তাদের মধ্যে কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। অপর মতটি বলে বিশ্ব একটিমাত্র সত্তা দিয়ে গঠিত, তার মধ্যে বিভাগের অবকাশ নেই। সুতরাং বহু এখানে অস্বীকৃত। দ্বিতীয়টিকে আমরা একবাদ বলতে পারি, যেমন শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ বা প্লেটো-র সার্বিকবাদ[৬]। প্রথমটিকে আমরা বহুবাদ বলতে পারি। তা পৃথক সত্তার আকস্মিক সংযোগের ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। যেমন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ[৭]। সুতরাং এখানে একটি বিতর্কের মধ্য দিয়ে সমস্যার আলোচনা আবর্তিত হয়। এর মীমাংসা একটিকে গ্রহণ করে এবং অন্যটিকে প্রত্যাখ্যান করে নিষ্পন্ন হবে, না অন্য একটি তৃতীয় মত গ্রহণ করা হবে—এই হল এখানে সমস্যা। তাই একে আমরা এক ও বহুর সমস্যা বলতে পারি।

বিশ্বতত্ত্ব সমন্ধে দ্বিতীয় সমস্যা গড়ে উঠেছে বিশ্বের প্রকৃতিকে প্রশ্ন করে। তার সম্বন্ধে দুটি বিরোধী মৌলিক প্রশ্ন ওঠে: বিশ্বের প্রকৃতি জড় না চেতন।

১ Ontology
২ Epistemology
৩ Theology
৪ Ethics
৫ Aesthetics
৬ Realism
৭ Scientific Materialism

অর্থাৎ তা কি মাটি বা পাথরের মত জড় বস্তুর মত, না মানুষের চিন্তার মত চৈতন্যময় পদার্থ? আপাতদৃষ্টিতে দুই ধরনের পদার্থই আমাদের চোখে পড়ে। যেখানে প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল নয় সেখানে বস্তু একেবারেই জড়। আর যেখানে প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল সেখানে তাকে আশ্রয় করে এক ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থের আবির্ভাব হয়। তাকে আমরা চেতনা বলি। আমাদের চিন্তাশক্তির মধ্যে আমরা তার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই।

এখন সাধারণত তাদের একটিকে অস্বীকার করে অপরটি গ্রহণ করার দিকে দার্শনিক চিন্তার একটি ঝোঁক দেখা যায়। ফলে একটা একদেশদর্শী ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মতকে নানা সম্ভাব্য যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করবার চেষ্টা হয়। বৈজ্ঞানিক জড়বাদ প্রাণশক্তিকে জড়ের রূপান্তর বলেই ব্যাখ্যা করে। বাতির আলোর সঙ্গে তার তুলনা করা হয়। অপরপক্ষে চেতনাবাদ জড়বস্তুর পৃথক অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাকে মানসিক সৃষ্টি হিসাবে ব্যাখ্যা করে। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের যোগাচার শাখার জ্ঞানবাদের এবং পাশ্চাত্য দর্শনে লাইবনীটজ-এর মনাতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

যাঁরা একদেশদর্শী নন তাঁরা দুই তত্ত্বকেই স্বীকার করে নেন। তাঁরা বলেন বিশ্ব অংশত জড় এবং অংশত চেতন। এইভাবে একটি দ্বৈতবাদের উৎপত্তি হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বিশ্বে বস্তু ও আত্মার যুগপৎ স্বীকৃতি তার উদাহরণ। পাশ্চাত্য দর্শনে বের্গসঁ-এর সৃষ্টিধর্মী ক্রমবিকাশতত্ত্ব তার আর এক উদাহরণ। তিনি জড়ের সঙ্গে প্রাণশক্তির সমবায়ে বিশ্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই পথেই আর এক ভিন্ন উপায়ে এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা হয়েছে। এখানে দুটি বিপরীতধর্মী মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বেশ প্রকট। পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজা-র সমান্তরালতা বাদ[১] এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর নিরপেক্ষ সত্তাবাদ[২] তার সুন্দর উদাহরণ। উভয় ক্ষেত্রেই একটি তৃতীয় বস্তু হতে জড় ও চেতন পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনেও তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। মাণ্ডুক্য উপনিষদে দৃশ্যমান বিশ্বকে দুটি বিপরীতধর্মী পদার্থের সংযোগে গড়ে উঠেছে দেখানো হয়েছে। একদিকে জ্ঞাতা, অন্যদিকে জ্ঞেয়; একদিকে ভোক্তা, অন্যদিকে ভোগ্য। প্রথমটি চৈতন্যধর্মী এবং অপরটি জড়ধর্মী। কিন্তু তাদের উভয়েরই

১ Parallelism ২ Neutral stuff

উৎপত্তি ব্রহ্মের এক মৌলিক অবস্থা হতে। সে অবস্থায় তিনি জড়ও নন চেতনও নন।

এই বিভিন্ন শ্রেণীর মতের মূল্যায়নের ভিতর দিয়েই দর্শনের এই মৌলিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। তাদের সমালোচনা এবং তাদের মধ্যে যেগুলি যুক্তিসম্মত উপাদান বলে মনে হবে তাদেরই সমন্বয়ে এই দুরূহ সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রশ্নটি এমন দুরূহ যে কোন বিশেষ দার্শনিকের মতের মধ্যে তার সম্পূর্ণ সমাধান পাওয়া সম্ভব হয় না।

তারপর আসে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি। আমাদের বিশ্লেষণে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রথম মৌলিক সমস্যা হল জ্ঞানের প্রকৃতি। আমাদের আহৃত সকল জ্ঞানই দুটি সংজ্ঞার মধ্যে একটি সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বারা সূচিত হয়। যেমন পাথর ভারি জিনিস। এখানে পাথর এবং ভারি জিনিস, এই দুটিই পৃথক সংজ্ঞা। তারা আলাদা থাকলে কোন জ্ঞানের উদ্ভব হয় না। তারা সংযুক্ত হলেই মনে একটি জ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং জ্ঞানের রূপ হচ্ছে জ্ঞানবাক্য। এই জ্ঞানবাক্যের উপাদান হিসাবে যে দুটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয় তারা বিশেষকেও নির্দেশ করতে পারে আবার সাধারণকেও নির্দেশ করতে পারে। আমাদের উদ্ধৃত উদাহরণের দুটি সংজ্ঞাই সাধারণকে সূচিত করে, কারণ পাথর কথাটি, যে কোন পাথর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। এই ধরনের সংজ্ঞাকে আমরা সার্বিক সংজ্ঞা বলি, কারণ তা অনেকের ওপর প্রযোজ্য। একটি জ্ঞানবাক্যে বিশেষ সংজ্ঞাও থাকতে পারে। যেমন, এটি একটি ফুল। এখানে 'এটি' এই সর্বনাম বিশেষকে সূচিত করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই একটি জ্ঞানবাক্যে একটি সার্বিক সংজ্ঞা থাকতেই হবে। তা না হলে জ্ঞান সম্ভব হয় না।

এইভাবে জ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি সার্বিক সংজ্ঞা একটি সম্মানের স্থান অধিকার করে বসেছে। ঠিক বলতে কি তাকে কেন্দ্র করেই এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আবর্তিত হয়। সার্বিক সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় কি করে, তা কি বাস্তবে আছে না কেবল নামে আছে, এই ধরনের নানা প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এই নিয়ে নানা সূক্ষ্ম বিতর্ক আছে। তাদের মীমাংসার ওপর এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্বিতীয় মূল তত্ত্বের আলোচনার বিষয় হল জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয়। আমরা জানি জ্ঞানকে সম্ভব করে দুটি বস্তুর সংযোগ

একদিকে জ্ঞাতা ও অপরদিকে জ্ঞেয় বস্তু, একদিকে মানুষের মন ও অপরদিকে বিশ্ব। প্রতিটি মানুষ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। একদিকে এই প্রাণধর্মী সত্তা ও অপরদিকে বহির্বিশ্ব। বিশ্বের পরিবেশে তার থাকতে হয় এবং তা হতে তার খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থা হতে আত্মরক্ষা করতে হয়। সেই জন্যই মূলত জ্ঞানের প্রয়োজন। এই বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্ভব না হলে মানুষের জীবন ধারণ সম্ভব হত না।

এই পর্যন্ত বেশ সহজে বোঝা যায়। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলে বিষয়টি নানা জটিল সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগে যে জ্ঞানের উৎপাদন হয় তা নিশ্চিত; কিন্তু সে সংযোগ কি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ? প্রথমে এই প্রশ্ন এসে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমাদের মন যে জ্ঞান লাভ করে তা যে উপাদান হতে গড়ে ওঠে তাও ত মনেরই জিনিস। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে যে তথ্য আহরণ করে তারাই তার কাঁচা মাল; কিন্তু সেগুলিও ত মনেরই মত জিনিস। সে ক্ষেত্রে সত্যই কি মনের বহির্বিশ্বের বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে? এই এই নিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনে জটিল বিতর্ক আছে। আমাদের দেশের ন্যায়দর্শনের মতে তা ঘটে। লক ও হিউম-এর মতে তা পরোক্ষ, কারণ মন কাজ করে ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যের ওপর।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উঠে পড়ে। তা হল সত্যের সংজ্ঞা কি? আমরা জানি সত্যতা[১] একটি জ্ঞানবাক্যের ধর্ম। অর্থাৎ জ্ঞান বলতে বুঝি তা দুটি সংজ্ঞার মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ সূচিত করবে যাকে সত্য সম্বন্ধ বলে আমরা বিশ্বাস করি। কাজেই এই বিশ্বাসবোধও জ্ঞানবাক্যের একটি উপাদান। বিশ্বাস বলতে এই বুঝি যে জ্ঞানবাক্যটি যে সম্বন্ধ সূচিত করছে তা বাস্তবে আছে। আমি যদি বলি পৃথিবী ঘনত্ববিশিষ্ট চারটি পাশ যুক্ত একটি বস্তু, অন্যে বলবে তা সত্য নয়। কারণ পৃথিবীর প্রকৃতরূপ ভিন্ন, তা গোলাকার ঘনত্ববিশিষ্ট বস্তু। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে সত্যতা বলতে কি বুঝব যা বাস্তবে আছে তার সঙ্গে সাদৃশ্য? যাঁরা ভাবেন যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে না, তাঁরা এ মত গ্রহণ করতে পারেন না; কারণ যার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না, তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে কিনা মিলিয়ে দেখবার উপায়

১ Truth

নেই। সুতরাং বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির ওপর নির্ভর করতে হয়। এইভাবে সত্যের এক নূতন ব্যাখ্যা এসে পড়ে এই যে তা বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য। এইভাবে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতের উদ্ভব হয়। তাদের বলতে পারি সাদৃশ্যবাদ[১] ও সুমিতিবাদ[২]। এই বিতর্কের সমাধান নির্ভর করে জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে আমাদের মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে কিনা সেই প্রশ্নের মীমাংসার ওপর। এই দুটি যুগ্ম সমস্যার সেই কারণে একই সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত তৃতীয় প্রশ্ন হল জ্ঞানের কোন্ মার্গ সব থেকে নির্ভরযোগ্য। এ বিষয় কিছু আলোচনা এই অধ্যায়েরই আগের অংশে হয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমান আলোচনা সংক্ষেপে সারা যেতে পারে। জ্ঞানের দুটি মার্গ আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে: প্রত্যক্ষ মার্গ ও পরোক্ষ বা অনুমান মার্গ। প্রত্যক্ষ মার্গের উদাহরণ হল ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলির সাহায্যে অহরহ আমরা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে এইভাবে জ্ঞান আহরণ করে থাকি। তারা প্রত্যক্ষ কিনা তাই নিয়েও দর্শনে প্রশ্ন ওঠে। তবে তারা যে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান সে বিষয় মতদ্বৈধ নেই। তবু আমরা এদের প্রত্যক্ষ বলি, কারণ এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ বলেই অনুভব করি।

দ্বিতীয় জ্ঞানের রীতি হল অনুমানভিত্তিক জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই এই জ্ঞান গড়ে ওঠে। এই জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে মনের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার বাহিরে অতীত সম্বন্ধে ও ভবিষ্যত সম্বন্ধেও এই জ্ঞান সম্ভব। আমরা অনুমানের সাহায্যে জানি যে পৃথিবীর উত্তর ভাগের ভূখণ্ড একাধিকবার তুষার দ্বারা আবৃত হয়ে গিয়েছিল। আমরা বলে দিতে পারি সুদূর ভবিষ্যতে কবে আবার সূর্যগ্রহণ হবে এবং কোন্ কোন্ স্থানে তা দেখা যাবে। এইখানেই অনুমান রীতির উৎকর্ষ। কিন্তু অপরপক্ষে তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত সুস্পষ্ট নয় এবং একই সঙ্গে সমগ্রভাবে পাওয়া জ্ঞান নয়। তা অনুমানের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড রূপে গড়ে তোলা জ্ঞান। সেই কারণেই তার ওপর একটা অশ্রদ্ধা এসে পড়ে। কোন কোন দার্শনিক তাই এমন নূতন রীতির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন যা পরোক্ষ জ্ঞানের মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হবে আবার অন্যদিকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের মত সামগ্রিকও স্পষ্টভাবে অনুভূত হবে। এই তৃতীয় রীতির জ্ঞানের প্রকৃতি অনুভূতিধর্মী

১ Correspondence Theory ২ Coherence Theory

হবে। তা তাকে এঁরা অতিমানস জ্ঞান বলে থাকেন। শংকরাচার্য, বের্গসঁ এবং ব্র্যাডলি এই ধরনের তৃতীয় রীতির সমর্থক ছিলেন।

এখানে আমাদের সমস্যা হল এই বিভিন্ন রীতিগুলির প্রকৃতির সহিত পরিচিত হওয়া এবং তাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এমনও হতে পারে তাদের একটি বিশেষ রীতির সাহায্যে বিশ্বজিজ্ঞাসার সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ উৎকর্ষ। তাদের সংযুক্ত প্রয়োগই সেক্ষেত্রে প্রশস্ত মনে হতে পারে। এই সমস্যা সম্বন্ধে এই ধরনের প্রশ্নগুলিই হবে আমাদের আলোচনার বিষয়।

মানুষের ধর্মবোধ যে একটি মৌলিকবৃত্তি এ বিষয় পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করেই ধর্মতত্ত্ব গড়ে ওঠে। মানুষ তার বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে বিশ্বের মধ্যে একটি পরমশক্তির উপস্থিতি আবিষ্কার করে। বিপদে আশ্রয়ের জন্য, আত্মোন্নতির জন্য, এমন কি কোন স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত না হয়েও কেবল শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মানুষ সেই শক্তির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। এটি মূলত হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার এবং এই আকৃতির তৃপ্তির জন্য এই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে নানা রীতির প্রবর্তন করে। প্রচলিত ধর্মগুলি তার সুন্দর উদাহরণ। বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এগুলি গড়ে ওঠে।

কিন্তু এই ধর্মবোধকে কেন্দ্র করে মানুষের যে বিভিন্ন আচরণ রীতি গড়ে ওঠে তাকে বিষয় করে নানা দার্শনিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়। তাদের উদ্দেশ্য ধর্মবোধের বহিঃপ্রকাশকে ভাল করে বোঝা, নানারীতির উপাসনা কি করে গড়ে ওঠে তার কারণ বিশ্লেষণ করা। যুক্তি দিয়ে তাদের কোনটিকে কতখানি সমর্থন করা যায়, তাও তার আলোচনার বিষয় হয়। এই প্রসঙ্গে যে মূল প্রশ্নটির উদয় হয় তা হল বিশ্বের নিয়ন্ত্রক সত্তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় কি না।

প্রশ্নটি জটিল আকার গ্রহণ করে এই কারণে যে ব্যক্তিত্ব সীমার মধ্যে পরিস্ফুট হয়। বিশ্বসত্তার মত বিরাটকে ব্যক্তিত্ব-ভূষিত করলে তাঁর অসীমত্ব খণ্ডিত হয়। কাজেই এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দুটি বিপরীত মত গড়ে ওঠে। একটি মত ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপী বলে গ্রহণ করে। তাকে আমরা ঈশ্বরবাদ[১] বলতে পারি। অন্যটি বিশ্বসত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক রূপে কল্পনা করে। তাকে

১ Theism

আমরা সর্বেশ্বরবাদ[১] বলতে পারি। ইয়োরোপীয় দর্শনের আকর্ষণ ঈশ্বরবাদের প্রতি, তবে তার ব্যতিক্রম আছে। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরবাদের ওপর আকর্ষণ তত প্রবল নয়। আনুষঙ্গিকভাবে আরও কয়েকটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। ইয়োরোপীয় দর্শনে বিষয়টি অনেক দার্শনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় দর্শনে তা সম্পূর্ণ অবহেলিত হয় নি। ন্যায়দর্শনে তার আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গেই ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নও এসে পড়ে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে মূল আলোচনাটি ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের পরস্পরের যুক্তিযুক্ততার প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

মানুষের ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত কর্মগুলির পরিচালনা সম্পর্কেই নীতিতত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত কর্মগুলির নানাভাবে প্রতিক্রিয়া হয়। তাদের কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রশ্নকে ভিত্তি করেই নীতিবোধ গড়ে উঠেছে। এই নীতিবোধ এমন একটি নিয়ামক আদর্শ খোঁজে যা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাধীন কর্মগুলির নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। কল্যাণ কোন্ পথে, এই হল নীতিতত্ত্ব বিষয়ক মূল প্রশ্ন।

এখন কল্যাণ হল তাই যা সামগ্রিকভাবে সকল বিবদমান স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন করে। এখন মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মগুলি বিরোধ ঘটায় দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একটি হল ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে এবং অপরটি হল ব্যক্তি-বিশেষের সহিত সমাজের সম্পর্ক নিয়ে। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে দুটি বিপরীত-ধর্মী উপাদান আছে: দেহ এবং মন। আত্মতৃপ্তি সাধনের জন্য যখন কাজ করি তখন প্রশ্ন ওঠে দেহের তৃপ্তিসাধন করব না মনের। এইভাবে এসে পড়ে ভোগবাদের সঙ্গে সন্ন্যাসবাদের সংঘর্ষ। অপর পক্ষে ব্যক্তিবিশেষ ও সমাজের মধ্যেও একটা বিরোধের ভাব আছে। তখন প্রশ্ন ওঠে আমাদের ইচ্ছাধীন কর্মগুলি কি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের দ্বারা হবে। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে দুটি বিরোধী মত: স্বার্থবাদ[২] ও পরার্থবাদ[৩]। এই ভাবে যেমন নানা বিপরীত মত গড়ে ওঠে তেমন তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা হয়। নিয়ন্ত্রক নীতি হিসাবে বিভিন্ন দার্শনিক কোথাও কোন উদ্দেশ্যকে নিয়ামক শক্তিরূপে স্থাপন করেন,

১ Panthiesm ২ Egoism
৩ Altruism

কোথাও বা একটি তত্ত্বভিত্তিক সূত্র স্থাপন করেন। প্রথমটির উদাহরণ পাই ভোগবাদে[১]। আমাদের দেশের চার্বাকনীতি তার সমস্থানীয়। দ্বিতীয়টির সুন্দর উদাহরণ হল কাণ্ট স্থাপিত নৈতিক আদর্শের সূত্রটি। প্রস্তাবিত কর্মের উৎকর্ষ নির্ধারণের জন্য এটি একটি সূত্র স্থাপন করে বলে, একে সূত্রভিত্তিক[২] নীতি বলা হয়ে থাকে। এই সূত্র কর্মের ফল সম্পর্কিত চিন্তা বিবর্জিত। এই বিষয় গীতার নিষ্কাম কর্ম সাধনার আদর্শের সঙ্গে তার তুলনা চলে।

এই দুই জোড়া বিরোধী তত্ত্বকে আমাদের দেশের প্রাচীন দর্শনে একটি ব্যাপকতর ধারণার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তা এমন একটি নীতি স্থাপন করে যার সাহায্যে উভয় ক্ষেত্রেই একটি সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হয়। সামঞ্জস্যের বিষয় যথাস্থানে পরে আলোচনা হবে। এখানে ধারণাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে দেহের সঙ্গে মনের স্বার্থের সংঘর্ষ এসে পড়ে তা একদেশ-দর্শিতার ফল। দেহ ও মন এই দুই নিয়ে ব্যক্তি। এখানে তারা মূল বস্তু নয়, মূল বস্তু হল ব্যক্তি। ব্যক্তির সামগ্রিক কল্যাণই এখানে কাম্য এবং তাকে উদ্দেশ্য করে নীতির আদর্শ গড়ে তোলা উচিত। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও একদেশদর্শিতার প্রভাবে গড়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজের আশ্রয়ে ব্যক্তি বিকাশ লাভ করে আবার ব্যক্তির সাধনা সমাজের ঐশ্বর্য বর্ধিত করে। সুতরাং উভয়ের সংযুক্ত কল্যাণের মধ্যেই প্রকৃত আদর্শের সন্ধান মিলবে।

এইভাবে দেখতে গেলে উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধ এসে পড়ে সংকুচিত দৃষ্টি-ভঙ্গির ফলে। সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি মনকে বিরোধের পথে টানে এবং যা আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণের বস্তু হয় মন তার দিকেই ঝোঁকে। যেমন দেহ ও মনের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মানুষ দৈহিক ভোগ-সুখের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থের প্রতি আকর্ষণ স্বভাবত বেশী হয়। এই লক্ষণগুলির ভিত্তিতে উপনিষদে এই যুগ্ম বিরোধকে সূচিত করতে প্রেয় ও শ্রেয় কথা দুটির ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম উদাহরণে দৈহিক সুখকে প্রেয় বলে সূচিত করা যায়। দ্বিতীয়টিতে

১ Hedonism

২ Formalistic Ethics

স্বার্থসাধনকে প্রেয় বলা যায়। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই আপাত দৃষ্টিতে তাদের আকর্ষণ বেশী। যা শ্রেয় তা সামগ্রিকভাবে কল্যাণ সাধন করে। তা আপাতদৃষ্টিতে হৃদয়ঙ্গম হয় না, ধীর মনে বিচার করে তবে তার সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি এখানে বিতর্ক আবর্তিত হয় প্রেয় ও শ্রেয়ের বিরোধকে কেন্দ্র করে।

শিল্পতত্ত্বের কেন্দ্রগত বিষয় হল শিল্পবস্তু। শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে যে নানা প্রশ্ন উদয় হয় তাদের পরস্পর সম্পর্ক তার সাহায্যে বেশ বোঝা যায়। আমাদের আলোচনা সেই পথেই পরিচালিত হবে। মানুষের শিল্পবস্তু সৃষ্টি করবার আকৃতি একটি মৌলিক আকৃতি। তা তার শিল্পবোধকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আর তা তৃপ্তি খোঁজে নানা শিল্পবস্তু সৃষ্টি করে। মন এখানে সৃষ্টিধর্মী হয়। সৃষ্টির মাধ্যম হতে পারে নানা জিনিস, যেমন মাটি, পাথর, তুলি, রঙ ও প্রচ্ছদ। এরা চোখে দেখা যায় এমন বাস্তব রূপ নেয়। তাই এদের দৃষ্টিভিত্তিক শিল্প[১] বলা হয়। এরা স্থায়ী রূপ পায়। আর এক শ্রেণীর শিল্প আছে যা মূলত কালের পটে পরিস্ফুট হয়, যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের অনুসরণে এদের দৃশ্য শিল্প বলতে পারি; কারণ নাট্যকে দৃশ্য কাব্য বলা হয়ে থাকে। আর এক শ্রেণীর শিল্প আছে যা আরও সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। যেমন কবিতা, উপন্যাস, গল্প। মানুষের উদ্ভাবিত ভাষাই এদের অবলম্বন। এদের তাই শ্রব্য বা পাঠ্য শিল্প বলা চলে।

এদের সকলেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। এদের বিষয়বস্তু সর্বক্ষেত্রই মানুষের হৃদয়বৃত্তির পরিস্ফুরণ। অবশ্য তাদের মাধ্যম ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে। এদের একটি আন্তর রূপ আছে এবং একটি বাহিরের রূপ আছে। প্রথমটি শিল্পীর মনে প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। দ্বিতীয়টি শিল্পবস্তু হিসাবে রসিকের সংবেদনশীল মনের কাছে আবিষ্কৃত হয়। ফলে শিল্পী এবং রসিকের মনে একটি অনন্যসাধারণ অনুভূতি জাগে। তাকে কেউ বলেন সুখ, কেউ বলেন আনন্দ। তা যে সাধারণ সুখানুভূতি হতে ভিন্ন তা সূচিত করতে ক্লাইভ বেল তাকে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি[২] বলেছেন। আমাদের অলংকার শাস্ত্রে তাকে সুখ হতে পৃথক করে চিহ্নিত করবার জন্য আনন্দ বলা

১ Visual Art

২ Aesthetice Emotion

হয়েছে। শিল্পের এই যে বিভিন্ন দিক তাদের অবলম্বন করে শিল্পতত্ত্বে বিভিন্ন প্রশ্ন উদয় হয়। শিল্পের উপাদান কি, শিল্পবস্তু কি অনুকরণভিত্তিক, শিল্পের আন্তর প্রকাশ মূল বস্তু, না বাহিরের রূপ মূল বস্তু ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ওঠে। তবে শিল্পতত্ত্বের মূল প্রশ্নটি হল স্বতন্ত্র। তা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে শিল্পবস্তু আমাদের আনন্দ দেয় কেন। প্রাচ্য অলংকার শাস্ত্রে এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বতত্ত্ব

বিশ্বের রূপ

(১)

সমস্যার প্রকৃতি

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য সমস্যা হল বিশ্বের রূপ বা গঠন প্রকৃতি কিরূপ। প্রশ্ন হিসাবে স্থাপন করলে তা এইরূপ দাঁড়ায়ঃ বিশ্ব কি একটিমাত্র আভ্যন্তরীণ বিভাগহীন সত্তা দ্বারা গঠিত না বহু বিচ্ছিন্ন পৃথক সত্তা দ্বারা গঠিত? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এই প্রসঙ্গে নানা পরস্পরবিরোধী মতের উদ্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে মূল মতগুলি নির্বাচিত করে এখানে আলোচনা করা হবে। তারপর তাদের মধ্য হতে যুক্তিসম্মত উপাদানগুলি সংগৃহীত হবে এবং তাদের সাহায্যে সমাধানের চেষ্টা হবে।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে যে পরিচয় এনে দেয় তাতে মনে হয় বিশ্ব অসংখ্য বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন বস্তুর সমষ্টি। মানুষ, নানা জীব-জন্তু, ঘর-বাড়ী, রাস্তা, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র-এরা সংখ্যাতীত, এদের পরস্পরের সঙ্গে কোন মিল নাই। এদের মধ্যে এমন পার্থক্য এবং এমন পারস্পরিক বিরোধ আছে যে তাদের পরস্পর যোগসূত্রে গ্রথিত করা যায় না, করতে গেলে বিভ্রান্ত হতে হয়। শুধু তাই নয়, এরা অস্থির, এরা স্থায়ী নয়, এরা বিনাশশীল। এরা সিনেমার ছবির মত, পর্দার দৃশ্য অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। ঘরের অভ্যন্তরে, রাস্তায় ঘাটে, প্রকৃতির বক্ষেও দৃশ্যগুলি নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে। ঘরের মানুষের নানা কাজে নিত্যব্যস্ততা, পথে যানবাহন ও যাত্রীর স্রোত অবিরাম প্রবাহিত, প্রকৃতির বক্ষে গাছপালা নিত্য পরিবর্তনশীল। গাছেরা আজ নূতন পাতায় সাজছে, কাল ফুলের শোভা ধারণ করছে, কিছু-দিন পরে ফলভারে আনমিত হচ্ছে, তারপর ফল ফেলে দিয়ে পাতা ঝরিয়ে দিয়ে নিরাভরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জগতের পরিচয় পাই তা নিত্য পরিবর্তনশীল। তৃতীয়ত আমরা বহির্বিশ্বে যাদের সহিত পরিচিত হই তারা বিনাশশীল। তারা আজ আছে কাল থাকবে না। একটি বিশেষ মানুষ শিশু হয়ে জন্মায়, বাল্য অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে,

তারপর জরাগ্রস্ত হয়ে একদিন মৃত্যুকে আশ্রয় করে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বস্তুগুলির সহিত পরিচিত হই তারা শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, তারা চঞ্চল, অস্থির ও অস্থায়ী।

এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি দেখে মানুষের মন অস্থির হয়। সেই কারণে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্বসম্বন্ধে যে পরিচয় আমরা পাই তা গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করে। যা অস্থির, যা চঞ্চল, যা পরস্পরবিরোধী এবং সর্বোপরি যা অস্থায়ী, তা কি সত্য না অলীক? মানসিক শান্তির জন্য আমাদের মন তখন যা ধ্রুব যা বিনাশশীল নয়, যা এক তাকেই সত্যের প্রকৃতরূপ বলে ভাবতে শেখে। মোটামুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যে ধর্ম, প্রকৃত সত্তাকে তার বিপরীতধর্মী বলে তা গ্রহণ করতে চায়। এই আকৃতি হতেই দর্শনের চিন্তায় বহুকে ত্যাগ করে একের প্রতি, বিনাশধর্মীকে ত্যাগ করে অবিনাশীর প্রতি, পরিবর্তনশীলকে ত্যাগ করে ধ্রুব এবং স্থিরের প্রতি আকর্ষণ গড়ে ওঠে। এ আকর্ষণ বহু কালের। উপনিষদের প্রার্থনা বাণীতে প্রথম তা শোনা গিয়েছিল।[১] ঋষি এই আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন যা সত্য আছে তাকে পেতে, যা অন্ধকারের মত বিভ্রান্তিকর নয় তার আশ্রয় নিতে, যা মরণশীল নয় তার সন্ধান পেতে।

(২)

একবাদী দর্শন

এই আকৃতি দর্শনের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক পথে বিকাশলাভ করে দুটি সমধর্মী কিন্তু পৃথক তত্ত্বের সৃষ্টি ঘটিয়েছে। উভয়েরই আকর্ষণ ধ্রুবের প্রতি, তবে সে আকর্ষণ তৃপ্তি পেয়েছে ভিন্ন পথে তার সমাধান করে। সেটা সম্ভব হয়েছে দুই ভাবে। একটি হল তুলনায় সহজবোধ্য পথে ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্ভূত বহু ও নানার জগতকে প্রপঞ্চ বা মায়া বলে ব্যাখ্যা করে এবং বিশ্বের মৌলিক রূপকে একক চৈতন্যময় সত্তা বলে গ্রহণ করে। একে আমরা বলে থাকি শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ। আর এক সূক্ষ্ম পথ আছে যেখানে বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলিকে শ্রেণী অনুসারে ভাগ করে প্রতি বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক যে সার্বিক সংজ্ঞা তাকেই প্রকৃত সত্তা বলে গ্রহণ করে। এই সার্বিক সংজ্ঞাগুলিকে ব্যাপকতা অনুসারে

১ অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা মৃতং গময়॥

সাজিয়ে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সংজ্ঞাকেই প্রকৃত একক সত্তা বলে গ্রহণ করা যায়। প্লেটো এই পথেই তাঁর সামান্যবাদ[১] গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ধারণায় এই একক সামান্য সত্তা হলেন কল্যাণধর্মী সত্তা এবং তাঁর অবস্থিতি স্থান কালের অতীতে। যা লক্ষ্য করবার তা হল ভিন্ন পথে গেলেও, উভয় তত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়েই প্রকৃত সত্তাকে এক এবং দ্বিতীয়বিহীন বলে গ্রহণ করেছে এবং উভয়েই বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে অবভাস বা বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় নয় বলে ব্যাখ্যা করেছে। এই দুই মনীষী কি বিচিত্র পথে তাঁদের এই সমধর্মী অথচ পৃথক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা তাঁদের মত দুটির আলোচনা হতে সুন্দর বোঝা যাবে। প্রথমে আমরা প্লেটো-র সামান্যবাদের আলোচনা দিয়ে সুরু করব, কারণ শংকরাচার্য হতে তিনি অনেক প্রাচীন।

প্লেটো-র দর্শনকে বুঝতে হলে আমাদের সার্বিক সংজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নিতে হবে। মানুষের মনে সার্বিক সংজ্ঞা গড়ে তোলবার একটি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। তার সাহায্যেই আমরা আমাদের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে থাকি। ইন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য সরবরাহ করে তাদের সহিত পরিচিত হতে এই সার্বিক সংজ্ঞা প্রয়োগ করতে হয়। আমি চোখে দেখছি একটি বস্তু যার চারটি পা আছে, লেজ আছে, বেরালের থেকে আকারে বড়, ঘেউ ঘেউ করে ডাকে ইত্যাদি। আমার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় তার সম্বন্ধে এতগুলি তথ্য সংগ্রহ করে এনে দেয়; কিন্তু এগুলি আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন এবং এটি যে কি ধরনের জীব তা সোজাসুজি বুঝিয়ে দেয় না। তা বুঝতে আমাদের মনে কুকুর নামে যে সার্বিক সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে এই তথ্যগুলি সংযুক্ত করতে হবে। তখনি আমাদের মন বলে উঠবে চিনেছি, এটি একটি কুকুর।

এই সার্বিক সংজ্ঞা খেয়াল মত গড়ে ওঠে না, তার একটি ভিত্তি আছে। আমাদের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা একই ধরনের গুণ সমন্বিত একাধিক জীব দেখি। তারপর তাদের সাধারণ ধর্মগুলিকে একত্রিত করে তার ভিত্তিতে এই সার্বিক ভাবমূর্তি মনের মধ্যে গড়ে তুলি। সার্বিক সংজ্ঞা একটি নাম যা এই ভাবমূর্তিকে সূচিত করে। এই ভাবমূর্তি কোন বিশেষ কুকুরের মত

১ **Realism**

প্লেটো-র ধারণায় সার্বিকই প্রকৃত সত্তা। তাই তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্ব এই নামে প্রচলিত।

নয়, অথচ তা সকল বিশেষ কুকুরের ওপর প্রযোজ্য। অতীতে যত কুকুর জন্মেছিল তাদের ওপর যেমন প্রযোজ্য তেমন বর্তমানে যত কুকুর আছে এবং ভবিষ্যতে যত কুকুর জন্মাবে তাদের ওপরও প্রযোজ্য। তা যেমন ছোট কুকুরকে সূচিত করে তেমন বৃহদাকার কুকুরকেও করে। এটা সম্ভব হয় এই কারণে যে সকল বিশেষ কুকুরের যা সাধারণ গুণ তাদের একত্রিত করে এই মানস ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। তাই জন্যই তার প্রয়োগের ব্যাপকতা এমন অসাধারণ। তা যেন সকল বিশেষের সার অংশ নিয়ে গড়ে ওঠে।

এই সার্বিক সংজ্ঞার[১] স্বরূপ কি তাই নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে তুমুল বিতর্ক আছে। এর পরিচয় দিতে নানা বিপরীত মত ব্যক্ত করা হয়েছে। মধ্যযুগে তা নিয়ে বিপুল আলোচনা হয়েছে। বর্তমানকালেও সে বিতর্কের শেষ হয় নি। লেয়ার্ড, স্টাউট, বার্ট্রাণ্ড রাসেল এর প্রকৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই জটিল বিষয়টি নিয়ে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। কাজেই এখানে প্লেটো-র দর্শনকে বুঝতে এ বিষয় যেটুকু আলোচনা একান্ত প্রয়োজন তাতেই তা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

সার্বিক সংজ্ঞার প্রকৃতি সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর মত পাওয়ায় যায়। এক-শ্রেণীর মত বলে সার্বিক সংজ্ঞা ব্যাকরণ সম্পর্কিত বিষয়; ভাবপ্রকাশ করতে আমরা তা ব্যবহার করি সুতরাং তা নামেই আছে।[২] আর একশ্রেণীর মত বলে তা মনে আছে ভাবমূর্তি রূপে।[৩] আর একশ্রেণীর মত হল তা শুধু ভাব-মূর্তি নয়, তাই হল প্রকৃত সত্তা আর ইন্দ্রিয়গোচর বহু বিশেষের জগতের সহিত যে আমরা পরিচিত তা প্রকৃত সত্তা নয়, তা তার অনুকরণ। সার্বিক শুধু সংজ্ঞা নয় তাই প্রকৃত সত্তা[৪], আর বিশেষকে যে দেখি তা হল তার ছায়া বা অনুকরণ। এই হল প্লেটো-র সামান্যবাদের[৫] সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্লেটো কেন যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বহু জাতির বিশেষকে দেখি—যেমন কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জীব, বিশেষ মানুষ, টেবিল, চেয়ার, পাথর, গ্রহ, উপগ্রহের মত নানা জড়বস্তু, তাদের প্রকৃত সত্তার ছায়া বলে উপেক্ষা করলেন তার কিছু কারণ তিনি দেখিয়েছেন।

প্রথম কারণ, যা বিশেষ তা অধ্রুব, তা চঞ্চল, তা নিত্য পরিবর্তনশীল, তা বিনাশশীল, আজ আছে, কাল থাকবে না। অপরপক্ষে সার্বিক সংজ্ঞা যাকে

১ Universal ২ Nominalism Conceptualism

৪ Real ৫ Realism

সূচিত করে তা স্থির, তা ধ্রুব, তা স্থান কালের অতীত। তাই জন্য তাকেই প্রকৃত সত্তা বলে গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয় কথা, যা বিশেষ তার মধ্যে বিশুদ্ধতা নেই, তা মিশ্রধর্মী। তার মধ্যে নানা বিপরীত ধর্ম আশ্রিত হয়ে আছে। যা এক হিসাবে ভাল তা অন্য হিসাবে মন্দ, যা এক হিসাবে একের দ্বিগুণ, অন্য হিসাবে অর্ধেক। অন্য-বস্তু-নিরপেক্ষভাবে কোন বিশেষ ধর্মকে তা আশ্রয় করে না। অপর পক্ষে সার্বিক সংজ্ঞা যাকে সূচিত করে তা অন্য-বস্তু-নিরপেক্ষভাবে যে ধর্ম প্রকাশ করে তাকেই আশ্রয় করে। সুতরাং সত্তার বিশুদ্ধরূপ সার্বিকের মধ্যেই পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় দত্ত বিশেষ সম্পর্কিত জ্ঞানকে তিনি মত[১] বলেছেন এবং সার্বিকের জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান[২] বলেছেন। কারণ, তাঁর ধারণায় বিশেষ প্রকৃত সত্তা নয়, প্রকৃত সত্তা হল সার্বিক। বিশেষ সৎও নয় অসৎও নয়, তাব মাঝামাঝি পদার্থ। সুতরাং সার্বিক শুধু সংজ্ঞা নয়, তা সত্তা; তা শুধু সত্তা নয়, তাই প্রকৃত সত্তা আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিশেষের সহিত আমরা দৃশ্যমান জগতে পরিচিত হই তা তার অনুকরণ, তার ছায়া। সার্বিকদেব নিয়েই স্থান-কালের অতীত নিত্য এবং ধ্রুব প্রকৃত বিশ্ব গড়ে উঠেছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিশ্বের পরিচয় পাই তা তার ছায়া মাত্র[৩]।

এই প্রসঙ্গেই প্লেটো-র সেই বিখ্যাত মন্তব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে যে মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই যে সে বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় হতে বঞ্চিত, তার ছায়া দেখেই তার সম্বন্ধে তার ধারণা করতে হয়। তাঁর মন্তব্যটি এই: তিনি কল্পনা করেছেন কতকগুলি মানুষ যেন মাটির অভ্যন্তরে স্থাপিত একটি গুহার মধ্যে বাস করছে। তার ওপরের অংশটা খোলা এবং সেই পথে বাহির হতে আলো আসতে পারে। তাদের কণ্ঠদেশ এবং পা দুটি এমনভাবে শৃঙ্খলিত যে তারা খোলা অংশের দিকে মুখ ফেরাতে পারে না, আজীবন তাদের তার দিকে পিছন ফিরে কাটাতে হয়। বাহিরে কিছু দূরে আগুন জ্বালানো হয়েছে। এই আগুনও তাদের মাঝখান দিয়ে একটি উঁচু পথে চলে গিয়েছে। সেই পথ দিয়ে কত যাত্রী যাচ্ছে। তাদের হাতে কত কি জিনিস, জীব-জন্তু, বিচিত্র দ্রব্য। আগুনের দীপ্তি গুহার পেছনের দেয়ালে তাদের যে ছায়া ফেলছে শৃঙ্খলিত মানুষগুলি তাই দেখছে। প্লেটো বলেন,

১ Opinion ২ Knowledge

৩ এই প্রসঙ্গে Plato-এর Republic গ্রন্থের পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

মানুষের দশাও অনুরূপ। মানুষ প্রকৃত সত্তার পরিচয় পায় না, তারা নিজেদের ছায়া বা পরস্পরের ছায়া পেছনের দেয়ালে প্রতিফলিত হতে দেখতে পায়।[১]

প্লেটো-র ধারণায় এই সার্বিক সত্তাগুলি দেশকালের অতীত রূপে বর্তমান। তারা নিত্য এবং অপরিণামী। এদের মধ্যে যা ব্যাপকতম সার্বিক তাকে তিনি যা বলেছেন তাকে বিভিন্ন দার্শনিক ইংরেজি ভাষায় 'গুড' বলে অনুবাদ করেছেন। তারকচন্দ্র রায় তাঁর দর্শনের ইতিহাসের গ্রন্থে বাংলা অনুবাদ দিয়েছেন শ্রেয়[২]; কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করায় অসুবিধা আছে। প্রথমত আমাদের দর্শনের শ্রেয়ের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। তাকে প্রেয়ের বিপরীত বলে নির্দেশ করা হয়েছে।[৩] দ্বিতীয় কথা, শ্রেয় বলতে সাধারণভাবে কল্যাণকে সূচিত করে, সুতরাং তা নীতিতত্ত্ববিষয়ক কথা। এখন প্লেটো যে কি অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তা বোঝা শক্ত। তবে ওপরে দর্শিত কারণে নৈতিক তাৎপর্য হতে মুক্ত কোন শব্দ ব্যবহার করাই প্রশস্ত। কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত 'ভাল' কথাটি চলতে পারে। তার শুদ্ধরূপ 'উত্তম'ও চলতে পারে। আমরা তাকেই 'গুড'-এর সমার্থবোধক কথা হিসাবে ব্যবহার করব। তিনি এই উত্তমকে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সার্বিক বলে গ্রহণ করেছেন। এই সার্বিকটি অন্য সকল সার্বিককে পরস্পর সংযুক্ত করে এবং তাদের মধ্যে একটি সামগ্রিক সুমিতি স্থাপন করে তাদের একত্বমণ্ডিত করে। উত্তমকে তাই তিনি সূর্যের সহিত তুলনা করেছেন। সূর্য হতে যেমন প্রাণীরা আলোক ও প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে তেমন উত্তম হতে অন্য সার্বিক তার তাৎপর্য পায়। তার আলোকেই অন্য সার্বিক প্রকাশিত ও জ্ঞানগম্য হয়।

এখন এই 'উত্তম' অর্থে প্লেটো কি বুঝিয়েছেন তা ঠিক বোঝা যায় না। এ বিষয় রীতিমত মতদ্বৈধ আছে। উইল ডুরাণ্ট-এর মতে তা তিনটি অর্থ যুগপৎ সূচিত করে। সার্বিক যে সংজ্ঞা নয়, প্রকৃত সত্তা, এ কথা যেমন বোঝায় তেমন বোঝায় তাদের পরস্পরের নিয়ম ও শৃঙ্খলা এবং তৃতীয়ত একটি আদর্শ জগতের কথাও সূচিত করে। কারণ এরা সকলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ

১ "Like ourselves. I replied ; and they see only their own shadows or the shadows of one another, which the fire throws on the opposite wall of the cave." —Republic

২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়

৩ কঠ উপনিষদ, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী।

হতে পৃথক এবং স্থান-কালের অতীত হওয়ায় স্থায়ী এবং নিত্য, অপরপক্ষে বিশেষ হতে এদের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।[১]

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন এখানে উত্তম অর্থে সম্ভবত প্লেটো এই বুঝেছেন যে দৃশ্যমান জগতের তুলনায় সার্বিকের জগৎ পূর্ণতর এবং অনবদ্যভাবে উত্তম, সুতরাং তার উত্তমত্ব অনুভব করা মানে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করা।[২] এখানে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে রাসেল যে ঠিক কি বলতে চেয়েছেন তাও বোঝা শক্ত। সার্বিকের জগৎ কেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হতে উত্তম তা একটু বিস্তারিত ভাবে বোঝা গেলে ভাল হত। সম্ভবত সার্বিকের জগতের যে উৎকর্ষ—তার নিত্যত্ব এবং বিশুদ্ধতাই তার কারণ বলে তিনি মনে করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে মনে হয় রাসেল ডুরাণ্ট প্রদত্ত তিনটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার প্রথমটি গ্রহণ করেছেন। সার্বিকের নিত্যত্বই তার উত্তমত্বের কারণ।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন প্লেটো-র সামান্যবাদ ঋগবেদের ঋততত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয়।[৩] প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা লক্ষিত হয় বেদে তাকেই ঋত বলা হয়েছে। তা বিশ্বের নিয়ামক শক্তি। সূর্য চন্দ্র যে নিয়মিত কক্ষপথে চলে, মেঘ যে বারিবর্ষণ করে, নদীর জল যে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, এ সবই ঋতের গুণে। ঋত বিশ্বের ধারক বা নিয়ামক। তাই তাকে ধারক শক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪] বরুণ-দেবতাকে ঋতের প্রযোজক দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি 'ঋতস্য গোপা'। তাঁকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা জানানো হয়েছে 'নিঋ্‌তিকে পরাঙ্মুখ

১ "These ideas, laws and ideals are more permanent and, therefore, real than the sense-perceived particular things through which we conceive and deduce them." —The Story of Philosophy, Chap. I

২ "The underlying assumption is that reality as opposed to appearance is completly and perfectly good; to perceive the good, therfore, is to perceive reality." —History of Western Philosophy, Book I, Chap. X

৩ "Every thing that is ordered in the universe has Rita for its priniciple. It corresponds to the Universals of Plato."

—Indian Philosoply, Vol. I, Chap, II

৪ ঋতদেবের অনেক দৃঢ় ধারক আহ্লাদকর রূপ আছে। —ঋগবেদ ।৪।২৩।৯

করে দূরে রাখ"[১]। রাধাকৃষ্ণন প্লেটো-র সামান্যবাদকে এই ঋতের সহিত তুলনা করেছেন। সুতরাং তাঁর ব্যাখ্যায় প্লেটো যাকে উত্তম বলছেন তা বিশ্বের নিয়ামক শক্তি। সুতরাং মনে হয় ডুরাণ্ট যে তিনটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার দ্বিতীয়টিকে রাধাকৃষ্ণণ গ্রহণ করেছেন।

ডুরাণ্ট যে তৃতীয় সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। তিনি বলেছেন 'উত্তম' কথাটি আদর্শসূচকও বটে। কিন্তু প্লেটো যে এই অর্থে তাকে প্রয়োগ করেছিলেন তা মনে হয় না। আদর্শের প্রশ্ন এখানে ঠিক ওঠে নি। এখানে প্রশ্ন উঠেছিল কোন্‌টি প্রকৃত সত্তা, ইন্দ্রিয়দত্ত বিশেষের জগৎ, না ইন্দ্রিয়ের অতীত স্থান কালের বাইরে অবস্থিত সার্বিকের জগৎ। প্লেটো যে বলতে চেয়েছেন যে দ্বিতীয়টি প্রকৃত সত্তা এবং প্রথমটি তার ছায়া তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে আদর্শ জগতের কথা অবান্তর।

প্লেটো-র সামান্যতত্ত্বের 'উত্তম' শব্দটির ব্যাখ্যায় এই বিতর্ক বুঝিয়ে দেয় যে তাঁর বক্তব্যটি অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাকে বুঝতে গেলে খানিকটা আন্দাজের ওপর নির্ভর করে অনুমান করতে হবে। মনে হয় তাঁর নিজের বক্তব্যকে অবলম্বন করেই সোজাসুজি অর্থ খোঁজা ভাল। তিনি 'উত্তম' সংজ্ঞাটিকে অন্য সার্বিকের রাজা স্থানীয় বিবেচনা করে তাকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং আরও বলেছেন যে তার আলোকেই অন্য সার্বিক প্রকাশিত ও জ্ঞানগম্য হয়। এই থেকে অনুমান করা যায় অন্য সার্বিকগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একটি সামগ্রিক সুমিতি দান করাই তার কাজ। তা বিভিন্ন সার্বিকের সংযোগসূত্র হয়ে তাদের বিন্যাস সাধন করে। সুতরাং তাকে সার্বিক জগতের নিয়ামক শক্তি বলা যায়।

মনে হয় প্লেটো-র সামান্যতত্ত্বের মধ্যে যে তত্ত্বগুলি বীজ আকারে ছিল তা প্লটিনাস-এর নব প্লেটোবাদের[২] মধ্যে বিকাশলাভ করে পরিস্ফুট হয়েছিল। সুতরাং তাঁর দর্শন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্লেটোকে বুঝতে সাহায্য করবে।

প্লটিনাস বিশ্বের ব্যাখ্যায় তিনটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাদের প্রত্যেকটি বিশ্বসত্তার প্রকাশের এক একটি ভিন্ন স্তর সূচিত করে। সবার উপরে আছেন একক সত্তা। তাকে প্লেটো-র অনুসরণে কোথাও ঈশ্বর বলা হয়েছে, কোথাও উত্তম বলা হয়েছে। তিনি বিশ্বের অতীত, তাঁর ওপর কোন

১ ঋগ্‌বেদ ॥১॥২৪॥৯

২ Neo.-Platonism.

গুণ বা ধর্ম আরোপ করা যায় না; কেবল তিনি আছেন এইটুকু বলা যায়। তিনি পরম সত্তা। উপনিষদের মৌলিক সৎ-এর সহিত তার তুলনা চলে।[১]

দ্বিতীয় তত্ত্ব হল চেতনাতত্ত্ব[২]। একে চিৎসত্তা বলতে পারি। এই চিৎশক্তি হল সেই আলোক যার সাহায্যে যিনি এক তিনি নিজেকে দেখেন। তার ফলে তিনি নিজের সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। সুতরাং এটি বিশ্বসত্তার নিজের মধ্যেই উদ্ভূত নিজের জ্ঞানরূপ। এর সঙ্গে হেগেল-এর নিরপেক্ষ সত্তা পরিকল্পনার[৩] তুলনা চলতে পারে। কারণ, তাঁর ধারণায় মূল সত্তা নৈয়ায়িক সম্বন্ধে আবদ্ধ যুক্তিযুক্ত চিন্তাসমষ্টির সমাবেশ। সমগ্র বিশ্বই এখানে সুসংবদ্ধ চিন্তাসমষ্টি বলে পরিকল্পিত হয়েছে। মৌলিক সত্তা একাধারে সামগ্রিক পূর্ণ সত্তা ও তার জ্ঞান।

তৃতীয় তত্ত্বটি হল বিশ্বাত্মা তত্ত্ব[৪]। এটি পরমাত্মার সমস্থানীয় এবং খানিকটা উপনিষদের ব্রহ্মের সহিত তুলনীয়। তিনি প্রাণী ও জড় জগতের স্রষ্টা। বিশ্বসত্তার চিৎশক্তি হতেই তার উদ্ভব। এর দুটি দিক আছে। একটি অন্তর্মুখী; সে পথে তা চিৎ-সত্তার প্রতি আকৃষ্ট। অপরটি বহির্মুখী; সে পথে তা প্রকৃতিরূপে প্রকট এবং ইন্দ্রিয়গম্য জগতের উৎপাদক। সুতরাং এই বিশ্বাত্মা যেমন জগতে বহু ও বিশেষের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে ক্রিয়াশীল, তেমন অপর দিকে মূল সত্তার[৫] দিকে আকৃষ্ট।

মনে হয় প্লেটো-র দর্শনে যে চিন্তা অস্পষ্ট ও বীজ আকারে বর্তমান ছিল তা প্লটিনাস-এর চিন্তায় পরিস্ফুট হয়েছে। প্লেটো পরিকল্পিত 'উত্তম' এখানে একক সত্তা। প্লেটো-র উত্তমের পরিকল্পনায় দুটি উপাদান ছিল। তা হল মূল সত্তার একত্ব এবং দ্বিতীয়ত তার সার্বিক সত্তাকে পরিব্যাপ্ত করে একটি সামগ্রিক সুমিতি দান করবার শক্তি। এই দুটি উপাদানকে সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করবার জন্যই এখানে প্লেটো-র উত্তমকে দুটি ভিন্ন স্তরে দুটি পৃথক সত্তা রূপে সূচিত করা হয়েছে। উত্তম-এর একত্ব সূচিত হয়েছে প্রথম স্তরের একক সত্তার পরিকল্পনায় এবং সার্বিক সংজ্ঞাগুলিকে সুসংবদ্ধ করে সাজিয়ে তার সামগ্রিক সুমিতি সূচিত করতে দ্বিতীয় স্তরে চিৎসত্তার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষের জগতকে ছায়ার জগৎ বলে কল্পনা করেছেন; কিন্তু

১ সদেব সৌম ইদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬॥২॥১

২ Nous

৩ Absolute

৪ Soul

৫ Nous

প্লটিনাস তাকে অবজ্ঞা করেন নি। তাঁর দর্শনে বিশেষের জগৎ সম্মানের না হোক তৃতীয় স্তরে একটি স্থান পেয়েছে। তাঁর মতে একটি অংশ বিচ্ছুরিত হয়ে দৃশ্যমান প্রকৃতির জগত রূপে প্রকট হয়েছে। তবু প্লেটো-র বিশেষ হতে সার্বিকের প্রতি পক্ষপাতের প্রভাব হতে তিনি একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর ধারণায় বিশ্বাত্মার বাইরের রূপে আমরা যে বহু দ্বারা বিখণ্ডিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ পাই তা নানা ত্রুটিপূর্ণ; অপরপক্ষে বিশ্বাত্মার অন্তর্মুখী দৃষ্টির মধ্যে আমরা চিৎ-সত্তার যে রূপ দেখি তা পরিপূর্ণ এবং অনবদ্য রূপ।

উপরের বিশ্লেষণ হতে সহজেই বোঝা যায় যে প্লেটো-র আকর্ষণ বিশেষের বা বহুর প্রতি নয়, একের প্রতি; যা ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয় তার প্রতি নয়, যা অবিনাশী, যা নিত্য তার প্রতি; যা চঞ্চল বা অস্থির তার প্রতি নয়, যা ধ্রুব, যা স্থির তার প্রতি। এই দিকেই তাঁর মতিগতি এবং সম্ভবত মতিগতির প্রভাবেই তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু ও বিশেষের জগতকে প্রত্যাখ্যান করে স্থানকালের অতীত এক নিত্য মানসিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থানকালের উর্ধ্বে যে ধ্রুবলোকের কল্পনা করা হয়েছে তার কি সত্যই পৃথক অবস্থিতি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে সার্বিকের পৃথক সত্তা আছে কিনা, সেই প্রশ্নের মীমাংসার ওপর। তার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে অন্যত্র প্রাসঙ্গিকভাবে আসবে। এখানে সেই বিস্তারিত আলোচনা প্রশস্ত নয়। তবু এখানে এইটুকু বলা যেতে পারে যে সার্বিকের বিশেষ হতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতির পরিচয় আমরা পাই না। ভাষা ছাড়া ভাব কল্পনা করা যায় না, বিশেষ ফুল ছাড়া ফুলের ভাবরূপের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এক্ষেত্রে সম্ভবত এরিসটটল-এর সিদ্ধান্তই সত্য। তিনি বলেন সার্বিকের অস্তিত্ব খুঁজতে হবে বিশেষের মধ্যে, বিশেষ হতে বিচ্ছিন্নভাবে তার পৃথক অস্তিত্ব নেই।

রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের চিন্তাকে গণিতের বিমূর্তরূপের দিকে আকর্ষণের সহিত তুলনা করেছেন। গণিতের প্রয়োগ ক্ষেত্র বিশেষ সংখ্যার বস্তু, কিন্তু বস্তু বা বিশেষকে উপেক্ষা করে সংখ্যা নিয়ে তার বিকাশ। গণিতের এই বিমূর্তরূপ একটা আছে কিন্তু তার প্রকটরূপ খুঁজতে হবে বিশেষের মধ্যে; তার পৃথক অস্তিত্ব কেউ কল্পনা করবেন না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন বিশ্বসত্তার প্রকাশ স্থান-কালের টানাপোড়েনে গ্রথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে নয়,

বিমূর্তলোকে নয়, তার মধ্যেই তাকে খুঁজতে হবে। এই ধরনের চিন্তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ তিনি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"প্রকাশ কোন্ খানে ? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি তাহাই যে প্রকাশ। এই-যে সম্মুখে, এই-যে পার্শ্বে, এই-যে অধোতে, এই-যে ঊর্ধ্বে— এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ-যে সমস্তই সুস্পষ্ট; এ-যে আমার ইন্দ্রিয়-মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এ বা ধস্তাৎ, স উপরিস্তাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ। এই ত প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায় ?"[১]

শংকরাচার্যের বিশুদ্ধ একবাদ বিশ্বকে একক সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করবার একটি সুন্দর উদাহরণ। তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ওপর লিখিত ভাষ্যে এবং প্রাচীন উপনিষদগুলির ব্যাখ্যায় তিনি এই তত্ত্বটি স্থাপন করেছেন। এমন মনীষা, এমন তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, এমন চতুর বিশ্লেষণ নৈপুণ্য তাঁর ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় যা মানুষের মনকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আনমিত করে।

আমরা এখন তাঁর পরিকল্পিত বিশুদ্ধ একবাদ যা অদ্বৈতবাদ নামে প্রচলিত তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব। আলোচনার আরম্ভেই শংকরাচার্যের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচিত হলে আমরা তাঁর প্রচারিত তত্ত্বটি সহজে বুঝতে পারব। প্রাচীন উপনিষদগুলিতে বার বার উল্লেখ হয়েছে যে বিশ্ব ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। তিনি বিশ্বের কারণ। এরিসটটল চার শ্রেণীর কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে দুটি আমাদের দর্শনে স্বীকৃত : উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। যেমন ঘটের ক্ষেত্রে তার উপাদান হল মৃত্তিকা ; তাই তা হল তার উপাদান কারণ। আর সেই উপাদানকে রূপান্তরিত করে কুম্ভকার ঘটের উৎপাদন করে ; তাই সে তার নিমিত্ত কারণ। এখন প্রশ্ন ওঠে বিশ্ব ব্রহ্মের কিরূপ কারণ।

শংকরাচার্য-এর উত্তর দিয়েছেন এইভাবে। তিনি বলেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ব্রহ্ম সৃষ্টির কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র। কারণ উপনিষদে অনেক স্থলে উল্লেখ আছে যে ব্রহ্ম প্রথমে সৃষ্টি করলেন[২]। এই ধরনের কার্যকারণ সম্পর্ক আমরা কার্য হতে কোন পৃথক শক্তির ওপরই আরোপ করে থাকি, যেমন ঘটের ক্ষেত্রে কুম্ভকার। কিন্তু ব্রহ্মকে এইরূপ কারণ বলে কল্পনা করলে

১ ধর্ম

২ ব্রহ্মসূত্র, শংকর ভাষ্য ।১।৪।২৬

একটি অসুবিধা এসে পড়ে। তা হলে ব্রহ্ম আর বিশ্বের একমাত্র কারণ হতে পারেন না, একটি পৃথক উপাদান কারণেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ব্রহ্মকে যুগপৎ নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ বলে মেনে নিতে হয়। তিনি একাধারে বিশ্বের উপাদান কারণও বটে নিমিত্ত কারণও বটে। ব্রহ্ম এমন স্বতন্ত্র ধরনের কারণ যে সৃষ্টিকে সম্ভব করতে তাঁকে অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয় না। একাধারে তিনি উপাদান কারণও বটে আবার সেই উপাদানকে বিশ্বরূপে পরিবর্তন করার কাজও নিমিত্ত কারণ হিসাবে তিনিই সম্পাদন করেন। কাজেই এক্ষেত্রে কুম্ভকারকে যে হিসাবে কারণ বলি সে হিসাবে তাঁকে কারণ বলা যায় না। আবার মৃত্তিকার কারণত্ব তাঁর ওপর আরোপ করা যায় না।[১]

ব্রহ্মের ওপর এইভাবে উপাদান কারণত্ব এবং নিমিত্ত কারণত্ব একসঙ্গে আরোপ করার ফলে মনে এই রকম ধারণা জাগতে পারে যে ব্রহ্ম কারণ হিসাবে এক থাকেন এবং যখন কার্যরূপে পরিণত হন তখন তিনি বহুতে রূপান্তরিত হন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক যুক্তিতে সর্বেশ্বরবাদ এসে যায়। ব্রহ্ম যখন বিশ্বের উপাদান কারণও বটেন তখন তার মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান এবং যেহেতু বিশ্ব বহু বস্তুর সমষ্টি তখন ব্যাষ্টির মধ্যেও তিনি বিরাজ করেন। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে এক, অপরপক্ষে বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে তিনি বহু হয়ে যান। তিনি একাধারে এক এবং বহু। শংকরাচার্য কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে ব্রহ্ম কারণ হিসাবে ত স্বভাবতই এক, কার্য হিসাবেও তিনি একই থেকে যান। তাঁর একত্ব তিনি কোন অবস্থাতেই বর্জন করেন না। যে ব্রহ্ম কারণ হিসাবে এক থাকেন আবার কার্য হিসাবে বহুতে রূপান্তরিত হন সে ব্রহ্মকে তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং সর্বেশ্বরবাদকে তিনি অনুমোদন করেন না। তাঁর মতে সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।

এই জন্যই তাঁর স্থাপিত তত্ত্বটি অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। তাঁর ব্যাখ্যায় ব্রহ্ম যথার্থভাবেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আপাতদৃষ্টিতে এখানে একটি অসন্তোষ-জনক অবস্থা এসে পড়ে। ব্রহ্ম যদি সকল অবস্থাতেই এক থাকেন অথচ তিনি

১ নিমিত্তং তু অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদান কারণং কুলালসুবর্ণাদীনধিষ্ঠাতৃনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে নৈব ব্রহ্মণ উপাদান কারণস্ত॥

শাঁরীরক ভাষ্য ॥১॥৪॥২৩

একাধারে বিশ্বের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ হন, তা হলে বিশ্বে যে আমরা বহু ও নানা বস্তুর সমাবেশ দেখি তার সঙ্গে ব্রহ্মের অখণ্ড একত্ব সামঞ্জস্য রাখবে কি করে?

শংকর এই পরিস্থিতিতে বিচলিত হন না। তিনি তার ব্যাখ্যা দেন এইভাবে। তিনি বলেন বহু দ্বারা বিখণ্ডিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব ব্রহ্ম হতে ভিন্ন নয়, তাও ব্রহ্ম তবে বিশ্বের মধ্যে আমরা যে তাঁকে বহু ও নানা রূপে দেখি সেইটাই ভুল। বিশ্বের কোথাও নানা নেই, বহু নেই, আছেন একমাত্র ব্রহ্ম। তবে আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বহু ও নানার অস্তিত্ব অনুভব করি তাকি মিথ্যা? তিনি এক রকম তাই বলেন। তবে ঠিক মিথ্যা বলেন না, বলেন তাকে বহু রূপে দেখাটা ভুল দেখা, আসলে তা বহু নয়। দৃশ্যমান জগত ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। জগতকে আমরা যখন বহুরূপে দেখি তখন ভুল দেখি, আসলে তা একত্ব হারায় না। পূর্ণচন্দ্রের আলো যখন স্থির জলে প্রতিবিম্বিত হয় তখন সেই প্রতিবিম্ব চাঁদ একই থাকে, কিন্তু সেই জলে যদি ঢেউ ওঠে সেই ছায়া-চাঁদ বহুরূপে বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এও সেইরকম। এখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্বতন্ত্র ধরনের। তাতে বহুতে পরিণত হবার অবকাশ নেই; যা কার্য তাই কারণ, তারা একই রয়ে যায়। কারণকে আমরা কার্যরূপে যে বহু দেখি, তা দেখার ভুল।

এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন ভোক্তৃ-ভোগার্থ সম্বন্ধ যুক্ত সংসারে প্রচলিত ব্যবহারিক রীতির ফলে কারণ কার্যে রূপান্তরিত হয়ে বহু দেখায়, কিন্তু এই বহুত্বের প্রকৃত পক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই, কারণ এখানে কার্য-কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কার্য হল আকাশাদি প্রপঞ্চময় জগত, কারণ হলেন পরম ব্রহ্ম; সেই কারণ হতে কার্যের পার্থক্য নেই, আছে অনন্যত্ব—এই বুঝতে হবে।[১]

এখন এটা বোঝা সহজ হবে যে শংকরাচার্য যে পথে ব্রহ্ম ও জগতকে কার্য-কারণ সম্বন্ধে সংযুক্ত করেন তা সাধারণত ব্যবহৃত অর্থ হতে বিভিন্ন। সাধারণত কার্যকে আমরা কারণের পরিণাম বলে নির্দেশ করে থাকি, অর্থাৎ

১ অভ্যুপগম্য চৈনং ব্যবহারিকং ভোক্তৃ-ভোগ্য-লক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিত, ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি, যস্মাত্তয়োঃ কার্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম, তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্যস্যাবগম্যতে॥ শারীরক ভাষ্য ॥২॥১॥১৪

কার্যকে কারণের রূপান্তর বলে গ্রহণ করি। তিনি কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুদ্বারা বিখণ্ডিত বিশ্বকে ব্রহ্মের পরিণাম বলে গ্রহণ করেন না। তাঁর মতে তা ব্রহ্মের বিকৃত রূপ; তাই তাকে এখানে পরিণাম না বলে বিবর্ত বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিশ্ব ব্রহ্মের রূপান্তর নয়, সৃষ্টি এবং ব্রহ্ম একই জিনিষ। সৃষ্টির মধ্যে আমরা যে ব্রহ্মের অখণ্ড একরূপ উপলব্ধি না করে বহুকে অনুভব করি সেটি আমাদের অনুভূতির দোষ। এখানে পরিণাম ঘটে নি, ঘটেছে বিবর্ত। আমাদের অনুভূতি শক্তির অক্ষমতা হেতুই এমন ঘটে থাকে, যেমন জলের মধ্যে আংশিকভাবে অনুপ্রবিষ্ট সোজা লাঠিকে আমরা বাঁকা দেখি। যখন দুধ রূপান্তরিত হয়ে দই হয় তখন আমরা পাই পরিণামকে। আর যখন রজ্জু চোখের দেখার ভুলে সর্প বলে মনে হয়, তখন আমরা পাই বিবর্তকে। যে শক্তি এই চোখে দেখার ভুল ঘটায় তা হল মায়া, যেমন রজ্জুকে সর্প বলে ভুল করবার কারণ হল অন্ধকার। এই শক্তিটির এমন ক্ষমতা আছে যা ব্রহ্মের প্রকৃত রূপটিকে আবৃত করে রাখে এবং একটি বিকৃত রূপকে জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলির নিকট স্থাপন করে। ফলে আমরা প্রকৃত রূপকে দেখতে পাই না, দেখতে পাই বিকৃত রূপকে। কাজেই এই যে বহুর জগত, নানার জগত, তা যে একেবারে ভিত্তিহীন তাও বলা চলে না। তা ব্রহ্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তা ব্রহ্মই, কিন্তু দেখার ভুলে আমরা তার একত্ব উপলব্ধি করি না, তাকে বহুরূপে দেখি। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুদ্বারা বিখণ্ডিত বিশ্বকে তিনি একেবারে মিথ্যা বলতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে তা সত্য ও মিথ্যার মধ্যবর্তী জিনিষ। তাই তাকে তিনি 'সদসৎ' বলেছেন, অর্থাৎ খানিকটা সৎও বটে খানিকটা অসৎও বটে। তা একাধারে আছে এবং নেই।

শংকরাচার্যের ধারণায় ব্রহ্মের বিশুদ্ধ এবং অবিকৃতরূপে তাঁর দুটি মাত্র বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম, তিনি সৎ অর্থাৎ আছেন, দ্বিতীয়, তিনি চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞাতৃরূপী। চিৎশক্তির বিকার তিনি নন, তাঁর প্রকৃতিই চিৎস্বরূপ, যেমন লবণের লবণত্ব প্রকৃতি। আমরা দ্বৈতবোধের ভিত্তিতেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে পেয়ে থাকি, জ্ঞেয় না থাকলে জ্ঞাত কি করে থাকে ভেবে পাই না। তিনি কিন্তু বলেন জানবার কিছু না থাকলেও ব্রহ্মের জ্ঞাতৃরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে। কোন অবস্থাতেই তাঁর জ্ঞানশক্তির বিলোপ ঘটে না। ব্রহ্মকে তিনি তাই 'নির্বিশেষ-চিন্মাত্র' বলে বর্ণনা করেছেন। মহাশূন্যে কিরণকে প্রতিফলিত করতে কিছু থাক বা নাই থাক, সূর্য সেখানে কিরণ বিকীরণ করে চলে।

ব্রহ্মেরও সেইরকম জ্ঞানের বস্তু কিছু থাক বা না থাক জ্ঞাতৃরূপ চির বিরাজমান।[১]

অল্প কথায় শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে দেওয়া হল। এ হতে দেখা যাবে যে প্লেটো-র সামান্যবাদের সঙ্গে তার প্রকৃতির সাদৃশ্য আছে। ঠিক বলতে কি তাদের সাদৃশ্য গভীর। প্রথমত, উভয়েরই আকর্ষণ বহুকে বর্জন করে একের প্রতি। উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে মূল সত্তা বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন, তাকে প্রতিভাসের স্বীকৃতি-মাত্র দিতে চান। দ্বিতীয়ত উভয়েই তাকে একেবারে অলীক বলে প্রত্যাখ্যান করেন না। তাকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর সত্তার মর্যাদা দিতে তাঁরা প্রস্তুত। প্লেটো বলেন বিশেষের জগত প্রকৃত জগতের ছায়া, আর শংকর বলেন তা প্রকৃত সত্তার বিকৃত রূপ, তা মায়া। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, তাঁরা তার প্রকৃতি বর্ণনা করতে একই ধরণের পরিভাষাও ব্যবহার করেছেন। যেহেতু তা মূল সত্তার প্রকৃত পরিচয় দেয় না, শংকরাচার্য তাকে সদসৎ বলেছেন। একই কারণে প্লেটো তাকে সৎ ও অসৎ-এর মধ্যবর্তী স্থানীয় পদার্থ বলে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়ত, আর একটি মূল সাদৃশ্য হল তাঁরা উভয়েই মূল সত্তাকে চেতনারূপী বলেছেন। তাঁরা দুজনেই চেতনাবাদী[২]। সাধারণভাবে উভয়েই বহুকে ত্যাগ করে একের প্রতি আকৃষ্ট। বিশ্বের বিশুদ্ধভাবে একত্ব, অখণ্ড একত্ব উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয়।

এখন প্রশ্ন হল শংকরের অদ্বৈতবাদ কতখানি যুক্তিদ্বারা সমর্থিত। এ বিষয় আলোচনা করবার পূর্বে বহুবাদী দার্শনিক মতগুলি স্থাপন করা প্রয়োজন। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ের শেষ অংশেই তার পরিপূর্ণ আলোচনা প্রশস্ত। তবু এখানে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে। তা শংকরাচার্যের মতিগতি কোন পথে সে বিষয় আলোকপাত করবে।

প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে তাকে একটি সামগ্রিক রূপ দেবার জন্য বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। শংকরাচার্য এই গ্রন্থের ভাষ্য সূত্রেই তাঁর অদ্বৈতবাদ মূলত প্রতিষ্ঠা করেন। তার পূর্ণতর সমর্থনের জন্য তিনি প্রাচীন উপনিষদগুলির ওপরও ভাষ্য লেখেন; কারণ

১ শারীরক ভাষ্য ।।২।।৩'১৮

২ Idealist

ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের আপ্তবচনের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষ্যগুলির মধ্যেই পরোক্ষভাবে অদ্বৈতবাদের জন্ম। উপনিষদে প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি তা প্রবর্তিত করেন।

এখন প্রশ্ন ওঠে প্রাচীন উপনিষদগুলি কি তাঁর প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদকে সমর্থন করে? এখানে সংক্ষেপে তার উত্তর দেবার চেষ্টা হবে। মনে হয় উপনিষদে প্রত্যক্ষভাবে অদ্বৈতবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে পরোক্ষ-ভাবে সমর্থক তার কিছু বাণী পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শংকরাচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বচনের রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে তার সমর্থন খুঁজেছেন।[১] কিন্তু এই রূপক ব্যাখ্যা কতখানি সমর্থনযোগ্য তার নিশ্চয়তা নেই। তার থেকেও নির্ভরযোগ্য সমর্থক বাণী কিছু পাওয়া যায়। তা বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির মধ্যে আছে। তার উল্লেখ করবার আগে কিছু প্রাথমিক কথা বলা প্রয়োজন।

ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সম্ভব করতে হলে দুটি বিভিন্নধর্মী সত্তার প্রয়োজন। তার একটি জানবার ক্ষমতা রাখে, অন্যটি তার জ্ঞানের বস্তু হবার ক্ষমতা রাখে। এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতেই বহু ও বিচিত্র বস্তুর সমষ্টি এই বিশ্ব প্রকট হয়। যেখানে এই দ্বৈতবোধ নেই সেখানে এই বহুদ্বারা বিখণ্ডিত বিশ্বের প্রকাশও নেই। দ্বৈতের ভিত্তিতে যার প্রকাশ তার সীমা আছে, কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পরের ওপর সীমা টেনে দেয়। দ্বৈতের বাহিরে যার প্রকাশ তা সীমাহীন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যা বলেছেন তা মোটামুটি তাই, তবে তার অতিরিক্ত কিছু ঈঙ্গিতও আছে। তিনি বলেছেন যেখানে দ্বৈতের মত হয় সেখানে একজন অপরকে আঘ্রাণ করে, একজন অপরকে দেখে, একজন অপরকে শোনে, কিন্তু যেখানে আত্মা (অর্থাৎ ব্রহ্ম) ভিন্ন অপর কিছু থাকে না, সেখানে কে কাকে আঘ্রাণ করবে, কে কাকে দেখবে, কে কাকে শুনবে? দ্বিতীয় বিহীন অবস্থায় সেই বিজ্ঞাতৃরূপী ব্রহ্মকে কে জানবে?[২]

১ ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ।। বৃহদারণ্যক ।।২।।৫।।১৯ মনে হয় ঋগবেদ ।।৬।।৪৭।১৮ হতে তা উদ্ধৃত।

২ যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি ইতর ইতরং পশ্যতি ইতর ইতরং শৃণুতে… …যত্র বাস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ।।২।।৪।১৪। ও ৪।।৫।।১৫

এখানে 'দ্বৈতমিব' কথাটির তাৎপর্য খুব গভীর। দুয়ের মত হয় বললে মনে হয় যেন যাজ্ঞবল্ক্য বলতে চেয়েছেন দ্বৈতভাবটি ব্রহ্মের প্রকৃত ভাব নয়, তা একটি কৃত্রিম অবস্থার মত। তা যদি হয় তা হলে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে ব্রহ্মের যে বহু দ্বারা খণ্ডিত ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত রূপের পরিচয় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় তা যেন তাঁর ঠিক রূপটি প্রকাশ করে না। শুধু তাই নয়, দ্বৈতভাববিহীন অবস্থায় ব্রহ্মের যে রূপটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তাকে তিনি বিজ্ঞাতৃরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। তা হলে তাঁর বচনগুলির মধ্যে ব্রহ্মের প্রকৃতরূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম, তিনি অখণ্ডভাবে এক, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে বহু ও নানারূপে খণ্ডিত রূপ তাঁর প্রকৃত পরিচয় নয়। দ্বিতীয়, তাঁর যা অখণ্ডরূপ তা জ্ঞাতৃরূপী। একই উপনিষদে অন্যত্র তিনি আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : তিনি বলেছেন জ্ঞেয় বস্তু না থাকলেও ব্রহ্ম তাঁর জ্ঞাতৃরূপ মোচন করেন না, তার কারণ তাঁর দ্রষ্টৃরূপ তাঁর সঙ্গে নিত্য বর্তমান তা বিনাশশীল নয়, জ্ঞেয়-নিরপেক্ষভাবে তাঁর জ্ঞাতৃরূপ।[১]

এই বাণীগুলির মধ্যেই শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের অঙ্কুররূপ পাওয়া যায়। তার দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের এখানে সমর্থন আছে—ব্রহ্মের অখণ্ডতা ও চিন্ময়তা। বাকি যে বৈশিষ্ট্যটুকু রইল—ইন্দ্রিয় গোচর বিশ্বের যে বৈচিত্র্যময় বহুদ্বারা খণ্ডিত প্রকাশ তার অসারতার—এখানে যেন পরোক্ষভাবে সমর্থন পাওয়া যায় 'দ্বৈতমিব' এই উক্তিটির মধ্যে।

অপরপক্ষে উপনিষদের বচনগুলির মধ্যে এমন একটি ভাবধারা পাওয়া যায় যা ইন্দ্রিয় গোচর রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে বিচিত্র জগতকে ব্রহ্মের নিজস্ব প্রকাশ বলেই গ্রহণ করেছে। তা যে চোখের দেখার ভুল বা ভ্রান্ত ধারণা বা ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ নয়, এ ধরনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে উপনিষদ হতে কিছু উক্তি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, এই যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, ব্রহ্মেই তাদের অবস্থিতি, ব্রহ্মেই তাদের বিলয়।[২] শুধু তাই নয়

১ যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্ দৃষ্টের্ বিপরিলোপো বিদ্যতেঽ বিনাশিত্বাৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪॥৩॥২৪

২ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৩॥১৪॥১

এমন স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যায় যে ব্রহ্মের যেন তাঁর একক অদ্বিতীয় রূপ হতে বহুদ্বারা খণ্ডিত বৈচিত্র্যময় রূপের প্রতিই আকর্ষণ বেশী। একাধিক উপনিষদে তার সমর্থক উক্তি পাওয়া যায়। তার একটির উল্লেখ এখানে করলেই যথেষ্ট হবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে আত্মা বা ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় রূপেই পূর্বে ছিলেন।[১] কিন্তু একা থাকলে ত তাঁর রসোপলব্ধি হয় না, তাঁর আনন্দময় রূপ প্রকট হয় না, তাই তিনি বহু হতে চাইলেন।[২] তখন তিনি নিজেকে দুই করলেন। তখন জ্ঞাতা এল জ্ঞেয় এল, শ্রোতা এল শ্রোতব্য এল, ঘ্রাতা এল ঘ্রাতব্য এল, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধে ভরা বিচিত্র বিশ্ব এল। উপনিষদের ঋষি বলেন ব্রহ্মের নিজস্ব তৃপ্তির জন্যই এমন ঘটল। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি প্রকাশ হত না যে। তখন বিশ্ব জুড়ে দ্বৈত-সঙ্গীতের ধারা ছড়িয়ে পড়ল। তখন বিশ্বের সব কিছু মধুসিক্ত হল। তখন আনন্দের উৎস উৎসারিত হল। ঋষি ব্রহ্মের সেই দ্বৈত-মণ্ডিত প্রকট রূপটিকে অভিবাদন জানালেন 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে।[৩]

উপরের আলোচনা হতে যা পাই তা সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির মধ্যে এমন কিছু মন্তব্য পাওয়া যায় যা শংকরাচার্যের প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের সমর্থন করে। অপরপক্ষে বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে যে মূল ভাবধারাটি গড়ে উঠেছে তা বহুকে জড়িয়ে নিয়ে পরম সত্তার একত্ব প্রচার করে, বহুকে মায়া বলে পরিহার করে না। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে যেন মনে হয় এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে অদ্বৈতবাদের বীজ উপনিষদে আছে, কিন্তু উপনিষদ বহু দ্বারা খণ্ডিত দৃশ্যমান বিশ্বকে প্রত্যাখ্যান করে নি।

শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগে ভারতের এক বিখ্যাত মনীষী ছিলেন। তাঁর মন্তব্যে আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিপাদ্য হল এই। ব্রহ্মসূত্র হল উপনিষদের বচনগুলির মধ্যে বিকশিত বেদান্ত দর্শনের সংকলন গ্রন্থ। সুতরাং তার ব্যাখ্যা করতে হবে উপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। শুধু তাই নয়, উপনিষদের দর্শনের সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলে

১ আত্মা বা ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ বৃহদারণ্যক ।.১॥৪'।১

২ স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥১॥৪॥৩

৩ মুণ্ডক । ২॥৭

আরও একটি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেখানে যে চিন্তাধারা মুখ্য স্থানীয়, যে ভাবধারা মূল স্থান অধিকার করে আছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাতেই ব্যাখ্যা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য হবে। অপরপক্ষে গৌণ ভাবধারা যদি ব্যাখ্যার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় তা হলে তা নির্ভরযোগ্য হবে না। তাই চৈতন্যদেব বলেছেন,

উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব
মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।[১]

তাঁর অভিযোগ অদ্বৈতবাদে শংকরাচার্য উপনিষদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মুখ্য ভাবধারা অবলম্বিত হয় নি। তিনি গৌণ ভাবধারা অবলম্বন করে ভাষ্য রচনা করেছেন।[২] শুধু তাই নয়, তিনি মুখ্য অর্থকে আচ্ছাদন করেছেন।[৩] সেই মুখ্য ভাবধারা অদ্বৈতবাদের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না, কারণ তা বহুকে গ্রহণ করেছে, প্রপঞ্চ বলে ত্যাগ করেনি।

মনে হয় এক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের প্রতি শংকরাচার্যের আকর্ষণ তাঁর মতিগতির পথে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। তা না হলে মুখ্য ভাবধারাকে তিনি গ্রহণ করলেন না কেন? সম্ভবত এ বিষয় তাঁর অগ্রজ দার্শনিক গৌড়পাদের অভিমতও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে স্বপ্নাবস্থার খানিক তুলনা চলে এবং তাকে ভিত্তি করে গৌড়পাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে যা প্রকৃতিতে অদ্বয় চিৎশক্তি স্বরূপ তার মধ্যে দ্বৈতবোধের আভাস ঘটতে পারে, সুতরাং তা উপেক্ষণীয়। উভয় অবস্থাতেই জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতে বহু বস্তুর উপলব্ধি হয়। স্বপ্নাবস্থায় স্পষ্টত দেখা যায় তা মনের সৃষ্টি এবং বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং বাস্তব অবস্থায় দ্বৈত্যবোধের ভিত্তিতে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পরিচয় পাই তাও প্রতিভাস মাত্র হওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনা তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যেমন স্বপ্নে দ্বৈতভাবাপন্ন হয়ে মন মায়া দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমন জাগ্রত অবস্থাতেও মন মায়াদ্বারা পরিচালিত হয়। এ কথা সন্দেহাতীত যে মন একক হয়েও স্বপ্নে দ্বৈতভাবাপন্ন হয়, তেমনি এও সন্দেহাতীত যে যা

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য চরিতামৃত, সপ্তম পরিচ্ছেদ
২ গৌণবৃত্ত্যে যে বা ভাষ্য করিলা আচার্য। ঐ
৩ গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া। ঐ

অদ্বয় তা জাগ্রত অবস্থায় দ্বৈতভাব সংযুক্ত হয়।[১] বলা বাহুল্য, এখানে যুক্তি তুলনা-ভিত্তিক,[২] সুতরাং তা দুর্বল এবং নির্ভরযোগ্য নয়।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। তা হল চৈতন্যদেবের অনুসরণে কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথও এই অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ করেছেন। অবশ্য উপনিষদের ব্যাখ্যার যথার্থতা সূত্রে তিনি তা করেন নি। তিনি তা করেছেন এই কারণে যে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা শংকরাচার্যের প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের সমর্থন করে না। তাঁর সে প্রতিবাদ সুন্দর ভাষায় নানা কবিতায় ছড়ানো আছে। তার মর্ম কথা হল এই: রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় ঋতুর সাজি নিয়ে এই যে প্রকৃতি আমাদের নয়নরঞ্জন করছে, মহত্ত্ব-নীচতা, হাসি-কান্না জড়িয়ে মানুষের আচরণ যে আমাদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করছে, এর মধ্যেই বিশ্বসত্তার প্রকাশের আস্বাদ পাওয়া যায়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, প্রিয়জনের প্রীতির মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্ব সত্তারই স্পর্শ অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি সংসারে 'অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের সহিত পরিচিত হয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর খেদোক্তির মধ্যে এই হতাশভাবের গভীরতার পরিচয় আমরা সুন্দরভাবে পাই। প্রাসঙ্গিক কবিতার অংশটি এই:

হারে নিরানন্দ দেশ পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।
লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহ কোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব বসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।[৩]

১ যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ॥ [গৌড়পাদকারিকা। ৩।। ৪৩

২ Inference by analogy

৩ সোনার তরী

(৩)

বহুবাদী দর্শন

বহুবাদ একবাদের ঠিক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। একবাদ বিশেষকে প্রত্যাখ্যান করে অখণ্ড একের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বহুবাদের আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে বহুর প্রতি। বিশ্বকে তা ব্যাখ্যা করতে চায় অগণিত ক্ষুদ্র বিশ্লিষ্ট পৃথক সত্তার সাহায্যে। তারা কোন শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে তারা যে আচরণ করে, তার আকস্মিক সমাবেশের ফলে নিরবধি কালকে অবলম্বন করে বিশ্ব গড়ে উঠেছে। এই অগণিত বিশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র সত্তার যান্ত্রিক সমাবেশের দ্বারা বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত সব কিছু ব্যাখ্যার তা চেষ্টা করে। বিশ্বের দুটি অংশ আপাতদৃষ্টিতে সকলেরই চোখে পড়ে— জড় অংশ এবং জীব অংশ। জড় অংশে এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রয়োগ অনেক সহজ, কিন্তু জীব অংশে নয়। সেখানে একটি প্রাণশক্তির উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে। উদ্ভিদ জগতে, প্রাণীজগতে, বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে এই প্রাণশক্তি অহরহ পরিবেশের প্রতিকূলতা হতে জীবকে রক্ষা করতে চেষ্টিত। কিন্তু যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় তাকে স্বীকার করা যায় না, কারণ তা হলে বহুবাদের ভিত্তি ভেঙে পড়ে। তাই কোন উদ্দেশ্যমূলক শক্তির অস্তিত্ব তা অস্বীকার করে। তাই তা মূলত জড়বাদী হয়। তার যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। যেমন লাইবনিটজ-এর মনাড-তত্ত্ব, তবে তা ব্যতিক্রমই।

ভারতীয় দর্শনগুলি আপাতদৃষ্টিতে বহুবাদী, কেবল মীমাংসা দর্শনকে অবলম্বন করে যে অদ্বৈতবাদ গড়ে উঠেছে তা তার ব্যতিক্রম। আপাতদৃষ্টিতে তাদের বহুবাদী বলে উল্লেখ করা হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তারা ততটা বহুবাদী নয় যতটা তারা দ্বৈতবাদী। বিশ্বে আপাতদৃষ্টিতে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সত্তা চোখে পড়ে। তাদের একটি জড়ধর্মী এবং অপরটি চৈতন্যধর্মী। চৈতন্যও আপাতদৃষ্টিতে জড়কে আশ্রয় করে থাকে বটে তবে তা বিশুদ্ধ জড় বস্তু হতে স্বতন্ত্র। তার মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়া করে; তাকে প্রাণশক্তি বলা যায়। সেই প্রাণশক্তির প্রকাশ চেতনার ভিতর দিয়ে। এই দর্শনগুলি অনেকগুলি পৃথক সত্তার সাহায্যে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তারা বহুবাদী। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তারা বিশ্বের ব্যাখ্যায় দুটি মৌলিক সত্তারই স্বীকৃতি দিয়েছে—জড় সত্তা এবং প্রাণ সত্তা।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যটি স্থাপনের জন্য এই দর্শনগুলির বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে তার সহিত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন। আমরা এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শন এবং উত্তর ও পূর্ব মীমাংসা দর্শনকে বাদ রেখে জৈন ও বাকি চারটি হিন্দু দর্শনের বিষয় আলোচনা করতে পারি। তাদের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যেমন সংযুক্ত তেমন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। যোগ সাংখ্যের বিশ্বতত্ত্ব গ্রহণ করেছে, তবে একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব সংযোগ করেছে; সেটি ঈশ্বরতত্ত্ব। অপর পক্ষে তার বিশেষ আলোচনার বিষয় হল মূল সত্তার বিশুদ্ধ রূপের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপনের একটি প্রক্রিয়া। তা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে না। সুতরাং সাংখ্য দর্শনের বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। অনুরূপভাবে ন্যায় যুক্তি তত্ত্বের বিভিন্ন দিকের আলোচনায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছে এবং বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বৈশেষিক দর্শন প্রতিপাদিত তত্ত্বকেই গ্রহণ করেছে। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় বৈশেষিক দর্শনের বিশ্বতত্ত্বতেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

জৈন দর্শন বিশ্বে যে বিভিন্ন প্রকৃতির সত্তা দেখা যায় তাদের ভাগ করে অনেকগুলি শ্রেণী পেয়েছে। তাদের স্বীকৃতি দিয়ে তা বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছে। প্রথমে এই সত্তাগুলিকে দুটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, স্থানকে ব্যাপ্ত করে তাদের দেহ আছে কি নেই এই নীতির ভিত্তিতে। সুতরাং মৌলিক শ্রেণী দুটি: যার দেহ আছে তা অস্তিকায় আর যার দেহ নেই তা অনস্তিকায়। সকল বস্তু বা দেহধারী জীব অস্তিকায়। অনস্তিকায় হল আকাশ ও কাল। তার পর অস্তিকায় পদার্থকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: জীব ও অজীব। যার মধ্যে প্রাণশক্তি ক্রিয়া করে তা জীব আর যার মধ্যে করে না, নিতান্তই জড়, তা অজীব। জড়কে জৈন দর্শন পুদ্গল বলে।[১] এই পুদ্গল মৌলিক পদার্থ নয়, যৌগিক পদার্থ। তা গড়ে উঠেছে অসংখ্য অণুর সমাবেশে বা সংযোগে। এই সংযোগ বা স্কন্দ হতে বিভিন্ন জড় বস্তুর উৎপত্তি। জড় বস্তু চারটি বিভিন্ন গুণের অধিকারী: রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ। এখানে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দুটি মৌলিক সত্তার এখানে স্বীকৃতি পাই। তা হল জীব ও অজীব। অণুতত্ত্ব অজীবেরই

[১] পুদগল আধুনিক বিজ্ঞান কল্পিত Matter এর সমস্থানীয়।

বিশ্লেষণ। আকাশ ও কাল অতিরিক্ত সত্তা হিসাবে স্বীকৃত হলেও তা জী ও অজীবকে জড়িয়েই বর্তমান।

সাংখ্য দর্শনে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছে অনেকগুলি পৃথক তত্ত্বে সাহায্যে। ঠিক বলতে কি তাদের সংখ্যা পঁচিশ। এই পঁচিশটি তত্ত্বের মধ্যে দুটি মৌলিক তত্ত্ব পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ তত্ত্ব মানসিক তত্ত্ব আর প্রকৃতিত জড় তত্ত্ব। তারা প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় পৃথক থাকে। তাদের সংযো ঘটলেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতির মধ্যে এই প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় এবং ফলে নূতন পৃথক সত্তার উদ্ভব হয়। এ প্রক্রিয়াগুলির প্রথম স্তরে আসে মহৎ বা বুদ্ধি এবং তারপর আসে অহংকার এই অহংকারবোধ হতেই ব্যক্তিত্ব বোধের সৃষ্টি। এই অহংকারকে ঘি একাদশ ইন্দ্রিয় গড়ে ওঠে। তাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়টি হল মন। মনের দিক হতে যেমন পঞ্চেন্দ্রিয় তেমন মনে বাহিরে পাঁচটি তন্মাত্র ফুটে ওঠে। তারা জ্ঞেয় পদার্থ কিন্তু তাদের প্রকৃতি স্বাতন্ত্র্য হেতু এক একটি বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাদের জানা যায় এই পাঁচটি তন্মাত্র হল রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপের উপলব্ধি হয়, রসনার সাহায্যে রসের, কর্ণের দ্বারা শব্দের, ত্বকের দ্বার স্পর্শের এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধের। এই পাঁচটি তন্মাত্রকে একক ব মিশ্রিতভাবে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে পাঁচ মহাভূতের উদ্ভব হয়েছে তারা হল ব্যোম বা আকাশ, মরুৎ বা বায়ু, তেজ, অপ বা জল এবং ক্ষিতি বা পৃথিবী। আকাশের উপাদান শব্দ তন্মাত্র, তেজের উপাদান শব্দ, স্প ও রূপ তন্মাত্র, জলের উপাদান শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস তন্মাত্র এবং পৃথিবী উপাদান পাঁচটি তন্মাত্র। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা পৃথক সত্তা নিয়ে গড়ে উঠেছে সাংখ্য দর্শন।

বলা বাহুল্য এদের অনেকগুলি তত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে একটি তত্ত্ব আর একটি তত্ত্বের উপর ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চমহাভূতের পর পঞ্চ তন্মাত্রের পৃথক স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল না এর ফলে তত্ত্বের সংখ্যা অনর্থক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্লেষণ করলে আরও দেখ যাবে সাংখ্য দর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি মাত্র, প্রকৃতি ও পুরুষ। যা কিছু ঘটে সবই প্রকৃতির মধ্যে। পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষ্য মাত্র হয়ে থাকে। তার একমাত্র কার্য প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হয়ে প্রকৃতিকে ক্রিয়াশীল করে তোলা। তাকে

অপরকে ক্রিয়াশীল করবার শক্তি বলে[১] বর্ণনা করা যেতে পারে। মিছরি উৎপাদন করতে ময়রা চিনির রসে সুতো ডুবিয়ে দেয়। তাকে জড়িয়ে রস কঠিন দানাযুক্ত মিছরিতে রূপান্তরিত হয়। তা না থাকলে তা ঘটত না। অথচ মিছরির উৎপাদনে তা অক্রিয় থেকে যায়। সুতরাং প্রকৃতিই রূপান্তরিত হয়ে অন্য তেইশটি তত্ত্বের উৎপাদন করে। অক্রিয় প্রকৃতির সক্রিয় অবস্থায় যে জটিল প্রকাশ তার তারা অঙ্গ হয়ে গড়ে ওঠে। তাদের পৃথক স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সাংখ্য দর্শনে আমরা দুটি মূল তত্ত্ব পাই, প্রকৃতি ও পুরুষ। তা দ্বৈতবাদী, তা বিশুদ্ধভাবে বহুবাদী নয়।

ন্যায়-বৈশেষিক যুগ্ম দর্শন। ন্যায়ের দৃষ্টি প্রমাণ শাস্ত্রের ওপর নিবদ্ধ। বৈশেষিক দর্শন বিশ্বতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করে যে দর্শন উদ্ভাবন করেছে ন্যায় দর্শন তাকে গ্রহণ করেছে। ন্যায় দর্শন যে ষোলটি পদার্থের উল্লেখ করে তারা সত্তার নির্দেশ করে না, তারা জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়কে আলোচনার বস্তু। বৈশেষিক দর্শন বিশ্বের ব্যাখ্যায় নয়টি তত্ত্ব বা পৃথক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তারা হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, স্থান, কাল, আত্মা ও মন। সাংখ্য দর্শনের তুলনায় তালিকা অনেকখানি সরল হয়ে পড়েছে। যেমন পঞ্চভূতের সঙ্গে পঞ্চ তন্মাত্রের স্বীকৃতি নেই ; একটির উল্লেখ করলে অপরটি আপনি এসে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু পুনরুক্তি দোষ রয়ে গেছে। যেমন ব্যোমের উল্লেখের পর স্থান তত্ত্বের অতিরিক্ত স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল না। উভয়ে মূলত এক। তা এই দর্শনেই পরোক্ষ-ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্বের জড় অংশের ব্যাখ্যায় তাকে ত্যাগ করা হয়েছে এবং বাকি চারটি মহাভূতের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এখানেও দেখা যাবে বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য দর্শনের মত মূলত দ্বৈতবাদী। তা দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকার করে—আত্মা ও জড় পদার্থ। মনত আত্মারই ইন্দ্রিয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ হল জড়ের উপাদান। স্থান ও কাল হল সেই রঙ্গমঞ্চ যেখানে জড় ও চেতন শক্তির আবির্ভাব ঘটে।

তবু মনে হয় ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে এক মাত্র বৈশেষিক দর্শনেই বহুবাদের প্রতি কিছু আকর্ষণ দেখা যায়। সেটা বিশেষভাবে প্রকট বিশ্বের জড় অংশের ব্যাখ্যায়। বৈশেষিক দর্শন বিশ্বের জড় অংশের ব্যাখ্যা করেছে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি মহাভূতের সাহায্যে। এরা জড়েরই

১ Catalytic agent

ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এক একটি মহাভূত অগণিত অণুর সমষ্টি। অণুগুলির প্রকৃতির ভিন্নতা হেতুই বিভিন্ন মহাভূত গড়ে উঠে। মহাভূতগুলি স্থায়ীও বটে অস্থায়ীও বটে। তাদের উপাদান যে অণু তা স্থায়ী। অণুগুলির সংযোগে যে বিশেষ রূপ গড়ে ওঠে তা অস্থায়ী। এই অণুগুলি আকারে খুবই ক্ষুদ্র এবং তাদের বিভাগ করা যায় না।[১] তারা যদি অবিভাজ্য না হত তা হলে বিভিন্ন বস্তুর আয়তনের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা যেত না।[২] অর্থাৎ বস্তুর পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি পাওয়া যেত না। এই অণুগুলি এতক্ষুদ্র যে তাদের চোখে দেখা যায় না। সুতরাং বিশ্বের জড় অংশের ব্যাখ্যায় এখানে বহুবাদ বিশেষ প্রকট। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জড় জগতের মূল উপাদান হল পরমাণু। তারা অবিভাজ্য এবং নিত্য। তাদেরই সংযোগে পরমাণুর গুণভেদে বিভিন্ন মহাভূত সৃষ্ট হয় এবং তাদের সমাবেশই বিশ্ব।

বিশুদ্ধ বহুবাদের ভাল উদাহরণ আমরা পাশ্চাত্য দর্শনেই পাই। তার লক্ষণ হল বহু বিশ্লিষ্ট নিত্য পৃথক পদার্থকে বিশ্বের মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃতি দেওয়া। তাদের বিশ্লিষ্ট ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তা কোন সংযোজক বা নিয়ামক শক্তির, যেমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্রিয়ার স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। আকস্মিক সংযোগ এবং যান্ত্রিক ক্রিয়ার সাহায্যেই তা বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চায়। সুতরাং একে আমরা অনুবাদও বলতে পারি।[৩]

প্রাচীন গ্রীসে এই বিশুদ্ধ বহুবাদ বা অণুবাদের প্রথম জন্ম। দার্শনিক লিউকিপ্পাস এবং ডিমোক্রাইটাস-এর চিন্তায় তার বিকাশ। অনেকের ধারণা ডিমোক্রাইটাস-এর রচনা বলে যা প্রচারিত তা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে লিউকিপ্পাস-এর উক্তি। সে যাই হোক, তাঁদের চিন্তার মধ্য দিয়ে যে দর্শনটি গড়ে উঠেছে তা বিশুদ্ধ বহুবাদের একটি সুন্দর উদাহরণ। আরও আশ্চর্য কথা, তার প্রথম জন্মগ্রহণের সময় তার যে রূপটি ফুটে উঠেছে, বর্তমান যুগে তার যে উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুবাদ, তার সঙ্গে সুন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়। কেবল বৈজ্ঞানিক রীতিতে চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে তার একটু আভিজাত্য বেড়েছে মাত্র। তাদের এই বিস্ময়কর সাদৃশ্য আমাদের বর্তমান আলোচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

১ নিরবয়ব: ক্রিয়াবান্ পরমাণুঃ॥

২ সর্ব্বেষামনবস্থিতাবয়বত্বে মেরুসর্ষপয়োঃ তুল্যপরিণামত্বাপত্তিঃ॥ ন্যায় কন্দলী

৩ Atomism

প্রাচীন অণুবাদের পরিকল্পনায় বিশ্ব এইভাবে গড়ে উঠেছে। বিশ্বের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু। তারা অবিভাজ্য এবং এমন নিরেট যে তাদের মাঝখানে কোন শূন্য স্থান নেই। এই অণুগুলি নিত্য এবং সংখ্যায় অগণিত। তাদের আয়তনের এবং প্রকৃতির ভেদ আছে, কেহ তুলনায় ছোট, কেহ তুলনায় বড়। এই অণুগুলি সর্বক্ষণ চঞ্চল এবং তাদের সমাবেশে বিশ্ব গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের সমাবেশ আকস্মিকভাবে ঘটে না। তা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লিউকিপ্পাস নাকি বলেছেন যে কিছুই শুধু শুধু ঘটে না, যা ঘটে তা একটি কারণ হেতু বাধ্যতামূলকভাবে ঘটে।[১] বিশ্ব কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রাণশক্তির অস্তিত্ব এই দর্শনে স্বীকার করা হয় নি। ডিমোক্রাইটাস-এর ধারণা মানুষের আত্মাও জড়ধর্মী অণু দিয়ে গঠিত, চিন্তাও জড়বস্তুর একটি ক্রিয়া। যাকে আমরা প্রাণশক্তি বলি তা একটি বিশেষ শ্রেণীর অণু দ্বারা গঠিত। তা অগ্নি-ধর্মী। সজীব পদার্থে তাই এই অগ্নিধর্ম বিশেষভাবে প্রকট। মোট কথা জড়ধর্মী অগণিত অবিভাজ্য অণুর প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন রূপে সমাবেশের ফলে বিশ্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এখন আমরা বিশ্লেষণ করলে দেখব যে এই প্রাচীন অণুবাদের মধ্যে বিশুদ্ধ বহুবাদের সকল মূল লক্ষণগুলি বর্তমান আছে। সেই লক্ষণগুলি হল এই। তা বিশ্লিষ্ট জড়ধর্মী অগণিত অণুকে বিশ্বের মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছে। তার পর তাদের যান্ত্রিক সমাবেশের সাহায্যেই তা বিশ্বের ব্যাখ্যা করে। কাজেই তাদের সংযোজনসাধক শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল কোন উদ্দেশ্যধর্মী সত্তার অস্তিত্ব তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। একই কারণে তা প্রাণশক্তিকে জড়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। প্রাচীন অণুবাদে এই সব লক্ষণগুলিই বর্তমান।

আধুনিক অণুবাদ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের হাতে গড়ে উঠেছে। যাকে অনুমানের ভিত্তিতে ডিমোক্রাইটাস রূপ দিয়েছিলেন তাকে বৈজ্ঞানিক রীতির চিন্তার সাহায্যে আরও পরিপাটি রূপ দেওয়া হয়েছে। কথায় বলে বাপকো বেটা সিপাহিকো ঘোড়া, কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া। আধুনিক বৈজ্ঞানিক

১ "Naught happens for nothing but everything from a ground and of necessity."

Russell, History of Western Philosophy, Book I, Chap. IX

অণুবাদ প্রাচীন অণুবাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে এই প্রবাদ বাক্যের যথার্থতার সুন্দর দৃষ্টান্ত। উভয়ের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেটুকু সাদৃশ্যের অভাব তা নগণ্য এবং তা ঘটেছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য। প্রাচীন অণুবাদ ধরে নিয়েছিল যে পরমাণুর গঠন এমন যে তার মধ্যে কোনও ফাঁক নেই। বর্তমান অণুবাদ বলে ফাঁক আছে; কারণ পরমাণুর মধ্যে দুটি পরস্পর পরিপূরক শক্তি ক্রিয়া করে এবং একটিকে কেন্দ্র করে অপরটি আবর্তিত হয়। তার গঠন অনেকটা ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র সৌরজগতের মত। তবু তাদের পরস্পরের আকর্ষণ এত প্রবল এবং আয়তনে তারা এত ক্ষুদ্র যে তারা একটি অখণ্ড অবিভাজ্য বস্তুর মতই কাজ করে। সৌর জগৎ যে অর্থে অবিভাজ্য পরমাণুও সেই অর্থে অবিভাজ্য।

বৈজ্ঞানিক পরমাণু তত্ত্বের[১] বিচারে পরমাণুর গঠন প্রকৃতি যে রূপ নির্দ্ধারিত হয়েছে তাই দিয়েই আমাদের আলোচনা আরম্ভ হতে পারে। ডলটন, টমসন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পরমাণুর যে চিত্রটি গড়ে উঠেছে তা সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে।

পরমাণুর গঠন প্রকৃতি অনেকটা সৌর জগতের মত। তার মাঝখানে যে কেন্দ্রীয় অংশটি আছে তাকে প্রোটন বলা হয়। তা ধনাত্মক বৈদ্যুতিক-শক্তি-সম্পন্ন। তার চারিপাশে এক বা একাধিক ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক কণা আবর্তিত হয়। তাকে ইলেকট্রন বলে। কেন্দ্রীয় অংশটি সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় এবং ইলেকট্রনগুলি গ্রহের সঙ্গে তুলনীয়। অণুগুলির প্রকৃতি ও আয়তনের ভিন্নতা নির্ভর করে তাদের মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যার ওপর। তাই তাদের রাসায়নিক গুণও নির্দ্ধারিত করে। ইলেকট্রনগুলির ঋণাত্মক শক্তির সহিত

১ পরমাণুর উপাদান তিনটি: ইলেকট্রন, 'প্রোটন ও নিউট্রন। আধুনিক পরমাণুতত্ত্ব গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। পরিপূর্ণ মতটি গড়ে তুলতে একশ' বছরের ওপর লেগেছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ডলটন প্রথম রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ হতে (Chemical molecule) পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করেন। তার পর টমসন তার অন্যতম উপাদান ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন! তার পর রাদারফোর্ড আলফা, বীটা ও গামা রশ্মি আবিষ্কার করেন। তারা যথাক্রমে ঋণাত্মক, ধনাত্মক ও নিরপেক্ষ বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষ্ট। নীলস বোর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পরমাণুর কেন্দ্রশক্তি (nucleus) আবিষ্কার করেন। তা ধনাত্মক। চ্যাড উইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন। তা নিরপেক্ষ শক্তিসম্পন্ন এবং কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সমতা রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় অংশটির পরিমাপও বেড়ে যায়। সুতরাং যে বৈদ্যুতিক কণাগুলির সংযোগে তা গঠিত তাদের সংখ্যা সমগ্র অণুটির ওজন খানিকটা নির্দ্ধারিত করে। অন্য যে উপাদান তা নিয়ন্ত্রিত করে তা হল নিউট্রন। তারা না ঋনাত্মক না ধনাত্মক শক্তি বিশিষ্ট। তা কেন্দ্রের প্রোটনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তার পরিমাপ বৃদ্ধি করে, কিন্তু পরমাণু বিশেষের রাসায়নিক গুণের ওপর তার কোন প্রভাব থাকে না।

সব থেকে সরল বিন্যাস হল হাইড্রোজেন অণুর। তাতে একটি প্রোটনকে কেন্দ্র করে একটি ইলেকট্রন ঘোরে। তার পর আসে হিলিয়াম। তাতে একটি প্রোটনকে কেন্দ্র করে দুটি ইলেকট্রন ঘোরে। তার পর ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রনের সংখ্যা একটি করে বেড়ে বেড়ে ইয়ুরেনিয়ামের ক্ষেত্রে বিরানব্বই এ দাঁড়ায়। কিন্তু সবকটি ইলেকট্রন একই কক্ষপথে ঘুরতে পারে না। কেন্দ্রের কাছে কক্ষপথ ছোট হয়; কাজেই বেশী সংখ্যক ইলেকট্রন ধরে না। দূরের কক্ষপথ বড় হয়; কাজেই বেশী ইলেকট্রন ধরে। এইজন্য ইলেকট্রনের কক্ষপথের একটি বিন্যাস আছে। প্রথম কক্ষপথে মাত্র দুটি ইলেকট্রন ধরে। পরের দুটি কক্ষপথে আটটি করে ইলেকট্রন ধরে এবং বাকি কক্ষপথগুলিতে আঠারটি করে ইলেকট্রন ধরে। এইভাবে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ[১] গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটির উপাদান ভিন্ন প্রকৃতির অণু।

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সংযোগে যে যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ[২] গড়ে ওঠে তাও এই ইলেকট্রনের বিন্যাসের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কোন কক্ষপথে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যার কম ইলেকট্রন আর অন্য প্রকৃতির অণুতে কোথাও অতিরিক্ত ইলেকট্রন থাকে, তা হলে তাদের পরস্পর সংযোগ ঘটবার অবকাশ থাকে। এই সুযোগ নিয়ে তারা পরস্পর মিলে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। আমরা জানি আমরা খাদ্যের সঙ্গে যে লবণ ব্যবহার করি তা একই যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ। তা দুটি মৌলিক পদার্থ, সোডিয়াম ও ক্লোরিনের সংযোগে গড়ে উঠেছে। তাই তার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। এখন ক্লোরিনের সতেরোটি ইলেকট্রন আছে। সুতরাং তাদের বিন্যাস হবে প্রথম কক্ষপথে দুটি, দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি এবং তৃতীয় কক্ষপথে সাতটি। অপর পক্ষে সোডিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা এগারো। সুতরাং তাদের মধ্যে প্রথম কক্ষপথে আছে

১ Elements ২ Chemical compounds

দুটি, দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি আছে এবং তৃতীয় কক্ষপথে একটি আছে। সুতরাং ক্লোরিনের তৃতীয় কক্ষপথে যে একটি জায়গা খালি আছে সেখানে সোডিয়ামের তৃতীয় কক্ষপথের একটি ইলেকট্রন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দুইটির সংযোগ ঘটায়।

এমনও অণু আছে যার কোন কক্ষপথে জায়গা খালি নেই; সব কক্ষপথেই পূর্ণ সংখ্যক ইলেকট্রন বর্তমান আছে। এদের সঙ্গে কাজেই অন্য প্রকৃতির অণুর মিলনের সুযোগ থাকে না। তাই তারা নিঃসঙ্গই রয়ে যায়। তাই তাদের সহিত সংযোগে যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ গড়ে তোলা যায় না। এই শ্রেণীতে পড়ে হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন ও জেনন। এরা তাই রাসায়নিক মিশ্রণের উপযোগী নয়।

বৈজ্ঞানিক অণুবাদ এই অণু এবং তার গতির[১] সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চায়। অণু আছে আর তাদের পারস্পরিক মিশ্রণ আছে আর গতি আছে এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক নিয়মে[২] পরিচালিত হয়ে তারা আকস্মিক ভাবে বিশ্বে নানা বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ ঘটিয়েছে। এই তত্ত্বের সাহায্যে জড় বস্তুর উৎপাদন এমন কি গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা একরকম সহজেই দেওয়া যায়। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বেশী রকম বাধা পায়। প্রথমত বিশ্বে প্রাণ শক্তির বিকাশের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য মূলক শক্তির ক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্টই দেখা যায়। পৃথিবীকে আশ্রয় করে উদ্ভিদ এবং জীবরূপে যে নানা প্রাণীর বিকাশ ঘটেছে তার মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রাণের বিকাশের এমন পরিচয় পাওয়া যায়, যে একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা তা পরিচালিত বলে ধারণা হয়। দ্বিতীয়ত, মানুষের মনে যে চৈতন্য শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে জড় শক্তির কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। কাজেই তাকেও অণুগুলির আকস্মিক সংঘাতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা শক্ত হয়ে পড়ে।

বৈজ্ঞানিক অণুবাদ কিন্তু বহুবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এদের স্বতন্ত্র শক্তি বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। তা বলে প্রাণের বিকাশকে ও রাসায়নিক মিলন ও পরিবেশের প্রভাবের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রাণের ধারার এত বৈচিত্র্য এবং তার ক্রমবিকাশের দিকে গতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে

১ Motion ২ Laws of Nature

যান্ত্রিকভাবে ঘটেছে বলা হয়। এ বিষয় ডারউইন-এর ক্রমবিকাশ তত্ত্ব[১] তাঁদের অস্ত্র। কাল যখন নিরবধি, পরিবেশ এবং অণুর আকস্মিক সমাবেশে তা ঘটেছে বলে অনুমান করলে তার সবল প্রতিবাদ করা যায় না।

দেহের মধ্যে যে জ্ঞানের অনুভূতি তাকেও অণুর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়। দেহের মধ্যে যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয় তা দেহ কোষেরই প্রক্রিয়া। কি ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির ক্ষেত্রে, কি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই কার্যকারণ সম্বন্ধে আণবিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা যায়। আমরা যখন কোন বস্তু দেখি তখন সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে। তা স্নায়ুর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে। আবার মস্তিষ্কের কোষে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তাকেই আমরা কিছু দেখছি বলে অনুভব করি। অনুরূপ ভাবে আমি যখন হাত তুলি তখন মস্তিষ্কের কোষে যে ক্রিয়া শুরু হয় তা হাতের পেশীকে চালিত করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে। এখানে যা ইচ্ছাশক্তি বলে অনুভব করি তা আসলে দেহের বিভিন্ন কোষের প্রক্রিয়া।

এ বিষয় শোপেনহাউয়ের বৈজ্ঞানিক অণুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জড়শক্তি বলে "আমি আছি এবং আমার বাহিরে কিছুই নেই। বিশ্ব আমারই অস্থায়ী রূপ। তুমি, মন, এই রূপের একটি অংশের একটি আকস্মিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। তুমি কিছুক্ষণ আছ, তার পর থাক না। কিন্তু আমি চিরদিন থাকি।"[২]

এই হল বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অণুবাদের প্রতিপাদ্য। তা সমগ্র বিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে চায় অগণিত অণুর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যান্ত্রিক রীতিতে আকস্মিক মিলনের ভিত্তিতে। তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্বে কোন নিয়ামক শক্তি নেই। তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তা চিৎশক্তি ও প্রাণশক্তির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজী নয়। অণুগুলির আকস্মিক মিলনের সাহায্যেই তার ব্যাখ্যা করে। এমন কি মানুষের মস্তিষ্কের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসের উৎপাদনেও কোন প্রাণশক্তির ক্রিয়া স্বীকার করে না। সুতরাং চিৎশক্তি ও প্রাণ শক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তবে সে আলোচনা দীর্ঘ হবার প্রয়োজন নেই। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান

১ Theory of Evolution

২ World as Will and Idea, Vol II, Chap. I

এই সম্পূর্ণ একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির আর সমর্থন করে না। বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁদের মধ্যে এমন মনীষী আছেন যাঁরা বৈজ্ঞানিক অণুবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং তার এই স্পর্ধিত দাবীর পেছনে এখন আর তেমন বল নেই। এই মনীষীদের মধ্যে জীনস, এডিংটন, আইনস্টাইন ও শ্রয়িডিঙ্গার অন্যতম। এডিংটন মনে হয় চৈতন্যবাদের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট। জীনস স্বীকার করেন অণুবাদের দ্বারা বিশ্বের সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। আইনস্টাইন বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন 'যে ঈশ্বর বিশ্ব নিয়ে পাশা খেলেন।' শ্রয়িডিঙ্গার-এর ধারণায় অণুগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মনের মত সত্তার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে জীনস-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

তিনি বলেন নূতন পদার্থ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন আর বৈজ্ঞানিক জড়বাদ এই দাবী করে না যে স্থান-কালের মধ্যে জড় শক্তির ক্রিয়ার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা করা যায়। তা স্বীকার করে যে জড় পদার্থ ও তাড়িত-চুম্বকীয় তরঙ্গে বিচ্ছুরিত শক্তির সাহায্যে স্থান-কালে দৃশ্যমান যে জগৎ তার ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তার অতিরিক্ত আরও উপাদান আছে যা যায় না[১]। তারাও জড় উপাদানের মতই সত্য কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গোচর নয়। সুতরাং জড় জগতের মধ্যে যা দেখি তার দ্বারা সমস্ত বিশ্বের ব্যাখ্যা করা যায় না। বিশ্ব জড় জগতকে অতিক্রম করে বর্তমান। তার জড় রূপ সমগ্ররূপের একটি দিক মাত্র।

কাজেই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গির একদেশদর্শিতা প্রমাণ করতে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবু সংক্ষেপে বিষয়টির আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাতে একটা লাভও আছে। বিষয়টি সম্বন্ধে এই আলোচনার সাহায্যে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

প্রথম জড়শক্তির সাহায্যে চেতনশক্তির ব্যাখ্যার কথা ধরা যাক। এখানে জড় বিজ্ঞান যে যুক্তি অবলম্বন করে তা হল এই দেখানো যে প্রতি মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে একটি জড়বস্তুকে অবলম্বন করে জড়শক্তির ক্রিয়া আবিষ্কার করা

১ "The new physics suggests that besides the matter and radiation which can be represented in ordinary space and time, there must be other ingredients which cannot be so represented. These are just as real as the material ingredients, but do not happen to make any direct appeal to our senses."

Physics and Philosophy, Some Problems of Philosophy

যায়। আমি যখন বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করি তখন মানসিক ক্রিয়ার দুটি দিকই দৃষ্টিগোচর হয়। হয়ত একটি কুকুর আমাকে আক্রমণ করেছে। তার ডাক যে বায়ুতরঙ্গ সৃষ্টি করে তা আমার কাণের পর্দায় লাগে এবং মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে। অনুরূপ ভাবে তার মূর্তি হতে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি আমার চোখে পড়ে মস্তিষ্কের অন্য কতকগুলি কোষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই আমি উপলব্ধি করি যে একটি কুকুর আমাকে আক্রমণ করেছে। তখন আত্মরক্ষার জন্য আমার ইচ্ছা হয়। ফলে মস্তিষ্কের কোষ হতে আদেশ স্নায়ুযোগে আমার হাতের মাংসপেশীতে সঞ্চারিত হয়। হাত তখন লাঠি দিয়ে কুকুরকে প্রতি-আক্রমণ করে। এখানে বাহিরের জগত হতে বিপদের খবর আসা এবং তা হতে মুক্তির জন্য ভিতরের প্রতিক্রিয়ার সুন্দর উদাহরণ এক সঙ্গে মেলে।

এখন জড় বিজ্ঞান বলবে এর সমস্তটাই জড়শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়; তার অতিরিক্ত কোন চিৎশক্তির স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন নেই। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াগুলিকে ব্যাপ্ত করে জড়শক্তির কার্য-কারণ যোগ আবিষ্কার করা যায়। সে কথা ঠিকই। অনুভূতি ও চিন্তার সঙ্গে দেহের মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই জড়শক্তির ক্রিয়া আছে বৈকি। কিন্তু তারই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে যে মানসিক ক্রিয়া চলে তাত তার মধ্যে আসে না, তার বাহিরে রয়ে যায়। তা একটি অতিরিক্ত বস্তু যা জড়ের সঙ্গে থাকে অথচ জড়ের মত নয়। জড় শক্তির প্রক্রিয়ার জালে তাকে ধরা যায় না।

এই প্রসঙ্গে উইলভার পেনফিল্ড নামে এক স্নায়ু বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে মস্তিষ্কের নির্দেশ পালন করবার জন্য আমাদের স্নায়ু বিন্যাসকে অবলম্বন করে অনেক যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। তারা প্রয়োজন হলে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেও কাজ করতে পারে। যেমন চোখের কাছে কিছু আসলে চোখের পাতা আপনা হতেই বুঁজে যায়। কিন্তু কে যে এই ব্যবস্থাগুলি পরিচালনা করে তাঁর মতে বোঝা শক্ত। তা কি মনের মধ্যে স্থাপিত অন্য একটি যন্ত্র, না তা জড়বস্তু হতে স্বতন্ত্র অন্য কোন পদার্থ? এই শক্তিকে জড়শক্তি বলে দাবী করলেই তা জড়শক্তিতে পরিণত হয় না।[১]

১ "But what agency is it that calls upon these mechanisms, choosing one rather than another? Is it another mechanism or is there in the mind something of different essence? ···To declare that these two things are one does not make them so.'

Quoted by Arthur Koestler in "The Ghost in the Machine". Chap. XIV

পৃথিবীর বক্ষে প্রাণশক্তির ক্রিয়া সকলেরই নজরে পড়ে। উদ্ভিদ জগতে তার কত বিচিত্র রূপ। একদিকে মনসা জাতীয় গাছ আছে যা মরুভূমির রুক্ষপরিবেশে প্রাণ ধারণের ক্ষমতা রাখে। অপর দিকে এমন উদ্ভিদ আছে যা জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও বিকাশ লাভ করে। একদিকে যেমন বিশাল বনস্পতি আছে, অপরদিকে তেমন পায়ের তলায় দলিত হয়ে পড়ে থাকে এমন তৃণও আছে। তারা জড়পদার্থ হতে বিভিন্ন। তারা পরিবেশের প্রতিকূলতা হতে আত্মরক্ষা করে, তারা পরিবেশ হতে খাদ্য সংগ্রহ করে বড় হয়। জীব জগতেও ঠিক অনুরূপ বিন্যাস দেখা যায়। এক দিকে যেমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু আছে তেমন অপর দিকে তিমির মত বিরাট জীবও আছে। আবার তা জলে বাস করেও ফুসফুসের সাহায্যে রক্ত শোধন করে। জীবেদের মধ্যেও এমন একটি শক্তি ক্রিয়া করছে যা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এবং বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে আত্মরক্ষা ও জীবনধারণ করতে সাহায্য করে। সে শক্তি উটকে মরুভূমিতে বিচরণ করবার উপযুক্ত করে সজ্জিত করে, মেরুপ্রদেশের ভাল্লুককে প্রচণ্ড শীত হতে আত্মরক্ষা করবার উপযুক্ত পোষাক দেয়।

এখন প্রশ্ন হল এই প্রাণশক্তির কি ভাবে বিচিত্র রূপে বিকাশ হল। জড় বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে যান্ত্রিক রীতির ভিত্তিতে। কোন উদ্দেশ্য বা অন্তর হতে প্রণোদিত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জীবের ক্রম-বিকাশ গড়ে ওঠে না। এই হল তার প্রতিপাদ্য। ক্রমবিকাশের এই ব্যাখ্যার মূল প্রচারক হলেন ডারউইন। তাঁর প্রবর্তিত ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা খুব সংক্ষেপে এই ভাবে করা যেতে পারে।

বংশধারা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে অনুক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। কিন্তু যতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর জীব বংশধারা অক্ষুণ্ন রাখতে চায় প্রকৃতির বক্ষে তাদের সকলের জন্য স্থান নেই। অপর পক্ষে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল জীবই সমান ভাবে সজ্জিত নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য রকমের ব্যতিক্রমের অধিকারী হয়। সেই ব্যতিক্রম যদি জীবনযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় কাজে লাগে, তা হলে তা শ্রেণীবিশেষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ হয়ে যায়। এই ভাবে পরিবেশই ঠিক করে দেয়, যে বিশেষ শ্রেণী জীবনযুদ্ধে জয়ী হবে তার কি কি বিশিষ্টতা থাকবে। এখানে এ কথা স্বীকৃত হয় নি যে জীবের মধ্যেই অন্তর্নিহিত কোন শক্তি সেই বিশিষ্টতা গড়ে তুলতে সাহায্য করছে, যা কোন বিশেষ পরিবেশে জীবনধারণের সহায়ক

হবে। বরং একটি মাত্র নিয়ামক শক্তির এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তা হল বাহিরের পরিবেশ। কোন বিশেষ পরিবেশে আকস্মিক ভাবে লব্ধ কোন বিশিষ্টতা যদি সুবিধা এনে দেয়, তা হলে যে জীবটির সেই বিশিষ্টতা আছে সেই টিকে থাকবে; আর যাদের সে বিশিষ্টতা নেই তারা লোপ পেয়ে যাবে। ফলে যে টিকে রইল তার বংশই সংরক্ষিত হবে। এখানে কোন উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল নয়, বাহিরের পরিবেশই শ্রেণী বিশেষের বিশিষ্টতা গড়ে তোলে[১]। আমরা খরস্রোতা নদীর তীরে নুড়ি পাথর পাই। জলের স্রোতে পরস্পরের গা ঘষে তারা একই ধরনের চ্যাপ্টা ডিম্বাকৃতি রূপ পায়। এই রূপ ভিতরের শক্তি গড়ে তোলে না, জলের স্রোত যান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলে। এই তত্ত্ব অনুসারে পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বিশিষ্টতা এইভাবে গড়ে ওঠে।

ডারউইন-এর প্রতিপাদ্য তাঁর নিজের প্রদত্ত একটি উদাহরণ হতে বেশ সহজে বোঝা যায়। মাডীরা দ্বীপের পোকাদের ডানা নেই। প্রাকৃতিক নির্বাচন রীতির ফলে যান্ত্রিক ভাবে ক্রমবিকাশের পথে তারা কি ভাবে ডানা হারালো, তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন এই ভাবে। দ্বীপের মধ্যে তারা বাস করে, চারিদিকে সমুদ্র। এ অবস্থায় যে পোকা বেশী উড়বে তা সমুদ্রের মধ্য পথভ্রষ্ট হয়ে প্রাণ হারাবে। কাজেই বংশ পরম্পরায় যে পোকাগুলি কম উড়বে তারাই বাঁচবে, আর তারাই বংশ রক্ষা করবে। তারা স্বভাবের বশেও ওড়া ত্যাগ করতে পারে, আবার ডানায় কোন দুর্বলতা থাকলেও উড়তে না পারে। ইরূপে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে নির্বাচিত ভাবে এই পতঙ্গদের মধ্যে ংশবৃদ্ধি সীমিত থাকায় তারা এককালে ঘটনাচক্রে ডানা হারিয়ে বসল।[২]

কিন্তু স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদিত হয় যে কেবল মাত্র বাহিরের পরিবেশের ভাবে এমন ভাবে কি প্রাণের ক্রমবিকাশ সম্ভব? এককোষ বিশিষ্ট জীব তে ধাপে ধাপে মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীব, উভচর জীব, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী জীব বং শেষে মানুষ যে বিকাশ লাভ করল সবই কি এই প্রাকৃতিক নির্বাচন রীতির ল? প্রাণশক্তির বাহিরের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার যে বিস্ময়কর ক্ষমতা লক্ষিত হয় তা কি ইঙ্গিত করে না যে ভিতর হতে একটি

১ **Natural selection**

২ **"For during many successive generations each individual beetle which ew east either from the wings having been ever so little less perfectly eveloped or from indolent habit, will have had the best chance of surviving tom not being blown out to sea". Darwin, Origin of Species, p. 151**

শক্তি ও ক্রমবিকাশের পথে প্রাণধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? কিন্তু যান্ত্রিক ক্রিয়ারীতিতে বিশ্বাসপরায়ণ জড়বাদ তাকে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়। তা বলে কাল যখন নিরবধি এবং শতশত কোটি বৎসর ধরে যখন ক্রমবিকাশ গড়ে উঠেছে তখন কেবল প্রাকৃতিক নির্বাচন রীতির সাহায্যেই প্রাণের যে সহস্র সহস্র রূপের বিকাশ দেখি তা সম্ভব হতে পারে। একটি বানর যদি টাইপ-রাইটারের বোতাম শত শত বৎসর টিপে চলে আকস্মিক ভাবে সেক্সপীয়ারের একটি নাটক ও রচনা হয়ে যেতে পারে। এঁদের মুখপাত্র হিসাবে জুলিয়ান হাক্সলির মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন চক্ষু বা হাত বা মস্তিষ্কের মত সূক্ষ্ম অবয়ব আকস্মিক ঘটনার সমাবেশে ঘটতে পারে না বলে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তার গুরুত্ব থাকে না এই কারণে, যে প্রাকৃতিক নির্বাচন সংঘটিত হয়েছিল পার্থিব জীবনের কোটি কোটি বৎসরকে আশ্রয় করে।[১]

হার্বার্ট স্পেনসার ছিলেন ডারউইন-এর সমসাময়িক দার্শনিক। তিনি এই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে অতি আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে প্রয়োগ করে একদিকে পরমাণু হতে মহাবিশ্ব এবং অপর দিকে এককোষ-বিশিষ্ট জীব হতে মানুষ, সব কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। এমন কি মানুষের সৃষ্টি সমাজ-রাষ্ট্র, বিজ্ঞান-দর্শন এদেরও তার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মানস জগতে তা এক বিস্ময়কর অভিযান। এই সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যায় ক্রম-বিকাশ তত্ত্বকে একমাত্র সৃষ্টিধর্মী তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায় ক্রমবিকাশের বিষয় হল জড়বস্তু এবং তার বিভিন্নমুখী গতি। ক্রম-বিকাশ শক্তির প্রভাবে জড়পদার্থ সরল প্রকৃতি হতে ক্রমশ জটিলতর প্রকৃতি গ্রহণ করে, অথচ তার মধ্যে একটি আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।[২]

কিন্তু এ হেন মনীষা-মণ্ডিত পৃষ্ঠপোষক ও যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের প্রয়োগে সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তিনি শেষে

১ "The hoary objection of the improbability of an eye or a hand or a brain being evolved by blind chance has lost its force" because "natural selection operating over the stretches of geological time" explains every thing.

Quoted in Arthur Koestler's 'The Ghost in the Machine'. Chap. IX

২ "Evolution is an integration of matter and a concommitant dissipation of motion; during which the matter passes from an indefinite incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity."

First Principles, p 36.

স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে প্রাণশক্তির ব্যাখ্যা কেবল মৌলিক জড় পদার্থ ও তার রাসায়নিক মিশ্রণের সাহায্যে করা যায় না।[১] বলা বাহুল্য এই স্বীকৃতি প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে দুর্বল করে দেয়।

তাঁর এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে হবে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার মধ্যে। তা একদেশদর্শী। বাহিরের পরিবেশের প্রভাব জীবনের ক্রমবিকাশে নিশ্চয় আছে; কিন্তু তাই একমাত্র শক্তি নয়। পাথরের নুড়ি যেমন নদীর স্রোতের প্রভাবে পরস্পর নিপিষ্ট হয়ে তাদের রূপ পায়, বিভিন্ন শ্রেণীর জীব যে তেমন করে গড়ে ওঠে নি, তার প্রমাণ প্রচুর পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে যে সব তথ্য মিলবে তারা সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করে যে প্রাণশক্তি একটি প্রচণ্ড শক্তি। তা জীব দেহের অভ্যন্তরে থেকে এমন ভাবে তাকে পরিচালিত করে যাতে বাহিরের পরিবেশের প্রতিকূলতা অতিক্রম করা যায়। সম্ভবত তাই অধিকতর সক্রিয় শক্তি। আমরা এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য স্থাপন করতে পারি।

পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষার চেষ্টার পরিচয় আমরা দুভাবে পাই। এক ভাবে হল, পরিবেশ যেমন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেহের এমন পরিবর্তন সাধন যে সেই পরিবেশ হতে দেহের পুষ্টি এবং সংরক্ষণের শক্তি আহৃত হতে পারে। তার সুন্দর উদাহরণ মেলে জীবদেহে ফুসফুসের বিকাশের ইতিহাসে। মাছ জলের মধ্যে বাস করে, তা থেকে তার শরীরকে জীবিত রাখতে অক্সিজেনের প্রয়োজন। জলে অক্সিজেন জলের সঙ্গেই মিশ্রিত থাকে। তাই অক্সিজেন গ্রহণের জন্য মাছের কানকো এবং ঝিল্লির ব্যবস্থা। তার মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত করে মাছ জল হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। কিন্তু জীবের যখন ডাঙায় আগমন ঘটল, তখন তার প্রয়োজনীয়তা রইল না। সেখানে অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে অন্য বাষ্পীয় পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। কাজেই বায়ুকে শরীরের মধ্যে টানলে সেখানে তার মধ্য হতে অক্সিজেন সংগ্রহ করা যায়। তাই ঝিল্লীর পরিবর্তে ফুসফুসের উদ্ভব হল।

অনেক সময় প্রতিযোগিতার ফলেও পরিবেশের এমন পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যে একই মহাশ্রেণীর[২] অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর[৩] জীবের একই ধরনের খাদ্য

১ "(Life) cannot be conceived in physico-chemical terms." Biology, i, 120

২ Genus ৩ Species

সংগ্রহে অসুবিধা দেখা দেয়। বাড়ীতে হয়ত এত চাল নেই যে সকলেই ভাত খেতে পারে। তখন গৃহিণী ব্যবস্থা করেন কেউ পছন্দ মত ভাত খাক আর কেউ আটার রুটি খাক। অবস্থাটা এখানে অনেকটা সেই ধরনের। তৃণভোজী জীব কেউ ঘাস খায়, কেউ গাছের পাতা খায়, কেউ উঁচু গাছের পাতা খায়। জিরাফ উঁচু ডাল হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে বলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার গলা খুব উঁচু হল। ঘোড়া কেবল তৃণভোজী হল বলে তার দাঁত এমন ভাবে গড়ে উঠল যে সহজেই ঘাস কাটতে পারে।

দ্বিতীয়ত প্রাণশক্তি আর এক উপায়ে পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে চলে। এখানে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ততটা প্রশ্ন নয়। এখানে প্রাণশক্তি আরও সক্রিয়। পরিবেশে নূতন সুযোগ পেলে তার সুবিধা গ্রহণ করার আকূতিও বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে যেন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা বাধ্যতামূলক। এখানে কিন্তু যেন ইচ্ছাধীন। যে সুযোগ উপস্থিত তার সদ্ব্যবহার কেন করব না—এই মনোভাব নিয়ন্ত্রিত।

দু একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। স্তন্যপায়ী জীব ডাঙায় বাস করতে অভ্যস্ত। সেটাই তার সাধারণত জীবনধারণের ক্ষেত্র। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এটা মনে হয় অতিরিক্ত সুবিধার সুযোগ গ্রহণের ইচ্ছা-প্রণোদিত। আমরা জানি যে তিমি মাছ বা শুশুক স্তন্যপায়ী জীব। ডাঙা হতে সমুদ্রে পুষ্টি সংগ্রহ করা সহজ। তাই বোধ হয় তারা সমুদ্রের প্রতি আকৃষ্ট হল। তাদের দেহ এমন ভাবে পরিবর্তিত হল যাতে জলের মধ্যে চলাফেরা করা যায় এবং জলে থেকেও বায়ুমণ্ডল হতে অক্সিজেন সংগ্রহ করা যায়। আমরা সাধারণত দেখি স্তন্যপায়ী মহাশ্রেণীর[১] অন্তর্ভুক্ত জীবেরা ভূমিতে আবদ্ধ থাকে। তারও ব্যতিক্রম আছে। বাদুড় আকাশে উড়ে বড় বড় গাছ হতে খাদ্য সংগ্রহ করবার সুবিধা চাইল। তাই তার দেহ তার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠল। দুই হাত আর দুই পায়ের মাঝখানে পর্দার মত একটি পাতলা চামড়া গড়ে উঠল যাতে তা উড়তে পারে।

আমার ত মনে হয় ক্রমবিকাশের জন্য এই পরিবেশের সুবিধা গ্রহণের আকূতি হতেই মানুষেরও উদ্ভব হয়েছে। বানরের পূর্বপুরুষ এককালে নিশ্চিত ভূমিতলের জীব ছিল, কারণ সেটা না হওয়া স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে ব্যতিক্রম।

১ **Genus of Mammals.**

তার পর নিরাপত্তার জন্য এবং বৃক্ষ হতে খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ নেবার জন্য সে বৃক্ষবাসী জীব হতে চাইল। তার ফলে তার দেহের এমন পরিবর্তন ঘটল, যাতে গাছে আরোহণ এবং ডালে ডালে বিচরণের তা উপযুক্ত হল। এইভাবে নিজেকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা হতেই তার হাত এবং পা পাঁচ আঙুল বিশিষ্ট হল এবং বুড়ো আঙুলের উদ্ভব হল। বুড়ো আঙুল যুক্ত পাঁচটি আঙুল না থাকলে তার গাছের ডালকে অবলম্বন করে চলা ফেরা সম্ভব হত না। মানুষের পূর্বপুরুষ যে বানর শ্রেণীর জীব ছিল তার প্রমাণ তাদের দেহগত সাদৃশ্য। মনে হয় মানুষের পূর্বপুরুষের এক সময় ভূমি হতে খাদ্য সংগ্রহের ইচ্ছা বলবতী হয়েছিল। ফলে সমতল ভূমিতে চলার চেষ্টা হতে তার নূতন করে দেহের পরিবর্তন সংঘটিত হল। তা হতেই মানুষের অনন্যসাধারণ পায়ের উদ্ভব। তার পায়ে বুড়ো আঙুল গোড়ালি হতে সরে এসে অন্য চারটি আঙুলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার এবং দুপায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা লাভ করল। পরিণতিতে তার হাত দুটি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে বুদ্ধিশক্তির নিয়ন্ত্রণে নিজের জীবনধারণ সমস্যার সমাধানের ভার গ্রহণ করল। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার জন্য আর তার দৈহিক ক্রমবিকাশের আশ্রয় গ্রহণ করতে হল না। ক্রমবিকাশ কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবাহিত হল।

এই সব দেখে ডারউইন প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিত্তিতে ক্রমবিকাশের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। বিভিন্ন মনীষী দৃঢ় ভাষায় তাঁদের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। তার দু-একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ওয়াডিংটন যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি মোটামুটি বলেছেন বিশ্বে এত যে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জীবদেহে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তাকে যান্ত্রিকভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন রীতি দিয়ে পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই বিষয় স্তূপীকৃত প্রমাণের বিরুদ্ধে এমন করা যুক্তি সঙ্গত নয়। তাকে যদি মেনে নিতে হয় তা হলে এও মানতে হয় যে খেয়াল খুশী মতে ইটের পরে ইট ফেলে বাড়ী গাঁথা যায়।[১]

১ "To suppose that the evolution of the wonderful biological mechanisms has depended only on a selection out of a haphazard set of variations, each produced by blind chance, is like suggesting that if we went on throwing bricks together into heaps, we should eventually be able to choose ourselves the most desirable house."

Quoted by Koestler in Ghost in the Machine. Chap. X.

কেবল জড়শক্তিকে অবলম্বন করে যান্ত্রিক ব্যাখ্যার দ্বারা প্রাণশক্তির এই বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা করা যায় না। জীব অক্রিয় হয়ে বসে থেকে পরিবেশের প্রভাবে এবং আকস্মিক বীজকোষের পরিবর্তনের[১] উপযোগিতার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে না। প্রাণশক্তিও এখানে সক্রিয় হয়। তাই উইল ডুরাণ্ট বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ একান্তই একদেশদর্শী। তার ব্যাকরণে কেবল বিশেষ্যপদের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়। বিশ্বে কেবল জড়শক্তি ক্রিয়াশীল নয়, প্রাণশক্তিও ক্রিয়াশীল।[২]

সুতরাং কেবল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অণুর প্রক্রিয়ার ফলে এবং পরিবেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিতভাবে ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করা শক্ত হয়ে পড়ে। পৃথিবীর বক্ষে যে প্রাণশক্তির নানা ভাবে পরিবেশের প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার এবং অনুকূলতার সুযোগ গ্রহণ করবার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায় তা স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে জীবদেহের অভ্যন্তরেও একটি শক্তি বেশ বুদ্ধি ও বিবেচনার সঙ্গে এখানে কাজ করে। এই প্রমাণের ভিত্তিতে ক্রমবিকাশের অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সূত্রে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যে ব্যাখ্যাগুলি স্থাপন করেছেন তাদের এখন সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

এঁদের মধ্যে লামার্ক সব থেকে প্রাচীন। তিনি ডারউইন-এরও আগের মানুষ। তিনি ক্রমবিকাশকে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণায় পৃথিবীর বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে নানা প্রাণীকে ব্যাপ্ত করে এই ক্রমবিকাশের আকৃতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার উদ্দেশ্য নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উন্নততর শ্রেণীর জীবের বিকাশ ঘটানো এবং এরই পরিণতি রূপে মানুষের মত সূক্ষ্ম-মস্তিষ্ক-সজ্জিত বুদ্ধি-পরিচালিত অনন্যসাধারণ জীবের উৎপত্তি ঘটেছে। এখন ক্রমবিকাশের পথে পুরুষানুক্রমে কেমন ভাবে নূতন দেহসজ্জা সংক্রামিত হল এই প্রশ্নের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এই ভাবে। তাঁর মতে বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ জীব পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে যে রীতি অবলম্বন করে, তাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। সেই অভ্যাস পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়। ফলে দেহের যে অঙ্গ অব্যবহৃত হয়ে

১ Mutation

২ "Materialism is like a grammer that recognises only nouns ; but reality like language contains action as well as objects, verbs as well as substantives, life and motion as well as matter.' Story of Philosophy, Chap. X

পড়ে থাকে তা পঙ্গু হয়ে যায় এবং যে অংশ নূতন রীতিতে ব্যবহৃত হয় তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। ঘোড়ার যে ঘাস কাটার উপযোগী দাঁত উদ্ভাবিত হল তার ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব অনুসারে হয়ে দাঁড়াবে এই। প্রথমে ঘোড়া সব রকম উদ্ভিত খেত। পরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল তৃণভোজী হতে অভ্যস্ত হল। এই অভ্যাস পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হবার ফলে তার জীব-কোষের[১] এমন পরিবর্তন সাধিত হল[২] যে বংশানুক্রমে ঘোড়ার দাঁতের রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল।

এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার কারণ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত বিশেষ জীবের বিশেষ অভ্যাস পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত[৩] হয় না। কাজেই তাঁর প্রতিপাদ্যের ভিত্তি ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু লামার্ক-এর প্রবর্তিত তত্ত্বের দুটি দিক আছে। প্রথম কথা হল, তা স্বীকার করে না যে কেবল মাত্র পরিবেশই জীবের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। তা বলে তার অতিরিক্ত আর একটি শক্তি জীবের ভিতর হতে ক্রিয়া করে। তা হল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার আকূতি। সেই আকূতিই জীবকে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় কথা হল, যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয় কি করে এ বিষয়ে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সমর্থিত হয় নি। তাকে পরিত্যাগ করলেও প্রথম তত্ত্বটির মূল্যহানি ঘটে নি। তার মধ্যে এমন একটি সত্য অন্তর্নিহিত আছে যাকে উপেক্ষা করা যায় না। পরবর্তী কালের মনীষীদের তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে তাঁরা নূতন তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। সুতরাং তাঁদের ব্যাখ্যাকে লামার্ক প্রবর্তিত তত্ত্বের পরিণত রূপ বলা যেতে পারে।

এই ব্যাখ্যাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি শ্রেণী বলে ক্রম-বিকাশের লক্ষ্য পূর্ব হতেই নির্দ্ধারিত। তা হল মানুষের মত এমন জীব সৃষ্টি করা যে প্রকৃতির অভিভাবকত্ব হতে মুক্তিলাভ করে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার সমস্যার নিজেই সমাধান করে নিতে পারবে। একে লক্ষ্যবাদ[৪] বলে। অর্থাৎ তা বলে ক্রমবিকাশের লক্ষ্য নির্দ্ধারিত; কাজেই তা

১ Germ cell
২ Mutation
৩ Inherited
৪ Finalism এর প্রতিশব্দ হিসাবে এই কথাটি ব্যবহার হল

একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাপক ক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এই শ্রেণীতে পড়ে। মার্কিন দার্শনিক ডু-নুয়ির প্রতিপাদিত তত্ত্বও এই শ্রেণীতে পড়ে। কিছু পার্থক্য থাকলেও তাঁর সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ। তাঁর ধারণায় মানুষের মত জীব সৃষ্টিই ক্রমবিকাশের একটি সুদূর প্রসারী লক্ষ্য। তাই তিনি এর নাম দিয়েছেন দূরগত লক্ষ্যবাদ[১]। তৃতীয় মতটি হল বের্গসঁ প্রবর্তিত। তা প্রাণশক্তির প্রক্রিয়ার ফলে ক্রম-বিকাশের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ এঁদের মত তিনিও একটি আকৃতির সক্রিয় ভূমিকা স্বীকার করেন। তবে তার প্রকৃতির কিছু ভিন্নতা তিনি লক্ষ্য করেন। তিনি সুদূর প্রসারী কোন লক্ষ্যের ভূমিকা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে প্রাণশক্তি[২] সৃষ্টি ধর্মী, পরিবেশের প্রতিকূলতা তাকে নিত্য নূতন প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী করে। ফলে তা নিত্য নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। তাই তাঁর ক্রমবিকাশ তত্ত্বকে তিনি সৃষ্টিধর্মী ক্রমবিকাশ[৩] বলে নামকরণ করেছেন। বলাবাহুল্য এই তিনটি তত্ত্বই এক মূল চিন্তাধারা অনুপ্রাণিত; তা হল জীবের অভ্যন্তরে প্রোথিত একটি আকৃতি ও ক্রমবিকাশ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা সমধর্মী, তাদের যে পার্থক্য তা গৌণ বিষয়কে অবলম্বন করে। আমরা এখন এই তিন মনীষীর ব্যাখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিপাদ্যকে এই ভাবে গড়ে তুলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ক্রমবিকাশের জগতে অন্য জীবের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় নি। মানুষের জন্য একটি ভিন্ন ব্যবস্থা হয়েছে। সকল জীবেরই সমস্যা হল পরিবেশ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করা এবং তার প্রতিকূলতা হতে আত্মরক্ষা করা। একেই বলা যেতে পারে জীবন সংগ্রাম। অন্য জীবের জীবন সংগ্রামে যে নানা সমস্যার উদয় হয় তার সমাধানের ভার প্রকৃতি নিজের স্কন্ধেই নিয়েছে। তার উপযোগী করবার জন্য তাদের দেহে নানা যন্ত্র সংযুক্ত হয়েছে, নানা সজ্জায় তাদের সজ্জিত করা হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা হল। তার দেহের সহিত কোন বিশেষ অস্ত্র বা সজ্জা সংযুক্ত হল না।

১ Telefuialism

"We shall use as a leading light a teleological hypothesis, that is a finalism with a very ultimate goal, a telefinalism." Human Destiny, The Method.

২ Elan vital ৩ Creative Evolution

নিতান্তই অসহায় অবস্থায় প্রকৃতির বক্ষে স্থাপিত হল। অন্য জীব নানাভাবে বৃত্তি[১] দ্বারা পরিচালিত; মানুষের মধ্যে বৃত্তির প্রভাব নগণ্য। তার দেহ নিরাবরণ, অন্য বড় আকারের জীবের সহিত তুলনায় দুর্বল। জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য সে পরিবর্তে পেল দুটি অস্ত্র। প্রথম, চিন্তা করবার শক্তির উপযুক্ত এক অতি বিরাট মস্তিষ্ক এবং দ্বিতীয়, সমস্যার সমাধানের জন্য সেই চিন্তাশক্তি যে উপায় উদ্ভাবন করবে তাকে রূপ দেবার জন্য দুখানি মুক্ত হাত। ফলে নানা প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় তার বুদ্ধিশক্তি হল শাণিত এবং হাতের সাহায্যে তা প্রযুক্তি বিদ্যা আয়ত্ত করে তার সমাধান করল।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, "মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুষ্কর করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণ-পণ করিয়া মরিতে হয়।...আত্মরক্ষার উপায় লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে। কোমল ত্বক এবং দুর্বল শরীর লইয়া যে মানুষ আজ সমস্ত প্রাণী সমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানব শক্তির গৌরব।"[২]

প্রকৃতির বিধানে মানুষের দেহ এইভাবে নূতন পথে বিবর্তন লাভ করল। তা এনে দিল দুটি মৌলিক সুবিধা। প্রথমটি হল দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি। আনুষঙ্গিক ভাবে তার ফলে তার হাত দুটি মুক্ত হয়ে গেল। তাদের আর দেহকে বহন করবার জন্য অনুক্ষণ নিজেকে নিযুক্ত রাখতে হল না।

রবীন্দ্রনাথের মতে এই হাত দুটির মুক্তিলাভ মানুষের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর ফলেই সে প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করল।[৩] তাঁর মতে এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। প্রথমত অন্য জীবের মত তার আত্মরক্ষার জন্য আচ্ছাদন বা আক্রমণের জন্য হাতিয়ার দেহের অঙ্গ হিসাবে বহন করতে হল না। সবই তার হাত দিয়ে সে তৈরি করে নিতে পারে এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারে, সর্বক্ষণ অঙ্গে বহন করতে হয় না। ফলে তার প্রাণশক্তি অন্য পথে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল।

১ Instinct ২ ধর্ম

৩ **"But the best means of the expression of his physical freedom gained by Man in his vertical positions is through the emancipation of his hands."**

Religion of Man, Chap. III

দ্বিতীয়তঃ তার জন্য পূর্ণতর জীবনের সম্ভাবনা দেখা দিল। বুদ্ধি শক্তির প্রয়োগে তার জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করবার সুযোগ এল।[১] এই পূর্ণতর জীবন বিকশিত হল বিভিন্ন পথে। তা প্রথমত প্রকৃতির ওপর দৈহিক প্রয়োজনের জন্য নির্ভরশীলতার দুঃখ হতে তাকে পরিত্রাণ করল। আত্মরক্ষার জন্য, শীততাপ নিবারণের জন্য, অন্নসমস্যার সমাধানের জন্য তার প্রযুক্তিবিদ্যাই তার নির্ভর হয়ে দাঁড়াল। অপর পক্ষে দৈহিক মুক্তি মানসিক পরিবর্দ্ধনের পথ উন্মুক্ত করে দিল। এই পথে সে প্রীতির সূত্রে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তুলল। ফলে তার নীতিবোধ ফুটে উঠল। এ দিকে বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের মানবের সঙ্গে একত্ব অনুভব করে বিশ্বজনীন সেবা ও প্রীতির প্রতি তার মন আকৃষ্ট হল। তাঁর মতে এগুলিই হল মানব সংস্কৃতির প্রেরণা। তার লক্ষ্য হল জ্ঞান, প্রীতি ও কর্মের সংযোগে বিশ্ববাসীর সহিত একত্ববোধ জাগ্রত করে, বিশ্বসত্তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করা এবং মঙ্গলের পথে চালিত হওয়া।[২]

হুস্থয়ি-এর দূরগত লক্ষ্যবাদ[৩] অনেকটা রবীন্দ্রনাথের যুক্তির অনুসরণ করে। তাঁর মতেও ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত রূপ হল মানুষ। তার প্রখরতর বুদ্ধিশক্তি, দুপায়ে চলার শক্তি এবং দুটি মুক্ত হাত তাকে শুধু প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্তি এনে দেয় নি, তার একটি সমৃদ্ধতর মানসিক জীবনের সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। সেই পথেই তার বিবেক বা দায়িত্ববোধের উৎপত্তি হয়েছে এবং সে নীতিবোধ বিশিষ্ট জীবে পরিণত হয়েছে। এঁদের মতের সাদৃশ্য কতখানি, তা হুস্থয়ি-এর প্রতিপাদ্যটিকে সংক্ষেপে স্থাপন করলেই বোঝা যাবে।

তাঁর বিশ্বাস ক্রমবিকাশ ব্যাপারটি সমস্ত পৃথিবীর বক্ষ জুড়ে ঘটে চলেছে। তাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। তা দেখলে বোঝা যাবে এর মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়া করছে এবং তা একটি লক্ষ্য পথের দিকে এগিয়ে

১ "Man desired is his completeness to be the one great representative of multiform life···by purposeful selection of opportunities with the help of on his reasoning mind." Religion of Man, Chap. II

২ "This is the spirit of civilisation which in all its best endeavour invokes our supreme Being for the only bond of unity that leads us to truth namely that of righteousness." Ibid.

৩ Telefinalism

চলেছে।[১] অবশ্য তার মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে, সব জায়গায়ই সব পরীক্ষা সফল হয় নি, তবে সমগ্রভাবে দেখলে তার গতি প্রগতির পথে। একটি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে না ধরে নিলে ক্রমবিকাশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে কেবল জড়শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের হতাশ হতে হয় কারণ, জড় বস্তুর প্রকৃতি ও আচরণ রীতির সঙ্গে তার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান[২] প্রাকৃতিক নির্বাচন[৩] এবং বীজকোষের পরিবর্তন[৪]—এদেরও একটি ভূমিকা আছে। তবে তাদের ভূমিকা গৌণ; কেবল এই প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে ক্রমবিকাশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় না। এগুলি কার্যসাধনের উপায়মাত্র[৫], প্রকৃত নিয়ন্ত্রক শক্তি নয়। একটি বাড়ী নির্মাণ করতে কর্ণিকের যে ভূমিকা এদের ভূমিকা তার অনুরূপ। কর্ণিকের সাহায্যে বাড়ী গাঁথবার মসলা স্থাপিত হয়, প্রয়োজন হলে ইট কাটা যায়; কিন্তু কেউ কি তা হলে বলবেন যে কর্ণিকই বাড়ী গাঁথে? প্রকৃতপক্ষে যে স্থপতি নক্সা রচনা করেন তিনিই এই নির্মাণকার্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও একটি লক্ষ্য অনুরূপভাবে মুখ্য নিয়ন্ত্রক শক্তি।[৬]

এই লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হল এমন একটি জীবরূপ বিকশিত করা যার জন্য পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার সুযোগ থাকবে। এই লক্ষ্যের পথ বিভিন্ন বিঘ্ন এবং প্রতিকূলতা হতে জীবকে পরিত্রাণের চেষ্টার দ্বারা সূচিত। প্রথমে অচলভাবে স্থিতি হতে দেহকে স্থানান্তরে পরিচালনার শক্তি অর্জন তার প্রথম পদক্ষেপ; পরিবেশের ওপর নির্ভরশীলতা হতে মুক্তি তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ; হাত দুটির দেহসঞ্চালনের কাজ হতে মুক্তি তার তৃতীয় পদক্ষেপ; অর্জিত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত করবার একটি সফল উপায় উদ্ভাবন (কথার এবং গ্রন্থের মাধ্যমে) তার চতুর্থ পদক্ষেপ; এবং নীতিবোধের

১ We suggest the hypothesis of a finality comparable to gravitation in the above analogy, that is to say telefinality directing evolution as a whole. Human Destiny 7

২ Adaptation ৩ Natural selection ৪ Mutation

৫ Mechanism

৬ "Strictly speaking these mechanisms are not determining factors in general evolution any more than a mason is a determining factor in the cathedral on which he works." Ibid

পরিস্ফুরণ তার শেষ পদক্ষেপ।[১] বলা বাহুল্য এ বিষয় রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য আছে।

বের্গসঁ-এর 'সৃষ্টিধর্মী ক্রমবিকাশ' তত্ত্ব মোটামুটি একই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কেবল জড়শক্তির সাহায্যে প্রাণশক্তির ব্যাখ্যা হয় না। তা জড়ের সহিত যুক্ত হলেও তার একটি নিজস্ব ভূমিকা থাকে। ক্রমবিকাশে এই প্রাণশক্তিই মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। তা নিজের বিকাশের সুবিধার জন্য বৃহৎ হতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তির অনুসন্ধান করছে এবং শেষে মানুষের পর্যায়ে এসে থেমে গেছে; কারণ পরিবেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে সে প্রযুক্তি বিদ্যার ওপর নির্ভর করতে শিখেছে।

প্রথমত তিনি বলেছেন মনের ব্যাখ্যায় জড়শক্তি কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। জড়শক্তি স্থানধর্মী, তার বাহিরে প্রকাশ আছে কিন্তু তার পরিবর্তনশীলতা নেই। অপরপক্ষে প্রাণশক্তি কালধর্মী, তা নিত্যপরিবর্তনশীল। তার ধর্ম আয়তনে প্রকট নয়, গুণে প্রকট। সেই কারণে, কেবল জড় অণুর গতি এবং তার সমাবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি তাঁর প্রতিপাদ্যকে বোঝাবার জন্য প্রাণশক্তির তুলনা করেছেন একটি বৃত্তের সহিত এবং জড়শক্তির তুলনা করেছেন অসংখ্য সরলরেখার সহিত। বৃত্ত যদিও একটি বক্ররেখায় বেষ্টিত, তার ক্ষুদ্র অংশগুলিকে আলাদাভাবে দেখলে সেগুলি সরলরেখা বলে মনে হবে। প্রাণশক্তি জড়শক্তির সহিত সংযুক্ত বলে আপাতদৃষ্টিতে জড়শক্তির সাহায্যে তার ব্যাখ্যা সম্ভব বলে মনে হয়; কিন্তু তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য এত গভীর যে তা সম্ভব নয়। তা বৃত্তকে অসংখ্য সরলরেখার সমষ্টি বলে ব্যাখ্যা করার মত হবে।[২]

বের্গসঁ-এর মতে প্রাণশক্তি জড়ের মত যন্ত্রবৎ কাজ করে না। তা সৃষ্টিধর্মী। তা পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, প্রয়োজন হলে নিজেকে পরিবর্তিত করে নিতে পারে। তার নিজস্ব একটি ইচ্ছাশক্তি আছে। তবে তিনি এ কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন যে এই ইচ্ছাশক্তি বাহির হতে

১ "Liberation from the time-consuming method of transmitting useful acquired characters and experience (through speech and tradition) and last of all···liberation of conscience."

২ "In reality, life is no more made up of physico-chemical elements than a curve is composed of straight lines" Creative Evolution, P. 31

ক্রিয়া করে। লক্ষ্যবাদের[১] মধ্যে তিনি এই রকম একটি ইঙ্গিত পান। কিন্তু তাঁর মতে তা স্বীকারযোগ্য নয়। এরকম ধারণা ক্রমবিকাশের সৃষ্টিধর্মী রূপের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় জড়বাদের যান্ত্রিকত্ব এবং লক্ষ্যবাদের দূরগত লক্ষ্যতত্ত্ব, দুটিকেই পরিহার করতে হবে। মানুষের কর্মরীতির অনুসরণেই এই ধরনের তত্ত্ব গড়ে ওঠে।[২] এটা অনস্বীকার্য যে প্রাণশক্তি ও একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে; কিন্তু সে উদ্দেশ্য প্রাণশক্তির মধ্যে থেকেই কাজ করে, বাহির থেকে নয়।

তিনি বিশ্লেষণ করে পেয়েছেন যে ক্রমবিকাশের পথে প্রাণশক্তি তিনটি সম্ভাব্য রূপ নির্বাচন করে নিয়েছে। একটি স্থিতিশীল রূপ। মহীরুহের মধ্যে সেরূপ প্রকট। একটি বিরাট গাছ শত শত বৎসর ধরে একই জায়গায় স্থাণুর মত অচল থেকে প্রাণধারণ করতে পারে। দ্বিতীয়টি হল বৃত্তি চালিত[৩] রূপ। এখানে বুদ্ধিশক্তি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে প্রাণশক্তি বৃত্তিচালিত হয়ে যান্ত্রিক আচরণের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। সে রূপ মৌমাছির সমাজবিন্যাসে বেশ পরিস্ফুট। তৃতীয় রূপে তা স্থাণুভাব ত্যাগ করে এবং বৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বুদ্ধিশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আপনার সমস্যা আপনি সমাধান করতে চেয়েছে। সে রূপ স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে সাধারণভাবে প্রকট এবং পরিপূর্ণভাবে প্রকট মানুষের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে প্রাণশক্তিই[৪] মূল শক্তি। তারই এরা বিভিন্ন প্রকাশ। এই প্রাণশক্তিকে বের্গসঁ ঈশ্বরের আসনে স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনায় যখন জড়শক্তিও স্বীকৃত, এ ঈশ্বর সর্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর নন। জড়শক্তি তাঁর ক্ষমতাকে সীমিত করে। সুতরাং বের্গসঁ দ্বৈতবাদী। এই প্রসঙ্গে এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে দৈহিক ক্রমবিকাশের আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে যে মানুষের মানসিক পরিবর্ধনের পথ খুলে গিয়েছে সে বিষয় বের্গসঁ কিছু বলেন না। মানুষের ক্রমবিকাশ দৈহিক ক্রমবিকাশকে ডিঙিয়ে গিয়ে যে মানসিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে মানুষকে একটি অনন্যসাধারণ জীবে পরিণত করেছে, সে বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও ডুনুয়ি বিশেষ অবহিত ছিলেন। বের্গসঁ কিন্তু সেদিকে

১ Finalism

২ "We must get beyond both points of view-mechanism and finalism-as being at bottom only standpoints to which the human mind has been led by considering the work of man.' Creative Evolution, p. 89

৩ Instinct ৪ Elan vital

মনোযোগ দেন নি। এইখানেই 'লক্ষ্যবাদের' সহিত বের্গসঁ-এর 'সৃষ্টিধর্মী ক্রমবিকাশ বাদের' মূল পার্থক্য।

জড়বাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার সহিত এই শ্রেণীর ব্যাখ্যার পার্থক্য হল, যাঁরা এই মত পোষণ করেন তাঁরা ক্রমবিকাশে পরিবেশের প্রভাবকেই একমাত্র সক্রিয় শক্তি বলে স্বীকার করেন না; তাঁরা জীবদেহের অভ্যন্তরে একটি উদ্দেশ্যমূলক শক্তির ভূমিকাও স্বীকার করেন। অবশ্য কেহ কেহ বাহির হতে আরোপিত উদ্দেশ্য স্বীকার করেন; কিন্তু সকলে তা করেন না। বের্গসঁ বলেন প্রাণশক্তি স্বাধীনভাবে জড় বস্তুর মধ্যেই ক্রিয়া করে। তাঁর এই প্রাণশক্তি তত্ত্বকে অনেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এটা ব্যাখ্যা করবার অক্ষমতাকে গোপন করবার জন্য একটি নূতন কথা আমদানী করার সমস্থানীয়। তাঁদের ধারণা কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে জড়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই প্রশস্ত ব্যাখ্যা; তাকে প্রত্যাখ্যান করে একটি অতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তির ভূমিকা অবতারণা করা অতি দুর্বল যুক্তি[১]।

এই প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে জর্জ গেলার্ড সিমসন এর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ জুলিয়ান হাক্সলি ও তাঁর মত সমর্থন করেন। তাঁদের মতে প্রাণশক্তি তত্ত্বের অবতারণাকরে ক্রম-বিকাশের ব্যাখ্যার চেষ্টা উপহাসযোগ্য। তা বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের প্রক্রিয়ার ইঞ্জিনশক্তি দ্বারা ব্যাখ্যার সমস্থানীয়[২]; অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ব্যাখ্যাকে কেবল সীমাবদ্ধ রাখতে হবে উত্তপ্ত জলের বাষ্পে পরিণত হবার ফলে যে প্রচণ্ড স্ফীতিশক্তি সঞ্চারিত হয় কেবল তার মধ্যেই। তা না করে বাষ্পীয় শক্তি বলে একটি কথার আমদানী করে তাব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা উপহাসাস্পদ হওয়া।

কিন্তু সত্যই কি এটা এমন উপহাস করবার বস্তু? বাষ্পের স্ফীতিশক্তি যে ইঞ্জিনকে চালিত করে তা সত্য এবং এখানে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এখানেও কি তার মধ্যে একটি অতিরিক্ত শক্তি ক্রিয়াশীল নয়? এরিসটটল এই বিষয়টি পরিষ্কার করবার জন্য একটি অতিরিক্ত কারণের

১ Ignava ratio

২ "As Huxley has remarked the vitalist's ascribing evolution to an elan vital no more explained the history of life than would, ascribing its motion to an elan locomotif explain the operation of a steam engine."

Simpson, The Meaning of Evolution, 8

উল্লেখ করেছিলেন। সেটি হল উদ্দেশ্য কারণ[১]। তা ছাড়াও তিনি তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন যার অস্তিত্ব আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমর্থন করে। তারা হল উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ এবং রূপ কারণ। এরিসটটল-এর প্রবর্তিত চারটি কারণই সুন্দরভাবে মনুষ্যনির্মিত যে কোন বস্তু বা যন্ত্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের কথা যখন উত্থাপিত হয়েছে তার ওপরেই তা প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে।

ইঞ্জিনের উপাদান কারণ প্রধানত ইস্পাত। কারণ তা দিয়েই তার দেহ গড়া হয়; সঙ্গে অন্য ধাতুও কিছু কিছু থাকতে পারে। ইঞ্জিনের নিমিত্তকারণ হল সেই কারিগরগণ যারা ইস্পাতের সাহায্যে তার দেহ ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে। তার রূপ কারণ হল যে নক্সার অনুসরণে তা নির্মিত হয়েছে তাই। ইঞ্জিনের অতিরিক্ত একটি উদ্দেশ্য কারণও আছে। যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি বস্তু নির্মিত হয়, তাই হল তার উদ্দেশ্য কারণ। বস্ত্র বয়ন করা হয় পরবার জন্য। পরবার উদ্দেশ্যই তার উদ্দেশ্য কারণ। অনুরূপভাবে ইঞ্জিনের উদ্দেশ্য কারণ হবে মানুষের দ্রুতগতিতে ভ্রমণের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাপূরণের জন্য বৈজ্ঞানিক উপদেশ দিয়েছেন বাষ্পের স্ফীতিশক্তিকে কাজে লাগানো যায়; তখন ইঞ্জিনিয়ার তাকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত একটি যন্ত্রের নক্সা তৈরি করেছেন এবং সেই নক্সার অনুসরণেই কারিগর কারখানায় বসে ইঞ্জিন গড়েছেন।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যাবে যে কেবল মাত্র বাষ্পের স্ফীতি শক্তির সাহায্যে ইঞ্জিনের চাকা ঘোরাবার ক্ষমতা কার্য-কারণ সম্বন্ধের যোগে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি জড়বাদের ব্যাখ্যা। কিন্তু সেই ব্যাখ্যাই কি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা? দ্রুতগতিতে চলবার উদ্দেশ্য ও একটি ব্যাখ্যা এবং তা যে শক্তির উল্লেখ করে তার ভূমিকা এখানে গৌণ নয়। তা না থাকলে ইঞ্জিন নির্মাণ-ই হত না। এক্ষেত্রে কেবল ইঞ্জিনশক্তির দ্বারা ব্যাখ্যার চেষ্টা সত্যই উপহাসের বস্তু হত, কারণ বাষ্পেব স্ফীতিশক্তিই ইঞ্জিনশক্তি। কিন্তু উদ্দেশ্য-কারণকে অন্যতম শক্তি বলে উল্লেখ করা আদৌ উপহাসের বিষয় নয়।

বের্গসঁ-এর দর্শনে প্রাণশক্তির সাহায্যে ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা। কারণ প্রাণশক্তি উদ্দেশ্যমূলক। সেই উদ্দেশ্য হল বিশেষ বিশেষ ~~শ্রেণীর~~ জীবকে পরিবেশের উপযোগী করে গড়ে তোলে। এই উদ্দেশ্যের

১ Final Cause

অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ তা মানসিক বস্তু। প্রাণীদের আচরণ এবং সজ্জা হতেই তার অস্তিত্ব অনুমান করে নিতে হয়। এমন অনুমান করার সপক্ষে জীবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য মানুষের নির্মিত যন্ত্র এবং প্রকৃতির মধ্যে স্বতঃবিকশিত প্রাণী দেহের সহিত উদ্দেশ্য কারণের সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষ ও নির্মিত যন্ত্রের ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধ বাহিক। মানুষের উদ্দেশ্য মানুষের মনে থাকে আর তাকে চরিতার্থ করবার জন্য সে নানা উপাদানের সংযোগে বাহির হতে একটি যন্ত্র নির্মাণ করে। এখানে উদ্দেশ্য বাহির হতে কাজ করে। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণশক্তি কাজ করে দেহের অভ্যন্তরে থেকেই। কাজেই তার উদ্দেশ্য ও প্রচ্ছন্নভাবে ভিতর হতেই কাজ করে।

কাজেই প্রাণশক্তির সাহায্যে ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা প্রথমতঃ ইঞ্জিন শক্তির সাহায্যে ইঞ্জিনের ব্যাখ্যার সমস্থানীয় নয়। ইঞ্জিনশক্তি বাষ্পের স্ফীতিশক্তি হতে বিভিন্ন নয়, কাজেই এখানে দ্বিরুক্তিদোষ এসে পড়ে; সত্যই তা কোন নূতন আলোকপাত করে না। দ্বিতীয়ত, এ ব্যাখ্যা উপহাসযোগ্য নয়; কারণ এটি তথ্য দ্বারা সমর্থিত তত্ত্ব এবং এই ব্যাখ্যায় একটি অতিরিক্ত শক্তির ভূমিকা যুক্তিসঙ্গতভাবেই স্বীকৃত। মানুষের একটি যুক্তিকে বা প্রতিপাদ্যকে উপহাস করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা তখনই প্রকট হয়, যখন যুক্তি দ্বারা তাকে খণ্ডন করা যায় না। নিজের দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা হতেই এই ধরনের আচরনের উদ্ভব হয়। এখানেও কি সেই ধরনের ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করছি না?

বহুবাদ শুধু জড়পদার্থকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে না, চেতন পদার্থকে ভিত্তি করেও জড়বাদ গড়ে উঠতে পারে। তার সুন্দর উদাহরণ মেলে লাইবনীটজ-এর দর্শনে। তিনি বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছেন চৈতন্যময় অসংখ্য বিশ্লিষ্ট পদার্থের সাহায্যে। তারা ঠিক জড়বাদের অণুর মত নয়। তারা বিশ্বের মৌলিক সত্তা। তাদের তিনি বৈজ্ঞানিক জড়বাদের অণু হতে পৃথক-ভাবে চিহ্নিত করবার জন্য নাম দিয়েছেন 'মনাড'। দার্শনিক ক্রনোই এই শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে এগুলিই হল বিশ্বের মৌলিক ঐকিক সত্তা; তাদের ব্যাপ্তিও আছে, জ্ঞানশক্তিও আছে। লাইবনীটজ এই শব্দটিকে একটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতেও এগুলি মৌলিক সত্তা; কিন্তু এগুলির ব্যাপ্তি নেই, এরা অবিভাজ্য, উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত এবং ক্রিয়াশীল। এরা পরস্পর হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং কোন

কোন সংযোগ রক্ষা করে না। তাঁর দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখন দেওয়া যেতে পারে।

জড়বাদের অণুতত্ত্বকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন একটি বিশেষ ধারণার বশবর্তী হয়ে। তাঁর ধারণায় যা বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব তার দুটি গুণ অবশ্য থাকা প্রয়োজন—অবিভাজ্যতা ও বাস্তবতা। তাঁর মতে এই দুটি গুণ কেবল চেতনা শক্তিরই আছে। যার ব্যাপ্তি আছে তাকে মূল তত্ত্ব বলে স্বীকার করা যায় না, কারণ তা অবিভাজ্য নয়। অপরপক্ষে গণিতের বিন্দু অবিভাজ্য, কিন্তু তা কল্পিত, তার অস্তিত্ব নেই। কেবল মানসধর্মী পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে অথচ তাকে ভাগ করা যায় না। তাকেই তিনি মনাড বলেছেন।

এই মনাডগুলি সংখ্যায় বহু। তারা সক্রিয় সত্তা। তারা অদৃশ্য কিন্তু সমগ্র বিশ্বের উপাদান। এরা বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন গুণের। তার জন্যই বিশ্বের মধ্যে এত বৈচিত্র্য। লাইবনীটজ এদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সবার নীচের শ্রেণীতে পড়ে জড়পদার্থ ও উদ্ভিদ। তাদের জ্ঞানশক্তি আছে, কিন্তু স্তিমিতরূপে, যেমন মূর্চ্ছিত জীবে থাকে। পরের শ্রেণীতে আসে সাধারণ জীব। এদের মধ্যে জ্ঞানশক্তি আংশিক বিকশিত। এদের অনুভূতি ও স্মৃতিশক্তি আছে, কিন্তু বুদ্ধিশক্তি নেই। তাদের ওপর আছে মানুষের মত সত্তা। সেখানে বুদ্ধিশক্তি ক্রিয়াশীল ও আত্মচেতনা পরিস্ফুট। এই বিভিন্নশ্রেণীর মনাডের সমাবেশেই বিশ্ব গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরও একটি মনাড, তবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনাড।

এই মনাডগুলি কল্পিত হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট রূপে। কোন মনাডের সঙ্গে অন্য মনাডের সংযোগও নেই প্রভাবও নেই। তাদের জানালাবিহীন বদ্ধ ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাহিরের সঙ্গে সংযোগের কোন ব্যবস্থা তাতে নেই। তা হলে বাহির সম্বন্ধে জ্ঞানের উদ্ভব হয় কি করে বা পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা হয় কি করে? এই দুটি সমস্যার তিনি নিজের মত করে একটা সমাধান দিয়েছেন।

প্রথমত ধরা যাক জ্ঞানের সমস্যা। লাইবনীটজ বলেন বাহিরের সঙ্গে সংযোগ না থাকলেও এই জ্ঞান সম্ভব, কারণ প্রত্যেকটি মনাড একটি দর্পণের মত কাজ করে। দর্পণ যেমন নিজের মধ্যে বাহিরের বস্তুর প্রতিচ্ছবি ধরতে পারে, মনাডও তেমন পারে। কিন্তু দর্পণের ক্ষেত্রে ত বাহির হতে আলোক আসে অথচ মনাডের ক্ষেত্রে ত তেমন কোন সংযোগ সূত্র নেই। তিনি বলেন

তবু প্রতিফলিত হয়, তবে মনাডের অন্তর্নিহিত শক্তির গুণে। তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া হতেই এই প্রতিফলন সম্ভব ; তার কারণ প্রতি মনাডের ভিতর সমগ্র বিশ্ব বীজাকারে আছে। সুতরাং প্রতি মনাড এক একটি ক্ষুদ্র বিশ্বের মত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, বিভিন্ন মনাডের পরস্পরের সংযোগ যদি না থাকে তা হলে বিশ্বে সঙ্গতি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা হয় কি করে? তিনি বলেন সেটা সম্ভব হয় মনাডগুলির গঠন প্রকৃতির জন্য। তারা এমনভাবে গঠিত হয় যে প্রত্যেকে পৃথকভাবে কাজ করলেও তাদের পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি ঘড়ি স্বয়ং সম্পূর্ণ, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবু তারা একই সময় দেয়। এও তেমনি। একটি পূর্ব হতে আয়োজিত ব্যবস্থার গুণে এটি সম্ভব হয়। তিনি তাই এই তত্ত্বকে প্রাক-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতি[১] নাম দিয়েছেন।

লাইবনীটজ-এর এই তত্ত্ব এইভাবে অগণিত, বিশ্লিষ্ট, পরস্পর সম্পর্করহিত চেতন প্রকৃতির মৌলিক সত্তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। এতে এক রকম বাহাদুরী আছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু একে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে এমন কতকগুলি অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়ে যে যুক্তি প্রয়োগ করে তার অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদনের প্রয়োজন হয় না। যার বাহিরের সঙ্গে সংযোগ নেই তা বাহিরের জ্ঞান সঞ্চয় করবে কি করে? যারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে, কোন নিয়ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি আসবে কি করে? উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যাখ্যা অসঙ্গতি ও কষ্ট কল্পনা দোষে দুষ্ট।

(৪)

সামগ্রিক ঐক্যবাদী দর্শন

উপরের বিস্তারিত আলোচনার ফলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমত এটা দেখা আছে যে বিশ্বের গঠন প্রকৃতির সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় দার্শনিকদের মন একটি দোটানাভাবের দ্বারা দোলায়িত হয়। এখানে দুটি বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণ দেখা যায়। এক দিকে আছে যা এক, যা ধ্রুব, যা

১. Pre-established harmony

অচঞ্চল, যা নিত্য তার প্রতি আকর্ষণ। অপর দিকে আছে যা বহু, যা বিচিত্র নিত্যপরিবর্তনশীল তার প্রতি আকর্ষণ। এর ফলে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এক দিকে নিত্য, অবিনাশী, অচঞ্চল, বিশুদ্ধ একক সত্তার সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছে। সেই চেষ্টা হতে অতি উচ্চস্তরের মনীষার নিদর্শনরূপ এমন দর্শন গড়ে উঠেছে যাকে আমরা গ্রহণ করি বা না করি, অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি। প্লেটো-র সামান্যবাদ বা শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ বিশ্বের মানুষের যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে। অপর দিকে যা বহু, যা পরিবর্তনশীল এবং সেই কারণে অনিত্য, তার প্রতি আকর্ষণ বহুবাদের বিকাশের সহায়তা করেছে। বৈজ্ঞানিক জড়-বাদ তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। তা যান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন অণুর পরস্পরের সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছে। লাইবনীটজ-এর মনাড তত্ত্বে তার একটি নূতন রূপ পাওয়া যায়। তাও বহু বিভিন্ন, বিশ্লিষ্ট সত্তার সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছে। তাদের প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও তারা সমধর্মী।

দ্বিতীয় বিষয় যা স্পষ্ট হয়ে গেছে তা হল এই যে এই দুই শ্রেণীর তত্ত্বই একদেশদর্শী। কারণ তা হওয়া স্বাভাবিক; দুটি বিপরীতধর্মী মতের একটিকে গ্রহণ করলে এমনই ঘটে থাকে। এ অবস্থায় আদালতে বিভিন্ন পক্ষের সমর্থক উকিলের মত এদের সমর্থকগণ প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে খণ্ডন করাই কর্তব্য বলে মনে করেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের মতকে উপেক্ষা করাই রীতি হয়ে পড়ে। দর্শনে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। প্লেটো-র সামান্যবাদ যা বহু, যা পরিবর্তনশীল তাকে প্রকৃত সত্তা বলে স্বীকার করে নি; তাকে প্রকৃত সত্তার ছায়া বলে উপেক্ষা করেছে। অনুরূপভাবে শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকে অখণ্ডভাবে একক সত্তারূপে কল্পনা করেছে এবং সেই কারণ বহুর বিচিত্র সমাবেশে গঠিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে মায়া বা প্রপঞ্চ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। অপর দিকে বহুবাদ একককে আদৌ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, তার কাছে বহুই একমাত্র সত্য। তাই বৈজ্ঞানিক জড়বাদ অগণিত অণুর যান্ত্রিক সংঘাতের সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। তা বলেছে তাদের সমাবেশে যা ঘটে তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, নিতান্তই আকস্মিক। লাইবনীটজ-এর মনাড তত্ত্ব অনুরূপভাবে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে সঙ্গতি দেখা যায় তার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এক পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতির সাহায্যে।

তৃতীয় বিষয় যা স্পষ্ট হয়ে গেছে তা হল এই দুই শ্রেণীর একদেশদর্শী মত কখনও বিশ্বের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে ঠিক ধারণা এনে দিতে পারে না। এই প্রতিপাদ্যের মূল যুক্তি হল এই যে তারা একদেশদর্শী। এমন তত্ত্ব বিশ্বের সমগ্র রূপটি স্থাপন করতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় যুক্তি হল, তারা বিশ্বের যে অংশটি প্রতিপাদ্য মতটির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না, তাকে বর্জন করে। ফলে বর্জন করবার চেষ্টায় নিজেই অসঙ্গতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। উপরের আলোচনার মধ্যেই তা ধরা পড়ে। সুতরাং সবিস্তারে তার পুনরুল্লেখ করবার প্রয়োজন থাকে না। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে মনে হবে যে বিশ্বের রূপ বড় জটিল। তার মধ্যে বিপরীত ধর্মের সমাবেশ হয়েছে। তা বহু নিয়ে গঠিত, এও যেমন সত্য, তার মধ্যে যে একটি সামগ্রিকভাবে একতা পরিস্ফুট, এও সত্য। এদের সামঞ্জস্য সাধনের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পূর্ণরূপটিকে পাওয়া যাবে। বহুর মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে, সংগঠন আছে, উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া আছে, যুক্তিসম্মত চিন্তা আছে। বিশ্বের মধ্যে যে সামগ্রিক একত্বের আভাস পাওয়া যায়, এরা তারই প্রমাণ। অপরপক্ষে বহু হতে বিশ্লিষ্টভাবে ঐকিক মহিমায় মণ্ডিত হয়ে এক যে একান্তই একা আছেন তা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

এই কারণে একটি সমন্বয়ধর্মী ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই রকম ব্যাখ্যাও বিশ্বের কয়েকটি দর্শনে পাওয়া যায়। এখন তাই আমাদের আলোচনার বিষয় হবে। এই ব্যাখ্যার প্রকৃতি কি হবে উপরের আলোচনা হতে আমরা কিছুটা অনুমান করে নিতে পারি। তা ঐকিক তত্ত্ব এবং বহুতত্ত্ব উভয়কেই স্বীকার করে নিয়ে একটি দর্শন গড়তে চেষ্টা করবে। কাজেই তার মধ্যে বিশুদ্ধ একত্বও যেমন গ্রহণ করা হবে না, তেমন পরস্পর পৃথক এবং বিশ্লিষ্ট বহুত্বকেও গ্রহণ করা হবে না। সেখানে বহুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে এক হবে না, বহুকে অঙ্গীভূত করে এক হবে। তা হবে অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গী।

ঐকিক বস্তু দুই ধরনের হতে পারে। তা বিশুদ্ধভাবে এক হতে পারে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সূর্য। আমরা জানি সূর্য একটি নক্ষত্র; তার মধ্যে উত্তাপের মাত্রা এত বেশী যে সকল মৌলিক পদার্থগুলি সেখানে গ্যাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাকে একটি বিরাট গোলাকার বস্তু হিসাবে কল্পনা করতে পারি। তার মধ্যে বিভাগ নেই, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুগুলি সেখানে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে তার দেহ সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়ত, বস্তু জটিল-ভাবে এক হতে পারে। তার অর্থ তার মধ্যে বহু ও একের একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে। তার সুন্দর নিদর্শন আমাদের দেহ। একে ইংরাজিতে যা বলা হয় তার বাংলা প্রতিশব্দ হবে অঙ্গী[১]। এর মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, অথচ তারা পরস্পর সুসংবদ্ধ, তারা একযোগে কাজ করতে পারে। তারা নিয়ন্ত্রিত হয় একটি নিয়ন্ত্রক শক্তিদ্বারা যার উদ্দেশ্য হল দেহকে সংরক্ষিত করা। এর সঙ্গে একজন সেনাপতি পরিচালিত সৈনিকদলের তুলনা চলে। সৈনিকেরা ব্যক্তি হিসাবে বহু, কিন্তু দল হিসাবে এক। তাদের একত্বের বাহিরের পরিচয় হল তাদের নেতার নির্দেশমত একযোগে কাজ করার ক্ষমতা। একটি সৈন্যদল এইভাবে বিশ্লিষ্টভাবে বহু, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এক। এর একত্বের থেকে দেহের একত্ব আরও গভীর। এখানে একত্ব কৃত্রিমভাবে আরোপিত। দেহের অংশগুলিকে সংহত করে যে একত্ব বিরাজমান, তা স্বাভাবিক, তা ভিতর হতেই গড়ে উঠেছে।

আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধানের সূত্র মিলবে এই জটিল একের মধ্যে। শংকরাচার্যের বিশুদ্ধ একবাদ পাব যদি একটি সেনাদলের বিশেষ বিশেষ সৈনিককে অস্বীকার করে কেবল সেনাপতিকেই সত্য বলে গ্রহণ করি। বৈজ্ঞানিক বহুবাদকে পাব যদি সেনাপতিকে অস্বীকার করে কেবল ব্যক্তিরূপী সৈন্যগুলিকে স্বীকার করি। দুইকে নিয়েই সমগ্রটিকে পাই। বহুর মধ্যে সামগ্রিকভাবে আমাদের একের সন্ধান করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি পারিভাষিক সমস্যার সমাধান আমাদের প্রথমেই করে নিতে হবে। যে তত্ত্ব বহু অংশ বিশিষ্ট এক তত্ত্বকে স্বীকার করে তাকে সূচিত করতে ইংরাজিতে যে পারিভাষিক শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে তা হল 'প্যানথীয়িজম'[২]। আমরা তার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'সর্বেশ্বরবাদ' কথাটির ব্যবহার করেছি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ফলে একটি অস্পষ্টতা এসে পড়ে। পাশ্চাত্যদর্শনে প্যানথীয়িজম কথাটির ব্যবহার করা হয় দুটি বিভিন্ন অর্থে। প্রথম অর্থ হল তা সেই তত্ত্বকে বোঝায় যা বলে ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রূপে বর্তমান, তাঁর পৃথক অস্তিত্ব নেই। এই অর্থ ধর্মশাস্ত্রের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় অর্থ এই করা হয় যে তা বোঝায় যে বিশ্ব-সত্তার গঠন-প্রকৃতি এমন যে তাতে বহুকে জড়িয়ে নিয়ে সামগ্রিকভাবে

১ Organism ২ Pantheism

একত্ব পরিস্ফুট।[১] বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনায় এই অর্থেই তার ব্যবহার। আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই অর্থই প্রশস্ত। কিন্তু একই পারিভাষিক শব্দের দুই অর্থে ব্যবহারে একটা অসুবিধা এসে পড়ে। তা চিন্তার স্বচ্ছতা এবং স্পষ্টতা রক্ষার অন্তরায়। তাই তা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। এই শব্দটির পারিভাষিক অর্থের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের সংযোগ সুস্পষ্ট। সে ক্ষেত্রে সেই প্রসঙ্গেই এর প্রতিশব্দ সর্বেশ্বরবাদ শব্দটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা উচিত বলে মনে হয়। বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে একটি পৃথক পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করাই প্রশস্ত বলে মনে হয়। আমরা তাই যে তত্ত্ব বিশ্বের গঠনের ব্যাখ্যায় বহু ও একতত্ত্ব উভয়কেই স্বীকার করে তাকে সামগ্রিক একবাদ[২] বলব।

সামগ্রিক একবাদের দৃষ্টান্ত আমরা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্রথম পাই শেলিং-এর প্রাকৃতিক দর্শনে। তিনি এককালে খুব জনপ্রিয় দার্শনিক ছিলেন। এমন কি বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল যে প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন তার বিষয় ছিল এই শেলিং-এরই দর্শন।[৩] তবু তিনি বর্তমানে অবহেলিত হয়েছেন। পূর্বে রচিত দর্শনের ইতিহাসে তাঁর দর্শন আলোচিত হয়েছে, কিন্তু সম্প্রতি তা হচ্ছে না। ডুরাণ্ট তাঁর দর্শনের ইতিহাসে তাঁকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। রাসেল-এর দর্শনের ইতিহাসেও তিনি বর্জিত হয়েছেন। তার একটা কারণ যে নেই তা নয়। তাঁর দর্শন একটি পরিপূর্ণ রূপ পায় নি। কারণ তাঁর নিজস্ব মত বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। অথচ এই বিভিন্ন অবস্থার মতের মধ্যেও কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। তাঁর চিন্তার প্রথম যুগে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যেই প্রাকৃতিক দর্শন গড়ে ওঠে। এই দর্শনে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে একটি বিশ্বাত্মার পরিকল্পনা আছে।[৪] দ্বিতীয় যুগে প্রকৃতির জগৎ এবং চিন্তার জগতের অভিন্নতাই তাঁর প্রতিপাদ্য। এখানে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[৫] শেষের দিকে প্লেটোর অনুসরণে তাঁর বিশুদ্ধ একত্বের প্রতি আকর্ষণ লক্ষিত হয়। তখন তাঁর

১ D. D. Runes এর Dictionary of Philosophy দ্রষ্টব্য

২ Composite Monism

৩ On the difference between the systems of Fichte and Schelling দ্রষ্টব্য

৪ Ideas towards a Philosophy of Nature এবং On the World Soul এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য

৫ এই প্রসঙ্গে System of Transcendental Idealism দ্রষ্টব্য

প্রতিপাদ্য হয় অসীমই মূল সত্তা। যে বিশ্ব অসীম হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তা মূল সত্তা নয়।[১] মনে হয় তাঁর দর্শনের পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করবার সুযোগ ঘটে নি এবং সেই কারণেই বিভিন্ন সময়ে রচিত গ্রন্থগুলির প্রতিপাদ্যের মধ্যে এমন অনৈক্য এসে পড়েছে।

তবু তাঁর প্রকৃতি-দর্শনের আলোচনার একটি তাৎপর্য আছে। কারণ পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এইখানেই প্রথম বিশুদ্ধ একবাদ এবং বহুবাদের মধ্যে সমন্বয়ের একটি চেষ্টা হয়েছে। একে সামগ্রিক একবাদই বলি বা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পরিভাষার অনুসরণে সর্বেশ্বরবাদ বলি এর মূল পরিচয় হল প্রকৃতির মধ্যে যে আপাতদৃষ্টিতে বহুর বিশ্লিষ্ট সমাবেশ দেখা যায়, তার ওপর একটি অতিরিক্ত তত্ত্বের সাহায্যে সামগ্রিকভাবে একটি একত্ব আরোপ করার চেষ্টা হয়েছে। তাঁর দর্শনে এই সংযোজক শক্তি হল বিশ্বসত্তা। পশ্চিমে এই ধরনের চেষ্টা তাঁর দর্শনেই প্রথম হয়েছিল। সেই কারণেই এখানে তার আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে শেলিং-এর পূর্বে কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের চিন্তাধারায় সর্বেশ্বরবাদের[২] কিছু ছায়াপাত হয়েছিল। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই তত্ত্বের যা মূল লক্ষণ এঁদের দর্শনে তা পাওয়া যায় না এবং সেই কারণে তাদের এই শ্রেণীর দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যে যে দার্শনিকের চিন্তায় সর্বেশ্বরবাদের ছায়াপাত হয়েছিল তাঁরা হলেন জিয়োর্দানো ব্রুনো, মালেব্রাঁশ ও স্পিনোজা। এখানে তাঁদের দার্শনিক তত্ত্বকে একে একে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি তাদের প্রকৃত সর্বেশ্বরবাদী বলে চিহ্নিত করা যায় কিনা।

জিয়োর্দানো ব্রুনো ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী ; যুক্তি দিয়ে যে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হতেন তা প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরোধী হলেও প্রচার করতে ভয় পেতেন না। এই নির্ভীকতার জন্য তাঁর জীবন দিতে হয়েছিল। খৃষ্টধর্ম বিরোধী তত্ত্বপ্রচারের অপরাধে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। জ্ঞানের সাধনায় অধিকার স্থাপনের জন্য তিনি সক্রেটিস-এর মত শহীদ হয়েছিলেন। যাক সে কথা ; সংক্ষিপ্তভাবে

১ এই প্রসঙ্গে Exposition of the True Relation of Nature Philosophy to the Amended Fichtian Views দ্রষ্টব্য

২ Pantheism

বলা যায় তাঁর দার্শনিক মত ছিল এই যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং তার প্রত্যেক অংশ ঈশ্বর কর্তৃক সঞ্জীবিত। তবে তাঁর দর্শনে ঈশ্বরই একমাত্র তত্ত্ব নন; অতিরিক্তভাবে বিশ্বে অনেক নিত্য খণ্ড সত্তা আছে বলে স্বীকৃত। এই স্থায়ী সত্তাগুলির তিনি 'মনাড' নাম দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের আত্মাও এই রকম একটি নিত্যস্থিতিশীল মনাড এবং ঈশ্বর হলেন মনাডদের মধ্যে রাজা, তিনি মহামনাড। প্রত্যেক মনাড একাধারে জড়রূপ ও চৈতন্যরূপ। ক্ষুদ্রতম অণুও মনাড আবার গ্রহ-নক্ষত্রও এক একটি মনাড। সুতরাং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এখানে সামগ্রিক একত্ববাদ পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে নি। ঈশ্বর যদি অন্য মনাডের মত একটি মনাড হন তা হলে এখানে বহুবাদের প্রতি আকর্ষণ বড় হয়ে পড়ে। মনে হয় লাইবনীটজ যেন ব্রুনোর দর্শনের এই অসঙ্গতি বর্জন করেই তাঁর নিজস্ব বিশুদ্ধ বহুবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তা হতেই বোঝা যাবে এ দর্শন ততটা সামগ্রিক একবাদের প্রতি আকৃষ্ট নয় যতটা ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত বহুবাদের প্রতি। তাঁর দর্শন ততটা সর্বেশ্বরবাদের দিকে ঝোঁকে নি যতটা একেশ্বরবাদের[১] দিকে ঝুঁকেছে।

মালেব্রাঁশ ছিলেন ফরাসী ধর্মযাজক। তাঁর দর্শনের ভিত্তি হল মনের বহির্জগতের সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রকৃতির উপর। তাঁর ধারণায় মানুষের মন ও বহির্জগত পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় পদার্থ এবং তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান কি করে সম্ভব, এই প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। তার উত্তরে তিনি বলেছেন মন ও বহির্জগতের বাহিরে একটি তৃতীয় পদার্থই তা সম্ভব করে। সেই তৃতীয় পদার্থই ঈশ্বর। তিনি সমস্ত বস্তু দর্শন করছেন। অন্তর্জগত ও বহির্জগত পরস্পর পৃথক হলেও তিনি উভয়কে ধারণ করে আছেন। তাঁর মধ্যেই আমরা প্রত্যয়ের সাক্ষাৎ পাই। বলা বাহুল্য এখানে বহুবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদ যেন কি রকম খানিকটা মিশ্রিত হয়ে গেছে। এঁর চিন্তার মধ্যে খানিক সাদৃশ্য পাই বার্কলে-র দর্শনের সঙ্গে এবং খানিক পাই স্পিনোজার দর্শনের সঙ্গে। মোটামুটি তাঁর বেশী আকর্ষণ দ্বৈতবাদের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছেন বহির্জগতের জ্ঞান কি করে সম্ভব হয় তার ব্যাখ্যা করতে। তাঁর দর্শন সম্বন্ধে তারকচন্দ্র রায় ঠিকই মন্তব্য করেছেন, "মালেব্রাঁশ দেকার্ত-এর মতকে সর্বেশ্বরবাদের দ্বারদেশ পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন; আর একটু অগ্রসর

১ Theism

হইলেই তিনি সর্বেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ক্যাথোলিক সংস্কার তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই।"[১]

স্পিনোজা বিশ্বের মূল সত্তার নাম দিয়েছেন মৌলিক সত্তা[২], তিনিই ঈশ্বর। তাঁর দুটি গুণ[৩] এবং এই গুণ দুটির অসংখ্য বিকার আছে। এই তিন তত্ত্ব নিয়ে স্পিনোজা-র দর্শন। মৌলিক সত্তার একটি গুণ ব্যাপ্তি এবং অন্যটি চেতনা। এরা একই মূল সত্তার দুই দিক। তাদের পরস্পরের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, তবু তাদের মধ্যে ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ঘটে একই মূল বস্তুর তারা বিভিন্ন দিক বলে। এই দুই গুণের বিকার[৪] হতে বিশ্বে বহু ও নানা বস্তুর সৃষ্টি হয়। তাদের কেউ চৈতন্যধর্মী, কেউ জড়ধর্মী। তাঁর ধারণায় প্রকৃতির মধ্যেও মূলসত্তা ক্রিয়াশীল, তবে যে প্রকৃতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে আমাদের পরিচয় ঘটে তাকে তিনি ঈশ্বর হতে পৃথক করে রেখেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রকৃতির মধ্যে বিশ্লেষণ করে দুটি অংশ দেখিয়েছেন। তার একটির নাম দিয়েছেন সৃষ্টিধর্মী প্রকৃতি[৫] এবং অপরটির নাম দিয়েছেন জড়ধর্মী প্রকৃতি[৬]। প্রথমটির সঙ্গে বের্গসঁ-এর প্রাণশক্তি তত্ত্ব[৭] তুলনীয়। তাকেই তিনি ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলেছেন। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর জড়ধর্মী যে প্রকৃতি তাকে তিনি ঈশ্বর হতে পৃথক রেখেছেন। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন উৎপাদক কারণ হিসাবে তিনি ঈশ্বরকে প্রকৃতি হতে পৃথক ভাবেন না, সেখানে তিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকেই ক্রিয়া করেন[৮]; তা বলে প্রকৃতির জড়রূপ ও ঈশ্বর যে একই বস্তু এ কথা স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত নন।[৯]

উপরের আলোচনা হতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। সামগ্রিক একবাদের বৈশিষ্ট্য হল তাতে ঐকিক তত্ত্ব বহুকে জড়িয়ে নিয়ে গড়ে ওঠে, বহু একের আশ্রয়ে সামগ্রিকতা মণ্ডিত হয়। এই লক্ষণ স্পিনোজা-র দর্শনে ঠিক পাওয়া

১ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়

২ Substance ৩ Attributes ৪ Modes

৫ Natura naturans ৬ Natura naturata ৭ Elan vital

৮ "I hold that God is the immanent and not the extraneous cause of all things." Epistle, 31

৯ "It is, however, a complete mistake on the part of those who say that my purpose……is to show that God and nature under which last term they understand a certain mass of corporeal matter are one and the same, I had no such intention." Ibid.

যায় না। তার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, তাঁর পরিকল্পনায় জড় পদার্থ, যার ব্যাপ্তি আছে এবং চেতন পদার্থ, যার ব্যাপ্তি নেই, তাদের মধ্যে এই বলে একটি পার্থক্য টানা হয় যে তাদের মধ্যে পরস্পরের ওপর ক্রিয়া সম্ভব হয় না। তাদের পরস্পরের আচরণে সঙ্গতির ব্যাখ্যার জন্য মূল সত্তা[১] নামে একটি তৃতীয় তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এর কাজ অনেকটা লাইবনীটজ-এর পরিকল্পিত প্রাক নির্ধারিত সঙ্গতি তত্ত্বের[২] অনুরূপ। এর ফলে মূলত তাঁর দর্শন একটি দ্বৈতবাদী তত্ত্বে পরিণত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, স্পিনোজা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তিতে ঈশ্বরের উপস্থিতি স্বীকার করেছেন, কিন্তু সৃষ্ট প্রকৃতি, যাকে তিনি 'ন্যাচুরা ন্যাচুরাটা' বলেছেন তাকে ঈশ্বর হতে পৃথক করে রেখেছেন। এ ত সামগ্রিক একবাদ বা সর্বেশ্বরবাদের লক্ষণের বিরোধী।

এখন আমরা শেলিং-এর প্রকৃতিবিষয়ক দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারি। প্রকৃতির ব্যাখ্যায় তিনি তিনটি তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। তার একটি হল জৈব প্রকৃতি। এখানে প্রকৃতি সৃষ্টিধর্মী, কিন্তু এই সৃষ্টি ধীর গতিতে চলেছে। তা হতে অনুমান করা যায় যে সৃষ্টির আকৃতি একটি বিরোধী শক্তির সম্মুখীন হচ্ছে। এই বিরোধী শক্তি কি, তা ঠিক স্পষ্ট করে তিনি উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত পরবর্তীকালে তাই বের্গস-এর দর্শনে জড়শক্তির স্থান গ্রহণ করেছে। এই সৃষ্টি কার্যের ক্ষেত্রে "উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের সংযোগ"[৩] দেখা যায়। সেই পথেই বিভিন্ন জাতির বিকাশ ঘটে। এখানে প্রকৃতির লক্ষ্য জাতিকে সংরক্ষিত করা, বিশেষ তার উপায়স্বরূপ, তার ভূমিকা গৌণ। মানুষ, নিম্নশ্রেণীর জীব এবং উদ্ভিদ প্রকৃতির এই অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্ব হল জড়প্রকৃতি। তা জৈবপ্রকৃতির বিপরীতধর্মী। তা সৃষ্টিধর্মী নয়। তা বহু উপাদানের সমষ্টি মাত্র। জড় বস্তুর পরস্পরের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই, কেবল স্থানের কাঠামোতে পরস্পরের পাশে অবস্থিত। যে শক্তি এইভাবে তাদের একত্র স্থাপিত করে রেখেছে তা হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। জড় প্রকৃতি জৈবপ্রকৃতি হতে ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। জড়ের মধ্যেও কিছু ক্রিয়াশীলতার লক্ষণ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি জীবের প্রজনন ক্রিয়ার সঙ্গে দুই বা তার অধিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার তুলনা করেছেন। জীবের উত্তেজনশীলতার সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির

১ Substance ২ Pre-established harmony

৩ Adaptation of means to an end.

তুলনা করেছেন এবং জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়ার সঙ্গে জড়ের চৌম্বক শক্তির তুলনা করেছেন।

তৃতীয় তত্ত্ব হল সজীব ও নির্জীব, পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া আছে। জড়ের উপর নির্ভর করেই জৈব শক্তির বিকাশ সম্ভব। জৈব প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটি উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া দেখা যায়, জড় প্রকৃতির মধ্যেও শক্তির সুবিন্যস্ত অভিব্যক্তি[১] দেখা যায়। এই অবস্থা হতে তিনি অনুমান করেছেন যে উভয়েই একই উৎস হতে উৎসারিত হয়েছে। জড় ও জৈব জগতকে ধারণের জন্য এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এইভাবে একটি তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এই তৃতীয় শক্তিকে তিনি বিশ্বের আত্মারূপে কল্পনা করেছেন।[২] এই বিশ্বাত্মাই বিশ্বকে ধারণ করে এবং জৈব ও জড় প্রকৃতির সংযোগ সাধন করে। উভয়েই সেই বিশ্বশক্তির প্রকাশ। তিনি অঙ্গী এরা তাঁর অঙ্গ। জড় এবং জৈব প্রকৃতি এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত বলেই আমরা দেখি একই প্রজ্ঞা উভয়ের মধ্যেই প্রতিফলিত। তাই মানসিক চিন্তাকে যে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত করে, প্রকৃতির ক্রিয়াকেও তা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই দেখি যা একটি বিশেষ পদার্থের গুণ তাই ইন্দ্রিয়োপলব্ধির রূপ নেয়, যা দোখ তা মনের উপলব্ধির বিষয় হয়। এইভাবে দেখতে গেলে জড় ও জৈব প্রকৃতি জুড়ে এক অভিন্ন প্রজ্ঞা বিরাজ করছে মনে হবে।

উপরের আলোচনা হতে শেলিং-এর প্রকৃতির দর্শনের একটি ধারণা পাওয়া যাবে। তা হতে বোঝা যায় যে তাঁর দর্শনেই প্রথম পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে সামগ্রিক ঐক্যবাদের[৩] আবির্ভাব ঘটে। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের আংশিক সমর্থন দার্শনিক থিলির মন্তব্যে পাওয়া যাবে। তিনিও স্বীকার করেন যে শেলিং-এর দর্শন সামগ্রিক ঐক্যবাদের একটি দৃষ্টান্ত, কারণ এখানে বিশ্ব একটি অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গীরূপে কল্পিত হয়েছে; তাঁর ধারণায় বিশ্ব একটি বিকাশশীল সৃজনধর্মী সক্রিয় বিরাট সত্তা; সেখানে প্রত্যেক অংশের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে এবং সমগ্রের স্বার্থকে সংরক্ষিত করবার জন্য তারা পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। বহুর মধ্যে এখানে ঐক্য প্রতিফলিত এবং একের মধ্যে বহু বিধৃত।[৪]

১ Dynamic order ২ World soul ৩ Composite monism

৪ "In its developed state, Schelling's philosophy is a form of pantheism, in which the univers is conceived as a living evolving system; as an organism in which every part has its place and subserves the whole."
Thilly, History & Philosophy, p. 455

প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে যে দর্শন গড়ে উঠেছে তার মধ্যে সামগ্রিক ঐক্যবাদের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উপনিষদের এই তত্ত্বকে সাধারণত সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়; কিন্তু মনে হয় তা ততখানি সর্বেশ্বরবাদী নয় যতখানি সামগ্রিক ঐক্যবাদী। যে পরমশক্তির এখানে কল্পনা করা হয়েছে তার ঐক্যসাধক ক্ষমতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তার ঈশ্বরত্বের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি স্থাপন করা যেতে পারে। উপনিষদের মধ্যে ঈশ্বরকে ভক্তি করবার বা শ্রদ্ধা নিবেদন করবার ইচ্ছা কোথাও প্রকট নয়। সেখানে যে ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকট তা হল বিশ্বরহস্যকে জানবার ইচ্ছা। জ্ঞানের আকৃতিই সেখানে একমাত্র আকৃতি। বিশ্বসত্তাকে জানতে হবে এই হল উপনিষদের ঋষির একমাত্র কামনার বিষয়। ঐহিক ভোগসুখের ইচ্ছা সেখানে মানুষকে তৃপ্তি দেয় না। তা সেখানে সুবর্ণের শৃঙ্খলরূপে[1] বর্ণিত হয়ে প্রত্যাখাত হয়। সেখানে ঋষি বলেন বিত্তের দ্বারা মানুষ তৃপ্তি লাভ করে না।[2] সেখানে যে প্রার্থনা জানানো হয় তাতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদিত হয় না, বিশ্বসত্তাকে জানবার উপযুক্ত ধীশক্তি কামনা করা হয়।[3] সুতরাং এখানে ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দর্শন গড়ে ওঠে নি, বিশুদ্ধভাবে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা গড়ে

মৌলিক বিশ্বসত্তাকে সূচিত করতে তা যে শব্দগুলি ব্যবহার করে তাও আমাদের প্রতিপাদ্য সমর্থন করে। সেখানে তাকে সূচিত করতে তিনটি শব্দের প্রধানত ব্যবহার দেখা যায়: ব্রহ্মণ্, ভূমন্ ও আত্মন্। যা অতি বিরাট তাই ব্রহ্ম, ভূমন অর্থেও তাই বুঝি। তা মূলসত্তার সর্বব্যাপী রূপ সূচিত করে। আত্মন্ অর্থে যা গভীর, যা অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে তাই বুঝি। তা ব্রহ্মতত্ত্বের মৌলিক রূপটি সূচিত করে। এখানে কোথাও ভক্তি বা শ্রদ্ধার সহিত তাকে সংযুক্ত করা হয় নি। একটি স্থান ছাড়া কোথাও ঈশ্বর কথাটিরও ব্যবহার হয় নি। সেটি পাই ঈশ উপনিষদের প্রথম শ্লোকে। সেখানেও কিন্তু তাঁকে ভক্তির পাত্ররূপে বর্ণনা করা হয় নি; তাঁর ব্যাপকতাকেই পরিস্ফুট করা

১ বিত্তময়ী শৃঙ্কা

২ ন হ বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ ॥ কঠ।।১।।১।।২৭

৩ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ॥ বৃহদারণ্যক ;।৩।।৩।।৬

হয়েছে।[১] অর্থাৎ এখানে ব্রহ্মের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাই আমরা উপনিষদের দর্শনকে সামগ্রিক ঐক্যবাদের পরিপোষক বলে বর্ণনা করব। তাকে ব্রহ্মবাদও বলতে পারি; কারণ ব্রহ্মবাদী শব্দটির উপনিষদের মধ্যেই প্রয়োগ দেখা যায়। এখন আমরা উপনিষদের ব্রহ্মবাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদের প্রকৃতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হবে, যদি আমরা এরিস্টটল বর্ণিত চারটি কারণের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা করি। তিনি চারটি কারণের উল্লেখ করেছেন যা প্রাকৃতিক সৃষ্টি বা মানুষের নির্মিত বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। তারা হল উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ, রূপ কারণ ও চূড়ান্ত কারণ[২]। তাদের বোঝাবার জন্য আমাদের দেশের যুক্তিশাস্ত্রে যে দৃষ্টান্তটি সাধারণত ব্যবহার হয়, তারই এখানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ঘট যে নির্মাণ হয় তার প্রসঙ্গে এগুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ঘট মাটি দিয়ে তৈরি হয়; তাই মাটি তার উপাদান কারণ। কুম্ভকার তাকে রূপ দেয়; তাই সে হল নিমিত্ত কারণ। ঘট যে রূপে পরিবর্তিত হয় তা কুম্ভকারের মনের মধ্যে থাকে এবং নিপুণ অঙ্গুলি চালনার সাহায্যে চক্রে ঘূর্ণমান মৃৎপিণ্ডে তা সঞ্চারিত করে; তাই হল তার রূপ কারণ। যে উদ্দেশ্যের জন্য ঘট তৈরি হয় তাই তার চূড়ান্ত কারণ। সে উদ্দেশ্য হল জল রাখা।

আমরা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত একটি কারণেরও উল্লেখ পাই। সে কারণের প্রকৃতি এগুলি হতে স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানে ব্যবহৃত কার্য-কারণ তত্ত্ব একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে কল্পিত। তা প্রকৃতির নানা ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। সে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় আলোচ্য ঘটনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত তাকে যুক্ত করে। সেটিকে পরবর্তী ঘটনার কারণ বলে সূচিত করা হয়। কিন্তু যে কোন অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা কারণ বলে স্বীকৃতি পায় না। যেখানে তা অন্য-সর্ত-নিরপেক্ষভাবে পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে যুক্ত হয়, সেখানেই তা কারণ, অন্যত্র নয়[৩]। একটি বাস্তব উদাহরণ নিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। আমি দেশলাই দিয়ে বাতির সলতে জ্বালিয়ে দিলাম আর

১ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। ঈশ। ১

২ **Materiel Cause, Efficient Cause, Formal Cause, Final Cause,**

৩ **Unconditional antecedent.**

বাতি জ্বলল। এখানে মনে হতে পারে আমার দেশলাই জ্বালানোই বাতি জ্বলবার কারণ; কিন্তু তা নয়, দাহিকাশক্তিযুক্ত উত্তাপই বাতি জ্বলবার কারণ। দেশলাই না জ্বালিয়ে অন্যভাবেও সেই দাহিকাশক্তি প্রয়োগ করা যেত।

বিজ্ঞানে ব্যবহৃত কার্য-কারণ তত্ত্বের প্রকৃতি আরও ভালভাবে বোঝা যায় বিজ্ঞান নানা ঘটনার ব্যাখ্যায় তা কিভাবে ব্যবহার করে তার দ্বারা। বিভিন্ন ঘটনাকে কার্য-কারণের সম্বন্ধে সংযুক্ত করতে তা নানা কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করে এবং তাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে[১]। তার প্রয়োগ করেই প্রধানত এই ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়। এই ব্যাখ্যা তিনভাবে করা যায়। প্রথমত একটি ঘটনা ঘটলে তার অব্যবহিত পূর্বের অন্য-সর্তনিরপেক্ষ ঘটনাকে তার ব্যাখ্যা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন একটি কাচখণ্ড পাথর দিয়ে আঘাত করলে দেখা যাবে তা ভেঙে গেছে। এখানে বলা হবে পাথরের আঘাতেই এমন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত কারণ পরম্পরার সহিত যুক্ত করে ঘটনার ব্যাখ্যা হয়। যেমন বিদ্যুৎ চমকালে দারুণ শব্দ হয় দেখে আমরা ভাবি বিদ্যুৎই এই শব্দ ঘটায়। বিজ্ঞান বলবে বিদ্যুতের আবির্ভাবে বায়ুমণ্ডলে দারুণ সংঘাত হয়, সেই সংঘাত আমাদের কানের পর্দায় আঘাত করে বলে আমরা শব্দ শুনি। তৃতীয়ত একটি বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মকে একটি ব্যাপকতর প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে তার ব্যাখ্যা করা হয়। আমরা জানি শূন্যে কিছু নিক্ষেপ করলে তা ভূমির দিকে আকৃষ্ট হয়। আমরা বলি পৃথিবী সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে। বিজ্ঞান বলবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সমগ্র বিশ্বে ক্রিয়াশীল। তারই নিয়মানুবর্তী হয়ে পৃথিবী ভূপৃষ্ঠে বস্তুকে টানে। সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাবে কার্য-কারণ সংযোগ স্থাপন করে ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে।

বিজ্ঞানের এইভাবে কার্য-কারণের সংযোগ সাধন করে ঘটনা পরম্পরার ব্যাখ্যার একটি তাৎপর্য আছে। তা ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কাজে লাগে। তা এই কার্য-কারণের সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রকৃতির আচরণের মধ্যে নানা নিয়ম আবিষ্কার করে। তা ভবিষ্যদ্বাণী করবার সহায়তা করে। সব থেকে বড় সুবিধা তাকে ভিত্তি করেই মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা হলেও তার প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তা প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্য ব্যাখ্যা করে, তার বেশী নয়। সামগ্রিকভাবে বিশ্বকে বুঝতে তা বিশেষ

১ Laws of Nature

সাহায্য করে না। একটি বস্তু সৃষ্ট হয় কি করে, তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা তার সাহায্য পাওয়া যায় না। সেইখানেই এরিসটটল-এর কারণ তত্ত্বের উৎকর্ষ।

এই চারটি কারণের প্রয়োগ যে মানুষের সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে করা যায় তাতে সন্দেহ নেই। সৃষ্টি হিসাবে বিশ্বের গঠন প্রকৃতি জানতেও মনে হয় তা সাহায্য করে। তবে একটা বিষয় এখানে আমাদের সাবধান হতে হবে; এ ক্ষেত্রে নিতান্তই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি[১] যাতে না আরোপিত হয় তা দেখতে হবে। মানুষের নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর কারণ বিভিন্ন পদার্থ হতে পারে; কিন্তু যে শক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার সম্পর্কে এই বিভেদ না ঘটবারই সম্ভাবনা। কারণ মানুষের সঙ্গে সে যা নির্মাণ করে তার সম্পর্ক বাহ্যিক; কিন্তু বিশ্বের ক্ষেত্রে তা নয়, বিশ্বের বাহিরে যখন কিছু নেই, তার অভ্যন্তরেই যে তা ক্রিয়াশীল তা ধরে নিতে হবে।

আমাদের প্রতিপাদ্য হল উপনিষদের দর্শনে বিশ্বের গঠন সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তা বলে বিশ্বশক্তি বা ব্রহ্ম একাধারে বিশ্বের উপাদান কারণ, রূপ কারণ, নিমিত্ত কারণ এবং চূড়ান্ত কারণ। তার সমর্থনে নীচে প্রাসঙ্গিক তথ্য স্থাপিত হবে। তবে তার আগে তার তাৎপর্য কি দাঁড়ায় তা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। তাৎপর্য হল বিশ্বের মধ্যে বিশ্বশক্তি ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে; বিশ্বের মধ্যে যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে বহুর বৈচিত্র্যময় প্রকাশ তার মধ্যে সেই শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। সেই শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং সেই শক্তিই বিশ্বকে সামগ্রিকভাবে একত্বমণ্ডিত করেছে। বিশ্বের মধ্যেই যে বিশ্বশক্তি ছড়িয়ে রয়েছে তাই হল উপনিষদের প্রধান সুর। এই মন্তব্যের সমর্থনে উপনিষদের কিছু বাণী উদ্ধৃত করে আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে।

উপনিষদে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিতা গুণ প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, সেই অমৃত ব্রহ্মই আমাদের সম্মুখে, ব্রহ্ম আমাদের পশ্চাতে, তিনি আমাদের দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি উর্দ্ধে তিনি অধো দেশে; সেই বলিষ্ঠ ব্রহ্মই এই বিশ্বরূপে প্রসৃত।[২]

১ Anthropomorphic view.

২ ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্‌। মুণ্ডক। ২। ২। ১

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, যেমন উর্ণনাভ হতে তন্তু উৎপন্ন হয়, যেমন অগ্নি হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি এই আত্মা হতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা, সকল জীব উৎপাদিত হয়েছে।[১]

ব্রহ্ম বিশ্বের, সকল বস্তুর, সকল জীবের শুধু উৎপত্তি কারণ নয়, তারা ব্রহ্মের মধ্যেই অবস্থিত, ব্রহ্মের মধ্যেই তাদের প্রতিষ্ঠা। এই কথা বোঝাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে রথনাভি ও রথনেমিতে যেমন রথের চক্রের সমস্ত অরগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরকম এই ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যেই সকল জীব, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ এবং সকল জীবাত্মা আশ্রিত হয়ে গেছে।[২]

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই কথাগুলির সারমর্ম ছোট করে অল্প কথায় বুঝিয়েছে এই বলে যে এই সব কিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, পুষ্টি এবং বিলয়।[৩]

সুতরাং ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর প্রকট বিশ্ব হতে পৃথক নয়, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে বহুকে আশ্রয় করে, তাদের একত্বমণ্ডিত করেছে। এই হল উপনিষদের বাণীর মর্মকথা। বিশ্বশক্তির সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ কত নিগূঢ় তা বোঝাতে আমরা এখন বলতে পারি যে তা এমন নিগূঢ় যে এরিসটটল কথিত প্রত্যেকটি ভিন্ন শ্রেণীর কারণের লক্ষণই ব্রহ্মের কারণত্বে পাওয়া যায়। তিনি একাধারে বিশ্বের উপাদান কারণ, রূপ কারণ, নিমিত্ত কারণ ও চূড়ান্ত কারণ।

প্রথম কথা, ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান কারণ। মনে হয় ব্রহ্মই যে বিশ্বের উপাদান কারণ এই কথাটির ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। তাই যেন ব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধের নিগূঢ়ত্ব প্রমাণ করে। এই কথাটি বোঝাতে বলা হয়েছে বিশ্ব সম্বন্ধে সব থেকে বড় সত্য হল তাই যা জানলে তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এই কথাটি বোঝাতে একটি উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে। মানুষের নির্মিত বস্তুর মধ্যে দুটি জিনিস লক্ষণীয়, একটি তার বিশেষ

১ স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। বৃহদারণ্যক। ২। ১। ২০

২ তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বানি ভূতানি সর্বে [দেব]াঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এব আত্মানঃ সমর্পিতাঃ। বৃহদারণ্যক। ২। ৫। ১৫

৩ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি। ছান্দোগ্য। ৩। ১৪। ১

রূপ এবং অপরটি তার উপাদান। যেমন মৃন্ময় পাত্রের উপাদান মৃত্তিকা এবং তার পাত্র রূপে প্রকাশ, একটি লৌহ নির্মিত দ্রব্যের উপাদান লৌহ এবং তার সেই বিশেষ দ্রব্যরূপে প্রকাশ। এখানে মূলতত্ত্ব হল তাদের উপাদান আর গৌণ তত্ত্ব হল তাদের বিশেষ রূপে প্রকাশ। সেই রকম বিশ্ব সম্বন্ধে মূল তত্ত্ব হল ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান এবং বিভিন্নরূপে তার প্রকাশ হল গৌণ তত্ত্ব। উপাদানের বিকার হতেই তা ঘটেছে এবং এই পার্থক্য ততটা মৌলিক নয়। আমাদের ভাষার তাগিদে তাদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মৌলিক তথ্য হল—বিশ্বের উপাদান হলেন ব্রহ্ম।[১]

উপরের বচন হতে মনে হবে যেন ব্রহ্মের রূপকারণত্বের ওপর এখানে তেমন মূল্য আরোপ করা হয় নি। যেন ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে উপাদান কারণ যখন এক তখন তার পৃথক রূপের কোন মূল্য নেই এবং তারা গৌণ লক্ষণ এবং পাদটীকায় উদ্ধৃত বাণীর ভাষণ হতেই এই পৃথক মূল্যবোধ পরিস্ফুট হয়। কিন্তু উপনিষদে এমন বচনও আছে যেখানে বিশ্বের বহুরূপে প্রকাশকে অবহেলার চোখে দেখা হয় নি। কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে যে একই বিশ্বসত্তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান[২]। বহুকে ব্যাপ্ত করেই তাঁর একত্ব। কথাটি পরিস্ফুট করবার জন্য একটি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে একই অগ্নির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে প্রকাশ হলেও অগ্নি বলেই তাকে আমরা চিনি। সেই রকম একই আত্মা সকল জীবের রূপে প্রকট হলেও তিনি তাদের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছেন। একই শক্তির বিশ্বে বহুরূপে প্রকাশ[৩]।

নিমিত্ত কারণের লক্ষণ হল তা সৃষ্টির নিয়ামক শক্তি। ব্রহ্ম যে বিশ্বের অভ্যন্তরে থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এ বিষয় উপনিষদে সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়। এইখানেই মানুষের কারণত্বের সঙ্গে বিশ্বসত্তার কারণত্বের পার্থক্য। মানুষ নিমিত্ত কারণ হিসাবে কাজ করে যাকে নির্মাণ করল তার বাহিরে রয়ে গেল, তাকে পরে নিয়ন্ত্রিতও করে বাহির হতে; কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে নিয়ন্ত্রক

১ যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬॥৪

২ একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি॥ কঠ॥ ২॥ ৫॥ ১২

৩ অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ কঠ॥ ২॥ ৫॥ ৯

শক্তি এমনভাবে কাজ করে না। কারণ সে শক্তিত প্রকৃতির বাহিরে অবস্থিত নয়। অণুর মধ্যে যে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন সংহত হয়ে থাকে তার নিয়ামক শক্তি তার অভ্যন্তরেই অবস্থিত। যে প্রাণশক্তি দেহের নিয়ন্ত্রণ করে তাও তার অভ্যন্তরেই স্থিত। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে যে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে ব্রহ্ম দুই ভাবে কাজ করেন। প্রথমত তাঁর প্রশাসনে সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত ও বিধৃত। সূর্য-চন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী, নিমেষ-মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমাস-মাস, ঋতু-সংবৎসর সবই তাঁর প্রশাসনে ধৃত হয়ে আছে[১]। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে তিনি বিভিন্ন জীবের অন্তরে বর্তমান থেকে তাদের অজানিতভাবে তাদের নিয়ন্ত্রিত করেন। সকল জীব তাঁর শরীর স্বরূপ এবং তাদের অন্তরে থেকে তাদের নিয়মিত করেন বলেই তিনি অন্তর্যামী। দেহ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু নিয়ামক শক্তি নিত্য এবং তাই অমৃত[২]।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল সামগ্রিকভাবে বিশ্বের মধ্যে চূড়ান্ত কারণের সন্ধানে বিরোধী। তাঁর ধারণায়, বিশ্বের মধ্যে কি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল তা বিশ্ব সম্বন্ধে উত্থাপন করা যায় না[৩]। তার সপক্ষে তিনি দুটি যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমত তিনি বলেছেন ঈশ্বর কি উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা। অধার্মিকের মত আচরণ করার সমস্থানীয়[৪]। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন যে এ প্রশ্ন অর্থহীন, কারণ এর শেষ নেই। আমাদের তা হলে ধরে নিতে হবে যে ঈশ্বরকে নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বর হতে শক্তিমান এক পরম-ঈশ্বর তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মনে হয় দুটি যুক্তি তেমন সবল নয়। তিনি যেন সমস্ত জিনিসটা দেখেছেন একেশ্বরবাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে। ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরে বিশ্বাসী সংস্কারবদ্ধ ভক্তের কাছেই এ প্রশ্ন উত্থাপন করা অধার্মিকের আচরণের মত গণ্য হতে পারে, অন্যত্র নয়। সর্বেশ্ববাদের দৃষ্টি ভঙ্গি হতে যদি

১ এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষমুহূর্তা অহোরাত্রা-র্ধমাসা মাসাঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা স্তিষ্ঠন্তি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩ ॥ ৮ ॥ ৯

২ যঃ সর্বভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যাঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি এষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩ ॥ ৭ ॥ ১৫

৩ "The conception of purpose is only applicable within reality and not to reality as a whole." History of Philosophy Chap. II

৪ Impious

কারণ সন্ধানের চেষ্টা হয় তা হলে দ্বিতীয় আপত্তিও খাটে না। যাঁর উদ্দেশ্য অন্বেষণ হবে তাঁকে ত বিশ্বের বাহিরে রাখা হল না। সমগ্র বিশ্বকে অবলম্বন করে যদি একটি উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা কেন গ্রহণ করব না? যাই হোক উপনিষদের ঋষি এই উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে কোন মানসিক বাধা বোধ করেন নি। তাঁরা এ বিষয় চিন্তা করেছেন এবং একটি তত্ত্বও স্থাপন করেছেন। অবশ্য তা মূলত কল্পনা ভিত্তিক, কারণ বিষয়টি এত গভীর যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের তা কোন সুযোগ দেয় না। তবে তা যে যুক্তি-সম্মত নয় তা নয়।

উপনিষদের ঋষি এই উদ্দেশ্যকে রসের আস্বাদ বলে বর্ণনা করেছেন। এই রস অর্থে কি বোঝায় তারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম রস স্বরূপ, কারণ তিনি রস অনুভব করে আনন্দ পান[১]। এই আনন্দ হল শিল্পরসিকের আনন্দ। এখানে শিল্পী, শিল্পরসিক এবং শিল্প কর্ম একই সত্তা রূপে পরিকল্পিত; তাই বিশ্বসত্তাও রস স্বরূপ হয়ে পড়েন। এখন আনন্দ জিনিসটি কি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তা সুখ নয়, তা হতে আরও ব্যাপক। তা সুখ-দুঃখকে জড়িয়ে নিয়ে পরিস্ফুট হয়, যেমন নাটকের অভিনয়ে। এর ইংরাজিতে ঠিক প্রতিশব্দ নেই। যে পারিভাষিক কথাটি সব থেকে তার কাছে যায় তা হল শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি[২]। শিল্পতত্ত্বরসিক ক্লাইভ বেল তার প্রবর্তন করেছেন। এই আনন্দ কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনের সহিত সংযুক্ত নয়, তা অহৈতুক। উপনিষদ বলতে চেয়েছে বিশ্বসত্তা শিল্প-রসিক, তিনি তাই বিশ্বশিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করে আনন্দ পান। এই চিন্তা যুক্তিসম্মত[৩]। কারণ বিশ্ব শক্তির কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকতে পারে না, তা থাকে বদ্ধ জীব মানুষের। এখন উপনিষদে কি ভাবে বিশ্ব-শক্তির চূড়ান্ত-কারণত্বকে প্রতিপাদন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

রস উপলব্ধি করতে চাই দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির সত্তা, বিশুদ্ধ একত্বের মধ্যে রসের উপলব্ধির অবকাশ নেই। তার জন্য প্রয়োজন দ্বৈতবোধের; চাই রূপ

১ রসো বৈ সঃ॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ২॥

২ Aesthetic Emotion

৩ ইয়োরোপীয় দর্শনেও একটি অনুরূপ চিন্তা পাওয়া যায়। বলডুইন যে Pancalism তত্ত্ব স্থাপন করেছেন তাও বিশ্বসত্তাকে শিল্পীরূপে কল্পনা করেছে। এই প্রসঙ্গে J. M. Baldwin এর Genetic Logic and Pancalism দ্রষ্টব্য।

রস স্পর্শ গন্ধের জগৎ, চাই তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি মন। দুয়ের জানাজানি, দুয়ের পরিচয়, দুয়ের প্রীতি—এদের অবলম্বন করেই রসের ধারা প্রবাহিত হয়। সেইজন্য উপনিষদে বলে আদিতে এককসত্তা অবস্থায় ব্রহ্ম তাঁর একাকিত্ব উপভোগ করলেন না। তাই রসের উপলব্ধির জন্য তিনি বহু ও বিচিত্র রূপে প্রকট হলেন। তিনি একাকী থেকে আনন্দ পেলেন না বলেই তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন[১]।

ব্রহ্মের অহৈতুকী তৃপ্তির জন্যই এমন ঘটল। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি প্রকাশ হত না যে। তাই ত বিশ্বে দ্বৈত-সঙ্গীতের ধারা ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভিত্তিতে বিশ্বসত্তার আপন মাধুরী আপন চক্ষে ধরা পড়ল। তখন পান্নার রঙ হল সবুজ, চুনির রঙ হল রাঙা, মেঘে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের কিরণ সাত রঙে রঙীন হল। তখন বাতাসের স্পর্শ ঠেকল মিষ্টি, রজনীগন্ধার গন্ধ নাকে লাগল ভাল। তখন পাখীর গান কাণে লাগল মধুর। তখন মানুষের মনের সামনে বিশ্বের সুন্দর রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। তাই উপনিষদের ঋষি বললেন, এই পৃথিবী সকল প্রাণীর নিকট মধুস্বরূপ, এই পৃথিবীর কাছে সকল প্রাণী মধু স্বরূপ[২]।

এখন ব্রহ্মের এই আনন্দরূপটি কি রকম তার একটা ধারণা করা দরকার। তা বুঝিয়ে দেবে তার অর্থ কত ব্যাপক। উপনিষদের বিভিন্ন বচন হতে তার মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। এই আনন্দরূপের প্রকাশ বিশ্বের মধ্যেই, কিন্তু বিশ্বে যা কিছু দেখি তা চঞ্চল, তা নিত্য পরিবর্তনশীল, তার মধ্যে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, তার মধ্যে সৃষ্টি আছে, ধ্বংস আছে। তাই যদি হয় তা হলে তার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে আনন্দের অবকাশ কোথায়?

তার উত্তর উপনিষদে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সেটা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে সেখানে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, মৃত্যুর দুঃখ আছে, হাসি আছে, কান্না আছে। সেটা কিন্তু বিশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির জগৎ, সেটা সুখ-দুঃখের জগৎ, সেটা আনন্দের জগৎ নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে আমাদের অনুভূতি

১ ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌। স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদ্‌ একাকী ন রমতে॥ স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। বৃহদারণ্যক। ১। ৪। ৩

২ ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু। বৃহদারণ্যক। ২। ৫। ১

কিন্তু অন্য রূপ নেবে। তখন মৃত্যুতে শোকের দাহ থাকে না, কান্নায় দুঃখ স্পর্শ করে না। তখন জন্মের যা মূল্য মৃত্যুর সেই মূল্য, হাসির যা মূল্য কান্নার তাই মূল্য, সুখের যা মূল্য দুঃখের তাই মূল্য।

প্রশ্ন হল, সেটা কেমন করে হয়? উপনিষদ বলে, সেটা সম্ভব হয় যদি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বকে দেখা যায়। বিশ্বস্রষ্টা একজন শিল্পী, তিনি বিশ্বকে নিয়ে নাট্য রচনা করেন। এখানে বস্তু বিশেষের ধ্বংস আছে, কিন্তু বস্তু পরম্পরার শেষ নেই, অণু ভাঙে অণু গড়ে। এখানে প্রাণীবিশেষের ধ্বংস আছে, কিন্তু প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকে। সৃষ্টি এবং ধ্বংস এর উপাদান, দুইকে জড়িয়ে নিয়ে বিশ্বশিল্প গড়ে উঠেছে। কথাটা পরিষ্কার করে নেবার জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। যে কোন খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল থাকে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই খেলা জমে ওঠে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কারও ভাগ্যে ঘটে পরাজয়, কারও ভাগ্যে জয়। যে হারে সে দুঃখ পায়, যে জেতে সে সুখ পায়। কিন্তু এই পরাজিতের দুঃখ এবং বিজয়ীর সুখ, উভয়কে জড়িয়ে নিয়ে খেলা জমে ওঠায় যে আনন্দ তা জোটে কেবল নিরপেক্ষ দর্শকের ভাগ্যে। তার কারণ তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে খেলা দেখেন, প্রতিযোগীদের মনোভাব নিয়ে নয়। এখানে সুখ-দুঃখকে উপাদান করে নিয়ে আনন্দ গড়ে ওঠে।

উপনিষদে তাই বলা হয়েছে মৃত্যুর দাহিকা শক্তি তখনই অনুভব হয় যখন খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়ে আমরা মৃত্যুকে দেখি। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে মৃত্যু ভয়াবহ, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে মৃত্যু ত জীবন প্রবাহের একটি তাল মাত্র, জন্ম ও মৃত্যুর ধারা নিয়ে সে প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলে। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে মনের সাহায্যে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে যে বিশ্বে নানা বলে কিছু নেই। যে এখানে নানার মত দেখে সেই মৃত্যু হতে মৃত্যুর শোক পায়।[১]

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে এ বিষয় উপনিষদের চিন্তাধারায় বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। তিনিও বিশ্বের মধ্যে একটি শিল্পরচনার আভাস ইঙ্গিতে পেয়েছেন। তাঁর কল্পনায় বিশ্বধারা একটি নৃত্যনাট্য। সেই নাট্যের নায়ক হলেন বিশ্বস্রষ্টা। তিনি যে ছন্দে নৃত্য করেন তা দুটি তাল দ্বারা চিহ্নিত।

১১ মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ কঠ ॥ ২ ॥ ৪। ১১

তার একটি ধ্বংস একটি সৃষ্টি, একটি মৃত্যু একটি জন্ম, একটি দুঃখ একটি সুখ। দুইকে জড়িয়ে তাঁর নৃত্যধারা প্রবাহিত। তাই তিনি সেই নটরাজের রূপটি চিত্রিত করেছেন এইভাবে :

হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে ॥[১]

উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তা হলে বিশ্ব একটি অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গীরূপে পরিকল্পিত। তাতে বহু ও পৃথক পদার্থের বিচিত্র সমাবেশ আছে, কিন্তু তারা একই ব্যাপক সত্তার মধ্যে বিধৃত। সেই সত্তা বিশেষের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং দ্বৈতভাবে চিহ্নিত হয়ে বিচিত্ররূপে প্রকট হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতে তার রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই ;

যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন মাঝে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা।[২]

৫

আলোচনা

শিল্পী গল্প রচনা করেছেন। তাতে আছে একটি কাহিনী। সে কাহিনীর নায়ক এক নিঃসঙ্গ যুবক, সে জীবনে রস পায় না। সে চায় সঙ্গী। অনেক দেশ ঘুরতে ঘুরতে সে পেল এক মনের মত সঙ্গী। তখন দুজনের চোখে দুজনকে চিনল। দুজনকেই দুজনে আবিষ্কার করল। ফলে তাদের নিঃসঙ্গ নীরস জীবনের ওপর যবনিকাপাত ঘটল। জীবন তাদের আনন্দমুখর হল।

এখন এই কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে শব্দের সঙ্গে শব্দের সংযোগ সাধন করে। প্রতিশব্দটি আবার রূপ পেয়েছে কয়েকটি অক্ষরের সাহায্যে। এখন

১ অরূপ রতন। এই প্রসঙ্গে 'বলাকায়' চঞ্চলা এবং 'ঋতুরঙ্গশালা'র নটরাজশীর্ষক কবিতাও দ্রষ্টব্য।

২ স্মরণ

সগু অক্ষর জ্ঞান অর্জন করেছে এমন কোন মানুষ যদি সে কাহিনী পড়তে যায়, প্রতিটি পদ বানান করে করে পড়তে তার প্রাণান্ত হবে। কয়েকটি অক্ষরের সংযোগে যে পদটি রচিত হয়েছে বড় জোর সেই পর্যন্ত তার দৌড়। তাকে ডিঙিয়ে একটি সমগ্র বাক্যে পৌঁছাতে তার সামর্থ্য থাকবে না, সমগ্র কাহিনীর রস উপলব্ধি করা ত দূরের কথা। কিন্তু যার লিখিত ভাষার উপর অধিকার এমন গভীর, যে পদগুলির সংযোগে একটি সমগ্র বাক্যের অর্থ গ্রহণ শুধু করে না, বাক্য পরম্পরার সংযোগে যে কাহিনীটি তাদের অবলম্বন করে রূপ পেয়েছে তাকেও গ্রহণ করতে পারে, তার অবস্থা ভিন্ন। সে তখন বিভিন্ন পদের সঙ্গে বা বিভিন্ন বাক্যের সঙ্গে পরস্পরের ভেদ দেখে না। তাদের সকলকে জড়িয়ে নিয়ে এক অখণ্ড কাহিনী আত্মপ্রকাশ করেছে তা বুঝতে পারে। এখানে ভাগকে অঙ্গীভূত করে একটি সামগ্রিক সুমিতির সুন্দর উদাহরণ পাই।

মনে হয় বিশ্বকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলেও একটি সামগ্রিক ঐক্যরূপ ফুটে ওঠে। মহাবিশ্বে কি দেখি? বিশ্লেষণ করে পাই অণুকে। কিন্তু সেই অণুর মধ্যেও বিভাগ আছে; তাদের মধ্যেও একটি সামগ্রিক সুমিতি বিরাজিত। প্রোটন ও নিউট্রনকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি চক্রাকারে ঘুরছে। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যেও আবার ভাঙা গড়া আছে। বড় অণু ভেঙে ছোট অণুতে পরিণত হচ্ছে, ছোট অণু অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে বড় অণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই ভাঙাগড়ার খেলায় যে শক্তি মুক্ত হচ্ছে তাই তাপ ও আলোক তরঙ্গরূপে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে। অপরদিকে বিভিন্ন অণুতে ইলেকট্রনগুলির যে কক্ষপথ আছে তাদের বিন্যাসে কোথাও কোথাও শূন্য স্থানের সুযোগ নিয়ে অণুতে অণুতে মিলন ঘটে রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটছে। এইভাবেই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে জলের মত, লবণের মত মিশ্র পদার্থ গড়ে উঠেছে। একে নিয়েই জড়জগৎ।

কিন্তু সত্যই কি তা জড়? তাকে অবলম্বন করেই কি প্রাণের প্রকাশ নয়? সে প্রাণশক্তি ত দেহকে আশ্রয় করেই বিকশিত। সেই দেহ গড়ে উঠেছে নানা মৌলিক ও মিশ্র পদার্থের সমাবেশে। তাতে কার্বন আছে, অক্সিজেন আছে, ক্যালসিয়াম আছে, নাইট্রোজেন আছে, জল আছে, আরও কত কি আছে। তার মধ্যে যে সুসংহত প্রক্রিয়া তার ঐক্য এবং তার অনবদ্য কর্মবিন্যাস

বিস্ময়কর। বাহিরকে জানা ও পরিবেশের মধ্য হতে পুষ্টি সংগ্রহ করা এবং প্রতিকূল শক্তিকে ব্যাহত করার কাজ কি নিপুণভাবে সেখানে সম্পাদিত হচ্ছে। সেখানেও রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়ে তার সাহায্যে সে কাজ চলেছে। হৃৎপিণ্ড যে রক্ত পরিচালনা করছে তার ছন্দ এই বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মস্তিষ্কে যে চিন্তা হচ্ছে, সেখান হতে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিকট নির্দেশ যাচ্ছে তার সঙ্গেও বিদ্যুৎশক্তির সংযোগ আছে। কার্যকারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে জড়ের ওপর মাত্র নির্ভর করে মানসিক ক্রিয়ার বা প্রাণশক্তির ব্যাখ্যা হয় না সত্য ; কিন্তু তাদের সম্বন্ধ ত নিত্য, জড়ের বাহিরে ত প্রাণের প্রকাশ দেখি না।

ওদিকে মহাবিশ্বেও বিস্ময়কর ব্যবস্থার শেষ নেই। ক্ষুদ্র অণু জুড়ে জুড়ে উপগ্রহ, গ্রহ গড়ে উঠছে। তারা ও নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনের মতই আবর্তিত। অণুতে ও বিরাটে একই ছন্দ ক্রিয়াশীল। কোটি কোটি নক্ষত্রও এক কেন্দ্রস্থলকে মাঝে রেখে থালার আকারে বা কুণ্ডলী পাকিয়ে আবর্তিত। মহাশূন্য আবার এই ধরনের কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের[১] দ্বারা বেষ্টিত। এ যেন এক ধরনের রাস নৃত্য। অণু হতে বিরাট, বিরাট হতে বিরাটতরে একই বর্তুলাকার নৃত্য ছন্দ ক্রিয়াশীল।

বিস্ময়ের পর আরও বিস্ময় এই যে বিশ্ব ব্যেপে যে বিরাট নাট্য অভিনীত হচ্ছে তাকে বোঝাবার বা হৃদয়ঙ্গম করবার উপযুক্ত মন যতক্ষণ না বিশ্বে ফুটে উঠছে ততক্ষণ তা যেন শূন্য প্রেক্ষাগারে নাট্যাভিনয়ের মতই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান সে কথা স্বীকার করুক বা নাই করুক, জ্ঞানশক্তির উদয়ের পূর্বে বিশ্বে রূপ বলে কিছু ছিল না, শব্দ বলে কিছু ছিল না, গন্ধ বলে কিছু ছিল না, আস্বাদ বলে কিছু ছিল না। রামধনুর বর্ণাঢ্য শোভা দেখে কেউ বলবার ছিল না, কি সুন্দর। চাঁপা ফুলের গন্ধ পেয়ে কেউ বলবার ছিল না, কি মিষ্টি। শুধু কি তাই ? হৃদয় বলে কিছু ছিল না, ভালবাসা বলে কিছু ছিল না। একই অখণ্ড সত্তার মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে দ্বৈতবোধ গড়ে ওঠবার ফলেই বিশ্বের পরিপূর্ণ রূপটি গড়ে উঠল। যে শিল্পের ব্যবস্থা বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে হয়েছিল তার দর্শক তখনই এল। এবং তখনই শিল্প ও শিল্পরসিকের সংযোগে শিল্পরস আস্বাদিত হল।

মনে হবে মহাবিশ্বের রচনায় মানুষের মনের ভূমিকাকে এত বড় করে

* ১ Galaxy

দেখবার কারণ নাও থাকতে পারে। মহাবিশ্বের মধ্যে প্রাণের স্থান ব্যাপকতার দিক থেকে বিচার করলে নগণ্য। আমাদের সৌর-জগতের নয়টি গ্রহের মধ্যে মাত্র আমাদের পৃথিবীতেই প্রাণশক্তির বিকাশ দেখা যায়। বিশ্বে যত নক্ষত্র আছে তাদের বেশীর ভাগই যুগ্ম নক্ষত্র। সেখানে উত্তাপ এত বেশী যে গ্রহ থাকলেও প্রাণী ধারণের উপযোগী পরিবেশ সেখানে নেই। কাজেই কোটি কোটি সৌরমণ্ডলের মধ্যে প্রাণের বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ এক ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া যাবে।

কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টির রীতি লক্ষ্য করলে এ যুক্তি সবল বলে মনে হবে না। প্রকৃতির রীতিই হল এই যে ব্যাপক হারে আয়োজন করে সীমিত লক্ষ্যে তা পেঁছাতে চায়। তার উপকরণের ত অভাব নেই, তাই অপব্যয়ের ভয়ও নেই। আমগাছে মুকুল ধরে যত তার এক ভগ্নাংশ মাত্র গুটিতে পরিণত হয়। সেই গুটির আবার এক বড় অংশ শুকিয়ে ঝরে যায়। যে কটি আম তার পর গাছে ধরে তার মধ্যেও কত যে শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে যায়; পাকা হয়ে পরিণত রূপ লাভ করে এক ভগ্নাংশ মাত্র। এইরকম কত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

তাই মনে হয় সত্যই সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে। সেই শিল্পের শিল্পী ও শিল্পরসিক একই মহাশক্তি হতে উদ্ভূত হয়েছে। বিশ্বের পরিণত রূপেই যেন বিশ্ব একদিকে শিল্প ও অন্যদিকে শিল্পরসিক হয়ে দ্বৈতরূপে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধে প্রকট হয়। আর যিনি শিল্পী তিনি উভয়কে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে, সব কিছু নিয়ে বিশ্বকে একটি সামগ্রিক একতা মণ্ডিত করে, প্রচ্ছন্ন রূপে শিল্প ও শিল্পরসিকের মধ্যে বিরাজ করেন। সামগ্রিক ঐক্যবাদই তাই মনে হয় বর্তমান সমস্যার সব থেকে সন্তোষজনক সমাধান। কেউ হয়ত বলবেন, এ ত কাব্য, এ ত তত্ত্বকথা নয়। তার উত্তরে বলব, এ সত্য বলেই কাব্য, কারণ বিশ্বসত্তা শিল্পী।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্বতত্ত্ব

বিশ্বের প্রকৃতি

(১)

সমস্যার পরিচয়

প্রতি মানুষ এক হিসাবে একেবারে নিঃসঙ্গ। একদিকে সে এবং অপর-দিকে তার পরিবেশ। সেই পরিবেশ হতে সে এক রকম বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেই পরিবেশকে আশ্রয় করেই সে জীবনধারণ করে। তার সহিত মানুষের নিত্য পরিচিত হতে হয়, তার সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। কারণ পরিবেশের প্রতিকূলতা হতে যেমন তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন, তেমন পরিবেশের অনুকূলতার সুযোগ নিয়ে তার শারীরিক পুষ্টির জন্য বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কাজেই বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন হলেও তার সঙ্গে তার অহরহ্ সংযোগ সাধন করতে হয়।

এই সংযোগ সাধন ঘটে মানুষের বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে। ফলে পরিবেশ সম্বন্ধে সে খবর সংগ্রহ করতে পারে। এইভাবে যে পরিচয় ঘটে তা হতে সে জানতে পারে তার মনের বাহিরে বহু বস্তু আছে। তারা কেহ অচল। যা অচল তা বলপ্রয়োগে নড়ে, কিন্তু নিজ শক্তিতে নড়বার ক্ষমতা রাখে না। যা সচল তা নিজ শক্তিতে নড়বার ক্ষমতা রাখে। উভয় বস্তুই কিন্তু বাহ্যত ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে অনুভব করা যায়। চক্ষু দিয়ে তাদের একটি বিশেষ রূপ দেখা যায়; স্পর্শ দিয়ে বোঝা যায় তারা কঠিন বা তরল বা বাষ্পীয় কিনা, তাদের গন্ধ থাকলে আঘ্রাণে তা ধরা পড়ে; বায়ুতে তারা তরঙ্গ উৎপাদনের ক্ষমতা রাখলে শ্রবণেন্দ্রিয়ে তা শব্দরূপে প্রকাশ হয়; তাদের স্বাদ থাকলে তা আস্বাদন করা যায়। যে দ্রব্যগুলির সহিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটে তারা প্রধানত নিজ শক্তিতে নড়বার ক্ষমতা রাখে না তাদের আমরা জড় পদার্থ বলি।

বাহিরে জড় পদার্থের রূপ ধারণ করে অথচ নিজ শক্তিতে চলবার ক্ষমতা রাখে এমন বস্তুর সহিত মানুষের প্রথম পরিচয় হয় নিজের দেহের সম্বন্ধে জ্ঞান হতে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে বহির্বিশ্বে দৃষ্ট যে জড় পদার্থের সহিত

পরিচয় ঘটে, তার দেহ মানুষের কাছে তাদেরই মত জিনিস বলে ঠেকবে। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্যও সে নিজের দেহের মধ্যে লক্ষ্য করে। জড় পদার্থের মত রূপ হলেও দেহ নিজ শক্তিতে চলতে পারে, তার অঙ্গগুলিকে নিজের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পরিচালিত করতে পারে। সে আরও লক্ষ্য করে বহির্বিশ্বে তার মত ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহধারী পদার্থ আছে যা নিজ শক্তিতে চলতে ফিরতে পারে। সে তাদের আচরণ হতে অনুমান করে, তাদের মধ্যেও তার মনের মত একটি মন ক্রিয়া করে, তাদের মধ্যেও ইচ্ছাশক্তির নির্দেশে তারা পরিচালিত হয়। এই ধরনের পদার্থকে সে জড়পদার্থ হতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবার জন্য জীব বলে। জড়বস্তু দ্বারা গঠিত হলেও তাদের মধ্যে প্রাণশক্তি আছে।

মানুষের মন আরও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করে। বিশ্ব সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করবার চেষ্টায় সে নিজের মধ্যে আর একটি অতিরিক্ত শক্তির অস্তিত্বের পরিচয় পায়। তার মন নামে একটি পদার্থ আছে যা ইচ্ছা করে, যা সুখ-দুঃখ অনুভব করে, যা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে এমনকি নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে। যে পদার্থটি এই ধরনের নানা ক্ষমতার পরিচয় দেয়, দেহের মধ্যে কোন বিশেষ স্থানে তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। তার যেন স্থানগত অস্তিত্ব নেই। তা নিত্য নানা কর্মে জড়িত; কখনো ভাবে, কখনো সুখ-দুঃখ অনুভব করে, কখনো নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে দেহকে নানাভাবে পরিচালিত করে। সেই মন এই বিচিত্র ক্রিয়াগুলির কেন্দ্রশক্তি হিসাবে নিজেকে অনুভব করে। ফলে তার মধ্যে আমিত্ববোধ পরিস্ফুট হয়। সেই আমিকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, হৃদয়বৃত্তির অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছা সবই আবর্তিত হয়। সেই আমি যেন বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ। তা জড়ের মত নয়; তা জড়পদার্থ দিয়ে গঠিত দেহের নিত্য সঙ্গী, কিন্তু তা দেহের মত নয়। এই নিয়ন্ত্রক শক্তিকে দেহ হতে পৃথক করে চিহ্নিত করবার জন্য সে তার নাম দেয় আত্মা[১]। তার ধারণা হয় যে এই আত্মা জড় হতে এমন বিভিন্নধর্মী যে দেহ হতে পৃথক ভাবেও তার অস্তিত্ব সম্ভব হতে পারে। এই হতেই জন্মান্তরবাদের ধারণার উৎপত্তি।

বিস্ময়ের পর আরও বিস্ময়, বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করতে গিয়ে মানুষ আবিষ্কার করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে না।

১. Soul.

বহির্বিশ্বের প্রতিক্রিয়া তার ইন্দ্রিয়ের কাছে আনে নানা অনুভূতি[১]। সেই অনুভূতি হতে সে পায় কতকগুলি পৃথক তথ্য। তাদের তাই বলা হয় ইন্দ্রিয়-আহৃত ইন্দ্রিয়-দত্ত তথ্য[২]। আমাদের মন সেই তথ্যগুলিকে একত্রিত করে যে ভাবমূর্তি গড়ে[৩] তার সঙ্গে যে শ্রেণীর তা অন্তর্ভুক্ত তার সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাকে চেনে। এই শ্রেণী সম্পর্কিত যে মানসিক ধারণা তাকে আমরা সার্বিক সংজ্ঞা বলি[৪]। এই সার্বিক সংজ্ঞার কিভাবে উৎপত্তি হয়, তাদের নিজস্ব সত্তা আছে কিনা, এ প্রশ্নগুলি যথাস্থানে পরে আলোচিত হবে। এখানে শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে এই সার্বিক সংজ্ঞার সহিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য মিলিয়ে আমরা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি। কথাটি পরিষ্কার করে নেবার জন্য আমরা একটি উদাহরণ স্থাপন করতে পারি। আমার পড়ার টেবিলের ফুলদানিতে একটি গোলাপ ফুল রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে আমি তার উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি; কিন্তু তা নয়। আমার চক্ষু তার আকৃতি সম্বন্ধে তথ্য আমার মনের কাছে স্থাপন করে, আমার ঘ্রাণশক্তি তার কাছে একটি বিশেষ ঘ্রাণের খবর নিয়ে আসে, আমার স্পর্শেন্দ্রিয় তার কোমলতার পরিচয় বহন করে আনে। ওদিকে আমাদের মনের ভাণ্ডারে নানা সার্বিক সংজ্ঞার ধারণা আছে। তাদের মধ্যে গোলাপ-ফুল একটি। এই সার্বিক সংজ্ঞার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আনীত তথ্যগুলির মিল আবিষ্কার করে যে বস্তু সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি আসছে তাকে আমরা গোলাপফুল বলে চিনি। সুতরাং বহির্জগতের বস্তুর সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে না। তারা ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে নিজেদের সম্বন্ধে যে পরিচয় পাঠায় তার সঙ্গে সার্বিক সংজ্ঞার সাদৃশ্য দেখে আমরা তাকে চিনতে পারি। সুতরাং মনের দিক হতে দেখতে গেলে বাহিরে অবস্থিত বস্তু মানুষের মনের বস্তুতে রূপান্তরিত না হলে তার প্রত্যয় ঘটে না। এই অর্থে বলা যায় যে বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত মন না থাকলে তার অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। দ্বিতীয়ত যে রূপে তার পরিচয় ঘটে তা জড় রূপ নয়, চৈতন্যরূপ।

অতিরিক্তভাবে আরও একটি জিনিস নজর করা যায়। তা হল দেহের মধ্যে মনের যে পরিচয় আমরা পাই তা সর্বক্ষেত্রে দেহের সহিত সংযুক্ত।

১. **Sensation** ২. **Sense datum.**
৩. **Mental image** ৪. **Universal**

দেহ বিকল হলে মনের আর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য কেউ কেউ বলবেন পরজন্ম আছে; কিন্তু তা বিতর্কের বিষয়, সংস্কার এবং কল্পনা হতে উদ্ভূত যুক্তি[১] তার ভিত্তি। সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। সে প্রতিপাদ্যটিও যথাস্থানে পরীক্ষা করা হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে এইটুকু লক্ষ্য রাখলেই চলবে যে দেহ ও মনের সহাবস্থিতি নিত্য। দেহ বিকল হলে মন কাজ করে না। শুধু তাই নয়, নানা মানসিক কার্যের সঙ্গে দেহের জড় অংশেও নানা প্রক্রিয়া বর্তমান থাকে কিন্তু তাদের পারম্পর্য জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে বসেই মানুষের বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হয়। এখন এই ধরনের জটিল অবস্থার মধ্যে তার মীমাংসা সহজ হয় না। যে সব তথ্য পাওয়া যায় তারা বিভিন্ন দিকে পথ নির্দেশ করে। কোন তথ্যের ইঙ্গিত হল বিশ্ব জড়ধর্মী, আবার কোন তথ্যের ইঙ্গিত হল বিশ্ব-চৈতন্যধর্মী। এদের পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান করে একটি পূর্ণাঙ্গ মত সোজাসুজি গড়ে উঠতে পারে না। মতিগতির পথে বা যে শ্রেণীর তথ্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন পথে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তর আসে। তা যে নিরর্থক হয় তা নয়। তাদের পরস্পর বিরোধ লক্ষ্যে আসলে দার্শনিকের মন নূতন পথে তার সমাধান খোঁজে। ফলে সমন্বয়ের ভিত্তিতে একটি সমাধান আবিষ্কার করবার বিশেষ সহায়ক হয়। এই সমাধান সাধনের চেষ্টা হয় দুই ভাবে। প্রথম হতে পারে উভয়ের দাবী অংশত স্বীকার করে নিয়ে। বিশ্ব কেবল জড়-ধর্মী বা বিশুদ্ধভাবে চৈতন্যধর্মী না বলে বলা যেতে পারে বিশ্ব অংশতঃ জড়ধর্মী এবং অংশতঃ চৈতন্যধর্মী। দ্বিতীয় পথ হল জড় ও চৈতন্যরূপকে একই সত্তার যুগপৎ বিভিন্ন প্রকাশ রূপেও কল্পনা করা যায়, কিম্বা একটি তৃতীয় পদার্থ হতে তাদের উভয়ের উৎপত্তি অনুমান করা যায়। এইভাবে এই সমস্যাটির সমাধান বিচিত্রপথে অগ্রসর হয়। তার পরিণত রূপটির মধ্যে তার সমাধান মিলবার সম্ভাবনা থাকে। জটিল প্রশ্নের এইভাবেই সমাধান সংঘটিত হয়ে থাকে, সোজাসুজি সমাধান সম্ভব হয় না। বর্তমান প্রশ্নের সম্পর্কেই দেখি এই ধরনের একটি পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে।

সত্তার যে অংশটি জড়ধর্মী তা ইন্দ্রিয়ের কাছে সহজেই প্রকট। তার

১. Speculative reasoning

প্রকাশও অত্যন্ত ব্যাপক ক্ষেত্রে। মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ দেখা যায় অতি সংকুচিত ক্ষেত্রে। সৌর-জগতের নয়টি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীর বক্ষেই প্রাণের বিকাশ দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রাণের প্রকাশ অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ে, তা সহজগ্রাহ্য নয়। এই সব কারণেই বোধ হয় স্বভাবত জড়ধর্মী পদার্থকেই বিশ্বের মৌলিক সত্তা বলে স্বীকৃতি দেবার একটা প্রবৃত্তি আসে। সেই কারণেই দেখা যায় অতি প্রাচীনকাল হতেই জড়বাদী দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। তুলনায় চৈতন্যবাদী দর্শনের বিকাশ ঘটেছে পরে। অন্তত পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

বিশ্বের প্রকৃতি কি, তা জড়ধর্মী না চৈতন্যধর্মী? এই প্রশ্নের উত্তরে জড়বাদ সাধারণভাবে বলে যে বিশ্ব জড়ধর্মী। তবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। সবক্ষেত্রেই চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তবে তাকে জড়েরই প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এই ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। একভাবে এই ব্যাখ্যা হয় যে যা চৈতন্য বলে প্রতীয়মান হয় তা জড়েরই বিশেষ রূপ, যেমন অগ্নিশিখা জড়ের রূপান্তর মাত্র। আমাদের দেশের লোকায়ত দর্শন এবং প্রাচীন গ্রীসে ডিমোক্রাইটাস স্থাপিত অণুবাদ এই শ্রেণীতে পড়ে। উভয়েই অতি প্রাচীনকালে উদ্ভূত হয়েছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক জড়বাদ এদেরই উত্তরাধিকারী কারণ এরা সকলেই একই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত।

আর এক শ্রেণীর জড়বাদ হতে পারে যার দৃষ্টিভঙ্গি একটু পৃথক। উপরের দর্শনগুলি বিশ্বতত্ত্বের[১] পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত। এই জড়বাদ জ্ঞানতত্ত্বের[২] পরিপ্রেক্ষিতেও গঠিত হতে পারে। জ্ঞানতত্ত্বভিত্তিক আলোচনায় দেখা যায় যে বিশ্ব সম্বন্ধে পরিচয় সংগ্রহ করতে চৈতন্যধর্মী পদার্থের বিশেষভাবে আশ্রয় নিতে হয়, অর্থাৎ মন ও তার সৃষ্টি জ্ঞান এখানে প্রধান বিষয় হয়ে পড়ে এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত বহির্বিশ্ব সম্পর্কিত তথ্য গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই জ্ঞাতৃরূপী মন এবং সম্বন্ধধর্মী জ্ঞান উভয়কেই স্বীকার করতে হলে বিশ্বকে বিশুদ্ধভাবে জড়ধর্মী বলা চলে না। তাই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জড়বাদে তাদের বহির্বিশ্বের অঙ্গীভূত বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই নববস্তুবাদের[৩] উৎপত্তি হয়েছে। তা বলে মানসিক ব্যাপার বস্তুরই অঙ্গ, তা অনেকটা বহির্বিশ্বের আড়াআড়ি কর্তনের[৪] মত।

১ Ontology
২ Epistemology
৩ New Realism
৪ Cross-section

অনুরূপভাবে একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে কেবল চেতনাকে স্বীকৃতি দিয়ে এই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হয়। তা বলে বিশ্ব বিশুদ্ধভাবে চেতনাধর্মী। মনের বাহিরে যে একটা বিশ্ব আছে এবং তা যে প্রধানত জড়ধর্মী, এ কথা তা একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং হয় তাদের মানসিক পদার্থেরই বিশেষ রূপ বলে ব্যাখ্যা করা হয়, কিম্বা তাদের মৌলিক সত্তার মর্যাদা দেওয়া হয় না। এখানে মতিগতিই বিভিন্ন শ্রেণীর চৈতন্যবাদ গড়তে সব থেকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তার ভিত্তিতে আমরা তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর চৈতন্যবাদ গড়ে উঠতে দেখি। প্রথম, জড়-সত্তাকে গৌণ-সত্তায় নামিয়ে দিয়ে ব্যাখ্যা; দ্বিতীয়, জড-সত্তাকে মানসিক-সত্তা বলে ব্যাখ্যা; তৃতীয়, বহির্বিশ্বের মন হতে পৃথক এবং নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করেও তাকে চৈতন্যধর্মী বলে ব্যাখ্যা।

যে শ্রেণীর চৈতন্যবাদ জড়কে মূলসত্তার মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয় তার মধ্যে জড়ের বিরোধী একটি সংস্কার ক্রিয়া করে। তার আকর্ষণ যা ধ্রুব, যা নিত্য, যা স্থির এবং বিশুদ্ধভাবে এক তার প্রতি। যার দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে গঠিত তা জড়বস্তু সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ না করে পারে না।

বহির্বিশ্বে প্রকট জড়-জগৎ অনিত্য, চঞ্চল এবং বিচ্ছিন্ন বস্তুর সমবায়ে গঠিত। কাজেই তা প্রকৃত সত্তা নয়, তা প্রতিভাসের মত জিনিস। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই প্লেটোর সামান্যবাদ, শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাতবাদ গড়ে উঠেছে। তাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি একই। তাই তাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু ও বিশেষের বিশ্ব ছায়ার মত, স্বপ্নের মত বা মরীচিকার মত। জড়-সত্তা একভাবে আছে কিন্তু মূলত নেই, তা মৌলিক সত্তা নয়, গৌণ সত্তা। এইরূপে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চৈতন্যবাদের ভিত্তি হল জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা। জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয় অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে জ্ঞাতারূপী মনের সঙ্গে জ্ঞেয়রূপী বস্তুর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে না, অথচ জ্ঞেয়ের পরিচয় নিতেই জ্ঞানের উৎপত্তি। যা ঘটে তা অতি বিচিত্র জিনিস। বাহিরের জ্ঞেয় বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার সাহায্যে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য বিচ্ছিন্ন আকারে সংগ্রহ করে। তার পর মনের মধ্যে তাদের সংযোগ সাধন করে বস্তুর প্রকৃতি উপলব্ধি করা হয়। তাকে আমরা বলি ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। ফলে যাকে

আমরা পাই তা বাহিরের বস্তু নয়, আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত একটি ধারণা।[১] এই আবিষ্কারকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুকে ও মানসিক ধারণা রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। এখন মানসিক ধারণা দু ধরনের হতে পারে। স্বপ্নে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভিত্তিতে যে সব মানসিক ধারণার উদ্ভব হয়, তা যে স্বপ্ন দেখে তার মনেরই সৃষ্টি; কিন্তু বহির্বিশ্ব হতে ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য দিয়ে যে মানসিক ধারণা উৎপাদিত হয় অন্য জ্ঞাতারও মনে তার উদয় হয়। এই অবস্থাটি ব্যাখ্যা করবার জন্য ধরে নেওয়া হয় যে বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগের ফলে যে ধারণার উদয় হয় তারা মানসিক ধারণা হিসাবে সকল মানুষের মনে যাতে উদয় হয় তার জন্য একটি ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়। সে ভাণ্ডারটি ঈশ্বরের মন রূপে কল্পনা করা হয়েছে বার্কলির চৈতন্যবাদে। তাকে একটি আলয় রূপে কল্পনা করা হয়েছে বৌদ্ধ দর্শনের যোগাচার শাখায়।[২]

তৃতীয় শ্রেণীর চৈতন্যবাদ বহির্বিশ্বে অবস্থিত জড়বস্তুকে বহির্বিশ্বের অঙ্গ হিসাবেই স্বীকৃতি দেয়, তাকে মানসিক ধারণা বলে ব্যাখ্যা করে না বা তাদের মৌলিক তত্ত্বের মর্যাদা দিতে অপ্রস্তুত নয়। তবে বলে, তাও চৈতন্যধর্মী। মনের যা প্রকৃতি, বহির্বিশ্বের প্রকৃতি তা হতে অভিন্ন। যাকে জড় বলি তাও প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যধর্মী। কাজেই বিশ্ব সর্বতোভাবেই চৈতন্যধর্মী, তার মধ্যে জড়ত্ব কিছু নেই।[৩] এই শ্রেণীতে পড়ে হেগেল-এর দর্শন, কারণ তিনি বলেন যে বিশ্বসত্তার প্রকৃতি ও চিন্তার প্রকৃতি অভিন্ন। লাইবনীটজ-এর মনাড় তত্ত্বকে বোধহয় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ বিশ্বকে বহু বিশ্লিষ্ট সত্তার সমষ্টি বলে বর্ণনা করা হলেও, তাঁর মতে এই বিশ্লিষ্ট সত্তাগুলি জড়ধর্মী নয়, চৈতন্যধর্মী। সুতরাং তা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিশ্বের প্রকৃতি খানিকটা যেন জড়ধর্মী, খানিকটা যেন চৈতন্যধর্মী। প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন দর্শনকার নিজের রুচি অনুসারে সমগ্র বিশ্বকে এক অভিন্ন প্রকৃতির

১ Idea

২ এই শ্রেণীর দর্শনকে ইংরাজি পরিভাষায় Subjective Idealism বলা হয়, কারণ এখানে ব্যাখ্যা জ্ঞাতা-ভিত্তিক।

৩ এই শ্রেণীর দর্শনকে ইংরাজি পরিভাষায় Objective Idealism বলা হয়, কারণ এখানে ব্যাখ্যা জ্ঞেয়-ভিত্তিক।

ধারক হিসাবে ব্যাখ্যা করতে চান। ফলে দুটি বিপরীতধর্মী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। তাদের একটি বিশ্বকে বিশুদ্ধভাবে জড়ধর্মী বলে ব্যাখ্যা করতে চায় এবং অপরটি বিশুদ্ধভাবে চৈতন্যধর্মী বলে ব্যাখ্যা করতে চায়। উভয় শ্রেণীর মধ্যে একাধিক দার্শনিক তত্ত্ব স্থান পায়। তাদের মধ্যে পরস্পরের কিছু পার্থক্য নজরে পড়লেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত। উপায় বিভিন্ন হক, তাদের প্রতিপাদ্য হল বিশ্বের ব্যাখ্যায় একই অভিন্ন প্রকৃতি আরোপ করা—হয় বিশ্ব বিশুদ্ধভাবে জড়ধর্মী না হয় চৈতন্যধর্মী। এই মনোভাবের সমালোচনা করবার এখনও সময় আসে নি। এই অধ্যায়েরই পরবর্তী অংশে সে বিষয় আলোচনা করা হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে তাদের মধ্যে একদেশদর্শী মনোভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট এবং কাজেই এই শ্রেণীর মীমাংসা সন্তোষজনক নয়।

যে সব দর্শন এই ধরনের মনোভাব পোষণ করে না তারা বিশ্বের মধ্যে জড়প্রকৃতি ও চৈতন্যপ্রকৃতি উভয়েরই সন্ধান পায়। কোন দিকে পক্ষপাত না থাকায়, তারা একটিকে দিয়ে অপরটির ব্যাখ্যা বা যার প্রতি আকর্ষণ নেই তাকে একটি গৌণ ভূমিকা দিয়ে ব্যাখ্যা করে না। এখন বিশ্বে জড়প্রকৃতির বিশেষ প্রকাশ জড়ধর্মী বস্তুতে। তাকে আমরা অচেতন পদার্থ বলি। কিন্তু সেই জড়বস্তুকেই অবলম্বন করে তাকে সুসমঞ্জসভাবে সংগঠিত করে প্রাণধর্মের বিকাশ ঘটে। এই প্রাণধর্মযুক্ত জড়বস্তুর সমাবেশকেই আমরা চেতন পদার্থ বলি। তার বৈশিষ্ট্য হল তার পরিবেশ হতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে তা আত্মপুষ্টি ও আত্মরক্ষার কাজে অহরহ নিযুক্ত। এটি সম্পাদিত হয় উন্নত জীবের ক্ষেত্রে প্রধানত তার বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে। এই স্বতন্ত্র সত্তাটি মানুষের ক্ষেত্রে এমন একটি পূর্ণ বিকশিত রূপ ধারণ করে যে তার ওপর একটি আত্মনিয়ন্ত্রিত ঐক্য আরোপ করা হয় এবং তাকে আত্মা বলা হয়। বিভিন্ন ধর্ম বলে যে সেই আত্মা দেহ হতে বিযুক্ত হয়েও অস্তিত্ব রক্ষা করে, কাজেই তা বিনাশশীল নয়। অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য মানুষের মনকে এমনভাবে অভিভূত করে যে মানুষ তাকে একটি মৌলিক সত্তা বলে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হয়। সে যাই হক, চেতনপ্রকৃতির সত্তার উপস্থিতি সজীব প্রাণীর দেহে এবং মানুষের মনে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শনে জড়পদার্থ এবং চৈতন্যধর্মী পদার্থ উভয়কেই মৌলিক সত্তা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর দর্শনের মতে বিশ্ব অংশত জড়প্রকৃতির এবং অংশত চৈতন্যপ্রকৃতির।

সুতরাং এই শ্রেণীর দর্শনকে দ্বৈতবাদী বলতে পারি। এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল তা কোন একটি বিশেষ প্রকৃতির সত্তাকে প্রাধান্য না দিয়ে দুটির সাহায্যেই বিশ্বের প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর মত পোষণ করে জৈন দর্শন ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন। জৈন দর্শন বলে বিশ্ব দুই শ্রেণীর পদার্থের দ্বারা গঠিত, জীব ও অজীব। অজীবের মধ্যে যাদের স্থানে অবস্থিতি আছে তাদের মধ্যে প্রধান হল পুদ্গল অর্থাৎ জড় পদার্থ। জীব বা আত্মা চেতন পদার্থ। তা নিত্য এবং দেহ হতে দেহান্তরে যেতে পারে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনও অনুরূপ মত পোষণ করে। তা বিশ্বকে দুটি মৌলিক সত্তায় ভাগ করে। একদিকে আ ৃত-১

জীবাত্মা। প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু দিয়ে গঠিত। অর্থাৎ বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় মৌলিক জড়পদার্থগুলি রাসায়নিক মিশ্রণে গঠিত। অন্যদিকে আছে বহু জীবাত্মা। তারা জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত। তারা নিত্য এবং দেহ হতে দেহান্তরে গমন করে।

পাশ্চাত্য দর্শনে দেকার্ত ও বের্গসঁ-এর দর্শন এই শ্রেণীতে পড়ে। উভয়েই দ্বৈতবাদী ছিলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় উভয়েই জাতিতে ফরাসী ছিলেন ; দেকার্ত বিশ্বের মধ্যে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির মৌলিক সত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন ; একটি হল জড় সত্তা ও অপরটি হল চেতন সত্তা। তারা পরস্পর বিপরীত প্রকৃতির পদার্থ এবং তাদের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। বের্গসঁ-এর দর্শনেও দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হল সক্রিয় এবং অপরটি অক্রিয়। অক্রিয় সত্তার নিদর্শন জড়বস্তু, সক্রিয় সত্তার নিদর্শন প্রাণী। প্রাণশক্তি জড়বস্তুকে অবলম্বন করে আত্মবিকাশ করে। এই দুই বিপরীতধর্মী উপাদান নিয়েই বিশ্ব রচিত।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শনগুলি নিশ্চিত একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত ; কিন্তু এদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা পরিস্ফুট নয় ; এখানে যা পাই তা হল একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, তার বেশী নয়। ফলে বিশ্বের মধ্যে জড় ও চৈতন্য এই দুই বিপরীত প্রকৃতির সত্তার সহাবস্থিতি মাত্র স্বীকৃত হয়েছে। পরের অবস্থায় দেখা যায় সত্তার এই দুই বিপরীত প্রকৃতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সাধনের ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এর ফলে একটি তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে। তার বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে বিভিন্ন পথে

জড় ও চৈতন্যধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে উভয়ের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত একত্ব স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

এই পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ পাই স্পিনোজা-র দর্শনে। দেকার্ত জড় ও চেতন পদার্থকে বিপরীতধর্মী বলেই আলোচনা শেষ করেছেন। স্পিনোজা একটি সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে তাদের সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর মূল সত্তা। তাঁর দুটি গুণ বিশ্বে প্রকট—একটি জড়ত্ব, অপরটি চেতনা। তারা পৃথক কিন্তু একই অঙ্গের অঙ্গী। পাউলসেন-এর দার্শনিক তত্ত্ব একই চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত, তবে তিনি এই পথেই জড় ও চৈতন্যকে আরও ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণায় বিশ্বের সকল বস্তুই যুগপৎ জড় ও চৈতন্যধর্মী। তারা একই বস্তুর দুই দিকের মত। যা একদিকে জড় তা অন্যদিকে চেতন। বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে এইভাবে তিনি জড় ও চেতনের সহাবস্থিতি লক্ষ্য করেছেন বলে তাঁর দর্শনের নাম দিয়েছেন সর্ব-চৈতন্যবাদ[১]।

আর এক পথেও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হয়েছে। এখানে তাদের পরস্পর সংযুক্ত করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হয় নি। এই রূপ চিন্তার মূলে এই ধরনের একটা ধারণা ক্রিয়া করে যে জড়ধর্ম ও চৈতন্য ধর্মের মধ্যে আমরা যে বিভেদ টানি তা অতিমাত্রায় বেশী। ঠিক বলতে কি যা জড় এবং যা চেতন বস্তু তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ততটা বেশী নয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তা তার অনুকূল একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে জড় আর স্থূল নয়, তাও মনের মত সূক্ষ্ম পদার্থ। এই পথে চিন্তা করেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে জড় প্রকৃতির পদার্থ ও চৈতন্য প্রকৃতির পদার্থ একটি তৃতীয় নিরপেক্ষ পদার্থ[২] হতে উদ্ভূত হয়েছে। আশ্চর্যের কথা উপনিষদের মধ্যেও একটি এই ধরনের তত্ত্ব পাওয়া যায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদে মৌলিক সত্তার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে তাঁর জ্ঞাতৃরূপ বা জ্ঞেয়রূপ, কোন রূপই প্রকট নয়।

এইভাবে বিচিত্রপথে বিশ্বসত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। উপরের বিবরণ হতে দেখা যাবে যে এই আলোচনা তিনটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করেছে। তারা তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত। প্রথমটি একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারা প্রভাবান্বিত। তার চেষ্টা হয়

১ Panpsychism ২ Neutral stuff

বিশ্বকে হয় জড়ধর্মী না হয় চৈতন্যধর্মী বলে ব্যাখ্যা করা। দ্বিতীয়টি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, কিন্তু সক্রিয়ভাবে সমন্বয় সাধনে এগিয়ে যেতে পারে নি। তাই উভয়ের সহাবস্থিতি স্বীকার করে বিশ্বের প্রকৃতির ব্যাখ্যা দিয়েছে। তৃতীয়টিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রণোদিত, কিন্তু অতিরিক্তভাবে সমন্বয় সাধনে উদ্‌গ্রীব। এখন আমরা এই বিভিন্ন শ্রেণীর মতগুলির সবিস্তার আলোচনা করবার প্রস্তাব করি। তাদের প্রতিপাদ্য কি জেনে তার পর তা যুক্তিদ্বারা কতখানি সমর্থনযোগ্য তা বিচার করে দেখতে পারি। এই রকম সমালোচনা-মূলক বিচার-বিবেচনার মধ্য দিয়েই এই জটিল সমস্যার সমধানের সূত্র সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে।

(২)

জড়বাদী দর্শন

জড়ের ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাখ্যা

জড়বাদী দর্শনের চেষ্টা হয় কেবল মনের বাহিরে অবস্থিত জড়বস্তুর সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে বিশ্বের প্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে জড়বস্তুর মত। জড়বস্তু আবার মনের বাহিরে অবস্থান করে। জড়বস্তুকে প্রাধান্য দিলে তার মন-নিরপেক্ষভাবে অবস্থিতি বা অস্তিত্বও আপনা হতে স্বীকৃত হয়ে যায়। এদের সেই কারণে বস্তুবাদী দর্শনও বলা যায়। কিন্তু মনে হয় তাকে জড়বাদী বলাই ভাল। আমাদের আলোচ্য সমস্যার প্রসঙ্গে সেই রূপটিই তার বেশী প্রকট।[১]

লোকায়ত দর্শন ভারতীয় জড়বাদী দর্শনের সুন্দর উদাহরণ। মনে হয় তা যেন গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রাইটাস প্রবর্তিত জড়বাদ হতেও প্রাচীনতর। তিনি ছিলেন খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ; কিন্তু মনে হয় লোকায়ত দর্শনের উৎপত্তি হয়েছিল বুদ্ধেরও পূর্বে[২]। লোকায়ত দর্শন বিশুদ্ধভাবে জড়বাদী। তা কেবল মাত্র চারটি মৌলিক পদার্থের স্বীকার করে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও মরুৎ। সেকালের বিশ্লেষণে এই চারটি যৌগিক পদার্থ নিয়েই বিশ্ব গঠিত

১ Materialistic

২ "Several vesteges show that even in the pre-Buddhistic India. prolaimers of purely materialistic doctrines appeared."

Garbe, Philosoply of Ancient India, p. 25

বলে ধারণা করা হত। এরা সকলেই জড়ধর্মী। অন্য ভারতীয় দর্শন চৈতন্য-ধর্মী পদার্থকেও স্বীকার করত; কিন্তু এই দর্শন তা করে না। সুতরাং মনের অস্তিত্বও তা স্বীকার করত না।

এই প্রসঙ্গ সম্পর্কে ইংরাজিতে ব্যবহৃত পরিভাষা সুস্পষ্ট নয়। অনেক সময় এই ধরনের মতকে সূচিত করতে Realism শব্দটি ব্যবহার হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে এই পারিভাষিক শব্দটি কম করে তিনটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম, তা প্লেটো প্রবর্তিত সামান্যবাদকে সূচিত করে। তা বলে সার্বিক সংজ্ঞাগুলিই মৌলিক সত্তা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। দ্বিতীয়, তা ব্যবহৃত হয়েছে এই তত্ত্বকে সূচিত করতে যে জ্ঞাতা-নিরপেক্ষভাবে জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে। এটি জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক তত্ত্ব। New Realism বা Critical Realism তত্ত্বে শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়, তা চেতনধর্মী পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, জড়ধর্মী পদার্থের সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করে—এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। জড়বস্তুকে প্রাধান্য দেয় বলে তাকে Materialism-ও বলা হয়েছে। একে সম্ভবত Objectivism বলা যায়; কিন্তু তাও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হয়ে পড়ে। জ্ঞানতত্ত্বের দিক হতে তা জ্ঞেয়কে প্রাধান্য দেয়, বস্তুতত্ত্বের দিক হতে তা জড়কে প্রাধান্য দেয়। এক্ষেত্রে তাকে Materialism বলাই প্রশস্ত মনে হয়। মানসিক প্রক্রিয়াকে তা জড়শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। এ বিষয় তা আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করে। তার প্রতিপাদ্য হল মানসিক ক্রিয়া হল জড়শক্তিরই ভিন্নরূপে প্রকাশ। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগ্রন্থে এমন কি রসসাহিত্যেও তার দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্বসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ নামে দর্শনের প্রাচীন সংকলন গ্রন্থে বলা হয়েছে এই দর্শনের মতে আত্মা দেহের অতিরিক্ত কিছু নয়। আমি তরুণ, আমি যুবক, আমি বৃদ্ধ ইত্যাদি বোধ হতে আত্মা সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে ওঠে তা জড়পদার্থ হতে কোন স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় দেয় না, এ বোধ দেহেরই বোধ[১]। এই দৃষ্টিভঙ্গি 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে একটি চরিত্রের উক্তির মধ্যে পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছে। চরিত্রটি বলছে: "ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ হল একমাত্র মৌলিক পদার্থ; মানুষের পরমার্থ হল সম্পদ সুখভোগ। জড়বস্তু চিন্তা করবার ক্ষমতা রাখে। পরলোক বলে কিছু নেই। মৃত্যুতেই সব শেষ

১ সর্বসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ ॥ ২ ॥ ৬

হয়ে যায়।"[১] এখানে জড়বাদের সপক্ষে একটি প্রবল যুক্তিও ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে জড়দেহ হতে বিচ্ছিন্নভাবে আত্মার অস্তিত্ব দেখা যায় না। মন দেহের নিত্যসঙ্গী। কাজেই মনকে দেহের অঙ্গীভূত বলে গ্রহণ করা উচিত।

পাশ্চাত্য জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ। তাও চৈতন্যধর্মী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না; যাকে চৈতন্যধর্মী বলা হয় তাকে জড়শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। এ বিষয় ডিমক্রাইটাস-এর অণুবাদের সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক জড়-বাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পার্থক্য নেই। ডিমক্রাইটাস বহু অণুর সমবায়ে মানুষের আত্মার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে মানুষের আত্মা গঠিত হয় একটি বিশেষ শ্রেণীব অণুকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে। এই অণুগুলি অতি সূক্ষ্ম, সম্পূর্ণ গোলাকার, অতি চঞ্চল এবং তেজোমণ্ডিত। দেহের সর্বত্র তারা ছড়িয়ে আছে এবং তাদের সাহায্যেই দেহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়[২]।

বৈজ্ঞানিক জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ তবে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্থাপিত হয়েছে। তার ভিত্তি অণুবাদ এবং তার সমর্থক যুক্তি হল কারণতত্ত্ব[৩]। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে অণুর সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যার পূর্বের অধ্যায়ে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বের মৌলিক পদার্থ হল অণু। এই অণু-গুলির গঠনগত পার্থক্য আছে। স্বাভাবিকভাবে উৎপাদিত অণুর সংখ্যা বিরানব্বই। কতকগুলি বাদে তারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ গড়ে তোলে। জীবের দেহের এবং মনের প্রক্রিয়া কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে এই রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। মস্তিষ্কের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সাধিত হয় স্নায়বিক শক্তি দ্বারা এবং তা উৎপাদিত হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। মোট কথা হল যাকে আমরা মানসিক ক্রিয়া বলি তাকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ দৈহিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে। এই প্রতি-

১ প্রবোধচন্দ্রোদয়, দ্বিতীয় অঙ্ক

২ "The soul is composed of the finest, roundest, most nimble and fiery atoms which are scattered over the entire body—there being always one soul atom between two other atoms—and which produce movements of the body."
Thilly, History of Philosophy, p. 3

৩ Causality

পাদ্যের সপক্ষে যে মূল যুক্তিগুলি ব্যবহৃত হয় তা সংক্ষেপে এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

জড়ের মধ্যে যে কার্য ঘটে তার কারণ জড়পদার্থ হওয়াই স্বাভাবিক। জড়বাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে নানা তথ্য পাওয়া যায়। মানসিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় স্নায়ু দ্বারা। যে জীবের মানসিক কাজ বেশী তার স্নায়ুমণ্ডলী[১] সেইরূপ পরিবর্দ্ধিত। মানুষের মানসিক ক্রিয়া সব থেকে বেশী। তাই দেখা যায় তার স্নায়ুমণ্ডলী সব থেকে পরিবর্দ্ধিত। দেহের অনুপাতে তার মস্তিষ্ক সব থেকে বড়। স্নায়ু দ্বারাই যে মানসিক কাজ সম্পাদিত হয় তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। মস্তিষ্কে আঘাত পেলে মানুষের মন কাজ করে না। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ক্ষমতা হ্রাস পায়।

সকল মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গেই স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিত কোষগুলির[২] আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে কার্যকারণের সম্বন্ধে মানসিক ক্রিয়ার সহিত জড় কারণের সংযোগ স্থাপন করা যায়। আমরা যখন ঘণ্টা বাজতে শুনি তখন জড়বস্তুকে অবলম্বন করে একটি কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করি। ঘণ্টায় আঘাত করলে বায়ুতে তরঙ্গ উৎপাদিত হয়। সেই তরঙ্গ কর্ণপটহে আঘাত করে। তা স্নায়ু যোগে বাহিত হয়ে যখন মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তখনই আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনি। এখানে জড় কারণের সঙ্গে জড় কার্যের সংযোগ যখন বর্তমান, তখন অতিরিক্তভাবে অন্য মানসিক কারণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই হল যুক্তি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যাকে চেতন পদার্থ বলি তার আবির্ভাব পৃথিবীতে ঘটেছে জড় পদার্থের অনেক পরে। সত্তার জড়পদার্থের সমষ্টিরূপেই প্রথম আবির্ভাব। সমগ্র সৌর-জগতে অন্য কোন গ্রহে সজীব সত্তা নেই বলেই মনে হচ্ছে। অন্য সৌর-মণ্ডলে পৃথিবীর মত সজীব পদার্থকে আশ্রয় দিয়েছে এমন গ্রহ আছে কিনা জানা নেই। তা থাকলেও তাদের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং মহাবিশ্বের পরিকল্পনায় সজীব পদার্থের ভূমিকা নগণ্য এবং সেক্ষেত্রে গৌণ বলেই স্বীকার করে নেওয়া বিধেয়। সুতরাং বিশ্বকে বিশুদ্ধভাবে জড়ধর্মী বলে গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত। মানসিক ক্রিয়া বিশ্বের প্রকৃত রূপ নয়, একটা আনুষঙ্গিক রূপ[৩]। বৈজ্ঞানিক জড়বাদের ধারণায় বিশ্বের রূপ কেমন দেখায়

১ Nervous system ২ Neurons
৩ Epephenomenon

পাউলসেন তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন একখণ্ড রুটিতে বাসি হয়ে গেলে যেমন ছাতা পড়ে, তেমন পৃথিবীতে পরিবেশের আনুকূল্যে তার দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসে এক সময় সজীব পদার্থের আবির্ভাব ঘটে। মানুষের বিশ্বমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে সেই প্রসঙ্গেই। কিছুকাল পৃথিবীর কোলে আশ্রিত থেকে এই প্রাণের ধারা মরুর বক্ষে নিস্তেজ স্রোতস্বিনীর মত একদিন বিলীন হয়ে যায়। তা অনিত্য, যা নিত্য তা হল জড় পদার্থ এবং তার নিয়ন্ত্রক নিয়ম[১]।

জৈবশক্তি বা মানসিক ক্রিয়ার জড়ের ভিত্তিতে ব্যাখ্যার সপক্ষে অন্যতম প্রবল যুক্তি হল দেহ হতে পৃথকভাবে তার অবস্থিতি দেখা যায় না। দেহ যতদিন সক্রিয় থাকে তার সঙ্গে তাও বর্তমান থাকে। দেহযন্ত্র বিকল হলে তাও ক্রিয়া করে না। তখন আমরা বলি মৃত্যু ঘটেছে। দেহ হতে পৃথকভাবে মানসিক ক্রিয়া থাকে না, এই তথ্যটিকে যে জড়বাদী দর্শনে তার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে ব্যবহার করা হয়েছে, তা লোকায়ত দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি। সুতরাং দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েও মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকে কিনা সে প্রশ্নটি প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। এমন অনেক দর্শন আছে যা সে অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং পরলোকে বিশ্বাস করে। বিভিন্ন ধর্মের আশ্রিত সংস্কার এই মতকে স্বীকার করে। সুতরাং এই প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

জীবদেহে, বিশেষ করে মনুষ্য দেহে একটি সত্তার অবস্থিতি অনেক দর্শন স্বীকার করে। চৈতন্যবাদী দর্শনগুলি ত করেই; যারা নয় তাদেরও অনেকে করে। তাকে জ্ঞাপন করতে আমাদের দেশে যে পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহার হয় তা হল আত্মা। মৃত মানুষের আত্মাকে আমরা প্রেতাত্মা বলি। পাশ্চাত্য দর্শনে তার সমর্থবোধক শব্দ হল 'সোল'[২]। প্লেটো তাকে পৃথক সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত দর্শন প্লেটো-র অভিমত মোটামুটি

১ "Our earth is at any given moment of its long development covered with a world of living organism, and amongst them man appears as a variation of these forms. After a brief bloom, this world sinks back again into the nothingness from which it came. One thing alone remains: eternal matter and the laws of its motions." Introduction to Philosophy, P. 66

২ Soul

গ্রহণ করেছে। এখন আমাদের আলোচনায় এই সত্তাটিকে সূচিত করতে আত্মা শব্দের ব্যবহারে একটু অসুবিধা এসে পড়ে। উপনিষদের আলোচনায় সাধারণত আত্মা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ব্রহ্ম শব্দের সমার্থবোধক হিসাবে। অবশ্য কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে মানুষের মধ্যে যে মনোময় সত্তা আছে তাকে বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বচনে দুই অর্থেই আত্মন্ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। বচনটি হল এই :

যদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা
এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ সর্বে
লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এবাত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ [১]

এখানে বলা হয়েছে রথের চাকার তারগুলি যেমন রথনাভি এবং রথনেমিকে আশ্রয় করে আছে, তেমন এই আত্মাকে আশ্রয় করে সকল ভূত, সকল দেব, সকল লোক, সকল প্রাণ এবং সকল আত্মা আছে। যা লক্ষ্য করবার তা হল এখানে আত্মা কথাটির দুবার ব্যবহার হয়েছে। প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বসত্তা বা ব্রহ্মকে সূচিত করতে এবং পরে ব্যবহার করা হয়েছে মানুষের আত্মাকে সূচিত করতে। পরবর্তী কালে এই দুই সত্তাকে পৃথক ভাবে সূচিত করবার জন্য আমাদের দর্শনে পরমাত্মা ও জীবাত্মা কথা দুটির ব্যবহার হয়েছিল। মনে হয় তার অনুসরণে মানুষের আত্মাকে সূচিত করতে আমরা জীবাত্মা কথাটির ব্যবহার করতে পারি।

জীবাত্মা দেহ হতে পৃথক ভাবে থাকতে পারে কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে জীবাত্মা অদৌ আছে কিনা এই প্রশ্ন এসে পড়ে। জড়বাদী দর্শন তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত নয়। সুতরাং মানুষের আত্মা আছে কিনা সেই প্রশ্নের আলোচনা দিয়ে আমরা সুরু করতে পারি। এ বিষয় জড়বাদী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিটি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে মার্কিন দার্শনিক উইলিয়ম জেমস-এর এ বিষয় উক্তির মধ্যে। তাঁর অভিমতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

জেমস মানসিক ক্রিয়াকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত অবস্থা হল মানুষ মূলত একটি দেহী। তার দেহ-মনের কাজ হল আত্ম-

১ বৃহদারণ্যক ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১৫

রক্ষা করা এবং পরিবেশ হতে আত্মপুষ্টি সঞ্চয় করা। সেই কারণ পরিবেশ সম্বন্ধে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং তার মধ্যে তার নিজের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে নিতে হয়।

এই প্রসঙ্গেই মানসিক ক্রিয়ার তাৎপর্য। তা উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত এবং তা হল প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে রক্ষা করা এবং নিজের দৈহিক কল্যাণ সাধন করা[১]। কাজেই মানুষের মন ঠিক আয়নার মত বাহিরের বিশ্বকে প্রতিবিম্বিত করে না; তা পরিবেশক জানে এবং তার সহিত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে নানাভাবে চেষ্টা করে। তা একটি সক্রিয় শক্তি; কিন্তু তা বলে সৃষ্টিধর্মী নয়। এর চিন্তা এর মধ্যে উদ্ভুত হয় না। বাহির হতে অনেকগুলি সম্ভাবনার ইঙ্গিত আসে। তার কাজ হল তাদের একটিকে নির্বাচন করা। সুতরাং তা চিন্তা করে না, নির্বাচন করে। তা অনেক সমকালীন সম্ভাবনার একটি সমাবেশ[২]।

তাঁর ধারণায় মনের মধ্যে সচেতন বলে কোনও পদার্থের[৩] অস্তিত্ব নেই। পদার্থ বলতে যদি বুঝি তার একটি পৃথক সত্তা আছে এবং নিজস্ব উপাদানের স্থায়িত্ব আছে যেমন একটি প্রস্তর খণ্ডের আছে তা হলে সচেতন নামে কোন পদার্থ নেই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যাকে সচেতন বলি তার মধ্যে প্রধানত পাই অন্য পদার্থ হতে সংগৃহীত কিছু অভিজ্ঞতা যা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের চেতনার মধ্যে আকাশের দিকে চাইলে পাই একটি নীল রঙের অভিজ্ঞতা, পরমুহূর্তে একটি গাছের দিকে চাইলে পাই একটি সবুজ পত্রে আচ্ছাদিত বস্তুর অভিজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে তা নিত্য-পরিবর্তনশীল কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমাবেশ। প্রতি সমাবেশের মধ্যে একটি ঐক্য আছে, কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য নেই। কাজেই তার নিজস্ব সত্তা বলে কিছু নেই।[৪] তা যেন একটি রঙ্গমঞ্চ যেখানে বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন দৃশ্যের সমাবেশ হয়।

১ "Right or intelligent mental action consists in the establishment··· of such inward relations and reactions as will favour the survival of the thinker or at least his physical well-being."

Journal of Speculative Philosophy Vol. XII, January 1878.

২ "a theater of simultaneous possibilities."

Principles of Psychology, Vol. I

৩ Entity

৪ "For twenty years past I have mistrusted consciousness as an entity; for seven or eight years past I have suggested its nonexistence to my students."

Essays in Radical Empiricism

মানুষের যাকে আমরা ব্যক্তি সত্তা বলি[১] তাও জেমস-এর মতে অনুরূপ-জিনিস। প্রকৃতপক্ষে তাও বোধ দ্বারা রঞ্জিত কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমাবেশ মাত্র। দেহের মধ্যে যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে মানুষ 'আমার কাজ' বলে বোধ করে, কারণ তা দেহের মধ্যেই সংঘটিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের যা অভিজ্ঞতা হয় সবই ঘটে দেহকে কেন্দ্র করে। আমরা যা কিছু দর্শন করি, যা কিছু কাজ করি, যা কিছু আকর্ষণ অনুভব করি, সবই দেহকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। সুতরাং আমাদের অহং বোধ এই দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ফলে মানসিক ক্রিয়ার তা একটি কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রকৃতপক্ষে তা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে মাত্র সূচিত করে। সেই অভিজ্ঞতাগুলি 'আমার' বলে যে ধারণা হয়, তার কারণ তারা অহং বোধের দ্বারা রঞ্জিত হয়। আসলে তা হল দেহকে কেন্দ্র করে কতকগুলি অভিজ্ঞতা পরম্পরা।[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মনকে জেমস নিতান্তই জড়বাদীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। তাই মনের মধ্যে দেহ হতে কোন পৃথক সত্তার আবিষ্কার করতে পারেন নি। তিনি মনকে দেহের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করেছেন। অহংবোধ তার মতে দেহকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, কারণ মনের সকল অভিজ্ঞতা দেহকে অবলম্বন করেই লাভ হয়।

আমরা এখন এমন একটি দার্শনিক মত দিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ করতে পারি যা আত্মাকে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। তত্ত্বটি কঠ উপনিষদে দেওয়া হয়েছে। তাতে আত্মা ও তার পরিবেশকে নিয়ে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি দেখা হয়েছে বলে তার উৎকর্ষ। কঠ উপনিষদে ব্যাখ্যা ও আত্মাসম্পর্কিত তত্ত্বটির প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন যে যেখানে প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটে সেখানে তার সঙ্গে তার পরিবেশের অবিরাম একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা চলেছে।[৩]

১ self

২ "The body is the storm centre, the origin of co-ordinates, the constant place of strains in all that experience-train. Everything circles round it and is felt from its point of view. The word 'I' then is primarily a noun just like 'this' and 'have'."

Pluralistic *Universe*, p. 380 note.

"Life is a continuous adjustment of internal relations to external relations."—*Principles of Biology*

কথাটি খুবই সত্য। জীবের সঙ্গে তার পরিবেশের এক হিসাবে ধরতে গেলে একটি বিরামহীন দ্বন্দ্ব চলেছে। পরিবেশ একদিকে আর জীববিশেষ অন্য দিকে। জীব বিশেষ সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিত একটি পৃথক সত্তা। তা এমন ভাবে সজ্জিত যে তার পরিবেশ হতে পৃথক থেকেও আত্মরক্ষা করতে পারে এবং সেই পরিবেশ হতেই পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন এমন কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের যার সাহায্যে তা বাহিরের পরিবেশ হতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে; কারণ, কোথায় বিপদ লুকিয়ে আছে তা জানতে হবে এবং কোথায় খাদ্য আছে তা সংগ্রহ করতে হবে। তার পর পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলবার জন্য একটি নিয়ন্ত্রক শক্তির প্রয়োজন। ইচ্ছা শক্তি হিসাবে তা শরীরের মধ্যে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, ইচ্ছাশক্তিকে ঠিকমত পরিচালিত করবার জন্য বিবেচনা শক্তির প্রয়োজন। বুদ্ধিশক্তি হিসাবে তা বর্তমান। বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, ইন্দ্রিয়—এদের সুসংবদ্ধ করে সাজিয়ে একত্রিত রূপে তাই দেহ গড়ে উঠেছে। এরা সকলেই একটি বিশেষ সত্তার স্বার্থ সংরক্ষিত করছে; সেই সত্তাকে মানুষের ক্ষেত্রে এখানে আত্মা বলা হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই কঠ উপনিষদে ব্যাখ্যাত আত্মাবিষয়ক তত্ত্বটি বর্ণিত হয়েছে। এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সত্তা হল আত্মা যা বিশেষ মানুষকে ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। সেই ব্যক্তি-মানুষ নিজের জীবনকে বিকশিত করে পরিবেশের থেকে নিজেকে পৃথক রেখে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে। পরিবেশের সঙ্গে সে নিজেকে পরিচিত করে, তারপর নিজেকে যেভাবে বিকশিত করতে চায় সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে পরিবেশে যা পায় তার কিছু বর্জন করে, কিছু গ্রহণ করে। এই ভাবেই দিনে দিনে ধীরে ধীরে তার জীবন গড়ে ওঠে।

কথাটি বোঝাবার জন্য এখানে একটি উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে। জীবনকে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী একটি পথ অতিক্রমণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই পথ যেন বাহ্যিক পরিবেশ। সেকালে যন্ত্রচালিত যান ছিল না, অশ্বচালিত রথই পথ চলতে ব্যবহার করা হত। এই রথকে অবলম্বন করেই আত্মার পরিকল্পনাটি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে বর্ণিত হয়েছে। রথে আরোহী থাকে; তাকে টানতে অশ্ব নিযুক্ত হয়; সেই অশ্বকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে লাগাম থাকে; তাদের কোন দিকে পরিচালিত করতে হবে তা ঠিক

করবার জন্য সারথি থাকে। এই সব কিছু আয়োজন আরোহীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে; তার জন্যই ত রথ চালানো। সেই রথী হল মানুষের ক্ষেত্রে আত্মা। আর আরোহী, সারথি, অশ্ব প্রভৃতি সমেত যেমন পথ যাত্রার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তেমন দেহ ও মনকে জড়িয়ে নিয়ে ব্যক্তিমানুষের জীবন পথে যাত্রার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এইভাবে উপমাকে সর্বাংশে প্রয়োগ করে উভয়ের পরস্পরের এই ভাবে তুলনা করা হয়েছে;

আত্মা হল রথীর সমস্থানীয়;
শরীর হল রথের সমস্থানীয়;
বুদ্ধি হল সারথির সমস্থানীয়;
মন হল প্রগ্রহের সমস্থানীয়,
আর ইন্দ্রিয় হল অশ্বের সমস্থানীয়।[১]

সুতরাং কঠ উপনিষদে আত্মা পরিকল্পিত হয়েছে একটি জটিল সত্তা রূপে। তা যেন একটি বহু-অঙ্গ-বিশিষ্ট সত্তার নিয়ামক কেন্দ্রবিন্দু। তা দেহ ও মন উভয়কে জড়িয়ে নিয়ে অবস্থিত। তার যেমন দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, তেমন একটি মানসিক দিকও আছে। দেহ জড় হলেও তা প্রাণশক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত এবং আত্মার বাহক। জেমস বর্ণিত আত্ম-তত্ত্বের সঙ্গে আমরা এই তত্ত্বের তুলনা করে দেখতে পারি। জেমসও স্বীকার করেন যে পরিবেশ হতে জীব পৃথক এবং পরিবেশ হতে আত্মরক্ষা করার একটি চেষ্টা তার মধ্যে ক্রিয়াশীল। কিন্তু তার জন্য তিনি একটি পৃথক নিয়ন্ত্রক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাই নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়াকে তিনি দেহের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। এমন কি মনের মধ্যে একটি চৈতন্যের ধারার অস্তিত্ব স্বীকার করেও তার মধ্যে সক্রিয় নির্বাচনশক্তি বা উদ্ভাবন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। নির্বাচন যেন আপনা-আপনি যান্ত্রিক ভাবে ঘটে যায় এই ধরনের তাঁর মত। কঠ উপনিষদে বর্ণিত তত্ত্ব দেহকে স্বীকার করে; কিন্তু তার সঙ্গে একটি মানসিক সত্তার অস্তিত্বও লক্ষ্য করে এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষেত্রে সেই মানসিক শক্তিকেন্দ্রকে নিয়ামক শক্তি বলে গ্রহণ

১ আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ॥
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
কঠ ॥১।৩।৪

করে। এই তত্ত্ব অনুসারে তাই হল আত্মা এবং তা দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত।

এখন আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি এই দুই বিপরীতধর্মী মতের সম্পর্কে কোথায় কতখানি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এই বিষয় সম্বন্ধে প্রথমেই কতকগুলি সর্ববাদিস্বীকৃত তথ্য স্থাপন করা যায়। তার ভিত্তিতে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হবে।

আমরা প্রথমে লক্ষ্য করতে পারি যে মানুষের দেহের মধ্যে দুটি পৃথক ধরনের ক্রিয়া চলছে। একটি হল দেহকে জীবিত রাখবার ক্রিয়া এবং অপরটি হল ইন্দ্রিয়সমেত দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রিত করবার ক্রিয়া। প্রথমটির কাজ হল বাহির হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে পাকস্থলীতে পরিচালিত করা, তাকে অন্ত্র এবং যকৃৎএর সাহায্যে পরিপাক করে দেহের পুষ্টি সাধন করা, দেহের অভ্যন্তরে যে দূষিত পদার্থ জমে উঠছে তাকে বহিষ্কার করা। শুধু তাই নয়, দেহের কার্যক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে বাহিরের বায়ু হতে অক্সিজেন নিয়ে ফুসফুসের সাহায্যে রক্ত পরিশোধিত করা এবং দূষিত কার্বন নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির করে দেওয়া এবং সেই পরিশোধিত রক্ত ধমনী যোগে সমগ্র দেহে পরিচালিত করা। এটা হল নিতান্তই দেহকে কর্মক্ষম ও সজীব রাখার কাজ। এই কাজগুলি নীরবে দেহের অভ্যন্তরেই সম্পাদিত হয় এবং প্রধানত মানসিক ক্রিয়া ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়। পাকস্থলীর কাজ কেমন করে হয় আমাদের মন তার কোন খবর রাখে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আপনি চলে, ঘুমের মধ্যেও নির্বিঘ্নে চলে। আর হৃৎপিণ্ডের দেহের সর্বত্র রক্তপ্রবাহকে পরিচালিত করবার ক্রিয়া ত নির্ধারিত ছন্দে আমরণ সম্পাদিত হয়। এই কাজগুলি পৃথকভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি পৃথক মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে তার নিম্ন অংশে স্থাপিত আছে। তাকে আমরা লঘু মস্তিষ্ক [১] বলি।

মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রিত মানসিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদনের জন্য একটি পৃথক মস্তিষ্কের ব্যবস্থা আছে। অন্য জীবের তুলনায় মানুষের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে তার আকৃতিও বড়। তাকে আমরা গুরু মস্তিষ্ক[২] বলি। তা করোটির সমগ্র উপরের অংশ জুড়ে অবস্থিত। অন্য জীবের তুলনায় দেহের অনুপাতে তার আকার সব থেকে বড়। এই গুরু মস্তিষ্কের সাহায্যেই সকল সজ্ঞানে কৃত এবং মন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কাজগুলি সম্পাদিত

১ Cerebellum ২ Cerebrum

হয়। বাহিরের পরিবেশকে জানা এবং তার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করে প্রতিক্রিয়ার নির্দেশ এই মস্তিষ্ক হতে করা হয়। যুক্তি-সম্মত চিন্তা, শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি, শিল্পকর্ম রচনা ইত্যাদি উন্নতস্তরের সকল মানসিক ক্রিয়ার কেন্দ্র এই গুরু মস্তিষ্ক।

সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে জৈব ক্রিয়াকে তার জটিলতার ভিত্তিতে প্রকৃতিই দুটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়েছে। একটি হল মৌলিক জৈব ক্রিয়া। তার কাজ হল দেহকে সংরক্ষিত করা এবং পরিচালিত রাখা। সেটি মানুষের সচেতন মনের অজ্ঞাতে আপনা হতেই সম্পাদিত হয়। তার কর্মকেন্দ্র লঘু মস্তিষ্ক। অপরটি হল মনের সচেতন কর্ম নিয়ন্ত্রিত করা। তাদের সঙ্গে দেহকে পরিচালিত রাখার দায়িত্ব জড়িত নয়। তারাই হল মানুষের মনের উপাদান। চিন্তা, হৃদয়ের অনুভূতি, শিল্পবস্তু রচনার আকৃতি, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম করবার আকৃতি—এরাই হল সেই উপাদান।

জেমস মনের সঙ্গে নদীর স্রোতের ধারার তুলনা করেছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন। আমরা যতক্ষণ জাগি, আমাদের মন যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ আমাদের মনে নানা বৃত্তির কাজ চলতে থাকে; এমন কি স্বপ্নাবস্থায়ও এ কাজের বিরাম ঘটে না। গভীর ঘুম ব্যতীত এই কর্মের ছেদ নেই। কিন্তু তার ফলে মানসিক ক্রিয়ার ধারার কোন ছেদ পড়ে না; যেমন আমরা প্রতিদিন খানিকটা করে বই লিখি, কিন্তু তা সত্ত্বেও রচনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না। আমাদের মন সত্যই একটি সচঞ্চল ধারা। এই ধারাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে চারটি পৃথক উপাদান পাওয়া যায়। তাদের নিয়েই আমাদের সচেতন মন গঠিত। কাজেই তাদের মানসিক বৃত্তি বলতে পারি। প্রথম হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি। তার সাহায্যেই আমাদের সচেতন মন বাহিরের পরিবেশের সহিত পরিচিত হয়। তার নিজের কর্ম নির্ধারণের জন্য সে পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় বৃত্তিটি হল মনন। তার প্রথম কাজ হল ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। অতিরিক্ত কাজ হল চিন্তা করা। তৃতীয় হল কর্মপ্রণোদক বৃত্তি। যে কাজ ইচ্ছা করে করি তাই হল এই বৃত্তির প্রকাশ। মানুষের বিভিন্ন ইচ্ছাই তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আর এক শ্রেণীর বৃত্তি আছে যাদের হৃদয়বৃত্তি বলতে পারি। তা অন্য বৃত্তিগুলির সহিত সংযুক্ত। যেমন ইচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম সফল হলে আমাদের ভাল লাগে, না হলে খারাপ লাগে। এইভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতিও সুখকর

হতে পারে, দুঃখকরও হতে পারে। অন্য ব্যক্তির সহিত পরিচয়ে তাকে ভাল লাগতে পারে, খারাপও লাগতে পারে। ফলে হৃদয়ে শ্রদ্ধার অনুভূতি বা বিদ্বেষের অনুভূতি জাগতে পারে।

এই প্রসঙ্গে যেটি আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল এই বৃত্তিগুলি স্বয়ং সক্রিয় থেকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়ে মনের মধ্যে প্রবাহিত ধারাকে রূপ দেয় না। তারা সক্রিয়ভাবে পরস্পরের প্রভাবান্বিত হয়ে কাজ করে। স্রোতে ভাসমান বস্তু যেমন অক্রিয়ভাবে স্রোতের শক্তির প্রভাবে চালিত হয় এ তেমন নয়। যদি তুলনা করতে হয় বলতে হয় খেলোয়াড় পরিচালিত বিলিয়ার্ড বলের গতির মত তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এই বৃত্তিগুলি পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে, একটি উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মনের মধ্যে প্রবাহিত এই স্রোতের ধারাকে রূপ দেয়। কাজেই এই বৃত্তিগুলি সচেতন মনে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। একটি উদাহরণ নিলে আমাদের বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। ধরা যাক আবছায়া অন্ধকারে আমার দর্শনেন্দ্রিয় এমন একটি বস্তু সম্বন্ধে তথ্য এনে দিল যাকে আমার বুদ্ধি শক্তি ব্যাখ্যা করল সাপ বলে। যেমন মননবৃত্তি চিনল এটা সাপ, সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্মপ্রণোদক বৃত্তি আদেশ পেল আমার হাতের লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করতে। আমার হাত সেই আদেশ পালন করল। যখন তা নড়ে না দেখলাম, তখন কাছে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে রজ্জুর লক্ষণ ধারণ করে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির এই নূতন তথ্যকে ভিত্তি করে মননবৃত্তি বলল, এটা ত সাপ নয়, এটা রজ্জু। তখন হৃদয়বৃত্তি আর ভয়ে অভিভূত রইল না। এই রকম প্রতিনিয়তই মনের মধ্যে ঘটে চলেছে। যে স্রোত সেখানে বয়ে চলেছে তাতে এই চারটি পৃথক ধারা ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছে। এরাই হল আমাদের সক্রিয় মনের আধেয়। যা এই উদাহরণটিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার তা হল এই যে আত্মরক্ষার ইচ্ছা এখানে বিভিন্ন বৃত্তির ক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। আমাদের সকল সচেতন ক্রিয়াই প্রধানত কোন না কোন ইচ্ছাদ্বারা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মনের মধ্যে প্রবাহিত এই স্রোতের সঙ্গে নদীর প্রবাহের তুলনা তার প্রকৃত পরিচয় ঠিক দিতে পারে না। তার কারণ নদীর ধারা কতকগুলি অক্রিয় জলকণার দ্বারা গঠিত; কিন্তু মনের প্রবাহ যে উপাদানগুলি দিয়ে গঠিত তারা সক্রিয়। কাজেই একটি যান্ত্রিক ক্রিয়ার সঙ্গে তার ঠিক তুলনা চলে না।

ঠিক সেই কারণে জেমস যে মনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের তুলনা দিয়েছেন তাও ঠিক নয়। রঙ্গমঞ্চে যে বিভিন্ন দৃশ্য ও চরিত্রের সমাবেশ হয় তা আপনা হতে আকস্মিকভাবে হয় না। যিনি সূত্রধার তাঁর নির্দেশে একটি কাহিনীকে পরিস্ফুট করতে তাদের উদয় হয়।

শুধু তাই নয়, মনের মধ্যে যে ঘটনার ধারা প্রবাহিত তার স্মৃতিও একটা মনে থেকে যায়। অতীতের অভিজ্ঞতা মনের মধ্যেই স্মৃতির আকারে সংরক্ষিত হচ্ছে। সে স্মৃতি কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও সুস্পষ্ট, কিন্তু সঞ্চয়ের বিরাম নেই। ব্যক্তিবিশেষ জীবনে প্রথম আত্মসচেতন হবার পর থেকে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে তার জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে যেতে পারে। এখানে মানুষের মনও খানিকটা আত্মজীবনীর লেখকের মত কাজ করে। অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতির ভাণ্ডারে তা লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং দরকার মত তা হতে প্রয়োজনীয় তথ্য তখনি এসে হাজির হচ্ছে। একটি মানুষের সঙ্গে অনেক কাল ব্যবধানের পরে দেখা। তার আচরণের বা চেহারার সহিত কোন সাদৃশ্যকে ভিত্তি করে তখনি স্মরণশক্তি বলে দিল, এ তোমার ছোটবেলার বিদ্যালয়ের সহপাঠী; তখন আমি তাকে চিনতে পারলাম। তাই মনে হয় নদীর স্রোতের সঙ্গে বা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা ঠিক হয় নি: তা বিভ্রান্তি ঘটায়, মনে হয় মনের ঘটনার স্রোত কতকগুলি অক্রিয় উপাদানের যান্ত্রিক সমাবেশ। নদীর স্রোতের সঙ্গে মনের প্রকৃতির যেটুকু মিল তা নিতান্তই বাহ্যিক। এইটুকু মাত্র মিল আছে যে উভয়েই গতিশীল, উভয়েই নিত্য পরিবর্তনশীল। আর সব দিকেই অমিল। নদীর স্রোতের জলকণা অক্রিয়ভাবে যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়। মানসিক বৃত্তিগুলি সক্রিয় ভাবে পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। নদীর স্রোত নিজের পরিবর্তনশীলরূপের কোন স্মৃতি বহন করে না। মনের অভ্যন্তরে স্রোত অনুক্ষণ স্মৃতিরূপে সংরক্ষিত হচ্ছে। স্মরণশক্তি এইভাবে শুধু মানসিক জীবনের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সচেতনতা আনে না, তার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে একত্ববোধও পরিস্ফুট করে।

আমরা অতিরিক্তভাবে আরও লক্ষ্য করতে পারি যে মনের মধ্যে যে ঘটনাপ্রবাহ চলেছে তার শুধু অভিন্নতাবোধ নয়, তাকে ব্যাপ্ত করে একটি আত্মসচেতনতাবোধও বিরাজমান। এই মনের মধ্যেই এমন কিছু আছে যা এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে শুধু সচেতন নয়, অতিরিক্তভাবে অনুভব করে, এগুলি আমার মনের মধ্যে প্রবাহিত ঘটনা। তা ভাবে এই যে নানা বৃত্তির মিলনে

ঘটনা প্রবাহ গড়ে উঠছে সেগুলি আমারই মনের উপাদান। সেই মন আমার। মনের প্রতি উপাদানের সঙ্গেও সেই আত্মসচেতনতা সংযুক্ত। ইন্দ্রিয় পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আনে, তা বলে তা আমারই অনুভূতি ; মনে চিন্তা ঘটে. তা বলে আমারি চিন্তা ; যে ইচ্ছাশক্তি তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তা বলে তা আমারই ইচ্ছাশক্তি ; হৃদয়ে যে অনুভূতি জাগে, তা বলে সে আমারই অনুভূতি। শুধু তাই নয়। স্মরণশক্তি তার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে স্মৃতি বহন করে, তা বলে তা আমারই জীবন। যে দেহের মধ্যে তা ক্রিয়াশীল, তা বলে এ আমারই দেহ। এমন কি বহির্বিশ্বের বস্তু সম্বন্ধেও তার মালিকানা সে সরবে ঘোষণা করে। সুতরাং এই ধারাবাহিকতা, সেই ধারাবাহিকতার স্মৃতিকে অবলম্বন করে একত্ববোধ এবং নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আত্মসচেতনতা মনের মধ্যে একটি অহংবোধের সৃষ্টি করে।

আরও দেখা যায় এই অহংবোধকে কেন্দ্র করে আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তার গড়ে ওঠে। তা দেখায় এই শক্তিটি নিতান্তই সক্রিয় শক্তি। নিজস্ব মতিগতির ভিত্তিতে সে নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই আচরণের মধ্যে অভ্যাসগুণে একটি সাদৃশ্য গড়ে ওঠে। একটি বিশেষ পরিবেশে ব্যক্তি বিশেষ একই আচরণ করবে ধরে নেওয়া যায়। যে সমাজের অন্য মানুষের কল্যাণ সাধন করতে অভ্যস্ত সে সৎ মানুষ বলে সুখ্যাতি অর্জন করবে। যে নিতান্ত স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে অন্যের অকল্যাণ ঘটাতে অভ্যস্ত সে অখ্যাতি অর্জন করবে। এইভাবে আচরণের মধ্য দিয়ে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এই হল সাধারণ মানুষের কথা। তার মতিগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তার ইচ্ছাশক্তি তার চরিত্রকে গড়ে তোলে।

অসাধারণ মানুষের কথা আরও বিস্ময়কর। তিনি দৈনন্দিন জীবনে নিজের মতিগতির পথে নিজেকে পরিচালিত করে শুধু ক্ষান্ত হন না, তার মনে একটি প্রবল ইচ্ছাশক্তি তাঁর সমগ্র চিন্তা, কর্ম, হৃদয়ের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাঁর স্থাপিত গন্তব্যের পথে তাঁর জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যে কোন কৃতি সাধকের জীবনই তার দৃষ্টান্ত। সাম্রাজ্যবাদের গরল একটি বিরাট দেশকে কি চূড়ান্ত দুর্দশার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে দেখে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সকল চিন্তা, সকল শক্তি এবং সকল কর্ম নিয়োগ করেছিলেন ভারতের মুক্তি সাধনায়। ফলে স্বাধীন ভারতের জনক হিসাবে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল। হেলেন কেলার অতি অল্প বয়সে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দুই-ই

হারান ; তবু তাঁর দুর্ভাগ্যই তাঁর মনে এমন প্রেরণা জুগিয়েছিল যে প্রথমত তিনি এই দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও কথা বলতে এবং পড়তে শিখলেন এবং পরে তাঁর মত দুর্ভাগাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই দৃষ্টান্তগুলি দেখায় যে মানুষের মধ্যে যে সত্তা আছে তা শুধু সক্রিয় নয়, তা প্রয়োজন হলে এমন প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা রাখে যা একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্য পথে নানা প্রতি-কূলতা সত্ত্বেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সুতরাং মানুষের মনে আমরা কতকগুলি বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ দেখি। প্রথমত তার দেহ আছে, কিন্তু তা ঠিক সাধারণ জড় পদার্থ নয় ; তা দেহী-রূপে সুসম্বিবদ্ধ জীব।[১] তার সাধারণভাবে সংরক্ষণের কাজ অচেতনভাবেই সম্পাদিত হয়। কিন্তু তার উন্নত মানসিক ক্রিয়াগুলি সচেতনভাবে সম্পাদিত হয়। সেগুলিই তার মনের সচেতন অংশের উপাদান। তারা একটি ধারার মত, কিন্তু সেই ধারা যন্ত্রের মত অক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয় না, একটি ইচ্ছা-শক্তির নিয়ন্ত্রণে তারা পরিচালিত। যে ইচ্ছাশক্তি এদের নিয়ন্ত্রণ করে তা একটি অহংবোধের সঙ্গে জড়িত। মনের মধ্যে অবস্থিত সেই 'আমি' নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং দেহ সমেত ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াগুলি তার নিজের বলে বোধ করে এবং ব্যবহার করে। তাকে ঘিরে একটি ব্যক্তি সত্তা ফুটে উঠেছে। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে একটি অনন্যসাধারণ পৃথক সত্তা হিসাবে চিহ্নিত করে।

এখন প্রশ্ন হল এটিকে একটি পৃথক সত্তা বলে গ্রহণ করা যায় কিনা। উপরে স্থাপিত তথ্যগুলি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করবে যে তা একটি পৃথক সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি পাবার অধিকার রাখে। এক খণ্ড পাথরের যদি একটি পৃথক বস্তু[২] হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা থাকে, তার অনেক বেশী আছে। পাথর-খণ্ড অক্রিয় দেহধারী, মানব সত্তা চৈতন্যযুক্ত এবং সক্রিয় ; শুধু পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করে আত্মরক্ষা করে না, তা নিজেকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করবার ক্ষমতা রাখে। পাথর-খণ্ড প্রকৃতির পরিবেশের একটি অক্রিয় অংশ। পরিবেশ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং পরিচালিত করে। এ বিষয় তার নিজের কিছু করবার নেই, অক্রিয়ভাবে পরিবেশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া গতি নেই। এই সত্তা মূলত কিন্তু মানসিক। যে অংশে তা দেহ সেখানেও তা জড় উপাদানে গঠিত দেহকে সজীব পদার্থে পরিবর্তিত

১. Organism ২. Substance

করে। সুতরাং এই মানসিক সত্তার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করতে পারি। এই মানসিক প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তাকে আমরা জীবাত্মা[১] বলতে পারি।'

এখন আমরা আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে পারি। তা হল দেহ হতে বিচ্ছিন্নভাবে আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা, অর্থাৎ পরলোক আছে কিনা। এ বিষয় কি ভারতীয়, কি পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে একটি আশ্চর্য ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়। প্লেটো-র দর্শনে তার স্বীকৃতি আছে। তাঁর ধারণায় মানুষের আত্মা আছে এবং মৃত্যুর পরও তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন কি কর্মফল-বাদও তিনি একরকম মানেন। তাঁর মতে দার্শনিকরা সব থেকে ধার্মিক মানুষ। তাই মৃত্যুর পর তারা দেবতাদের সঙ্গে সুখে বাস করবার অধিকার পায়। যারা সাধারণভাবে ধার্মিক তারা মৃত্যুর পর সমাজতন্ত্রে অভ্যস্ত জীবে পরিণত হয়। অর্থাৎ তারা মৌমাছি বা পিপীলিকা জাতীয় জীব হয়ে জন্মায়। এই শ্রেণীর সমাজের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বলেই বোধ হয় তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। আর যারা অধার্মিক তারা প্রেতে পরিণত হয় এবং সমাধিক্ষেত্রে বিচরণ করে। তারা জীব দেহে অনুপ্রবেশ করবারও ক্ষমতা রাখে।[২]

সম্ভবত প্লেটো-র অনুসরণে খ্রীষ্টধর্মেও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তবে প্রাচীন বাইবেলেও তার উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টধর্মেও তা স্বীকৃত। ইহলোকে জীবনের সমাপ্তি হবার পর 'শেষ বিচারের দিনে'[৩] সকলের ডাক পড়ে এবং বিচারের শেষে কেহ বা স্বর্গে যায় কেহ বা নরকে যায়। বুক অব এনক-এর[৪] মধ্যে স্বর্গ নরক ও শেষ বিচারের উল্লেখ আছে। সেণ্ট অগষ্টিন তাঁর গ্রন্থে[৫] উল্লেখ করেছেন যে ইহজীবনেই যদি চূড়ান্ত শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা থাকত তা হলে শেষ বিচারের প্রয়োজন হত না। সেণ্ট টমাস একুইনাস তাঁর গ্রন্থে বলেছেন[৬] যে কেবল মানুষের আত্মা অমর। তিনি একই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রেতাত্মার স্বর্গ ও নরক বাসের ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে এক লোকায়ত দর্শন ব্যতীত আত্মা পৃথক সত্তা হিসাবে স্বীকৃত এবং মৃত্যুর পরেও যে আত্মা বর্তমান থাকে, তাও স্বীকৃত। অতিরিক্তভাবে আর একটি তত্ত্ব তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তা হল জন্মান্তরবাদ।

১ Soul
২ প্লেটো-র Phaedo শীর্ষক Dialogue দ্রষ্টব্য
৩ Last Judgment
৪ Book of Enoch
৫ City of God.
৬ Summa Contro Gentiles, Book II

তা বলে মানুষের আত্মা জীবনে যে কর্ম করে তার ফল ভোগ করবার জন্য পুনরায় তাকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। ভাল কর্ম করলে পরবর্তী জন্মে অবস্থার উন্নতি হয়, খারাপ কর্ম করলে অবস্থার অবনতি ঘটে। অতিরিক্তভাবে সকল ভারতীয় প্রতিষ্ঠিত দর্শনগুলির মতে এই জন্মান্তর গ্রহণ একটি দুর্ভাগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত, কারণ তা আত্মাকে জন্ম হতে জন্মান্তরের জালে জড়িয়ে ফেলে। এই জন্মান্তরের বন্ধন হতে মুক্তিই মানুষের জীবনের পুরুষার্থ। সেই মুক্তি অর্জিত হয় জ্ঞানের এবং নীতিসম্মত জীবনের পথে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন নীতি সম্পর্কিত পথকেই নির্বাণ বা মুক্তির উপায় বলে নির্দেশ করেছে। হিন্দু দর্শনগুলি জ্ঞানমার্গকে মুক্তির উপায় বলে গ্রহণ করেছে।

সম্ভবত বৌদ্ধ দর্শন ছাড়া এই সকল দর্শনগুলিই পরজন্মের বন্ধন হতে মুক্তিলাভের পর আত্মার একটি পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকে। সেই অবস্থাই এদের মতে বিশেষ বাঞ্ছনীয় অবস্থা। জৈন দর্শনের ধারণায় জন্ম বন্ধন হতে মুক্তিলাভের পর আত্মা নিজের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থায় তা অনন্ত জ্ঞান, অনন্তদর্শন, অনন্তশক্তি ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী। ন্যায় দর্শন জন্ম বন্ধন হতে মুক্ত আত্মার যে রূপ কল্পনা করে তাকে বলা হয়েছে 'দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি'। জীবনের সঙ্গে যে দুঃখভোগ জড়িত থাকে, তা হতে এ অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মনে হয় ন্যায় দর্শন বেশী রকম দুঃখবাদী ছিল; তা না হলে দুঃখ হতে পরিত্রাণকেই পুরুষার্থ বলবে কেন? সাংখ্য দর্শনের মূল তত্ত্ব দুটি, প্রকৃতি ও পুরুষ। এই পুরুষই আত্মার সমস্থানীয়। এই দর্শনের বিচারে মুক্ত অবস্থায় দার্শনিক জ্ঞান লাভের পর প্রকৃতি হতে পুরুষ বিচ্ছিন্ন হয় এবং ফলে তার নিজস্ব রূপটি তা ফিরে পায়. সে রূপে তা নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং জ্ঞানস্বরূপ। শংকরাচার্যের অদ্বৈত দর্শনের মতে ব্রহ্মের সঙ্গে বিশ্বের অভেদজ্ঞান হতেই আত্মার মুক্তি ঘটে। মনে হবে পরজন্মের বন্ধন হতে মুক্তির পর বিশ্বাত্মার বা ব্রহ্মের সঙ্গে বিলীন হয়ে জীবাত্মার পরিণতিতে প্রকৃত অভেদত্ব ঘটাই উচিত। কিন্তু মুক্ত অবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে অন্য রকম। তাকে বলা হয়েছে 'বিদেহ মুক্তি'। এই অবস্থায় ও অভেদ-উপলব্ধি বর্তমান থাকবে এবং আনন্দের অনুভূতি উৎপাদিত হবে। সম্ভবত আনন্দ উপলব্ধির আকর্ষণে প্রকৃত অদ্বৈত সম্বন্ধ ঘটানো হয় নি।

উপনিষদের পরবর্তী যুগের দর্শনগুলিতে পরজন্ম ও কর্মফল বাদ একটি যুগ্মতত্ত্ব হিসাবে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত গৃহীত হয়েছে যে তা দেখলে আশ্চর্য

হতে হয়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের উপনিষদের যুগে এমন কি বেদের সংহিতা অংশেও ফিরে যেতে হবে। সেখানে পরলোক এবং কর্মফল সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে এই তত্ত্বটি উপনিষদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে এবং সেটিই পরবর্তী যুগের দর্শনে একটি দৃঢ় সংস্কাররূপে পরিণত হয়েছে। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, কারণ তা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

ঠিক বলতে কি পরজন্মবাদের বীজ বেদের মধ্যেই নিহিত ছিল। যম সেখানে পরলোকের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে দেখা যায়, মৃত্যুর পরেও যে প্রেতের অস্তিত্ব থাকে সে বিষয় সেখানে একটি অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে। সেখানে বলা হয়েছে শবদাহের পর মানুষের প্রেত যমের কাছে চলে যায়। সেখানে তার পিতৃ-পুরুষগণ পূর্ব হতেই অপেক্ষা করছেন।[১] এটিই সম্ভবত পরজন্মবাদের বীজ।

তার পর দেখি উপনিষদের মধ্যে এমন একটি মত গড়ে উঠেছে যা মৃত্যুর পরে প্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু পরজন্ম থাকে কিনা এ বিষয় কোন নিশ্চিত মত দেয় নি। পরজন্মবাদের ক্রমবিকাশের পথে তাই যেন মনে হয় প্রথম পদক্ষেপ। বৃহদাবণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যখন কোন মানুষ ইহলোক হতে চলে যায়, প্রথম সে বায়ুতে যায়, তার পর সে আদিত্যে যায়, তার পর সে চন্দ্রে যায়। সেখান হতে সে এক শোকবর্জিত অশীতল লোকে উপস্থিত হয়ে শাশ্বত কাল বাস করে।[২] সুতরাং এখানে মৃত্যুর পর প্রেতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু পরজন্ম স্বীকৃত হয় নি। পাপ বা পুণ্যকর্মের পরলোকে কোন প্রভাব সংক্রামিত হয় কিনা তারও উল্লেখ নেই।

তার পর আমরা এই ধরনের উক্তি পাই যা অতিরিক্তভাবে বলে যে অতীতের কাজের ওপর প্রেতের পরলোকে কেমন অবস্থা হবে তা নির্ভর করে। এইখানেই প্রথম পরলোকের সঙ্গে কর্মফলতত্ত্ব সংযুক্ত হচ্ছে। ঈশ

১ প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বেভির্
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা
যমং পশ্যামি বরুণং চ দেবম্॥ —ঋগ বেদ॥ ১০॥ ১৪॥ ৭

২ স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমং তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমা॥ বৃহদারণ্যক॥ ৫॥ ৩॥ ১০

উপনিষদে আত্মহত্যার তীব্র নিন্দা করে বলা হয়েছে যে যারা আত্মহত্যা করে তারা এক আনন্দহীন লোকে গমন করে।[১] বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে বিভিন্ন মানুষের ভাগ্যে পরলোকে বিভিন্ন অবস্থা জোটে। যাঁরা অরণ্যে বাস করে সত্যানুসন্ধান করেন, তাঁরা নানা লোকে ঘুরে শেষে ব্রহ্মলোকে গিয়ে সেখানে চিরকালের মত বাস করেন। যাঁরা সংসারে কর্মমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁরাও নানা স্থান ঘুরে শেষকালে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন। সেখানে পুণ্যের পরিমাপ অনুসারে সুখভোগ করেন। তার পর পুণ্যের ক্ষয় হয়ে গেলে তাঁরা আকাশে নিক্ষিপ্ত হন। তার পর বিচিত্র পথে তাঁরা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। পৃথিবীতে এসে তাঁরা অন্নে পরিণত হন, তার পর পুরুষে সংক্রামিত হন এবং শেষে নারীতে জন্মগ্রহণ করেন।[২] এই উক্তিগুলি নানাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম এখানে কর্মফলবাদ স্বীকার করা হচ্ছে, অর্থাৎ প্রেতের ভবিষ্যত ইহজীবনের কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় বলে একটি ধারণা গড়ে উঠছে। এখানেই বোধ হয় কর্মফলের অঙ্কুর রূপটি দেখা যায়। দ্বিতীয়ত আরও একটি জিনিসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুণ্যের পুরস্কারের ব্যবস্থা চন্দ্রলোকে হয়েছে এবং পুণ্যের সঞ্চয়ের ক্ষয় হলে জন্মের বন্ধন সুরু হচ্ছে, এই বচনটির মধ্যেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ সংসার-জীবন দুঃখের এই কথাটিই যেন এখানে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে কর্মফলের আকর্ষণে পরজন্মকে প্রত্যাহৃত করবার পথটিও সূচিত হয়েছে। তা হল সত্যানুসন্ধানের পথ। সে পথ অবলম্বন করলে স্থায়িভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। এই ইঙ্গিতদ্বারা পরিচালিত হয়েই কি পরবর্তীকালে হিন্দু ষড়দর্শন জ্ঞানমার্গে জন্মবন্ধন হতে মুক্তির পথ সন্ধান করেছিল ?

দেখা যাবে উপরের বচনগুলির মধ্যে কর্মফলবাদ ও পরজন্মবাদ সম্বন্ধে ধারণাটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে এসেছে, তবে এই যুগ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা এখনও পরিণত রূপটি পায় নি। সুতরাং এটিকে এই যুগ্মতত্ত্বের বিকাশের পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করতে পারি। এখানে পরজন্ম এবং ইহলোকে আচরিত কর্মের তার ওপর প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু আংশিকভাবে ; তবে কি ভাবে কর্মফল পরজন্মকে নিয়ন্ত্রিত করে তা ঠিক সূচিত হয় নি।

১ অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ঈশ ॥ ৩

২ বৃহদারণ্যক ॥ ৬ ॥ ২ ॥ ১৩-১৬ দ্রষ্টব্য

এর পরে আমরা কতকগুলি বচন পাই যাতে দেখা যায় এই যুগ্মতত্ত্ব আরও পরিণতি লাভ করেছে এবং প্রায় সম্পূর্ণ রূপটি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদের একটি উক্তি দিয়ে আমরা বিষয়টির অবতারণা করতে পারি। সেখানেও পরজন্ম স্বীকার করা হয়েছে এবং তার বন্ধন হতে মুক্তির উপায় কি তাও সূচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মানুষ বাসনাকে মনে মনে পূরণ করতে চায় সে নিজের বাসনা অনুসারে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু যার সব কামনা পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে তার কামনা সকল এইখানেই বিলয় প্রাপ্ত হয়।[১] এখানে একটু স্বতন্ত্র কথা বলা হয়েছে। এখানে পরজন্মের অবস্থা যে পূর্বজীবনের কর্মফল দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় সে কথার উল্লেখ নেই। যে কথাটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হল কামনার আকর্ষণ। তাই জন্মান্তরের বন্ধনে মানুষকে আকর্ষণ করে। কামনাই মনে হয় পরবর্তীকালে বুদ্ধের দর্শনে তৃষ্ণা বা তহ্‌না রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই সেখানে তৃষ্ণার মূলকে উৎপাটিত করাই নির্বাণের পথ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। এইভাবে দেখা যায় ভারতীয় দর্শনে পরবর্তীকালে যে সব তত্ত্ব বিকাশলাভ করেছে তারা অনেকেই উপনিষদের বচনে বীজ আকারে বর্তমান ছিল।

উপনিষদের এ বিষয় মূল চিন্তা ধারাটি কিন্তু পরজন্মের সঙ্গে কর্মফলকে কার্য কারণ সম্বন্ধে যুক্ত করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের কয়েকটি বচনে তা বেশ পরিস্ফুট হয়েছে মনে হয়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, মানুষ পুণ্যকর্মের দ্বারা পুণ্যজীবন লাভ করে এবং পাপকর্মের দ্বারা পাপময় জীবন লাভ করে।[২] এখানে কর্মফলের দ্বারা যে পরবর্তী জীবনের অবস্থা প্রভাবান্বিত হয় তা সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদে যে তত্ত্বটি প্রচারিত হয়েছে তাও কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বর্জন করেন নি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় তিনি সেটিকেও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যখন মানুষ মনের যা কিছু কামনা আছে তাদের ত্যাগ করে তখন মর্ত্য মানুষ অমৃত হয় এবং ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়।[৩]

১ কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে যত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥ মুণ্ডক। ৩। ২। ২

২ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি। বৃহদারণ্যক। ৩। ২। ১৩

৩ যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ইতি।
বৃহদারণ্যক। ৪। ৪। ৮

সুতরাং উপনিষদের বিভিন্ন বচনে যা পাই, তা হতে দেখা যায় যে পরজন্মবাদ সেখানে অঙ্কুর অবস্থা হতে ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু উপনিষদের শেষের যুগেও যুগ্মতত্ত্বরূপে তার পরিপূর্ণ রূপটি গড়ে ওঠে নি। যাজ্ঞবল্ক্যের শেষে উদ্ধৃত বচন দুটির মধ্যে যে সামান্য অনৈক্য দেখা যায় তা আমাদের এই প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করে। তবে এটুকু স্বীকার্য যে তার মূলনীতিটি এক রকম স্বীকৃত হয়েছে। ষড়দর্শনের যুগে যা ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ের বিষয় তা সেখানে নানা জল্পনার বিষয়। সেখানে এই যুগ্মতত্ত্বকে অঙ্কুরে পাই, না হয় অপরিণত অবস্থায় পাই। তবে বেদে ও উপনিষদে তার মূলত সমর্থন ছিল বলেই ভারতীয় দর্শনে তা এত সহজে এক দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হতে পেরেছিল।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যাবে যে ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তরবাদের সপক্ষে দুটি যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথম যুক্তি হল কামনা অপরিতৃপ্ত থাকলে তার পূরণের জন্য আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ মানুষের কাছে সংসার জীবনের প্রতি আকর্ষণ খুব তীব্র, কারণ এখানে নানা কামনার তৃপ্তির সুযোগ ঘটে। জীবনের প্রতি আকর্ষণ, ভোগের প্রতি আকর্ষণ পুনর্জন্মের বন্ধনে মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করে। এই চিন্তাটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। তার প্রভাব বৌদ্ধ দর্শনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। পাশ্চাত্য দর্শনে এর অনুরূপ মত পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় যুক্তিটি হল, মানুষ ইহজীবনে ভাল কাজ করে বা খারাপ কাজ করে; তার জন্য পুরস্কার দেওয়া বা শাস্তিবিধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার জন্যই মানুষের পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।' এটা একেবারেই নৈতিক যুক্তি। এর সমধর্মী তত্ত্ব ইয়োরোপীয় দর্শনে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্লেটো-র মন্তব্যের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর দর্শনে ইহজীবনে বিভিন্ন আচরণের জন্য বিভিন্ন মানুষের পরলোকে বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা পুরস্কার বা শাস্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মে যে শেষ বিচারের[১] তত্ত্বটি গৃহীত হয়েছে তারও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একই। শেষ বিচারে প্রতি প্রেতের বিচার হবে এবং পূর্বজীবনের আচরণের ভিত্তিতে কেউ স্বর্গে যাবার অধিকার পাবে কেউ নরকে নির্বাসিত হবে। এই সব তত্ত্ব একই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত।

১ **Last Judgment**

বিচার করলে দেখা যাবে যে পরলোকের অস্তিত্বের সপক্ষে যে দুটি যুক্তি প্রয়োগ হয়েছে উভয়েই দুর্বল। প্রথম যুক্তিটি ত মনে হয় আরও দুর্বল। বলা হয়েছে যে জীবনে কামনা অপূর্ণ থাকলে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এ যুক্তির মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ নেই। আমার একদিন একটি জনপ্রিয় ছায়াছবি দেখবার ইচ্ছা হল, কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতায় দেখা ঘটে উঠল না। আর একদিন তা দেখবার ইচ্ছা করে বৈ কি এবং এই ইচ্ছা প্রেক্ষাগৃহের কাছে আমাকে টানে বৈ কি। কিন্তু সেটা ঘটা নির্ভর করে অবস্থার অনুকূলতার উপর। ইচ্ছা থাকলে যে-ইচ্ছা পোষণ করে তার দিক হতে তা পূরণের চেষ্টা নিশ্চিত হয়, কিন্তু সকল অবস্থাতেই যে তা পূর্ণ হয় তা বলা যায় না। পরলোকে যাওয়া সম্ভব হলে হয়ত সে ইচ্ছা পূরণ হবে; কিন্তু ইচ্ছার অস্তিত্বই পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে না। তার জন্য চাই স্বতন্ত্র প্রমাণ।

দ্বিতীয় যুক্তিটি খানিকটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কারণ তা সামগ্রিক কল্যাণের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কর্মফল ভোগের ব্যবস্থা, অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি এবং ভাল আচরণের পুরস্কার ত ইহজীবনেই সম্ভব হতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে হয়ত মনে হবে যে একটি মানুষ অতি সৎস্বভাবের ছিল, কিন্তু সারাজীবন চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে গেল; এ ক্ষেত্রে পরলোক না থাকলে তার পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কিম্বা একটি মানুষ নানা অত্যাচার করে গেল, কিন্তু ইহজীবনে শাস্তি এড়িয়ে গেল। তার কি বিচার হবে না? ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে সত্যই এই রকম হতাশা বোধ জাগে। কিন্তু মানুষ ত একা থাকে না, সে সমাজের অঙ্গহিসাবে জীবন ধারণ করে। সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে মনে হয় পাপ-পুণ্যের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি এখানেই দেওয়া হয়ে যায়। যে মানুষ নীতি সম্মত জীবন যাপন করেও পুরস্কৃত হল না, তার সমাজ তার আচরণে সমগ্র ভাবে উপকৃত হল বৈকি; কারণ তার আচরণ কল্যাণের সমর্থন করল। অপর পক্ষে যে অন্যায় আচরণ করল, অথচ নিজে শাস্তি এড়িয়ে গেল, তার কর্মফল সমাজের ক্ষতি সাধন করল। তাই মনে হয় সামগ্রিকভাবে দেখলে বিচার ইহজীবনেই হয়ে যায়।

আরও একটি অবস্থা আমাদের এই প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কর্মফল একাধিক পুরুষকে ব্যাপ্ত করে ক্রিয়াশীল। পিতা

উদ্যোগী পুরুষ হলে তিনি যে সঞ্চয় বা প্রতিষ্ঠা রেখে যান তাঁর সন্তান নিজের অর্জিত না হলেও তার সুফল ভোগ করে। অনুরূপভাবে যে পিতা নিরুদ্যম ও আলস্যপরায়ণ তাঁর সন্তানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে দারিদ্র্য ভোগ করে। তা ইঙ্গিত করে যে কর্মফল ব্যক্তিবিশেষের জীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে কাজ করে না, আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে কাজ করে।

প্রেতাত্মার অস্তিত্বের সমর্থনে আরও এক শ্রেণীর প্রমাণ পাওয়া যায় যার উল্লেখ এখানে প্রসঙ্গত এসে পড়ে। তারা এই ধরণের :

১) মধ্যবর্তীর[১] সাহায্যে প্রেতাত্মা বার্তা প্রেরণ করে এই রকম প্রমাণ। প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী কতকগুলি মানুষ অন্ধকার ঘরে বসে প্রেতকে আহ্বান করে[২]। প্রেত এসে ইশারায় বা যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করছে তার সাহায্যে উপস্থিতি জানায় এবং প্রশ্ন করলে ইশারায় বা মধ্যবর্তীর মুখ দিয়ে উত্তর দেয়। এখানে একটা যে কিছু ঘটে সে কথা ঠিক। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার এই যে প্রেতাত্মাকে এখানে দেখা যায় না, অন্য জীবিত মানুষের মাধ্যমে তার বার্তা প্রেরিত হয়।

২) অনেক সময় সংবাদ প্রকাশ হয় যে একটি বিশেষ মানুষ বোধ করছে যে সে পূর্বজন্মে আর একটি বিশেষ মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তার ভিত্তিতে সে পূর্বজন্মের স্মৃতিকথা স্মরণ করতে পারছে এবং তার সমর্থনে কিছু অবস্থা ঘটিত প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। এই শ্রেণীর মানুষকে জাতিস্মর বলা হয়। এখানেও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ব্যক্তিবিশেষের উক্তির ওপর এই তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। দ্বিতীয়ত তার উক্তির সমর্থনে যে অবস্থা ঘটিত প্রমাণ পাওয়া যায় তাও কতখানি নির্ভরযোগ্য জানবার উপায় নেই। হয়ত সে যে ধরণের জায়গায় থাকত বলে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির বাসস্থানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য অভ্রান্তভাবে উভয় ব্যক্তির একত্ব স্থাপন করে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

৩) তৃতীয়ত ভৌতিক উপদ্রবের কথা[৩] উল্লেখ করা হয়। শব্দ করা, ঢিল ফেলা, চেয়ার-টেবিল ঠেলা ইত্যাদি ঘটে, কিন্তু তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এই রকম দাবী করা হয়। এ সব জায়গায় অনেক সময় স্থিরবুদ্ধিতে পর্যবেক্ষণ করলে বা অনুসন্ধান করলে ব্যাখ্যা হয়ত মিলতে পারে। কিন্তু প্রেত সম্বন্ধে মানুষের এমন একটা সংস্কার আছে যে তার অস্তিত্ব সহজেই বিশ্বাস

১ Medium ২ Seance ৩ Poltergeist

করা হয়। অনেক সময় আতঙ্ক হেতু স্থিরবুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ থাকে না। এই প্রসঙ্গে আমি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি: মফঃস্বলের এক সহরে চাকুরী জীবনে সরকারী আবাস হিসাবে বাস করবার জন্য একটি অতিপ্রাচীন বাড়ী পেয়েছিলাম। সেখানে যে ভূতের উপদ্রব হয় এই রকম একটি অখ্যাতি ছিল। রাত্রে অনেক সময় দেখা যেত তার চিমনি দিয়ে ছোট ইটের টুকরো গড়িয়ে এসে পড়ছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেল সেই চিমনির সুড়ঙ্গ বেয়ে ইঁদুর ওঠা নামা করে এবং তার ফলে অভ্যন্তরের দেয়াল হতে ভ্রষ্ট হয়ে টুকরো ইট ইত্যাদি পড়ে।

৪) তার পর সোজাসুজি ভূত দেখার ঘটনারও উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যিনি দেখেন তাঁর হয়ত এই ধরণের অনুভূতি সত্যই ঘটে থাকে। কিন্তু যেটুকু দেখেছেন, আর তার ভিত্তিতে যা দেখেছেন মনে করছেন, তার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকতে পারে। এখানে যা ঘটে তা অনেকটা অন্ধকারে দড়ি দেখে সাপ বলে ভ্রম হওয়ার মত। অর্থাৎ এখানে সালম্বন ভ্রম[১]ও ঘটতে পারে। এই ভাবেই সাধারণত মানুষ ভূত দেখে। অন্ধকারে একটি অস্পষ্ট ছায়াকেও ভূত মনে হতে পারে। এগুলি সাধারণত আতঙ্ক হেতু ঘটে। আবার কোন কারণ না থাকলেও মানুষ অনেক সময় ভূত দেখে থাকে। রজ্জু নেই অথচ সাপ দেখার মত। একে নিরালম্বন ভ্রম[২] বলা যায়। ইচ্ছা প্রণোদিত হয়েও মানুষের অলীক অনুভূতি ঘটে; যেমন গল্পে কথিত আকাশ কুসুম দেখার কাহিনী। মৃত প্রিয়জনকে দেখার তীব্র ইচ্ছা হতে তাকে দেখার পর্যন্ত অনুভূতি ঘটতে পারে। এই ব্যাপারগুলি এই ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হলেও আমাদের মুখ্য আলোচনার অঙ্গ নয়। তাই এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে ইংরেজ দার্শনিক জোড-এর এ বিষয় অভিমতটি উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। তাঁর এ বিষয় প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে এবং তাঁর মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।[৩]

তিনি এ বিষয় তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রথম তিনি বলেছেন প্রেতের আহ্বানের বৈঠকে যা ঘটে তার সমস্তটাই প্রবঞ্চনা বলে উড়িয়ে দেওয়া

১ Illusion ২ Hallucination

৩ এই প্রসঙ্গে Joad রচিত Guide to Modern Thought, Chap. VII দ্রষ্টব্য।

যায় না। দ্বিতীয়তঃ সেগুলি যে যারা বৈঠকে যোগ দেয় বা যে মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করে তাদের অবচেতন মনের কাজ বলে ব্যাখ্যা করা যায়, তাও নয়। তবে তিনি মনে করেন না যে এই ঘটনাগুলি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। উপসংহারে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে জাতিস্মর, ভৌতিক উপদ্রব এবং মধ্যবর্তীর সাহায্যে বার্তা প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি নিশ্চিতভাবে প্রেতের মরণোত্তর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা হয় তা ভিত্তিহীন। যেটুকু নির্ভরযোগ্য তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে। তবে তার পরেও কিছু ঘটনা থেকে যায় যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এখনও মেলে নি।[১]

আইনস্টাইন বলেন ঈশ্বরের ওপর মানুষের আচরণরীতি আরোপের মনোবৃত্তি[২] হতেই তাঁকে বিচারকরূপে কল্পনা করা হয়। মানুষের কাছে সমাজের কল্যাণ রক্ষা একটি মৌলিক প্রয়োজন হয়ে পড়ে; তাই রাষ্ট্রে অন্যায়কারীর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা। তা একান্তই সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যিনি বিশ্বশক্তি তাঁর কাছে এটি একটি মৌলিক প্রয়োজনের স্থান নাও অধিকার করতে পারে। নাট্যকার নানা চরিত্র সৃষ্টি করেন। তাদের কেহ ভাল, কেহ মন্দ। যে ভাল তার জন্য কোথাও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে, কোথাও থাকে না। অনুরূপভাবে যে মন্দ, কোথাও তার শাস্তি ঘটে, কোথাও ঘটে না। এই অবস্থায় কি আমরা বলব, একটি নূতন নাটক রচনা করে চরিত্রগুলির এই ভাগ্য বৈষম্য দূর করবার ব্যবস্থা হবে? আমরা বলব তার প্রয়োজন নেই, কারণ নাট্যরচনা একটি শিল্পকার্য, তা বিচারকার্য নয়। সুতরাং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি হতেই যে ঈশ্বরকে বিচারকরূপে কল্পনা করা হয়েছে, আইনস্টাইনের এই মন্তব্য সমর্থন করা যায়।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি মন্তব্য করেছেন যা বর্তমান আলোচনার সহায়তা করবে। মৃত্যুর পরে ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন না।[৩] তাঁর ধারণায় যাদের মন দুর্বল তারা হয় আতঙ্ক হেতু বা অহমিকা বোধ হেতু

১ "It is probable, I think, that different types of phenomena are caused in different ways, but, although, we may be able to guess with some measure of confidence at the mode of causation of some of them, others remain at present totally inexplicable.

২ Anthropomorphism.

৩ "Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbour such thoughts through fear or ridiculous egotism." The Great Quotations, compiled by George Seldes.

এই রকম বিশ্বাস করে। তাঁর মন্তব্যের প্রথম অংশটি একটু অস্পষ্ট। মনে হয় তিনি বলতে চেয়েছেন, যা অজ্ঞাত তার মধ্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবেশ করতে মানুষের ভয় হয় এবং নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য সে ভাবে যে পরলোক অনেকটা পরিচিত জীবনের মত। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও একটি জীবন থাকে মনে করে সান্ত্বনা পায়। কাউকে যখন জোর করে জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় সে এই ভেবে প্রবোধ পায় যে কেউ তাকে তুলে নেবার ব্যবস্থা করবে, ডুবে মরতে হবে না।

তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যটির অর্থ বোঝা সহজ, তাতে কোন অস্পষ্টতা নেই। মানুষ নিজেকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং সেই কারণে বিশ্বের অনুপাতে নিজেকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিয়ে থাকে। সেই কারণে সে ভাবে যে ব্যক্তি হিসাবে সে এমন মূল্যবান সম্পদ যে, যে শক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি তাকে জঞ্জালের স্তূপে ফেলে দেবেন না, মৃত্যুর পরেও নূতনভাবে তাকে ব্যবহার করবেন। মনে হয় তাঁর এই মন্তব্যটি খুবই সত্য। তার সুন্দর উদাহরণ মেলে দার্শনিক জেমস মার্টিনো-র পরলোকের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রযুক্ত যুক্তিগুলি হতে। তিনি যে সমস্ত যুক্তিগুলি ব্যবহার করেছেন তা এই অহমিকা বোধ প্রণোদিত।[১] তিনি মোটামুটি বলতে চেযেছেন যে মানুষ ইহজীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, বা ব্যক্তিবিশেষ যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, সেগুলি মূল্যবান সম্পদ। যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যদি সুবিবেচক হন, তা হলে তাদের নষ্ট করে দিতে পারেন না, পরবর্তী জীবনে তাদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যে শক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি ত মানুষের সীমিত, অহমিকা-বোধ প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না, নিজস্ব মতিগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন। দ্বিতীয়ত, যিনি অমিত শক্তি ধারণ করেন, যিনি মূল্য-হীনকে সোনায় পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁর অপব্যয় করবার ভয় থাকে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই বলা যায়:

মূল্য হীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর রয়েছে তাহার।
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।[২]

১ James Martineau, A Study of Religion, Vaticinations of intellect etc.

২ মহুয়া, বোধন

আসলে মনে হয় পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস মানুষের কামনা-প্রণোদিত চিন্তা[1] হতে উদ্ভূত হয়। আমি যা ভালবাসি তাই কামনা করি এবং সেই কারণে ভাবি বাস্তবে তা পাওয়া সম্ভব হবে। এই কামনা যত তীব্র হবে ততই বিরোধী প্রমাণ সত্ত্বেও তাকে সম্ভব বলে গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সাধারণত মানুষ জীবনকে অত্যন্ত ভালবাসে। অনেক সময় মানুষের যে বৈরাগ্যের উদয় হয় তা কোন মানসিক আঘাতে ঘটে থাকে, তা ব্যতিক্রম। যারা আত্মহত্যা করে তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটি সাময়িক উত্তেজনা বা হতাশা ভাব হতে তা করে। আত্মহত্যার চেষ্টা সফল না হলে অনেক সময় দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে না। সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষ জীবনকে ভালবাসে; তাই মৃত্যুর পর জীবন যে একেবারে শেষ হয়ে যায়, তা ভাবতে মন চায় না। এই মনোবৃত্তি হতে পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস একরকম সংস্কারে পরিণত হয়েছে। ইচ্ছাটি সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান বলে সে বিশ্বাস এমন সর্বজনীন রূপ ধারণ করেছে।

যা কামনা করি তাই যে নিশ্চিত ঘটে এমন বিশ্বাস করায় মনের একটি তৃপ্তি আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা প্রমাণ করে না যে তা সত্যই ঘটে। আমি যত দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি না যে পরজন্ম আছে, তা পরজন্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবে না। তা নির্ভর করে যে শক্তি মানুষকে টেনে আনে তার কি ইচ্ছা তার ওপর। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে লব্ধ একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রতি বছর বসন্তে গাছে নূতন পাতা গজায়। সে পাতা আবার শীতের শেষে ঝরে গিয়ে নূতন পাতার আগমনের পথ পরিষ্কার করে দেয়। এখন যে পাতাগুলি ঝরে গেল, তাদের মধ্যে যদি মানুষের মত ইচ্ছাশক্তি এবং চিন্তাশক্তি থাকত, তা হলে তারা ভাবতে পারত, আমরা চলে যাব কেন এবং কল্পনা করতে পারত যে তারা আবার কোথাও নূতন পাতা হয়ে জন্মাবে। কিন্তু যে শক্তি গাছের সৃষ্টি করে, তার পরিকল্পনায় পাতার ভূমিকা গৌণ, গাছের ভূমিকা মুখ্য। গাছকে বছরের পর বছর জীবিত রাখাই তার উদ্দেশ্য। পাতার ভূমিকা সূর্য কিরণ হতে গাছের জন্য পুষ্টি সংগ্রহ করা। বছর শেষে গাছ কিছু বড় হয়, যে অংশে পাতাগুলি ছিল তা আর গাছের মাথায় থাকে না, তা ডালে পরিণত হয়। তাই পুরাতন পাতা ঝরিয়ে গাছের

১ Wishful thinking

ডগায় নূতন পাতা গজাবার ব্যবস্থা। পুরাতন পাতাগুলি বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারে না।

মানুষের ক্ষেত্রেও অবস্থাটি অনুরূপ। ব্যক্তি মানুষের মনে তার ব্যক্তিগত মরণোত্তর অস্তিত্ব বিশেষ কামনার বস্তু, কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থায় মনে হয় তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নি। যে শক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর জীবকে পৃথিবীর কোলে স্থাপন করেছেন, তিনি প্রাণের প্রবাহকেই মুখ্য বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। তাঁর পরিকল্পনায় ব্যক্তি মানুষের ভূমিকা গৌণ। তাকে অবলম্বন করে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়; তার যখন কাজ ফুরিয়ে যায় জীর্ণ পাতার মত সে ঝরে যায়। বংশপরম্পরায় প্রাণের ধারা অক্ষুন্ন থাকে। এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে দুটি প্রবল প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই।

প্রথমত লক্ষ্য করা যেতে পারে যে প্রাণ-শক্তির বিকাশ রূপায়িত হয়েছে জড়পদার্থকে অবলম্বন করে। জড় পদার্থ হতে প্রাণীর দেহ গড়ে ওঠে। অবশ্য প্রাণশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তা আর তখন ঠিক জড়পদার্থের মত ক্রিয়া করে না। বিজ্ঞান তা স্বীকার করে। এবং তাই তাকে নূতন নাম দিয়ে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করবার জন্য বলে তা হল জৈব পদার্থ[১] এবং তার ক্রিয়া সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান চর্চা করে তাকে বলা হয় জৈব রসায়ন[২]। এই দেহের সঙ্গে মানসিক ক্রিয়া এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে একটি হতে অন্যটিকে পৃথক ভাবে কল্পনা করা যায় না। মানুষের দৈহিক দিক মানসিক দিক হতে যে পৃথক প্রকৃতির, তা সর্বথা স্বীকার্য। তবে তাদের সংযোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে প্রতিক্ষণ তারা সংযুক্তভাবে ক্রিয়া করে। পৃথকভাবে তাদের ক্রিয়া নেই। রথের আরোহীর সঙ্গে রথের সম্পর্ক বাহিরের এবং ক্ষণিকের; তাই তাদের পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব। রথের সঙ্গে আরোহী যদি এমনভাবে মিশে যেত যে তার পৃথক প্রকাশ থাকত না, সমগ্র রথকে জুড়েই তা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করত তা হলে তাদের এই পৃথক অবস্থান সম্ভব হত না। মানুষের ক্ষেত্রে তাই দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনের বা আত্মার পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। এখানে ত এমন নয় যে দেহ ও মন নিজেদের পার্থক্য অক্ষুন্ন রেখে একত্রিত হয়েছে, এরা সংযুক্তভাবে দেহ ও মন, এরা দেহ ও মন নয়, দেহ-মন। এরা এমন ভাবে জড়িত যে এদের পৃথক প্রকাশ নেই। সে ক্ষেত্রে দেহ যখন জরা বা রোগ জীর্ণ হয়ে বা

১ Organic matter.

২ Organic Chemistry

আকস্মিক আঘাতে জৈব পদার্থের মত কর্ম করতে অক্ষম হয়, তখন যা পড়ে থাকে তা শুধু জড় পদার্থ—এই রকম অনুমান করাই সঙ্গত।

দ্বিতীয়ত, যে শক্তি মানুষকে বা অন্য জীবকে পৃথিবীর বক্ষে স্থাপন করেছেন তিনি ব্যক্তি মানুষকে মুখ্য ভূমিকা দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর মুখ্য লক্ষ্যের বিষয় হল প্রাণের ধারা; তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, তাকে অব্যাহত রাখাই এখানে লক্ষ্য। ব্যক্তি আসে সেই ধারাকে কিছু কালের জন্য ধারণ করতে, তার পর যখন তার ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়, তখন সে সরে দাঁড়ায়, নূতন সতেজ ব্যক্তিকে তার স্থান গ্রহণ করবার পথ করে দিতে। মানুষের বা জীবের যে সন্তান হয় তা সম্ভবত এই কারণেই। সন্তানই পিতা-মাতার স্থান গ্রহণ করবার জন্য জন্মগ্রহণ করে। পূর্ণ প্রাণশক্তি সমন্বিত হয়ে নূতন দলের, বংশ ধারার বাহক হবার প্রয়োজন আছে বলেই পুরাতন দলকে সরে যেতে হয়। নূতনের জন্ম আছে বলেই পুরাতনের মৃত্যুর প্রয়োজন আছে। বংশ পরম্পরায় মানুষের প্রাণপ্রবাহ বাহিত হবার এই যে ব্যবস্থা তার সঙ্গে যাকে বলা হয় 'রিলে রেস'[১] তার সহিত বেশ তুলনা চলে। এখানে একটি প্রতীক বহন করবার জন্য একই দলের পক্ষে একাধিক খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। প্রত্যেকের কাজ হল গন্তব্য স্থানের দিকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে পরবর্তী খেলোয়াড়ের হাতে সেটি এগিয়ে দেবার ভার দেওয়া। মনে হয় জীবনের ধারা যেন নদীর প্রবাহের মত সংরক্ষিত হয় না, তা সংরক্ষিত হয় অলিম্পিকের মশাল যে ভাবে দেশ হতে দেশান্তরে নীত হয় সেই ভাবে। বহু বিশেষ মানুষ কিছুকালের জন্য প্রাণের মশাল বহন করবার ভার পায়, তার পর শ্রান্ত হলে মশাল বাহক যেমন সরে দাঁড়ায়, জরাগ্রস্ত হলে সে তেমন সরে দাঁড়ায় এবং পরবর্তী পুরুষের নবীন সন্তানরা সেই মশাল বহন করবার ভার পায়।

সুতরাং দেহ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ও আত্মা বর্তমান থাকে এই যুক্তি জড়বাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না। আসলে কিন্তু জড়বাদের দৌর্বল্য জড়বাদের মধ্যেই নিহিত আছে। তা চেতন পদার্থের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না। জড়পদার্থের সাহায্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে যাকে আমরা চেতন পদার্থ বলি তাকে ব্যাখ্যা করে। তা মানসিক ক্রিয়াকে জড়পদার্থের যান্ত্রিক ক্রিয়ার একটি আনুষঙ্গিক উপদৃশ্য[২] বলে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু স্পষ্টতই তা একদেশদর্শি-দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত।

১ Relay race ২ Epiphenomenon

মানুষের মধ্যে যে জড় ও চেতনের একত্র সহাবস্থিতি এবং সহযোগিতা ঘটেছে তা অনস্বীকার্য। মনোবিজ্ঞান সে কথা স্বীকার করে। আপাত দৃষ্টিতে আমরা অনুভব করি যে এই সহযোগিতা এমন ঘনিষ্ঠ যে মন দেহকে প্রভাবান্বিত করে আবার দেহ মনকে প্রভাবান্বিত করে। আমার ইচ্ছা হল মাঠে বেড়িয়ে আসবার, আমার মন থেকে আদেশ চলে গেল মস্তিষ্কের জীবকোষে, তা স্নায়ু যোগে পরিবাহিত হল আমার পায়ে, তখন আমার পা চলতে লাগল। এই ত আমরা অনুভব করি। অপর পক্ষে দেখা যায় শরীর দুর্বল হযে পডলে মনও নিস্তেজ হয়ে যায়। সহযোগিতার অর্থই ত হল পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করা।

কিন্তু বিজ্ঞান তা স্বীকার করতে পারে না, কারণ তা যে নিয়মে বিশ্বাসী তার দ্বারা এই পরস্পরকে প্রভাব করার সম্ভাবনা থাকতে পারে না। এই তত্ত্বকে গ্রহণ করবার অন্তরায় দুটি। প্রথমত বিজ্ঞান বলে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ কেবল অভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যেই বর্তমান থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কার্য ও কারণ উভয়কেই জডধর্মী হতে হবে। দ্বিতীয়ত দেখা যায় যে কার্য কারণ সম্বন্ধে রূপের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু শক্তির সাম্য সংরক্ষিত হয়।[১] যেমন বাতি পুড়লে তার পরিবর্তে কারবন ও অকসিজেনের রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত গ্যাস ও কিছু বারিকণা পাওয়া যাবে। তাদের উভয়ের যোগফল একই দাঁড়াবে। যা বাতি আকারে একত্র ছিল তা রূপান্তরিত হয়ে ছডিয়ে পডবে কাজেই জডকারণের ফল জডকার্যের রূপই গ্রহণ করবে।

সুতরাং এই নিয়মকে অক্ষুণ্ণ রেখে জড়বিজ্ঞান চেতন পদার্থের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়। মনোবিজ্ঞান কিন্তু অতটা পারে না। তা মন ও দেহের পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে সমান্তরালবাদ স্থাপন করে[২]। তা বলে মন আলাদা ক্রিয়া করে এবং দেহ আলাদা ক্রিয়া করে, তবে আমরা তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি, তার কারণ উভয়ে একভাবে অথচ পৃথক ভাবে পরিচালিত হয় বলে। যেমন দুটি ঘডি একই সময় দেয় বা দ্বৈত সঙ্গীতে একই সঙ্গে একই সঙ্গীত দুজনে গাইতে পারে। এই তত্ত্ব অনুসারে আমি যখন বেডাতে যাই তখন আমার ইচ্ছা পদ সঞ্চালনের কারণ নয়, তার কারণ হল মস্তিষ্কের মধ্যে জীবকোষের স্পন্দন।

১ Conservation of Energy

২ Psycho physical Parallelism

সমান্তরালবাদ সুতরাং স্পষ্টই স্বীকার করে যে দৈহিক পর্যায়ে যে ক্রিয়া চলে তা জড়শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তার অতিরিক্তভাবে একটি মানসিক ক্রিয়াও চলে। সুতরাং অবস্থা যা দাঁড়ায় তা হল এই যে জড়শক্তির সাহায্যে মানসিক কার্যের দেহের দিকের ক্রিয়ারই ব্যাখ্যা হয়; তার অতিরিক্ত যে মানসিক ক্রিয়া ঘটে তাকে ব্যাখ্যা করতে তা পারে না।

এই অবস্থায় মানসিক ক্রিয়াকে জড়শক্তির প্রকাশ বলে দাবী করবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। অপরপক্ষে পারস্পরিক ক্রিয়া করা যে একেবারেই অসম্ভব এমন বদ্ধমূল ধারণার কাছে নতি স্বীকার করবার ও প্রয়োজন দেখা যায় না। কার্য ও কারণের মধ্যে শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় এটি ধরে নিলেও মানসিক ক্রিয়ার পৃথক অস্তিত্বের সম্ভাবনা অপ্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, অন্ধ সংস্কারের মত এমন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকবার প্রয়োজন নেই যে জড় ও চেতন পদার্থের প্রকৃতি এমন চূড়ান্তভাবে ভিন্ন যে তারা পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করতে পারে না। বরং এমনও হতে পারে যে তাদের যতটা ভিন্ন প্রকৃতির মনে হয় ততটা নয়। কার্য-কারণ সম্বন্ধ যে তাদের ওপর আরোপ করা যায় না, তা শুধু এইটুকু প্রমাণ করে যে তারা ভিন্ন নিয়ম মেনে চলে। জড় পদার্থ যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ মেনে চলে তার ভিত্তি জড়শক্তি। এমনও হতে পারে যে চেতন পদার্থ যে কার্য-কারণ রীতি মেনে চলে তা ভিন্ন প্রকৃতির, তাই জড় পদার্থের পর্যায়ে প্রযোজ্য কার্য-কারণ রীতির দ্বারা তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তার অর্থ এই নয় যে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া একেবারেই ঘটে না। সুতরাং জড়বাদের জড়ের ভিত্তিতে মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরা যায় না।

জড়বাদের দাবী আর একভাবেও স্থাপিত হয়েছে। বিষয়টির অভিনবত্ব আমাদের তার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং সেই কারণে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই নূতন তত্ত্বটি নব বস্তুবাদ নামে পরিচিত।[১] যাঁরা এই তত্ত্বটি স্থাপন করেছেন তাঁদের মতের মধ্যে যে সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক মিল আছে তাও নয়। যাই হোক সে বিষয় আমাদের সবিস্তার

১ **New Realism**

এই প্রসঙ্গে **The New Realism 1912, Co-operative Studies in Philosophy by Holt Marvin, Montagu, Perry, Pitkin and Spalding** দ্রষ্টব্য।

আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। যেটুকু বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সে বিষয় তাঁদের মোটামুটি মতের ঐক্য আছে। আমাদের আলোচনা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

জড় বা চেতনের সর্বাত্মক স্বীকৃতির প্রতিযোগিতায় যে দুটি বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে সে বিষয় আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। জড়বাদ যেমন দাবী করে কেবল জড় পদার্থের সাহায্যে মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্ভব, তেমন চৈতন্যবাদ দাবী করে কেবল চেতন পদার্থের সাহায্যে জড় পদার্থের ব্যাখ্যা করা যায়। এক ধরণের চৈতন্যবাদ আছে যা মনের বাহিরে কোন বস্তুর, বিশেষ করে জড়বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তা বলে এই বস্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে মনেরই ধারণা।[১] তা বস্তুর মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলে, তাকে জ্ঞাতা-ভিত্তিক চৈতন্যবাদ[২] বলা হয়। নববস্তুবাদ যেন জড়বাদের দিক হতে ঠিক তার প্রত্যুত্তর, তা ঠিক তার বিপরীত একটি তত্ত্ব স্থাপন করেছে। তা বিষয়টির জ্ঞানতত্ত্বের দিক হতে প্রধানত আলোচনা করেছে।

এই নববস্তুবাদ বলে জ্ঞান ক্রিয়াটি জড় পদার্থ হতে বা জ্ঞেয়বস্তু হতে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়, তা জড়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নানা তথ্যের মধ্যে অন্যতম তথ্য। জ্ঞান মানসিক সত্তার ক্রিয়া নয়, তা জড়েরই অঙ্গীভূত ঘটনা। সে ক্রিয়া বস্তুর মধ্যেই ঘটে এবং তার ফলে বস্তুর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে না। চেতনার মধ্যে যে জ্ঞান আহৃত হয়, তা মানসিক নয়, তা বস্তু হতে অভিন্ন। জ্ঞান বলে মন যাকে অনুভব করে তা মূলত জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু। এই গোষ্ঠীর দার্শনিকদের ধারণায় দেহধারী জীবের কাজ হল মনের বাহিরে যে বস্তু আছে তাকে প্রকাশ করা। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাই না, অনুসন্ধানী আলো[৩] নিক্ষেপ করলে তার কিছু অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ে। জীবের মন সেই অনুসন্ধানী আলোর মত কাজ করে এবং বস্তু ও তার অঙ্গীভূত জ্ঞানকে প্রকাশ করে বলে আমাদের জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। এই হল নববস্তুবাদের জ্ঞান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা। মোটামুটি তা বলতে চায় বস্তুবিষয়ক জ্ঞান মনের জিনিষ নয়, তা বস্তুরই অঙ্গ। অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভিত্তিক চৈতন্যবাদের তা ঠিক বিপরীত।

স্পষ্টতই বোঝা যায় নববস্তুবাদের এই ব্যাখ্যা একদেশদর্শী মনোভাব সম্ভূত এবং সেই কারণেই অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য। তা দীর্ঘ সমালোচনার যোগ্যতা

১ Idea ২ Subjective Idealism ৩ Search light

রাখে না। সংক্ষেপে এই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে অনুসন্ধানী আলোর মত মন যে কাজ করে তারও একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। এই অনুসন্ধান ও আবিষ্কার কার জন্য? জ্ঞেয় বস্তুর জন্য ত নয়, যে মন জানতে চায় তার জন্য। কাজেই একটি জ্ঞাতৃরূপী মনের অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হয়ে পড়ে। যেখানে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সত্তার সহাবস্থিতি ঘটে সেখানে একটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, অন্যটির ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে গেলেই এই রকম অসঙ্গতি এসে পড়ে।

(৩)

চৈতন্যবাদী দর্শন

চেতনার ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাখ্যা

চৈতন্যবাদী দর্শনগুলির দৃষ্টিভঙ্গী জড়বাদী দর্শনগুলির ঠিক বিপরীত। জড়বাদী দর্শন যেমন চেতন পদার্থের চৈতন্য ধর্ম স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, তাকে জড়েরই রূপান্তর বা অঙ্গ বলে প্রচার করে, চৈতন্যবাদী দর্শন তেমন মনের বাহিরে বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। মনের বাহিরে যা কিছু বস্তু আছে তার জড় প্রকৃতি স্বীকার করে না। চৈতন্য-বাদী দর্শন তিনভাবে এ বিষয় নিজের মতটিকে গড়ে তোলে। এই সম্পর্কে এই অধ্যায়ের আরম্ভে কিছু বলা হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনাকে সহজ-বোধ্য করবার জন্য এ বিষয় সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, জড়বস্তুর অস্তিত্ব তা একেবারেই অস্বীকার করতে চাইবে, বলবে তা প্রকৃত সত্তা নয়, তা মৌলিক সত্তার মর্যাদা দাবী করতে পারে না, তা ছায়ার মত বস্তু বা ভ্রান্ত দৃষ্টি প্রসূত প্রপঞ্চ। দ্বিতীয় পথে মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, কিন্তু তাকে মনের ধারণায়[১] পরিণত করা হয় এই যুক্তিতে যে মনের ধারণারূপেই আমাদের তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তৃতীয় পথে মন-নিরপেক্ষ ভাবে বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রকৃতি চৈতন্যময় বলে দাবী করা হয়, তার জড়ত্ব অস্বীকার করা হয়। এর দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক জড়বাদের ঠিক বিপরীত।

আমরা প্রথমে আলোচনা করব সেই শ্রেণীর চৈতন্যবাদী দর্শনের যা মনের

১ Idea

বাহিরে অবস্থিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, অথবা তাকে মৌলিক সত্তার মর্যাদা দিতে চায় না। এই শ্রেণীতে কতকগুলি খ্যাতিমান দার্শনিকের মত এসে পড়ে। তাঁরা হলেন প্লেটো, বুদ্ধ এবং শংকরাচার্য। এঁদের তিন জনকেই বিশ্বের দার্শনিকদের শীর্ষস্থানে স্থাপন করা যায়। সুতরাং বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিপাদ্য আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে পড়ে।

প্লেটো-র দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঠিক পূর্বের অধ্যায়ে করা হয়েছে। কাজেই তার এখানে পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন হবে না। শুধু তাঁর দর্শনের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে তাৎপর্যটুকু বিশ্লেষণ করলেই চলবে। তাঁর দর্শন সামান্যবাদ নামে প্রচলিত। তার প্রতিপাদ্য হল বহু ও নানা দিয়ে গঠিত চঞ্চল বিনাশশীল যে বিশ্বকে দেখি তা প্রকৃত সত্তা নয় তার অনুকরণ, অতএব মূল বস্তুর ছায়ার সঙ্গে তুলনীয়। মৌলিক সত্তা স্বতন্ত্র, তা স্থান কালের অতীত ভাবে নিত্য বর্তমান, তা পরিবর্তনশীল নয়, তা ধ্রুব। তা গঠিত নানা সার্বিক সংজ্ঞার পারস্পরিক সুসমঞ্জস মিলনে। কাজেই তার প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপ, তা মনের মত বস্তু। সুতরাং প্লেটোর প্রতিপাদ্য হল মৌলিক সত্তার প্রকৃতি জ্ঞানরূপ, তা চৈতন্যময়। আর আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে জগতের পরিচয় এনে দেয়, তা সার্বিক সংজ্ঞার অনুকরণে রচিত, সুতরাং মূলসত্তার ছায়ার সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং তাঁর প্রতিপাদ্য হল মৌলিক সত্তা জড় প্রকৃতির নয়, চেতন প্রকৃতির।

এখানে দেখা যায়, প্লেটো সার্বিক সংজ্ঞার জগতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত হতে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন এই ধারণা হতে, যে সার্বিক সংজ্ঞা দিয়ে গঠিত একটি বিভিন্ন জগত আছে। স্বভাবতই প্রশ্ন এসে পড়ে এমন একটি বিশেষ জগত সত্যই আছে কি? সুতরাং তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়ে সার্বিক সংজ্ঞার প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নটি। তার কি বিশেষ হতে স্বতন্ত্রভাবে কোন পৃথক সত্তা আছে? এই প্রশ্নটি পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাচীনকাল হতেই বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। তা সত্বেও তার এখনও সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নি। প্রশ্নটি এমন মৌলিক যে পরবর্তী অধ্যায়ে তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এখানে এইটুকু বললেই চলবে যে বিষয়টি বিতর্কের বিষয় এবং সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না আসতে পারলে প্লেটো-র প্রতিপাদ্য গ্রহণ করা যায় না। এমন কি তাঁর সমসাময়িক গ্রীক দার্শনিকগণ ও তাঁর মত গ্রহণ করতে পারেন নি

এবার আমরা বুদ্ধের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু এই আলোচনার প্রধান অন্তরায় হল তিনি নিজস্ব কোন দর্শনের গ্রন্থ লিখে যান নি। তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন বা শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করেছেন, লিখিত আকারে কিছু রেখে যান নি। তবে তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর শিষ্যপরম্পরা তাঁর বচনগুলি ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। তাই আমাদের অবলম্বন। এর মধ্যে বেশী নির্ভরযোগ্য সেই গ্রন্থগুলি যা তাঁর মৃত্যুর অনতিদীর্ঘকাল পরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এগুলি ত্রিপিটক নামে অভিহিত। তার তিনটি শাখা: বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি বা পাত্র। তা পালি ভাষায় রচিত। তিনটি ভাগে বিভক্ত বলে ত্রিপিটক নাম। প্রথম ভাগের নামে বিনয় পিটক। তার আলোচনার বিষয় সংঘের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণ-রীতি। তারপর পাই সূত্র পিটক। তাতে ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা আছে। তা পাঁচটি ভাগ বা নিকায়ে বিভক্ত। বিখ্যাত ধর্মপদ গ্রন্থ তাদের অন্তর্ভুক্ত। সূত্র পিটকের অংশ নিয়েই পরবর্তী কালে অভিধর্ম পিটক গড়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম অবস্থায় সংকলিত ভগবান বুদ্ধের বচনের মধ্যে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক তত্ত্বটির পূর্ণরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

তার সম্ভবত একটা কারণ ছিল: তিনি জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জীবনের যন্ত্রণা হতে সাধারণ মানুষকে পরিত্রাণ করবার ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাই সাধারণের বোধগম্য পালি ভাষায় তিনি কথা বলতেন। সেই জন্য তাঁর প্রচারিত ধর্ম বা মার্গের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব তাঁর উপদেশের মধ্যে তিনি স্থাপন করতে চাইতেন না। তাই মনে হয় ত্রিপিটকে সংরক্ষিত তাঁর বচনগুলির মধ্যে তাঁর দর্শনের আভাসে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট রূপটি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের পর সূত্রের অনুসরণে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। অবশ্য সেগুলি সংস্কৃতে রচিত। তাদের মধ্যে দুটির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা হল সুরঙ্গম সূত্র এবং লঙ্কাবতার সূত্র। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও উভয়ক্ষেত্রেই ত্রিপিটকে কথোপকথনের ছলে যে আলোচনারীতি প্রবর্তিত আছে তাও এখানে অনুসৃত হয়েছে। এখানে কথোপকথনের মধ্যে বুদ্ধের মনীষায় ভাস্বর, ব্যক্তিত্বমণ্ডিত মূর্তিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। অবশ্য ত্রিপিটকের মত তারা প্রাচীন নয়, তবু এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে

প্রচলিত প্রবাদ বাক্য দ্বারা তা প্রভাবান্বিত। ত্রিপিটকের সঙ্গে তাদের গুণগত পার্থক্য কেবল পরবর্তীকালে রচিত বলেই ঘটেছে। পরে রচিত বলে তারা কম নির্ভরযোগ্য, তবে একেবারে বর্জন করবার কোন সংগত কারণ নেই। যখন মূল ত্রিপিটকে লব্ধ তথ্য সন্তোষজনক নয়, তখন তাদের অতিরিক্তভাবে পরিপূরক তথ্যের ওপর নির্ভর করা দোষণীয় হবে না। আমরা এই বিবেচনায় বুদ্ধের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কিত দার্শনিক মতটি এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থ হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

আমাদের আলোচনা বুদ্ধ প্রবর্তিত প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্ব[১] নিয়ে আরম্ভ করতে পারি। তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে, মানুষ কি ভাবে জীবনের জালে জড়িয়ে পড়ে নির্যাতন ভোগ করে এবং কিভাবে তা হতে নির্বাণের পথে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। প্রতীত্যসমুৎপাদের ধাতুগত অর্থ হল একটির উপর নির্ভর করে আর একটির উৎপত্তি। পালি শাস্ত্রে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই হলে এই হয়, এর উৎপত্তি হতে এর উৎপত্তি।[২] সুতরাং নাম হতে বোঝা যায় কার্যকারণ সম্বন্ধে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা এখানে সূচিত হয়েছে। এই সম্বন্ধের দীর্ঘ তালিকার সমগ্রটির সঙ্গে বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের পরিচিত হবার প্রয়োজন নেই। কেবল যে অংশটি মানুষকে জীবনের বন্ধনে জড়িয়ে দুঃখে আচ্ছন্ন করে তার মধ্যেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে।

মহাবগ্‌গে বলা। হয়েছেঃ ভগবান তথাগত রাত্রির প্রথম প্রহরে কারণ মালার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জানলেন : অবিদ্যা হতে সংস্কার আসে, সংস্কার হতে অজ্ঞান, অজ্ঞান হতে নামরূপ, নামরূপ হতে ষড়ায়তন (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্পর্শ এবং মন এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হতে আসে স্পর্শ, স্পর্শ হতে বেদনা (ইন্দ্রিয়ানুভূতি), বেদনা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতে উপাদান (আকর্ষণ), উপাদান হতে ভব, ভব হতে জন্ম এবং জন্ম হতে জরা, মরণ, শোক, আক্ষেপ, দুঃখ ভোগ, অবসাদ ও নৈরাশ্য[৩]। এই হল কার্য কারণ মালার বারোটি অঙ্গ। এই তালিকায় সংক্ষেপে বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের চুম্বকে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই জন্য একে বৌদ্ধ ধর্মের চাবিকাঠি বলা

১ পটিচ্চসমুপ্পাদ

২ ইমস্মিং সতি ইদং হোতি। ইমস্সুপ্পাদা ইদম্ উপপজ্জতি।

৩ মহাবগ্‌গ ॥১।১।১

হয়েছে। স্বয়ং বুদ্ধই বলেছেন যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন তিনি ধর্মকে দেখেন[১]।

আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে উপরের তালিকায় প্রথম তিনটি কারণের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। প্রথম কারণ হল অবিদ্যা, দ্বিতীয় সংস্কার এবং তৃতীয় অজ্ঞান। অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলতে কি বোঝায় তা আমরা একরকম জানি। তবে সংস্কার বলতে তিনি কি বুঝেছেন তা জানা দরকার। সংস্কার বলতে সম্ভবত তিনি বুঝেছেন সেই প্রবল আকুতি যা মানুষকে জন্মগ্রহণে আকৃষ্ট করে। সম্ভবত শোপেনহাউয়ের যাকে 'জীবিত থাকবার আকৃতি'[২] বলেছেন এ তার অনুরূপ। সংস্কার অর্থে সাধারণভাবে বুঝতে হবে একটি আকৃতি। তার বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হতে পারে, সম্যক জ্ঞানের পর তা হয়ত নির্বাণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তবে এখানে তার অর্থ স্পষ্টতই জন্মলাভের প্রবল আকুতি বোঝায়। তার সমর্থনে এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের নিজের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন :

এমন হতে পারে যে একজন শ্রমণ এই ভাবে মনে মনে চিন্তা করছেন : আমার দেহ মৃত্যুদ্বারা আচ্ছন্ন হলে আমি এক পরাক্রান্ত রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারি। এই ভাবনা সে চিন্তা করে, এই ভাবনায় বাস করে এবং এই ভাবনা পোষণ করতে থাকে। এই সংস্কারগুলি এবং এই মানসিক অবস্থাগুলি যা সে পোষণ করে এবং যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে, এই ধরণের অবস্থাই তার পরজন্ম সংঘটিত করে।[৩]

সুতরাং বোঝা যায় যে সংস্কার অর্থে তিনি বুঝেছেন মনে পোষণ করা প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তা তাঁর তৃষ্ণা-তত্ত্বের সমস্থানীয়।

কাজেই অবিদ্যা হেতুই মানবরূপী জীবের সংসারে প্রবেশ ঘটে কারণ তা জীবনের প্রতি তাকে সংস্কারের বেশে আকৃষ্ট করে। তারপর যে বিশ্বে সে প্রবেশ করে তা অজ্ঞান দিয়ে গড়া, অজ্ঞানই তার উপাদান। তা যেন মায়া-অঞ্জন। এই মায়া-অঞ্জনের গুণেই জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের

১ যো পটিচ্চ সমুপ্পন্নং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি যো ধম্মং পস্সতি সো পটিচ্চ সমুপ্পন্নং পস্সতি। মজ্‌ঝিম নিকায়, সুত্তপিটক

২ Will to live

৩ মজ্‌ঝিম নিকায়

উৎপত্তি ঘটে। সেটা ঘটে কি ভাবে তাও প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে। অজ্ঞান হেতুই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে একটি দ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দ্বৈতভাবের একদিক হল 'নামরূপ'। অর্থাৎ সকল জ্ঞেয় পদার্থকেই তা সূচিত করে। ইঙ্গিতে যেন বলা হয়েছে তার বাস্তব সত্তা নেই, কেবল রূপ ও নামের সংযোগে তা গড়ে উঠেছে। পঞ্চম তত্ত্ব হিসাবে যাকে ষড়ায়তন বলা হয়েছে তাই হল জ্ঞাতা, কারণ তার মধ্যে স্থান পেয়েছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। তাদের সংযোগে বা স্পর্শে ইন্দ্রিয়ানুভূতি[1] বা বেদনার উৎপত্তি। এই ভাবেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভোক্তৃ ভোগ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার ফলেই জীবনের প্রতি তৃষ্ণা সঞ্জাত হয়। এই তৃষ্ণাই আমাদের 'ভব' বা জন্ম পরম্পরার বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে জরা, মরণ, শোক, হতাশা প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এই হল সংক্ষেপে ভগবান বুদ্ধ স্থাপিত দর্শনের মূল কথা। তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল একটি ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে জীবন দুঃখময়, অথচ মানুষের জন্মপরম্পরার বন্ধন তাকে অনন্তকালের জন্য দুঃখভোগে বাধ্য করে। তা হতে মুক্তির পথ তিনি খুঁজেছিলেন। সেই পথ হল নির্বাণ এবং তা লাভ করতে তিনি যে ব্যবস্থার উপদেশ দিয়েছিলেন তাই হল আট অষ্টাঙ্গিক মার্গ। কিন্তু সে ব্যবস্থার আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন হল বিশ্বের প্রকৃতি কিরূপ, তা চৈতন্য-ধর্মী, না জড়ধর্মী। সেই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই আমরা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের আলোচনা করব।

মনে হয় ওপরের আলোচনা হতে এই বিষয়ের ওপর তাঁর ধারণা কি ছিল, সে বিষয় কিছু আলোকপাত হয়। প্রথমত দেখা যাবে যে জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ, যাকে তিনি তৃষ্ণা বলেছেন, তা উৎপাদন হয় ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধের ভিত্তিতে। একদিকে জ্ঞাতারূপী ইন্দ্রিয় সমন্বিত মন, অপর দিকে বহির্জগত। তাদের সংস্পর্শেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং তার আকর্ষণই জীবনের প্রতি মানুষকে টানে। অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতেই ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সম্বন্ধটাই অজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ তার ভিত্তি নির্ভরযোগ্য নয়, তাকে অবলম্বন করে যা গড়ে উঠেছে তা অস্থায়ী এবং

১ Sensation

আলম্বন ভ্রমের[১] মত অসার পদার্থ। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্পর্কে যে জগত গড়ে উঠেছে তা যে প্রতিভানের মত জিনিষ তার ইঙ্গিত কিছু পাওয়া যায় বহির্জগতকে নাম-রূপ বলে চিহ্নিত করা হতে। তার ভিত্তি যে হেতু অজ্ঞান, তার মৌলিক সত্তা বলে কিছু নেই। ভ্রান্ত দৃষ্টির প্রভাবে আমরা যেমন মরীচিকা দেখি, অজ্ঞানের প্রভাবে তেমন আমরা একটি অলীক জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্পর্কে গঠিত বিশ্ব দেখি। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বহুধারা খণ্ডিত যে বিশ্বের পরিচয় দেয় তা যে মৌলিক সত্তা নয়, তা যে প্রতিভানের মত বস্তু, এ বিষয় বুদ্ধের বহু উক্তি পাওয়া যায় এবং এ বিষয় কোন মতদ্বৈধ নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘতর করবার প্রয়োজন নেই।

তারপর প্রশ্ন ওঠে আমরা যে বিশ্বের সহিত আমাদের ব্যক্তিমনের সাহায্যে পরিচিত হই তার যদি মৌলিক সত্তা না থাকে, তা হলে তার অতিরিক্ত কি কোন মৌলিক সত্তা আছে? মনে হয় বুদ্ধের ধারণা ছিল এমন একটি সত্তা আছে। সে সত্তা স্থান-কালের অতীত, তা জন্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, তা খণ্ডিত হয় না। তা যদি না হবে তা হলে যা জন্মায়, যা ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তা জন্মপরম্পরার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে কোথায় যাবে? আমরা এই ধরণের একটি উক্তি 'উদানে' পাই। উদানের সূত্রগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রের অঙ্গীভূত, তা সুত্তপিটকের অঙ্গ। সুতরাং তুলনায় বেশী নির্ভরযোগ্য। এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটির অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।

"হে আমার অনুগামিগণ, এমন একটা কিছু আছে যা জন্মায় না, নির্মিত হয় না, বা সৃষ্ট হয় না, বা বিভক্ত হয় না। এমন একটি জন্মবন্ধন-মুক্ত সত্তা যদি না থাকত…তা হলে যা জন্মগ্রহণ করে তার নিষ্ক্রমণের পথ থাকত না।"[২]

এখন প্রশ্ন হল এই যে জন্মবন্ধন হতে মুক্ত একটি মৌলিক সত্তার অস্তিত্বের ইঙ্গিত উপরের মন্তব্য হতে পাই, তার প্রকৃতি কি? সে বিষয় তথাগতের মন্তব্য রূপে বর্ণিত যে সব উক্তি সুরঙ্গম সূত্র ও লঙ্কাবতার সূত্রে পাই তা হতে কিছু আলোকপাত হয় মনে হয়। তারা পালিভাষায় লেখা প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তারা তুলনায় প্রাচীন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। এই

১ Illusion

২ উদান ।৮।৩

গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধের নিজস্ব দর্শনের বিষয় কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাদের নির্ভরযোগ্যতার সপক্ষে সব থেকে বড় নির্ভরযোগ্য যুক্তি হল এই যে প্রতীত্য-সমুৎপাদে যে দর্শনটি চুম্বকে পাই বা উদানে যে উক্তিটি পাই তাদের সঙ্গে এই বচনগুলি সংগতি রক্ষা করে।

এই মৌলিক সত্তা যে মনের মত পদার্থ অর্থাৎ তা জড়প্রকৃতির নয়, চৈতন্য প্রকৃতির, এই ধরণের মন্তব্য প্রথমত সেখানে পাওয়া যায়। সুরঙ্গম সূত্রে পাই ভগবান বুদ্ধ বলছেন: "আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা এবং তাদের বিকাশ ব্যক্তিমনে প্রকট হয়।...তা যদি হয় তা হলে সে বিস্ময়কর শান্ত বোধি মন, যা হতে দৃশ্যমান জগতের ধারণা উৎপাদিত হয় তার কোন সারবত্তা থাকবে না, তা কি হয়?"[১]

এই মন্তব্যের তাৎপর্য হল অজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তিমনের কাছে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত ধরা পড়ে তা একটি লোকাতীত সত্তা কর্তৃক বিধৃত। শুধু তাই নয়, তা মনের মত পদার্থ এবং তাকে বিশিষ্ট করবার মত কিছু গুণও আছে। তা নির্মল, তা শান্ত, তা বোধিদ্বারা চিহ্নিত। ইনিই হলেন বুদ্ধের ধারণায় মৌলিক সত্তা। মনে হয় তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের অতীত, স্থান কালের অতীত বিশ্ব-মন রূপে পরিকল্পিত হয়েছে। লঙ্কাবতার সূত্রের মন্তব্য অনুসারে যা নির্বাণ রূপে কল্পিত হয়েছে তা ঠিক দীপ নির্বাণের মত শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়, ব্যক্তিমনের এই বিশ্ব-মনের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে দু একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

সুরঙ্গম সূত্রের প্রথম অংশে বলা হয়েছে: "অনেকের ধারণা যে নির্বাণের অর্থ হল ইন্দ্রিয় ও ব্যক্তিমনের বিনাশ; তারা জানে না যে নির্বাণ ও বিশ্বমন একইবস্তু।"[২]

উপরের বচনগুলি হতে মনে হয় যে বুদ্ধের পরিকল্পনায় যা মৌলিক সত্তা তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ যুক্ত জগত হতে পৃথক এবং তার প্রকৃতি চৈতন্যময়, তা মনের অনুরূপ সত্তা। এই দুটি সূত্রে আরও অনেক বচন পাওয়া যায় যা স্পষ্টই ইঙ্গিত করে যে তা শুধু চৈতন্যময় সত্তা নয়, জ্ঞাতৃরূপী সত্তা। সুরঙ্গম সূত্রে ব্যক্তি মনের দেখার সঙ্গে মৌলিক মনের দেখার পার্থক্য টানা

১ সুরঙ্গম সূত্র ।১।২

২ Lin Yutang, The wisdom of India নামে সংকলন গ্রন্থ হতে এই বচনগুলি উদ্ধৃত।

হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যখন তুমি নিজেকে দেখো বা আমাকে দেখো তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় দৃষ্ট বিকৃত কুহেলি মাত্র দেখো, তা ইন্দ্রিয়াতীত নিরপেক্ষ দৃষ্টির দর্শন নয়। মৌলিক দৃষ্টির অতীন্দ্রিয় দর্শন স্বভাবতই কোন বিকৃত কুহেলি দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। কাজেই মৌলিক মন তোমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত সংযুক্ত মন হতে পৃথক।[১] অর্থাৎ ব্যক্তিমনের সঙ্গে এখানে অতীন্দ্রিয় মনের পার্থক্য টানা হয়েছে। ব্যক্তি মনের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং ক্ষণিক সত্তা বিশিষ্ট বাহ্যিক সৃষ্টিপ্রবাহ দৃষ্ট হয়। সেখানে যা দেখি তা প্রকৃত দর্শন নয়, তা ভ্রান্ত দর্শন, তা কুহেলির সহিত তুলনীয়। মৌলিক মনের প্রকৃতি তা হতে স্বতন্ত্র, তাতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি নেই, তাই তা অবিকৃত এবং স্বচ্ছ। তা দৃষ্টিশক্তি সমন্বিত কিন্তু তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি ঘটে না।

লঙ্কাবতার সূত্রেও একটি অনুরূপ উক্তি পাই। সেখানে বলা হয়েছে: তথাগতের কথিত নির্বাণ সেইখানে লাভ হয় যেখানে ব্যক্তি মনের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করে মানুষ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের মধ্যে দ্বৈতভাব আর স্বীকার করে না।

এই সকল মন্তব্য হতে মনে হয় বুদ্ধের পরিকল্পনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চলমান বিশ্ব হতে পৃথক একটি নিত্যবিরাজমান মৌলিক সত্তা আছেন। তিনি একটি চৈতন্যময় সত্তা এবং বোধিরূপে বিরাজমান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ব্যক্তিমনের যে জ্ঞানক্রিয়া ঘটে তা অলীক। বিশ্ব মনের দ্রষ্টা রূপ আছে কিন্তু তার জ্ঞানক্রিয়া ঘটে না; কারণ জ্ঞানক্রিয়া ত অবিদ্যা ও অজ্ঞান হতেই জন্মায়।

বিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত দর্শনও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তবে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তার আলোচনা মোটামুটি হয়ে যাওয়ায় এখানে তার পুনরুত্থাপন প্রয়োজন হবে না। কেবল বর্তমান প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মতটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে। শঙ্করাচার্যের ধারণায় বিশ্বসত্তা মূলত একক সত্তা এবং আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে বহুধারা বিখণ্ডিত চলমান বিশ্বের পরিচয় দেয় তা তার বিকৃত রূপ। তা প্রপঞ্চ, তা মায়া। তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্ব হল এই মৌলিক সত্তা একক হলেও, তাঁর জানবার বা দেখবার কোন দ্বিতীয় বস্তু না থাকলেও তাঁর এইরূপ খণ্ডন হয় না। তিনি শুধু চৈতন্যময় পদার্থ নয়, তিনি অতিরিক্তভাবে দ্রষ্টারূপী, দেখবার বস্তু না থাকলেও তাঁর দ্রষ্টারূপ নষ্ট হয় না। তিনি বলেন এই আত্মা নিত্য-চৈতন্য।

১ সুরঙ্গম সূত্র ।১।৫

২ লঙ্কাবতার সূত্র

দ্রষ্টব্য না থাকলেও তাঁর মতে তার দেখা সম্ভব। তার সমর্থনে তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন মহাশূন্যে বিরাজমান জ্যোতিষ্ক অব্যাহত ভাবে কিরণ ছড়ায়; সেই কিরণকে প্রতিফলিত করবার জন্য কোন বস্তু না থাকলেও কিরণ বর্ষণ অব্যাহত থাকে।[১]

মনে হয় এ বিষয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ছিলেন। তাঁর দার্শনিক মতটির সহিতও পূর্বে আমরা পরিচিত হয়েছি। সুতরাং এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে যেটুকু বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক তাতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকব। মোটামুটি যাজ্ঞবল্ক্যের চিন্তায় বিশ্বসত্তার বা ব্রহ্মের যে রূপটি ফুটে ওঠে তার দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভোক্তা-ভোগ্য, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বিশ্বের সহিত আমাদের পরিচয় হয় তা মৌলিক সত্তা নয়, তা দ্বৈতবোধ হতে সম্ভূত। প্রকৃত আত্মা বা 'প্রাজ্ঞ আত্মার' প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সেখানে দ্বৈতবোধ থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের উপলব্ধি ঘটে না। তবে দ্রষ্টব্য, ঘ্রাতব্য, জ্ঞাতব্য বস্তু না থাকলেও মূল সত্তার জ্ঞাতৃরূপের বিনাশ ঘটে না। তার কারণ তাঁর সেরূপ স্বভাবগত রূপ, তার বিনাশ নেই। কাজেই প্রাজ্ঞ আত্মা যে কিছু দেখেন না, তার কারণ দেখবার কিছুই নেই, তিনি অখণ্ডভাবে এক।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি তিনি আরুণিকে বলছেন: এই অন্তর্যামী আত্মা অমৃত, অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা, অমত অথচ মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা।[২]

এই উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণে দেখি তিনি রাজর্ষি জনককে বলছেন যে প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আচ্ছন্ন হলে মানুষের জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্বের বোধ লোপ পায় অথচ তার জ্ঞাতৃরূপ বর্তমান থাকে। কেন থাকে তার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, সে দেখে না তার কারণ এই নয় যে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়, সে দেখেও দেখে না, দ্রষ্টার দৃষ্টির এখানে বিলোপ ঘটে না, তা হতে দ্বিতীয় কেউ নেই যে দেখবে।[৩]

১ বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈতন্যাভাবাৎ—যথা বিয়দাশ্রয়স্য প্রকাশস্য প্রকাশ্যাভাবাদনভিব্যক্তি র্ন স্বরূপা ভাবাঘতবৎ। শারীরক ভাষ্য ।২।৩।১৮

২ বৃহদারণ্যক ।৩।৭।২৩

৩ যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টু দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয় মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। বৃহদারণ্যক ।৪।৩।২৩

এখানে যা লক্ষ্য করবার তা হল বুদ্ধের নিজস্ব দর্শনের সহিত শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত দর্শনের আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য। উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের বৈচিত্র্যময় জগৎকে মৌলিক সত্তার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন। উভয়েই বলেছেন তার জন্ম অবিদ্যাকে ভিত্তি করে। উভয়েরই ধারণা তা মৌলিক সত্তার প্রকৃত পরিচয় দেয় না। শঙ্করাচার্য বলেছেন তা প্রপঞ্চ, বুদ্ধ বলেছেন তা কুহেলিকার মত, তা প্রকৃত সত্তার নির্মল রূপটিকে আচ্ছন্ন করে। অতিরিক্ত ভাবে উভয়েরই ধারণা, এই সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হতে পৃথক, তা একক সত্তা এবং তা চৈতন্যময় মনের সদৃশ পদার্থ। বুদ্ধ তাকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞাতা বলেছেন, তাকে বিশ্বমনও বলেছেন। শঙ্করাচার্য বলেছেন তা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ এবং জ্ঞাতৃরূপী, জানবার বস্তু না থাকলেও তার জ্ঞাতৃস্বরূপ খণ্ডন হয় না। উভয়ের চিন্তার আশ্চর্যকর সাদৃশ্য এখানে দেখা যায়। এক্ষেত্রে যে একটি প্রবাদবচন প্রচলিত আছে যে শঙ্করাচার্য ছিলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তার যে ভিত্তি নেই, তা বলা যায় না।

মনে হয় এই চিন্তাধারাটি ভারতীয় দর্শনের একটি বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা নয়। ভারতীয় দর্শনে তার যেন একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির মধ্যে তত্ত্বটিকে বীজ আকারে পাওয়া যায়। তাই বুদ্ধের চিন্তায় বিকাশ লাভ করেছে এবং পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্যের দর্শনে পূর্ণাঙ্গরূপটি পেয়েছে, এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে অন্যতম। সুতরাং তার রচনাকাল বুদ্ধের পূর্ববর্তী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বুদ্ধ যে প্রাচীন উপনিষদগুলির প্রচারিত তত্ত্বের সহিত অপরিচিত ছিলেন এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই। বরং দেখা যায় যে তাঁর চিন্তায় উপনিষদের সহিত যে পরিচিত ছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ব্রহ্মবিহার সম্বন্ধে তাঁর যে সুন্দর মন্তব্যটি আছে তার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।[১] সুতরাং মৌলিক সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তায় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রভাব থাকবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

শঙ্করাচার্য যে যাজ্ঞবল্ক্যের মন্তব্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা ধরে নেওয়া অনেক সহজ। তাঁর শারীরিক ভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের প্রাসঙ্গিক

১ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের Religion of Man (Spiritual Union)-এ ব্রহ্মবিহার সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যায় তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের ভাষ্যে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন। তিনি যে যাজ্ঞবল্ক্যের চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এ বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনায়াসে করতে পারা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্যের মন্তব্যে যা বীজ আকারে ছিল তা শঙ্করাচার্যের দর্শনে বিকাশ লাভ করেছে।

এই শ্রেণীর দর্শনে দুটি দুর্বলতা এসে পড়ে। প্রথম, তা একদেশদর্শি-দৃষ্টি দ্বারা প্রভাবান্বিত বলে তার জড়ের বিরুদ্ধে একটি মানসিক বিরাগ এসে পড়ে। ফলে বিশ্বসত্তাকে বিশুদ্ধভাবে চৈতন্যপ্রকৃতির বলে ব্যাখ্যা করতে চায়। অপর পক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের মনের যে বিশ্বের সহিত পরিচয় ঘটে তাকে খণ্ডন করবার জন্য যে চেষ্টা হয়, তা সন্তোষজনক হয় না, কারণ তা বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গি বর্জিত। ফলে তাকে এই শ্রেণীর দর্শন মূল সত্তার বিকৃত পরিচয় বা মায়া বা ছায়ার মত বলে কল্পনা করে। এই ধরণের সিদ্ধান্ত আমাদের অভিজ্ঞতায় লব্ধ তথ্যের বিরুদ্ধে যায় বলেই ব্যাখ্যা খুব সন্তোষজনক হয় না।

মৌলিক সত্তার প্রকৃতি যে মানসিক শুধু এইটুকু বলেই কিন্তু এই শ্রেণীর দর্শন ক্ষান্ত হয় না। তা অতিরিক্ত ভাবে বলে যে এই মৌলিক সত্তা জ্ঞাতা-ধর্মী। সাধারণত জ্ঞেয়ের সম্পর্কেই জ্ঞাতার ধারণা গড়ে ওঠে; কিন্তু এখানে বলা হয় যে জ্ঞাতব্য কিছু না থাকলেও, দ্বিতীয় সত্তা না থাকলেও মূল সত্তার দ্রষ্টা প্রকৃতি লোপ পায় না, কারণ তা অবিনাশী। দেখবার কিছু নেই বলেই তিনি কিছু দেখেন না। শঙ্করাচার্য এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন মহাকাশে কিরণ গ্রহণ করবার কিছু না থাকলেও সূর্য যেমন কিরণ ছড়িয়ে যায়, এখানেও তেমন ঘটে। কিন্তু এই উপমাটি অনবদ্য হয়েছে বলে মনে হয় না। সূর্যের কিরণ একটি জ্ঞেয় বস্তু, সূর্যও একটি জ্ঞেয় বস্তু; সূর্যের দেহই খণ্ডিত হয়ে কিরণ রূপে বিচ্ছুরিত হয়। শঙ্করাচার্য যদি একটি জ্ঞাতৃরূপী সত্তার সহিত তুলনা করতে পারতেন ভাল হত। কিন্তু সে রকম তুলনীয় বস্তু পাওয়া যায় না। জ্ঞেয় পদার্থ যে তার গুণসমেত জ্ঞাতা না থাকলেও বর্তমান থাকে, তা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি স্বীকার করে। অবশ্য দর্শনশাস্ত্রে তা বিতর্কের বিষয়। তবু মনে হয় সাধারণ বুদ্ধি যা ভাবে তার সমর্থনে কিছু নির্ভরযোগ্য যুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞেয় নেই জ্ঞাতা আছে, সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় না।

বিশ্বে দেখা যায় জ্ঞাতা নিরপেক্ষ ভাবে জড়প্রকৃতির বস্তু বর্তমান থাকে। তার জ্ঞেয়রূপ তখনই প্রকট হয় যখন বিশেষ পরিবেশের অনুকূলতার সুযোগ নিয়ে জড়কে অবলম্বন করে প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটে। যেমন আমাদের পৃথিবীর বক্ষে ঘটেছে। বিজ্ঞান বলে এটা ব্যতিক্রম। আমাদের সৌর জগতের নয়টি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই সেই পরিবেশ আছে যা প্রাণশক্তির বিকাশের অনুকূল। মহাকাশে আরও কত সৌরমণ্ডল আছে। তাদের কারও হয়ত এমন গ্রহ থাকতে পারে যার উত্তাপ প্রাণশক্তির বিকাশের অনুকূল, যার এমন বায়ুমণ্ডল আছে যা জৈব ক্রিয়ার সহায়ক। কিন্তু তা মহাবিশ্বের এক ভগ্নাংশ মাত্র অবলম্বন করে বর্তমান। যে সকল গ্রহে প্রাণশক্তির বিকাশ সম্ভব নয় সেখানে জড় বস্তু আছে, তাদের জ্ঞানের বিষয় হবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু জ্ঞেয়স্বরূপ প্রকট হয় নি। তার কারণ জ্ঞেয় হতে হলে জ্ঞাতার প্রয়োজন।

প্রাণশক্তি বিকাশলাভ করে যখন জীবরূপে পরিণত হয় তখনই জ্ঞাতৃরূপী সত্তার আবির্ভাব ঘটে। তার একটা কারণ আছে। যা বিশুদ্ধভাবে জড়বস্তু তা জড়প্রকৃতির অঙ্গীভূত। তার পৃথকভাবে নিজের সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন হয় না। একটি মাটির ডেলা নানা প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তার অভ্যন্তর হতে নিজেকে সংরক্ষিত করার গরজ নেই। ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও অন্য আকারে তা জড় প্রকৃতির অঙ্গ হয়েই থাকে। বৃষ্টির জলে গলে গেলে তা যে ভূমির উপর অবস্থিত ছিল তার সঙ্গেই মিশে যায়। কিন্তু জড়বস্তু যখন প্রাণশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন তা একটি জীবে পরিণত হয়। তা তখন হয়ে পড়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। একদিকে সেই জীববিশেষ এবং অপরদিকে তার পরিবেশ। সেই পরিবেশ হতে তার পুষ্টি সংগ্রহ করতে হয়, সেই পরিবেশে যা তার প্রতিকূল তা হতে তার আত্মরক্ষা করতে হয়। নিজেকে পৃথক সত্তারূপে সংরক্ষিত করবার জন্যই এটি প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এখন এই কাজ করতে হলে তার অনুক্ষণ পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। পরিবেশের মধ্যে কোথায় পুষ্টি পাওয়া যায় তা জানতে হবে, কোথায় প্রতিকূল শক্তি ক্রিয়াশীল তা হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এই জন্যই জীবের জ্ঞাতৃরূপ প্রকট হয়ে ওঠে। তার মন, তার বুদ্ধিশক্তি গড়ে ওঠে। নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনেই জৈবসত্তার জ্ঞাতৃরূপ বিকশিত হয়।

অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে তাকে অতিক্রম করে ব্যবহারিক প্রয়োজনমুক্ত হয়ে তা জ্ঞান সঞ্চয়ের ক্ষমতা অর্জন করে। কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে জড় সত্তার নিজস্ব কারণে জ্ঞেয় হবার প্রয়োজন হয় না ; কিন্তু চেতন সত্তার নিজের প্রয়োজনেই জ্ঞাতা হবার প্রয়োজন হয়। বিশ্বের জ্ঞাতৃরূপ বিশ্বের বিকাশের পরে এসেছে, কিন্তু জ্ঞান-নিরপেক্ষ রূপ প্রথম হতেই বর্তমান ছিল। জ্ঞাতৃরূপের গুণগত ঐশ্বর্য আছে স্বীকার্য, কিন্তু তা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় রূপ, তা নয়। এক্ষেত্রে জ্ঞাতৃ-রূপকে এত প্রাধান্য দেবার উপযুক্ত সমর্থক তথ্য পাওয়া যায় বলে মনে হয় না।

লাইবনীটজ-এর দর্শনেও জড়সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এমন একটি বিচিত্র দর্শন গড়া হয়েছে যা বলে অসংখ্য চেতন পদার্থের সমন্বয়ে বিশ্ব গঠিত হয়েছে। এই শ্রেণীর অন্য দর্শনগুলি হতে তা এই বিষয় পৃথক। অন্যেরা একবাদী, তা বহুবাদী। মূল সত্তাকে তিনি মনাড বলেছেন, তা চৈতন্যময় এবং সংখ্যায় বহু, তার অবস্থিতি নেই। তাঁর দর্শন সম্বন্ধেও পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং তার সামগ্রিক আলোচনা না করে যে অংশ বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, তার মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হবে।

লাইবনীটজ-এর বহুবাদভিত্তিক চৈতন্যবাদের জন্ম ঘটেছে তাঁর নিজের মনের একটি সংস্কারের প্রভাবে। তাঁর ধারণা ছিল যা মৌলিক সত্তা[১] তার অবস্থিতি[২] থাকতে পারে না। তাঁর মতে বহু সত্তার সংযোগের পরেই সত্তার অবস্থিতি সম্ভব হয়। কাজেই একটি পৃথক সত্তার অবস্থিতি থাকতে পারে না। চেতন প্রকৃতির সত্তারই অবস্থিতি নেই। সুতরাং মৌলিক সত্তারও প্রকৃতি হল চৈতন্যময়। এই কারণে তিনি বিশ্বসত্তাকে বহু চৈতন্যময় সত্তার সমষ্টি রূপে কল্পনা করেছেন।

এই দর্শনের দুটি দিক আছে। একদিকে তা বহুবাদী, অর্থাৎ বহু বিশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন সত্তায় বিশ্বাসী। কিন্তু সেখানে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকে অস্বীকার করে তিনি নিজেকে অসুবিধায় জড়িয়ে ফেলেছেন। এ বিষয় পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত তিনি মৌলিক সত্তাকে অবস্থিতিহীন মনে করেন বলে তাকে মানসিক প্রকৃতির বলে কল্পনা করেছেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা তাঁর সে ধারণাকে কি সমর্থন করে ? মৌলিক সত্তার অবস্থিতি আছে এমনও ত আমরা দেখি। একদেশদর্শী হওয়ার ফলে এখানেও কষ্টকল্পনা দোষ এসে পড়ে।

১ Substance ২ Extension

দ্বিতীয় শ্রেণীর চৈতন্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। তা বিশ্বতত্ত্বের[১] দিক হতে বিষয়টি আলোচনা করে না। তা বিষয়টি আলোচনা করে জ্ঞানতত্ত্বের[২] দিক হতে। তা প্রথম শ্রেণীর মত জড়বস্তুর সত্তা অস্বীকার করে না, তাকে ছায়া বা মায়া বলে ব্যাখ্যা করে না। তা চৈতন্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে জ্ঞেয় বস্তুর মানসিক-উপলব্ধি-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তা বলতে চায় বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি তাকে মন উপলব্ধি করে। ফলে যে রূপে তাকে পাই তা মানসিক রূপ। তা একটি ধারণায়[৩] রূপান্তরিত হয়ে তবে মনের কাছে ধরা দেয়। কাজেই যার সঙ্গে আমাদের এই পরিচয় ঘটে তা এই মানসিক ধারণা। এই যুক্তির ভিত্তিতে জ্ঞাতারূপী মন-নিরপেক্ষ কোন জড়ধর্মী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে তা প্রস্তুত নয়। জ্ঞাতা-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলে তাকে জ্ঞাতা-ভিত্তিক চৈতন্যবাদ বলা[৪] হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই বার্কলির দর্শনের আলোচনা করব। তাঁর দর্শনটি তিনি এইভাবে গড়ে তুলেছেন: দে-কার্ত তাঁর দর্শন আরম্ভ করেছিলেন সকল বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করে। যতক্ষণ না এমন একটি সত্তা পেয়েছিলেন যার সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করা যায়, তিনি থামেন নি। তিনি নিজের মধ্যেই সেই সত্তার আবিষ্কার করেছিলেন যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়, এই যুক্তি প্রয়োগ করে যে তিনি নিজে আছেন কারণ তিনি চিন্তা করেন।[৫] কারণ তিনি যে চিন্তা করেন তা তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির গোচর। তারপরে তাকে ভিত্তি করে তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন।

অনুরূপভাবে বার্কলি তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন একই ধরণের একটি যুক্তির ওপর। তিনি বলেছিলেন মনের বাহিরে যে সব বস্তু আছে তাদের কোন বিশেষ মন অনুভব না করলে অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। মনের বাহিরের বস্তুর কাজেই মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্ব নির্ভর করে মনের অনুভূতির বিষয় হবার ওপর। তিনি বলেছেন, স্বর্গের ঐক্যতান সঙ্গীত হতে পৃথিবীর আসবাবপত্র, এক কথায় বিপুল বিশ্ব, যে সকল বস্তুর

১ Ontology
২ Epistemology
৩ Idea
৪ Subjective Idealism
৫ Cogito ergo sum.

সমবায়ে গঠিত তাদের মন নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্ব নেই। তার অর্থ হল অস্তিত্ব থাকতে হলে অনুভূত বা জ্ঞাত হওয়া চাই।[১]

দ্বিতীয় কথা হল, অনুভূত হতে হলে, বস্তুর মন হতে পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। তার চূড়ান্ত প্রমাণ মেলে স্বপ্নে। সেখানে যা দেখি, যা অনুভব করি, সবই মনের মধ্যে ঘটে। কাজেই আমরা যা দেখি বা অনুভব করি, তার ব্যাখ্যার জন্য মন-নিরপেক্ষভাবে বহির্বিশ্বে কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করবার প্রয়োজন হয় না। তবে একটা অসুবিধা উপস্থিত হয়। স্বপ্নে যেমন আমাদের মনের গোপন ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমাদের খেয়াল ও খুশীমত নানা বস্তুর উপলব্ধি হয়, জাগ্রত অবস্থায় তা হয় না। সেই অবস্থায় যা দেখি তা আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না, তা আমাদের মনের ওপর আরোপ করা হয়। তার অর্থ এই যে একটি স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি এখানে ক্রিয়া করে।[২]

যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নানা বস্তুর অনুভূতি স্থাপন করেন তিনি বার্কলির মতে ঈশ্বর। কিভাবে এই অনুভূতিগুলি মানুষের মনে স্থাপিত হবে তার রীতি তিনি প্রকৃতির নিয়মাবলীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। এই নিয়মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের মনে ইন্দ্রিয়যোগে যে ধারণাগুলি অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেন তাদেরই আমরা সত্তাবিশিষ্ট বস্তু বলি। অপরপক্ষে যেগুলি আমাদের কল্পনা হতে জন্মগ্রহণ করে তাদের অনুভূতি তত উজ্জ্বল বা স্থায়ী হয় না; তাই তাদের ধারণা বা বস্তুর প্রতিকৃতি বলি। কারণ সেগুলি বাহির হতে যা মনে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাদের অনুকরণে গঠিত।[৩] এইভাবে তিনি বস্তুর উপলব্ধি ও বস্তু সম্বন্ধে মানসিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। কাজেই তাঁর ধারণায় মন-নিরপেক্ষভাবে বহির্বিশ্বে স্বতন্ত্র জড়ধর্মী বস্তুর সত্তা স্বীকার

১ "All the choir of heaven and furniture of earth, in a word all those bodies which compose the mighty frame of the world have not any subsistence without a mind, that being so is to be perceived or known."

Treatise concerning the Principles of Human Knowledge.

২ "But whatever power I have over my own thoughts, I find the ideas actually perceived by sense have not a like dependence on my will··· There is, therefore, some other will or spirit that produces them." Ibid

৩ "The ideas imprinted on the senses by the Author of Nature are called real things and those excited in the imagination being less regular, vivid and constant, are more properly termed ideas or images of things which they copy and represent." Ibid

করবার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মতে যাকে আমরা বহির্বিশ্ব বা প্রকৃতি বলি তা ঈশ্বরেরই মনে চিন্তা রূপে বিরাজমান। তা সুসম্বন্ধভাবে সজ্জিত। তার বোধ হতেই আমাদের একটি পৃথক বহির্বিশ্বের ধারণা হয়। কিন্তু আসলে পৃথক আকারে তা নেই, তা ঈশ্বরের মনের মধ্যে বিধৃত। সুতরাং মনের বাহিরে কোন সত্তা নেই।

মনে হয় তাঁর এই দার্শনিক চিন্তায় তাঁর মতিগতির প্রভাব বিলক্ষণ বর্তমান ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধর্মযাজক। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভক্তি তাঁর মজ্জাগত। কাজেই তিনি ঐকান্তিক ভাবে নাস্তিকতা বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে নাস্তিকতার প্রধান ভিত্তি হল জড়বাদ। সেই জড়বাদকে খণ্ডিত করতে পারে এমন দর্শন গড়লে নাস্তিকতাবাদের ভিত্তি তার তলা হতে সরে যায়। সেই কারণেই তাঁর চৈতন্যবাদের প্রতি পক্ষপাত। অতিরিক্ত ভাবে যদি দর্শন এমনভাবে গঠিত হয় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয়ে যায়, তা হলে এক ঢিলে দুই পাখী মারার কাজ হয়। সেটা করা সম্ভব বিশ্বের ব্যাখ্যায় তাঁর ওপর একটি মুখ্য ভূমিকা স্থাপন করলে। ন্যায় বিচারের জন্য তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োজন হতেও তার আবেদন আরও বলবান হবে। মনে হয় এই ধরণের ধারণার বশবর্তী হতেই তিনি তাঁর নিজস্ব দর্শনটি গড়ে তুলেছেন।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের প্রমাণ তাঁর নিজস্ব উক্তি। তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশে বলেছেন: এটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে সকল যুগেই নাস্তিকের কাছে জড় পদার্থ বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাদের দর্শনগুলি এমন স্পষ্ট এবং আবশ্যিকভাবে তার ওপর নির্ভরশীল যে একবার এই ভিত্তি প্রস্তরটি সরিয়ে নিলে এই বাড়িখানি মাটিতে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।[১]

বৌদ্ধ দর্শনের যোগাচার শাখায় আমরা একটি অনুরূপ তত্ত্ব পাই। তারও উৎপত্তি জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি হতে। তার মূল প্রতিপাদ্য হল মনের বাহিরে মন-নিরপেক্ষ কোন বস্তু আছে কিনা, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' নামক দার্শনিক সংকলন গ্রন্থে এইভাবে স্থাপিত হয়েছে "বাহিরের বস্তু কি একটি সরল অণুর মত না একটি জটিল বস্তু? তা জটিল বস্তু হতে পারে না, কারণ আমরা যখন দেখি তখন, একটি বস্তুর

১ Treatise concerning the Principles of Human Knowledge Section 92

অংশমাত্র দেখি, না সমগ্র দেখি, তা বুঝতে পারি না। তা অণু হতে পারে না, কারণ তা হলে তাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যাবে না।"[১]

সুতরাং যোগাচার দর্শনের মতে বাকি যা রইল তা হল বিজ্ঞান। এই শব্দটি এখানে একটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞান হল চেতনার[২] সমার্থবোধক। তা ঠিক মন নয়। তা বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতার প্রবাহ, তা যাকে জেমস বলেছেন চেতনার ধারা, তাই। সমস্ত বিশ্বকেই এই চেতনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হবে। বিশ্বে যা কিছু আছে সবই বুদ্ধিময়।[৩] চিত্ত বা মন স্থির সত্তা নয়, তা চেতনার প্রবাহ। এর মধ্যে জ্ঞাতাও নেই জ্ঞেয় নেই, আছে চিন্তা ও অনুভূতি পরম্পরা। 'সর্বসিদ্ধান্ত সার সংগ্রহে' বলা হয়েছে: চেতনার প্রকৃতি হল এই যে তাকে বিভাগ করা যায় না; কিন্তু যাদের ধারণা স্বচ্ছ নয়, তাদের কাছে মনে হয় যেন তাকে জ্ঞেয় বস্তু এবং জ্ঞাতা ব্যক্তি এবং সর্বশেষে অনুভূতিরূপে ভাগ করা যায়।[৪] অর্থাৎ এ বিষয় যোগাচার দর্শন মূল বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। কাজেই এই দর্শনের মতে জ্ঞান বা চেতনার ধারা নিয়েই সমগ্র বিশ্ব গঠিত। বিশ্বের একটি মাত্র উপাদান আছে, তা হল চেতনার প্রবাহ; তার মধ্যে জ্ঞাতা নেই, জ্ঞেয় নেই, তাদের পরস্পরের সংযোগে অনুভূতি নেই। চেতনা ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে এই দর্শন গড়ে ওঠেনি বলে এর আর এক নাম 'নিরালম্বন বাদ'।

জ্ঞাতা নেই, জ্ঞেয় নেই অথচ চেতনার ধারা রয়েছে, এই যদি হয় তা হলে প্রশ্ন ওঠে চেতনার বিষয় কোথা হতে আসে? তার মীমাংসা করতে যোগাচার দর্শন একটি বিশেষ তত্ত্বের অবতারণা করেছে। তাকে বলা হয় আলয় বিজ্ঞান। তা বলে প্রতি ব্যক্তি বিশেষ একটি আলয় বা ভাণ্ডার সঙ্গে বহন করে। সেই আলয়ের মধ্যে চেতনার উদয় হতে পারে এমন সমস্ত সম্ভাব্য ধারণা ও অনুভূতি সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে। সেগুলি যেন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থের মত, পাঠক যখন যেটি চান তখন সেটি তাঁর কাছে স্থাপিত হয়। তবে এই উপমা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়; কারণ একই গ্রন্থাগার বহুলোক ব্যবহার করে, এখানে কিন্তু তা ঘটে না। এখানে প্রত্যেকের জন্য

১ সর্বদর্শন সংগ্রহ ২ Consciousness

৩ সর্বং বুদ্ধিময়ং জগৎ

৪ সর্বসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ।৩২।১০

পৃথক আলয় বিজ্ঞান আছে, যেন প্রত্যেকের জন্তই একটি পৃথক গ্রন্থাগার রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন ওঠে পাঠকের ক্ষেত্রে পাঠকের ইচ্ছায় গ্রন্থস্থাপন করা হয়; কিন্তু এখানে ত মন বলে কোন পদার্থ স্বীকৃত হয় না, সে ক্ষেত্রে কি নিয়মে চৈতন্য প্রবাহের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয়? তার উত্তরে বলা হয় সেটা নির্ভর করে পরিবেশের অনুকূলতার ওপর। পরিবেশ বিশেষ অনুকূল হলে আলয় হতে একটি বিশেষ ধারণা বা অনুভূতি প্রত্যয়রূপে চেতনা প্রবাহের বিষয়ীভূত হয়, তখন আমরা তাকে প্রত্যক্ষ করি। এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে স্মরণশক্তির তুলনা করা হয়েছে। নানা বস্তুর স্মৃতি আমাদের মনের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে। সবগুলি একসঙ্গে চেতনার স্তরে আসে না, কেবল যেগুলি অবস্থার গুণে আকৃষ্ট হয় সেগুলি আসে। একটি চেনা মানুষকে দেখলে তার সঙ্গে জড়িত স্মৃতিগুলি চেতনার প্রবাহে প্রবেশ করে। এখানেও সেই রকম ঘটে।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যাবে যে বার্কলির জ্ঞান-ভিত্তিক চৈতন্যবাদ এবং যোগাচার দর্শনের বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক। উভয়ের একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত। জ্ঞাতা-নিরপেক্ষভাবে যে বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে, তা তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। অথচ একই ধরণের জ্ঞান বা অনুভূতি বহির্বিশ্ব হতে নানা মানুষের মনে যে আসে, তাও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। তাই তাকে ব্যাখ্যা করেন এই বলে যে তারা মনের মধ্যেই যেমন স্মৃতির বিষয়গুলি সঞ্চিত থাকে, তেমন ভাবে সঞ্চিত থাকে বা ঈশ্বরের মনে রক্ষিত থাকে। বাহিরের বিশ্বকে এই দর্শন দুটি মানসিক ধারণায় পরিণত করে। এইভাবে মৌলিক বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য আছে।

তবে কিছু পার্থক্যও নজর করা যায়। যেমন বার্কলি মানুষের মনকে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু যোগাচার দর্শন তাকে পদার্থ[১] বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, মনকে বাদ দিয়ে তা চেতনা পরম্পরাকে মাত্র স্বীকার করে। দ্বিতীয় পার্থক্য হল জ্ঞানের বিষয়গুলি মানসিক প্রত্যয় রূপে কিভাবে থাকে তাই নিয়ে। বার্কলির মতে তারা ঈশ্বরের মনে অবস্থান করে। যোগাচার দর্শনের মতে তারা আলয় বিজ্ঞানরূপে প্রতি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে পৃথকভাবে রক্ষিত হয়। উভয় তত্ত্বই কষ্টকল্পনা-দোষদুষ্ট, তবে বিজ্ঞানবাদ যেন তুলনায় আরও অবাস্তব। প্রতি ব্যক্তিবিশেষের

১ Substance

জন্য আলাদা ভাণ্ডার না রেখে একটি সাধারণ ভাণ্ডার রাখলেই ত চলত। প্রত্যেকের জন্য আলাদা 'আলয়' রাখবার কি প্রয়োজন ছিল বোঝা যায় না।

এই শ্রেণীর দর্শনের সঙ্গে প্লেটো র দর্শনের প্রকৃতির এই প্রসঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্লেটো মানুষের মন-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। তিনি শুধু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সমন্বিত সমগ্র দৃশ্যমান জগতকে মৌলিক সত্তার মর্যাদা দিতে চান নি। তাঁর ধারণায় এরা মূল বস্তুর ছায়ার মত জিনিস কারণ তারা মূলবস্তুর অনুকরণ। তাঁর ধারণায় মূলবস্তু হল সার্বিক সংজ্ঞাগুলি। সুসংবদ্ধভাবে সাজানো সার্বিক সংজ্ঞার যে জগৎ তাই হল মৌলিক সত্তা। তাঁর আকর্ষণ ধ্রুবের প্রতি, একের প্রতি। তাই তিনি বহুদ্বারা খণ্ডিত চলমান বিশ্বকে মৌলিক মর্যাদা দিতে পারেন নি। জ্ঞেয় বস্তুর বিপক্ষে তাঁর কোন প্রতিকূল মনোভাব ছিল না। বার্কলির এবং যোগাচার দর্শনের ও চলমান বিশ্বের প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না; তাঁদের বিরোধ জ্ঞাতা হতে পৃথক জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের বিপক্ষে।

তৃতীয় শ্রেণীর চৈতন্যবাদের বৈশিষ্ট্য হল তা মন-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে, তবে তা যে জড়ধর্মী তা স্বীকার করে না। তা বলতে চায় তারও প্রকৃতি চিন্ময়। এই শ্রেণীর নিদর্শন হিসাবে হেগেলকে স্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর মূল দার্শনিক গ্রন্থের নাম হল 'লজিক'। তার অর্থ দাঁড়ায় যুক্তি শাস্ত্র, কিন্তু সে অর্থে তিনি কথাটি ব্যবহার করেন নি। যুক্তি শাস্ত্র শেখায় কিভাবে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দুইখণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থখানি আসলে একটি দার্শনিক গ্রন্থ। তার ভাষা একান্ত দুর্বোধ্য, তার সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর অনৈক্যপূর্ণ, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এত অভিনব যে তা দীর্ঘকাল ধরে দার্শনিক আলোচনার ওপর একটি মৌলিক প্রভাবরূপে ক্রিয়া করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি সব থেকে খ্যাতিমান দার্শনিক ছিলেন। তার শেষ ভাগেও তাঁর সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর প্রভাব মাতৃভূমি অতিক্রম করে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সকল বিশিষ্ট ব্রিটিশ দার্শনিক তাঁর প্রভাবে ধরা দিয়েছিলেন। এই তালিকায় বোসাঙ্কে, গ্রীন ও ব্র্যাডলি পড়েন।

তাঁর ভাষার দুরূহতা এবং ভাবের জটিলতার উদাহরণস্বরূপ তাঁর দর্শনের

মূল তত্ত্ব 'চূড়ান্তপ্রজ্ঞার'[১] যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বর্তমান আলোচনায় তা প্রাসঙ্গিকও হবে। তার বাংলায় অনুবাদ নীচে দেওয়া হল :

"চূড়ান্ত প্রজ্ঞা : জ্ঞেয় প্রকৃতির প্রজ্ঞা এবং জ্ঞাতা-প্রকৃতির প্রজ্ঞার ঐক্যরূপে যা প্রজ্ঞা, তা হল প্রজ্ঞার ধারণা ; সেটি হল স্বরূপে অবস্থিত প্রজ্ঞা যার বিষয় বস্তু হল প্রজ্ঞা ; তা এমন একটি সত্তা যা সকল বৈচিত্র্যকে নিজের সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যে ধারণ করে।"[২]

বার্ট্রাণ্ড রাসেল তার অর্থ করেছেন 'চূড়ান্ত প্রজ্ঞা হল বিশুদ্ধ চিন্তা এবং তার বিষয় হল বিশুদ্ধ চিন্তা।' মনে হয় তার মর্মার্থ তিনি ঠিকই ধরেছেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তাঁর দর্শনে এই চুম্বকে কথিত উক্তিটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা প্রথমে তার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাথমিক কথা বলে নিয়ে তারপর সে পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

হেগেল কতকগুলি প্রাথমিক ধারণা নিয়ে তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। সেগুলির সহিত প্রথমে পরিচয় হওয়া দরকার। প্রথমেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর ধারণায় বিশ্বের প্রকৃতি হল প্রজ্ঞা স্বরূপ। সেই প্রজ্ঞার দুটি রূপ : একটি স্বরূপে অধিষ্ঠিত রূপ[৩] এবং অপরটি তার নিজের অভিব্যক্তির অনুরূপ[৪]। উভয় রূপই প্রজ্ঞাধর্মী। কাজেই তিনি বিশুদ্ধভাবে চৈতন্যবাদী। প্রজ্ঞার যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রূপ তাকে তিনি বলেছেন চূড়ান্ত প্রজ্ঞা[৫]। এখানে আছে পরস্পর সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিত চিন্তা। তার প্রকৃতি জ্ঞান বাক্যের মত। অর্থাৎ তাতে দুটি সার্বিক সংজ্ঞার সম্বন্ধ সূচিত হয়। এই জ্ঞানবাক্যে সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিত রূপটি হল বিশ্বসত্তার অপ্রকট রূপ। তা স্থানকালের অতীত। তা প্লেটো-র পরিকল্পিত সার্বিক সংজ্ঞা দিয়ে গঠিত সামান্যের জগতের অনুরূপ, তবে কিছু ভিন্নও বটে। প্লেটো-র সামান্যের

১ Absolute Idea

২ মূল জার্মান হতে এই ব্যাখ্যার Wallace কৃত অনুবাদ এই :

"The Absolute Idea. The Idea as unity of the Subjective and Objective Idea, is the notion of the Idea a notion whose object is the Idea as such, and for which the objective is the Idea an object which embraces all characteristics in its unity."

৩ In itself ৪ For itself ৫ Absolute Idea

জগত সার্বিক সংজ্ঞা রূপ মৌলিক সত্তা দিয়ে গঠিত। তারই অনুকরণে বাস্তব জগতের বস্তুগুলি উৎপাদিত হয়। তাই বাস্তব জগতকে ছায়ার জগত বা নকলের জগত বলে তাঁর দর্শনে বর্ণিত হয়েছে। হেগেল-এর দর্শনে যা মৌলিক সত্তা তার উপাদান আরও জটিল। তা সার্বিক সংজ্ঞার সংযোগে গঠিত জ্ঞান বাক্যের[১] সমষ্টি। অর্থাৎ তা সুসংবদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক চিন্তাসমষ্টি। প্রকৃতির জগৎ প্রকৃত মৌলিক সত্তার অনুকরণ নয়; তা হল স্বরূপে অবস্থিত প্রজ্ঞার বাস্তবায়িত রূপ। চূড়ান্ত প্রজ্ঞাই নিজের অভিব্যক্তির পথে দৃশ্যমান জগতে রূপান্তরিত হয়। তা সত্ত্বেও তার প্রকৃতি বদলায় না, তারও প্রকৃতি জ্ঞানবাক্যভিত্তিক চিন্তার মত।

দ্বিতীয়ত, হেগেল-এর বৈজ্ঞানিক রীতির ব্যাখ্যার ওপর আস্থা ছিল না। সে রীতিতে জড়শক্তিকেই বিশ্বের বিবর্তনের কারণ বলে ধরা হয়। জড় বস্তুই এক পরিবেশ হতে অন্য পরিবেশে পরিবর্তন ঘটায়। এই ধরনের ব্যাখ্যায় যে যুক্তি দেখানো হয় তার সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। হেগেল-এর ধারণায় যে পরিবর্তন ঘটবে তা যে নিশ্চিত ঘটবে এমন বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উৎপাদন করবার ক্ষমতা রাখে না। তুলনায় প্রজ্ঞা ভিত্তিক ব্যাখ্যায় বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ আপনি এসে পড়ে। প্রজ্ঞা নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির বলেই পরিবর্তিত রূপ পায়। সেই কারণে বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যাকে তিনি প্রকৃষ্টতর রীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি বলেন বিশুদ্ধ চিন্তাই এই ব্যাখ্যান রীতির অবলম্বন। তার প্রকৃতি কি সে বিষয় ও তাঁর নিজস্ব মত আছে। তাঁর ধারণায় যে জ্ঞানবাক্যে বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকবে তাকে বিশুদ্ধ চিন্তা বলে গ্রহণ করা যাবে না। আমি যদি বলি, রাম একজন মানুষ, তা বিশুদ্ধ চিন্তার নিদর্শন হবে না, কারণ এখানে রাম নামে এক ব্যক্তি বিশেষের সহিত এই জ্ঞানবাক্য জড়িত। আমি যদি বলি, মানুষ একটি বুদ্ধিযুক্ত জীব, তাও বিশুদ্ধ চিন্তা বলে স্বীকৃত হবে না। কারণ যদি ও এই জ্ঞানবাক্যে দুটি সার্বিক সংজ্ঞা আছে তবু তাদের সঙ্গে তারা যে বিশেষকে সূচিত করে তার সহিত পরোক্ষভাবে সংযোগ এসে পড়ে। সার্বিক সংজ্ঞার সম্বন্ধের বিমূর্ত রূপ দিয়েই বিশুদ্ধ চিন্তা গঠিত হয়। যেমন যদি, সকল মানুষ মরণশীল, এই না বলে বলি সকল 'উ' হয় 'বি',[২] তা হলে সেটা বিশুদ্ধ চিন্তার নিদর্শন হবে। এর সঙ্গে সংখ্যা তত্ত্বের বেশ

১ Judgment ২ উ=উদ্দেশ্য বি=বিধেয়

তুলনা চলে। কোন জিনিসের সংখ্যা নির্দেশ করতে আমরা সংখ্যা ব্যবহার করি। যেমন বলি, পাঁচটি আম বা দশটি গরু। জিনিস হতে পৃথক করে নিলে আমরা পাই সংখ্যার বিমূর্ত রূপ। সেই সংখ্যার আবার বিমূর্তরূপ পাই বীজ গণিতে। সেখানে সংখ্যাকে অক্ষরে রূপান্তরিত করা হয়। এখানেও অনুরূপভাবে বাস্তব অবস্থা সূচিত করতে দুটি সার্বিক সংজ্ঞার প্রয়োগে যে জ্ঞানবাক্য রচিত হয়, তার বিমূর্ততর রূপে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে বিশুদ্ধ চিন্তায় পরিণত করা হয়। হেগেল-এর ধারণায় এই বিশুদ্ধ চিন্তাই বিশ্বের মৌলিক উপাদান।

তৃতীয়ত তিনি কাণ্ট-এর পরিকল্পিত জ্ঞানের প্রকার তত্ত্ব[১] গ্রহণ করেছেন। জ্ঞান কত শ্রেণীর হতে পারে এই তত্ত্বের দ্বারা কাণ্ট তা সূচিত করেছেন। জ্ঞানের মৌলিক প্রকারগুলি তাতে দেখানো হয়েছে। কাণ্ট বারোটি মৌলিক প্রকারের উল্লেখ করেছেন। হেগেল তার সঙ্গে অনেক অতিরিক্ত প্রকার সংযুক্ত করেছেন। কাণ্ট প্রকারগুলির মধ্যে কোন সম্পর্ক নির্দেশ করেন নি। হেগেল-এর ধারণায় এই প্রকারগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করা যায়। এই পথে প্রকারগুলিকে পরস্পর যুক্ত করে চূড়ান্ত প্রজ্ঞায় উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং প্রকার তত্ত্ব তাঁর দর্শনে একটি মৌলিক তত্ত্ব।[২]

হেগেল আবার প্রকারগুলিকে তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাদের প্রথমটি হল সত্তা প্রকৃতির[৩]; যেমন গুণ, পরিমাণ প্রভৃতি। এই প্রকারগুলি তাঁর ধারণায় অন্য-বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে বর্তমান থাকতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকার হল সারভিত্তিক[৪]। এরা যুগলে বর্তমান, কারণ প্রত্যেকে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত নয়; যেমন কার্য-কারণ সম্বন্ধ, দ্রব্য ও গুণের সম্পর্ক। তৃতীয় শ্রেণীর নাম তিনি দিয়েছেন 'নোশন'[৫]। তার অর্থ কি তা বোঝা যায় না। কাণ্ট চারটি মৌলিক শ্রেণীর প্রকার নির্দেশ করেছিলেন: পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ ও বিধা। তাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করে তিনি বারোটি প্রকার স্থাপন করেছিলেন। এরা সকলেই জ্ঞানের প্রকৃতি অনুসারে তাদের প্রকার সূচিত করে। হেগেল-এর প্রকারও তাই করে। তবে তার বিন্যাস বিভিন্ন। হেগেল-এর সত্তা

১ Categories of knowledge

২ তরকচন্দ্র রায়, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩ Being   ৪ Essence   ৫ Notion

প্রকারের মধ্যে কাণ্ট-এর গুণ ও পরিমাণ এসে পড়ে। কিন্তু আর কোথাও বিশেষ মিল নেই। মনে হয় হেগেল নিজের রচিত দর্শনের প্রতি লক্ষ্য রেখে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য যাতে রক্ষা করে, সেই ভাবে প্রকারগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন। তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর 'নোশন' সম্পর্কিত বিশ্লেষণ হতে। তার মধ্যে তিনি তিনটি প্রকার স্থাপন করেছেন : জ্ঞাতাগত[১], জ্ঞেয়-গত[২] এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত[৩]। এই তত্ত্বগুলি সবই তাঁর নিজস্ব দর্শনের অঙ্গীভূত। তাই মনে হয় তাঁর প্রকারের বিশ্লেষণ এমন জটিল এবং দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুলনায় কাণ্ট প্রকারগুলির বিশ্লেষণ করেছিলেন নিরপেক্ষ মন নিয়ে জ্ঞান-বাক্যের শ্রেণীগুলি সূচিত করতে। বিশ্বতত্ত্ব[৪] গড়ে তোলবার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। তাই তা আরও নির্ভরযোগ্য হয়েছে।

হেগেল-এর দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার ত্রিভঙ্গী নয়। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হল চিন্তা তার নিজস্ব শক্তি বলেই বিশ্বকে প্রকট করে। চিন্তার এই নিজস্ব শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ত্রিভঙ্গী নয়ের ব্যবহার করেছেন। তার মূল কথা হল চিন্তা ইতিবাচক অবস্থা হতে নেতিবাচক অবস্থায় উপনীত হয় এবং তৃতীয় অবস্থায় তাদের সমন্বয়ে ব্যাপকতর ধারণায় উন্নীত হয়। এই ভাবে চিন্তার অগ্রগতি তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা সূচিত হয়। চিন্তা যেন অগ্রসর হয় তিন পদক্ষেপের ছন্দে নিজেকে পরিচালিত করে। প্রথম পদক্ষেপ ইতিবাচক ধারণা।[৫] দ্বিতীয় পদক্ষেপ বিপরীত ধারণা[৬] এবং তৃতীয় পদক্ষেপ তাদের সমন্বয়সূচক ধারণা[৭]। তিনি এই রীতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকারের[৮] এক হতে অন্যতে উত্তরণ কি ভাবে ঘটেছে তা তাঁর দর্শনে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এখনি মন্তব্য করেছিলাম যে তিনি প্রকার তত্ত্বের পরিকল্পনা এমন ভাবে করেছেন যাতে তাঁর দর্শনটি উদ্ঘাটিত হয়। আমাদের এই প্রতিপাদ্য, তাঁর ত্রিভঙ্গী নয়ের রীতিতে প্রকার হতে প্রকারে উত্তরণে কেমন ভাবে তিনি প্রয়োগ করেছেন, তা হতে সুন্দর সমর্থন হবে।

তাঁর পরিকল্পনায় গুণের দিক হতে সব থেকে কম ব্যাপক প্রকার হল 'সত্তা'[৯] এবং সব থেকে ব্যাপক প্রকার হল 'চূড়ান্ত প্রজ্ঞা'।[১০] তাঁর ত্রিভঙ্গী

১ Subjective Notion
২ The Idea
৩ Notion-in-itself
৪ Ontology
৫ Thesis
৬ Antithesis
৭ Synthesis
৮ Categories
৯ Being
১০ Absolute Idea

নয়ের সাহায্যে পরস্পর বিরোধী সংজ্ঞার সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাঁর দর্শনে এই 'সত্তা' হতে ক্রমশ এগিয়ে তিনি 'চূড়ান্ত প্রজ্ঞায়' এসে উপনীত হয়েছেন। সত্তার গুণগত ব্যাপকতা সব থেকে কম, কারণ তাতে ন্যূনতম গুণই স্থান পেয়েছে; সেটুকু না থাকলে তা শূন্যে পরিণত হত। অপর পক্ষে চূড়ান্ত প্রজ্ঞা হেগেল-এর পরিকল্পনায় সব থেকে ব্যাপকতম ধারণা। চূড়ান্ত প্রজ্ঞা অর্থে এখানে জ্ঞানের আকারে সমগ্র বিশ্ব বিধৃত হয়েছে বুঝি। তাঁর মতে বিশ্ব জড় প্রকৃতির নয় চৈতন্য প্রকৃতির। সুতরাং সমগ্র বিশ্বই তার আধেয়।

এক দিকে যেমন প্রকার হতে ব্যাপকতর প্রকারের ভিতর দিয়ে কেবল সত্তা অবলম্বন করে হেগেল ব্যাপকতম সত্তা, চূড়ান্ত প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়েছে দেখিয়েছেন, তেমন প্রকৃতির দর্শন এবং মানব-আত্মার দর্শনের ভিতর দিয়ে, চূড়ান্ত প্রজ্ঞা রূপ অতীন্দ্রিয় অবস্থা হতে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে প্রকৃতির মধ্যে প্রকট হয়ে, মানব মনে বিশ্ব চিন্তা রূপে আবার স্বরূপে ফিরে গিয়েছে, এও তিনি দেখিয়েছেন। এইভাবে দুদিক হতে তিনি তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর পরিকল্পনায় পরম সত্তার দুটি রূপ। দুই রূপই চৈতন্য-প্রকৃতির। একটি অতীন্দ্রিয় রূপ; সেখানে তিনি চূড়ান্ত প্রজ্ঞা রূপে নিজেই নিজেতে বর্তমান।[১] অপরটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানব মনে প্রতিফলিত জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে জ্ঞানরূপ। এখানে তিনি নিজের জন্য নিজে প্রকট হয়েছেন।[২] তাঁর ধারণায়, ইন্দ্রিয়াতীত প্রজ্ঞারূপে যা থাকে, তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বরূপে প্রকট হয়ে মানব মনের মধ্য দিয়ে নিজের কাছে নিজে প্রতীয়মান হয়। এইভাবে যা অবাস্তব বা বিমূর্ত, তা প্রকৃতির মধ্যে বাস্তব হয়, আবার মানব মনের মধ্য দিয়ে আত্মরূপ দর্শন করে আত্ম সচেতন হয়। বিশ্বাতীত রূপে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা, প্রকৃতিরূপে তিনি প্রকট প্রজ্ঞা, মানব দৃষ্টিতে লব্ধ বিশ্ব দর্শনে তিনি আত্মসচেতন প্রজ্ঞা। এখন আমরা এই হেগেল প্রদত্ত চূড়ান্ত সত্তার পরিচায়ক মন্তব্যটি স্মরণ করতে পারি। তার অর্থ বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করা এখন খানিকটা সহজ হবে। তার মর্মার্থ হল, বিশ্ব সত্তার প্রকৃতি বিশুদ্ধ চিন্তার মত, তিনি মানব মনে নিজেকেই নিজে চিন্তা করেন।

এইবার অতি সংক্ষেপে হেগেল-এর প্রকৃতি ও মানব-আত্মার দর্শনের একটি বিবরণ দিয়ে তাঁর দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ করব। এই প্রসঙ্গেও তিনি ত্রিভঙ্গী নয় প্রয়োগ করেছেন। তার প্রথম পদক্ষেপ সূচিত করে বিশুদ্ধ

১ Absolute-in-itself ২ Absolute-for-itself

প্রজ্ঞা[১], অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত চূড়ান্ত প্রজ্ঞাই তার ইতিবাচক ধারণা।[২] দ্বিতীয় পদক্ষেপে যে নেতিবাচক ধারণা পাই তাই হল প্রকৃতি। এবং তৃতীয় পদক্ষেপে যে সমন্বয় সূচক ধারণা পাই, তাই হল মানব মন।

বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার গুণ হল তা চৈতন্যময়। অপরপক্ষে প্রকৃতি হল সম্পূর্ণ জড়ধর্মী। কাজেই তারা পরস্পরের বিপরীত ধর্মী। প্রকৃতির ভিত্তি হল স্থান, তাকে অবলম্বন করেই তা গড়ে ওঠে। চৈতন্যের স্থানে অবস্থিতি নেই। কাজেই তারা সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। প্রকৃতির দর্শনে তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাতে আছে সংঘাত বিজ্ঞান[৩], অর্থাৎ জড় পদার্থের পারস্পরিক যান্ত্রিক সংঘাত, পদার্থ বিজ্ঞান[৪] এবং রাসায়নিক বিজ্ঞান[৫]। এক কথায় সমগ্র জড় প্রকৃতি তার আলোচনার বিষয়।

আত্মার দর্শনে তিনটি ভাগ আছে। মানুষের মনের তিনটি অবস্থা তা সূচিত করে। প্রথম ভাগে জ্ঞাতৃরূপী[৬] মন। ব্যক্তিরূপী মানুষের মন এখানে আলোচিত হয়েছে। তার বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, স্মৃতি এর আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় আসে স্রষ্টারূপী মন।[৭] মানুষের মন যে সব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে তাই এর আলোচ্য বিষয়। যেমন আইন, নীতি, সমাজ, রাষ্ট্র। তৃতীয়ত আসে চূড়ান্ত প্রজ্ঞারূপী মন। এখানে মানুষের মন চূড়ান্ত সত্তার অন্বেষণে যা গড়ে যেমন শিল্পতত্ত্ব ও দর্শন তাই আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং তাঁর দর্শনের বিন্যাস হতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে তাঁর প্রতিপাদ্য পরিস্ফুট করবার জন্যই তিনি তাঁর ত্রিভঙ্গী নয় এবং তাঁর প্রকার তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য হল বিশ্ব বিশুদ্ধ চিন্তা প্রকৃতির। স্বরূপে তা চূড়ান্ত প্রজ্ঞারূপে অতীন্দ্রিয় সংজ্ঞারূপে বিরাজমান। নিজের সম্বন্ধে নিজে সচেতন হবার জন্য তিনি প্রকৃতিরূপে প্রকট হন এবং মানুষের মনে দার্শনিক জ্ঞানরূপে আবার স্বরূপে ফিরে যান।

এই হল সংক্ষেপে হেগেল-এর দর্শন। তাঁর দর্শনের এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যে পাশ্চাত্য দর্শনকে তা দীর্ঘদিন এক রকম মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছিল। সেই আচ্ছন্নভাব কিন্তু ধীরে ধীরে সরে গেছে। এখন তিনি এক

১ Pure Idea
২ Thesis
৩ ics
৪ Physics
৫ Organics
৬ Subjective Spirit
৭ Objective Spirit

রকম অবহেলিত। শুধু অবহেলিত নয়, এমনকি নিন্দিত। তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর দর্শন সম্বন্ধে কেয়ার্ড-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন হেগেল-এর দর্শন একটি চরম ঔদ্ধত্যের নিদর্শন। অর্থ বিহীন কথার জালে সাজিয়ে তিনি যা স্থাপন করেছেন তা প্রলাপের সমস্থানীয়। তা কেবল উন্মাদ-আশ্রয়েই শোভা পায়।[১] আপাতদৃষ্টিতেই বোঝা যায় এই মন্তব্য একদেশদর্শী মনোভাব প্রণোদিত। হেগেল যে এককালে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন তার একটা কারণ নিশ্চিত ছিল। এমনকি বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয় বিবেচনা করেও তাঁর দর্শনের স্থাপনার সুখ্যাতি করেছেন।[২]

আপাতদৃষ্টিতে তাঁর দর্শনের কয়েকটি বিষয় আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করে পারে না। একটি বিশেষ দর্শনের এমন ব্যাপকতা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। তা তাঁর মানসিক ক্ষমতার অসাধারণত্ব অনায়াসে প্রমাণ করে। তাঁর ধীশক্তি যে অনন্য সাধারণ ছিল তা স্বীকার করতেই হয়। এই ব্যাপকতার দিক থেকে তাঁর তুলনা চলে কেবল আর একজন দার্শনিকের সঙ্গে। দশ খণ্ডে সমাপ্ত স্পেনসার-এর সমন্বয়ী দর্শনের[৩] সহিত ব্যাপকতায় তাঁর দর্শনের তুলনা চলে। দ্বিতীয় কথা তাঁর ত্রিভঙ্গী নয়ের মধ্যে এমন একটি তত্ত্ব আছে যার আংশিক সত্যতা অনস্বীকার্য। এই তত্ত্বের মূল কথা হল বিরোধের সমন্বয়েব ভিতর দিয়েই সত্যের অন্বেষণের পথে চিন্তাব বিকাশ হয়। অবশ্য তিনি যে ভাবে তার ব্যবহার করেছিলেন তা ঠিক যুক্তি সম্মত নয়। চিন্তা মুক্ত পথে অগ্রসর হতে ভালবাসে। তাকে একেবারে ছকে সাজিয়ে স্থাপন করা যায় না। তা করতে গেলে অনেক সময় যুক্তির বা তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। তাঁর ইতিহাসের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থে এই চেষ্টা অনেক সময় তাঁকে উপহাসাস্পদ সিদ্ধান্তে টেনে নিয়ে গেছে। তা এতই সহজে চোখে পড়ে যে তার উদাহরণ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। তবু সাধারণভাবে একথা সত্য, যে দর্শনের বিষয়বস্তু এমন ব্যাপক এবং বিচিত্র যে সমন্বয়ের পথেই নির্ভরযোগ্য দার্শনিক

১ "But the height of audacity in serving up pure non-sense in stringing together, senseless and extravagant mazes of words such as had previously been known only in mad-houses was finally reached in Hegel."

Caird, Hegel, Introduction

২ History of Western Philosophy, BR. III Chap. XXII

৩ Synthetic Philosophy

তত্ত্ব পাওয়া যায়। স্বভাবতই বিষয়ের বিরাটত্ব হেতু প্রাথমিক চেষ্টায় দার্শনিক মত একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে তার বিপরীত মতকে প্রত্যাখ্যান না করে তার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হতেই পূর্ণতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। তাঁর ত্রিভঙ্গী নয় এই মূল নীতির উপর স্থাপিত। সুতরাং তার মধ্যে এই নীতির স্বীকৃতি আমরা পাই।

হেগেল-এর দর্শনের মূল দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিশ্বে তিনি চেতন পদার্থ ছাড়া অন্য কোন প্রকৃতির পদার্থের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। এই পদার্থ এখানে বিশুদ্ধ চিন্তার রূপ নিয়েছে। কেবল এই তত্ত্বের সাহায্যেই তিনি বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। বিশ্বের মধ্যে যে একটি বিকাশ ক্রিয়া চলেছে তা তিনি স্বীকার করেন। তিনি প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, মানুষের মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এমন কি মানুষের ইতিহাসও স্বীকার করেন। সকল ক্ষেত্রেই ক্রিয়া চলছে, অবস্থা হতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। তার নিয়ামক শক্তি কি? তিনি বলেন তা হল চিন্তার নিজস্ব নিয়ম।[১] চিন্তার নিজস্ব নিয়ামক শক্তিই এখানে ক্রিয়াশীল, অন্য দ্বিতীয় শক্তি নেই। তাঁর এই প্রতিপাদ্য যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায় না। বিশ্বের মধ্যে যে চিন্তাশক্তির অতিরিক্তভাবে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল, তার পরিচয় আমরা নানাভাবে পাই। মানুষ শুধু চিন্তা করে না, কর্মও করে। তার চিন্তাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মে, কিন্তু তার কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। ইচ্ছাশক্তি কোন পথে যাবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চিন্তাশক্তি তার সাহায্য করতে পারে, কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে তা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে বিশ্বের মধ্যেও একটি ইচ্ছাশক্তির সক্রিয় উপস্থিতির আমরা প্রমাণ পাই। জড়শক্তির মধ্যে তা ক্রিয়াশীল কিনা, তা হয়ত বিতর্কের বিষয় হতে পারে; কিন্তু জৈব শক্তির ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি অনস্বীকার্য। সেখানেও পথের নির্দেশনায় যুক্তিসম্মত চিন্তার প্রয়োগ ক্ষেত্র থাকতে পারে; কিন্তু যে শক্তি এখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তা একটি ইচ্ছাধর্মী শক্তি। কেবল বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা তাই করা যায় না। তার বিশেষ ক্ষেত্র চিন্তার রাজ্যে। তা ব্যক্তি-আশ্রিত চিন্তা হতে পারে এবং বিশ্বের অন্তর্নিহিত নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাও হতে পারে।

১ Laws of Thought

(৪)

দ্বৈতবাদী দর্শন

উপরে বিশ্বের প্রকৃতি কি, এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় আমরা দুটি বিপরীতধর্মী দার্শনিক মতের আলোচনা করেছি। একটির প্রতিপাদ্য হল বিশ্ব জড়ধর্মী এবং অপরটির প্রতিপাদ্য হল বিশ্ব চৈতন্যধর্মী। উভয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ দর্শনগুলির আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে উভয় শ্রেণীর দর্শনই একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই বিস্তারিত আলোচনা হতে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে বিশ্বে দুটি বিপরীতধর্মী সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের একটি জড় প্রকৃতির, অপরটি চৈতন্য প্রকৃতির। তার অতিরিক্ত মীমাংসা এখানে করা যায় না। তবে এ বিষয় একরকম স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে একটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং অপরটির ওপর নির্ভর করে বিশ্বের প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমাদের এই মন্তব্যের সমর্থনে জীনস্-এর একটি উক্তির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মূল্য বাড়ে এই কারণে যে আমরা জানি যে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনি চৈতন্যবাদী দর্শনের চিন্তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। আমরা বলে থাকি যে বহির্বিশ্ব হতে ইন্দ্রিয়গুলি কিছু বার্তা বহন করে আনে এবং তারপর মানুষের মন তাকে রঞ্জিত করে তাকে যেমনটি দেখে তেমন ভাবে তাকে গড়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেন মানুষেরই চেতনার রঙে পান্না হয় সবুজ আর চুণী হয় লাল। অর্থাৎ তার তাৎপর্য হল মনের বাহিরের বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্ভবত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না, কাজেই যে রূপে আমরা তাকে দেখি তা খানিকটা মনেরই সৃষ্টি। এই অবস্থা হতেই মন-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করবার একটা আকৃতি দার্শনিকের মনে জাগে। তার প্রতিবাদেই জীনস্ তার মন্তব্যটি করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে মানুষ যখন একটি রাঙা রঙের ফুল দেখে, তখন সেই অনুভূতি মনের বাহিরে অবস্থিত ফুল কতখানি নিয়ন্ত্রিত করে তা বিতর্কের বিষয় হলেও, দেখা যায় যে সেই ফুল ফটোগ্রাফের যন্ত্রেও মনের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ লাল রঙ উৎপাদন করতে পারে।[১] তা প্রমাণ করে মন-নিরপেক্ষভাবে ও বহির্জগতে সত্তা থাকতে পারে।

১ "Whatever capacity a red flower may have for producing a sensation of

সুতরাং আমাদের আলোচনা এমন একটি অবস্থায় এসেছে যখন আমাদের কাজ হবে ঠিক করা যে এই দুই বিপরীতধর্মী দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় কিনা। এখানে দুটি সম্ভাবনা আছে। প্রথম, তাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন সম্ভব নয়, এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। তখন দুটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বলতে হবে যে বিশ্ব অংশত জড় প্রকৃতির এবং অংশত চৈতন্য প্রকৃতির। আর একটি সিদ্ধান্ত হতে পারে যে তাদের সমন্বয় সম্ভব। তা হলে চিন্তা ভিন্ন পথে চলে যাবে। সে বিষয়টি আলোচনা করবার আগে আমরা প্রথম সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে দর্শনগুলি গড়ে উঠেছে তাদের আলোচনা করতে পারি। এখন আমাদের সেই বিষয়টিরই বিশেষ আলোচনা হবে। যে দর্শনগুলি এইভাবে জড়বাদ ও চৈতন্যবাদের সহাবস্থিতি স্বীকার করে গড়ে ওঠে তাদের আমরা দ্বৈতবাদী দর্শন বলতে পারি ; কারণ তারা জড় সত্তা ও চেতন সত্তা উভয়েরই যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই প্রসঙ্গে জৈন দর্শন, ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, দেকার্ত-এর দর্শন এবং বের্গসঁ-এর দর্শন আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে।

জৈন দর্শন সম্পর্কে ইতিমধ্যে কিছু আলোচনা হয়েছে। তা বিশ্বতত্ত্বের প্রথম সমস্যা অর্থাৎ বিশ্বের গঠনপ্রকৃতি কিরূপ তাতে সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে জৈন দর্শনের অতিরিক্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিশ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে অর্থাৎ বিশ্বের প্রকৃতি কি, এই প্রসঙ্গে। তার উত্তরে জৈন দর্শন বলে বিশ্বের প্রকৃতি আংশিকভাবে জড় এবং আংশিক ভাবে চেতন। জৈন দর্শনে পদার্থগুলি যেভাবে বিশ্লেষণ হয়েছে তা হতে এই উত্তরটি এসে পড়ে। আমরা যাকে পদার্থ বলি জৈন দর্শন তাকে দ্রব্য বলে।

জৈন দর্শনে এই দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ নির্দিষ্ট হয়েছে এইভাবে। সকল দ্রব্য দুটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : অস্তিকায় ও অনস্তিকায়। অনস্তিকায় দ্রব্য একটি। তা হল কাল। অস্তিকায় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত দুটি শ্রেণী আছে : জীব ও অজীব। অজীব শ্রেণীতে আসে ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল। বোঝাই যায় জৈন দর্শনে দ্রব্য অর্থে যা সাধারণত বোঝা যায়, তা সূচিত

redness in a man's mind, it also has a capacity for reflecting red light whether there is one to see it or not, as may be very simply proved by photography."

Physics and Philosophy, Some problems of Philosophy.

হয় নি। অজীব দ্রব্যের যদি কায় থাকে তা হলে ধর্ম ও অধর্ম রূপ মানসিক ধারণার কি করে কায় থাকে বোঝা যায় না। আকাশের কায় আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। নিউটনও এইরূপ ধারণা পোষণ করতেন মনে হয়। পুদ্গল অর্থে অজীব পদার্থ বলতে যা বুঝি তাই বোঝায়। যা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায়, যেমন ইন্দ্রিয়গুলি, বিভিন্ন শ্রেণীর শরীর, জীবদেহ, কর্ম ইত্যাদি দিয়ে, যার মূর্ত রূপ আছে, তাই হল পুদ্গল।[১] অর্থাৎ যার বাস্তব রূপ আছে এবং জড়ধর্মী তা এই শ্রেণীতে পড়ে। আমরা যাকে জড় পদার্থ বলি পুদ্গল তাই বোঝায়। কর্মকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বোধ হয় এই কারণে যে কর্মের মধ্য দিয়েও নানা পুদ্গলের সহিত পরিচয় ঘটে।

জীবশ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে দুটি উপশ্রেণী স্থাপন করা হয়েছে: স্থাবর এবং ত্রস বা গতিশীল। স্থাবর জীবের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও বৃক্ষ। উদ্ভিদকে নিশ্চয় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়; কিন্তু পৃথিবী জল অগ্নি ও বায়ুকে করার খুব যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বলা হয়েছে এদের মাত্র ত্বক ইন্দ্রিয় আছে এবং অন্যের দ্বারা স্পৃষ্ট হবার চেতনা আছে। মনে হয় স্পর্শ করলে পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নির মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বলেই তাদের প্রাণী বলে কল্পনা করা হয়েছে। মাটিতে পা ঠুকলে মাটি কেঁপে ওঠে, আগুনে কিছু ঠেকালে তার শিখা কম্পিত হয়, জলে বা বাতাসে কোন দ্রব্য নাড়ালে তার মধ্যে প্রবাহ আসে। এই ধরনের একটি যুক্তি সম্ভবত এর পেছনে ছিল। গতিশীল জীবের মধ্যে পড়ে মানুষকে নিয়ে সকল জীব। তাদের দুই হতে পাঁচটি পর্যন্ত ইন্দ্রিয় আছে। জীব বা আত্মা জৈন দর্শনের মতে চেতন দ্রব্য। চেতনা এর স্বরূপগত ধর্ম এবং সর্বদা এর মধ্যে ক্রিয়াশীল।

সুতরাং উপরের বিশ্লেষণ হতে জৈন দর্শনে আমরা দুই বিভিন্ন শ্রেণীর সত্তা পাই। একটি চেতনধর্মী ও অপরটি অচেতনধর্মী। অচেতনধর্মী দ্রব্যের মূল রূপ হল পুদ্গল এবং চেতনধর্মী দ্রব্যের সাধারণ রূপ হল দেহধারী জীব। সুতরাং জৈন দর্শনে একটি দ্বৈতবাদ এসে পড়ে। বিশ্বের প্রকৃতি কি, তা জড়ধর্মী না চৈতন্যধর্মী, তার উত্তরে এই দর্শন বলে বিশ্ব অংশত জড়ধর্মী এবং অংশত চৈতন্যধর্মী।

১ পঞ্চাস্তিকায় সময় সার ৮৯

ন্যায় ও বৈশেষিক যুগ্ম দর্শন। তাদের মধ্যে ন্যায়দর্শনে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে জ্ঞানবিষয়ক তত্ত্ব, আর বৈশেষিক দর্শনে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে সত্তা বিষয়ক তত্ত্ব। সুতরাং আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনে আলোচনাই বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

বৈশেষিক দর্শনের মূল তত্ত্ব হল দ্রব্য পদার্থ। তার তালিকায় দ্রব্য পদার্থ নয়টি। তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি পদার্থ নিয়ে পঞ্চ মহাভূত; কাল ও দিক নিয়ে অপ্রত্যক্ষ পদার্থ; এবং আত্মা ও মন নিয়ে চৈতন্যধর্মী পদার্থ। যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণ আছে তাই ভূত। পৃথিবীর বিশেষরূপে গ্রাহ্য গুণ হল গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ এবং আকাশের গুণ শব্দ। সেকালে জানা ছিল না যে বায়ুতরঙ্গ হতেই শব্দের উৎপত্তি; মহাকাশে শব্দ হয় না, কারণ সেখানে বায়ু নেই। এইভাবে জোর করে তাকে পঞ্চমহাভূতের অন্যতম করায় একটি অসঙ্গতি এসে পড়েছে। অন্য মহাভূতের যেমন পরিমাণ আছে এবং একটি বাহ্যিক রূপ আছে, আকাশের তা নেই। তাকে যেন জোর করে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে দিক ও কাল। সুতরাং তাদের বাস্তব সত্তা এখানে স্বীকৃত। দিক ও কাল নিত্য এবং সর্বগত, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বলে তার অস্তিত্ব অনুমান সাপেক্ষ।

শেষ শ্রেণীতে পড়ে আত্মা এবং মন। মনকে আত্মা হতে পৃথক করবার একটি কারণ বৈশেষিক দর্শনে অনুভূত হয়েছে। আত্মা নিত্য, বিভু এবং সর্বব্যাপী, তা চৈতন্য প্রকৃতির। মন ও নিত্য, কিন্তু সূক্ষ্ম এবং অণু পরিমাণ। বহির্জগতের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হতেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা হয়েছে মনের বাহিরে বিশ্বে বহু বস্তু এক সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, কিন্তু তাদের সবগুলির ইন্দ্রিয়ানুভূতি একসঙ্গে হয় না; যার প্রতি মনঃ সংযোগ হয় শুধু তাকেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি। সুতরাং অনুমান করা হয় শুধু জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞাতার সন্নিকর্ষ হতে নয়, তাদের সহিত একটি সহকারী কারণ বর্তমান না থাকলে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মনকে সেই সহকারী কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে। সুতরাং আমরা মনোবিজ্ঞানে যাকে মনোযোগ ক্রিয়া[১] বলি মন বলতে এখানে তাই বোঝায়। তাকে বৈশেষিক দর্শনে একটি অতিরিক্ত পদার্থের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

১ Attention

বৈশেষিক দর্শনে বিশ্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হতে এই সিদ্ধান্ত আসে, যে তা বর্তমান প্রশ্ন সম্বন্ধে এই মত পোষণ করে, যে বিশ্ব অংশত জড় প্রকৃতির এবং অংশত চেতন প্রকৃতির। এই দর্শনে যে নয়টি দ্রব্য পদার্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের এই ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ না করে, দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি শ্রেণীতে পড়ে দিক ও কাল সমেত সাতটি জড়-ধর্মী পদার্থ এবং অন্য শ্রেণীতে পড়ে দুটি চৈতন্যধর্মী পদার্থ—আত্মা ও মন।

দেকার্ত তিনটি মৌলিক সত্তার সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছেন। এই সত্তাগুলিকে তিনি দ্রব্য[১] বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ধারণার দ্রব্য তাই যা স্বয়ং-নির্ভর, যা নিজের অস্তিত্বের জন্য অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই অর্থে কেবল ঈশ্বরই একমাত্র প্রকৃত দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারেন। তাই দেকার্ত-এর দর্শনে তিনি সর্বাগ্রে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি আরও দুটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তারা হল জড় পদার্থ এবং মন। তারাও এক রকম স্বয়ং নির্ভর এবং বিভিন্ন গুণের আধার। জড়পদার্থের গুণ ও ক্রিয়ার সাহায্যে সমগ্র মন-বহির্ভূত বাস্তব জগতের ব্যাখ্যা করা যায়। জড়ের গুণ হল ব্যাপ্তি।[২] বহির্বিশ্বে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই স্থানে অবস্থিত। জড় সত্তার রূপ পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য তার গতির[৩] ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপ ভাবে চেতন দ্রব্যের গুণ হল চেতনা। সকল চৈতন্যধর্মী সত্তার তিনি ব্যাখ্যা করেছেন চেতনারই বিভিন্নভাবে প্রকাশের[৪] ভিত্তিতে। তাঁর ধারণায় এই দুটি দ্রব্য পরস্পর বিপরীত-ধর্মী হলেও তারা পরস্পরের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাঁর ধারণা মানুষের মস্তিষ্কে যে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড আছে তার মাধ্যমে দেহের সঙ্গে মনের প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। তা যেন ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে তা অবস্থিত বলেই তিনি এইরূপ অনুমান করেছিলেন। কিন্তু তা চিন্তাকার্যে সাহায্য করে না। তার ভূমিকা স্বতন্ত্র। অপরপক্ষে দেহ ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞান ঠিক গ্রহণ করেনি। কারণ তার ধারণা বিপরীত প্রকৃতির পদার্থের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আরোপ করা যায় না। সে যাই হক, এইভাবে দেকার্ত-এর দর্শনে বিশ্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সত্তার সাহায্যে। তাদের একটি জড়ধর্মী এবং অপরটি চৈতন্যধর্মী।

১ 'Substance ২ Extension ৩ Motion ৪ Modes of Thought

পাশ্চাত্য দর্শনে দেকার্ত-এর ভূমিকা অনন্যসাধারণ। তাঁর প্রবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করেই পশ্চিমের দর্শনে স্বাধীন চিন্তার পথে অগ্রসর হয়ে নানা বিচিত্র তত্ত্বের সমাবেশ ঘটেছে। তাই তাঁকে পাশ্চাত্য দর্শনের বর্তমান যুগের পথিকৃৎ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর উপরের সিদ্ধান্ত কিভাবে তাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অতিরিক্তভাবে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁর নিজের উক্তি দ্বারা সমর্থিত হবে।

তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন যে কোন বিষয় একেবারে নিশ্চিত না হয়ে তাকে সত্য বলে তিনি গ্রহণ করবেন না।[১] কাজেই অন্যের মতের ওপর নির্ভর না করে, তিনি সকল বিষয় নিজের জ্ঞানের আলোকে অনুসন্ধান করে দেখলেন, এমন কোন তথ্য তিনি পান কিনা যার সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যে তা সত্যই আছে। এইভাবে সব কিছু অবিশ্বাস করে করে তিনি শেষে একটি স্থানে পৌঁছালেন যেখানে তিনি নির্ভরযোগ্য অবলম্বন পেতে পারেন। তা হল তাঁর নিজের অস্তিত্ব। তিনি বললেন, তিনি চিন্তা করেন, কাজেই প্রমাণ হয় তাঁর অস্তিত্ব আছে, এই তথ্যটি এমন নির্ভরযোগ্য যাকে কোন সন্দেহই বিচলিত করতে পারে না।[২] কাজেই তাকেই তিনি তাঁর দর্শনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেন।

এই ভিত্তি হতেই তিনি তাঁর দর্শনের দুটি মূল স্তম্ভকে পেলেন। তার একটি হল তাঁর মন এবং অপরটি হল তাঁর দেহ। তিনি যে 'আমিকে' নিজের মধ্যে আবিষ্কার করলেন, এই দুটি তত্ত্ব তার বিভিন্ন অংশ। তাই তিনি বলছেন, তিনি চিন্তা করেন, কাজেই তিনি আছেন, এই উপলব্ধি হতে তিনি এই অতিরিক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে তিনি একটি পদার্থ।[৩] এই ভাবেই তাঁর দর্শনের দুটি মৌলিক তত্ত্ব এসে পড়ে।

১ "The first precept was never to accept anything for true which I did not clearly known to be such." Discourse on Method, II

২ "As I observed that this truth I, think hence I am, so certain and of such evidence, that no ground of doubt however extravagant, could be alleged by the sceptics capable of shaking it, I concluded that I might without scruple accept as the first principle." Discourse on Method, III

৩ "I thence concluded that I was a substance whose soul, essence or nature consists only in thinking...... ; so that, I, that is to say the mind by which I am what I am, is wholly distinct from the body".

Discourse on Method, III

বের্গসঁ-এর দ্বৈতবাদী দর্শনে একটি নূতন সুর পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রকাশ যে রঙ্গমঞ্চে বিধৃত, তা আপাতদৃষ্টিতে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির উপাদানে গঠিত। তাদের একটি হল স্থান এবং অপরটি হল কাল। স্থানে তা অবস্থিত এবং কালে তা প্রবাহিত। অবশ্য আইনস্টাইন তাদের সংযুক্ত করে একটি যুগ্ম তত্ত্বে পরিণত করেছেন। বের্গসঁ-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থান স্বীকৃত, কিন্তু পটভূমি হিসাবে স্থান হতে কালের ভূমিকা আরও মৌলিক; কারণ তিনি বিশ্বকে অচঞ্চল সত্তা রূপে দেখেন নি, তিনি তাকে গতিশীল রূপে উপলব্ধি করেছেন।

তাই তাঁর ধারণায় বিশ্বরচনায় কালের ভূমিকা মুখ্য। এই কালকে অবলম্বন করেই বিশ্ব গড়ে উঠেছে। যেমন স্থানকে অবলম্বন করে বস্তুর অবস্থিতি, তেমন কালকে অবলম্বন করে সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রকাশ। বিশ্ব স্থিতিশীল নয়, বিশ্ব অবিরত হয়ে চলেছে। অতীত হতে বর্তমান, বর্তমান হতে ভবিষ্যতে তার অবিরাম গতি। বিশ্ব শুধু নিত্য অপস্রিয়মান বর্তমানে সীমাবদ্ধ নয়। অতীত বর্তমানে বিধৃত এবং বর্তমান অতীতরূপে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। চলার পথে বিশ্ব তার অতীতকে সঞ্চয় হিসাবে বহন করে নিয়ে চলেছে। তাঁর এই তত্ত্বকে তিনি কালস্থিতি[১] বলেছেন। আমরা কালকে একটি প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করি। তাঁর প্রবর্তিত কাল-স্থিতি পারিভাষিক শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কালের প্রবাহকে অবলম্বন করে বিশ্বের গতিশীল রূপ যেভাবে গড়ে উঠছে তাকেই তিনি সূচিত করেছেন। তিনি বলেন এই কাল-স্থিতি হল অতীতের ভবিষ্যতের দিকে অব্যাহত প্রগতি, তা যেমন অগ্রসর হয় তেমন স্ফীতিলাভ করে।[২] তার অর্থ হল এই যে অতীত ধ্বংস হয়ে যায় না, তা বর্তমানের সঙ্গে পথের সঞ্চয়ের মত বাহিত হয়ে থাকে।

এই কালস্থিতি দুটি উপাদান দিয়ে গঠিত। একটি হল জড়শক্তি। তা স্থূল, তা সক্রিয়, তার স্থানে অবস্থিতি আছে। অপরটি হল প্রাণশক্তি, ধী শক্তি[৩] তার হাতিয়ার। এই ধীশক্তি কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বের্গসঁ-এর পরিকল্পনায় তা সকল শ্রেণীর জীবের মধ্যেই বর্তমান। এমন কি

১ Duration

২ "Durations is the continuous progress of the past which gnaws into the future and which swells as it advances."

৩ Conciousness — Creative Evolution, Introduction

নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে যেখানে পৃথক স্নায়বিক বিন্যাস নেই, তাতেও এই ধীশক্তি ক্রিয়াশীল। যেখানে প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল, সেখানেই ধীশক্তি বর্তমান।[১]

প্রাণশক্তি জড়শক্তিকে ব্যবহার করে নিজের বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। এই চেষ্টা হতেই বিশ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। জড়শক্তি খানিকটা প্রতিকূল। তাই প্রাণশক্তির বিকাশ জটিল পথে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং ক্রমবিকাশ সৃষ্টিধর্মী। জড়শক্তির প্রতিকূলতা হেতু প্রাণশক্তির বিকাশ বহু ও বিচিত্ররূপে প্রকট। এইভাবে বিকাশের পথে প্রাণশক্তির তিনটি বিশেষ রূপ লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদের মধ্যে তা জড়ের প্রভাবে অভিভূত হয়ে, জড়েরই মত একটি দীর্ঘকালস্থায়ী স্থিতিশীল রূপ পায়। আর এক পথে তার ধীশক্তি সক্রিয় না থেকে কতকগুলি বৃত্তিরূপে পরিণত হয়ে জীবের জীবনযাত্রাকে সংরক্ষিত করে মাত্র। মৌমাছি বা পিপীলিকার সমাজ তার উদাহরণ। মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীবে ধীশক্তি নিজের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবার সুযোগ পায়। তাই সেখানেই প্রাণশক্তির পরিপূর্ণ রূপটি প্রকট হয়।

সুতরাং বিশ্বনাট্যে দুটি চরিত্র অভিনয় করে। তাদের একটি হল প্রাণশক্তি এবং অপরটি হল জড়শক্তি। জড়শক্তির ভূমিকা গৌণ। প্রাণশক্তিই এখানে নায়ক। তাকেই বের্গসঁ 'এলাঁ ভিতাল'[২] নাম দিয়ে বিশ্বের মূলতত্ত্ব রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এদের নিয়ে অভিনয়-পরম্পরার মত বিশ্বপ্রবাহ গঠিত। তবে তাকে প্রবাহ বললে ঠিক বলা হবে না। কারণ, প্রবাহের মধ্যে সঞ্চয় নেই। এখানে কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে অতীত অব্যাহতভাবে সংযুক্ত হচ্ছে। বের্গসঁ তাই বলেন, মানুষের স্মরণ-ক্রিয়ার মধ্যেই বিশ্বপ্রবাহের প্রকৃত রূপটি প্রকট হয়। এখানে যেমন বর্তমান অনুভূতির সহিত অতীতের স্মৃতি জড়িত থাকে, তেমন বিশ্বধারার মধ্যেও অতীত সঞ্চিত থাকে। তার প্রকৃত রূপটির পরিচয় দেবার জন্য তাই বের্গসঁ দুটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। তুষারের ওপর গড়িয়ে দিলে তুষার পিণ্ড চলার পথে তুষার কণা সঞ্চয় করে আকারে বড় হতে থাকে। তার সঙ্গে বিশ্বপ্রবাহের তিনি তুলনা করেছেন। আর একটি উপমা হল এই : ছড়িয়ে রাখা সুতো যদি গুটিয়ে নেওয়া যায়, পেছনের

১ "Theoretically then everything living is conscious. In principle consciousness is co-extensive with life." Mind-Energy, Introduction

২ Elan Vital

অংশ সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। তাঁর মতে এর সঙ্গেও বিশ্বপ্রবাহের তুলনা চলে। আমার ধারণা তাঁতে কাপড় বোনার সঙ্গে বের্গসঁ কল্পিত বিশ্বধারার আরও ভাল তুলনা চলে। তাঁতে টানার ওপর পোড়েন টেনে বোনার কাজ এগিয়ে চলে। টানা যেন স্থান, পোড়েন যেন কাল। উভয়কে অবলম্বন করে কাপড় যেমন রূপ নেয় তেমন বোনা অংশ পেছনে গুটিয়ে রাখা হয়।

সুতরাং বের্গসঁ-দর্শনে আমরা দুটি বিভিন্নধর্মী সত্তার সমাবেশ পাই। তাদের একটি সক্রিয়, অপরটি অক্রিয়। প্রথমটি প্রাণশক্তি, দ্বিতীয়টি জড়শক্তি। জড়শক্তি প্রাণশক্তির আংশিকভাবে অনুকূল, সম্পূর্ণভাবে নয়। তার আনুকূল্যকে ব্যবহার করে প্রাণশক্তি আত্মবিকাশের পথ পরিষ্কার করে নেয়। এইভাবেই বিশ্বে প্রাণধারার বিকাশ ঘটে। জড়শক্তি ও প্রাণশক্তি ভিন্ন প্রকৃতির। জড় সক্রিয় নয়, তার স্মরণশক্তি নেই, তার মধ্যে বহুকে একত্বের সূত্রে গ্রথিত করবার শক্তি নেই। অপর পক্ষে প্রাণশক্তি স্বভাবতই মুক্ত এবং সক্রিয়। তার স্মরণ-শক্তি আছে। তার বিস্তারের তীব্র আকূতি তাকে বিকাশের পথে নিত্য গতিশীল করে তোলে। এই প্রাণশক্তি নিত্য গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল হলেও, তার স্মরণশক্তি অতীতকে কৃপণের সঞ্চয়ের মত সঙ্গে নিয়ে চলে। ভবিষ্যতে যা নূতন সৃষ্টি করবে তাও তার স্মৃতির পটে অঙ্কিত করে রাখবে।

বের্গসঁ-দর্শনে যেটি মূল্যবান কথা তা সম্ভবত এই যে তা বিশ্বের গতিশীলতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা বিশ্বের স্থিতিশীল রূপের দ্বারা এত প্রভাবান্বিত যে তার এই রূপটি সাধারণত নজরে পড়ে না। এ বিষয় বুদ্ধের দর্শনের সঙ্গে তার তুলনা চলে। কিন্তু মনে হয় তাঁর পরিকল্পিত কাল-স্থিতির[১] যে রূপ চিত্রিত হয়েছে তা কষ্টকল্পিত। বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় তা দেয় না। বিশ্ব যে একটি গতিশীল প্রবাহ তা সর্বথা স্বীকার্য, কিন্তু তা যে কৃপণের মত অতীতকে সঞ্চয় করে চলে তা বলা যায় না। এমন কি মানুষের স্মরণশক্তির মধ্যেও তা ঠিক ঘটে না। স্মরণশক্তি মানুষকে জানতে চিনতে সাহায্য করে। তা ব্যবহারিক কাজে লাগে বলেই তা সঞ্চিত হয়। মানুষ যেমন মনে রাখে তেমন ভোলেও। যখন যে কাজ করে তাতে যা কাজে লাগে তার স্মৃতি উজ্জ্বল থাকে। যখন অন্য কাজে যায় তখন তার স্মৃতি চলে যায়। প্রকৃতির মধ্যেও অতীত যে ক্রিয়াশীল থাকে তাও

১ Duration

লক্ষ্য করা যায়। তার প্রভাব যতক্ষণ বর্তমান থাকে ততক্ষণ তা ক্রিয়াশীল থাকে। কালের ব্যবধানে ক্রমশ তা শিথিল হয়ে যায় কিম্বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় একরকম নষ্ট হয়ে যায়। ভূমিকম্পে যদি একটি দ্বীপ উড়ে যায় তার অতীত এক রকম লুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং অতীতের পরিপূর্ণ সঞ্চয় বর্তমানের ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়, এটি গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব নয়।

(৫)

সমন্বয়বাদী দর্শন

দ্বৈতবাদী দর্শনগুলি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে জড়প্রকৃতির সত্তা এবং চৈতন্যপ্রকৃতির সত্তা এমন বিপরীতধর্মী যে তাদের সমন্বয় সাধন করা যায় না। অথচ তাদের কোনটিকে বিশ্বের ব্যাখ্যায় বর্জন করাও যায় না, কারণ উভয় প্রকার সত্তাই বিশ্বের উপাদান। সেই কারণে এই শ্রেণীর দর্শন এই দুই প্রকৃতির সত্তার সহাবস্থিতির ভিত্তিতে বিশ্বের প্রকৃতির ব্যাখ্যা করে। তার প্রতিপাদ্য হল বিশ্ব অংশত জড়প্রকৃতির এবং অংশত চেতনা প্রকৃতির। এইখানে গিয়েই তারা থেমে যায়। তাদের বৈশিষ্ট্য হল তারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে উভয় প্রকৃতির সত্তার দাবী স্বীকার করে। এইরূপে পরোক্ষভাবে তারা দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের সম্ভাবনার পথ খুলে দেয়।

বর্তমান প্রশ্ন সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা তাই এইখানেই থেমে যায় নি, আরও অগ্রসর হয়েছে। তা জড়প্রকৃতির সত্তা ও চেতনপ্রকৃতির সত্তার দাবীর সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে একটি মীমাংসার সন্ধান করে। তা দ্বৈতবাদী দর্শনের মত শুধু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয় না, দুটি পরস্পর বিরোধী দার্শনিক তত্ত্বকে একটি ঐক্য সূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করে। ঐক্য সূত্রে উভয়কে বাঁধা দুভাবে সম্ভব হতে পারে। প্রথমত একই বস্তুর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশরূপে তাকে দেখানো যেতে পারে। এই পথে দুজন মনীষী উভয়ের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা হলেন স্পিনোজা ও পাউলসেন। উভয়েই সমন্বয়ের পথে সর্বেশ্বরবাদের দিকে এগিয়ে গেছেন; তবে বিভিন্ন ভাবে। স্পিনোজা জড় ও চেতনধর্মকে ঈশ্বরের দুটি পৃথক সম্বন্ধহীন গুণ[১] বলে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরই মৌলিক সত্তা[২]। তাঁর বহু গুণ সম্ভব। তাদের মধ্যে

১ Attribute ২ Substance

দুটি হল ব্যাপ্তি এবং চেতনা। প্রথমটিকে অবলম্বন করে জড়বস্তুর প্রকাশ এবং দ্বিতীয়টিকে অবলম্বন করে চেতন সত্তার প্রকাশ। পাউলসেন একটু ভিন্ন পথে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বিশ্বের সকল সত্তার মধ্যে দুটি দিক আছে। একটি হল জড়ের দিক এবং অপরটি হল চৈতন্যের দিক। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মধ্যে তাদের সহাবস্থিতি প্রত্যক্ষ; কিন্তু অতিরিক্তভাবে যা শুধু জড় বলে মনে হয় তার মধ্যেও চৈতন্য বর্তমান আছে, তিনি এইরূপ অনুমান করেন। এইভাবে সমস্ত বিশ্বে সকল স্তরে জড় ও চেতনের সহাবস্থিতি ঘটে। তাঁর দর্শনের তাই তিনি সর্বচেতনাবাদ[১] নাম দিয়েছেন।

দ্বিতীয় যে পথে ঐক্যসাধনের চেষ্টা হয়েছে তা হল ভিন্ন প্রকৃতির। তাতে দেখানো হয়েছে যে জড় ও চৈতন্যকে আমরা যতখানি বিপরীতধর্মী বলে ভাবি তারা ততখানি বিপরীতধর্মী নয়। আধুনিক বিজ্ঞানে জড়প্রকৃতির যে ব্যাখ্যা পাই তাতে তার জড়ত্ব বিশেষ অবশিষ্ট থাকে না। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির মধ্যেও একটি ধীশক্তির প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব সূচিত হয়। সেই ধীশক্তি মানুষের চিন্তায়ও ক্রিয়াশীল। এই কারণে কোন কোন দার্শনিক জড় ও চেতন প্রকৃতির সত্তার উৎপত্তি একটি তৃতীয় নিরপেক্ষ প্রকৃতির সত্তা হতে উদ্ভূত হয়েছে বলে অনুমান করেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন জেমস জীনস, এডিংটন এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে প্রথম দুজন ততটা দার্শনিক নয় যতটা বৈজ্ঞানিক। তা সত্ত্বেও তাঁরা দার্শনিক হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য, কারণ বিশুদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনা দর্শনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য।

এই মতগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তায় যে সব নূতন বিস্ময়কর তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে তাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে প্রাচীন উপনিষদে কেবল ধীশক্তির ওপর নির্ভর করে প্রাচীন কালের মনীষী অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মাণ্ডূক্য উপনিষদে যে তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে বর্তমান আলোচনায় তা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

আমরা এখন একে একে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন দার্শনিক মতগুলির আলোচনা করব। যে পর্যায়ক্রমে উপরে এই মতগুলির উল্লেখ হয়েছে সেই পর্যায়েই এই বিভিন্ন দর্শনগুলি আলোচিত হবে। সুতরাং প্রথমেই স্পিনোজার দর্শন আমাদের আলোচনার বিষয় হবে।

১ Panpsychism

মনে হয় স্পিনোজার দর্শন দেকার্ত-এর দর্শনেরই পরিণত রূপ। আবশ্যিক জ্ঞানের[১] ওপর তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তাই জ্যামিতির অনুসরণে যেন তিনি তাঁর দর্শনখানি গড়ে তুলেছেন। বিশ্বের ব্যাখ্যায় দেকার্ত তিনটি তত্ত্বের ব্যবহার করেছিলেন: ঈশ্বর, জড়দেহ এবং মন। তাঁর মতে তিনটিই মৌলিক সত্তা[২]; তবে ঈশ্বর মৌলিকতর। তিনি তাদের পরস্পর পৃথক রূপে পরিকল্পনা করেছিলেন। সুতরাং তিনি দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুবাদী। স্পিনোজা কিন্তু তিনটিকেই একসঙ্গে মৌলিক সত্তার মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর ধারণায় ঈশ্বরের ভূমিকা সবার উপর। সুতরাং তিনিই একমাত্র মৌলিক সত্তা। কাজেই জড়ত্ব ও চেতনা তাঁর বহু সম্ভাব্যগুণের মধ্যে দুটি। এই দুটি গুণের সাহায্যেই তিনি বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছেন। এই গুণদুটির বিকার[৩] বা পরিবর্তিত রূপ হতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের উৎপত্তি হয়। মৃত্তিকার বিকার হতে যেমন আমরা কলসী, খুরি, হাঁড়ি ইত্যাদি পাই, এদের বিকার হতে তেমন চেতন সত্তা ও জড় সত্তা পাই। আর তাদের যে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি হলেন ঈশ্বর।

সুতরাং বিশ্বের দুটি দিক আছে। একটি হল বাহিরের দিক এবং অপরটি হল ভিতরের দিক। বাহিরের দিকে জড়ত্ব ও চেতনা, এই দুইগুণের বিকার হতে বিশ্বের বাহিরের রূপটি আমরা পাই। দেহ, মন, বিভিন্ন জড় পদার্থ, ঘটনা, এইগুলি নিয়ে দৃশ্যমান বিশ্ব গঠিত। এরা বিশ্বের পরিবর্তনশীল রূপ। তাদের ভিতর তাদের নিয়ন্ত্রক যে সত্তা ক্রিয়াশীল তাই হলেন ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরই মৌলিক সত্তা। তাঁর মতে এই ভাবে ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যেও ক্রিয়াশীল। প্রকৃতির মধ্যে তাই তিনি দুটি ভাগ টেনেছেন। একটি হল প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ। তার তিনি নাম দিয়েছেন উৎপাদিত প্রকৃতি।[৪] তা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতি। তার অভ্যন্তরে যে সক্রিয় শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে তাকে তিনি উৎপাদক প্রকৃতি[৫] বলেছেন। এ খানিকটা বের্গসঁ পরিকল্পিত জৈব শক্তির[৬] সহিত তুলনীয়, তবে তারা পৃথক তত্ত্ব। স্পিনোজার ধারণায় প্রকৃতিকে যে নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রণ করে, তা ঈশ্বরের নির্দেশ ব্যতীত কিছুই নয়। তিনি বলেন ঈশ্বরের প্রকৃতি হতেই অমোঘ নিয়ম

১ Necessary knowledge
২ Substance
৩ Modes
৪ Natura Naturans
৫ Natura Naturata
৬ Elan vital

বলে বিশ্বের উৎপত্তি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। জ্যামিতিতে আমরা পাই যে ত্রিভুজের প্রকৃতি হতেই তার তিনটি কোণের যোগফল দুটি সমকোণের সমান হয়। ঠিক তেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি হতে দৃশ্যমান বিশ্বের রূপ নির্ধারিত হয়ে গেছে।[১]

সুতরাং বিশ্বের বাহিরে যে রূপ প্রকট তাতে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সত্তা আমরা পাই। একটি জড় প্রকৃতির অপরটি চেতন প্রকৃতির। তারা তাঁর দর্শন মতে ঈশ্বরের দুটি পৃথকগুণের বিকার। কিন্তু তারা কি ঈশ্বরের অঙ্গীভূত? এ বিষয় স্পিনোজার চিন্তা খুব স্বচ্ছ নয়। কোন মন্তব্য হতে মনে হয় তিনি তাদের ঈশ্বর হতে অভিন্ন মনে করেন, আবার কোন মন্তব্য হতে সন্দেহ আসে তিনি এমন মত পোষণ করেন না। সম্ভবত তাঁর ধর্মগত সংস্কারের সঙ্গে তাঁর দার্শনিক মনের সংঘাত হেতু এমন ঘটেছে। যাক সে কথা, এটা নিশ্চিত যে তিনি দেহ ও মনকে এমন বিপরীত প্রকৃতির ধরেছিলেন যে তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। এইখানেই দেকার্ত-এর সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। তা সত্ত্বেও তিনি উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য স্বীকার করেছিলেন। তাদের মধ্যে এমন একটা ক্রিয়া-সম্পর্কিত সমতা বর্তমান যে মনের ইচ্ছা এবং দেহের কর্ম একই ক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়।[২]

স্পিনোজা-র দর্শনে জড়তত্ত্ব ও চৈতন্যতত্ত্বের কতখানি সমন্বয় সাধন হয়েছে বোঝা শক্ত। জড় সত্তা ও চেতন সত্তা, উভয়কেই একই তৃতীয় সত্তা ঈশ্বরের গুণ রূপে কল্পনা করে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি তার সমন্বয় সাধন করেছেন; কিন্তু শেষরক্ষা সম্ভবত তিনি করতে পারেন নি। জড় ও চেতন সত্তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলায় তাদের প্রকৃত মিলন বা সমন্বয় সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের পৃথক স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং পরস্পর হতে দূরেই রেখে দিয়েছেন। সমন্বয়ের চেষ্টা আছে কিন্তু দার্শনিক সিদ্ধান্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন দুটি বিপরীত মতিগতির মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য

১ "From the infinite nature of God all things······follow by the same necessity and in the same way as it follows from the nature of a triangle from eternity to eternity, that its three angles are equal to two right angles".

Ethics, I, 17

২ "The decision of the mind and the desire and the determination of the body··· are one and the same thing." Ethics III, 2

স্থাপনের চেষ্টায় একই বাড়ীতে এনেও তাদের ভিন্ন প্রকোষ্ঠে স্থাপিত করে, তাদের মিলনের সুযোগ না দেবার মত অবস্থা।

পাউলসেন-এর দর্শনে অনুরূপ পথে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তার প্রকৃতি একটু ভিন্ন। তিনি স্পিনোজা প্রবর্তিত দেহ ও মনের ক্রিয়ার মধ্যে সমতাবাদের[১] তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তারপর তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর দর্শনটিকে গড়ে তুলেছেন। সমতাবাদকে বিশ্লেষণ করে তিনি একটি যুগ্মতত্ত্ব পেয়েছেন। প্রথমত তা স্বীকার করে দৈহিক ক্রিয়াকে মানসিক ক্রিয়ার ফল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। অপরপক্ষে দ্বিতীয়ত, তা এও স্বীকার করে যে মানসিক ক্রিয়া কখনো দৈহিক ক্রিয়ার ফল হতে পারে না।[২] এইভাবে তা এই মূল তত্ত্ব স্বীকার করে যে বিশ্বের প্রকৃতি আংশিকভাবে চৈতন্য স্বরূপ এবং আংশিকভাবে জড়।

পাউলসেন কিন্তু এই অবস্থায় গিয়েই থামেন নি। তা হলে তিনি দ্বৈতবাদী হতেন। তিনি স্পিনোজা যেখানে থেমেছেন সেখানেও থামেন নি, আরও এগিয়ে গেছেন। স্পিনোজা বলেছেন স্থানে অবস্থিতি এবং চেতনা হল ঈশ্বরের দুটি মৌলিক গুণ এবং তাদেরই বিকারে বিশ্বে দুই প্রকৃতির বস্তুর আবির্ভাব হয়। দুই প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তিনি ঈশ্বর তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা ঘনিষ্ঠ ঐক্য নয়। তাদের সম্বন্ধ আছে কিন্তু ঐক্য সংঘটিত হয় নি। যেন একই পিতার তারা দুই ভিন্ন স্বভাবের পুত্র। পাউলসেন তাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, এই ধারণার ভিত্তিতে যে বিশ্বের সর্বত্রই জড় ও চেতন একই বস্তুর দুটি দিক রূপে বিরাজিত। এই তত্ত্বটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন এই ভাবে :

জড় সত্তা ও চেতন সত্তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সুতরাং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়। তবু দেখা যায় যে অন্তত জীবের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বর্তমান। জীবের দেহে কিছু ঘটলে তার মনে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ; আবার মনে কিছু ঘটলে দেহে তার প্রতিক্রিয়া

১ Parallelism

২ "Two propositions are contained in the theory of parallelism : (1) Physical processes are never effects of psychical processes ; (২) Psychical processes are never effects of physical processes."

Introduction of Philosophy, Chap. I, 5

ঘটে। পাউলসেন-এর ধারণায় জীবের মধ্যে এই যে যুগ্ম প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তা বিশ্বের সর্বত্র বর্তমান এবং এই প্রতিপাদ্যের সাহায্যেই জড় সত্তা ও চেতন সত্তার দ্বন্দ্বের সমন্বয়ের ভিত্তিতে মীমাংসা সম্ভব। তারপর তিনি নানা যুক্তি দিয়ে তাঁর এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন খুঁজেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য হল বিশ্বের প্রতি অংশে এবং সমগ্রভাবে এই প্রকৃতির সত্তার মধ্যে জড় ও চেতনের সহাবস্থিতি এবং সুসমঞ্জস ক্রিয়া ঘটে। সত্তা মূলত একই। তার দুটি দিক আছে। একটি বাহিরের দিক। তাকে আমরা জড় বলি। অপরটি ভিতরের দিক। তাকে আমরা মন বলি। যেমন চৈতন্যমণ্ডিত বস্তুর মধ্যে দেহ আছে তেমন জড়বস্তুর মধ্যেও মনের সদৃশ বস্তু আছে।

তার সমর্থনে তিনি এই কথাগুলি বলেছেন। জীবের মধ্যে যে জড় ও চেতন সত্তার সহাবস্থিতি বর্তমান, তা সহজেই লক্ষ্য করা যায় এবং সর্ববাদি স্বীকৃত। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে, কারণ তারাও এক শ্রেণীর জীব; তাদের মধ্যেও প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল। প্রশ্ন হল যাদের আমরা বিশুদ্ধভাবে জড় বলে ভাবি তাদের মধ্যেও কি অনুরূপভাবে মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়? তাঁর ধারণায় যায়। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সজীব দেহের যা উপাদান তা জড় বস্তুর উপাদান হতে স্বতন্ত্র নয়, কেবল, একটি প্রাণশক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত, অপরটি নয়। এককোষ বিশিষ্ট সত্তা সম্ভবত জড় কণা হতে সমুদ্ভূত হয়েছিল। কাজেই বিশুদ্ধ জড় সত্তা এবং জীব অধিষ্ঠিত জড় সত্তার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য টানা যায় না। একটি জড় কণা ও একটি সুসংবদ্ধ সত্তা; তার মধ্যে অংশ আছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, আবার পরিবেশ সম্পর্কে তারা একটি সমগ্রের মত ক্রিয়াশীল।[১] জড় কণা সম্বন্ধে যা বলা হল একটি অণু সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। বাহিরে তা একটি পৃথক সত্তা, ভিতরে তার অংশের মধ্যে একটি বিন্যাস আছে। কাজেই যেমন জীবদেহে, তেমন অজৈবিক জড় সত্তায়, উভয়ক্ষেত্রেই একটি আভ্যন্তরীণ বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে এই আভ্যন্তরীণ বিন্যাসই বিশুদ্ধ জড় সত্তার ক্ষেত্রে তার মানসিক দিক। বিভিন্ন জীবদেহে যে মানসিক ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করি তা জড় সত্তার মধ্যেও অনুস্যূত। যে মানসিক

১ "A molecule is a relatively complete system of corporal phenomena, a plurality of parts most intimately correlated and interacting in manifold ways and at the same time a whole related to its surroundings." Ibid

ক্রিয়া সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশীল, তা পৃথিবীর বক্ষে মানুষের মনে তার পরিণত রূপটি পেয়েছে।[১]

মানুষের ক্ষেত্রে যেমন তার মানসিক দিক সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, তেমন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার জড় দিকরূপে মানুষের মস্তিষ্ক সব থেকে জটিল আকার ধারণ করেছে। তেমন যত নীচে নামতে থাকব লক্ষ্য করা যেতে পারে যে মানসিক অংশ এক দিক থেকে যেমন জটিল হতে সরল আকার ধারণ করেছে, তেমন তার জড় অংশও সরল রূপ ধারণ করেছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মস্তিষ্ক তুলনায় অপরিবর্ধিত এবং এমন অবস্থা আসে যখন তার পৃথক অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। উদ্ভিদের দেহে চেতনাশক্তির পৃথক কেন্দ্র নেই। শেষে দেখি যাকে অজীব সত্তা বলি তার মানসিক দিক অতি সূক্ষ্ম আকারে অবস্থিত। তার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস এবং কর্মরীতিই তার মানসিক দিক। আর এক দিক হতে দেখলে আমরা লক্ষ্য করব যে প্রতি পৃথক বস্তু একটি বৃহত্তর বস্তুর অংশ। এইভাবে অংশ হতে অংশীতে যেতে যেতে আমরা সেই পূর্ণতম সত্তায় উপনীত হই যার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিধৃত। প্রতি ক্ষেত্রেই তার একটি জড় দিক এবং মানসিক দিকের সংযুক্ত অবস্থিতি। এইভাবে তাঁর ধারণায় বিশ্ব সত্তায় সকল বস্তুর মিলন ঘটেছে। এই সামগ্রিক বিশ্ব সত্তাকে তিনি ঈশ্বর বলেছেন। বিশ্বের জড় অংশ ঈশ্বরের দেহের মত এবং তার চেতন অংশ তাঁর মনের মত; তিনিই বিশ্ব-আত্মা।[২]

এইবার আমরা কতকগুলি দর্শন আলোচনা করব যা অন্যপথে জড় ও চৈতন্যের দ্বন্দ্বের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। স্পিনোজা ও পাউলসেন-এর দর্শনে সে চেষ্টা হয়েছিল ওদের ভিন্নধর্মী বলে স্বীকার করে নিয়ে। স্পিনোজা তাদের মধ্যে একটি মিলনসূত্র স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন উভয়কেই একই ঈশ্বরের ভিন্ন গুণ বলে কল্পনা করে। পাউলসেন সেই পথেই তাদের সমান্তরাল বিস্তারকে বিশ্বের সকল অংশে টেনে নিয়ে গিয়ে, তাদের সবক্ষেত্রে সহাবস্থিতি দেখিয়ে একই তত্ত্বকে একটি পরিণত রূপ দিতে

১ "Thus the same mental thread runs though all material phenomena. The human mind is nothing but the highest development, on our earth, of the mental processes which universally animate and move nature." Ibid

২ "The old conception of the world soul is the natural key stone of this entire cosmology. Every corporal system is the bearer or body of an inner life; the universal system is the body or phenomenon of God." Ibid.

চেয়েছিলেন। বর্তমানে আলোচ্য দর্শনগুলি কিন্তু সেই পথে যায় নি। তারা দেখাতে চেষ্টা করেছে যে যাকে জড় বলি এবং যাকে চৈতন্ত বলি তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। তারা হয় বলে যে একই নিরপেক্ষ শ্রেণীর সত্তা এক পরিবেশে জড় প্রকৃতির বলে মনে হয় এবং ভিন্ন পরিবেশে চেতন প্রকৃতির বলে মনে হয়, না হয় বলেন তার প্রকৃতির ভিন্নতা নেই, সম্ভবত তারা উভয়েই চেতন প্রকৃতির। অবশ্য যাঁরা বলেন যে উভয়েই চেতন প্রকৃতির তাঁরা মন ও মন-নিরপেক্ষ বহির্জগতের জ্ঞেয় প্রকৃতির সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর কল্পিত তত্ত্ব প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। তিনি শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা বলে বিশ্বের মৌলিক সত্তা হল না-চৈতন্তরূপী না-জড়রূপী, তা নিরপেক্ষধর্মী। তাঁর ধারণায় তা সংখ্যায় অগণিত। তাদের তিনি নিরপেক্ষ পদার্থ[১] বলেছেন। কিন্তু এই মতটি তাঁর পরিণত চিন্তার ফল। মনের এবং মনবহির্ভূত সত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে তিনি গভীর চিন্তা করেছেন। ফলে একাধিকবার তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছে। তাতে দোষ নেই; বরং তা দেখায় যে তিনি একটি সিদ্ধান্তকে জোর করে অবলম্বন করে থাকতে চাইতেন না। গভীরতর চিন্তার ফলে নূতন আলোকপাত হলে তিনি পূর্বের মত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন। তা তাঁর চিন্তার গতিশীলতা ও উদার দার্শনিক মনোভাবের পরিচায়ক। এখানে তিনি কিভাবে তাঁর পরিণত মতটিতে উপনীত হলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা হবে।

রাসেল রচিত প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'দর্শনের সমস্যায়'[২] তাঁর প্রথম অপরিণত মত পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় তিনি চার শ্রেণীর সত্তাকে স্বীকার করেছেন। তারা হল: মন, ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য[৩] সার্বিক সংজ্ঞা এবং বহির্জগতের জড় বস্তু। সার্বিক সংজ্ঞা আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে না; অন্য তিনটি প্রাসঙ্গিক হবে। সত্তার জ্ঞান তাঁর মতে দুইভাবে পাওয়া যায়। প্রথম, পরিচয়ভিত্তিক জ্ঞান[৪] এবং দ্বিতীয়, বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান[৫]। এই দুটি শ্রেণীর জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে

১ Neutral stuff
২ Problems of Philosophy
৩ Sense data
৪ Knowledge by acquaintance
৫ Knowledge by description

যে পরিচয়ভিত্তিক জ্ঞান বলতে আমরা যাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলি মোটামুটি তাই বোঝেন এবং বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান বলতে আমরা যাকে অনুমানভিত্তিক জ্ঞান বলি তাই বোঝেন। তার কারণ তিনি ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য এবং সার্বিক সম্বন্ধে জ্ঞানকে পরিচয়ভিত্তিক জ্ঞান বলেছেন। তাঁর ধারণায় তাদের সঙ্গে মনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানকে তিনি বর্ণনা-ভিত্তিক জ্ঞান বলেছেন, কারণ তার জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা যায় না। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য[১] এবং প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে একটি পার্থক্য টেনেছেন। তাঁর ধারণায় প্রথমটির সহিত মনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। প্রাকৃতিক বস্তু[২] যে বার্তা মনের নিকট পাঠায় তাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দরূপে মনের কাছে প্রতিভাত হয়। তারা ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য হতে উদ্ভূত। এদের তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলেছেন।[৩] যাকে প্রাকৃতিক বস্তু বলি তা হতে তারা স্বতন্ত্র। তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে না। মনের মধ্যে তাদের সম্বন্ধে যে সংবেদন ঘটে তা এই ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যকে ভিত্তি করে আসে।

তা হলে প্রাকৃতিক বস্তুর প্রকৃত পরিচয় কি? সে বিষয় তিনি যে গ্রন্থটিকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তার নাম হল 'বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান'[৪]। সেখানে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হল এই। তিনি বিষয়টি দুটি বিভিন্ন দিক হতে আলোচনা করেছেন। প্রথম মনের দিক হতে। ধরা যাক আমার ঘরে অবস্থিত টেবিল সম্বন্ধে প্রশ্নটি উঠেছে। যাকে আমরা টেবিল বলছি মনের দিক হতে দেখলে তার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের ঘটে না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি তার সম্বন্ধে নানা তথ্য বহন করে; যেমন স্পর্শে তা কঠিন ঠেকে, দেখতে চতুর্বাহু বিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্রের মত, তা চারটি পায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইত্যাদি। এখন, একটি বিশেষ মন তাকে দেখছে না, বহু মন তাকে দেখছে। প্রত্যেকের মনে তার ঠিক একই পরিচয় মিলবে না। যে যেখানে বসে আছে সেখান হতে সে তাকে ভিন্নরূপে দেখবে। দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুপাতে[৫] তার রূপ ভিন্ন হবে। সুতরাং যাকে আমরা টেবিল বলে অনুমান করছি তা এই বিভিন্ন দ্রষ্টার পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি হতে লব্ধ একটি মানসিক ছবি। তার একটি ন্যায়ভিত্তিক চিত্র গড়ে তুলে আমরা

১ Sense data ২ Physical objects ৩ Sensible objects

৪ Our Knowledge of the External World

৫ Perspective

তাকে জানি। প্রাকৃতিক বস্তুর মানসিক জ্ঞানকে তাই তিনি ন্যায়ের সৃষ্টি[১] বলে বর্ণনা করেছেন। এই হল তার এক দিকের পরিচয়।

অন্য দিক হতেও তার পরিচয় আছে। তা হল মনের দিক হতে নয়, মন-নিরপেক্ষভাবে তার নিজের দিক হতে পরিচয়। তিনি বলেন ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনে যে সংবেদন হয় তার স্থিতিকাল যৎসামান্য। তার অতিরিক্তভাবে সকল সম্ভাব্য পরিপ্রেক্ষিতে তার একটা মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। তা স্থায়ী। টেবিল সম্পর্কে উদাহরণটি আবার প্রয়োগ করা যেতে পারে। যত সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ হতে তাকে দেখা সম্ভব তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তার নিজস্ব একটি রূপ আছে। মননিরপেক্ষ প্রকৃত বস্তুটি হল সেই বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষির ভিত্তিতে গঠিত একটি সুসমঞ্জস সংস্থান। তাই প্রাকৃতিক বস্তুকে তিনি বলেছেন পরিপ্রেক্ষি সমূহের সংস্থান[২]। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে যে রূপ তা বস্তু নয়। তাদের সম্মিলিত রূপই বস্তু। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা প্রাকৃতিক বস্তুর চিন্তা করি তিনি তা গ্রহণ করেন নি। আমরা বস্তুকে একটি পদার্থ বলে গ্রহণ করি এবং তার গুণগুলিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে অনুমান করি। এটি হল বিশ্বতত্ত্ব ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।[৩] তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানতত্ত্ব ভিত্তিক[৪]। মানুষের মন কত বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দেখে, তার ভিত্তিতেই তিনি বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তাই মন-নিরপেক্ষ বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে বস্তুর নিজস্ব সত্তা কিছু নেই, তা বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিপ্রেক্ষির সমন্বয়। কিন্তু এখনই লক্ষ্য করা যাবে যে এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই তাঁর তৃতীয় পরিণত মতটি উৎপাদিত হয়েছে।

তাঁর তৃতীয় মতটি আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর পরবর্তী 'মনের বিশ্লেষণ'[৫] নামক গ্রন্থে। এখানে তিনি ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য এবং সংবেদনকে পৃথক রাখেন নি। পূর্বে তাঁর ধারণা ছিল যে ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য আসে প্রাকৃতিক পদার্থ হতে এবং তারা যখন সংবেদনে পরিবর্তিত হয় তখন তা মানসিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। এখানে তিনি বলেন, তা নয়, তারা একই সত্তার বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকাশ। এই সত্তাকে তিনি নিরপেক্ষ পদার্থ বলেছেন, কারণ তাঁর মতে তা না মনের মত, না জড়ের মত। তার দুটি সম্ভাব্য রূপ আছে।

১ Logical construct
২ System of Perspectives
৩ Ontological view point
৪ Epistemological view point
৫ The Analysis of Mind

একটি হল বস্তুর মন-নিরপেক্ষ রূপ। সেখানে তা পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত একটি সামগ্রিক রূপের অঙ্গ। এই রূপকে আমরা জড়রূপ বলে গ্রহণ করি। আবার যখন ভিন্ন পরিবেশে তা মনের সহিত সম্পর্কিত হয় তখন তার আর এক রূপ। তখন তা সংবেদন বলে অনুভূত হয়। তখন তা মনের প্রকৃতি ধারণ করে।

রাসেল-এর প্রতিপাদ্যটি অভিনব এবং জটিল। তাকে সহজবোধ্য করবার জন্য তিনি একটি উদাহরণ প্রয়োগ করেছেন। তাঁর চিন্তাকে আরও সহজগ্রাহ্য করবার জন্য সেটিও এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ধরা যাক, আকাশে একটি নক্ষত্র আছে এবং তার ছবি তোলবার জন্য একটি ক্যামেরা রাখা হয়েছে। এই ক্যামেরার প্লেটে তার একটি ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। নক্ষত্রের সেটি হল একটি রূপ। তার অতিরিক্তভাবে আকাশে বিরাজিত বহু নক্ষত্রের মধ্যে একটি নক্ষত্র হিসাবে তার নিজস্ব পরিবেশে তার একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে। উভয়ক্ষেত্রেই একই নক্ষত্রকে পাই। রাসেল-এর মতে ক্যামেরার প্লেটে ধৃত রূপটি হল সংবেদনের সমস্থানীয়। অর্থাৎ নিরপেক্ষ সত্তার মানসিক রূপ। অপরপক্ষে নিজস্ব পরিবেশে নক্ষত্র যেমন আছে তা হল তার প্রাকৃতিক বস্তু হিসাবে রূপ। অর্থাৎ তার জড় রূপ। বস্তু একই, কেবল পরিবেশের বিভিন্নতা হেতু তা এক জায়গায় জড় বলে গৃহীত হয় এবং অন্য জায়গায় চেতন বা মন বলে গৃহীত হয়। তাই তাকে তিনি নিরপেক্ষ পদার্থ বলেছেন।

এই উপমার প্রয়োগে তাঁর প্রতিপাদ্য কতখানি সহজবোধ্য হয়েছে তা ঠিক বোঝা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে তাঁর ব্যবহৃত উপমাটি ত্রুটিবিহীন নয়। এখানে প্রকৃত বস্তু আর তার ধরে রাখা ছায়াকে একই বলে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু তাত ঠিক বলা হল না। আমি নিজে আর মুকুরে প্রতিবিম্বিত আমার ছায়া কি একই জিনিস? তা হলে আমার আলোকচিত্রের সঙ্গে আমার কোন পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয়ত, মনে হয় ক্যামেরার প্লেট প্রকৃত বস্তুর ছায়া ধরে রাখে যান্ত্রিকভাবে, এই ব্যাপারে তার নিজস্ব কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। অপরপক্ষে বহির্বিশ্বের জ্ঞান-আহরণের চেষ্টায় মানুষের মন যে সংবেদন রচনা করে তাতে তার একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। মানুষের চোখের লেন্স-এর বাহিরে অবস্থিত বস্তুর যে ছায়া পড়ে তার সঙ্গে প্লেটে ধৃত ছবির তুলনা চলতে পারে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সেই ছায়া স্নায়ুতরঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা হতেই সংবেদন হয়। এ সম্পর্কে

আমাদের জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় পরবর্তী অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত সমালোচনার সুযোগ ঘটবে। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রাসেল-এর প্রতিপাদ্য কষ্টকল্পনা দোষে দুষ্ট হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণে তিনি লক্ষ্য করতে ভুলে গেছেন যে সংবেদন রচনায় মানুষের মন একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, তা বহির্বিশ্ব হতে যা আসে তার যান্ত্রিক প্রতিবিম্ব নয়। এখানে এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে জড় প্রকৃতির বস্তুর প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত আছে। যাকে তিনি নিরপেক্ষ পদার্থ বলেছেন, তাঁর দর্শনে তার জড়রূপের ভূমিকার প্রাধান্য দিয়েছেন। সংবেদনকে যান্ত্রিক বলে কল্পনা করা এবং মনকে একটি মুকুরের মত বা ফটোগ্রাফের প্লেটের মত বস্তুর যান্ত্রিক অক্রিয় ভূমিকা দেওয়া হতে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য কেবল কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাকে নূতন করে বিন্যাস করে মানুষের মন সংবেদন রচনা করে। মানুষের চোখে প্রাকৃতিক বস্তুর রূপ প্রতিফলিত হয়, কিন্তু মানুষের মন তা সোজাসুজি দেখে না। তা হলে মুকুর ও দেখতে পেত। তা হতে স্নায়ুযোগে যে তথ্য মনে পরিবাহিত হয়, তা হতেই তার সংবেদনের পৃথক উৎপত্তি সংঘটিত হয়।

এবার আমরা দুজন বিশিষ্ট ইংরেজ মনীষীর সিদ্ধান্ত স্থাপন করব। তাঁরা হলেন জেমস জীনস এবং আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন। উভয়েই পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। সেই কারণেই তাঁদের মন্তব্যের মূল্য বেশী হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু তাঁরা বৈজ্ঞানিক, স্বভাবতই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি জড়বাদের অনুকূল হবে, কারণ জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারা পদার্থ বিজ্ঞান, তথা সকল বিজ্ঞান অনুপ্রাণিত। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি তাঁদের গবেষণার ফলে তাঁরা উভয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে যাকে আমরা জড় বলি তা প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যধর্মা অবশ্য তাঁরা বলেন না যে তা মনের অন্তর্ভুক্ত ধারণার মত বা মনের সৃষ্টি, তবে তাঁরা বলেন আমাদের চিন্তা যে প্রকৃতির পদার্থ, আমরা যাকে জড় বলি তার প্রকৃতি ও অনুরূপ।

আমরা প্রথমে জীনস-এর মন্তব্যের আলোচনা করব। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এমন ব্যাপক যে তা স্বভাবতই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হতে দর্শনের ক্ষেত্রে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়। এইভাবেই উভয় বৈজ্ঞানিকের বর্তমানে আলোচ্য দার্শনিক প্রশ্নের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যে চিন্তাধারা জীনস-এর এই মন্তব্যের ভিত্তি তা হল সংক্ষেপে এই :

আমাদের স্থান ও কাল সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। নিউটনের ধারণায় তাদের বাস্তব সত্তা ছিল। আইনস্টাইন প্রবর্তিত আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে (বিশেষ) কাল স্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। স্থানের সহিত যুক্ত কালের নানা সম্ভাব্য মানসিক ধারণার মধ্যে তা একটি নির্বাচিত ধারণা। সুতরাং তার বাস্তব সত্তা নেই। দ্বিতীয়ত আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুসারে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তি তাদের বাস্তব রূপ হারিয়েছে। তারা মানসিক সত্তা রূপে স্বীকৃত হয়েছে।[১] একই ভাবে নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির রূপও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। জড়বাদের অবলম্বন হল জড় বস্তু। তার রূপ এইভাবে এখন এমন পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে তার জড়ত্ব বিশেষ রক্ষিত হয় না। নূতন 'কোয়াণ্টাম তত্ত্ব[২] অনুসারে আলোক রশ্মির কণারূপ এখন আর বজায় থাকে না, তাকে এখন তরঙ্গ রূপেও কল্পনা করা হয়। বহির্জগতকে জানবার চেষ্টায় বিজ্ঞান এই ধরনের একটি অবস্থায় উপনীত হয়। অথচ অন্য কোন রীতিতে প্রকৃতির নিজস্ব রূপটি জানবার উপায় নেই। সুতরাং এই সব তথ্যের মিলিত পরিচয় হতে এই অনুমান করাই তাঁর বিবেচনায় সঙ্গত মনে হয় যে বিশ্ব জড় না হয়ে চৈতন্যরূপী হওয়াই বেশী সম্ভব।[৩]

এডিংটন একটি ভিন্ন ধরনের যুক্তির বিন্যাসের ভিত্তিতে একটি অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে সমগ্র বিশ্বের উপাদান এমন পদার্থ যার প্রকৃতি হল মানসিক। অবশ্য আমরা মন অর্থে যা বুঝি সেই অর্থে তাকে তিনি মানসিক বলেন নি। আমাদের চিন্তা যে প্রকৃতির, যাকে জড়বিশ্ব বলি, তাঁর মতে তার প্রকৃতি তার অনুরূপ। চিন্তার মধ্যে আমরা পাই নানা সম্বন্ধ এবং পরস্পর সংবদ্ধ বস্তুর সমন্বয়। বিশ্বের প্রকৃতি ও তার মত। এই বার তাঁর যুক্তিগুলি নীচে স্থাপিত হতে পারে।

এডিংটন বলেন, এতদিন আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে যা নীরেট, যা কঠিন পদার্থের মত তার সঙ্গে মৌলিক সত্তার তুলনা করতে অভ্যস্ত।

১ "But the physical theory of relativity has shown that electric and magnetic forces are not real at all; they are mental constructs of our own."

Some Problems of philosophy, Physics and Philosophy

২ Quantum Theory

৩ "The most we can say is that the cumulative evidence of various pieces of probable reasoning makes it seem more and more likely that reality, is better described as mental than as material." Ibid

যা কঠিন পদার্থের মত তাই হল বাস্তব, সংক্ষেপে এই ছিল আমাদের ধারণা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সে ধারণাকে চুরমার করে দিয়েছে। জড় প্রকৃতি এখন বৈদ্যুতিক শক্তির সমাবেশে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং এখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এবং বিজ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়ের ক্ষেত্রের পার্থক্য কঠিন রূপ এবং অতীন্দ্রিয় রূপ দ্বারা চিহ্নিত নয়; তাদের ভিন্নতা সূচিত হয় তাদের সম্পর্কিত জ্ঞান, পরিমাপমূলক ছকে[১] ঢালা যায় কিনা তার ওপর। যা পরিমাপমূলক ছকে সাজানো যায় তাই হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র, আর যা যায় না, তা বিজ্ঞান বহির্ভূত ক্ষেত্র। এই হতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বিশ্বের উপাদান হল চেতন প্রকৃতির।[২] অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে তা মানুষের মনের মত, তবে সাধারণ ভাবে তার ধরনের। তার প্রকৃতি মানুষের চেতনার অন্তর্ভুক্ত অনুভূতির সমস্থানীয়।[৩]

তাঁর এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তিনি আরও কিছু যুক্তি স্থাপন করেছেন। বিশ্বে আপাতদৃষ্টিতে দুই ধরনের সত্তা আছে। একটি হল মানসিক সত্তা এবং অপরটি জড় সত্তা। মানসিক সত্তার প্রকৃতি চৈতন্যময় বলে ধরে নেওয়া যায়। এখন জড়ের প্রকৃতিও কি তাই? এই হল প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে তার যে পরিচয় পাই তা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং সেই কারণে নির্ভর-যোগ্য নয়। জড় পদার্থ পরিমাপযোগ্য। তাই তার মাপকাঠি পাওয়া যায়; কিন্তু তাতে বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি কি, তা তার খরচপত্রের পরিসংখ্যানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টার মত তা অসম্পূর্ণ।[৪] যেটুকু পরিচয় সম্ভব তারও ভিত্তি হল বহির্বিশ্বের বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ মনের দ্বারা গ্রহণযোগ্য বলে। এই জন্যই বহির্বিশ্বকে জানা সম্ভব হয়। আমরা তাকে জানতে পারি, তার কারণ তা আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত হল, মানসিক

১ **Metrical**

২ **"To put the conclusion crudely the stuff of the world is mind-stuff."**
Nature of the Physical World, Reality, Causation, Science and Mysticism

৩ **The mind-stuff of the world is of course something more general than our individual conscious minds, but we may think of its nature not as altogether foreign to the feelings in our consciousness." (Ibid)**

৪ **"The symbolic matter and fields of force bear to it the same relation that the bursar's accounts bear to the activity of the college.'! Ibid**

প্রকৃতির উপাদান বলতে আমাদের বুঝতে হবে জড়জগতের উপাদান রূপে যে সম্বন্ধ বস্তুর সমবায় আছে তাই।[১]

অবশ্য তাঁর মত এই নয় যে মনের বাহিরে মন-নিরপেক্ষভাবে কোন সত্তা নেই। তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন যে মনের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না এমন সত্তাও থাকতে পারে। তবু তিনি বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর প্রতিপাদ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তিনি বিশ্বের উপাদানকে নিরপেক্ষ[২] বলে স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁর ধারণায় নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন বিশ্বকে বুঝতে দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির উপাদানের দাবীর আমরা সম্মুখীন হই। এখানে সে অবস্থা বর্তমান নয়। যা জানে তা চেতন প্রকৃতির আর যাকে জানা যায় তারও অনুরূপ প্রকৃতি। কাজেই বিশ্বের উপাদানের প্রকৃতিকে নিরপেক্ষ না বলে মানসিক বলাই যুক্তিসঙ্গত। তাই তিনি বলেন বিশ্বের উপাদানের প্রকৃতি হল মানসিক। বিশ্বকে মন দিয়েই জানা যায়, কিন্তু জড় জগতের মধ্য দিয়ে তাকে জানতে গেলে আমরা বিশেষ কিছু পাই না, পদার্থ বিজ্ঞানের গোলক ধাঁধায় পড়ে যাই।

এখানে এডিংটন-এর মতের সঙ্গে রাসেল-এর মতের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। রাসেল-এর দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুবাদের[৩] দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তিনি দেখেছেন মনের মধ্যে মানসিক ক্রিয়া রূপে স্থাপিত না হলে তার সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। এই অবস্থার তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে: বস্তুই মূল সত্তা। তার দুটি রূপ। একটি মন-নিরপেক্ষ রূপ। সেই অবস্থায় তা সমগ্র পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ পরিবেশের সহিত তার বিভিন্ন সম্বন্ধই তার সংগঠক উপাদান। তাকে যখন মনের পরিবেশে স্থাপন করা হয় তখন তা মানসিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। এই সত্তাকেই তিনি নিরপেক্ষ পদার্থ বলেছেন। মন এখানে অক্রিয়, তা মূল পদার্থের বিশেষ অবস্থার মাত্র পরিবেশ রচনা করে।

অপরপক্ষে এডিংটনের দৃষ্টিভঙ্গি চৈতন্যবাদের[৪] দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। ... বলে এক দিকে মন ত আছেই এবং তার প্রকৃতি নিশ্চয় চৈতন্যরূপ। তার

১ "The mind-stuff is the agregation of relations and relata which form the building material for the physical world. Ibid

২ "The term mind-stuff might well be amended ; but neutral stuff seems to be its wrong kind of amendment." Ibid

৩ Realism. ৪ Idealism

বাহিরে যে মন-নিরপেক্ষ বিশ্ব পড়ে রয়েছে তার প্রকৃতিও অনুরূপ। তাদের আমরা নীরেট ভাবি বলে আপাতদৃষ্টিতে তাদের জড় মনে হয়; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তার নীরেট রূপকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাণিতিক ছকে তাকে সাজিয়ে জানবার চেষ্টা সফল হয় না। মন যে তাদের জানতে পারে তার কারণ হল মনের সঙ্গে যাকে জড়বস্তু বলি তার কোন প্রকৃতিগত বিভেদ নেই।

এই তিন বিশিষ্ট মনীষীর মন্তব্যগুলি আলোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যাকে আমরা জড় বলতে অভ্যস্ত এবং যাকে আমরা চেতন বলতে অভ্যস্ত তাদের পার্থক্য ক্রমশ যেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সীমিত হয়ে এসেছে। যাকে জড় এবং নীরেট বস্তু ভাবতাম তা চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গের রূপ নিয়েছে। তা মানুষের মনের চিন্তার মতই সূক্ষ্ম স্তরের জিনিষ। অপর পক্ষে দেখা যায় যেখানে তাদের সহাবস্থিতি ঘটেছে, যেমন জীবের দেহে, সেখানে তারা পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করে কাজ করে। শুধু তাই নয়, জীবনের সঙ্গে পরিবেশের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য তার মন বহির্বিশ্বের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। সেটা উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকলে সম্ভব হত না। ঘনিষ্ঠ যোগ তাদেরই মধ্যে সম্ভব যারা বিপরীতধর্মী নয়। এই সব বিবেচনা করলে মনে হয় যাকে আমরা জড় বলি আর যাকে আমরা চেতন বলি, তা সম্ভবত ভিন্ন প্রকৃতির নয়। আধুনিক বিজ্ঞানে এবং দর্শনে সম্প্রতি যে উপলব্ধি গড়ে উঠেছে তা এই চিন্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

এই প্রসঙ্গে দুটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে একটি পাই বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর কাছ হতে। তিনি এক জায়গায় এই মন্তব্য করেছেন যে তাঁর ধারণায় জড় ততটা জড় নয় এবং মন ততটা চেতন প্রকৃতির নয়, যতখানি সাধারণত ধরা হয়ে থাকে। এই বিশ্বাসকে গ্রহণ করলে বহির্জগতের জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান অনেক সহজ হয়ে যায়।[১] ওয়েলস ও জুলিয়ান হাক্সলি দুজনেই বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ। জীবদেহের প্রক্রিয়া আলোচনা করে তাঁরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা বলেন জড় ও চেতনের বিরোধ গড়ে ওঠে এই ধারণার ফলে যে জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের মধ্যে

১ "I believe that matter is less material and mind less mental than is commonly supposed and that when this is realised the difficulties raised by Berkely disappear." —The Analysis of Matter.

একটি সম্পূর্ণ বিরোধের অবস্থা বর্তমান আছে। তাঁদের মতে দেহ ও মনকে দুই স্বতন্ত্র সত্তা বলে ধরে নেওয়া ভুল। ঠিক বলতে তারা একই সত্তার দুটি বিভিন্ন দিক।[১] অর্থাৎ তাঁদের সিদ্ধান্ত পাউল সেন-এর সিদ্ধান্তের মত।

এই সব আলোচনা হতে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বক্রতা হতেই সম্ভবত জড় ও চেতনের দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয়েছে। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত অবস্থা দ্বারা সমর্থিত নয়। প্রকৃত অবস্থা যা পাই তা হল এই। একটি মৌলিক সত্তা নিয়ে বিশ্ব গঠিত। তা নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। এমন এক অবস্থা থাকে যখন তার সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। বিশ্বে যখন জীবের আবির্ভাব ঘটে নি তখন সেই অবস্থা ছিল। তার পর জীবের আবির্ভাবের সঙ্গে এই সামগ্রিক ঐক্য খণ্ডিত হল। জীব একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। তার নিজেকে পরিবেশ হতে রক্ষা করবার অনুক্ষণ চেষ্টা চলেছে। একদিকে সে এবং অন্য দিকে বিশ্ব। অথচ তাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ নেই। কারণ পরিবেশের অনুকূলতাই তার আবির্ভাব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সাহায্য করেছে। অবশ্য প্রতিকূল শক্তিও সেখানে ক্রিয়াশীল। আত্মপুষ্টি ও আত্মরক্ষার জন্য তার এই পরিবেশের সহিত পরিচয় হওয়া দরকার। এই প্রয়োজনের তাগিদেই তার জ্ঞাতৃরূপ এবং পরিবেশের জ্ঞেয় রূপ। এইভাবেই যা ছিল সামগ্রিক ভাবে এক দিন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিভিন্ন ও বিভক্ত হয়ে গেল। সেই বিভাগকে ভিত্তি করেই জড় ও চেতন সত্তার ধারণা। কাজেই এই দ্বৈতভাবের মূল কারণ সত্তার প্রকৃতির বিভিন্নতা নয়, জীবের তার পরিবেশের সহিত পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তা। যা জ্ঞাতা এবং যা জ্ঞেয় তারা মূলত এক। বিশ্বের বিকাশের এক অবস্থায় দ্বৈত ভাব উৎপাদিত হবার ফলে এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধের সৃষ্টি।

প্রাচীন উপনিষদে বিষয়টিকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা হয়েছে। বিশেষ করে ছান্দোগ্য উপনিষদ ও মাণ্ডূক্য উপনিষদে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিশ্বের দুটি রূপের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি রূপে বিশ্ব একটি সামগ্রিক ঐক্য রূপে বর্তমান, সেখানে কাউকে দেখবার বা

১ "Perhaps they assume too complete an opposition between the objective and the subjective. Perhaps we treat body and mind as opposites in kind, when in fact, each is one face of a single two-faced reality,"

Science of Life, Book 8, Chap. IV

জানবার প্রশ্ন ওঠে না। তাকে বিশ্বের ভূমা রূপ বলা হয়েছে। তা হল বিশ্বে যা কিছু আছে তাদের সকলকে জড়িয়ে নিয়ে তার ঐক্য রূপ। আর একটি অবস্থা আছে যেখানে একটি দ্বৈতভাব এসে পড়ে। সেখানে বিশ্বের এক অংশ হয় জ্ঞাতা, ঘ্রাতা, স্প্রষ্টা, দ্রষ্টা প্রভৃতি এবং অন্য হয় জ্ঞাতব্য, ঘ্রাতব্য, স্প্রষ্টব্য, দ্রষ্টব্য ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, একদিকে এই মৌলিক সত্তা ভোক্তা রূপে প্রকট হয় এবং অন্যদিকে ভোগ্য রূপে প্রকট হয়। উপনিষদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি বলে, যেখানে কেউ কাউকে দেখে না, কেউ কাউকে জানেনা, কেউ কাউকে শোনে না, তাই হল ভূমা এবং যেখানে এক অন্যকে দেখে, এক অন্যকে শ্রবণ করে এবং এক অন্যকে জানে তাই হল সীমিত।[১]

মাণ্ডূক্য উপনিষদে এই কথাটি আরও বিস্তারিত ভাবে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। উপনিষদটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার তাৎপর্য খুব গভীর। তাই তার একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। ব্রহ্ম বা আত্মাকে এখানে চারিটি অবস্থার মধ্যে বর্ণনা করে তাঁর মৌলিক প্রকৃতি কি তা বোঝবার চেষ্টা হয়েছে।[২] তার প্রথম তিনটি অবস্থায় ভোক্তারূপী আত্মার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং চতুর্থ অবস্থায় তাঁর মৌলিক রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ভোক্তা এলেই ভোগ্য এসে পড়ে। অর্থাৎ প্রথম তিনটি হল ব্রহ্মের দ্বৈত-অবস্থা এবং চতুর্থটি হল অদ্বৈত অবস্থা। একই অভিন্ন প্রকৃতির সত্তা কেমন করে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে স্তরে স্তরে ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধের সূত্রে পৃথক ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে তাই এখানে দেখানো হয়েছে।

প্রথম অবস্থায় পাই জাগ্রত অবস্থার মানুষের বিশ্বকে। এখানে দ্বৈতবোধ সম্পূর্ণভাবে প্রকট। ভোগ্য বিশ্ব ও ভোক্তারূপী ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্ক এখানে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট। তাই তার নিকট রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সমন্বিত বিশ্ব পূর্ণ মহিমায় প্রতিভাত। এখানে তাই বলা হয়েছে জাগ্রত অবস্থায় আত্মা 'বহিঃ প্রজ্ঞ'; কারণ এখানে জ্ঞাতা-রূপী মানুষের মনের কাছে বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বৈচিত্র্যময় বিশ্ব পরিপূর্ণ ভাবে প্রকট।

দ্বিতীয় অবস্থা পাই স্বপ্নে। এখানেও দ্বৈতাবস্থা বর্তমান; কিন্তু তা

১ যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমাথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। ছান্দোগ্য। ৭। ২৪। ১

২ সর্বং হি এতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। মাণ্ডুক্য। ২

খানিক পরিমাণে ম্লান হয়ে গিয়েছে। এখানে ভোক্তা আছে, কিন্তু প্রকৃত-ভোগ্য বর্তমান নেই, তার স্থান নিয়েছে তার মনের কল্পিত রূপ। সে রূপটি আবার ভোক্তাই সৃষ্টি করে। এখানে যে দ্বৈতবোধ তার সঙ্গে বাহিরের বিশ্বের কোন সংযোগ নেই। মনই নিজের ওপর দ্বৈতবোধ আরোপ করেছে। তাই জন্য আত্মাকে এখানে অন্তঃপ্রজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ এখানে জ্ঞাতার মধ্যেই রচিত হয়েছে।

তৃতীয় অবস্থা পাই সুষুপ্তিতে। যে অবস্থায় মানুষ এমন গভীর ভাবে ঘুমায় যে তার নিদ্রা কোন স্বপ্ন দ্বারা ব্যাহত হয় না, তাকে বলা হয় সুষুপ্তি। এই অবস্থায় দ্বৈতভাব সাময়িকভাবে প্রায় লোপ পেয়ে যায়। ঘুমের নিবিড়তা কমলে বা ঘুম ভাঙলে দ্বৈতভাব আবার পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু যতক্ষণ সুষুপ্তির অবস্থা বর্তমান থাকে ততক্ষণ দ্বৈতভাব থাকে না। তবে তার জ্ঞাতৃ-রূপটি অক্রিয় অবস্থায় বর্তমান থাকে। তার সেই অবস্থার প্রকৃতি বোঝাতে শংকরাচার্য একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন নিশীথের নিবিড় অন্ধকারে বহির্বিশ্ব যখন বিলীন হয়ে যায় তখন জ্ঞাতৃরূপী মনের জ্ঞানের শক্তি থাকলেও তার জ্ঞানক্রিয়া থাকে না। তবে এখানেও যে জ্ঞাতা সকল অনুভূতিশক্তি হারায় তা নয়, কারণ সুষুপ্তির অবস্থায় একটা অস্পষ্ট সুখবোধ হয় তথাকে, তা না হলে স্বপ্নবিহীন সুষুপ্তির একটা স্মৃতি ঘুম ভাঙলেও আমাদের থাকে কেন ?

চতুর্থ অবস্থায় আত্মার প্রকৃতি এই তিন অবস্থা হতে একেবারে ভিন্ন হয়ে যায়। প্রথম তিন অবস্থায় দ্বৈতভাব অল্পবিস্তর বর্তমান থাকে ; কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয় সম্বন্ধও বর্তমান থাকে না। কাজেই সে অবস্থায় তাঁকে জ্ঞেয় প্রকৃতির বা জ্ঞাতা প্রকৃতির বলে বর্ণনা করা যায় না। সুতরাং জড়ধর্ম বা চৈতন্যধর্ম কোনটিই তার ওপর আরোপ করা যায় না। এই চতুর্থ অবস্থার বর্ণনাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাই তার একটি বাংলা অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া ভাল হবে মনে হয়। অনুবাদে তা এই দাঁড়ায় :

অন্তর সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, বাহির সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, অন্তর-বাহির উভয় সম্বন্ধে জ্ঞানহীন ; প্রজ্ঞান ঘন নয়, জ্ঞানযুক্ত নয়, জ্ঞান-ক্ষমতা-হীন নয়। তা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, লক্ষণ-হীন, তা অচিন্ত্য, তা বর্ণনা করা যায় না, সেখানে কেবল

একত্ব প্রকট, সেখানে বহু ও নানার জগত লোপ পায়; তা শান্ত, শিব এবং অদ্বৈত।[১]

আমাদের প্রশ্ন হল তা অদ্বৈত অবস্থায় ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে কিনা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যে তত্ত্ব স্থাপন করেছেন তাতে বলা হয়, থাকে; কিন্তু মাণ্ডূক্য উপনিষদে যে তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে তা বলে, থাকে না। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে উপরের উদ্ধৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। এখানে অদ্বৈত অবস্থার প্রকৃতি বর্ণনা করতে যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে তারা সকলেই নেতিবাচক, তারা কতকগুলি গুণের অভাব সূচিত করে। যে গুণগুলির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে এই বর্ণনার প্রথম অংশে যে গুণগুলির অভাব সূচিত হয়েছে সেগুলি জ্ঞাতৃরূপী সত্তার ওপর প্রযোজ্য, যেমন না অন্তঃপ্রজ্ঞ, না বহিঃপ্রজ্ঞ, না উভয়ত প্রজ্ঞ, না প্রজ্ঞানঘন। অপরপক্ষে শেষের দিকে যে গুণগুলির অভাব সূচিত হয়েছে, সেগুলি জ্ঞেয়রূপী সত্তার উপর প্রযোজ্য, যেমন অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অচিন্ত্য ইত্যাদি। সুতরাং তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে চতুর্থ অবস্থায় ব্রহ্মের যে রূপ সেখানে তিনি জ্ঞাতার বৈশিষ্ট্যগুলিও ধারণ করেন না, জ্ঞেয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিও ধারণ করেন না। সেখানে পরিপূর্ণভাবে একত্ব বিরাজমান; তাঁর দ্বৈতভাব নেই এবং সেই কারণেই তিনি জ্ঞাতাও নন জ্ঞেয়ও নন। ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্। সুতরাং এই চিন্তা অনুসারে জ্ঞাতৃরূপ কেবলমাত্র দ্বৈত অবস্থাতেই বর্তমান থাকে।

মনে হয় এই চিন্তার সূত্র ধরেই আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রশ্ন হল বিশ্বের প্রকৃতি কি, জড়ের মত না চেতন পদার্থের মত? আমাদের উত্তর হবে বিশ্বের মৌলিক প্রকৃতি এমন যে তাকে জড়ও বলা যায় না চেতনও ও বলা যায় না। তা এমন সত্তা যার মধ্যে এমন কোন স্বাভাবিক বিভাগ নেই। এই বিভাগ এসে পড়ে যখন জ্ঞাতার দৃষ্টিভঙ্গি তার ওপর আরোপিত হয়। জ্ঞেয় বস্তু চেতনও হতে পারে, অচেতনও হতে পারে। মানুষের মন

১ নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নো ভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞান ঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্। অদৃশ্যম—
ব্যবহার্যমলক্ষণম চিন্ত্যাম ব্যপ দেশ্যমে—
কাত্ম প্রত্যয় সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং
শিবম দ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে। মাণ্ডূক্য ॥৭

বা মনের চিন্তা ও জ্ঞেয় বস্তুতে পরিণত হতে পারে। বহির্বিশ্বে সাধারণত জ্ঞেয়বস্তু জড়ধর্মী বলেই মনে হয় যা জ্ঞেয় তা জড়প্রকৃতির। অপরপক্ষে জ্ঞাতা চৈতন্যধর্মী বলে তাকে চেতন প্রকৃতির ধরা হয়। তার ভিত্তিতেই জড় ও চেতনের দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে চেতনধর্মী সত্তাও অংশত জড়ধর্মী এবং দেহ ও মন নিয়ে গঠিত।

দেহ ও মনের এমন সুন্দর সমন্বয় সম্ভব হত না, যদি না তারা মূলতঃ একই সত্তা হতে উদ্ভূত হত। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে যে পরস্পর প্রতিক্রিয়া হয়[১], এমন মনে করবারও সঙ্গত কারণ আছে। দেকার্ত যখন সেই কথা বলেছিলেন মনোবিজ্ঞান তা গ্রহণ করে নি। তার কারণ তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এই সংস্কারের প্রভাবে বাধা দিয়েছিল যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ দুই সম প্রকৃতির ক্রিয়ার ওপরই আরোপ করা যায়। জড় ও চেতন ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু; কাজেই তাদের মধ্যে সে সম্বন্ধ আরোপ করা যায় না। ফলে সমান্তরাল বাদ[২] স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সমান্তরালবাদ যে ব্যাখ্যা দেয় তা সন্তোষজনক মনে হয় না। তা যেন প্রকৃত কারণ কি তা নির্দেশ করবার অক্ষমতা প্রকাশ করে। কেন সমান্তরাল হয় তার কোন উত্তর নেই। সমান্তরালবাদে এটা ধরে নেওয়া হয় যে জড় পদার্থ ও চেতন পদার্থ বিপরীতধর্মী। প্রশ্ন ওঠে, কেন বিপরীত ধর্মী? তার সমর্থনে দেখানো হয় যে কোন মানসিক প্রক্রিয়ার জড় কারণের একটি জড় কার্যও লক্ষ্য করা যায়, কাজেই কার্য কারণ সম্বন্ধ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

এই অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। জড় কার্যের মধ্যেই জড় কারণের প্রভাব সীমাবদ্ধ রাখলে, তার অতিরিক্ত যে একটা মানসিক ক্রিয়া ঘটে তার কি ব্যাখ্যা হবে? তার মনোবিজ্ঞান সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কার্যকারণ সম্বন্ধে এই বিশেষ সংস্কারের প্রভাবেই মনে হয় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। যাকে জড় বলি এবং যাকে চেতন বলি, তাদের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া সম্ভব, এটা ধরে নিলেই তার সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। বিশ্বকে বোঝবার জন্যই ব্যাখ্যা। যে ব্যাখ্যায় বোঝা সহজ হয়, তাই গ্রহণযোগ্য। তা পূর্ব হতে সঞ্চিত কোন সংস্কারের সহিত যদি সামঞ্জস্য না রাখতে পারে সেই সংস্কারকেই সরে যেতে হয়। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজাবার যন্ত্রে বসিয়ে দিলে

১ Theory of Interaction   ২ Theory of Parallelism

তার কাঁটার রেকর্ডের গায়ে ঘর্ষণের ফলে বায়ুতে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। সেই তরঙ্গ কাণের পর্দায় আঘাত করলে স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত কোষে আলোড়ন হয় আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা গান শুনি। এই অতিরিক্ত শোনাকে বিজ্ঞানের গড়া কার্য-কারণ সূত্রের সঙ্গে গ্রথিত করা যায় না; কিন্তু এইটুকু অসুবিধা ছাড়া কার্য-কারণ সম্বন্ধের আর সবগুলি সর্তই এখানে পূরণ হয়। বিজ্ঞানের পরিমাপভিত্তিক ছকে ধরা যায় না বলে ত আমরা বলতে পারি না যে এই গান শোনার কারণ বায়ু তরঙ্গ নয়।

এই রেকর্ডের দৃষ্টান্তের অপর দিকটিও আমরা লক্ষ্য করতে পারি। রেকর্ড উৎপাদিত হল কেন? শিল্পী নিজের কণ্ঠসঙ্গীতকে ধরে রাখতে চাইলেন বলেই ত। তাঁর মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগল এবং তাকে পূরণ করবার চেষ্টা হতেই রেকর্ড এর সৃষ্টি হল। যা নির্মাণ হল তা জড় বস্তু, যে ইচ্ছাটি তার কারণ তাও পূরণ হল যাকে জড় বলি তাকে অবলম্বন করে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক হতে স্নায়ুযোগে নির্দেশ গেল কণ্ঠে এবং তার মধ্য হতে মুখের পথে যে বায়ু তরঙ্গ উৎপাদিত হল তাই সে ইচ্ছার জড়ের মাধ্যমে প্রকাশ দিল। কিন্তু সেই ইচ্ছাটি জড় নয়। কাজেই এখানেও চেতন কারণ হতে জড় কার্যের উৎপত্তি হল। তা সম্ভব, কারণ বিশ্বের জড় বা চেতন রূপ তার মৌলিক গুণ নয়; বিশেষ পরিবেশে তাকে অংশত জড় এবং অংশত চেতন মনে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞান তত্ত্ব

জ্ঞানের প্রকৃতি

(১)

প্রাথমিক কথা

জ্ঞান একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তা এত সূক্ষ্ম পর্যায়ের বিষয় যে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। তাকে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে বিশ্বের পরিচয় এনে দেয় তার মত বস্তু বলে কেউ স্বীকার করবেন না। বহির্বিশ্বের যে ধরণের অস্তিত্ব বর্তমান আছে সে ধরণের অস্তিত্ব তাদের আছে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। এইটুকু মাত্র নিশ্চিত বলা যায় যে তা বিশেষ মানুষের মনে উদয় হয়। আবার বিশেষ মানুষকে অতিক্রম করে সকল জ্ঞানপিপাসু মানুষের অধিগম্য বিষয় হয়ে তা আত্মপ্রকাশ করে গ্রন্থরূপে। সেখানে যে জ্ঞান লিপিবদ্ধ হয়েছে তা বহু ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঞ্চিত হলেও গ্রন্থের আকারে ব্যক্তি বিশেষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। অন্যদিক হতেও বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার একটি মৌলিক প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। বহির্বিশ্ব মূলত জড় পদার্থ দিয়ে গঠিত, তা নীরেট, তা সহজে ইন্দ্রিয় গোচর হয়। জ্ঞান কিন্তু মানসিক পদার্থ। তা চৈতন্য প্রকৃতির। মানুষের মনের মধ্যে তার উদ্ভব, কিন্তু তার অবস্থিতি স্থান ও কালের মধ্যে নির্দেশ করা যায় না। কালের সঙ্গে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। জ্ঞান কালের অতীত, তাকে নিত্যও হয়ত বলতে পারি। তবে তার উপলব্ধি মানুষের মন ব্যতীত সম্ভব হয় না। এই হিসাবে হয়ত তা যে স্থানকে অতিক্রম করেছে তা বলা যায় না। কিন্তু যদি স্থানে তার পরোক্ষভাবে অবস্থিতি থাকে তা এমন সূক্ষ্ম পর্যায়ের যে তা ধরা যায় না। এই সামান্য আলোচনা হতেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে যে জ্ঞান যেমন সূক্ষ্ম পর্যায়ের তেমন একটি বিস্ময়কর বস্তু।

এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে জানবার আকৃতি হতে। মনে হয় এই জানবার আকৃতি প্রাণিজীবনে একটি একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। জড় বিশ্বে জানবার আকৃতি নেই, কারণ সেখানে প্রাণের পরিস্ফুরণ নেই। চাঁদের মত

বিরাট উপগ্রহে প্রাণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তা যে মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত, পৃথিবীও সেই মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত। কিন্তু প্রাণের বিকাশের সহায়ক যে অতিরিক্ত পরিবেশের প্রয়োজন, যেমন জল, বায়ুর আস্তরণ, তা সেখানে নেই। তাই সেখানে প্রাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। যে বিভিন্ন উপাদানে চন্দ্র গঠিত তাদের পরস্পরকে জানবার প্রয়োজন নেই, কারণ তারা জড়ধর্মী এবং জড়ধর্মী বস্তুর পরস্পরের সঙ্গে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কোন আদান-প্রদানের সম্পর্ক নেই। তারা কেবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পরস্পরের সন্নিধি লাভ করে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে আছে।

পৃথিবীর অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। এখানে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে এই জড় পদার্থকেই অবলম্বন করে প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটেছে। ফলে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রত্যেক প্রাণী একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, পৃথক, সক্রিয় সত্তা। একটি জড় বস্তু তা নয়। পরিবেশের সঙ্গে তা সক্রিয় পৃথক সত্তা হিসাবে ক্রিয়া করে না। প্রতি দেহধারী প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে একটি নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। সেই পরিবেশ হতে তা পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং তার মধ্যে কোন প্রতিকূল শক্তি ক্রিয়াশীল হলে, তার বিরুদ্ধে তা আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একটি বিড়াল তার খাদ্য সংগ্রহের জন্য ছোট প্রাণী ধরে খায়। এই ভাবেই তা পরিবেশ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে। ওদিকে বৃহত্তর প্রাণী তাকে আক্রমণ করতে পারে। ধরা যাক একটি কুকুর তাকে তাড়া করেছে। আত্মরক্ষার জন্য তখন সে ছুটে পালাবে। পালাতে পালাতে যদি সে জলে পড়ে যায় সাঁতার দিয়ে ভেসে থাকতে চাইবে। একটি প্রস্তর খণ্ড কিন্তু তার পরিবেশের মধ্যে নির্বিকার পড়ে থাকে। কেউ তাকে লাথি মারলে তা যন্ত্রবৎ গড়িয়ে যাবে মাত্র, জলে পড়লে তা সাঁতার কাটবে না, তলিয়ে যাবে। কারণ, তার সক্রিয়ভাবে নিজের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন নেই। তা জড় বিশ্বের অঙ্গ মাত্র। তাই তার জানবার আকৃতি নেই।

অপরপক্ষে পরিবেশকে জানবার প্রাণীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ, তার দুটি মৌলিক বৃত্তি—আত্মপুষ্টি ও আত্মরক্ষার কারণে তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ের একান্ত প্রয়োজন। কোথায় পরিবেশ অনুকূল, তা জানার প্রয়োজন পুষ্টির জন্য, আর কোথায় পরিবেশ প্রতিকূল, তা জানার প্রয়োজন আত্মরক্ষার জন্য। এই জন্যই প্রাণীর দেহে মন প্রোথিত হয়েছে এবং মনের

মধ্যে জানবার আকৃতির আবির্ভাব হয়েছে। এই জানবার আকৃতি ইতর প্রাণীর মধ্যে জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে যেটুকু সক্রিয়তার প্রয়োজন, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনের মধ্যে জ্ঞান-আহরণকে সীমাবদ্ধ রাখে না। তার কৌতূহলবোধ যেমন প্রখর তেমন চিন্তা করবার ক্ষমতারও সীমা নেই। তার মস্তিষ্ক এমনভাবে গঠিত যে তার জ্ঞানচর্চার শক্তি একরকম সীমাহীন বলা চলে। সে তাই দৈনন্দিন প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে তার জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ব্যাপ্ত করে বাড়িয়ে যেতে উদ্‌গ্রীব হয়। সে বিনা কারণে জ্ঞান চর্চা করে আনন্দ পায়। জ্ঞানের প্রতি তার আকর্ষণ তীব্র এবং অহেতুক। সুদূর অতীতে কি ঘটেছে তা জানবার কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন না থাকলেও সে প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। যে দেশে জীবন বিপন্ন করে যেতে হয় সে দেশকে জানবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়। সে উত্তর মেরুতে অভিযান চালিয়ে জীবনকে বিপন্ন করে, বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ নিয়ে সে মহাকাশেও পাড়ি দেয়। মহাবিশ্বে ছোট পৃথিবীর বুকে আশ্রিত ক্ষুদ্র মানুষ নগণ্য। তবু সে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করতে উদ্‌গ্রীব। সেই আগ্রহ হতেই দর্শনের উৎপত্তি এবং সেই চেষ্টার ফল হতেই মানুষের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছে। এই ভাবে মানুষের বিশ্বসম্বন্ধে পরিচয়লাভের চেষ্টা হতে যে বস্তুটি গড়ে উঠেছে তাই হল জ্ঞান। তা মানুষকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে বিশ্ব সম্বন্ধে পরিচয় এনে দেয়।

আমরা এই বিস্ময়কর বস্তুটিকে সূচিত করতে জ্ঞান কথাটির ব্যবহার করে থাকি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান একটি সম্বন্ধসূচক বাক্য। কাজেই তাকে জ্ঞান না বলে জ্ঞানবাক্য[১] বলাই প্রশস্ত। আগুন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে আমরা বলি আগুন উত্তাপ দেয়। শুধু আগুন বললে জ্ঞান হয় না, আবার শুধু উত্তাপ বললেও জ্ঞান হয় না। তাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ সূচিত হলে তবেই তা জ্ঞান হয়। অর্থাৎ এই জ্ঞান বাক্যে দুটি তর্কপদ[২] থাকে এবং অতিরিক্ত ভাবে তাদের সম্বন্ধ সূচক একটি পদও থাকে, যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে 'দেয়' এই পদটি। এই তিনটি পদের মধ্যে তৃতীয়টির ভূমিকা হল অন্য দুটি র

১ Judgoment ২ Term

মধ্যে একটি সম্বন্ধ সূচিত করা। এই হল জ্ঞানের রূপ। সুতরাং জ্ঞান না বলে জ্ঞান বাক্য বলাই প্রশস্ত। এখন এই সম্বন্ধের উপলব্ধি ঘটে মনের মধ্যে। তার অতিরিক্তভাবে এই সম্বন্ধ যা বোঝায় বহির্বিশ্বে তার অনুরূপ একটি সম্বন্ধও বর্তমান থাকা প্রয়োজন। তা না হলে জ্ঞানবাক্যের কোন তাৎপর্য থাকে না। আমি খেয়াল মত যে কোন দুটি পদের যে কোন প্রকারের সম্বন্ধ কল্পনা করে বাক্য রচনা করতে পারি। কিন্তু তা জ্ঞানবাক্য হবে তখনি যখন মনের বাহিরে যে বিশ্ব আছে তার সম্বন্ধে একটি প্রকৃত পরিচয় তা এনে দেবে। এইভাবেই জ্ঞানবাক্যের সত্যতা নির্ধারিত হয়। সুতরাং দুটি পদের মধ্যে সম্বন্ধসূচক বাক্য যখন অতিরিক্তভাবে বিশ্বের সম্বন্ধে সত্য পরিচয় এনে দেয় তখনি তা জ্ঞানবাক্য হয়। জ্ঞানের ক্রিয়ার সঙ্গে এইভাবে সত্যতার একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ এসে পড়ে। এই জন্য জ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই : তা হল একটি সম্বন্ধসূচক বাক্য যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা যায়।

এই জ্ঞানবাক্যের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তা নির্ণীত হয় কি উপায়ে এই জ্ঞান আহৃত হয় তার ওপর। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ প্রয়োগ করলে আলোচ্য বিষয় বোঝবার সুবিধা হবে। আমি আমার মনের মধ্যে যা ঘটছে, তা সোজাসুজি জানতে পারি। আমি অতীতের একটি সুখ স্মৃতি মনে পুনরুজ্জীবিত করছি। এই স্মৃতিটি সোজাসুজি আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হচ্ছে। অনুরূপভাবে আমি যখন মনে চিন্তা করি বা কোন শারীরিক অবস্থার সুখকর বা দুঃখকর অনুভূতি অনুভব করি, তখন তারাও সোজাসুজি আমার জ্ঞানের নাগালে এসে যাচ্ছে। এগুলি সোজাসুজি আসছে বলে এদের আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলতে পারি।

ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের মনের বাহিরে অবস্থিত যে বিশ্ব এবং তার অঙ্গীভূত বস্তুনিচয় পড়ে রয়েছে তাদের জ্ঞানও আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলির সাহায্যে সোজাসুজি লাভ করি। আমি যে ঘরে বসে আছি তাতে একটি টেবিল আছে, পাশে চেয়ার আছে, সামনের দরজা খোলা। তার বাহিরে একটি প্রাঙ্গণ। সেখানে একটি কুকুর ডাকছে। তারও বাহিরে এক ফালি রাস্তা দেখা যাচ্ছে, মানুষ যাচ্ছে, গাড়ির হর্ন বাজছে। সামান্য একফালি বিশ্বের মধ্যে এত যে বস্তুর সমাবেশ, এত যে কর্মতৎপরতা, এ সব সম্বন্ধেই আমি সোজাসুজি জ্ঞানলাভ করছি। আমার বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় তাদের পরিচয় এনে দিচ্ছে। টেবিলের আকার ও রঙ ও প্রাঙ্গণের গাছের

সম্বন্ধে পরিচয় পাচ্ছি চক্ষু দিয়ে, গাড়ির হর্ন-এর শব্দ শুনছি কাণ দিয়ে, টেবিলের কাঠিন্য অনুভব করছি স্পর্শ দিয়ে ইত্যাদি।

প্রথম শ্রেণীর মনের অভ্যন্তরের বস্তু বা ঘটনার জ্ঞানও প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত হয়, বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানও প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত হয়। এই অর্থেতারা উভয়েই প্রত্যক্ষজ্ঞান। কিন্তু একটু ভাল করে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে উভয়ে এক প্রকৃতির হলেও তাদের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। মনের অভ্যন্তরের বিষয়ের জ্ঞান একেবারে সোজাসুজি লাভ করা যায়। এখানে মাঝে মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য কোন ইন্দ্রিয় নেই। মনের মধ্যে অবস্থিত মানসিক ঘটনা বা চিন্তায় জ্ঞান একেবারে সোজাসুজি পাই। দেহের অভ্যন্তরে যন্ত্রণা বা সুখকর অনুভূতি অবশ্য স্নায়ুযোগে মনে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু সেখানেও ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা নেই। মোটামুটি চিন্তা ও হৃদয়ের অনুভূতি সোজাসুজি মনে আসে। কিন্তু বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চয় করি সেখানে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা ঘটে পরিবেশের পার্থক্য হেতু। মনের অভ্যন্তরে চিন্তা বা ইচ্ছা বা হৃদয়ের অনুভূতি রূপ যে জ্ঞানের বিষয়গুলি পাই তারা মনেই অবস্থিত। কিন্তু মনের বাহিরে যে জ্ঞানের বিষয় পাই তারা বাহিরে অবস্থিত। কাজেই তারা ইন্দ্রিয়ের দরজায় যে সংবাদ পাঠায় ইন্দ্রিয়গুলি তাকেই মনের গোচরে আনে; তবেই মন তাদের পরিচয় পায়। কাজেই বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করি তা প্রত্যক্ষ হলেও ততটা প্রত্যক্ষ নয়, মধ্যস্থের মাধ্যমে তা প্রত্যক্ষ হয়। অবস্থাটা অনেকখানি তুলনীয় হয় দুই ভিন্ন-ভাষা-ভাষী মানুষের মধ্যে অনুবাদকের সাহায্যে কথোপকথনের সঙ্গে। উভয়ে একই ভাষা জানে না বলে এমন এক তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় যে উভয়েরই ভাষা পৃথকভাবে জানে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অনেকটা সেই ধরণের ক্ষমতা রাখে। তারা বহির্বিশ্বের ভাষা বোঝে; তাই তাকে গ্রহণ করতে পারে। তার পর তাকে মনের বোধগম্য ভাষায় যেন মনের কাছে পৌঁছে দিতেও পারে। তবেই মন বহির্বিশ্বের পরিচয় পায়। সুতরাং মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিষয়ের সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাকে মনের বাহিরে অবস্থিত বিষয়ের জ্ঞান হতে প্রত্যক্ষতর বলা যায়।

আর এক শ্রেণীর জ্ঞান হতে পারে যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে সোজাসুজি নয়, পরোক্ষভাবে। কয়েকটি উদাহরণ স্থাপন করলে তাদের

প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। আমরা যখন বলি দুই আর দুই-এ চার হয় তখন প্রত্যক্ষ দুটি বস্তুকে চাক্ষুষ দেখে বলি না। বিশেষ বস্তুর ধারণা আমাদের মনের মধ্যেই আসে না। বস্তু বর্জিত সংখ্যাকে নিয়েই আমরা এই সিদ্ধান্ত করি। সুতরাং এই জ্ঞানের ভিত্তি প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করেই এই জ্ঞান সম্ভব। তাই তাকে প্রত্যক্ষ পূর্ব জ্ঞান[১] বলা হয়। এই ধরণের জ্ঞানের আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমি যখন বলি একটি বস্তুর আকৃতি একই সঙ্গে গোলাকার এবং ঘন ক্ষেত্রের[২] মত হতে পারে না, তখনও আমি বিশেষ বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই না। একটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের ভিত্তিতে তা গড়ে ওঠে। তা বলে, একই পদার্থে যুগপৎ বিপরীত ধর্মের অবস্থান ঘটে না। তাকে প্রয়োগ করেই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই। অনুরূপভাবে আমরা প্রত্যক্ষভাবে নজর করে থাকতে পারি যে যতখানি আমাদের অভিজ্ঞতায় এসেছে যে কোন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে নি, এক সময় না একসময় মারা গিয়েছে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে আমরা অনুমান করি যে সকল মানুষ মরণশীল। এও অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে তাদের একটি প্রকৃতিগত মিল আছে এই যে উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। প্রত্যক্ষ-পূর্ব জ্ঞান নির্ভর করে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের ওপর। অপরপক্ষে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে যে জ্ঞান হয় তা অনুমানের ভিত্তিতে। প্রত্যক্ষভাবে এই জ্ঞান সঞ্চিত হয় না বলে একে আনুমানিক জ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান[৩] বলা হয়।

দর্শনে আর এক শ্রেণীর জ্ঞানের কথাও উল্লেখ করা হয়ে থাকে যার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের পাওয়া প্রয়োজন। তাতে পরবর্তী আলোচনার সুবিধা হবে। কোন কোন দর্শন দাবী করে যে একটি বিভিন্ন প্রকৃতির জ্ঞান সম্ভব যা ঠিক প্রত্যক্ষের মতও নয় আবার পরোক্ষ জ্ঞানের মতও নয়। এই দর্শনগুলি মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—কোন শ্রেণীর জ্ঞানের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। এক দিকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কিন্তু যে জ্ঞান পাই তা সুস্পষ্ট। অপর দিকে পরোক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত, কিন্তু জোড়া দিয়ে দিয়ে জানার ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্পষ্টতা

১ Apriori knowledge ২ Cube
৩ Indirect or Inferential knowledge

তাতে ম্লান হয়ে যায়। তাই তাঁরা এক বিভিন্ন রীতিতে এমন ধরণের জ্ঞানের সন্ধান করেন যাতে থাকবে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা এবং পরোক্ষ জ্ঞানের ব্যাপকতা। এই শ্রেণীর জ্ঞানকে তাই অপরোক্ষানুভূতি[১] বলা হয়ে থাকে। কারণ, পরোক্ষের মত এর ক্ষেত্র ব্যাপক অথচ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত এর পরিচয় সাক্ষাৎ জ্ঞানের প্রকৃতি ধরে, অর্থাৎ অনুভূতির সহিত তুলনীয়। আমাদের দেশের যোগ দর্শন এই পথেই যোগের মাধ্যমে মৌলিক সত্তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথ নির্দেশ করেছে। শঙ্করাচার্য এই শ্রেণীর জ্ঞানকে 'অনুভব' নাম দিয়ে সূচিত করেছেন। বের্গসঁ সত্তার সামগ্রিকতা ও ধারাবাহিকতার প্রকৃতির পরিচয় লাভের জন্য একটি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় গড়ে তোলবার উপদেশ দিয়েছেন। এই রীতি ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পথ নির্দেশ করে বলে একে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানও বলা যায়।

আমরা উপরে যে জ্ঞানবাক্যগুলির দৃষ্টান্ত দিয়েছি এবং জ্ঞানবাক্য সম্বন্ধে যেটুকু সামান্য আলোচনা করেছি তা হতে একটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। তা হল এই যে জ্ঞানবাক্যের উপাদান হল দুটি পদ[২] এবং তাদের সম্বন্ধসূচক একটি ক্রিয়াপদ। যাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় হয় তাদের প্রথমটা একটি বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ হয় এবং শেষেরটি একটি বস্তু বা গুণ বা ক্রিয়াসূচক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির জ্ঞানবাক্য স্থাপন করতে পারি :

মনের অভ্যন্তরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান :

(ক) আমি চিন্তা করছি ;

বহির্বিশ্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান :

(খ) এটি একটি ফুল ;

পরোক্ষ জ্ঞান :

(গ) রাম চরিত্রবান ব্যক্তি ;

(ঘ) গরু একটি প্রাণী ;

আমরা লক্ষ্য করতে পারি ক ও খ উদাহরণে প্রথম পদটি সর্বনাম ; গ উদাহরণে তা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য ; কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদটি একটি সমগ্র শ্রেণীবাচক পদ। ঘ উদাহরণে কিন্তু একটি ব্যতিক্রম নজরে আসে। এখানে প্রথম ও শেষ দুটি তর্কপদই শ্রেণীসূচক। এর একটা কারণ আছে। সকল

১. Transcendental knowledge ২ Term

প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত। জ্ঞাতার সঙ্গেই তার সম্পর্ক এবং জ্ঞাতার বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞানে তা সীমাবদ্ধ। জ্ঞাতা ব্যতিরিক্ত অন্য কারও সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে না। আমি যখন চিন্তা করি, আমার চিন্তা আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্যে তার পরিচয় পায় না। আমি যখন একটি জিনিষকে ফুল বলে চিনতে পারি তখন তা কেবল আমারই জ্ঞানকে সূচিত করে। তা উদাহরণে অবস্থাটিও অনুরূপভাবে কিন্তু ভিন্ন রীতিতে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ জ্ঞান। এটি একটি ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে জ্ঞান।' তার ক্ষেত্র সংকুচিত। তিনটি ক্ষেত্রেই জ্ঞান একটি মাত্র জ্ঞেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যেখানে এইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্র বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে সীমিত হয় সেখানে প্রথম পদটি একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিসূচক সর্বনাম বা একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিসূচক বিশেষ্য পদ দিয়ে গঠিত হয়।

ঘ উদাহরণটির প্রকৃতি এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে বাক্যের প্রথম পদ ও শেষের পদ দুটিই জাতিবাচক। এর ফলে এখানে জ্ঞানের প্রকৃতির আশ্চর্যরকম বিস্তারলাভ ঘটেছে। এই জ্ঞান বিশেষ জ্ঞাতার মধ্যে বা একটি বিশেষ জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই জ্ঞানবাক্যটি সকল মানুষের মনের জ্ঞানের বিষয় হবার ক্ষমতা রাখে। অতিরিক্তভাবে জ্ঞেয় বস্তুটিও একটি বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষ সম্বন্ধেই তা ব্যবহার্য। এখানে জ্ঞানের ক্ষেত্রের এইরূপ অভাবিতভাবে বিস্তারলাভ করবার কারণ হল জ্ঞানবাক্যের দুটি পদই এখানে শ্রেণীবাচক। সুতরাং আপাতত আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সাধারণত জ্ঞানবাক্যে সর্বক্ষেত্রেই দ্বিতীয় পদটি শ্রেণীবাচক হয় এবং প্রথম পদটি শ্রেণীবাচক হতেও পারে, নাও পারে। শ্রেণীবাচক হলে জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটে এবং না হলে তা বিশেষে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

এই শ্রেণীবাচক শব্দগুলি ভারতীয় দর্শনে সামান্য বলা হয়।[১] আমরা তাদের সার্বিক সংজ্ঞাও বলতে পারি, কারণ তারা একটি শ্রেণীর সকল বিশেষ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। উপরে উদাহরণে 'চিন্তা' সার্বিক, 'ফুল' সার্বিক, 'চরিত্রবান' সার্বিক। এদের কোনটি ক্রিয়া নির্দেশ করে, কোনটি বস্তু নির্দেশ করে, কোনটি গুণ নির্দেশ করে। সকলেরই বৈশিষ্ট্য একই, অর্থাৎ তাদের প্রয়োগ বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকলের মধ্যে। এ

১ পাশ্চাত্য দর্শনে এদের universal বলে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই এক।

বিষয় আমাদের পরে বিস্তারিত আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে হবে। বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে এইটুকু পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হবে মনে হয়।

এই সার্বিকের তাৎপর্য বহুদূর প্রসারী। মানুষের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এই সার্বিকের আশ্রয়ে। সার্বিক সংজ্ঞা যদি মন না গড়ে তুলতে পারত, তা হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও সম্ভব হত না, পরোক্ষ জ্ঞানও সম্ভব হত না। সুতরাং বলা যায় এই সার্বিক সংজ্ঞাই হল মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকৃত উপাদান। একটি বাড়ী যেমন গড়ে ওঠে ইটের পর ইটকে সাজিয়ে, মানুষের জ্ঞানসৌধও তেমন গড়ে ওঠে জ্ঞানবাক্যের সঙ্গে জ্ঞানবাক্য সাজিয়ে। একটি সার্থক জ্ঞানবাক্য আবার গঠিত হয় দুটি সার্বিক সংজ্ঞার সাহায্যে। দুটি সার্বিক সংজ্ঞাও তাদের সম্বন্ধই যেন জ্ঞানসৌধ গাঁথবার ইট। কাজেই সার্বিকের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সার্বিকের ব্যবহার সম্ভব না হলে যে উচ্চতর স্তরে মানুষের পক্ষে জ্ঞানক্রিয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ত, তা বোঝা যায় সাধারণ প্রাণীর জ্ঞানক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের জ্ঞানক্রিয়ার তুলনা করলে. ইতর জীবও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করে এবং চিন্তা করে যে তার কর্তব্য নির্দ্ধারণ করে তা বোঝা যাবে দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করলে। ধরা যাক আমার একটি পোষা কুকুর আছে। আমি যখন বাড়ী ফিরি সে লেজ নেড়ে আমাকে স্বাগত জানাতে অভ্যস্ত। একদিন হয়ত এমন হল যে আমি ইচ্ছামত সাজবার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে একটি সাধুর বেশে বাড়ী ফিরছি। আমার গৈরিক বসন, মুখভরা দাড়ি আর মাথায় জটা দেখে সে আমায় চিনতে পারল না। তাই প্রথম দর্শনে আমাকে অপরিচিত জ্ঞান করে ঘেউ ঘেউ করে আমার আগমনে প্রতিবাদ জানাতে লাগল। কিন্তু যখন খুব কাছে এলাম তখন আমার ঘ্রাণ পেয়ে চিনতে পেরে লেজ নেড়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

এটি বহু সম্ভাব্য দৃষ্টান্তের একটি। এই দৃষ্টান্ত হতেই বেশ বোঝা যায় যে কুকুরের মত জীবও আমাদের মত জ্ঞান লাভ করতে এবং প্রথম চেষ্টায় লব্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হলে তাকে অতিরিক্ত তথ্যের সাহায্যে সংশোধন করবার এবং চিন্তা করে নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এই ধরণের জ্ঞান লাভ বিশেষের সাহায্যেই সংঘটিত হয়। সে মনিবকে ব্যক্তি হিসাবেই চেনে। তার সঙ্গে যার মিল নেই সে মনিব হতে বিভিন্ন, সেও বিশেষ। বিশেষকেই সে প্রীতি করে, বিশেষকেই সে শত্রু জ্ঞান করে। তার জ্ঞান

সর্বক্ষেত্রেই বিশেষকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং তার আচরণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই সাধারণত গড়ে ওঠে। বিশেষকে যে সে চিনতে পারে, তাও স্মরণ শক্তির সাহায্যে। তার মনিবের আকৃতি সম্বন্ধে তার স্মৃতি আছে, তার দেহের বিশেষ ঘ্রাণ সম্বন্ধেও তার স্মৃতি আছে। তাদের সাহায্যেই সে প্রথমে চিনতে তাকে ভুল করে এবং পরে চিনতে পারে। সুতরাং ইতর জীবের চিন্তা বিশেষকে অবলম্বন করে চিন্তা, তা মনে হয় সার্বিকের প্রয়োগ বর্জিত। তাই তা কেবল বর্তমানে সীমাবদ্ধ। সেই কারণে তার আচরণ বর্তমানে সীমাবদ্ধ।

সার্বিক সংজ্ঞা গড়তে পারে বলেই মানুষের ভাষা আছে; অন্য জীবের তা নেই। সার্বিক সংজ্ঞা ব্যবহার করতে পারে বলেই মানুষ শুধু বর্তমান নয়, অতীত ও ভবিষ্যত সম্বন্ধেও জ্ঞান সঞ্চয় করবার ক্ষমতা রাখে। সার্বিক সংজ্ঞার প্রয়োগেই মানুষের জ্ঞান প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে সর্বকালের এবং সর্বজনের অধিগম্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। এক কথায় বলা যায়, মানুষের বিরাট সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই সার্বিকের ব্যবহারের সাহায্যে। তাই মানুষের কাছে সার্বিকের তাৎপর্য খুবই সুদূরপ্রসারী।

(২)

জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা

উপরে জ্ঞানের সাধারণ পরিচয় দিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা হতে বোঝা যায় জ্ঞান জিনিষটি কত সূক্ষ্ম পর্যায়ের এবং তাকে ঘিরে কত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তাকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা গড়ে উঠেছে। মানুষের বিশ্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক বা আংশিক পরিচয়ের চেষ্টা হতেই এই জ্ঞানের উদ্ভব। আংশিক পরিচয় পাই বিজ্ঞানে আর দর্শনে চেষ্টা হয় তার একটি সামগ্রিক পরিচয় দেবার। এইভাবে বিশ্বকে জানবার তাগিদে মানুষের চিন্তার ফলে একটি নূতন জিনিষ সৃষ্টি হয়। তাকে আমরা বিশ্ব পরিচিতি বলতে পারি। হয়ত স্থূলভাবে তার সঙ্গে মূল বস্তুর সঙ্গে চিত্রের যে সম্বন্ধ আছে তার তুলনা করা যায়। কিন্তু সে উপমা নিতান্তই স্থূল। আমাদের মনে রাখতে হবে এই ছবি মানসিক এবং তা যান্ত্রিক রীতিতে গড়া নয়, তা অনেক মনীষীর অনেক চিন্তা, অনেক সাধনার ফলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। তা আদৌ প্রতিকৃতি স্থানীয় কিনা তা নিয়ে বিতর্কও আছে।

এখন প্রসঙ্গত দর্শনের আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাও এসে পড়ে। কোন শাস্ত্র সে আলোচনায় নিজেকে নিয়োগ করবে সেই হল প্রশ্ন। এখন জ্ঞান জিনিষটির প্রকৃতি যাকে বলে সৎ বস্তু, অর্থাৎ যার স্থানে এবং কালে কিম্বা শুধু কালে অবস্থিতি আছে[১] তা হতে ভিন্ন। বহির্বিশ্বে যাকে জড়বস্তু বলি তার অবস্থিতি স্থানে ও কালে আছে। তাদের অস্তিত্ব গুণ আছে বলে তাদের আমরা সৎ বলি। বেদান্তের ব্রহ্মকেও সৎ বলা হয়, যদিও অদ্বৈতবাদে তাঁকে নির্বিশেষ চিৎরূপে কল্পনা করা হয়, কারণ সকল সৎ বস্তুই তাঁতে আশ্রিত। কিন্তু এমন পদার্থ আছে যার অস্তিত্ব আছে বলা যায় না অথচ যাদের ক্রিয়াশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই। সার্বিক সংজ্ঞাগুলি তাদের সুন্দর উদাহরণ। জ্ঞানবাক্যের রচনায় ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের উৎপাদনে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য, অথচ আমরা ভেবে পাব না তারা কোথায় আছে। তাদের অস্তিত্ব আছে কিনা এই নিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে তুমুল তর্কের ঝড় বয়ে গেছে, অথচ এখনও তার মীমাংসা হয় নি। সে আলোচনাও প্রসঙ্গত পরে এসে পড়বে। এখানে এইটুকু বললেই চলবে যে তাদের পৃথক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেইজন্যই বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলতে চেয়েছেন তাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, একটা সূক্ষ্ম পর্যায়ের অস্তিত্ব আছে। তা সূচিত করতে তিনি উপ-অস্তিত্ব[২] কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রশ্নটিও যথাস্থানে আমাদের আলোচনা করতে হবে। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বিজ্ঞান যে বস্তুর আলোচনা করে তা আরও স্থূল প্রকৃতির। কাজেই বিজ্ঞানে সে আলোচনা প্রশস্ত বিবেচিত হয় নি। সুতরাং জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়ে। তার জটিলতা এবং প্রকৃতির সূক্ষ্মতার জন্যই শুধু তা দর্শনের আকর্ষণীয় আলোচ্য বস্তু বলে পরিগণিত নয়; তার একটি বিশেষ প্রয়োজনও আছে। বিশ্বকে জানবার চেষ্টায় জ্ঞানের উৎপত্তি। সে চেষ্টায় যে ফল পাই, তা কতখানি নির্ভরযোগ্য সেটিও প্রসঙ্গত আলোচনায় আবশ্যিক বিষয় হয়ে পড়ে। এই সূত্রে যে সকল প্রশ্ন স্থাপিত হয় তারও সমাধান এই কারণেই প্রয়োজন।

এখন আমরা সংক্ষেপে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে যে মূল সমস্যাগুলির উদ্ভব হয় তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি। সেই সমস্যাগুলি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তারা এই:

১ Existence ২ Subsistence

১) জ্ঞানবাক্যের প্রকৃতিগত সমস্যা ;

২) জ্ঞানের উৎপত্তি সংঘটিত হয় কিভাবে ;

৩) এবং জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত রীতি কি। আমরা এই সমস্যাগুলির একে একে পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

জ্ঞানবাক্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে এই অধ্যায়ের আরম্ভে করা হয়েছে। তা করা হয়েছে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশের প্রস্তুতি হিসাবে। কিন্তু বিষয়টি এত জটিল যে তার একটি বিস্তারিত আলোচনারও প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তার জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে। জ্ঞানবাক্যের উপাদান প্রত্যক্ষ জ্ঞানও বটে, পরোক্ষ জ্ঞানও বটে। তাতে বিশেষও প্রযুক্ত হয়, সার্বিক সংজ্ঞাও প্রযুক্ত হয়। এই ভিত্তিতে কত শ্রেণীর জ্ঞানবাক্য হতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকের মূল্য কতখানি, সেই প্রশ্ন এসে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানবাক্যের প্রয়োগক্ষেত্রের ব্যাপকতার প্রশ্নও এসে পড়ে।

সর্বোপরি জ্ঞানবাক্যের মূল উপাদান সার্বিক সংজ্ঞা বা সামান্য এমন একটি জটিল বস্তু যে তার প্রকৃতির প্রশ্নও আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। এখনি উল্লেখ করা হয়েছে যে সামান্যের প্রকৃতি কি, তার পৃথক অস্তিত্ব আছে কি নেই, তারা কত প্রকারের হতে পারে—এইসব প্রশ্ন নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে প্রচুর আলোচনা হয়ে গেছে। সেই আলোচনাও প্রসঙ্গত এসে পড়ে। আমরা দেখব প্রাচীন কাল হতেই এই সামান্যের প্রতি নানা দার্শনিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে তাদের প্রকৃতি নিয়ে প্লেটো এবং এরিস্টটল-এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে তাদের প্রকৃতি নিয়ে বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। মধ্য যুগে পাশ্চাত্য দর্শনে এই প্রশ্ন একটি মূল আলোচ্য বিষয়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান কালের পাশ্চাত্য দর্শনেও তাদের নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই সমস্যা নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন, কিন্তু তবুও তিনি তার সন্তোষজনক সমাধান হয়েছে বলে মনে করেন না। কাজেই এই বিভিন্ন মতের আলোচনা এবং তাদের মধ্যে একটি সন্তোষজনক মীমাংসার চেষ্টার প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় সমস্যা হল জ্ঞানবাক্যের উৎপত্তি সংঘটিত হয় কি করে। এ প্রশ্নটিও একান্ত জটিল। এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত যে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রশ্ন

এসে পড়ে তাদের উল্লেখ করলেই সে জটিলতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা জানি জ্ঞান মূলত দুই প্রকারের হতে পারে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং পরোক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানসিকও হতে পারে, ইন্দ্রিয়জাতও হতে পারে। তাদের ভিত্তি করেই পরোক্ষ জ্ঞান এসে পড়ে। তাদের উৎপত্তি কিভাবে হয় না জানলে, তাদের সহিত আমাদের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং এগুলি মূল প্রশ্নের আনুষঙ্গিক প্রশ্ন হিসাবে আসে।

তার পর প্রশ্ন আসে আমরা যে প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করি তাতে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞাতার কি সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে? এই পরিচয় দুভাবে ঘটতে পারে। প্রথম, যেমন আয়নার বুকে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে। দ্বিতীয়, যেমন সোজা না দেখে আয়নার প্রতিবিম্ব হতে প্রত্যক্ষ বস্তুর ধারণা করা যায়। দ্বিতীয় রীতিটি জলের অভ্যন্তরে গতিশীল অর্ণবজানে[১] অর্থাৎ যাকে আমরা চলতি ভাষায় ডুবো জাহাজ বলি তাতে ব্যবহার করা হয়। তাতে বাহিরের বস্তুর পরিচয় সংগ্রহ করা হয় আয়নায় যে প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তার সাহায্যে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আবার প্রত্যক্ষের একটি পরোক্ষ রীতির সন্ধান মিলে যায়। প্রশ্নটি বিশেষ করে ওঠে বহির্জগত সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের প্রসঙ্গে। এই ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানে কি জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎ সংযোগ হয়, যেমন আয়নার সঙ্গে যার প্রতিবিম্ব তা ধারণ করে তার হয়, না কোন তৃতীয় বস্তুর মধ্যস্থতায় তাদের পরিচয় ঘটে, যেমন ডুবো জাহাজের ক্ষেত্রে ঘটে? জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় এই প্রশ্নটি গভীর জটিলতা সৃষ্টি করে বসে। কাজেই তারও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তার পর আমরা আরও জেনেছি যে জ্ঞানবাক্য দুটি তর্কপদের শুধু সম্বন্ধ নির্ণয় করে না, তার সঙ্গে তার সত্যতা সম্বন্ধে একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। দুটি পদের সম্বন্ধ তখনি প্রকৃত জ্ঞানবাক্যে পরিণত হয়, যখন তার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের অবকাশ থাকে না, অর্থাৎ তার সত্যতায় আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং সত্য[২] বলতে আমরা কি বুঝি আর তার বিপরীত সংজ্ঞা ভ্রান্ত[৩] বলতেই বা কি বুঝি, সে প্রশ্নও প্রসঙ্গত এসে পড়ে সেই প্রসঙ্গেই আরও একটি জটিল প্রশ্নের উদয় হয়। আমরা বুঝি যে জ্ঞান বাক্যের বিশ্বাসভাজন হতে হলে, তার কিছু সর্ত পালন করতে হয়। যে

১ Submarine ২ Truth

৩ Error

সর্তটি কি? তা কি বহির্বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি?[১] আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এটা তাই হওয়া উচিত; কিন্তু সে সম্পর্কেও বিতর্ক ওঠে। এমন দার্শনিক মতও আছে, যা বলে যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে না। তা যদি হয়, তা হলে সঙ্গতি হয় কিনা জানব কি করে? এই মত তাই বলে যে জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ সুমিতির[২] ওপর, অর্থাৎ অন্য প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সহিত তার সন্তোষজনক সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে। সুতরাং সত্য বলতে কি বুঝি, তার মীমাংসা করতে গিয়ে আমরা একটি বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। তা হল সত্য কি সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে, না সুমিতির ওপর? তারও একটি সমাধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কিত মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নানা জটিল প্রশ্ন এসে পড়ে।

জ্ঞান তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় মৌলিক প্রশ্নের বিষয় হল জ্ঞানলাভের প্রশস্ত রীতি কি হওয়া উচিত। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে জ্ঞান অর্জন হয় তিনটি উপায়ে। প্রথম, প্রত্যক্ষভাবে, দ্বিতীয়, পরোক্ষভাবে এবং তৃতীয় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান নয়, অথচ প্রত্যক্ষের মত সুস্পষ্ট অনুভব দ্বারা। তাকে অপরোক্ষানুভূতি বলা হয়। এদের প্রত্যেকটি অবলম্বন করে তিনটি ভিন্ন জ্ঞান-অর্জন রীতি গড়ে ওঠে। বিশেষ বিশেষ দার্শনিক একটি বিশেষ রীতিকে বরণ করে নিয়ে অন্যদের বর্জন করেন। কেহ একাধিক রীতি প্রয়োগ করেন। এইভাবে এই তিনটি বিভিন্ন রীতির মধ্যে একটি বিরোধভাব এসে পড়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে এই বিরোধের ভিত্তিতে জটিল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তার আলোচনা ও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে।

এতগুলি জটিল প্রশ্নের একত্র আলোচনা সম্ভব নয়। তাই তাদের পৃথক ভাবে আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জ্ঞানতত্ত্বের তিনটি মৌলিক সমস্যা —প্রথম, জ্ঞান বাক্যের প্রকৃতি সম্পর্কে, দ্বিতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে এবং তৃতীয় জ্ঞানের রীতি সম্পর্কে। প্রত্যেকটির সঙ্গে যে সকল মূল আনুষঙ্গিক প্রশ্ন জড়িত তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে দেওয়া হয়েছে। এখন বর্তমান অধ্যায় প্রথম সমস্যাটির আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করি। অর্থাৎ বর্তমান অধ্যায়ে বিশেষ আলোচনার বিষয় হবে জ্ঞানবাক্যের প্রকৃতি কি। অন্য দুটি সমস্যা পরবর্তী দুটি পৃথক অধ্যায়ে পৃথকভাবে আলোচিত হবে।

১ Correspondence ২ Coherence

(৩)

জ্ঞানবাক্যের বিশ্লেষণ

আমরা উপরে জ্ঞানবাক্যের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তাতে দেখেছি যে জ্ঞানবাক্যে দুটি পদ থাকে এবং তাদের সম্বন্ধসূচক একটি ক্রিয়াপদ থাকে। সম্বন্ধসূচক পদটির ভূমিকা গৌণ, তা কেবল সম্বন্ধ নির্দেশ করে। মূল ভূমিকা গ্রহণ করে দুটি তর্কপদ। তাদের মধ্যে প্রথমটির আবার তাৎপর্য বেশী, কারণ তার সম্বন্ধেই জ্ঞান আহরণ করা হয়। তাই তার ভূমিকা সর্ব প্রধান। তাকে উদ্দেশ্য করেই দ্বিতীয় তর্কপদটি কিছু বলে, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে কিছু তথ্য এনে দেয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমি যখন বলি 'গোলাপ একটি ফুল', তখন গোলাপকে উদ্দেশ্য করে বলি তা হল এক শ্রেণীর ফুল। এখানে গোলাপকে উদ্দেশ্য করে বলি বলে তাকে আমরা উদ্দেশ্যপদ বলি, আর দ্বিতীয় পদের সাহায্যে কিছু বলি বলে তাকে বিধেয় বলি। এখানে সংযোজক ক্রিয়াপদটি লুপ্ত অবস্থায় আছে। তর্কশাস্ত্র সম্মত রূপে তাকে স্থাপন করতে হলে বলব: 'গোলাপ হল একটি ফুল'।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে জ্ঞানবাক্যের তর্কপদগুলি বিশেষকেও নির্দেশ করতে পারে, সামান্যকেও নির্দেশ করতে পারে। অর্থাৎ তা সার্বিক সংজ্ঞাও হতে পারে, আবার একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে সূচিত করে এমন পদও হতে পারে। উপরের উদাহরণে দেখা যাবে দুটি পদই সার্বিক সংজ্ঞা নির্দেশ করছে। পরোক্ষ আনুমানিক জ্ঞানে উভয় পদই সার্বিক হয়ে থাকে। বর্তমান উদাহরণটি আনুমানিক জ্ঞানের উদাহরণ বলে এখানে উভয় পদই সার্বিক প্রকৃতির হয়েছে।

বিশেষকে সূচিত করে, এমন জ্ঞানের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে। একটি উদাহরণ দিয়ে এ বিষয় আলোচনা হলে বুঝতে সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে এই সাধারণের পরিচিত জ্ঞানবাক্যটি গ্রহণ করা যেতে পারে:

এটি একটি বিড়াল

এখানে প্রথম পদটি একটি নির্দেশক সর্বনাম পদ। তার প্রকৃতি হতেই বোঝা যায় যেটিকে আমি চিনতে চেষ্টা করছি সেটি হচ্ছে একটি অনির্দিষ্ট বস্তু, তার প্রকৃত পরিচয় এখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। তার একটি কারণ আছে।

উপরের দৃষ্টান্তটি দেখিয়ে দেয় কি ভাবে মনের বাহিরে অবস্থিত একটি সত্তার সহিত আমরা পরিচয় লাভ করি। একে বলা হয় ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান[১]। আমরা প্রথমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হতে এই অনির্দিষ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে তথ্য পাই। যেমন তার চারটি পা আছে, তা ম্যাও ম্যাও করে ডাকে, তার গায়ের লোম স্পর্শে নরম ঠেকে ইত্যাদি। এদের ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য[২] বলা হয়ে থাকে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের মনের মধ্যে এই তথ্যগুলি পৌঁছে গেলেই যে তাকে চিনতে পারি, তা নয়। আমাদের মনে একটি সার্বিক সংজ্ঞার[৩] ধারণা আছে যাকে আমরা 'বিড়াল' বলি। তার উপাদান হল এই বস্তুটিকে যে বিশেষ গুণগুলি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে তারা। আমাদের মন দেখে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বস্তুটি সম্বন্ধে যে তথ্যগুলি পাচ্ছি তার সঙ্গে 'বিড়াল' এই সার্বিক সংজ্ঞার গুণ মিলে যাচ্ছে। তখন তাকে বিড়াল বলে চিনতে পারি। এইভাবে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞানে আমরা উদ্দেশ্যপদ হিসাবে একটি নির্দেশক সর্বনামকে পাই এবং একটি সার্বিক সংজ্ঞাকে পাই বিধেয় পদ হিসাবে। সুতরাং এখানে জ্ঞানবাক্যটি গঠিত হয়েছে একটি বিশেষ পদ[৪] ও একটি সার্বিক পদ দিয়ে।

উপরের আলোচনা হতে আমরা এখন দুই শ্রেণীর জ্ঞানবাক্যের সহিত পরিচিত হলাম। প্রথম শ্রেণীতে দুটি পদই সার্বিক এবং এখানে আমরা পাচ্ছি আনুমানিক জ্ঞানকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উদ্দেশ্য পদটি বিশেষ পদ[৫] এবং বিধেয়টি সার্বিক পদ[৬]। এখানে বিশেষের জ্ঞান পাচ্ছি। সাধারণত জ্ঞান এই দুই শ্রেণীরই হতে পারে। এ হতে আমাদের মনে হতে পারে যে জ্ঞানবাক্য গঠন করতে অন্তত একটি সার্বিক পদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপরের দুটি দৃষ্টান্তই তা সমর্থন করে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর ধারণায় অন্তত একটি সার্বিক পদ ব্যবহার না করলে কোন জ্ঞানবাক্য গঠন করা সম্ভব হয় না[৭]। কিন্তু মনে হয় এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করা যায় না। এমন জ্ঞানবাক্যও রচনা করা যায় যেখানে উভয় পদই বিশেষকে সূচিত করে। নীচের উদাহরণটি এই প্রসঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে:

১ Perception
২ Sense data
৩ Concept
৪ Particular term
৫ Particular term
৬ Universal term

৭ "No sentence can be made up without at least one word which denotes a universal." The Problems of Philosophy, Chap. IX

ইনি (হলেন) রামবাবু

এখানে দেখা যাবে দুটি পদই বিশেষকে সূচিত করে। একটি অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে জানতে চাই তিনি কে ; অনুসন্ধানে জানতে পারি তিনি রাম বাবু। এখানে উদ্দেশ্য পদটি নির্দেশক ব্যক্তিবাচক সর্বনাম এবং দ্বিতীয়টি একটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য পদ। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত জ্ঞানবাক্যের সার্বিক এবং বিশেষ পদের প্রয়োগকে ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণী পাওয়া যায়। তারা হল এই :

(১) কেবল বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ সূচক—
উদাহরণ : ইনি রাম বাবু
এটি আমার জামা

(২) একটি বিশেষ এবং একটি সার্বিকের সম্বন্ধ সূচক—
উদাহরণ : এটি একটি ফুল
আমি দেখছি

(৩) কেবল সার্বিকের সঙ্গে সার্বিকের সম্বন্ধ সূচক—
উদাহরণ : মানুষ একটি জীব
লোহা কঠিন পদার্থ
অগ্নি উত্তাপ দেয়

এই বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানবাক্য সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। প্রথম দৃষ্টান্তে 'এটি আমার জামা' এই উদাহরণে জামা পদটি আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে একটি সার্বিক সংজ্ঞা। এ সন্দেহের ভিত্তি আছে। কিন্তু এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন, যা স্বভাবত সার্বিক প্রকৃতির এমন পদও প্রসঙ্গের গুণে বিশেষে পরিণত হতে পারে। আমি যখন বলি 'এটি একটি জামা' বা 'মানুষ জামা পরে' তখন উভয় ক্ষেত্রেই এটি স্পষ্টতই সার্বিক পদ। কিন্তু যখন বলি 'এটি আমার জামা' তখন সার্বিক দিয়ে গঠিত হলেও বিশেষণ গুণ বিশিষ্ট সর্বনাম দ্বারা চিহ্নিত হওয়ায় তার সার্বিকত্ব লোপ পেয়ে তা বিশেষে পরিণত হয়েছে।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেরও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখানে 'আমি দেখছি' এই জ্ঞানপদটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি একটি মানসিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদাহরণ। অপর পক্ষে একই সঙ্গে উদ্ধৃত অপর জ্ঞান বাক্য 'এটি একটি ফুল' একটি ইন্দ্রিয় জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদাহরণ। মনের

মধ্যে যা অনুভব করা যায় তাই মানসিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যেমন চিন্তা করা, সুখ দুঃখ বোধ করা ইত্যাদি। তারা মনের মধ্যে ঘটে বলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এখানে পরস্পর সোজাসুজি সংস্পর্শে আসে। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানে এমন সোজাসুজি সংস্পর্শ ঘটে না, সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে।

উপরে যে তিন শ্রেণীর জ্ঞানবাক্যের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সামান্য ও বিশেষের ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা এখনি আলোচনা করলাম। অতিরিক্ত-ভাবে তাদের পরস্পরের প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। উপরের বিভাগ কেবল উপাদানগত বিভিন্নতাকে যে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি তা হলে তা বোঝা যাবে। প্রথম কেবল দুটি বিশেষ পদকে দিয়ে গঠিত জ্ঞানবাক্যের কথা ধরা যাক। আমি যখন বলি 'ইনি হলেন রামবাবু', তখন একটি অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্টরূপে সূচিত করি। তার তাৎপর্য হল রামবাবু নামে এক বিশেষ ব্যক্তি আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি পরিচিত এবং তাঁর আকৃতি কি রকম তা আমার জানা আছে ইত্যাদি। তাঁকে দেখে যে আবার চিনে ফেলেছি এবং অন্যের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি এই জ্ঞানবাক্যটি সেই কথা বলে।

এখানে তা হলে দুটি জিনিষ লক্ষণীয়। প্রথম, এখানে ব্যক্তি বিশেষটির সহিত পরিচিত হই আমার স্মৃতি শক্তির সাহায্যে। আমার স্মৃতি ভাণ্ডারে বহু পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের মধ্যে রামবাবু একজন। এই ব্যক্তির আকৃতির সহিত স্মরণে ধরে রাখা রামবাবুর আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমি তাঁকে চিনি। সুতরাং এই জ্ঞানবাক্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এখানে পরিচয়ের ভিত্তি হল স্মরণ-শক্তি। জ্ঞানের উদ্রেকে স্মৃতিরই এখানে মুখ্য ভূমিকা। দ্বিতীয় লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে এই জ্ঞান অতি সংকুচিত। যাকে জানতাম তাকে আবার দেখলাম এইটুকু মাত্র। অর্থাৎ তা হল এক রকম স্মৃতির পুনরুদ্রেক। দৈনন্দিন জীবনে তা কাজে লাগে; কিন্তু তার ক্ষেত্র একান্তই সংকুচিত হওয়ায় তাকে সার্থক জ্ঞান বলতে পারি না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান হল জ্ঞানেন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। সেই জন্য তার উদ্দেশ্য পদটি এমন একটি বিশেষ বস্তু সূচিত করে যার ওপর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে। তাই সাধারণ ক্ষেত্রেই তা একটি অনির্দিষ্ট বিশেষকে সূচিত করে এমন একটি সর্বনামের দ্বারা চিহ্নিত

হয়। তা ততক্ষণ অনির্দিষ্ট যতক্ষণ না ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের সহিত সার্বিকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাকে চিনতে পারা যায়। অর্থাৎ এখানে একটি বিশেষ বস্তুকে ইন্দ্রিয় বাহিত তথ্যের সাহায্যে আমরা চিনি। এখানেও প্রথম শ্রেণীর মত চেনার কাজ এসে পড়ে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। প্রথম শ্রেণীতে আমরা চিনি স্মৃতির সাহায্যে; কিন্তু এখানে আমরা চিনি ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যকে সার্বিকের সহিত সংযুক্ত করে। সার্বিক যে স্মৃতি নয় তা সহজেই বোঝা যায়। স্মৃতি হল পূর্বের অভিজ্ঞতা যা মনের ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে এবং প্রয়োজন হলে যাকে স্মরণে আনা যায়। অপর পক্ষে যাকে সার্বিক বলি তা একই ধরণের পদার্থ সম্বন্ধে তাদের মৌলিক গুণগুলিকে ভিত্তি করে তাদের একটি শ্রেণীগত মানসিক রূপ। তাই তাদের মানসিক ধারণা[১] বলা হয়। মন তাদের আবিষ্কার করে প্রধানত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং খানিকটা স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে। স্মৃতির সহিত জড়িত হলেও তা স্মৃতি হতে পৃথক।

দ্বিতীয় কথা এই শ্রেণীব জ্ঞানবাক্যের ক্ষেত্রও বিশেষভাবে সংকুচিত। আমি যখন বলি 'এটি একটি ফুল', তখন আমার জ্ঞান একটি মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়বাহিত বিশেষের জ্ঞান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধরনের জ্ঞানই বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় এনে দেয়। তার সাহায্যেই ইতর জীব তথা মানুষ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে নিজেকে পৃথক জীবধর্মী সত্তা হিসাবে সংরক্ষিত করে নিজের পুষ্টি এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। সেটুকু হল তার ব্যবহারিক সুবিধা। জীবন ধারণের জন্যই তার অতি অবশ্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু অতিরিক্ত-ভাবে তার আরও সার্থকতা আছে। এই ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আমাদের বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় এনে দেয়। সেই পরিচয়ই হল ভিত্তি যার ওপর নির্ভর করে আমাদের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞান এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকেই উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে গড়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান হতেই আমাদের সার্বিকের সহিত পরিচয় হয় এবং সার্বিকের সহিত সার্বিককে যুক্ত করে পরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। পরিণতিতে এই পরোক্ষজ্ঞানকে সুসংবদ্ধভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন গড়ে ওঠে। সুতরাং ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্র সংকুচিত হলেও তার তাৎপর্য হল সুদূর প্রসারী। জ্ঞান সঞ্চয়ের কাজে তা একটি মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে।

১ Concept

তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞানের প্রকৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান হতে রীতিমত ভিন্ন প্রকারের। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশেষ সীমাবদ্ধ, কিন্তু এই শ্রেণীর জ্ঞান সাধারণভাবে বিস্তারিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই শ্রেণীর জ্ঞানবাক্য দুই ধরণের হতে পারে। প্রথমটিতে উদ্দেশ্যপদ যাদের সূচিত করে তাদের অংশের সহিত বিধেয় পদটি সংযুক্ত হয়। আর দ্বিতীয় ধরণের জ্ঞানবাক্যে উদ্দেশ্যপদ যাদের সূচিত করে তাদের সকলের সম্পর্কে বিধেয় পদটি প্রযুক্ত হয়। দুটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে :

১) উদ্দেশ্যের উপর বিধেয়ের আংশিক প্রয়োগ :

কতকগুলি মানুষ শ্বেতকায়

২) উদ্দেশ্যের উপর বিধেয়ের সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ :

সকল গরুর খুর আছে

সুতরাং প্রথমটিকে আংশিক জ্ঞানবাক্য[১] বলা যায় এবং দ্বিতীয়টিকে সার্বিক জ্ঞানবাক্য বলা যায়[২]।

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উভয় ক্ষেত্রেই দুটি সার্বিকের মধ্যে সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে, কিন্তু প্রথমটিতে একটি ক্ষেত্রে সার্বিক সীমিত করা হয়েছে বলে জ্ঞানবাক্যের ক্ষেত্রের পার্থক্য এসে পড়েছে। প্রথমটিতে যে জ্ঞানবাক্য পাই তা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান হতে ব্যাপক হলেও দ্বিতীয়টির তুলনায় জ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক সংকুচিত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানকেই আমরা সার্থক জ্ঞান বলতে পারি, কারণ তার প্রয়োগ সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। এখানেই আমরা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং সার্থক জ্ঞান পাই। সার্থক জ্ঞান বলছি এই কারণে যে এখানেই সব থেকে নির্ভরযোগ্য এবং নিশ্চিত জ্ঞান পাই, কারণ প্রয়োগের কোন সীমা নাই। তা উদ্দেশ্যপদ যাদের সূচিত করে তাদের সকলের সম্বন্ধে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ব্যাপ্ত করে জ্ঞান এনে দেবার ক্ষমতা রাখে। এই শ্রেণীর জ্ঞানকে উপাদান রূপে ব্যবহার করেই বিজ্ঞান ও দর্শন গড়ে ওঠে।

সুতরাং এই সার্বিক পরোক্ষ জ্ঞানবাক্যের তাৎপর্য সব থেকে বেশী। এর সঙ্গে তাই আরও গভীর পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমেই আমরা তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে এই সার্বিক জ্ঞানের একটি শ্রেণী বিভাগ করে নিতে পারি। এই প্রসঙ্গে কাণ্ট-এর ব্যবহৃত জ্ঞান-

১ **Particular Proposition** ২ **Universal Proposition**

বাক্যের প্রকার ভেদের রীতির উল্লেখের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার মীমাংসা'[১] নামে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থে জ্ঞানবাক্যের প্রকার[২] তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রথমেই করে নিতে হয়।

তিনি জ্ঞানের প্রকারগুলিকে চারটি মৌলিক শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত তিনটি উপশ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। এইভাবে সর্বসমেত বারোটি প্রকার আমরা পাই। এখন আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রস্তাব হয়েছে সার্বিক জ্ঞানবাক্যগুলিকে তাদের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় কিনা। এখানে কাজেই প্রশ্ন ওঠে কাণ্ট-প্রবর্তিত প্রকারগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় কিনা। সেটা ঠিক করতে তাঁর প্রবর্তিত প্রকারগুলির সহিত আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন। তাঁর প্রবর্তিত প্রকারগুলি শ্রেণী ও উপশ্রেণীর ভিত্তিতে ভাগ করে সাজালে এই রকম দাঁড়ায় :

১) শ্রেণী : পরিমাণ বাচক
   উপশ্রেণী : সমগ্রতা, বহুত্ব, একত্ব
২) শ্রেণী : গুণবাচক
   উপশ্রেণী : অন্বয়, ব্যতিরেক, সসীমত্ব-অসীমত্ব
৩) শ্রেণী : সম্বন্ধবাচক
   উপশ্রেণী : নিরপেক্ষ, সাপেক্ষ, বৈকল্পিক
৪) শ্রেণী : প্রকৃতিবাচক
   উপশ্রেণী : অনিশ্চিত, বর্ণনাত্মক, নিশ্চয়াত্মক[৩]

কাণ্ট-এর প্রকল্পিত প্রকারগুলির বিন্যাস দেখলেই বোঝা যায় তাদের ভূমিকা হল দুটি বিশেষের সার্বিকের যোগে কত বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানবাক্য গড়া সম্ভব তাই দেখানো। এ যেন একই বস্তুকে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দেখানোর মত। আমার ঘরে একটা চেয়ার রয়েছে। তাকে সামনে হতে

১ Critique of Pure Reasoy

২ Categories of Knowledge

৩ উপরের শ্রেণী বিন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ নীচে দেওয়া হল :

1) Quantity : Universal, Particular, Singular
2) Quality : Affirmative, Negative, Infinite or Limitative
3) Relation : Categorical, Hypothetical, Disjunctive
4) Modality : Problematic, Assertoric. Apodictic

এক রকম দেখায়, পাশ হতে একরকম দেখায়, আবার উপর হতে একরকম দেখায়। এখানে জ্ঞানবাক্যকে এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। দু একটি উদাহরণ স্থাপন করলে আমাদের প্রতিপাদ্যটি সহজেই গ্রহণযোগ্য হবে। একটি মামুলি উদাহরণ নেওয়া যাক :

সকল মানুষ মরে

এখানে পরিমাণবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে তা হবে সার্বিক জ্ঞানবাক্য (সমগ্রতা)। গুণবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে তা হবে অন্বয়ী, কারণ দুটি সার্বিকের মধ্যে একটি সম্বন্ধ সূচিত করছে। সম্বন্ধবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে তা হবে নিরপেক্ষ, কারণ যে সম্বন্ধ সূচিত হচ্ছে তা সকল অবস্থাতেই প্রযোজ্য। আবার প্রকৃতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে তা হবে নিশ্চয়াত্মক, কারণ সম্বন্ধের নিশ্চিত অস্তিত্ব সূচিত হচ্ছে।

আর একটি ভিন্ন ধরণের উদাহরণ নেওয়া যাক :

কিছু মানুষ শ্বেতকায় নাও হতে পারে

এখানে পরিমাণবাচক শ্রেণীতে তা যে প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে তা হল 'বহুত্ব'। গুণবাচক শ্রেণীর প্রকার হবে 'ব্যতিরেকী'। সম্বন্ধবাচক শ্রেণীর প্রকার হবে 'বৈকল্পিক' আর প্রকৃতিবাচক শ্রেণীর প্রকার হবে 'অনিশ্চিত'। সুতরাং কাণ্ট-প্রকল্পিত প্রকারগুলির উদ্দেশ্য হল দেখানো যে একই জ্ঞানবাক্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে কি রকম দেখায়। সেই কারণে এগুলি ঠিক জ্ঞানবাক্যের শ্রেণী ততটা সূচিত করে না, যতটা জ্ঞানবাক্যের বিভিন্ন দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জ্ঞানবাক্য যেন একটি নানা-পলকাটা[১] বস্তু। এক এক দিক হতে তা এক এক রকম দেখায়। এই প্রকারগুলি তাদের পরিচয় বহন করে।

এই দেখে মনে হয় জ্ঞানবাক্যের এমন একটি শ্রেণী বিন্যাসের প্রয়োজন আছে যেখানে তাদের প্রকৃতির বিভিন্নতাগুলি সহজেই দৃষ্টি পথে আসে। সেটি সম্ভব হয় যদি উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে তাদের প্রকৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। বলা বাহুল্য তাদের প্রত্যেকেরই ওপর কাণ্ট প্রকল্পিত প্রকারগুলি আরোপ করা যায়। কারণ তারা সকল প্রকার জ্ঞানবাক্যের সম্ভাব্য পরিচয় দেয়। নীচে উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে জ্ঞানবাক্যের প্রকৃতিগত পার্থক্যের একটি শ্রেণীবিন্যাস স্থাপন করা হল। তাতে যে

১ Multi-faceted

উদাহরণগুলি স্থাপিত হবে আলোচনাকে অকারণ ভারাক্রান্ত করা প্রয়োজন নেই বিবেচনায় তারা একই ধরণের হবে। অর্থাৎ তারা হবে পরিমাণের দিক হতে সার্বিক, গুণের দিক হতে অন্বয়ী, সম্বন্ধের দিক হতে নিরপেক্ষ এবং প্রকৃতির দিক হতে নিশ্চয়াত্মক। এইবার শ্রেণীগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল :

১) গাণিতিক ও জ্যামিতিক বা পরিমাণবাচক জ্ঞানবাক্য ;

২) গুণবাচক জ্ঞানবাক্য ;

৩) জাতিবাচক জ্ঞানবাক্য ;

৪) কারণবাচক জ্ঞানবাক্য।

আমরা এবার প্রত্যেকটি শ্রেণীর বিস্তারিত পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি। প্রথম শ্রেণীতে স্থাপন করা হয়েছে গাণিতিক এবং জ্যামিতিক তথ্য। গণিতে বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে বস্তু নিরপেক্ষভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ সূচিত করে। বলা বাহুল্য, কাজেই সংখ্যাগুলি সার্বিক। এ নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। কাজেই আলোচনারও প্রয়োজন নেই। জ্যামিতি সংক্রান্ত তথ্যগুলি রেখা, ক্ষেত্র ও ঘনক্ষেত্রের ধর্ম কি তার পরিচয় দেয়। এই সংজ্ঞাগুলি কোন বিশেষ বস্তুকে সূচিত করে না। তার পরিকল্পিত ত্রিকোণ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র কোন বিশেষ ত্রিকোণ বা চতুর্ভুজকে সূচিত করে না। কাজেই তারা সার্বিক সংজ্ঞা। অবশ্য কোন জ্যামিতিক তত্ত্বকে প্রমাণ করতে আমরা একটি বিশেষ ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ এঁকে নিই। তা করা হয় আলোচনার সুবিধার জন্য।' তার দ্বারা এদের সার্বিকত্ব খণ্ডিত হয় না। এখন এদের দুটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে :

গাণিতিক তথ্য সূচক : দুয়ে দুয়ে চার হয়

জ্যামিতিক তথ্য সূচক : একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগ ফল দুই সমকোণ

উপরের উদাহরণ হতে দেখা যাবে যে গাণিতিক তথ্য এবং জ্যামিতিক তথ্যের আলোচনার বিষয় বিভিন্ন হলেও তাদের প্রকৃতি একই ধরণের উভয়েই পরিমাণ বা পরিমাপ বা আয়তনকে সূচিত করে। তারা একই ধরণের জিনিষ। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর জ্ঞানবাক্যকে একই শ্রেণীতে বো[ধ] হয় ফেলা যায় এবং তার নাম দেওয়া যায় পরিমাণবাচক শ্রেণী। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এখানে যে অর্থে পরিমাণ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে

কাণ্ট-এর শ্রেণীবিন্যাসে সে অর্থে হয় নি। সেখানে তা জ্ঞানবাক্যের প্রয়োগের ব্যাপ্তি বোঝায়।

যাকে গুণবাচক শ্রেণী বলা হল তারও অনুরূপভাবে কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা অন্য শ্রেণী হতে তাকে পৃথক করে। তার আলোচনা দুটি উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করা যাক :

লোহা ভারি

মানুষ চিন্তাশীল জীব

দেখা যাবে উপরের উদাহরণের প্রথমটি লোহা এই বস্তুটির একটি গুণের পরিচয় দেয়। এইভাবেই এখানে তা লোহা সম্বন্ধে তথ্য এনে দেয়। দ্বিতীয় উদাহরণে 'চিন্তাশীল' পদটি বিশেষণের রূপ নিলেও প্রকৃতপক্ষে তা একটি ক্রিয়ার পরিচয় দেয়। সুতরাং এখানে বিধেয় পদটি হয় নিজস্ব গুণ, না হয় ক্রিয়াভিত্তিক গুণের পরিচয় দেয়। এখানেও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে কাণ্ট-এর বিন্যাসে যে অর্থে গুণ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে হয় নি। এখানে জ্ঞানবাক্য উদ্দেশ্যের গুণ সূচিত করে। কাণ্ট-এর বিন্যাসে তা জ্ঞানবাক্য অস্তিবাচক না নেতিবাচক কিনা ইত্যাদি সূচিত করে।

অনুরূপভাবে জাতিবাচক শ্রেণীরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য শ্রেণীর জ্ঞানবাক্য হতে তাকে পৃথক করে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

মানুষ একটি জীব

এখানে উদ্দেশ্যকে একটি উপশ্রেণী হিসাবে দেখে তার সহিত একটি ব্যাপকতর শ্রেণীর সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়েছে। জীব একটি ব্যাপক শ্রেণী। তার মধ্যে বহু রকম জীব থাকতে পারে, যেমন মেরুদণ্ডহীন, সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী ইত্যাদি। মানুষ এই বহু উপশ্রেণীর একটির অন্তর্ভুক্ত। এখানে জাতির সঙ্গে উপজাতির সম্বন্ধ সূচিত করে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা হয়।

চতুর্থ শ্রেণী হল কারণবাচক শ্রেণী। তা উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয় পদের কার্য-কারণ সম্বন্ধ সূচিত করে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

আগুন তাপ দেয়

এর অর্থ হল তাপের কারণ আগুন। কার্য ও কারণের সম্বন্ধে যুক্ত করে এইভাবে একটি বস্তুকে এখানে জানা হয়। বিজ্ঞানের তথ্যগুলি প্রধানত এই শ্রেণীর হয়, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞানের। আবার ব্যতিক্রমও আছে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের তথ্যগুলি প্রধানত তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ জাতি-উপজাতি সম্বন্ধসূচক হয়।

এই প্রসঙ্গে পরোক্ষ জ্ঞানের আরও কিছু আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবে। প্রথমত একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যেতে পারে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে তার একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানসিকও হতে পারে, ইন্দ্রিয়জাতও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই তার জ্ঞাতার সহিত নিবিড় সংযোগ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বাহিরে তার বিস্তার নেই। আমি মনে যা চিন্তা করি বা আমার ইন্দ্রিয় যে তথ্য বহন করে, তা শুধু আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার সঙ্গে অন্য মনের সংযোগ নেই। অন্য মন তা হতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবস্থাটি অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়। কোন বিশেষ জ্ঞাতা কোন পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করলেও সে জ্ঞান শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্যেও তা গ্রহণ করতে পারে। নিউটন যখন জানলেন যে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে, তখন তা সকল মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে বর্দ্ধিত করল। যা একজন কর্তৃক অর্জিত হল তা সকলের হয়ে গেল। প্রত্যক্ষজ্ঞানে যা অর্জিত হয় তা জ্ঞাতারই থেকে যায়। নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যক্তিবিশেষেরই। বাহিরের বস্তুর জ্ঞান ও জ্ঞাতার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হতে লব্ধ জ্ঞান। এইভাবে পরোক্ষ জ্ঞানের জ্ঞাতাকে অতিক্রম করে সকলের হবার অর্থাৎ জ্ঞাতা হতে বিচ্ছিন্ন হবার শক্তি আছে।

দ্বিতীয় কথা যা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হল জ্ঞানবাক্যের সত্তা সম্বন্ধে। প্রশ্ন ওঠে তার কি সত্তা আছে? যার সত্তা আছে বলে আমরা ধরে নিই তার স্থান ও কালে অবস্থিতি আছে। জ্ঞানবাক্যের স্থান ও কালে অবস্থিতি নেই। কাজেই সত্তা আছে বলা যায় না। তার প্রকৃতি হল যার সত্তা আছে তার সম্বন্ধে তা সঠিক সংবাদ বহন করে। তাই জন্যই তা সত্য। তবে তাদের যে একেবারেই সত্তা নেই তাও বোধ হয় বলা যায় না। বাস্তব জগত হতে স্বতন্ত্র রূপে মানুষ তাদের দিয়ে একটি জ্ঞানের জগত গড়ে তোলে, যা এই বাস্তব জগত সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে। বাস্তব জগতে যা আছে তা সৎ আর এখানে যা আছে তা সত্য। বাস্তব জগতের পরিচয় দেয় বলেই তার মূল্য। সুতরাং তার একটি আনুষঙ্গিক সত্তা আছে বোধ হয় বলা যায়। সার্বিকের অস্তিত্বের মীমাংসা করতে বার্ট্রাণ্ড রাসেল

একটি অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।[১] যা সৎ তাকে তিনি বলেছেন সত্তাবান, আর যা সৎ নয় অথচ যার প্রভাব পরোক্ষভাবে বিশ্বে ক্রিয়াশীল থাকে তাকে তিনি উপসত্তাবান বলেছেন। মনে হয় এই জ্ঞানবাক্যের সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। তার সার্বিকের মত একটি আনুষঙ্গিক সত্তা আছে।

(৩)

সার্বিকের প্রকৃতি

উপরে যে আলোচনা হয়েছে তা হতে অনায়াসে বোঝা যায় যে সার্বিক একটি সূক্ষ্ম পর্যায়ের পদার্থ। তার প্রকৃতির নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য কাজ। অথচ উপরের আলোচনা হতে অতিরিক্তভাবে এও বোঝা গেছে যে জ্ঞানক্রিয়ায় তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত জ্ঞান যা প্রত্যক্ষ অনুভূতি নির্ভর জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের পরিচয় এনে দিতে পারে, তা সম্ভব হত না যদি না সার্বিক সংজ্ঞা থাকত। কাজেই তার প্রকৃতি সম্বন্ধে যতখানি সম্ভব পরিচয় সংগ্রহ করা আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার প্রকৃতির জটিলতা যে কতখানি তা বোঝা যায় এই অবস্থা থেকে যে আবহমান কাল বিশ্বের দার্শনিকগণ তার সহিত পরিচিত হবার চেষ্টা করেছেন। তবু যেন মনে হয় তার প্রকৃত পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল সাম্প্রতিক কালে সার্বিকের প্রকৃতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন; কিছু নূতন আলোকপাতও করেছেন। তবু তিনি তৃপ্তি পান নি। তাঁর ধারণা রয়ে গেছে যে সার্বিক সম্পর্কিত সমস্যার এখনও সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নি।[২] তাঁর মন্তব্য প্লেটো সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে। এক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় সার্বিকের প্রকৃতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ একটি আবশ্যিক বিষয় হয়ে পড়ে।

সামান্যের প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিই খানিকটা বুঝিয়ে দেয় বিষয়টি কত

১ "But universals do not exist in this sense; we shall say that they subsist or have being where being is opposed to existence as being timeless." The Problems of Philosophy, Chap. IX

২ "his (Plato's) theory of ideas which was pioneer attempt to deal with the still uns.lved problem of universals."—History of Western Philosophy Book I, Chap. XIII

জটিল এবং দুর্বোধ্য। আমরা মোটামুটি জানি সার্বিক বলতে তাই বুঝি যা বহু বিশেষ হতে পৃথক হয়েও তাদের সূচিত করে। তাদের ব্যবহার না করলে আমরা মনের কথা প্রকাশ করতে পারি না, এবং তাদের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞান গড়ে ওঠে। মন তাদের ধারণা করে কি করে, তাদের সত্তা আছে কি না, তারা কত ধরণের হতে পারে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এসে পড়ে। তাদের প্রকৃতি কি এই নিয়ে ত পাশ্চাত্য দর্শনে মধ্যযুগে তুমুল বিতর্ক হয়ে গেছে। তারা কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মত সত্তাবান? কেউ বলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত হতেও তারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সত্তায় ভূষিত, কারণ তারা স্থায়ী সত্তা আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত বিনাশধর্মী। অপর পক্ষে কেউ বলেন তাদের সত্তা আদৌ নেই, তারা কেবল নামে আছে। এইভাবে দর্শনের আলোচনায় তা এমন একটি রহস্যময় তত্ত্ব হিসাবে রূপ নিয়েছে যে তাকে ঘিরে যত তর্ক জমা হয়েছে তত তর্ক অন্য সমস্যা সম্বন্ধে দেখা যায় না।

সার্বিক সম্বন্ধে যতখানি সম্ভব পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের চেষ্টায় আমরা তার কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজব:

(১) তাদের উৎপত্তি কি করে হয়;

(২) তাদের প্রকৃতি কি, অর্থাৎ তাদের ওপর কি ধরণের সত্তা আরোপ করা যায়;

(৩) তাদের প্রকার।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সার্বিক সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা আছে। তবে মনে হয় তুলনায় পাশ্চাত্য দর্শনে তার আলোচনা আরও ব্যাপক। এই প্রশ্নগুলির মীমাংসার চেষ্টা করবার পুর্বে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তার বিষয় যে আলোচনা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি আমরা প্রাচ্য দর্শন দিয়ে এই বিবরণ সুরু করব।

অদ্বৈত বেদান্তের অভিমত দিয়েই এই আলোচনা সুরু করা প্রশস্ত হবে। কারণ, তা যে তত্ত্ব প্রচার করে তাতে সার্বিকের অস্তিত্বের আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ভারতীয় দর্শনে সার্বিকের পারিভাষিক প্রতিশব্দ হল সামান্য। তা মূলত জাতিবাচক। জাতিত্ব তার লক্ষণ। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত বলে জাতি বলে কিছু নেই। অবশ্য এটা স্বীকৃত হয়েছে যে বিশেষ শ্রেণীর বস্তুর একটি সমানধর্ম আছে, যেমন ঘটের ঘটত্ব। কিন্তু যা আছে ত ঘটের মধ্যেই

আছে ; তা হতে পৃথকভাবে তার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং জাতি একটি আত্মনির্ভর বস্তু নয়।[১]

তার পর আমরা বৌদ্ধ দর্শনের মন্তব্য স্থাপন করতে পারি, কারণ তা সামান্যকে কিছু সম্মান দেয়। বৌদ্ধদেব মতে সামান্যের পৃথক অস্তিত্ব নেই, তারা কেবল নামেই আছে। সামান্যের যে গুণগুলি আছে তারা বিশেষের মধ্যে বর্তমান থাকে না। তা থাকলে তাদের উপস্থিতি আমরা অনুভব করতাম। সামান্যের ধারণা গড়ে ওঠে অতীতের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। তার পর আমরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বিশেষের ওপর তাকে আরোপ করে থাকি। তার ভ্রান্ত ধারণা হতে উৎপত্তি।[২]

জৈন দর্শনে সামান্য আংশিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তার মতে সমান-ধর্ম হল একটি জাতির উপাদান। অর্থাৎ একটি সমগ্র জাতির সমানধর্মই হল সামান্য। তার পৃথক অস্তিত্ব নেই। বিশেষের মধ্যেই তার অস্তিত্ব। কাজেই বিশেষের জন্মের সঙ্গে তার আবির্ভাব এবং তার ধ্বংসের সঙ্গে তারও ধ্বংস ঘটে। বিশেষের মতই তা বিনাশধর্মী।[৩]

বৈশেষিক দর্শনেই সামান্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। অপরপক্ষে সেখানে দেখা যায় সামান্যকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি প্রশস্তপাদের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। তিনি সামান্যের পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ বিষয় তাঁর অভিমত প্লেটো-এর অভিমতের সঙ্গে তুলনীয়। অপরপক্ষে বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় তার ক্ষেত্র অতি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বৈশেষিক দর্শনের সামান্যের ব্যাখ্যার তুলনায় একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বৈশেষিক দর্শনে কতকগুলি পদার্থ স্বীকৃত হয়। পদার্থ কথাটির তাৎপর্য এখানে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তার অর্থ খুব ব্যাপক। আমরা সোজাসুজি যাদের প্রত্যক্ষ করি, বলি তাদের অস্তিত্ব আছে ; কারণ স্থান ও কালের প্রচ্ছদপটে তারা বিধৃত। তার অতিরিক্তভাবে এমন বস্তুও পাই যাকে আমরা মনের দ্বারা গ্রহণ করতে পারি অথচ যাদের পৃথক অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি

১ বেদান্ত পরিভাষা ॥১

২ **Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. II, Chap. III, Sec. 9**

৩ **Op. Cit. Vol II, P 210, footnote.**

প্লেটো-এর দর্শনে সামান্যকে প্রকৃত বাস্তব মৌলিক সত্তা বলা হয়েছে। তাই তার আর এক নাম বস্তুবাদ[১]।

এরিস্টটল প্লেটো-এর শিষ্যস্থানীয় হয়েও তাঁর সামান্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি যে বিশেষ হতে পৃথকভাবে সামান্যের অস্তিত্ব আছে এবং তাদের অনুকরণেই বিশেষ গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর দর্শনে যে সব যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তারা সবই যে বুদ্ধি দ্বারা সমর্থনযোগ্য, তা নয়। তাই তাদের বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন দেখা যায় না। মোটামুটি তিনি সামান্য এবং বিশেষের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন মনে হয় তা হতেই তাঁর অভিমতটি আপনি এসে পড়ে। সুতরাং তার মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

এরিস্টটল বলেন যে সার্বিকের প্রকৃতি হল এই যে তা অনেক বিশেষের বিধেয়পদ হবার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ তা অনেকগুলি বিশেষের যে সমানধর্ম তাই নিয়েই গড়ে ওঠে এবং সেই কারণে একটি জ্ঞানবাক্যে বিভিন্ন বিশেষের বিধেয়পদ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কাজেই বিশেষ হল তাই যা কোন উদ্দেশ্য পদের বিধেয় হিসাবে কাজ করতে পারে না।[২] সুতরাং সার্বিক হল তাই যা বহু বিশেষের পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে। তাঁর ধারণায় সার্বিকের এই প্রকৃতি হলেই বোঝা যায় যে তা একটি বস্তুর মত[৩] পদার্থ হতে পারে না। একটি বস্তুর বস্তুত্ব হল তাই যা তাকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করে। অপর পক্ষে সামান্য হল তাই যা বহু বিশেষের মধ্যে বর্তমান আছে। সুতরাং যা সামান্য তার বাস্তব সত্তা থাকতে পারে না। মনে হয় তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল এই : একটি বস্তু হল বিশেষ, তার অস্তিত্ব আছে। অপর পক্ষে একটি সামান্য হল বহু বিশেষের মধ্যে বর্তমান কতকগুলি গুণের সমষ্টি। একটি বিশেষের

১ Realism

২ "By the term universal I mean that which is of such a nature as to be predicated of many subjects. by individuals, which is not thus predicated.
On Interpretation

৩ "It seems impossible that the universal term should be the name of a substance. For the substance of each thing is that which is peculiar to it, which does not belong to anything else, but the universal is common since that is called universal which is such as to belong to more than one thing."
Ibid

সকল গুণ সামান্যের মধ্যে নেই, সাধারণ গুণগুলি মাত্র আছে। তাই সামান্যের পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বিশেষকে ভিত্তি করে তা গড়ে ওঠে এবং সেই কারণে তার অস্তিত্ব বিশেষের মধ্যেই খুঁজতে হবে। মনে হয় এরিস্টটল-এর ধারণায় সার্বিককে সত্তার মর্যাদা দিলে একটি অনৈক্য এসে পড়ে। সত্তা হল তাই যা নিজের গুণ দ্বারা এমনভাবে চিহ্নিত যে তা একটি বিশেষ রূপ পেয়েছে। এই রকম বিশেষেরই সত্তা থাকে। অপর পক্ষে যা সার্বিক তা হল এমন পদার্থ যাকে বিশেষ হতে পৃথক করে ভাবা যায় না। বিশেষেরই অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু যাকে বিশেষ হতে পৃথক করা যায় না, পৃথক অবস্থায় তার অস্তিত্ব থাকে কি করে?[১]

এবার আমরা কতকগুলি মধ্যযুগের দার্শনিকের সার্বিক সম্বন্ধে চিন্তার আলোচনা করব। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন প্লেটো এবং এরিস্টটল-এর চিন্তাদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তাই দেখা যায় সার্বিক সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই প্রসঙ্গে এনসেলম, টমাস একুইনাস এবং উইলিয়ম-অফ-ওকাম এর চিন্তা উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত এখানেই বলে রাখা যেতে পারে যে তাঁদের সকলেরই চিন্তা মোটামুটি এরিস্টটল-এর অনুবর্তী।

এনসেলম-এর ধারণায় সামান্যের মৌলিক পৃথক সত্তা নেই, কারণ তার প্রকৃতি বস্তুর মত নয়। একটি জ্ঞানবাক্যে যখন বিধেয়পদরূপে একটি সার্বিক ব্যবহার করি তখন একটি বস্তুর সঙ্গে উদ্দেশ্য পদের সম্বন্ধ আরোপ করি না, একটি অর্থবান শব্দ বা ধারণাকে[২] আরোপ করি। বহু বিশেষের মধ্যে যে গুণগত সাদৃশ্য দেখা যায় তার থেকেই সামান্যের উদ্ভব ঘটে। তাকে একটি সত্তাবান পদার্থের[৩] মর্যাদা দেওয়া যায় না।

টমাস একুইনাসও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর যুক্তি হল সংক্ষেপে এই: বিশেষ হতেই সামান্যের উৎপত্তি। কতকগুলি একই শ্রেণীর বিশেষের যে সাধারণধর্মগুলি আছে তাদের একত্রিত করে, তাদের একটি জাতিগত রূপ মনে গড়ে তোলা হয়। এমন পদার্থের পৃথক অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

১. "They at the same time treat the Ideas as universal substance and as separable and individual. That this is not possible has been shown before."
Metaphysics

২ Concept ৩ Substance

বিশেষের সম্পর্কেই তাদের প্রয়োগ এবং বিশেষের মধ্যেই তাদের অবস্থিতি। এরা প্রাকৃত বস্তুর সমস্থানীয় নয়।[১] সার্বিকের উৎপত্তি হয় মানুষের মনে মানুষের মন সার্বিকের তাৎপর্য খোঁজে মনের বাহিরে অবস্থিত বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে।[২]

উইলিয়ম-অফ-ওকাম-এর ধারণা অনুরূপ। তিনি বলেন সার্বিক হল একটি ধারণা-সূচক পদ যা একটি জ্ঞানবাক্য বিশেষের বা অন্য সার্বিকের বিধেয়পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তাকে ঠিক একটি বস্তুর সমস্থানীয় বলা যায় না, কারণ তার একটি ভিত্তি আছে, তা স্বাভাবিক ভাবেই বহু বিশেষের সমান ধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। অপর পক্ষে তাদের পৃথক অস্তিত্ব নেই। তারা বহু বিশেষকে নিয়ে গঠিত একটি সমগ্র জাতিকে সূচিত করে। তাদের বিশেষের মধ্যেই পাওয়া যায়। কাজেই তাদের প্রাথমিক সত্তা থাকতে পারে না। তাদের একটা গৌণ তাৎপর্য আছে এবং তা বিশেষের ওপর নির্ভরশীল।[৩]

আমরা বলেছি যে মধ্যযুগে সার্বিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনার ফলে সার্বিকের প্রকৃতি নিয়ে তিন শ্রেণীর মত গড়ে উঠেছিল এই প্রসঙ্গেই তাদের আলোচনা করে নিলে মধ্যযুগের এ বিষয় আলোচনার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হল সার্বিকের বস্তুর মত পৃথক সত্তা আছে কিনা। তার উত্তর এক হতে পারে যে তার পৃথক সত্তা আছে প্লেটো এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু তাই বলেন না, অতিরিক্ত ভাবে আরও বলেন যে তারাই বিশ্বের মূল সত্তা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তার অনুকরণ। ঠিক তার বিপরীত একটি মত এই হতে পারে যে সার্বিক ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি নামকে সূচিত করে মাত্র। নামেই তার অস্তিত্ব আছে তার পৃথক সত্তাও নেই এমনকি মানসিক ধারণা হিসাবেও তার অস্তিত্ব নেই আর এক ধরণের মত হতে পারে যা এই দুই মতের মাঝামাঝি। তা বলে সার্বিক শুধু নাম নয়, তবে তার পৃথক সত্তাও নেই। তা ধারণা হিসাবে মনে উদয় হয় এবং বিশেষের মধ্যেই তার অস্তিত্ব বিরাজমান।

মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শনে এই তিন শ্রেণীর মতই পাওয়া যায়। প্রথম

১ **Bertrand Russell, History of Western Philosophy Book II. Chap. XI**

২ **Summa Contra Gentiles, Book I and Book II**

৩ **Bertrand Russell, History of Western Philosophy Books II, Chp. XI**

সার্বিকের পৃথক সত্তা স্বীকার করে বলে তাকে (সার্বিকের) বস্তুবাদ[১] বলা হয়। প্লেটো-র দর্শন এই শ্রেণীতে পড়ে। তার সম্পূর্ণ বিপরীত মতটিকে বলা হয় নামবাদ[২]; কারণ তা বলে সার্বিক কেবল নামেই আছে। তার উদাহরণ আমরা মধ্যযুগে পাই রসেলিন-এর দর্শনে। তিনি বলেন সার্বিকের অস্তিত্ব কণ্ঠদ্বারা উচ্চারিত শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[৩] আর মধ্যবর্তী মতটিকে বলা হয় ধারণাবাদ[৪], কারণ তা সার্বিকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও তাকে নামমাত্র-সার বলতে প্রস্তুত নয়। তার উদাহরণ পাই এনস্লেম প্রভৃতির দর্শনে।

একই বিষয়কে অন্যভাবেও মধ্যযুগে দেখা হয়েছিল। সার্বিকের উদ্ভব বিশেষের আগে হয় না পরে হয়, এভাবেও এ বিষয়টিকে দেখা যায়। (সার্বিকের) বস্তুবাদ অনুসারে সার্বিক মৌলিক সত্তা এবং তার অনুকরণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু গড়ে ওঠে। সুতরাং আগে সার্বিক, তার পর বিশেষবস্তু। একে বলা হয় প্রাক্‌বস্তুবাদ[৫]। তার বিপরীত মত হল সার্বিকের উদ্ভব হয় বিশেষের সহিত পরিচয়ের পর। তাই তার নাম অনুবস্তুবাদ[৬]। মধ্যবর্তী মতটি বেশী জোর দেয় তার অস্তিত্ব কোথায় সেই প্রশ্নের ওপর। তা বলে সার্বিকের পৃথক অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্ব খুঁজতে হবে বিশেষের মধ্যে; তাই তার নাম দেওয়া হয় বস্তু-অন্তবর্তীবাদ[৭]। সুতরাং দেখা যায় একই তত্ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যা (সার্বিকের) বস্তুবাদ তাই প্রাকবস্তুবাদ; যা অনুবস্তুবাদ তাই হল নামবাদ, এবং যা বস্তু মধ্যবর্তীবাদ তাই হল ধারণাবাদের সমস্থানীয়।

এই প্রসঙ্গে এক অভারতীয় এশিয়াবাসী দার্শনিকের মন্তব্যের আলোচনা এসে পড়ে। তিনি হলেন আবিসিন্না। তিনি পারস্যবাসী ছিলেন। তিনি এই সমস্যার একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন সার্বিক এমন একটি পদার্থ যে তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে তিন রকমই বলা চলে। তাঁর ধারণায় চিন্তা হতেই সার্বিকের উৎপত্তি ঘটে। এই সার্বিক যুগপৎ বস্তুর পূর্বেও বর্তমান, বস্তুর সহিত পরিচয়ের পরেও

১ **Realsim**
২ **Nominalism**
৩ **Flatus vocigs (Breath of voice)**
৪ **Conceptualism**
৫ **Universalia antre**
৬ **Universalia post rem.**
৭ **Universalia in rem**

বর্তমান এবং বস্তুর অভ্যন্তরেও বর্তমান। ঈশ্বরের চেতনায় তারা বস্তুর পূর্বে বর্তমান। কারণ ঈশ্বর এক আদর্শ বিড়ালের পরিকল্পনা করবেন তবেই ত বিড়াল সৃষ্টি হবে। মানুষের চিন্তায় তারা বস্তুর পরে বর্তমান। কারণ একই শ্রেণীর অনেক বিশেষের সহিত পরিচয়ের পরেই ত মনে সার্বিকের ধারণা গড়ে ওঠে। তারা বিশেষ বস্তুর মধ্যেও বর্তমান। কারণ তারা যে সমান-ধর্মগুলির সমবায়ে গড়ে ওঠে তারা বিশেষে বর্তমান। এই মীমাংসার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়, কিন্তু তা সমস্যার সমাধান করে কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়। প্রশ্ন হল সার্বিকের পৃথক সত্তা আছে কিনা। এই সমাধান তার মীমাংসা করে না। একটি বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব থাকলেও মনের কাছে সার্বিকের সাহায্যে পরিচয়ের পরই সে অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়।

আমরা এখন পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক যুগে প্রশ্নটির কতভাবে মীমাংসার চেষ্টা হয়েছে সেই আলোচনায় চলে যেতে পারি। আধুনিক যুগে প্রশ্নটি প্রথম নূতন করে আলোচিত হয় লক-এর দর্শনে। তাঁর অভিমত দিয়েই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। তাঁর ধারণায় সার্বিক বলে কিছু নেই, যা আছে সবই হল বিশেষ। আমরা দেখি বিশ্বে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের যাদের সহিত পরিচয় হয় তারা সকলেই বিশেষ। বিশেষ মানুষ, বিশেষ জীব, বিশেষ বস্তুই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে একই ধরণের কতকগুলি বিশেষকে দেখে তাদের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নিয়ে তাকে একটি নাম দিতে পারি। কিন্তু তাদের সার্বিকত্ব তাদের অনেকগুলি এক ধরণের বিশেষ সম্পর্কে যে ব্যবহার করা যায় তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের পৃথক নিজস্ব সত্তা বলে কিছু নেই। মনের মধ্যে উদ্ভূত ধারণা হিসাবেও তা একটি বিশেষ।[১] তাঁর এই মন্তব্য হতে মনে হয় তাঁকে নামবাদী[২] দার্শনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

লক-এর পরবর্তী দার্শনিক হিউমও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর ধারণায় কতকগুলি বিশেষ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে তাদের আমরা একটি নাম দিয়ে সূচিত করি।[৩] সুতরাং যাকে সার্বিক বলি তাও প্রকৃত

১ Essay concerning Human Understanding, Chap. III

২ Nominalist

৩ "When we have found a resemblance among several objects we apply the same name to all of them." Treatise of Human Nature, Book I

পক্ষে একটি বিশেষ, কারণ তার সংযোগ একটি বিশেষ নামের সঙ্গে। এই নামের সংযুক্ত হওয়ার ফলেই তাদের একটি অতিরিক্ত তাৎপর্য উদ্ভূত হয়। তার ফলে সেই নামের সাহায্যে অবস্থা বিশেষে আমাদের একটি বিশেষের অনুরূপ অন্য বিশেষকে স্মরণ করা সম্ভব হয়।[১] সুতরাং তিনি নাম-বাদকে গ্রহণ করেছেন বলা যায়।

হিউম-এর পর বার্কলিও সার্বিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তও অনুরূপ, তবে তিনি একটু ভিন্ন ধরণের যুক্তি ব্যবহার করেছেন। সার্বিক সংজ্ঞা যে একভাবে আছে তা তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন। তবে তাঁর ধারণায় তারা নামেই আছে, তাদের পৃথক অস্তিত্ব নেই; কারণ বিশেষ হতেই তাদের সার্বিকত্বের উদ্ভব।[২] অর্থাৎ তাঁর ধারণায় বিশেষদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বলেই সার্বিক সংজ্ঞা গড়ে ওঠে। তাদের পৃথক অস্তিত্ব ত তিনি স্বীকার করেনই না, মানসিক ধারণা হিসাবেও তাদের তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর ধারণায় বিশেষ স্বভাবতই বিশেষ হওয়া সত্ত্বেও অনেক বিশেষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার গুণেই তাদের সার্বিক বলে মনে হয়।[৩]

আমরা পূর্বেই বলেছি যে সার্বিকের প্রকৃতি এমন জটিল যে দর্শনের আলোচ্য বিষয় হিসাবে তার আকর্ষণ অতি আধুনিক যুগেও শিথিল হয় নি। এই আলোচনা পাশ্চাত্য দর্শনেই সীমাবদ্ধ। তার ফলে সার্বিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু নূতন আলোকপাতও হয়েছে। এ বিষয় স্টাউট, লেয়ার্ড, আই. এ. রীড এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর বিস্তারিত আলোচনা আছে। লোয়ার্ড ও রীড-এর অলোচনা সমালোচনামূলক। কাজেই তাঁদের মন্তব্যের পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নেই। সার্বিক সম্বন্ধে আমরা যখন সাধারণভাবে আলোচনা করব সেই প্রসঙ্গে তাঁদেরও মন্তব্য এসে পড়বে। স্টাউট এবং

১ "All general ideas are nothing but particular ones annexed to certain terms which give them a more extensive significance and make them recall upon occasion other individuals which are similar to them." I bid

২ "I do not deny absolutely there are general ideas but only that there are any abstract general ideas, because they derive their generality from particular instances."

Treatise concerning the Principles of Human Knowledge

৩ "Universality, so far I can comprehend, not consisting in the absolute positive nature or conception of anything but in the relation it bears to the particulars signified or represented by it." Ibid

রাসেল-এর চিন্তা যৌলিক। কাজেই এখানে পৃথকভাবে তাঁদের অভিমতের বিষয় আলোচনার প্রস্তাব করি।

আমরা প্রথমে স্টাউটের মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। মনে হয় তিনি সমন্বয়ধর্মী। তিনি নামবাদীদের মত বলেন না যে সার্বিকের কেবল নামেই অস্তিত্ব আছে, তার বেশী কিছু তার মধ্যে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে এ কথাও বলেন না যে সার্বিকের একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তাঁর ধারণায়, যাকে সার্বিক বলি তা প্রকৃত সামান্যধর্মী নয়। তা একটি সমগ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষকে বোঝায়। শ্রেণী যে বিশেষ গুণগুলি দ্বারা সূচিত হয় তা বিশেষগুলির মধ্যে বর্তমান এবং সেই কারণে তারা একই গুণের অধিকারী। এই অবস্থাকে ভিত্তি করেই সামান্যের একটি ঐক্য সাধক শক্তি গড়ে ওঠে।[১] কাজেই বিশেষদের সমানধর্মকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে, তা এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণা নয়। জাতির যে বৈশিষ্ট্য তা বিশেষের মধ্যেই প্রকট বলেই সকল বিশেষ তার অংশীদার।[২] সুতরাং স্টাউট এর মত ঠিক ধারণাবাদের মতও নয়। তা সামান্যকে জাতির সহিত একীভূত করে না। তার স্থান ধারণাবাদ এবং নামবাদের মাঝামাঝি।

আধুনিক দর্শনে সার্বিকের প্রকৃতি নিয়ে সব থেকে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে বর্ট্রাণ্ড রাসেল-এর দর্শনে। সুতরাং তাঁর বিষয় একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাসেল-এর চিন্তা ছিল বিকাশধর্মী। তার প্রভাব সার্বিকের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা প্রথম অবস্থায় তাঁর সার্বিক সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল এবং কেমনভাবে তা পরিবর্তিত হয়েছে তা সংক্ষেপে দেখাব। তাঁর সার্বিক সম্বন্ধে আলোচনা তিনটি ভাগে করা হয়েছে। প্রথমে সার্বিকের প্রকৃতি কি সে বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। তার পর তার সম্বন্ধে জ্ঞান কি ভাবে অর্জিত হয় তার আলোচনা করেছেন। সর্বশেষে সার্বিকের কতপ্রকার শ্রেণী থাকতে পারে সে বিষয় আলোচনা করেছেন। আমরা এই ক্রমেই তাঁর সার্বিক তত্ত্বের আলোচনা করব।

১ Distributive unity

২ "The particular instances are distributed among particular things and so shared by them."

Journal of British Academy, X
The Nature of Universals and Propositions

প্রথম অবস্থায় রাসেল-এর সার্বিক সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা প্লেটো-এর সামান্যবাদের অনুরূপ ছিল। বিভিন্ন বিশেষের যা সমানধর্ম তাই নিয়ে সার্বিকের ধারণা আমরা গড়ে তুলি, কিন্তু দেখা যায় সার্বিকের প্রকৃতি বিশেষের প্রকৃতি হতে ভিন্ন। বিশেষ সংখ্যায় বহু, তা বিনাশশীল। অপরপক্ষে যাকে সার্বিক বলি তা পরিবর্তনশীল নয়, তা যা ছিল তাই থাকে, তা বিনাশধর্মী নয়।[১] তার প্রকৃতি যাকে বিশেষ বলি ঠিক তার বিপরীত।

এখন এদের প্রকৃতি কি? তাঁর ধারণায় সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হতে তাদের প্রকৃতি বিভিন্ন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর স্থান ও কালে অবস্থিতি আছে। সার্বিকের কি স্থান কালে অস্তিত্ব আছে? তিনি বলেন কালে বা স্থানে তাদের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যাবে না।[২] তবে কি তাদের মনের মধ্যে অবস্থিতি আছে? তিনি বলেন তাও নয়। তাদের অবস্থিতি যেমন স্থান কালের মধ্যে নেই তেমন মনের মধ্যেও নেই। মন যখন তাদের জানতে পারে তখনই তারা জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত হয়।[৩] সুতরাং তাদের প্রকৃতি অনন্যসাধারণ।

তা হলে কি তাদের পৃথক সত্তা বলে স্বীকার করা যায় না? তিনি বলেন এক সূক্ষ্ম পর্যায়ে তাদের সত্তা আছে বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। যার স্থান ও কালে অস্তিত্ব আছে তাকে আমরা সৎ বলি এবং তাকে বোঝাতে বলি তার সত্তা আছে। কিন্তু সার্বিকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অবস্থিতি নেই, কারণ তা স্থান-কালকে অতিক্রম করে। অপর পক্ষে মনেও তার অবস্থিতি নেই, মন তাদের আবিষ্কার করে। তবে তারা কোথায় আছে? তিনি প্লেটো-র অনুসরণে বলেন তাদের জন্য একটি বিশেষ জগত আছে। তাকে তিনি (স্থায়ী) সত্তার[৪] জগত বলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সহিত তার পার্থক্য টেনেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত গতিশীল, তা বিনাশধর্মী। এই জগত স্থির, শাশ্বত এবং

১ "Moreover, it is not fleeting or changeable like the things of sense : it is eternally itself immutable and indestructible."

The Problems of Philosophy. Chap IX

২ "the answer must be 'No where and No when.'" Ibid

৩ "Thus universals are not thoughts though when known they are the objects of thoughts." Ibid

৪ World of being.

বিনাশধর্মী নয়।[১] তিনি এই দুই শ্রেণীর পদার্থকে পৃথক করে চিহ্নিত করবার জন্য দুটি নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বস্তুকে তিনি অস্তিত্বধর্মী[২] বলেছেন এবং সাবিককে তিনি সত্তাধর্মী[৩] বলেছেন। তাঁর ধারণায় উভয়েই সত্য[৪]। এই উভয় পদার্থকে অবলম্বন করে দর্শন ও বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

রাসেল-এর সার্বিক সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত অভিমত দেখা যায় পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছিল। উপরের বর্ণনা হতে দেখা যাবে যে তিনি প্রায় প্লেটো-র সামান্যবাদকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে গ্রহণ করেছিলেন। প্লেটো সার্বিককে মৌলিক সত্তার মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অবস্থিত বস্তুকে তার অনুকরণ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। রাসেল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি বা তাকে নিকৃষ্ট পর্যায়ের পদার্থ বলেন নি। কিন্তু এইটুকু ব্যতীত অন্য বিষয়ে সাবিক সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্লেটো-র ধারণার অনুরূপ ছিল। তাকে সত্য বলে তিনি স্বীকার করেন। এক নিত্য, স্থিতিধর্মী জগতে তার সত্তা আছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন।

কিন্তু দেখা যায় পরবর্তীকালে সার্বিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন আমাদের চিন্তায় সার্বিক যে ভূমিকা গ্রহণ করে সেই ভূমিকা একটি শ্রেণীই গ্রহণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে শ্রেণীর অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে সার্বিকের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নেই। শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অপর পক্ষে শ্রেণীকে অতিক্রম করে সাধারণধর্ম থাকতে পারে কিনা সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ আছে।[৫] সুতরাং দেখা যায় সার্বিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পরবর্তী কালে রীতিমত পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তিত মত সার্বিককে জাতির সমপর্যায়ে স্থাপন করেছে। সুতরাং তাঁর পরিবর্তিত মতটি খানিকটা স্টাউট-এর মতের সহিত তুলনীয়।

১ "The world of being is unchangeable, rigid, exact, delightful to the mathematician, the logician, the builder of metaphysical systems and all who love perfection more than life," Ibid

২ (Objects) exist.

৩ (Universals) subsist or have being.

৪ both are real.

৫ এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রণীত Our knowledge of the External Wolrd এবং The Analysis of Mind গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এইবার সার্বিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের কিভাবে উদ্ভব হয় সে বিষয় আলোচনা করব। এ বিষয় তাঁর ধারণাকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন। আমরা সাধারণত জ্ঞান অর্জনের দুটি রীতি স্বীকার করে থাকি: প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং পরোক্ষজ্ঞান। যা সোজাসুজি আমাদের জ্ঞান গোচর হয় তাকে বলি প্রত্যক্ষ; যেমন মনের একটা অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। আর যাকে অন্য জ্ঞানের মধ্য দিয়ে জানি তাকে বলি পরোক্ষজ্ঞান। সকল আনুমানিক জ্ঞানই পরোক্ষজ্ঞান। রাসেল এই বিভাগকে একটু স্বতন্ত্র ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যাকে সোজাসুজি জানা যায় তাকে বলব পরিচয় ভিত্তিক জ্ঞান।[১] যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়বাহিত বহির্বিশ্বে অবস্থিত কোন বস্তু সম্বন্ধে তথ্য, বা মনের চিন্তা। আর এক রকমের জ্ঞান আছে যার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে না, যার বর্ণনা আমাদের কাছে স্থাপিত হলে তার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি। যেমন সার্বিক দ্বারা গঠিত জ্ঞানবাক্য। তিনি তাকে বলেন বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান।[২] তিনি তাদের অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন। যাকে সোজাসুজি পরিচয় করি তিনি তাকে বলেন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান; আর যাকে বর্ণনা দ্বারা জানি তিনি তাকে বলেন সত্যের জ্ঞান।[৩] কারণ দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে একটি সমগ্র জ্ঞান বাক্যের আকারে আমরা জ্ঞানলাভ করি। সেখানে দুটি বিশেষ বা সার্বিকের সত্য সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। অপরপক্ষে প্রথম ক্ষেত্রে কেবল বিশেষের জ্ঞান সূচিত হচ্ছে। এখানে একই বিষয়কে দুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখা হয়েছে। কি রীতিতে জ্ঞানলাভ হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে পাই পরিচয়ভিত্তিক জ্ঞান এবং বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান। আবার কি ধরণের জ্ঞান পাই সেই দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে তাই হয়ে দাঁড়ায় বস্তুর জ্ঞান এবং সত্য সম্বন্ধের জ্ঞান।

সার্বিকের জ্ঞান কিভাবে পাওয়া যায় এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছেন তা খুব স্পষ্ট নয়। তাঁর ধারণায় সার্বিকের জ্ঞান তিন ভাবে লাভ করা যায়। প্রথমত তা পরিচয়ের ভিত্তিতে লাভ করা যায়, দ্বিতীয়ত তা বর্ণনার

১ Knowledge by acquaintance

২ Knowledge by description

৩ "there are two sorts of knowledge:
Knowledge of things and Knowledge of truths."
Problems of Philosophy, Chap. V

ভিত্তিতে লাভ করা যায়; এবং তৃতীয়ত তা অন্য ভিন্ন পথে লাভ করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে যে যে শ্রেণীর সার্বিকের জ্ঞান লাভ করা যায় তাদের উল্লেখ করেছেন; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথে যাদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব তাদের উল্লেখ করেন নি। মনে হয় এ বিষয় তাঁর নিজের ধারণাও স্পষ্ট ছিল না। তিনি বলেছেন যে এমন কোন নীতি গড়ে তোলা যায় না, যার দ্বারা বলা যায় কোন শ্রেণীর সার্বিক প্রত্যক্ষ পরিচয়ে জানা যায় বা যায় না।[১] তবে তিনি কতকগুলি শ্রেণীর সার্বিক সম্বন্ধে এ বিষয় নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের তিনি যে তালিকা দিয়েছেন তা হল এই:

১ গুণবাচক—শৈত্য, তাপ

২ সম্বন্ধবাচক—বাম, দক্ষিণ

৩ স্থান ও কালবাচক—আগে, পরে, দূর, নিকট

৪ সাদৃশ্যবাচক—মত, সমান

৫ গাণিতিক ও জ্যামিতিক—দুই, চার, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ

রাসেল সার্বিক সংজ্ঞাগুলির শ্রেণী হিসাবে বিভক্ত করে একটি ব্যাপক তালিকাও দিয়েছেন। আমরা এই বিষয় নিয়ে একটি পৃথক আলোচনার প্রস্তাব করেছি। সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই তার আলোচনা সঙ্গত হবে। তা না হলে একই বিষয় দুবার উত্থাপন করতে হয়। তা অর্থহীন। তাই সার্বিকের প্রকার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় এই বিষয় তাঁর অভিমত নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এ পর্যন্ত সার্বিক সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে দেওয়া হয়েছে। এবার তাঁরা এই জটিল বিষয়টি সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছেন তার সাহায্যে আমরা সার্বিকের বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে পারি।

সার্বিক সম্বন্ধে প্রথম মৌলিক প্রশ্ন হল তাদের সঙ্গে আমাদের মনের পরিচয় কি ভাবে ঘটে। রাসেল বলেন প্রধানত আমরা তাদের আবিষ্কার করি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে আবিষ্কার হয় কি ভাবে? আমাদের নিজেদের এ বিষয় অভিজ্ঞতা

২৯ "Among universals there seems to be no principle by which we can decide which can be known by acquaintance."

The Problems of Philosophy, Chap X

ারণ করলে দেখব যে এই আবিষ্কার ঘটে বিশেষের সহিত পরিচয়ের ভিত্তিতে। ামরা যখন শিশু ছিলাম, তখন আমাদের মন ছিল বিস্ময় ও কৌতূহলে রা। আমরা চারিপাশে কত বিভিন্ন জিনিস দেখতাম এবং পিতা-মাতাকে শ্ন করতাম, এটা কি, ওটা কি? তাঁরা আমাদের কাছে তার নাম বলে যতেন। বলা বাহুল্য, সেই নামগুলি এক একটি সার্বিক। তারপর এমন কটা অবস্থা আসত যখন একই জাতির বা শ্রেণীর অনেকগুলি বস্তু দেখে াদের আমরা নিজেরাই চিনতে পারতাম। তখনি আমাদের সার্বিকের সঙ্গে ারিচয় ঘটে গিয়েছিল।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আমি একটি জিনিসকে রাস্তায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? মা বললেন, এটা গরু। আমি খাটালে অনুরূপ শ্রেণীর জিনিস দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? উত্তর হল, গরু। আবার াঠে একই ধরণের জিনিস চরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম; এটা কি? আবার উত্তর হল, গরু। তারপর আমি জন্তুটির সঙ্গে এমন পরিচিত হয়ে গেলাম যে তাকে আর চিনিয়ে দিতে হয় না। আবার সেই ধরণের একটি জীবকে দেখে আমি নিজেই সমবয়সীকে বললাম, ঐ দেখ একটা গরু। এটা সম্ভব হয় বহু এক শ্রেণীর জিনিস দেখে তাদের সমানধর্মকে অবলম্বন করে আমরা মনে মনে একটি ধারণা গড়ে তুলি এবং সেই ধারণার সহিত মিলিয়ে পরে অনুরূপ জিনিস দেখলে তাকে চিনতে পারি বলে। সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত এইভাবে সার্বিকের জ্ঞান জড়িত হয়ে পড়ে। অনেক বিশেষকে প্রত্যক্ষ করে সার্বিককে আবিষ্কার করি।

এইভাবে সার্বিকের সম্বন্ধে ধারণা আসে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ হতে তাদের সমানধর্মগুলিকে পৃথক করে নিয়ে। গরু চিনতে যে সার্বিকের ধারণা আমাদের মনে গড়ে ওঠে, তার উপাদান হল গরুকে অন্য শ্রেণী হতে বিশিষ্ট করে যে গুণগুলি, যেমন তার শিং, তার দ্বিধা-বিভক্ত খুর, তার চেহারা ইত্যাদি। লেয়ার্ড বলেন এইভাবে সার্বিকের-ধারণা গড়ে তোলা যায় না। তাঁর প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তিনি দুটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রথম, ধরা যাক লাল রঙ। এখন এই লাল রঙের কত প্রকার শ্রেণী আছে। যে সার্বিককে মন গড়ে তুলল তা কোন শ্রেণীর মত হবে তা বলা যাবে না। দ্বিতীয়, তিনি ত্রিভুজ সমতল ক্ষেত্রের কথা তুলেছেন। যে ত্রিভুজ সমকোণ-

বিশিষ্ট নয়, অতি-সমকোণ-বিশিষ্ট নয়, বা অব সমকোণ-বিশিষ্ট নয়, তা কেমন হবে ভেবে দেখতে বলেছেন।[১]

প্রশ্নটি প্রসঙ্গত নিশ্চিত ওঠে ; কিন্তু তার মীমাংসা হয়। লেয়ার্ড সার্বিকের প্রকৃতি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করেছেন বলে মনে হয় না। সার্বিক বিশেষের ঠিক আলোক চিত্র নয়। বহু বিশেষের সাদৃশ্যকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে বলেই তা বিশেষের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য চিনতে সাহায্য করতে পারে। মানুষ যখন একটি বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিকে বা জীবকে বা বস্তুকে চেনে, তখনি তার স্মরণের ভাণ্ডারে সেই বিশেষের একটি স্মৃতির সহিত তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে। এই বিশেষের স্মৃতির সঙ্গে এই বিশেষের আলোক চিত্রের তুলনা চলে। সার্বিক স্মৃতি নয়, তা সূক্ষ্ম পর্যায়ে অবস্থিত একটি ধারণার আবিষ্কার। সমান-ধর্মের ভিত্তিতে এমন ধারণা করা যদি সম্ভব না হত, তা হলে দৈনন্দিন জীবনে ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যের সাহায্যে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান[২] আদৌ সম্ভব হত না। তিনি যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন তাতে জাতি নির্দেশক সার্বিকের[৩] সঙ্গে উপজাতি নির্দেশক সার্বিকের[৪] অসঙ্গতি দেখিয়েছেন। যদি কেবল জাতি নির্দেশক সার্বিক বা কেবল উপজাতি নির্দেশক সার্বিকের কথা বিবেচনা করা যায় এ অসঙ্গতি থাকে না।

আমরা এখন কিছু উদাহরণ নিয়ে দেখে নিতে পারি উপরে বর্ণিত রীতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর সার্বিকের সহিত আমাদের পরিচয় হয় কিনা। কত শ্রেণীর সার্বিক আছে তাও বিতর্কের বিষয়। পরে যথাস্থানে সে প্রশ্নটির মীমাংসার চেষ্টা হবে। এখানে আমাদের আলোচনা সেই সব শ্রেণীর সার্বিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি যাদের সার্বিকত্ব সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য নেই। তারা হল জাতিবাচক, বস্তুবাচক, গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক এবং গাণিতিক ও জ্যামিতিক সার্বিক। আমাদের উপরে দর্শিত গরু সার্বিকের উদাহরণে প্রসঙ্গত জাতিবাচক সার্বিকের কথা বলা হয়েছে। আমরা পরীক্ষা করলে দেখব অনুরূপ রীতিতেই অন্য সার্বিকের সঙ্গে আমাদের প্র[illegible] ঘটে।

বস্তুবাচক সার্বিকের উদাহরণ হি[illegible] খণ্ড পাথরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাথর একটি জড় পদার্থ। বিভিন্ন পরিবেশে বিশেষ পাথরের

১ A study of Realism. Chap. VI

২ Perception ৩ Universal representing a genus

৪ Universal reprensenting a species

সহিত পরিচয়ের ফলেই, এই সার্বিকের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। গুণবাচক সার্বিকের উদাহরণ হিসাবে আমরা ঠাণ্ডা শব্দটির উল্লেখ করতে পারি। আমরা দেখি বরফ ঠাণ্ডা, জল অবস্থা বিশেষে ঠাণ্ডা হয়, শীতের বাতাস ঠাণ্ডা হয়। এইভাবে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিষের মধ্যে একই অনুভূতি উদ্রেক করবার ক্ষমতা লক্ষ্য করে ঠাণ্ডা বা শৈত্য সম্বন্ধে একটি ধারণার সহিত পরিচিত হই।

গাণিতিক সার্বিকগুলির সঙ্গেও আমরা অনুরূপভাবে পরিচিত হই। প্রথমে আমরা বস্তুর সম্পর্কে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করতে এই সার্বিকগুলি প্রয়োগ করি। যেমন দুটো ফল বা চারটে ফল গুণি, দুটি বই বা চারটি বই গুণি, দুটি ফুল বা চারটি ফুল গুণি। তার পরের অবস্থায় তাদের বস্তু হতে পৃথক করে, বস্তুর সহিত সম্পর্ক রহিত করে তাদের ভাবতে পারি। তখনি আমরা এই শ্রেণীর সার্বিকগুলির সহিত পরিচিত হই। জ্যামিতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। নানা গোলাকার ক্ষেত্র দেখে আমরা বৃত্ত সম্বন্ধে সার্বিক ধারণা করি। গাণিতিক ও জ্যামিতিক, উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমে আমরা বস্তুর সহিত সংযুক্ত করে তাদের দেখি, তারপর যখন তাদের সার্বিক রূপের সহিত পরিচিত হই তখন তাদের বিমূর্ত আকারে দেখতে পাই।

ক্রিয়াবাচক সার্বিকও একইভাবে আবিষ্কৃত হয়। আমরা ফুটবল খেলা দেখি, ক্রিকেট খেলা দেখি, টেনিস খেলা দেখি। তার ফলে খেলা ধারণার সহিত পরিচিত হই। বুঝি, তা হল বিশেষ নিয়ম অনুসারে কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুই দলের প্রতিযোগিতা। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই একই পরিচয়রীতি—বিশেষ হতে সামান্যে উঠি, মূর্তরূপ হতে বিমূর্ত রূপে উঠি।

কাজেই লেয়ার্ড যা বলেছেন তা এক পক্ষে ঠিক। সার্বিকের ধারণা কোন বিশেষের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। সার্বিক ত্রিভুজ সকল শ্রেণীর ত্রিভুজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু এইখানেই তার উৎকর্ষ। সকল বিশেষের সহিত সাদৃশ্য থেকেও তা আলাদা বলেই তার সাহায্যে বিশেষকে আমরা চিনতে পারি। সার্বিক আছে বলেই আমাদের মন অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাকে আবিষ্কার করে। তা এমন একটি স্থিতিস্থাপক ধারণা যে বিভিন্ন বিশেষের পার্থক্যকে অতিক্রম করে তাদের ব্যাপ্ত করবার ক্ষমতা রাখে।

এইবার আমরা সার্বিকের প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। ব্যাখ্যা করলে প্রশ্নটি দাঁড়ায় এই। বিশেষ সম্বন্ধে আমরা জানি তাদের অস্তিত্ব

আছে, দৃশ্যমান জগতের তারা অঙ্গীভূত, আপাতদৃষ্টিতে তাদের মনের বাহিরে একটি পৃথক সত্তা আছে। সার্বিকের প্রকৃতি কি সেইরূপ? ছোট করে বললে প্রশ্নটি দাঁড়ায়: সার্বিকের কি বিশেষ হতে পৃথক কোন প্রকার সত্তা আছে? এই প্রশ্নের উত্তর যে নানা ধরণের হতে পারে তা আমরা উপরের আলোচনা হতে দেখেছি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে সব বিভিন্ন দার্শনিক মত এই প্রসঙ্গে স্থাপিত হয়েছে, তাদের চারটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য তাদের তালিকা এখানে স্থাপন করা হল।

(১) তাদের কেবল নামে অস্তিত্ব আছে, এমন কি ধারণা হিসাবেও অস্তিত্ব নেই। লক, বার্কলি, হিউম, বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতির মত এই শ্রেণীতে পড়ে। একে নামবাদ বলব।

(২) তারা একটি মানসিক ধারণা মাত্র। ধারণা হিসাবেও তাদের পৃথক অস্তিত্ব নেই। বিশেষের সমানধর্মই শ্রেণীগত ঐক্য সূচিত করে। একে শ্রেণীধর্মী বিশেষবাদ বলব। স্টাউট প্রবর্তিত তত্ত্ব এই শ্রেণীতে পড়ে। সম্ভবত রাসেল-এর পরিবর্তিত মত এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

(৩) মানসিক ধারণা হিসাবে তাদের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু বহির্বিশ্বে তাদের পৃথক অস্তিত্ব নেই, বিশেষের মধ্যেই তারা প্রকট। এই তত্ত্বের স্থাপক হলেন এরিসটটল। ভারতীয় জৈন দর্শনও অনুরূপ মত পোষণ করে। একে ধারণাবাদ বলব।

(৪) চতুর্থ শ্রেণীর মত হল সার্বিকের বিশেষ হতে পৃথক একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। প্লেটো-র সামান্যবাদ তার উদাহরণ। আধুনিক দর্শনে রাসেলও প্রথমে এই ধরণের একটি মত পোষণ করতেন। ভারতীয় বৈশেষিক দর্শনে প্রশস্তপাদের ব্যাখ্যায় একটি অনুরূপ তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। একে স্বতন্ত্র সত্তাবাদ বলব।

প্রথম শ্রেণীর মতটিকে যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায় না। তার ব্যাখ্যায় সার্বিক একটি নাম মাত্র, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু সত্যই কি তাই? নাম ত শুধু নাম নয়, এখানে তার একটি অর্থ আছে। নাম অকারণে হয় নি, শূন্যকে অবলম্বন করে তা গড়ে ওঠে নি। তা নিশ্চয় একটি পদার্থকে সূচিত করে। সুতরাং সার্বিকের অস্তিত্ব শুধু নামে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; তার অতিরিক্তও কিছু আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মতটি একটি বিশেষ দার্শনিকের মত। তিনি হলেন স্টাউট। তিনি নামবাদকে গ্রহণ করেন নি; কারণ তিনি স্বীকার করেন সার্বিক শুধু নাম-সর্বস্ব নয়, তার অতিরিক্ত কিছু তার মধ্যে আছে। তার মধ্যে একটি ঐক্য-বিধায়ক শক্তি[১] আছে যা বহু বিশেষকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে দেখায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাদের একটি পৃথক ধারণা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন সার্বিকের যে ঐক্য-সাধক শক্তি তা বিশেষই সম্পাদন করতে পারে। বিশেষে বিশেষে গুণগত সাদৃশ্যই হল সার্বিক। রীড ও তাঁর মত সমর্থন করেন বলে মনে হয়।[২] সুতরাং বিশেষই সার্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এখানে এমন দুটি তত্ত্ব এ সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাদের মধ্যে অসঙ্গতি এসে পড়ে এবং সেই কারণে তাদের সহাবস্থিতি স্বীকার করা শক্ত হয়ে পড়ে। যখন শুধু বিশেষকে দেখি তখন তাকে বিশেষ বলেই জানি; শুধু তার উপর নির্ভর করে সমশ্রেণীর অন্য বিশেষের সহিত তার সাদৃশ্যের পরিচয় আমরা পাই না। সেই সাদৃশ্যকে পৃথক করে না নিলে তা বিশেষে আরোপ করা যায় না। সুতরাং বিশেষের জাতিগত ঐক্য সূচিত করবার ক্ষমতা আছে কিনা, তা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। এই সম্পর্কে লেয়ার্ড উত্থাপিত সমস্যার কথা প্রসঙ্গত এসে পড়ে। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজকে দেখে অসমবাহু ত্রিভুজকে চেনা শক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষকে অতিক্রম না করলে সার্বিকের প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

এই প্রসঙ্গে রাসেল-এর সার্বিকের সত্তা সম্বন্ধে পরবর্তী মতেরও আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। তার পরবর্তী ধারণা হল সার্বিকের পৃথক সত্তা স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই; তার যা ভূমিকা তা একটি শ্রেণীই সম্পাদন করতে পারে। এইভাবে দেখলে স্টাউট-এর মত হতে তাঁর এই পরিবর্তিত মত সার্বিকের কিছু অনুকূল। স্টাউট সার্বিকের ভূমিকা বিশেষে অর্পণ করেছিলেন। রাসেল তার ভূমিকা একটি শ্রেণীকে অর্পণ করতে চান। কিন্তু তাও করা যায় বলে মনে হয় না। একটি শ্রেণীর শ্রেণী হিসাবে বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় সার্বিকের সাহায্যে। যে সমান ধর্মগুলির মিলনে তা গঠিত তারাই তাকে অন্য শ্রেণী হতে পৃথক করে। সার্বিক তাদের ধারণ করে বলেই তাদের শ্রেণীগত ঐক্য পরিস্ফুট হয়। শ্রেণীর শ্রেণীত্ব সার্বিক হেতু। সার্বিককে

১ Distribbutive unity

২ L. A. Reid, Knowledge and Truth, Chap. VIII, Sec, 3.

বর্জন করে শ্রেণীকে সূচিত করা যায় না বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি গাণিতিক উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। দুটি গরু, দুটি ঘোড়া, দুটি গাধা ইত্যাদি 'দুই' এই সার্বিকের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তারা যে এক জোড়া এইটুকুই তাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য বা সমানধর্ম, আর কিছু নয়। এখানে সার্বিককে বাদ দিলে তাদের শ্রেণীত্ব থাকে না।

তৃতীয় ও চতুর্থ মত দুটিকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য একসঙ্গে গ্রহণ করব। তৃতীয় মতটি বলে সার্বিকের পৃথক অস্তিত্ব নেই, তা ধারণারূপে বর্তমান। তার অস্তিত্ব বিশেষেই খুঁজতে হবে। চতুর্থ মতটি বলে সার্বিক একটি পৃথক শ্রেণীর সত্তা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বস্তু হতে পৃথক তার একটি সত্তা আছে এবং তা নিত্য। প্রশ্নটির জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে সকল সার্বিকের প্রকৃতি এক নয়, তাদের প্রকৃতির ভিন্নতা আছে। এমন মনে হতে পারে যে একশ্রেণীর সার্বিকের সত্তাই পৃথক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অপরপক্ষে এও দেখা যায় যে, যা এক দৃষ্টিভঙ্গি হতে সার্বিকের গুণযুক্ত অন্য দৃষ্টিভঙ্গি হতে তাই বিশেষের লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্তমান প্রশ্ন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসতে তাদের এই বিচিত্র প্রকৃতির প্রতি আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

প্রথম কথাটাই প্রথমে আলোচনার জন্য দেওয়া যাক। আমাদের প্রতিপাদ্য হল, এমন প্রকৃতির সার্বিক আছে যার সম্বন্ধে 'সম্ভবত বলা যায় যে তাদের পৃথক সত্তা আছে; আবার এমন প্রকৃতির সার্বিক আছে যাদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে সার্বিকগুলি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীতে পড়বে যারা জাতি হিসাবে স্বভাবতই গড়ে উঠেছে। আর এক শ্রেণীতে পড়বে যে সব সার্বিকগুলি বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সাদৃশ্য বর্তমান তাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিছু উদাহরণ দিলে আমাদের মন্তব্য বোঝা সহজ হবে। উদাহরণ স্বরূপ গোজাতির কথা ধরা যাক। তার গুরুত্বসূচক যে সার্বিক তা একটি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা সার্বিক। যে সমানধর্মগুলি গোজাতির বৈশিষ্ট্য সূচিত করে তাদের অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কৃত্রিম উপায়ে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি মানুষ নির্মিত জাতিগুলি স্বভাবতই জাতির প্রকৃতি ধারণ করে। এইভাবে আমরা দুই শ্রেণীর স্বাভাবিক জাতি পাই, প্রাকৃতিক জাতি ও মনুষ্য নির্মিত জাতি। অপর পক্ষে আর এক শ্রেণীর সার্বিক আছে যার প্রয়োগ

একটি বিশেষ স্বাভাবিক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমন সাদা রঙ, উত্তাপ প্রভৃতি। সাদা রঙ গরুর হতে পারে, ঘোড়ার হতে পারে, ফুলের হতে পারে, কাগজের হতে পারে ইত্যাদি। বিভিন্ন বস্তুর বা জাতির গুণবাচক সার্বিক এই শ্রেণীতে পড়ে। গাণিতিক এবং জ্যামিতিক সার্বিকও এই শ্রেণীতে পড়ে, কারণ তাদের প্রয়োগ কোন বিশেষ স্বাভাবিক শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ থাকে না। সার্বিকের মধ্যে এই প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করে, হয়ত মনে হতে পারে যে, যে সার্বিক স্বাভাবিক জাতি সূচিত করে তাই প্রকৃত সার্বিক। কিন্তু তা মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সার্বিকের লক্ষণ হল তা বহু বিশেষকে সূচিত করবার ক্ষমতা রাখে, বা বহু বিশেষে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই গুণ উভয় শ্রেণীর সার্বিকের মধ্যেই বর্তমান আছে।

দ্বিতীয় কথা, সার্বিকদের প্রকৃতি এমন যে তারা বিভিন্ন পরিবেশে সার্বিকের মত ক্রিয়া করে, আবার বিশেষের মত ক্রিয়া করে। গরু, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ এরা সকলেই চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী জীব। এরা প্রত্যেকে সার্বিক। মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীব বলতে আমরা তাদের সকলকে সূচিত করি এবং অতিরিক্তভাবে আরও অনেককে করি। মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীবকে সার্বিক ধরলে এই জাতিগুলি বিশেষের ভূমিকা গ্রহণ করবে; আবার বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বিশেষকে সূচিত করতে তারা সার্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমরা কত জাতীয় ফুলের নাম করতে পারি। তারা সকলেই সার্বিক, কিন্তু এই ফুল সার্বিকের মধ্যে অনুরূপভাবে তারা বিধৃত। সাতটি মূল রঙ ছাড়া আমরা কত রকম রঙের সহিত পরিচিত হই। তারা সকলেই সার্বিক। অথচ রঙ এই সার্বিকের মধ্যে তারা সকলেই বিধৃত। সুতরাং দেখা যায় সার্বিকেরও সার্বিক থাকতে পারে। এই কারণেই বৈশেষিক দর্শন বলে যে সত্তাই শুধু বিশুদ্ধ সার্বিক এবং অন্যেরা মিশ্র সার্বিক। অর্থাৎ পরিবেশ অনুসারে তারা সার্বিকের মত কাজ করে আবার বিশেষের মত কাজ করে। এদের প্রকৃতি যেন পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোর প্রকৃতির মত। এক পরিবেশে তা তরঙ্গের মত ব্যবহার করে, আবার অন্য পরিবেশে কণার মত ব্যবহার করে।

এখন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যেতে পারি। আমাদের প্রতিপাদ্য হল কেবল এক বিশেষ প্রকৃতির সার্বিকের সম্ভবত পৃথক অস্তিত্ব আছে। এই প্রকৃতির সার্বিকের মধ্যে আসে যারা স্বভাবত জাতি হয়ে গড়ে উঠেছে তারা।

তারা প্রকৃতির সৃষ্ট সার্বিকও হতে পারে, মনুষ্যনির্মিত সার্বিকও হতে পারে। তার কারণ এই উভয় ক্ষেত্রে একটি বিশেষ রূপ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে। প্রথম মানুষ নির্মিত জাতির কথা ধরা যাক। একটি বাড়ী করতে হয়ত আমরা পৃথক নক্সা করি; কিন্তু এমনও হয় যেখানে একই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একই ধরণের অনেক বাড়ী নির্মিত হয়ে থাকে। দিল্লীতে সরকার স্থাপিত কলোনীতে একই ধরণের বাড়ী একটি বিশেষ পাড়ায় গড়ে ওঠে। তাদের নির্মাণ করবার আগে একটি নক্সা তৈরি হয়। সেই নক্সার আদর্শে নির্মিত হয় বলে বাড়ীগুলি একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে লণ্ডনের এক এক রাস্তার বাড়ী একই ধরণের। সুতরাং এখানে নক্সা বা 'ব্লু প্রিণ্ট' রূপে সার্বিকের অস্তিত্ব সূচিত হয়। মটর গাড়ির মত জটিল যন্ত্রের সম্বন্ধে এ কথা আরও খাটে। প্রতি মডেলের জন্য একটি 'ব্লু প্রিণ্ট' থাকে এবং সেই মডেলের সব গাড়িই এক হয়।

এ কথা প্রকৃতির সৃষ্ট জাতি সম্পর্কেও খাটে। সকল গরু যে একই ধরণের দেখতে হয়, সকল মানুষ যে একই ধরণের দেখতে হয়, সকল টিয়া যে একই ধরণের দেখতে হয়, সকল বটগাছ যে একই ধরণের দেখতে হয়, তার একটা কারণ আছে। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রকৃতির পরিবেশে এমন একটি প্রজাতি[১] গড়ে ওঠে যা নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে জীবনধারণ করবার ক্ষমতা রাখে। প্রতি বিশেষের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে তার দেহ সেই প্রজাতির গুণগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। এরিস্টটল তাই বলেছিলেন যে যাকে রূপকারণ বলা হয়, তা একটি রূপমাত্র নয়, তা একটি ক্রিয়াশীল শক্তি। তা জীবের অভ্যন্তরে থেকে তার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে প্রজাতির গুণ দিয়ে মণ্ডিত করে[২]। তিনি এই তত্ত্বটিকে 'এনটেলেকি'[৩] এই পারিভাষিক নাম দিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন ওঠে প্রকৃতির সৃষ্ট প্রজাতিগুলির মধ্যে যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়া করে তা ত অনুমানের ওপর নির্ভর করে, তার উপস্থিতির কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি? বাড়ির ক্ষেত্রে বা গাড়ীর ক্ষেত্রে যেমন নক্সা বা 'ব্লু প্রিণ্ট' আছে, এখানে সে রকম কিছু পাওয়া যায় কি? এরিস্টটল-এর যুগে অবশ্য এই

১ Species ২ Immanent teleology

৩ Entelecheia = entos (within) + Telos (purpose) + echo (having)
= Having purpose working within.

তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল যুক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করে। এখন কিন্তু জৈববিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এ রকম 'ব্লু প্রিন্টের' অস্তিত্বের প্রমাণ ও স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। দেখা যায় জীবদেহের প্রতিকোষে একটি নক্সা আছে।[১] যা জীবের দেহের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে প্রজাতির অনুরূপ করে গড়ে তোলে তাদের 'ক্রোমোসোম'[২] বলে। ইলেকট্রনিক ফটোতে তাদের চেহারাও ধরা পড়েছে। তারা শুধু নক্সা নয়, অতিরিক্তভাবে নিয়ামক শক্তি। এখানেই প্রকৃতির সৃষ্ট জাতি ও মানুষের নির্মিত নানা ব্যবহার্য যন্ত্র-আদির পার্থক্য। প্রকৃতির ক্ষেত্রে নক্সাই আভ্যন্তরীণ শক্তি হিসাবে নিজেকে রূপ দেয়, আর মানুষের ক্ষেত্রে নক্সা বাহিরে থাকে, কারিগর বাহির হতে তাকে রূপ দেয়।

সুতরাং দেখা যায় একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই সার্বিকের পৃথক অস্তিত্বের লক্ষণ বর্তমান। জীব দেহের এই 'কোড'-রূপী 'ক্রোমোসোম' অনেকখানি প্লেটো কল্পিত সার্বিকের অনুরূপ। প্লেটো কল্পিত সার্বিক হল যেন মডেল এবং বিশেষ যেন তার অনুসরণে গড়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর সার্বিকের পৃথক অস্তিত্ব হয়ত স্বীকার করা যায়। অন্য শ্রেণীর সার্বিকের প্রকৃতি কিন্তু ভিন্ন। সেখানে এক বা একাধিক সমানধর্মকে ভিত্তি করে একটি সার্বিক গড়ে ওঠে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি ভিন্নরূপ ধারণ করে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে এই শ্রেণীর সার্বিকও শূন্যে গড়ে ওঠে নি। তাদের একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। একটি গুণবাচক সার্বিকের কথা ধরা যাক। সাদা রঙ কত শ্রেণীর বস্তুর গুণ হতে পারে। তুলো সাদা, খড়ি সাদা, পাকা চুল সাদা, কত কি সাদা। এই সাদাত্বকে অবলম্বন করেও একটি শ্রেণী গড়ে তোলা যায়। শ্বেতবস্তু বলতে কত জিনিষকে তার মধ্যে স্থাপন করা যায়। সুতরাং এই সার্বিকের সাহায্যে বহু বিশেষকে একত্রিত করা যায়। এই হল তার ভিত্তি। কাজেই তা কেবল একটি নাম নয়, তা যথার্থই একটি জাতি সূচিত করে। কিন্তু তা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা জাতিকে সূচিত করে না। সেই কারণে তার পৃথক সত্তা আছে বলা যায় না। তারা যে মনের সৃষ্টি তা নয়, কারণ মন তাদের পরিচয় বিশেষ হতে সংগ্রহ করে। মন তাদের আবিষ্কার করে। এইভাবে রাসেল যেমন বলেছেন ধারণারূপে তাদের একটি সত্তা থাকতে পারে। তা নিত্যও বটে, কারণ তা স্থান কালের

১ Code ২ Chromosome

অতীত। কিন্তু স্বাভাবিক জাতির মত যে বাস্তব জগতে পৃথক সত্তা আছে তা বলা যায় না। আমাদের দেশের দর্শনের পরিভাষায় যাকে পদার্থ বলা হয় তার মর্য্যাদা এই শ্রেণীর সার্বিককে দেওয়া যায়; কিন্তু যে অর্থে একখণ্ড পাথরের সত্তা আছে বলা যায়, সেই অর্থে তাদের সত্তা আছে বলা যায় না।

এইবার আমরা সার্বিকের প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করব। বার্ট্রাণ্ড রাসেল সার্বিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে একটি তালিকা দিয়েছেন। তাঁর তালিকা খুব ব্যাপক। ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাচক, গুণবাচক এবং ক্রিয়াবাচক সার্বিক স্বীকৃত। পাশ্চাত্য দর্শনে বস্তু ও গুণ বাচক সার্বিকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। রাসেল-এর তালিকায় অনেক শ্রেণীর সম্ভাব্য সার্বিক স্থান পেয়েছে। সুতরাং তাঁর তালিকার ভিত্তিতে আলোচনা করলে তা পূর্ণাঙ্গ হবার সম্ভাবনা বেশী। আমরা তাই তাঁর তালিকা দিয়ে আলোচনা সুরু করব। তাঁর দেওয়া তালিকাটি এই :[১]

(১) বস্তুবাচক—মানুষ, গাছ, পাহাড়

(২) গুণবাচক—কোমলতা, শৈত্য, সৌন্দর্য

(৩) ক্রিয়াবাচক—গতি, বিকাশ, খেলা

(৪) গাণিতিক—দুই, চার, পঞ্চম

(৫) জ্যামিতিক—সমকোণ, ত্রিভুজ, গোলক

(৬) সম্বন্ধবাচক অব্যয়[২]—In, before, after

(৭) দিক বাচক—North of, Left of

(৮) সর্বনাম—তাঁর মতে এদের প্রকৃতি অস্পষ্ট।

উপরের তালিকায় আলোচনার সুবিধার জন্য (৬) ও (৭) এর ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দ না দিয়ে মূল ইংরাজিতে দেওয়া উদাহরণ উদ্ধৃত হল। তা হলে সমালোচনার সুবিধা হবে। কারণ এখানে ভাষার প্রকৃতির ভিন্নতা হেতু বাংলায় তার সঠিক প্রতিশব্দ পাওয়া যাবে না। এখন আমরা এই তালিকা কতখানি গ্রহণযোগ্য তার আলোচনা করব।

তালিকার প্রথম তিনটি হল বস্তুবাচক, গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক সার্বিক। সঙ্গে প্রদত্ত উদাহরণ হতে এদের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে প্রকট। এদের যে সার্বিক হবার অধিকার আছে তা সর্বজনস্বীকৃত। কাজেই তা নিয়ে আলোচনা

১ Problems of Philosophy, Chap. IX and X দ্রষ্টব্য।

২ Prepositions.

কান প্রশ্ন ওঠে না। মোটামুটি বলা যায় এক ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য পদ ছাড়া বার সব বিশেষ্য পদই সার্বিক। তারা বস্তুবাচক হতে পারে, গুণবাচক হতে পারে, ক্রিয়াবাচক হতে পারে। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য পদের অর্থ থাক আর নাই থাক, তা একটি বিশেষ ব্যক্তিকে সূচিত করে। তাই তা সার্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। গাণিতিক ও জ্যামিতিক সংজ্ঞাগুলিও যে সার্বিক তা সুস্পষ্ট। কারণ তারা বিশেষ হতে পৃথক অথচ বিশেষে তাদের প্রয়োগ করা যায়।

আমরা এখন সম্বন্ধবাচক অব্যয়ের[১] আলোচনায় আসতে পারি। এখানে মনে হয় রাসেল-এর এই শ্রেণীর অব্যয়গুলিকে সার্বিক মনে করবার কারণ ইংরাজি ভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। আমাদের মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে কিছু প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন। ভাষা দুই শ্রেণীর হতে পারে: বিশ্লেষণাত্মক[২] ও সংশ্লেষণাত্মক[৩]। বিশ্লেষণাত্মক ভাষার উদাহরণ পশ্চিমের ভাষাগুলি এবং সংশ্লেষণাত্মক ভাষার উদাহরণ হল সংস্কৃত ভাষা হতে উদ্ভূত ভাষাগুলি, যেমন বাংলা ভাষা। ভাষার কাজ হল মনের ভাব প্রকাশ করা। তা সম্ভব হয় বস্তুতে বস্তুতে সম্পর্ক সূচিত করে বা বস্তুর সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক সূচিত করে। তা করা যায় দুভাবে। এক হল নামপদ ও ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাদের চিহ্নিত করতে বিশেষ শব্দ সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজন মত তাদের ব্যবহার করে। আর করা যায় নামপদগুলির রূপ ঈষৎ পরিবর্তিত করে সম্বন্ধকে সূচিত করে। প্রথমটিতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথকভাবে প্রয়োগ করা হয় বলে তা বিশ্লেষণাত্মক, আর দ্বিতীয়টিতে নামপদের সহিত যুক্ত করে নিয়ে করা হয় বলে তা সংশ্লেষণাত্মক।

কিছু উদাহরণ স্থাপন করলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। বিশ্লেষণাত্মক ভাষার উদাহরণ-স্বরূপ এই ইংরাজি ভাষায় রচিত বাক্যটিতে নেওয়া যেতে পারে:

The book is in the room.

এর বাংলা হবে: বইটি ঘরে আছে।

এই দৃষ্টান্ত হতেই দেখা যাবে ইংরাজি ও বাংলা ভাষার গঠন-প্রকৃতির পার্থক্য। ঘরের সঙ্গে বই-এর অবস্থিতি সম্পর্কিত সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য

১ Preposition
২ Analytic language
৩ Synthetic language

আমরা ইংরাজিতে একটি পৃথক অব্যয় শব্দ ব্যবহার করেছি। অপরপক্ষে একই সম্বন্ধ সূচিত করবার জন্য বাংলায় ঘর এই নামপদটির উপর একটি বিভক্তি যোগ করে তার একটি সামান্য পরিবর্তিত রূপ দিয়েছি। ক্রিয়ার সহিত বিভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধকে কারক বলে। বাংলা বা সংস্কৃত ভাষায় তা সূচিত হয় নামপদের রূপকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে; আর ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় তা সূচিত হয় একটি স্বতন্ত্র অব্যয় পদ ব্যবহার করে।

সুতরাং রাসেল যখন বলেন যে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধসূচক অব্যয়[১] একটি সার্বিক, তা গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। সব ভাষায় তার অস্তিত্ব নেই। বাংলা ভাষায় তার অস্তিত্ব নেই। তার কাজ সেখানে মূল নামপদ দিয়েই সম্পাদিত হতে পারে। সুতরাং সকল ভাষায় যার অস্তিত্ব নেই যা কেবল বিশেষ ভাষার প্রকৃতিগত গঠনের গুণে প্রকট হয়, তাকে স্বয়ং নির্ভর সার্বিক বলা যায় না। অপরপক্ষে তার যা ভূমিকা তা মূল নামপদদ্বারা যখন সম্পাদিত হতে পারে তখন তার আবশ্যকীয়তা স্বীকারের প্রয়োজন দেখা যায় না। সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে সম্বন্ধসূচক অব্যয়কে সার্বিক বলা যায় না।

সম্বন্ধবাচক সার্বিকের পরিচয় দিতে রাসেল বলেছেন তারা ক্রিয়া ও সম্বন্ধসূচক অব্যয় দ্বারা সূচিত হয়।[২] কিন্তু তিনি যে সব উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলি সম্বন্ধসূচক অব্যয় সহযোগে গঠিত কতকগুলি পদসমষ্টি[৩]। এই প্রসঙ্গে পূর্বের উদাহরণ দ্রষ্টব্য। সম্ভবত এই প্রসঙ্গে তিনি ক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন এই কারণে যে জ্ঞান বাক্যে ক্রিয়ার সহিত তার সংযোগ ঘটে। প্রথমেই বলে রাখা যেতে পারে যে সম্বন্ধসূচক' সার্বিক যে আছে তা স্বীকার্য। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ভ্রাতা, ভগিনী, শিক্ষক প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। প্রতি ক্ষেত্রেই তারা অপর একটি পদার্থের সহিত সম্বন্ধ সূচিত করে। কিন্তু তারা বস্তুবাচক সার্বিকের অন্তর্ভুক্ত। তাদের পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন থাকে না। অপর পক্ষে যে পদসমষ্টিগুলির তিনি উল্লেখ করেছেন তারা সম্বন্ধসূচক অব্যয়ের[৪] দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। তাঁর প্রদত্ত একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে ধরা যাক:

১ Preposition

২ "Relations, that is sort of universals generally represented by verbs and prepositions." Problems of Philosophy, Chap. IX

৩ Phrase

৪ Preposition

Edinburgh is *to the north of* London.

আমরা বাংলায় বলব : এডিনবারা লণ্ডনের উত্তরে।

ইংরাজি পদসমষ্টিতে দুটি অব্যয় আছে।, আসলে এই বাক্যটি লণ্ডন সম্পর্কে এডিনবারার অবস্থিতি সূচনা করে। সম্পর্কটি কি? না উত্তরে অবস্থিতি। ইংরাজিতে তাকে সূচিত করা হয়েছে একটি পদসমষ্টি দিয়ে (to the north of), কিন্তু বাংলায় কেবল মূল পদটির রূপ পরিবর্তিত করা হয়েছে তাতে সপ্তমী বিভক্তি যোগ করে। উপরে সম্বন্ধসূচক অব্যয়কে সার্বিক হিসাবে স্বীকৃতিদান সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তা ও এই প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। তার কাজ সংশ্লেষণাত্মক ভাষায় মূল পদ 'উত্তরের' সাহায্যেই সম্পাদিত করা যায়। সেটি একটি পদার্থবাচক সার্বিক। সুতরাং একটি পদসমষ্টিকে সার্বিকের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয়।

শেষ প্রশ্ন হল সর্বনামগুলিকে সার্বিক বলা যায় কিনা। রাসেল বলেন তা বলা যায় কিনা মীমাংসা করা যায় না, কারণ তাদের প্রকৃতি মিশ্র ধরণের।[৩৪] মনে হয় তিনি ঠিকই বলেছেন। তাদের একাধারে সার্বিকের গুণও আছে আবার বিশেষের গুণ আছে। তাদের যে সার্বিকের গুণ আছে তা তাদের নাম দ্বারা সূচিত হয়। যে কোন পদার্থ সম্বন্ধে তাদের প্রয়োগ করা যায় বলেই ত তাদের নাম 'সর্বনাম'। আবার দেখা যাবে যখন ভাষায় প্রযুক্ত হয় তখন তারা একটি বিশেষ বা বিশেষ-সমষ্টিকে সূচিত করে। 'এটি' এই সর্বনাম যে কোন বস্তু সম্বন্ধে ব্যবহার করা যায়; কিন্তু যখন বলি, 'এটি একটি ফুল', তখন তা বিশেষকেই সূচিত করে। সুতরাং রাসেল-এর এই প্রতিপাদ্য সর্বথা গ্রহণ যোগ্য।

১ "Pronouns stand for particulars but are ambiguous." Problems of Philosophy, Chap. IX

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞান তত্ত্ব

জ্ঞানের উৎপত্তি

(১)

প্রাথমিক কথা

আমরা জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তার প্রকৃতির জটিলতা সম্বন্ধে তার ফলে আমাদের একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। জ্ঞানসম্পর্কিত অপর একটি মূল প্রশ্ন হল জ্ঞানের উৎপত্তি হয় কিরূপে? তাও একটি অনুরূপ ধরণের জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমান অধ্যায়ে সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হবে। মূল প্রশ্নে অবতীর্ণ হবার পূর্বে এই প্রশ্নটির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রথমে সেই পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি।

বিভিন্ন দর্শনে নানা প্রকারের জ্ঞানের উল্লেখ হয়েছে। তাদের সবগুলিকেই আমরা যে অর্থে জ্ঞানকে গ্রহণ করেছি সে অর্থে গ্রহণ করা যায় না। জ্ঞানের সব থেকে ব্যাপক তালিকা পাই মীমাংসা দর্শনে। তার প্রদত্ত তালিকার ভিত্তিতেই বর্তমান প্রসঙ্গটি আমরা আলোচনা করে নিতে পারি। তার তালিকাটি এই: (১) প্রত্যক্ষ (২) পরোক্ষ (৩) উপমান (৪) শব্দপ্রমাণ (৫) অর্থাপত্তি (৬) অনুপলব্ধি। এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ জ্ঞানের সহিত আমরা পরিচিত। এখন অন্যগুলি আমরা যে অর্থে জ্ঞানকে গ্রহণ করেছি তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে কিনা আমাদের দেখা প্রয়োজন।

উপমান বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ তুলনাভিত্তিক জ্ঞান, মীমাংসা দর্শনে ঠিক সে অর্থে তাকে ব্যবহার করা হয় নি। এখানে যে অর্থে তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে [illegible] একটি বিশেষ জাতির সহিত পরিচয়ের ভিত্তিতে অপর জাতির বি[illegible]না। যেমন একটি ঘোড়ার সহিত পরিচিত হয়ে প্রথম গাধা দেখলে বলব ঘোড়ার মত জীব। সাদৃশ্যকে ভিত্তি করেই এখানে পরিচয়। পরবর্তীকালে শবরস্বামী তাকে সাধারণ অর্থে উপমান বলতে যা বুঝি সেই সেই অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ দুটি তুল্য পদার্থের একটির গুণ বা ক্রিয়ার ভিত্তিতে অন্যের গুণ বা ক্রিয়া নির্দ্ধারণ। এখন দেখা যাবে প্রথম

অর্থে ঠিক প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় অর্থে তা অনুমানেরই প্রকারান্তর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য তার পৃথক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই।

শব্দপ্রমাণের ভারতীয় দর্শনে বিশেষ মূল্য আছে। তার অর্থ হল কোন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি বা গ্রন্থে উচ্চারিত বা লিপিবদ্ধ যে জ্ঞানবাক্য আছে তা বিনা দ্বিধায় সত্য বলে গ্রহণ করা। অর্থাৎ তা হল আপ্তবাক্য। নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে আসছে বলে তা যুক্তিসম্মত কিনা বিবেচনা না করে গ্রহণ করা উচিত, এই হল এখানে দৃষ্টিভঙ্গি। মীমাংসা দর্শন বেদকে অপৌরুষেয় বলে, সুতরাং তার বচন শব্দপ্রমাণ। বেদান্ত দর্শন নিজের নানা 'প্রতিপাদ্য' প্রমাণের জন্য উপনিষদের আপ্তবচন উদ্ধৃত করে। প্রশ্ন হল একে প্রকৃত জ্ঞান বলে গ্রহণ করা উচিত কিনা। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মনে হয় তা গ্রহণ করা যায় না। কোন প্রাচীন কালে কোন মনীষী তাঁর সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যা বলে গেছেন তাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করায় বিপদ আছে. তিনি যদি ভুল করে থাকেন, তার সংশোধনের উপায় থাকে না। সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন তাকে অস্বীকার করে ভালই করেছে। তাকে গ্রহণ করলে বিজ্ঞান ও দর্শনে নূতন আলোকপাতের পথ ব্যাহত হয়। নিউটন-এর সিদ্ধান্তগুলিকে যদি আমরা 'আপ্তবাক্য জ্ঞানে অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতাম তা হলে আইনস্টাইন-এর আবির্ভাব সম্ভব হত না। সুতরাং তাকে প্রকৃত যুক্তিসম্মত জ্ঞান বলে গ্রহণ করা যায় না।

অর্থাপত্তি অর্থে বুঝি একটি বিশেষ অবস্থা হতে যে অনুমান করা যায় তাই। পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে অবস্থাঘটিত প্রমাণ বলা হয় তার সঙ্গে তুলনীয়। ঘুমাচ্ছিলাম, বৃষ্টি হতে দেখি নি, অথচ পথঘাট সব ভিজে দেখে অনুমান করতে পারি যে বৃষ্টি হয়েছিল। একে অনায়াসেই আনুমানিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। সে ক্ষেত্রে তাকে বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে পৃথক শ্রেণীর জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন দেখি না।

সর্বশেষে অনুপলব্ধির প্রশ্ন ওঠে। তাকে জ্ঞান বলা যায় না, কারণ প্রকৃতপক্ষে তা জ্ঞানের অভাব। আবার উপলব্ধির অভাব হলেই যে কোন বস্তুর অভাব সূচিত হয়, তা নয়। অন্ধকার ঘরে অনেক কিছু দেখতে পাই না। তার দ্বারা প্রমাণ হয় না, তারা নেই।

সুতরাং বর্তমান আলোচনায় আমরা উপরের তালিকার কেবল প্রথম দুটি

জ্ঞানকেই গ্রহণ করব। অন্যগুলি হয় অনুমানের অন্তর্ভুক্ত, না হয় প্রকৃত জ্ঞানধর্মী নয়। এদের অতিরিক্ত একটি শ্রেণীর জ্ঞান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার প্রকৃতি বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্নভাবে বর্ণনা করলেও, তার লক্ষণ হল তা ইন্দ্রিয়ব্যতীত হবে, অথচ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান হবে। যোগ দর্শনে বর্ণিত সমাধি অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার এই ধরণের জ্ঞান। শঙ্করাচার্য বর্ণিত 'অনুভবের' মাধ্যমে অদ্বৈতব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরিচয় এই ধরণের জ্ঞান। বের্গসঁ যাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেছেন তার সাহায্যে গতিশীল বিশ্বের সাক্ষাৎ পরিচয়লব্ধ জ্ঞানও এই শ্রেণীতে পড়ে। তাদের বিস্তারিত আলোচনা জ্ঞানের আদর্শরীতি কি হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে যথাস্থানে করা হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে তার আলোচনা ঠিক আসে না। কারণ এই জ্ঞানের প্রকৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও আনুমানিক জ্ঞান হতে ভিন্ন। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সার্বিকের সাহায্যে জ্ঞান লাভ হয়। এই তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞানে তাদের প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। এদের প্রকৃতি এত ভিন্ন যে তাদের বর্তমান আলোচনায় একত্রিত করা যায় না। সুতরাং জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সার্বিকের উপর নির্ভরশীল পরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই দুটি বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে ঘটে ; এক দিকে আছে জ্ঞাতা এবং অপরদিকে আছে জ্ঞেয়। জ্ঞাতা উভয় ক্ষেত্রেই এক থেকে যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানে তাদের বিষয়ের, অর্থাৎ জ্ঞেয়ের প্রকৃতির পার্থক্য ঘটে যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয় একটি বস্তু বা ঘটনা, যেমন ফুল, যেমন খেলা। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বিশেষ সক্রিয় থাকে। তারা জ্ঞেয় বস্তুর সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সম্বন্ধে তথ্য মনের কাছে বহন করে এবং তখন মন তাকে বিশেষ বস্তু বা বিশেষ ক্রিয়া বলে চিনতে পারে। অপরপক্ষে পরোক্ষ জ্ঞানে বহির্বিশ্বে অবস্থিত বিশেষ জ্ঞেয় বস্তুগুলি মন থেকে দূরে সরে যায় তাদের স্থান নেয় বিশেষকে সূচিত করে যে সার্বিক সংজ্ঞাগুলি তাই। সার্বিকের সহিত সার্বিকের সম্বন্ধই যেখানে জ্ঞানের বিষয় হয়, বিশেষ বস্তু বা ক্রিয়া নয়। সেই কারণে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সেখানে বিশেষ ভূমিকা থাকে না। বুদ্ধিবৃত্তিই সেখানে একমাত্র সক্রিয় শক্তি। প্রত্যক্ষজ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় কাজ করে।

প্রত্যক্ষ ও আনুমানিক পরোক্ষ জ্ঞান উভয়েই বিস্ময়কর বস্তু। প্রথমে

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা ধরা যাক। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত জ্ঞেয় বিশেষ বস্তুর কি ভাবে সংযোগ ঘটে তা এক রকম রহস্যের মত। তা ঠিক বোঝা যায় না বলে তা নিয়ে নানা বিতর্ক এবং নানা মত গড়ে উঠেছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন এর রহস্য ভেদ করা দুষ্কর। তাকে নিয়ে কত ধরণের প্রশ্ন উঠতে পারে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় সুরঙ্গম সূত্রে বর্ণিত ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দের কথোপকথনের মধ্যে। গভীর মননশীলতার পরিচায়ক হিসাবে তা প্লেটো-র 'ডায়ালগ'[1] এর সঙ্গে তুলনীয়। সেখানে প্রশ্ন উঠেছে বস্তু ত মনের বাহিরে থাকে, তা হলে কি মন বস্তুর কাছে যায়? বিপরীত রীতিতে প্রশ্ন উঠেছে পরিচয়টা ত মনের মধ্যে ঘটে, তবে কি বস্তু মনের মধ্যে প্রবেশ করে? আবার প্রশ্ন উঠেছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুর পরিচয় ঘটে, তা হলে কি মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়? এই সব প্রশ্ন ইঙ্গিত করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত আমরা সর্বক্ষণ পরিচিত হলে ও ব্যাপারটি রীতিমত রহস্যাবৃত।

সুতরাং এই প্রত্যক্ষজ্ঞান কেমন করে ঘটে সে বিষয় যে বিভিন্ন দর্শনে জটিল বিতর্কের অবতারণা হয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মূল প্রশ্নটি দাঁড়ায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞেয় রূপ বিশেষ বস্তুর সহিত কি মনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা ঘটে। একশ্রেণীর দার্শনিক মত আছে যা তার সমর্থন করে। আবার একশ্রেণীর মত আছে যা বলে বিশেষের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে না, ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যের মাধ্যমে ঘটে। কি ভাবে তা ঘটে তা নিয়ে ও মতভেদ আছে। এই জটিল বিতর্কের একটি বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এসে পড়বে।

অনুরূপভাবে পরোক্ষজ্ঞান সম্পর্কেও নানা জটিল বিতর্ক এসে পড়ে। পরোক্ষজ্ঞানে আমরা জানি জ্ঞানবাক্যের উভয় পদই সার্বিক হয়। সেখানে উদ্দেশ্যপদের সহিত বিধেয় পদের একটি সম্বন্ধ সূচিত হয়। প্রকৃত ব্যাপকজ্ঞান আমরা সার্বিক জ্ঞানবাক্যে[2] পাই। কারণ সেখানে বিধেয় পদের উদ্দেশ্যপদের সহিত সম্বন্ধ সর্বতোভাবে সূচিত হয়। 'কতকগুলি মানুষ শ্বেতকায়' বললে যে জ্ঞান পাই 'সকল মানুষ বুদ্ধিমান জীব' বললে তার থেকে অনেক ব্যাপক জ্ঞান পাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানকে আমরা তাই সার্বিক জ্ঞানবাক্য বলি।

1. Dialogues of Plato
2. Universal Proposition

তাদের প্রয়োগ একটি সামান্যের অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষের ওপর। এখানে জ্ঞান প্রত্যক্ষ হতে দূরে সরে আসে বলেই সার্বিক দ্বারা সূচিত হতে পারে। সেই কারণেই তার প্রয়োগক্ষেত্র খুব ব্যাপক হয়ে পড়ে। দুটি সার্বিকের মধ্যে এখানে যে সম্বন্ধটি সূচিত হয় তা স্থান কাল নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি যখন বলি 'মানুষ মরণশীল জীব' তা সকল কালের সকল দেশের মানুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আমি যখন বলি 'আলো তাপ দেয়' তা সকল প্রকার প্রদীপ সকল নক্ষত্রের আলো সম্বন্ধে সর্বকালে প্রযোজ্য।

এইভাবে দেখা যাবে সার্বিক পরোক্ষজ্ঞানে তার ব্যাপকতা অভাবনীয়ভাবে বর্ধিত হয়। অবশ্য তার ভিত্তি হল প্রত্যক্ষজ্ঞান, কিন্তু তা প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানি অনেক বিশেষ মানুষ মরেছে; তার ভিত্তিতে অনুমান করি মানুষ মরণশীল। আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতায় জানি যে সকল ক্ষেত্রেই আলোর সঙ্গে উত্তাপ যুক্ত ছিল তার ভিত্তিতে অনুমান করি আলোক তাপ দেয়। এই যে প্রত্যক্ষ হতে অপ্রত্যক্ষে বিশেষ হতে সামান্যে আনুমানিক জ্ঞান এইভাবে বিস্তার লাভ করে তা কি অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে ঘটতে বাধ্য, এই প্রশ্নটি এসে পড়ে। আনুমানিক জ্ঞানের সম্পর্কে তাই হয়ে দাঁড়ায় অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে সংশ্লেষণাত্মক প্রত্যক্ষ-পূর্ব জ্ঞান কি ভাবে সম্ভব[১]; তার কি নির্ভরযোগ্যতা আছে?

পাশ্চাত্য দর্শনে এই জটিল প্রশ্নটি এক বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করেছে লক বলেছিলেন আমাদের জ্ঞানক্রিয়ায় মনের কোন ভূমিকা নেই। তা অক্রিয় তা একটি অব্যবহৃত স্লেটের মত।[২] বিষয়গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার ওপর যা লিখে দেয় তাই হল জ্ঞান। হিউম মনকে তুলনায় একটি সক্রিয় ভূমিকা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সার্বিক জ্ঞান উৎপাদনে মনের একটি ভূমিকা আছে, কিন্তু তা নির্ভরযোগ্য ফল দেয় না। এই শ্রেণীর জ্ঞানের সম্বন্ধে যেটুকু নিশ্চয়তা বোধ জন্মায় তার ভিত্তি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সার্বিক অনুমানের ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নজরে আসে না বলেই আমরা তাকে নিশ্চিত জ্ঞান বলে ধরে নিই। প্রকৃতপক্ষে সার্বিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা নেই। হিউম-এর এই নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কান্ট-এর মনে আঘাত

১ How are synthetic judgments a-priori possible?

২ Tabula rasa

করেছিল। তিনি তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করতেন না। এই শ্রেণীর জ্ঞানবাক্য কেন নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পরিবেশন করতে সক্ষম তা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন জ্ঞান অর্জনে মনের বিশেষ ভূমিকার অনুসন্ধান করে। এই ভাবেই জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বে সব থেকে মূল্যবান চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল। তার রোমাঞ্চকর ইতিহাস ও আমাদের আলোচনার বিষয় হবে।

আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি হল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশেষের জ্ঞান, কিন্তু আনুমানিক জ্ঞান সামান্যের জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান একান্তভাবে সংকুচিত, কিন্তু আনুমানিক জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। বিশেষের জ্ঞান জ্ঞাতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে যুক্ত, কিন্তু আনুমানিক জ্ঞানে এই সম্বন্ধের বিষয় জ্ঞাতা স্পষ্টরূপে অবহিত নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আমি বলি 'গাছ দেখছি', 'ফুলের গন্ধ শুঁকছি', 'ফলের আস্বাদ গ্রহণ করছি'। এখানে জ্ঞাতাও স্পষ্ট রূপে বিশেষ, জ্ঞেয় ও বিশেষ। আনুমানিক জ্ঞানে জ্ঞেয় বিশেষ নয় একটি সমগ্র জাতি। আনুমানিক জ্ঞান জ্ঞাতা সঞ্চয় করলে ও তা জ্ঞাতাকে অতিক্রম করে সকল সম্ভাব্য জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচরে আসবার ক্ষমতা রাখে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিতান্তই ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান ; তাতে অন্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। একই বিষয় অনেকে এক সঙ্গে দেখলেও সে অবস্থার পরিবর্তন হয় না। তাদের অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু ঠিক একই অভিজ্ঞতা নয়। একটি সঙ্গীত আমি যে ভাবে শুনি অন্য শ্রোতা সে ভাবে শোনে না। প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র। সার্বিকের ভিত্তিতে যে আনুমানিক জ্ঞান গড়ে ওঠে তা কিন্তু অনেকের মনের অধিগম্য হয়। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন, কিন্তু সকল মানুষেরই তা অধিকারে আসে। এইভাবে তা ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করে সর্বসাধারণের জ্ঞানে পরিণত হয়। এই দিক থেকে দেখতে গেলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা আনুমানিক জ্ঞানের তাৎপর্য অনেক বেশী। আনুমানিক জ্ঞানকে ভিত্তি করেই মানুষের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে।

তা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একটি নিজস্ব মূল্য আছে। আনুমানিক জ্ঞানের তা ভিত্তি। তা যে কাঁচা মাল দেয় তাই শোধিত হয়ে সার্বিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে আনুমানিক জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। আনুমানিক জ্ঞান যদি হয় একটি বাড়ী, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল তার ভিত্তি। ভিত্তি তলায় না থাকলে বাড়ী উঠতে

পারত না। বাড়ীর উৎকর্ষ তুলনায় বেশী নজরে আসে; কিন্তু তাই বলে ভিত্তির মূল্য কম নয়। ভিত্তি না থাকলে বাড়ী ওঠাই সম্ভব হত না।

এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় জাত জ্ঞানের সম্পর্কে মানুষের দুটি বিশেষ ধরণের পদার্থের সহিত পরিচয় হয়। তাদের একটি হল স্থান এবং অপরটি হল কাল। তারাই আমাদের সকল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অবলম্বন। একটি পট না হলে যেমন ছবি আঁকা সম্ভব হয় না, স্থান ও কালের পটে না পেলে কোন বস্তু বা ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় না। ঠিক বলতে কি সাধারণ মানুষের ধারণায় যেন এর জন্য দুটি আলাদা পটের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে অবস্থিত বহু বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য স্থানরূপ পটের প্রয়োজন। আর কোন ঘটনা ঘটলে তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য কালরূপ পটের প্রয়োজন। আপাত-দৃষ্টিতে যারা স্থায়ী বস্তু তাদের যখন প্রত্যক্ষ করি আমরা বলি, 'এইটির পাশে এইটি অবস্থিত।' আর যখন একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তখন বলি 'এটির পর এইটি ঘটল'। এই ভাবে সহাবস্থিতি ও পারম্পর্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গড়ে ওঠে এবং তাদের ভিত্তি করে আমাদের মন স্থান ও কাল সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নেয়।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের এই যে ধারণা গড়ে ওঠে তার কি কোন ভিত্তি আছে? আরও স্পষ্ট করে প্রশ্নটিকে স্থাপন করা যায়। স্থান, কালের কি মননিরপেক্ষভাবে অস্তিত্ব আছে? আমরা প্রস্তর খণ্ডকে জানি, নদীর স্রোতকে জানি। তারা কি সেই ধরণের পদার্থ? প্রশ্নটি বিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রে যেমন আসে, দর্শনের আলোচনা ক্ষেত্রে ও তেমন আসে। তা বিজ্ঞানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে যে ব্যাপারটি বিশ্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাজেই পদার্থবিজ্ঞানের তা অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে বিশ্বের প্রকৃতি কি তা জানতে গিয়ে দর্শন ও তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে, কারণ প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে এই দুটি পদার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই দেখা যায় যেমন বিজ্ঞানে তেমন দর্শনে এদের প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে স্থান ও কাল মননিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কাণ্ট-এর দর্শনে বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। কাণ্ট এই সিদ্ধান্তে আসেন যে স্থান ও কালের পৃথক সত্তা নেই, তারা মানসিক সৃষ্টি। তারা মনের রচিত পট যার ওপর প্রত্যক্ষ বস্তু ও ঘটনাকে স্থাপন করা হয়।

অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রথম ধারণা গড়ে উঠেছিল যে তারা দুটি পৃথক সত্তা। নিউটন-এর পরিকল্পিত পদার্থবিজ্ঞানে তাদের প্রকৃত সত্তার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে আইনস্টাইন একটি বিপরীত তত্ত্ব স্থাপন করলেন। তিনি এক রকম কান্ট-এর প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করে বললেন তারা মানসিক সৃষ্টি, তাদের মননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বললেন যে স্থান ও কালের ধারণাকে আমরা কৃত্রিম ভাবে পৃথক করে দেখি। প্রকৃতপক্ষে তারা একই পদার্থের ভিন্ন দিক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেটা সহজে ধরা পড়ে না; কিন্তু মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে তাদের একই পটের বিভিন্ন দিক হিসাবে গ্রহণ না করলে বিশ্বকে বোঝা শক্ত হয়। তাই তিনি কালকে স্থানের অঙ্গীভূত করে স্থানের চতুর্থ আয়তি[১] রূপে গ্রহণ করেছেন। এই হল আইনষ্টাইন-এর বিখ্যাত বিশেষ আপেক্ষিকবাদের[২] মর্ম কথা। যেহেতু বিষয়টি দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই এসে পড়ে, স্থান ও কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ের অঙ্গ হবে। তাতে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা ও আমাদের স্পষ্টতর হবে।

জ্ঞানের আমরা এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেছি যে তা হল দুটি পদের মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ সূচিত করে যা বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের সঠিক পরিচয় দেয়। এই সংজ্ঞা ও পরক্ষো প্রত্যক্ষ, উভয় শ্রেণীর জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পরোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে তা সহজেই চোখে পড়ে, কারণ সেখানে একটি জ্ঞানবাক্য থাকে এবং তাতে দুটি সার্বিক থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে সেটা তত নজরে আসে না; কারণ সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞেয়ের সম্বন্ধটি অতি প্রকট আকারে বিদ্যমান। একটি ফুল আমার চোখের সামনে স্থাপিত হলে আমি বলি, 'আমি একটা ফুল দেখছি'। কিন্তু এটি হল বিষয়টি সম্বন্ধে আমার মনের ব্যাখ্যা। আসলে যা ঘটে তা ভিন্ন জিনিষ। ফুলটি আমার চক্ষুগোচর হলে, আমার চক্ষু তার আকৃতি, রঙ প্রভৃতি লক্ষ্য করে। ঠিক বলতে কি তা চোখের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। তারপর চোখের পেছনে যে স্নায়বিক পর্দা আছে[৩] তার ওপর প্রতিফলিত হয়। তা হতে স্নায়ুতরঙ্গ মস্তিষ্কের কোষে পরিবাহিত হয়। এই ভাবে যে তথ্য আমার মনের কাছে স্থাপিত হয়, তার সঙ্গে আমার মনে ফুল সম্বন্ধে যে ধারণা[৪] আছে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তবে প্রত্যক্ষ করি

১ Fourth dimension
২ Special Theory of Relativity
৩ Retina
৪ Concept

সামনে যে বস্তুটি স্থাপিত হয়েছে সেটি একটি ফুল। তাকে জ্ঞানবাক্যরূপে প্রকাশ করলে বলতে হয় 'এটি একটি ফুল।' সুতরাং এটি ও একটি জ্ঞান-বাক্য। ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যের সঙ্গে সার্বিকের সংযোগে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদন হয়।

সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে আমরা চারটি অংশ পাই। প্রথম, একটি উদ্দেশ্য পদ; দ্বিতীয়, একটি বিধেয় পদ; তৃতীয়, তাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ-সূচক পদ; এবং চতুর্থ, বিশ্ব সম্বন্ধে তারা যে একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় দেয় সে সম্বন্ধে বিশ্বাস। প্রথম তিনটি নিয়ে জ্ঞান-বাক্যটি রচিত হয়। আর চতুর্থটি দ্বারা তার জ্ঞানত্ব সূচিত হয়। দুটি পদের সম্বন্ধসূচক একটি বাক্য পেলেই তা জ্ঞান বলে গ্রহণযোগ্য হয় না; অতিরিক্ত-ভাবে এই বিশ্বাস থাকা চাই যে তা বিশ্ব সম্বন্ধে যে সংবাদ বহন করে তা তার সঠিক পরিচয় দেয়। তবেই তা তথ্যে পরিণত হয়। সুতরাং জ্ঞানবাক্যের বিশ্বাসযোগ্যতা তার একটি অপরিহার্য উপাদান হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস-যোগ্যতাই সত্যতা। কোন দুটি পদের সম্বন্ধসূচক বাক্যকে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে আমরা বলি, 'এটা বিশ্বাস করি' বা 'এটা সত্য'। বিশ্বাস-যোগ্যতা এবং সত্যতা একই অর্থ সূচিত করে ধরা যায়। সুতরাং এক অপরের প্রতিশব্দ। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সত্যতা[১] পদটির বর্তমান আলোচনায় ব্যবহার করবার প্রস্তাব করি।

এখন এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে সত্যতার প্রকৃতি কি। অর্থাৎ জ্ঞানবাক্যের সত্যতা নির্ভর করে কিসের ওপর? এটিও জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক একটি মৌলিক প্রশ্ন। একে কেন্দ্র করেও নানা বিতর্ক আছে। এই বিতর্কের ফলে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর মত গড়ে ওঠে। এখন এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে জ্ঞানের বিষয়ের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে কিনা তার ওপর। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই প্রশ্ন নিয়ে দর্শনে বিতর্ক আছে। এর সম্ভাব্য উত্তর দুই ধরণের হতে পারে। এমন মনে হতে পারে যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্ভব। আর একটি উত্তর হতে পারে যে তা সম্ভব হয় না, মনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে না। এই দুই মতকে অবলম্বন করেই সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন মত গড়ে ওঠে।

যে দর্শন বিশ্বাস করে যে আমাদের মনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সাক্ষাৎ সংযোগ

১. Truth

ঘটে, তাকে অবলম্বন করে এই মত গড়ে ওঠে যে সত্যতা নির্ভর করে জ্ঞানবাক্য যে পরিচয় দেয় বিশ্বে সেই অবস্থা বর্তমান থাকার ওপর। অবস্থাটা দাঁড়ায় অনেকটা ছবির সঙ্গে মূল বস্তুর সাদৃশ্যের মত। একে তাই সংগতিবাদ[১] বলা হয়। যদি সিদ্ধান্ত হয় যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে না, তা হলে সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন সত্যতা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ সুমিতির ওপর। অর্থাৎ বিভিন্ন খণ্ডজ্ঞানের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ওপর। তাই তাকে বলা হয় সুমিতিবাদ[২]। এইভাবে সত্যতার প্রকৃতির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সংগতিবাদ এবং সুমিতিবাদের বিতর্ক গড়ে ওঠে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল সংগতিবাদে বিশ্বাসী। আলেকজাণ্ডার সুমিতিবাদে বিশ্বাসী। আবার এমন একটি তৃতীয় মত ও হতে পারে যে এ দুটির কোনটিই সত্যতার প্রকৃতির ঠিক পরিচয় দিতে পারে না। রীড এই ধরণের মত পোষণ করেন। বর্তমান অধ্যায়ে এই বিভিন্ন মতগুলির সমালোচনার প্রয়োজন হবে এবং সত্যতার প্রকৃতি কি সে বিষয় একটি সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

সত্যতার প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে আনুষঙ্গিকভাবে ভ্রম[৩] বলতে কি বুঝি সে প্রশ্ন ও এসে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে এটুকু বোঝা যায় যে সত্যতা বলতে যা বুঝি ভ্রম তার বিপরীত পদার্থ সূচিত করে। যে সম্বন্ধসূচক বাক্য বিশ্ব সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় দেয় না, তাই হল ভ্রম। ভ্রমের আবার শ্রেণী আছে। ভুল যুক্তি হেতু ভ্রম আসতে পারে, আবার ভুল দেখা হেতু ও ভ্রম আসতে পারে। ভুল যুক্তির সম্পর্ক আনুমানিক জ্ঞানের সঙ্গে। একটি সিদ্ধান্ত ভুল হলে আমরা বলি, 'এই সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত'[৪]। ভুল দেখা ঘটে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে। মামুলি উদাহরণ, রজ্জুতে সাপ দেখা, শুক্তিকে রজত ভাবা। আরও এক শ্রেণীর অভিজ্ঞতা আছে তা প্রত্যক্ষ হলেও তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। যেমন আকাশকুসুম। সাপকে রজ্জু বলে ভ্রম করলে ও সেখানে রজ্জু আছে, যা দেখছি তার অপব্যাখ্যা হতে এই ধারণার উৎপত্তি। শেষের ক্ষেত্রে কোন ভিত্তিই নেই, সমস্তটাই কল্পনা প্রসূত। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রান্তিকে সূচিত করতে যেমন পশ্চিমে তেমন আমাদের দেশে ও বিশেষ পরিভাষার ব্যবহার আছে। যে ভ্রম একটি বস্তুর প্রকৃতির অপব্যাখ্যা হতে সঞ্জাত হয়,

১ Correspondence Theory

২ Coherence Theory ৩ Error

৪ This is a false judgment। ন্যায়শাস্ত্রে Judgmentকে নিগমন বলা হয়।

তাকে বলা হয় সালম্বন ভ্রম[১]। আর যেখানে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত তাকে বলা হয় নিরালম্বন ভ্রম[২]। তার কারণ প্রথমটিতে একটি বস্তুকে অবলম্বন করে ভ্রম গড়ে ওঠে; অন্যটিতে ভ্রম কিছু অবলম্বন না করে গড়ে ওঠে।

ভারতীয় দর্শনে প্রথম শ্রেণীর ভ্রম অর্থাৎ যাকে বলা হয় সালম্বন ভ্রম তা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে বসেছে। তা নানা দর্শনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার একটি কারণ আছে। কয়েকটি বিশিষ্ট ভারতীয় দর্শনে বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকৃত হয় নি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার সম্বন্ধে যে ধারণা মনে গড়ে ওঠে তা ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। কাজেই দর্শনের মৌলিক অঙ্গের সমর্থনে এই সব দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে ভ্রান্তি বলে প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে তারা মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব, যাকে বলা হয় সালম্বন ভ্রম সেই শ্রেণীর পদার্থ। এদের পারিভাষিক নাম হল বিপর্যয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিখ্যাত দার্শনিক তত্ত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। শংকরাচার্য ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে মায়া বা প্রপঞ্চ বলেছে। বৌদ্ধ দর্শনের যোগাচার শাখা এবং মাধ্যমিক শাখা ও অনুরূপ মত পোষণ করে। মাধ্যমিক শাখা শূন্যবাদ এবং যোগাচার শাখা বিজ্ঞানবাদ স্থাপন করেছিল। উভয় দর্শনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে মৌলিক সত্তার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং তা যে মৌলিক সত্তা নয়, তা প্রমাণ করতে এই শ্রেণীর দর্শনগুলি বিভিন্ন বিপর্যয় তত্ত্ব প্রচার করেছিল। এইভাবেই সালম্বন ভ্রম বিষয়টি ভারতীয় দর্শনে অতিরিক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমাদের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেবার জন্য এই বিপর্যয় তত্ত্বের আলোচনারও প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান

আমরা প্রথমে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করব। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। এখন বিশেষ আলোচনার বিষয় হবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি কি করে ঘটে। প্রত্যক্ষ

১ Illusion ২ Hallucination

জ্ঞানে চারটি জিনিষের সমাবেশ হয়। একদিকে থাকে মন, অর্থাৎ জ্ঞাতা, অপর দিকে জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ জ্ঞেয়। তারপর প্রয়োজন তাদের পরস্পরের সংযোগ। সংযোগ না হলে ত জ্ঞানের সুযোগই ঘটে না। অতিরিক্তভাবে চাই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি। তারাই উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। তারা যেন উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলির এখানে একটি বড় ভূমিকা আছে বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানও বলা চলে। এখন এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে তা হল জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়ের যে সংযোগ ঘটে, তা কি সাক্ষাৎ সংযোগ না কোন মধ্যস্থের সহযোগিতায় সংযোগ? প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকৃতি হতেই এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়; কারণ এখানে দেখা যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির ও একটি ভূমিকা আছে। এখানে যা সংযোগ ঘটে তা আপাতদৃষ্টিতে ঠিক সোজাসুজি সংযোগ নয়। আয়নায় কোন বস্তুর যখন প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয় তখন সোজাসুজি সংযোগের উদাহরণ পাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সে ধরণের ব্যাপার ঘটে না। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। তাই বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রশ্ন ওঠে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সোজাসুজি সংযোগ ঘটে কি না।

বিষয়টি নিয়ে গুরুতর বিতর্ক আছে। আমরা মোটামুটি দেখব দুই শ্রেণীর মত গড়ে উঠেছে। এক শ্রেণীর দর্শন বলে আয়নাতে যে ভাবে বস্তু প্রতিফলিত হয় সেইভাবেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ ঘটে। আর এক শ্রেণীর দর্শন বলে ঠিক প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে না, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঘটে। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন ওঠে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি কি? তাতে কি সুস্পষ্ট জ্ঞান আসে, না অস্পষ্ট জ্ঞান আসে? প্রশ্নটি ভারতীয় দর্শনে বিশেষভাবে উত্থাপিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে তা পরোক্ষভাবে এসে পড়েছে। দুটি প্রশ্নই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। তাই দেখা যায় উভয়ের আলোচনা একই সঙ্গে করা হয়েছে। আমরা এই যুগ্ম প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভ করব বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের মত দিয়ে: কারণ প্রশ্নটি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনেই প্রথম আলোচিত হয়। ইয়োরোপীয় দর্শনে তার আলোচনা সুরু হয় অনেক পরে, এক রকম বর্তমান যুগেই বলা চলে।

জৈন দর্শনের ধারণায় আমরা যাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলি তা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয় কারণ তা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংঘটিত হয়। জৈন দর্শন পাঁচ

শ্রেণীর জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে: মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃপর্যায় ও কৈবল্য। মনকে ও একটি ইন্দ্রিয়রূপে গণনা করা হয় বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞান দুটিই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণী মতির মধ্যে ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আনুমানিক জ্ঞান এবং স্মৃতিকে স্থাপন করা হয়েছে। কারণ এই তিনটি ক্ষেত্রেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়, হয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, না হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের সাহায্যে। কাজেই এগুলি সবই পরোক্ষ জ্ঞানের উদাহরণ। শ্রুতির অর্থ হল সেই জ্ঞান যা শাস্ত্রের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবধি বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাহিরে দূরে অবস্থিত বস্তুর অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে সঞ্চিত জ্ঞান। মনঃপ্রত্যয় অর্থে বোঝায় অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে অন্যের মনের চিন্তার বিষয় জ্ঞান। কৈবল্য হল সর্বাত্মক জ্ঞান। তা জৈন দর্শনের বিবেচনায় সম্ভব হয় যখন আত্মা মুক্তিলাভ করে কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শেষের তিনটিকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়, কারণ এখানে জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে। জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ এখানে বড় জটিল এবং গতানুগতিক পথে যায় নি। মোটামুটি জৈন দর্শন ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে পরোক্ষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছে।[১]

প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন মনে হয় বিপরীত মত পোষণ করত। বুদ্ধঘোষ বলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সোজাসুজি সংযোগ ঘটে। এই সংযোগের সঙ্গে দুই ভেড়ার লড়াই-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দুই ভেড়ার যুদ্ধে যেমন তাদের শিং-এর সঙ্গে শিং-এর সংঘাত ঘটে মনের সঙ্গে ও বিষয়ের সেইরূপ সংঘাত ঘটে। মনে হয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথেই যে এই সংযোগ ঘটে সে বিষয় ও এই মত অবহিত ছিল। কারণ, বলা হয়েছে একদিকে চক্ষু এবং অন্যদিকে বস্তু থাকে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাদের মধ্যে মিলন ঘটে।[২] তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে মনের সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর মিলন ক্ষেত্র হল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় যে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করে, এ বিষয় তার কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং এই মতকে জৈন দর্শনের মতের বিপরীত বলা যায়।

এই মতটি পরবর্তীকালে বৌদ্ধদর্শনের অন্তর্ভুক্ত বৈভাষিক শাখায় সমর্থিত হয়েছে মনে হয়। তাও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সোজাসুজি গ্রহণ করেছে। তা বলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি। এখানে জ্ঞেয় বস্তুর সোজাসুজি দর্শন ঘটে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর তা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

১ পঞ্চাস্তিকায়সময়সার ২ মিলিন্দ ॥২॥৩॥৭

করেছে, কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবলম্বন করেই আনুমানিক জ্ঞান গড়ে উঠেছে। এই দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি, তার প্রতিপাদ্যের প্রমাণ হিসাবে যা উল্লেখ করেছে তা হতেই সুন্দর বোঝা যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, তার প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সকল লোকের অভিজ্ঞতা তার সমর্থন করে। তার বিপরীত মত সকল মানুষের অভিজ্ঞতার বিরোধী।[১]

তারপর ভারতীয় দর্শনে আর এক শ্রেণীর মত পাই যা সাধারণভাবে বলে যে প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, কিন্তু একই সঙ্গে এই ধরণের একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে সাক্ষাৎ পরিচয়ে যে জ্ঞান উৎপাদিত হয় তা অস্পষ্ট এবং তাকে স্পষ্ট করতে মনের ও কিছু ভূমিকা এসে পড়ে। এই প্রসঙ্গেই সবিকল্প এবং নির্বিকল্প জ্ঞানের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। মোটামুটি বলা হয় জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের মিলনে যে জ্ঞান হয় তা নির্বিকল্প, একরকম অস্পষ্ট ধারণা মাত্র। তা সবিকল্প অর্থাৎ স্পষ্ট হয়ে পড়ে যখন মন তাকে মার্জিত করে। তার তাৎপর্য হল এই যে এখানে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদনে মনের একটি ভূমিকাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয় পূর্ণতর আলোচনার সুবিধা হবে এই শ্রেণীর মতগুলি স্থাপন করবার পর। সুতরাং এই শ্রেণীর মতগুলি প্রথমে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই ন্যায় দর্শনের মতটি স্থাপন করা যেতে পারে। ন্যায়দর্শনের মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপাদান চারটি: ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; অর্থ, অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু; সন্নিকর্ষ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও তার জ্ঞেয় বিষয়ের সংযোগ; এবং সর্বশেষে তার পরিণতি হিসাবে জ্ঞান। গঙ্গেশ বলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ হল এখানে মনের সহিত জ্ঞানের বিষয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে।[২] এই সাক্ষাৎকার যে ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটে তা ন্যায় সূত্রের বচন হতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে সেখানে বলা হয়েছে তা হল 'সেই শ্রেণীর জ্ঞান যার উদ্ভব হয় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগে।' আরও বলা হয়েছে তা 'অভ্রান্ত, স্পষ্ট, কিন্তু বাক্যে প্রকাশ করা যায় না'।[৩]

দ্বিতীয় কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত লক্ষণীয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সুস্পষ্ট

১ সকল লোকানুভববিরোধশ্চ।

২ প্রত্যক্ষস্য সাক্ষাৎকারিত্বং লক্ষণম্। তত্ত্ব চিন্তামণি

৩ ন্যায় সূত্র ॥১॥১॥৪

বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অপর পক্ষে বলা হয়েছে এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অর্থাৎ ন্যায় দর্শনের মতে তা অনুভবের বিষয়, মননের বিষয় নয়। কিন্তু তার ফলে এই দুটি পদের মধ্যে একটি অসঙ্গতি এসে পড়ে; কারণ, ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না তার জ্ঞান হিসাবে কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ। তা পরিস্ফুট জ্ঞান হয় না। তাকে জ্ঞান-বাক্যের আকারে স্থাপন করা যায় না। গৌতম তা একরকম স্বীকার করেন। কারণ, তিনি ন্যায়সূত্রে তাকে 'অব্যপদেশ্য' বলে বর্ণনা করেছেন। নির্বিকল্প বলতে যা বুঝি অব্যপদেশ্য বলতে তাই বুঝি। তা অনুভবের[১] বিষয়, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। সুতরাং অন্যকে তার পরিচয় দেওয়া যায় না।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই বলে যে তা হল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ। এতে এমন ধারণা হতে পারে যে এই সন্নিকর্ষই জ্ঞানের উৎপাদন করে এবং মনের সহিত তার সংযোগ নেই। কিন্তু গৌতমের মত ঠিক তা নয়। তাঁর মতে জ্ঞান-উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা এসে পড়ে আত্মার ওপর। তিনি মনকে আত্মার সহায়ক মনে করেন এবং তার ভূমিকা হল ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করা। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির গোচরে অনেক তথ্য এক সঙ্গে আসে। কিন্তু সবগুলির প্রতি ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি একসঙ্গে আকৃষ্ট হয় না। নির্বাচিত করে বিশেষ বস্তুর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়। ন্যায় দর্শন বলে এই নির্বাচনের কাজ সম্পাদিত হয় মন কর্তৃক। তাই তাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। তা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ক্ষেত্র নির্বাচিত করে তাকে পরিচালিত করে। এখানে কঠ উপনিষদের প্রতিপাদ্য অনুসৃত হয়েছে। সেখানে মনকে প্রগ্রহ বলা হয়েছে। তার কাজ হল ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করা। ন্যায় সূত্রের ধারণা মন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে বলেই 'যুগপৎজ্ঞানের' বিভ্রান্তি ঘটে না।[২] সুতরাং প্রশ্নটি সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনের পূর্ণমতটি এই রকম দাঁড়ায়: এক দিকে আছে আত্মা, সেই প্রকৃত জ্ঞাতা; অন্যদিকে আছে বস্তু বা জ্ঞেয়। মন একটি পরিচালক ইন্দ্রিয়রূপে জ্ঞেয়কে নির্বাচন করে। তারপর ইন্দ্রিয়গুলি তার প্রতি আকৃষ্ট হবার ফলে তাদের মধ্যে সন্নিকর্ষ ঘটে। তার ফলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব।[৩]

১ Sensation

২ ন্যায় সূত্র ॥১॥১৬

৩ ন্যায় সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১—২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে ন্যায় দর্শনে 'অব্যপদেশ্য' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই দেখে মনে হয় যে এই দর্শনের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়গুলি একাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করতে সমর্থ নয়, এই হল বর্তমানে প্রচলিত ধারণা। তা বলে ইন্দ্রিয়গুলি নানা তথ্য বহন করে আনে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে মনে বিধৃত সার্বিকের সাহায্যে চিহ্নিত হলে তবেই জ্ঞান উৎপাদিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদনে দুটি অবস্থা আছে। প্রথমে বহির্জগত হতে তথ্য সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয় তার সহিত সার্বিকের সাদৃশ্য স্থাপন করে তার সহিত পরিচিত হওয়া। দুটি অবস্থাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবার জন্য প্রথম অবস্থাটিকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি[১] বলা হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থাটিকে প্রত্যক্ষজ্ঞান[২] বলা হয়। মনে হয় ন্যায়দর্শনের মতে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মত। দ্বিতীয় অবস্থাটি তা প্রত্যক্ষজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তাই তাকে অব্যপদেশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা দেখব অন্য ভারতীয় দর্শনে দ্বিতীয় অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাকেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এরপর আমরা পূর্ব মীমাংসায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। পূর্বমীমাংসার মত ন্যায়দর্শনের খানিকটা অনুবর্তী, কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নূতন কথাও তাতে আছে। মীমাংসার মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল 'সাক্ষাৎপ্রতীতি'[৩] অর্থাৎ এখানে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞেয়বস্তুর বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে। এখানেও বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত যেমন সংযোগ হয়, তেমন বিষয়ের গুণের সহিত ও পরিচয় ঘটে। কিন্তু মীমাংসা দর্শন এখানেই থামেনি। তার মতে তা হল 'শুদ্ধবস্তুজজ্ঞান'। অর্থাৎ এই অবস্থায় বিষয় যেটুকু তথ্য দিতে পারে তার মধ্যেই এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। তাই জন্য একে নির্বিকল্প জ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪] কুমারিল এই অবস্থার সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষজ্ঞানের তুলনা করেছেন। তার জাতি সম্পর্কিত জ্ঞান বা জ্ঞেয় বস্তুর গুণসম্পর্কিত জ্ঞান বর্তমান থাকে না। তাতে থাকে কেবল জ্ঞাতব্য বিষয় ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের সম্বন্ধে যে তথ্য দিতে পারে তাই। সুতরাং

১ Sensation ২ Perception

৩ প্রকরণ পঞ্চিকা, প্রত্যক্ষ ৪ শ্লোকবার্তিক, প্রত্যক্ষ সূত্র

নির্বিকল্প জ্ঞান হল অস্পষ্ট জ্ঞান। তা যাকে আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতি[১] বলি তার সমস্থানীয়। মীমাংসা দর্শনের মতে তা হলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের তা হল প্রথম ব অসংস্কৃত রূপ।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের সংস্কৃত রূপকে মীমাংসা দর্শনে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে তা সবিকল্প, কারণ সেখানে জ্ঞান স্পষ্টতর রূপ গ্রহণ করে। এই অবস্থায় জ্ঞে বস্তুটির জাতি কি এবং নাম কি, তার সহিত আমরা পরিচিত হই। প্রভাকর বলেন সবিকল্প জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে দুই পথে। প্রথম, অন্য বস্তু হতে তা গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করে; দ্বিতীয়, গুণগত সাদৃশ্য হেতু যে জাতির সহিত ত যুক্ত হবার যোগ্য তার সহিত তাকে যুক্ত করে। নির্বিকল্প জ্ঞান কেবল বিষয়ে নিজস্ব তথ্যগুলি দেয়। অতিরিক্তভাবে তাদের সাহায্যে তার জাতিগত সম্বন্ধ উপলব্ধি না করলে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত হওয়া যায় না।[২] সুতরাং মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্ত খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তা ন্যায়দর্শনের মত গ্রহ করেছে, কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবস্থার সহিত সংযুক্ত করেছে। তার মতে প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞানে জাতিগত ঐক্য এবং তার ভিত্তিতে অন্য জাতির সহিত পার্থক্যের বোধ আসে। সেটা সম্ভব হয় জাতিজ্ঞানে দ্বারা। অর্থাৎ তা স্বীকার করে যে সার্বিকের সহিত ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যে সংযোগ স্থাপনের পরেই আমরা প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা সবিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাই।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের মত সুস্পষ্ট নয়। তাই ত বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে। তবে মনে হয় মূলত তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে তা একটু স্বতন্ত্ররূপে স্থাপিত হলেও তা মীমাংসা দর্শনের অনুবর্তী। অর্থাৎ ত স্বীকার করে না যে প্রত্যক্ষজ্ঞান জ্ঞাতব্যের বিষয় যে তথ্য দেয় তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তা বলে অতিরিক্তভাবে তার সঙ্গে বুদ্ধিশক্তির একটি প্রক্রিয়া জড়ি আছে এবং মোটামুটি তার কাজ হল যেন সার্বিকের অর্থাৎ জাতির প্রকৃতি সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন করা। এই কথাই যেন সাংখ্যের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে সাংখ্যের মূল তত্ত্ব হ দুটি, প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ স্বভাবতই নির্লিপ্ত এবং চিৎস্বরূপ; অপরপক্ষে প্রকৃতি জড় এবং সক্রিয়। উভয়ের সংযোগ ঘটলে প্রকৃতি সক্রিয় হয় এব

১ Sensation

২ বস্ত্বন্তরানুসন্ধানশূন্যতয়া সামান্যবিশেষরূপতা ন প্রতীয়তে। প্রকরণ পঞ্চিকা

মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয় প্রকৃতির উদ্ভব হয়। তারা প্রকৃতিরই আশ্রিত কিন্তু পুরুষে প্রতিফলিত।

জ্ঞান সম্ভব করতে দুটি তত্ত্ব বা একটি দ্বৈতভাবের যে প্রয়োজন আছে তা সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত। একদিকে জ্ঞেয় বা বিষয় এবং অন্যদিকে জ্ঞাতা বা ভোক্তা। জ্ঞাতার জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদিত হয় কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে। সেইগুলি হল বুদ্ধি, অহংকার, মন ও ইন্দ্রিয়। প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ ঘটলে সেগুলি উত্তেজিত হয়। তখন তারা যে তথ্য সংগ্রহ করে তা মনের কাছে আসে। মন তখন তাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি রূপে পায়। অহংকার সেই অবস্থায় তাকে বুদ্ধির নিকট স্থাপন করে। তখন বুদ্ধি নিজে পরিবর্তিত হয়ে বিষয়ের অনুকরণ করে তার রূপ ধারণ করে। তখনই প্রকৃত উপলব্ধি হয়।[১] সুতরাং এখানেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দুটি স্তর দেখতে পাই। একটি হল ইন্দ্রিয়দত্ত অনুভূতি। তাকে মীমাংসা দর্শনের নির্বিকল্প জ্ঞানের সমস্থানীয় ধরে নিতে পারি। দ্বিতীয় অবস্থায় পাই বুদ্ধি নিজের মধ্যে পরিবর্তনের ফলে বিষয়ের রূপ গ্রহণ করে এবং তখনই বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হয়। একেই উপলব্ধি[২] বলা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় অবস্থার জ্ঞানকে আমরা মীমাংসা দর্শনের সবিকল্প জ্ঞানের সহিত তুলনা করতে পারি। বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রক্রিয়ার ফলে তা যে বিষয়ের অনুরূপ রূপ ধারণ করে বলা হয়েছে তা কি, তা ঠিক বোঝা যায় না। হয়ত তা হল বিষয়ের একটি মানসিক রূপ[৩]। এমনও হতে পারে, মনে যে সার্বিকের একটি ধারণা থাকে এ হল তাই। তাকে বিষয়ের মানসিক রূপ ধরে নিলেও বুদ্ধির এই ভূমিকা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সার্বিকের সহিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংযোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যাবে যে আলোচ্য প্রশ্ন সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে তিন শ্রেণীর মত প্রচারিত হয়েছে। প্রশ্ন হল প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষয়ের সঙ্গে মনের সোজাসুজি সংযোগ ঘটে কিনা সাধারণ মানুষ এই প্রক্রিয়ার জটিলতা। সম্বন্ধে ভাল রকম অবহিত নয় বলে ধরে নেয়, তা ঘটে। আমি যা দেখি তা সোজা দেখি। প্রথম শ্রেণীর মত এই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের সোজাসুজি সাক্ষাৎকার হয়। প্রাচীন

১ তত্ত্বকৌমুদী, ৩৬

২ Cognition ৩ Mental image

বৌদ্ধ দর্শন এই মতের সমর্থক। ন্যায়দর্শন ও মোটামুটি এই মতের সমর্থন করে। তবে সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করে যে তা যে জ্ঞান দেয় তা 'অব্যপদেশ্য', অর্থাৎ এমন অস্পষ্ট যে তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মত বলতে পারি। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে মীমাংসা দর্শনের মত। তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে দুটি স্তরে ভাগ করে। প্রথম স্তরে পাই ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য। তা যে জ্ঞান দেয় তা অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট। তাই তাকে নির্বিকল্প জ্ঞান বলা হয়েছে। তারপর সেই তথ্যের উপর জাতি সম্পর্কিত বোধ আরোপ করে তবেই স্পষ্ট বা সবিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এখানে সার্বিকের সহিত সংযুক্ত করার প্রয়োজন স্পষ্ট ভাবেই স্বীকৃত। সাংখ্য দর্শনের মতটি ভাল বোধগম্য নয়। তবে যেটুকু বোঝা যায় তা হতে ধারণা করা যায় তা মোটামুটি মীমাংসা দর্শনের অনুরূপ মত পোষণ করে। তা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে দুটি স্তরে যে প্রক্রিয়া ঘটে তা স্বীকার করে।

আমরা এইবার পাশ্চাত্যদর্শনে এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তার বিবরণ দিতে পারি। মোটামুটি পাশ্চাত্য দর্শনেও দেখা যায় চিন্তাধারা অনুরূপ পথে পরিচালিত হয়েছে। অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পার্থক্য থাকায় চিন্তা একটু ভিন্ন রূপ নিয়েছে। ইয়োরোপীয় দর্শনের চিন্তায় ও মোটামুটি তিনটি শ্রেণীর মত লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথম মতটি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। অর্থাৎ তা বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিষয়ের সহিত মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। টমাস রীড-এর চিন্তা এই শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মতটি একটু অসাধারণ। তা স্বীকার করে যে জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যস্থতায়। তা সত্ত্বেও তা বলে মনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞেয়বস্তুর সোজাসুজি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই মতটি প্রতিপাদিত হয়েছে এক মার্কিন দার্শনিক গোষ্ঠী দ্বারা। তাঁদের প্রতিপাদিত তত্ত্বটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সমালোচনামূলক বস্তুবাদ'[১]। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর মত। তিনি স্পষ্টতই বলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান মনের সহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে। তাই তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য[২] বহন করে তারা প্রত্যক্ষ, কিন্তু তাদের জ্ঞান পরোক্ষ। সুতরাং তাঁর ধারণায় প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষয়ের সহিত মনের

১ Critical Realism
২ Data

সোজাসুজি সংযোগ ঘটে না। এইবার এই মতগুলির বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হবে।

টমাস রীড সাধারণ মানুষের যা দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি তাই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে মন সোজাসুজি মনের বাহিরে অবস্থিত বিষয়কে জানতে পারে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ ঘটলেই আমরা তার বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। এর সঙ্গে কোন অনুমানের প্রক্রিয়া জড়িত নয়। সোজাসুজি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়।[১]

এবার আমরা সমালোচনামূলক বস্তুবাদের[২] প্রতিপাদ্যটি স্থাপন করব। এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয় সাতজন মার্কিন দার্শনিকের মিলিত উদ্যমে। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত দার্শনিক সান্টায়ানা অন্যতম। তাঁদের প্রতিপাদ্যটি জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি নির্দ্ধারণে প্রধানত সীমাবদ্ধ। কাজেই বর্তমান আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক। তার প্রথম আবির্ভাব হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে একটি গ্রন্থে। তাতে যাঁরা তার পৃষ্ঠপোষক তাঁদের প্রত্যেকের রচিত প্রবন্ধ আছে।[৩] তাঁরা যে প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছেন তা হল, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে? তাঁদের উত্তর হল, প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের; তা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সংঘটিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এইভাবে এই চিন্তায় একটি আভ্যন্তরীণ অনৈক্য এসে পড়ে। সে প্রশ্ন বিবেচনা করবার আগে তাঁরা কি বলেছেন তা বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক।

সমালোচনামূলক বস্তুবাদ বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তিনটি দিক আছে। প্রথম পাই জ্ঞেয় বস্তু। তার পরিচয়ই এখানে মূল প্রশ্ন। দ্বিতীয় পাই তার পরিচয়ের চেষ্টায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি কর্তৃক আহৃত তথ্য[৪] এবং তৃতীয়ত পাই জ্ঞাতার মনে তার সম্বন্ধে যে ধারণা হয় তাই[৫]। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতিরিক্ত মনের মধ্যে বিরাজমান একটি তৃতীয় পদার্থ পাই যা হল ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য। তা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় যে জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। তা এই কথাটি জোর দিয়ে বলে যে ইন্দ্রিয়

১ Essay on the Intellectual Powers of Man

২ Critical Realism

৩ Essays in Critical Realism, Co-operative study in the Problems of Knowledge

৪ Datum ৫ Psychological idea

বাহিত তথ্যের মাধ্যমে মনের মধ্যে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটলেও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। তা দাবী করে যে মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুকে জ্ঞাতা প্রত্যক্ষ জানতে পারে।[১] এই আপাতদৃষ্টিতে বিরোধের মীমাংসা এই দার্শনিক গোষ্ঠী করেছেন এইভাবে।

তাঁরা বলেন তা সম্ভব হয় ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যের প্রকৃতি হেতু। এই তথ্য বাস্তব প্রকৃতিরও নয় মানসিক প্রকৃতিরও নয়। তাকে তাঁরা 'জ্ঞানতাত্ত্বিক পদার্থ' বলেছেন।[২] তাঁদের ধারণা ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য প্রকৃত বস্তুর সারাংশ[৩] বহন করে। তাকে তাঁরা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। কোথাও বলেছেন তা হল বস্তুর 'চরিত্র বিন্যাশ'[৪] কোথাও বলেছেন 'তথ্যের আধেয়' কোথাও বলেছেন 'অর্থ বা তাৎপর্য'[৫]। সাণ্টায়ানা তাঁর ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন এইভাবে। তা হল বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা বিশুদ্ধ চিন্তার বিষয়, তা বিশেষ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার বাহিরের বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বা বাস্তব অস্তিত্ব নেই[৬]। তাঁর ব্যাখ্যাটি সত্যই অবোধ্য। মনে হয় তিনি বলতে চেয়েছেন ইন্দ্রিয় যে তথ্য বহন করে তা বস্তুর সহিত এক নয়, তা মানবিক অনুভূতি বা চিন্তার বিষয়, কিন্তু তা বস্তুর সারকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতার কাছে স্থাপন করে। তাঁরা বলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতার সঙ্গে বিষয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, কারণ তথ্যের মধ্যে বিষয়ের সারাংশকে পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠীর অন্যতম দার্শনিক অধ্যাপক সেলার বিষয়টিকে সহজ করে বোঝাবার জন্য একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন তথ্যের ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধটা আধার ও আধেয়ের মত।[৭] তথ্য যেন আধেয় এবং বিষয় যেন আধার। আধার এবং আধেয় পৃথক হলেও তাদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আধার হতে যদি আধেয়কে বার করে মনের কাছে স্থাপন করা যায়, তা হলে মূল সম্বন্ধে একটি জ্ঞান সম্ভব এবং সেটি প্রত্যক্ষ

১ "We shall point out that we claim from the first to know physical objects." Essays on Critical Realism, p. 193

২ "an entity of the peculiar type belonging to logic." Ibid.

৩ Essence ৪ Character complex ৫ Meaning

৬ "This object of pure sense or pure thought, with no belief superadded, an object inwardly complete and individual but without external relation or physical status is what I call essence."

Essays on Critical Realism, p. 168 foot not

৭ "The content is intuited ; the object is reacted to and affirmed,"

স্থানেরই সমস্থানীয়। মনে হয় এই গোষ্ঠী এই ধরণের একটি যুক্তি ব্যবহার করেছেন।

একটা উপমা প্রয়োগ করা যাক। তা হলে হয়ত তাঁদের বক্তব্য আরও একটু স্পষ্ট হবে। ধরা যাক একটি বই আছে। সেই বইটি আমি সোজা পড়তে পারলাম না; কিন্তু আর একজন পড়ে তার বিষয়টি সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করলেন। ফলে বইটি সম্বন্ধে আমার এক ধরণের ধারণা উৎপাদিত হল। এখানে গ্রন্থ এবং তার আলোচ্য বিষয় যেন হল জ্ঞেয়বস্তুর এবং তার সার আমার নিকট স্থাপিত হল অন্যের মাধ্যমে যিনি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনীয়। সে ক্ষেত্রে তিনি যা বলেন তাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের পরিভাষায় 'ডেটাম্'-এর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যের সমস্থানীয়, আর মনের ভূমিকা হল সোজাসুজি পাঠক না হয়ে অন্যের মুখে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। এই কারণে এঁরা বলেন যে সাধারণ মানুষ যে অর্থে বলে সে অর্থে সোজাসুজি আমরা বাস্তব জগতকে প্রত্যক্ষ করি না, যা প্রত্যক্ষ করি তা হল তথ্য।[১] তা সত্ত্বেও এঁরা দাবী করেন যে একরকম ভাবে জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে, কারণ তথ্য জ্ঞেয়বস্তুর সম্পর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ মনের নিকট স্থাপন করে।

সমালোচনামূলক বস্তুবাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতেই একটি আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি এসে পড়ে। তা বলে আমরা ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যকে জানি, প্রকৃত বস্তুকে জানতে পারি না। তবু দাবী করে যে প্রকৃত বস্তুকেই প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানা যায়। এই অসঙ্গতি দূর করবার জন্য রীড এক নূতন তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। তাও বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং সেই কারণে এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রীড বলেন ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহিত যে তথ্য পাই, তাই হল সোজাসুজি প্রকৃত বস্তু। অবশ্য তাঁর ধারণায় বস্তুর সামগ্রিক পরিচয় তা দিতে পারে না, কারণ তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তবে যেটুকু পরিচয় দেয় তা বস্তুরই পরিচয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য[৩] এবং বস্তু[৪] একই জিনিস।

১ "We admit as a result of reflection we intuit only contents."
Easays in Critical Realisen, p. 193

"The physical realm is one that we can never intuit, as commonsense tends to suppose, the only realm we intuit is the realm of date."
Op. Chit p. 195.

"For me then the sense datum here and now is a part of the physical objective world." L. A. Reid, Knowledge and Truth, Chap. VI

৩ Datum   ৪. Object

এইভাবেই তিনি এই অসঙ্গতির সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তবে কতটা পেরেছেন, তা বোঝা শক্ত। কারণ তাঁর নিজের ব্যাখ্যা অত্যন্ত জটিল এবং ইন্দ্রিয় বাহিত তথ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও সুস্পষ্ট বলে মনে হয় না। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর ব্যাখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে।

রীড বলেন বাস্তব জগত অত্যন্ত জটিল বস্তু। অপরপক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই তারা বিষয়ের অংশ সম্বন্ধে মাত্র তথ্য বহন করবার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং তাদের সাহায্যে প্রত্যক্ষবস্তুর আংশিক জ্ঞান মাত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে আরও জটিলতা এসে পড়ে। কারণ, যে তথ্য সংগৃহীত হয়, তা জ্ঞেয় বস্তু হতে স্বতন্ত্র অন্য সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যের সহিত মিশে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অতিরিক্ত তথ্য যে কি, তা তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত সেগুলি অংশত মানসিক উপাদান।[১] তাঁর ধারণায় প্রত্যক্ষজ্ঞানে তিনটি স্বতন্ত্র পদার্থের ভূমিকা থাকে। প্রথমত আছে জ্ঞেয় বস্তু যার প্রকৃতি এমন জটিল যে তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত থাকে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি। তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেই বস্তুর কিছু অংশ সম্বন্ধে তারা তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তৃতীয়ত মনের দিক হতে সেই সংগৃহীত তথ্য হতে নির্বাচন করে জ্ঞাতা প্রকৃত বস্তুকে জানতে পারে। যাকে তিনি ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য[২] বলেছেন তার প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট নয়। মনে হয় তা যেন তাঁর মতে স্থান-কালে অবস্থিত নয়, তা বস্তুর মতও নয়, মনের মতও নয়। মোটামুটি তিনি নিশ্চিত যে তা বস্তুপ্রকৃতির নয়, তা জ্ঞান-তত্ত্ব সংক্রান্ত পদার্থ।[৩]

সুতরাং দেখা যায় রীড সমালোচনামূলক বস্তুবাদের অসঙ্গতি দূর করতে গিয়ে এক অসাধারণ জটিলতা এবং অসঙ্গতির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। প্রথমত তাঁর চিন্তা জটিল এবং দুর্বোধ্য। উপরের ব্যাখ্যা হতে দেখা যায় যে

১ "The physical object is intuited directly, that is to say that we intuit real physical things not mere essences, but our intuition is not full or true or adequate, being affected by other factors, physical and oher wise, than those of the object which direct perception takes into account." Ibid

২ Datum

৩ "What to call it I have no idea what so ever, unless it be the transferred epithet, 'epistemological.'" Ibid

ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যের[১] প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রতিপাদ্যের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট অসঙ্গতি এসে পড়েছে। একদিকে তিনি বলছেন জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যা পাই তা প্রকৃত বস্তু।[২] যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে টেবিল দেখছি, তখন প্রকৃত টেবিলকেই সোজাসুজি প্রত্যক্ষ দেখছি। অপরদিকে তিনি বলেন জ্ঞানেন্দ্রিয় যে তথ্য আনে তাতে অংশত বস্তু থাকে এবং অংশত অন্য সূত্র হতে অন্য উপাদান সঞ্চারিত হয়; তার ফলে যা পাই তা ঠিক মূল বস্তুর মত নয়, তা স্থান-কালের অতীত। এই দুটি উক্তি পরস্পর বিরোধী। সে ক্ষেত্রে তিনি কি করে দাবী করতে পারেন যে ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য এবং বস্তু একই পদার্থ, তা বোঝা যায় না।

এর থেকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে অভিমত অনেক সহজ-বোধ্য। তা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর গ্রহণ করা যায় কিনা তা ভিন্ন প্রশ্ন, তবে আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় তাঁর স্থাপিত তত্ত্বের মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি দেখা যায় না। তিনি স্পষ্টই বলেন যখন আমরা একটা টেবিল প্রত্যক্ষ করি, তখন আমরা প্রকৃত টেবিল কি তা জানি না, তা আমাদের নাগালের বাহিরে রয়ে যায়; ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য হতে পরোক্ষভাবে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা করে নিই। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানে ও একটি অনুমানের উপাদান রয়ে যায়। এই বার আমরা তাঁর প্রতিপাদ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমতকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য তিনি প্রথমেই জ্ঞানকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম হল পরিচয় ভিত্তিক জ্ঞান[৩] এবং দ্বিতীয় হল বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান[৪]। তিনি বলেন আমরা পরিচয় ভিত্তিক জ্ঞান তখনই পাই যখন অন্য কোন প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত জ্ঞেয়ের সহিত আমাদের সোজাসুজি পরিচয় ঘটে।[৫] আর বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান পাই কতকগুলি নীতির[৬] প্রয়োগ করে। প্রথমটি হল বস্তুর জ্ঞান, যেমন মনের অনুভূতির জ্ঞান, পূর্বে ঘটিত ঘটনার স্মৃতি। আর দ্বিতীয়টি হল যা সত্য

১ Datum ২ Object

৩ Knowledge by acquaintance

৪ Knowledge by description.

৫ "We have acquaintance with anything of which we are directly aware without the intermediary of any process of inference or any knowledge of truths." The Problems of Philosophy, Chap. V

৬ Logical principles

তার জ্ঞান। এখানে অনুমানকে ভিত্তি করে জ্ঞান গড়ে ওঠে। সুতরাং প্রথম হল প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি আনুমানিক জ্ঞানের সমস্থানীয়।

রাসেল-এর ধারণায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে পাই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুর সাক্ষাৎ পরিচয়। তার ফলে যা পাই তা হল ইন্দ্রিয়জাত তথ্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়জাত তথ্য হল পরিচয়ভিত্তিক জ্ঞান।[১] তার পরের স্তরে আসে বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান।[২] এখানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের সহিত সার্বিকের সাদৃশ্য স্থাপন করে তবেই দ্বিতীয় স্তরে আমরা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষজ্ঞান পাই। তা অনুমানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তা পরিচয় ভিত্তিক জ্ঞান নয়, তা বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান[৩]। আমি যখন একটি টেবিল দেখি, তখন তার সম্বন্ধে চক্ষুরিন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় প্রভৃতি যে জ্ঞান বহন করে তা পরিচয় ভিত্তিক জ্ঞান, কারণ এখানে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞেয়বস্তুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। কিন্তু সেই তথ্যের সাহায্যে টেবিল সম্বন্ধে যে জ্ঞান মনে গড়ে ওঠে তা বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান, তাই পরোক্ষ।

রাসেল বলেন প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য। সেই তথ্য সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপাদান। মন যখন সেই তথ্যকে সার্বিকের সহিত সংযুক্ত করে একটি জ্ঞানবাক্য গড়ে তোলে, তখনই আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞান[৪] পাই। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি[৫] হতে উৎপাদিত জ্ঞান। যেহেতু তা ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[৬]

সুতরাং তাঁর মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যে দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হল ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য। তা পাওয়া যায় জ্ঞেয়বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে। কিন্তু তা তখনই পরিপূর্ণ প্রত্যক্ষজ্ঞানে পরিণত হয় যখন তা জ্ঞান-বাক্যের রূপ নেয়। এই জ্ঞানবাক্যে মনের সহিত জ্ঞেয়বস্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে

১ "Sense-date as we have already seen are among the things with which we are acquainted." Ibid

২ Perceptual Knowledge

৩ "It will be seen that among the objects with which we are not acquainted included (as opposed to sense-data) physical objects, nor other people's minds." Ibid

৪ Perceptual Knowledge ৫ Sensation

৬ Problems of Philosophy, Chap. XI, On Intuitive Knowledge, দ্রষ্টব্য

না। প্রথমটি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্য যে অপরিণত জ্ঞান স্থাপন করে তা পরিচয় ভিত্তিক জ্ঞান। কিন্তু পরিণত প্রত্যক্ষজ্ঞান বর্ণনাভিত্তিক। তাই জন্য তা জ্ঞানবাক্যের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই জ্ঞানবাক্য তাঁর ধারণায় দুই শ্রেণীর হতে পারে। তারা হল এই:

১) সরল ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যের অস্তিত্বসূচক;
যেমন 'একটি লাল দাগ রয়েছে'।

২) জটিল ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানের পরিচায়ক। তা আবার দুই শ্রেণীর হতে পারে:

(ক) যুগপৎ আকৃতি ও বর্ণসূচক একটি মাত্র ইন্দ্রিয় দত্ত তথ্যজ্ঞাপক।
যেমন 'লাল দাগটি গোলাকার'।

(খ) বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধসূচক। যেমন 'এটি ওটির ডান দিকে'।

সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যের সহিত সার্বিকের সংযোগ ঘটেছে। তাই তা পরিচয়ভিত্তিক জ্ঞান নয়, বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান।

আমরা উপরের আলোচনা হতে দেখতে পাই যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তিন শ্রেণীর মত গড়ে উঠেছে। এক শ্রেণীর মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। তা বলে প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সোজাসুজি সংযোগ স্থাপিত হয়। এই ধরণের মত বৌদ্ধদর্শনের বৈভাষিক শাখা গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্য দর্শনে টমাস রীড-এর মতও তার অনুসরণ করে। তারপর একটি মত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে যা অনুভব করে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দুটি স্তর আছে। প্রত্যক্ষজ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে যত সরল মনে হয় প্রকৃত পক্ষে তা নয়, তা অত্যন্ত জটিল। প্রথম স্তরে ইন্দ্রিয়গুলির জ্ঞেয়-বস্তুর সহিত সংযোগ ঘটে। তার ফলে মনের কাছে কিছু তথ্য স্থাপিত হয়। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের পরিণত রূপটি গড়ে ওটে। তাতে মনের কিছু ভূমিকা থাকে। তাই জন্য তাঁরা এই দুটি স্তরকে সূচিত করতে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের মধ্যে দুটি শ্রেণী স্থাপন করেছেন।

একটি হল ইন্দ্রিয় বাহিত তথ্য। ভারতীয় দর্শনে তাকে নির্বিকল্প জ্ঞান বলা হয়। ন্যায় দর্শনে সম্ভবত একেই অব্যপদেশ্য জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় তা প্রত্যক্ষজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থার উৎপাদনে মনের একটি সক্রিয় ভূমিকা থাকে। এখানে জ্ঞান স্পষ্টতর হয়। তাই জন্য ভারতীয় দর্শনে তাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা হয়। মীমাংসা দর্শনে এই

মতটি সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞানে যে সার্বিকের প্রয়োগ ঘটে তা সেখানে লক্ষ্য করা হয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর দর্শনে ও এই অবস্থায় সার্বিকের প্রয়োগ স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। তা সূচিত করতে তিনি প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে জ্ঞানবাক্য বলে বর্ণনা করেছেন[১]। সমালোচনামূলক বস্তুবাদ এই বিষয় স্পষ্ট কিছু উল্লেখ না করলেও তা স্বীকার করে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদনে মনেরও একটি ভূমিকা আছে। এইখানেই নব বস্তুবাদের সহিত তার পার্থক্য। নববস্তুবাদ জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে মনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। এই অর্থে তা একবাদী। অপরপক্ষে সমালোচনামূলক বস্তুবাদ দ্বৈতবাদী। তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তিনটি পৃথক পদার্থের ভূমিকা স্বীকার করেছে। তারা হল জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানেন্দ্রিয় সংগৃহীত তথ্য এবং জ্ঞাতা।

সুতরাং দেখা যায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক দিকে আছে জ্ঞাতার মন এবং অপরদিকে আছে জ্ঞেয় বস্তু। মাঝখানে আছে জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞেয়বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার সোজাসুজি সংযোগ ঘটে না। সোজাসুজি সংযোগ ঘটে জ্ঞেয়বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের। তার ফলে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য সংগ্রহ করে তাও যে অবিকৃতরূপে জ্ঞাতার নিকট স্থাপিত হয় তাও নয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্ভবত জ্ঞেয়ের প্রকৃতি পরিচয় পায়, কিন্তু সেই অবস্থায় ত তাকে মনের কাছে পাঠাতে পারে না। পাঠাতে হলে তাকে মনের গ্রহণযোগ্য করে পাঠাতে হয়। সেটা সম্ভব হয় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে স্নায়বিক স্পন্দনে[২] রূপান্তরিত করে। তার সাহায্যে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের কোষগুলির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তখনই মন তাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তার ফলে মনের মধ্যে যে জ্ঞান ফুটে ওঠে তাও ভাসা ভাসা অস্পষ্ট জ্ঞান। তা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয় তখনই যখন মন তার ওপর শ্রেণীগত ধারণা বা সার্বিকের প্রয়োগ করে তাকে চিনতে পারে।

একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। ধরা যাক আমার জানালার বাহিরে একটি পাখী বসে আছে দেখছি। এই দেখাটা আপাতদৃষ্টিতে এত সহজে সম্পাদিত হয় যে তার জটিলতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলেই বোঝা যায়। তার জটিলতা দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। এখন এই পাখী দেখা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-

১ Judgment of perception

২ Nerve impulse or Nerve current

জ্ঞান একটি জটিল পথে এই ভাবে উৎপাদিত হয়। প্রথমে আমাদের চক্ষু পাখীর দৈহিক গঠন ও বর্ণবিন্যাসের পরিচয় পায়। চোখের ওপরে যে পর্দা আছে[১] তাতে আয়নায় যেমন কোন বস্তুর মূর্তি হুবহু প্রতিফলিত হয় ঠিক সেই রকম প্রতিফলিত হয়; কিন্তু মনের মধ্যে সেই ভাবে তা সোজাসুজি যায় না। তা প্রথমে চোখের পেছনে স্থাপিত পর্দায় অর্থাৎ অক্ষিপটে[২] স্থাপিত হয়। সেখানে তা দুটি সম্পর্কিত স্নায়ুর[৩] মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি করে। সেই স্পন্দন মস্তিষ্কের যে অংশে দৃষ্টি উৎপাদনের ক্ষমতাধারী কোষগুলি আছে তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই হল মনের তাকে বোঝবার উপযুক্ত ভাষা এবং সেই কারণে তখনই মন ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যকে বুঝতে পারে। যেটুকু তথ্য পায় তা কিন্তু অস্পষ্ট, কারণ যে বস্তু সম্বন্ধে তথ্য স্নায়ুযোগে বাহিত হয়ে মনের কাছে এল তার ব্যাখ্যা তখনও হয় নি।

এর ফলে যেটুকু জ্ঞান উৎপাদিত হল তা সত্যই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ বিষয় ন্যায় দর্শন যা বলেছে তা ঠিক। তা সত্যই 'অব্যপদেশ্য'। তাতে মন যা পেল তার ওপর নির্ভর করে মন বড জোর তার ওপর একটি সর্বনাম প্রয়োগ করে বলতে পারে: 'এটা'। কিন্তু সেটা কি সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তখনও সম্ভব হয় না। এইখানেই মনের একটা নিজস্ব ভূমিকা এসে পড়ে। নিজের অতীতের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে ইতিমধ্যে তা 'পাখী' এই সার্বিক সংজ্ঞাটির সহিত পরিচিত হয়েছে। তা যে গুণগুলির সমষ্টি দিয়ে গঠিত তাদের সঙ্গে স্নায়ুবাহিত তথ্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মন তখন চিনতে পারে 'এটি একটি পাখী'। এই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিপূর্ণ রূপ। সুতরাং বার্ট্রাণ্ড রাসেল ঠিকই বলেছেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানসূচক বাক্য।[৪] মনের যে একটা ভূমিকা থাকে তা সুন্দর বোঝা যায় যাকে ভারতীয় দর্শনে বলা হয় সালম্বন ভ্রম[৫] তার দ্বারা। সালম্বন ভ্রম ঘটে মনের ব্যাখ্যাব কাজটা ঠিক সম্পাদিত হয় না বলে, অর্থাৎ ঠিক সার্বিকের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যের মিলন ঘটাতে পারে না বলে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক আমাদের উদাহরণের পাখীটি একটি তুলনায় বড় কালো রঙের পাখী। তা প্রকৃতপক্ষে একটি দাঁড়কাক। ভাল করে না দেখে যে তথ্য পেয়েছিলাম তার ফলে আমি ভাবলাম এটি একটি সাধারণ কাক এমন সময় তা দাঁড়কাকের মত ডেকে উঠল। আমার ভ্রান্তি টুটে

১ Lens ২ Retina ৩ Optic nerve
৪ Judgment of perception ৫ Illusion

গেল। অতিরিক্ত তথ্যের সহিত মিলিয়ে বললাম, এত কাক নয়, দাঁড় কাক। সুতরাং রাসেল যখন বলেন প্রত্যক্ষজ্ঞানে ভ্রান্তির অবকাশ নেই তিনি ঠিক বলেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও ভ্রান্তি ঘটতে পারে। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সালম্বন ভ্রম। এই দৃষ্টান্ত অতিরিক্তভাবে একথাও প্রমাণ করে দেয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদনে মনেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যকে চিনবার বা ব্যাখ্যা করবার দায়িত্ব তার এবং সেই দায়িত্ব ঠিক মত সম্পাদিত হবার ওপর তার নিশ্চয়তা নির্ভর করে।

এই আলোচনার ফলে মনে হয়, প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জনে আমরা সার্বিকের ভূমিকা যতখানি আছে ভাবি তার থেকে অনেক বেশী। সেটা ভাল বোঝা যায় আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেভাবে কজে করে তা বিশ্লেষণ করলে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি: চক্ষু, ত্বক, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা। তাদের গুরুত্ব সমান নয়; কারও কম, কারও বেশী। তবে তারা পরস্পর একযোগে কাজ করে এবং পরস্পরের সহায়তা করে। তার ফলে সামান্য আংশিক তথ্যের উপর ভিত্তি করেও প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এদের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্থান যে সবার উপরে তা নিয়ে বিতর্ক নেই। যেমন কাছের বস্তু তেমন দূরের বস্তু সম্বন্ধে তা তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। হাতের পাশের বইখানাও যেমন তার নাগালে আসে তেমন লক্ষ লক্ষ আলোক বৎসরের দূরত্বে অবস্থিত নক্ষত্রও তা দেখতে পায়। জ্ঞেয় বস্তুর সামগ্রিক রূপ তার সাহায্যে এক দর্শনেই পাওয়া যায়।

কাজেই জ্ঞান আহরণে তার ভূমিকা সর্বপ্রধান। তারপর ত্বক ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা। তা বস্তুর আকার সম্বন্ধে পরোক্ষ একটা ধারণা দিতে পারে। জ্ঞেয় বস্তু গোলাকার না চতুর্ভুজবিশিষ্ট একটি ঘনত্ববিশিষ্ট বস্তু, কি অন্য কোন আকৃতির, তার ওপর হাত বুলিয়ে চোখ বন্ধ রেখেও তা বলা যায়। সেই কারণেই অন্ধ ব্যক্তির নিকট ত্বক ইন্দ্রিয় সব থেকে নির্ভরযোগ্য ইন্দ্রিয়ের স্থান অধিকার করে। কিন্তু সেখানে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে স্থাপন না করতে পারলে ত্বক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর আকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, চক্ষুরিন্দ্রিয় আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে এক নজরে, কিন্তু ত্বক ইন্দ্রিয় সেই ধারণা করে বিভিন্ন পৃথক অনুভূতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। অর্থাৎ চক্ষুর ক্ষেত্রে পরিচয়টা হয় রাসেল-এর ভাষায় পরিচয়ের ভিত্তিতে এবং ত্বকের সাহায্যে পরিচয় হয় বর্ণনার ভিত্তিতে।

তাদের পরে অন্য ইন্দ্রিয়গুলির স্থান। তাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রবণেন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানে তার ভূমিকা দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। তা আকৃতি সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিতে পারে না। তা শব্দ গ্রহণের সাহায্যে অন্য বস্তুর উপস্থিতি জ্ঞাপন করে। তা সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে তথা মানুষের ক্ষেত্রে বিপদের সংকেত করে। ঝড়ের শব্দ বা ভারি জিনিসের পতনের শব্দ বা অন্য জীবের গতিবিধির শব্দ সম্বন্ধে তথ্য তা মনের কাছে স্থাপন করে। স্থতরাং তার মূল ভূমিকা শব্দের সংবাদ এনে বিপদ সংকেত করা। তার দ্বিতীয় কাজ হল পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করা। ইতর শ্রেণীর জীবের সে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ কারণ, তাদের শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনন্যসাধারণ। তার দুটি কারণ আছে। প্রথমত মানুষের বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতার অন্ত নেই। দ্বিতীয়ত মানুষের মন সার্বিক সংজ্ঞা রচনা করতে পারে। দুয়ের মিলনে মানুষের ভাষা রচিত হয়েছে। ভাষা এক অপূর্ব সৃষ্টি। তাকে অক্ষরের সজ্জায় বেঁধে মানুষ তার সংস্কৃতিকে স্থায়ী রূপ দিতে পেরেছে। তাকে অবলম্বন করে যেমন বিজ্ঞান, দর্শন গড়ে উঠেছে তেমন রসসাহিত্য গড়ে উঠেছে। তবু এটা স্বীকার করতে হয় যে জ্ঞানেন্দ্রিয় হিসাবে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

বাকি রইল ঘ্রাণ এবং রসনার ইন্দ্রিয়। এদের ভূমিকা আরও সীমিত। আঘ্রাণ ও শব্দের মত অন্য বস্তুর উপস্থিত সূচিত করে, তবে ভিন্ন পথে। তা আকর্ষণও করে আবার সাবধানও করে। গলিত পদার্থের দুষ্ট গন্ধ বা হিংস্র জীবের গায়ের গন্ধ জ্ঞাতাকে সাবধান করে দেয় যাতে তাকে এড়িয়ে যেতে পারে। মিষ্ট গন্ধ বা স্বজাতির গন্ধ আবার আকর্ষণ করে। ফুল তার মিষ্ট গন্ধ দিয়ে কীট-পতঙ্গদের আকর্ষণ করে যাতে পরাগের মিশ্রণ ঘটে। রসনা-ইন্দ্রিয়ের ভূমিকাও অনুরূপ। তা দেহের পুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে কাকে বর্জন করতে হবে এবং কাকে গ্রহণ করতে হবে সে বিষয় খবর দেয়। ভাল আস্বাদ হলে গ্রহণ করবার প্রতি আকর্ষণ হয়, খারাপ আস্বাদ হলে জীব তাকে বর্জন করে বিপদ এড়ায়।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করতে পারি যার তাৎপর্য আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে। সকল ইন্দ্রিয়গুলিই এমনভাবে গঠিত যাতে জীবের জীবনযাত্রার সহায়তা করা যায়। তারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা হল বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ জীবকে প্রাণ ধারণ,

প্রাণ রক্ষা এবং বংশবিস্তারে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যটি এত সুস্পষ্টভাবে প্রকট যে উদাহরণ দিয়ে তা বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। মোটামুটি প্রাণের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতেই জীবদেহে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি গড়ে উঠেছে। প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর জীবনের মধ্য দিয়ে। বিশেষ জীব আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির ক্ষমতা ধরলেই তা সম্ভব। সে ক্ষমতা ধারণ করা যায় পরিবেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবার ক্ষমতা হতে। কারণ, পরিবেশ হতেই জীব পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং পরিবেশের প্রতিকূলতা হতেই তার আত্মরক্ষা করতে হয়। পরিবেশ কোথায় গ্রহণযোগ্য, কোথায় বর্জনীয়, তা দ্রুত এবং প্রত্যক্ষভাবে জানবার জীবের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ, বিপদ অনেক সময় এমন দ্রুত আসে যে অতি দ্রুত তার আশংকা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে না পারলে জীবের জীবন বিপন্ন হতে পারে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেন এই ভূমিকা গ্রহণের জন্যই বিকাশ লাভ করেছে।

এখন আমরা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ফিরে যেতে পারি। আমাদের প্রতিপাদ্য হল প্রত্যক্ষজ্ঞানে সার্বিকের ভূমিকা যতটা ভাবা যায় তার থেকে বেশী। সেটা বোঝা যায় যেখানে দুটি ইন্দ্রিয় পরস্পরের সহায়ক রূপে কাজ করে। সেটা সব থেকে বেশী নজরে পড়ে দর্শন আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে। আমরা একটি বস্তুকে চক্ষু দিয়ে দেখেই বুঝতে পারি তা দূরে আছে না কাছে আছে ; আরও বুঝতে পারি তা কঠিন না তরল বা বায়বীয় পদার্থ। সেটা সম্ভব হয় এই দুই ইন্দ্রিয়ের পরস্পরের সহায়ক হবার গুণে। দূরের জিনিস আকারে ছোট হয়ে যায়, সে খবর আমরা পাই দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে। তাকে কাছে পেতে যে অনেকখানি পথ অতিক্রম করতে হয় সেটা জানি অতীতের অভিজ্ঞতা হতে। দুটিকে মিলিয়ে আমরা বস্তুর আনুপাতিক আয়তনের সাহায্যে দূরত্বকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। সেইভাবেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা হতে আমরা কঠিন বা তরল বায়বীয় পদার্থের সহিত পরিচিত হই এবং সেই সঙ্গে চক্ষুর সাহায্যে তারা কেমন দেখায় তার সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। এই দুই অভিজ্ঞতার মিলনেই কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর দূরত্ব সম্বন্ধে বা কঠিনত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করি। তথ্য সংগৃহীত হয় প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু জ্ঞান অর্জনে এক্ষেত্রে সার্বিকের সাহায্যে একটি অনুমানের প্রক্রিয়া ও প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান আছে বলে মনে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনে সার্বিকের ভূমিকা নগণ্য নয়।

উপরে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তা হতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রথমত বোঝা গেছে সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে যে ধারণা বহন করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্রিয়াটি তার থেকে অনেক জটিল। আরও দেখা গেছে প্রত্যক্ষ দর্শনের সবটাই ঠিক প্রত্যক্ষ নয়। প্রথমত এই ব্যাপারে চারটি জিনিস জড়িত। একদিকে আছে জ্ঞেয় বস্তু অপরদিকে আছে জ্ঞাতৃরূপী মন। জ্ঞেয়কে জানবার জন্য তৃতীয়ত জ্ঞাতার সহায়করূপে আছে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি। চতুর্থত আছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে জ্ঞেয়ের সংযোগ। এদেরই পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয়ত আরও দেখা গেছে যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যে দুটি অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ ঘটে। ফলে কতকগুলি তথ্য ইন্দ্রিয়গুলি সংগ্রহ করে। তারা স্নায়ু-বাহিত হয়ে মনের কাছে স্থাপিত হলে এক রকমের জ্ঞানের উদ্ভব হয় যা সুস্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় অবস্থায় মন সার্বিকের সহিত তার সম্বন্ধ স্থাপন করে তার পর সুস্পষ্ট জ্ঞান আহরণ করে। প্রথম অবস্থার জ্ঞানে যতখানি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞেয়ের সহিত সংযোগ ঘটে, দ্বিতীয় অবস্থায় ততখানি ঘটে না। তবু দ্বিতীয় অবস্থার জ্ঞানকেও আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞান বলি। এখন এই অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, প্রত্যক্ষজ্ঞানে কি জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। এইটিই আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের সম্পর্কে উপরের আলোচনা হতে যে অবস্থাটির উদ্ভব হয়েছে তা এই। আমরা দেখেছি বিষয়টি নিয়ে মতানৈক্য আছে। মোটামুটি যুক্তিসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা উপরে এখনি বর্ণিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় মনের সঙ্গে অর্থাৎ জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে কি না এ বিষয় সন্দেহের অবকাশ আছে। এই প্রসঙ্গে তিনটি দার্শনিক মত বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। প্রথম হল সমালোচনামূলক বস্তুবাদের প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় হল এই বিষয় সম্পর্কে রীডের অভিমত। আর তৃতীয় এ বিষয় রাসেল-এর মীমাংসা। তিনটি দার্শনিক মতের এক বিষয় সম্পর্কে ঐক্যমত্য দেখা যায়। তিনটি মতই স্বীকার করে যে প্রত্যক্ষজ্ঞানে তিনটি জিনিসের ভূমিকা আছে। প্রথম জ্ঞেয় বস্তু, দ্বিতীয় জ্ঞাতৃরূপী মন এবং তৃতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়। তাঁরা এ বিষয়েও একমত যে জ্ঞেয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে, কিন্তু মনের ঘটে না। তা সত্ত্বেও তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন।

সমালোচনামূলক বস্তুবাদ বলে মাঝে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একটি ভূমিকা থাকলেও বস্তুর সহিত মনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, পরোক্ষ নয়। রীডও অনুরূপ কথা বলেন। কিন্তু রাসেল বলেন জ্ঞেয়বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে না। মনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যের সঙ্গে, জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে নয়। কাজেই প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহৃত হয় পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ তাঁর পরিভাষায় সে জ্ঞান পরিচয়ভিত্তিক নয় বর্ণনাভিত্তিক। এখন আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি এই মতগুলি কতখানি গ্রহণযোগ্য।

সমালোচনামূলক বস্তুবাদ এবং রীড-এর অভিমত সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। কাজেই এই দুটি মতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য অল্প কথাতেই শেষ করা যায়। সমালোচনামূলক বস্তুবাদ স্বীকার করে যে জ্ঞাতৃরূপী মনের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সোজাসুজি সংযোগ ঘটে না, তা ঘটে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে। তা সত্ত্বেও তা দাবী করে যে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় পায়; কারণ তার ধারণায় ইন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য বহন করে তাতে জ্ঞেয়ের সারাংশ থাকে। এই তত্ত্বের দুই অংশের মধ্যে এইভাবে একটি অসঙ্গতি এসে পড়ে। এখানে একরকম স্বীকৃত যে মনের সংযোগ ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যের সঙ্গে এবং তা প্রকৃত জ্ঞেয় বস্তু হতে ভিন্ন। রীড এই অসঙ্গতি হতে ছাড়া পাবার জন্য বললেন ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যই হল জ্ঞেয় বস্তু। অর্থাৎ তিনি তথ্য হতে প্রকৃত বস্তুর কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। সেটা যে গ্রহণযোগ্য প্রতিপাদ্য তা মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষভাবে তিনি স্বীকার করেন যে ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যের প্রকৃতি জ্ঞেয় হতে পৃথক। তাঁর ধারণায় এই তথ্য কোন বস্তু নয়, তার পরিচয় তিনি সঠিক দিতে পারেন না, তা একটি জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত পদার্থ।[১] তা যদি হয়, তার জ্ঞেয় বস্তুর সহিত একত্ব স্থাপন করা যায় না, কারণ তা একটি বস্তুতত্ত্ব সম্পর্কিত পদার্থ।[২] কাজেই দুটি তত্ত্বের মধ্যেই একটি আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যেতে পারে।

তুলনায় রাসেল-এর প্রতিপাদ্যের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আছে। তাও স্বীকার করে যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মাঝখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একটি ভূমিকা আছে। জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সোজাসুজি সংযোগ ঘটে না, ঘটে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে, আর জ্ঞানেন্দ্রিয় তার ফলে যে তথ্য সংগ্রহ করে তারই সহিত সংযোগ ঘটে মনের। এই অবস্থায় তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে জ্ঞানেন্দ্রিয় যে তথ্য সংগ্রহ করে তা

১ Epistemological ২ Ontological entity

পরিচয়মূলক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সেই তথ্যকে ভিত্তি করে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান মনের সাহায্যে গড়ে ওঠে তা হল বিবরণমূলক জ্ঞান, অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান। সেই কারণে তিনি দ্বিতীয় অবস্থার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষের জ্ঞানবাক্য।[১] বলেছেন। এই প্রতিপাদ্য সব দিক হতেই সঙ্গতিপূর্ণ। তাই মনে হয় আমাদের বর্তমান প্রশ্নের যতগুলি উত্তর মিলেছে তাদের মধ্যে রাসেল প্রদত্ত উত্তর সব থেকে সন্তোষজনক। আমাদের প্রশ্ন ছিল প্রত্যক্ষজ্ঞানে কি জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞাতার সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে? তার উত্তরে তিনি বলেন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে জ্ঞেয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে, কিন্তু জ্ঞেয়ের সঙ্গে ঘটে না।

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি এই বলে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সোজাসুজি সংযোগ ঘটে না। কিন্তু এই প্রতিপাদ্য যেন আমাদের মন গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে আমরা প্রত্যক্ষ বলি এই কারণে যে আমাদের ধারণা এখানে জ্ঞেয় বস্তুকে আমাদের মন প্রত্যক্ষ করে। শুধু ধারণা নয়, আমরা যেন অনুভবও করি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে জ্ঞেয়বস্তুকে পাই তাকে আমাদের মন সোজাসুজি গ্রহণ করে। আমি যে ঘরে বসে আছি তার জানালা দিয়ে বাহিরের জগতের এক ফালি দেখা যায়। সেখানে একটি তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই। আমি অনুভব করি যে তাকে আমার মন সোজাসুজি দেখছে; অথচ বিশ্লেষণ করে দেখে যুক্তি বলে আমার মন সোজাসুজি দেখছে না, আমার চক্ষু সোজাসুজি দেখছে, আর তার বাহিত তথ্যের সাহায্যে আমার মন তার সম্বন্ধে ধারণা করছে, অপর দিকে আসল তালগাছ মনের নাগালের বাহিরে রয়ে যাচ্ছে। যা বোধ করি তার সঙ্গে যুক্তির অনৈক্য ঘটলে আমরা যুক্তি যা বলে তাকেই গ্রহণ করে থাকি। এখানে অবস্থাটি ঠিক সেরকম নয়। এখানে যা বোধ করি তার সমর্থনে কিছু নির্ভরযোগ্য যুক্তিও পাওয়া যায় মনে হয়। তা নিচে স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথম কথা, আমাদের মন এমনভাবে গঠিত যে তা যেন পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান সোজাসুজি এবং সহজে সংগ্রহ করতে পারে। তার জন্যই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে বর্তমান অধ্যায়েই ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা হয়েছে। কাজেই সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ করলে চলবে। জীব হিসাবে মানুষের তথা অন্য শ্রেণীর প্রাণীর অনুক্ষণ পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ, প্রতি জীববিশেষ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা; এক দিকে

১ Judgment of perception

তা আছে অন্য দিকে তার পরিবেশ আছে। আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির জন্যই তার প্রয়োজন। এই জ্ঞান সোজাসুজি ও সরল পথে আসা উচিত। কাজেই জীবের স্বার্থে তা এমনভাবে গড়া হয়েছে অনুমান করা যায় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সোজাসুজি পরিচয় ঘটে।

শুধু তাই নয়, তার একটি সমর্থক যুক্তিও পাওয়া যায়। আমাদের জ্ঞেয় বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় স্বপ্নেও ঘটে জাগ্রত অবস্থায়ও ঘটে। জাগ্রত অবস্থার মত স্বপ্নেও গাছ-পালা, জীব-জন্তু, আত্মীয়-পর সকলের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। কেবল পার্থক্য এইখানে যে স্বপ্নে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি কোন কাজ করে না। সকল সময়ে একেবারেই কাজ করে না বললে হয়ত ভুল হবে। অনেক সময় এমন হয় যে গলা শুকিয়ে গেলে শ্বাসকষ্ট হয়। মনে সেই কষ্ট অস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। তখন তাকে ভিত্তি করেই এক দুঃস্বপ্ন গড়ে ওঠে। তবে প্রধানত বলা যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে না, মনেরই এক অংশ জীবন্ত কল্পনারূপে জ্ঞেয় বস্তুর আকার ধারণ করে; তার ভিত্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে আমরা কল্পনা করি এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে অনুভব করি। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি ঘটে মনের ভিতরে। জেগে উঠলেই দেখি যে পরিবেশে ছিলাম সে পরিবেশ নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি স্বপ্নে যা দেখি তা মনের অভ্যন্তরে থাকে। তুলনায় জাগ্রত অবস্থায় যা দেখি তা মনের বাহিরে থাকে। অতিরিক্তভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরে জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহিত তথ্যের ভিত্তিতে যা দেখি তাকে মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুরূপেই দেখি। অপরপক্ষে স্বপ্নে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান ঘটে সেখানে আমরা এমন কল্পিত বস্তুকে দেখি যার বাস্তব সত্তা নেই। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ অক্রিয় থাকে। চোখ বোজানো থাকে অথচ দেখি, কাণ শোনে না, অথচ শুনি। অবশ্য বহির্বিশ্বে অবস্থিত বস্তুর জ্ঞান জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহায়তায়ই সংঘটিত হয়। তবু মনে হয় স্বপ্নে উপলব্ধি করা বস্তু বা ঘটনা হতে জাগ্রত অবস্থায় উপলব্ধি করা ঘটনা বা বস্তুর জ্ঞান আরও স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। এই হতে মনে হয় যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যস্থতা সত্ত্বেও জাগ্রত অবস্থায় আহৃত ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞানে বস্তুর সহিত সোজাসুজি সংযোগ একভাবে ঘটে।

এই সব কারণে মনে হয় প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞেয়বস্তুর সহিত সোজাসুজি সংযোগ স্থাপিত হয় না বললে ঠিক বলা হয় না। একথা স্বীকার্য যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির এখানে একটা মধ্যস্থের ভূমিকা আছে। তা সত্ত্বেও একরকমভাবে একটি

সোজাসুজি সংযোগ স্থাপিত হয় মনে হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্যকে অতিক্রম করে অথচ তাকে অবলম্বন করে মন জ্ঞেয়বস্তুর একরকম প্রত্যক্ষ পরিচয় পায়। জ্ঞেয়বস্তুর জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন প্রত্যক্ষ পরিচয় পায় ঠিক তার মত না হলেও তা তার অনুরূপ। আমাদের এই প্রতিপাদ্য একটি উদাহরণ স্থাপন করলে সম্ভবত আর একটু পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

আমরা একটি সঙ্গীত সোজাসুজি শিল্পীর কণ্ঠে আসরে বসে শুনতে পারি আবার বাড়ী বসে রেডিওর সাহায্যেও শুনতে পারি। দুই ক্ষেত্রেই শিল্পীর কণ্ঠস্বর শুনি এবং পরিচিত শিল্পী হলে একই গান সোজাসুজি শোনা থাকলেও রেডিও হতে আসলে তাকে প্রত্যক্ষ শুনছি না মনে করি না। রেডিওর মাধ্যমে আসলেও আমরা বোধ হয় বলতে পারি তাও প্রত্যক্ষ শোনা। এটা সম্ভব হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে। যেখানে আসরে বসে গান শুনি, সেখানে শিল্পীর কণ্ঠে বাতাসে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা সোজাসুজি আমাদের কাণের পর্দায় লাগে। আর যেখানে রেডিও যোগে শুনি সেখানে শব্দতরঙ্গকে প্রথম অবস্থায় বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আবার দ্বিতীয় অবস্থায় সেই তরঙ্গকে তারযোগে ধরে রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুতরঙ্গে রূপান্তরিত করে তবে শুনি। তাই জন্য আকাশবাণী প্রচারের ব্যবস্থার দুটি অঙ্গ আছে। একটি হল বায়ুতরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করবার একটি কেন্দ্র। অপরটি হল তাকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ হিসাবে ধরে আবার বায়ুতরঙ্গে রূপান্তরিত করে পূর্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গ্রহণ যন্ত্র বা রেডিও। রূপান্তরিত হয়েও আবার পূর্বের রূপে ফিরিয়ে আনা হয় বলেই সঙ্গীতের প্রত্যক্ষরূপ সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মনে হয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যেও একটি অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভূমিকা যেন প্রচার কেন্দ্রের[১] ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়, আর জ্ঞাতারূপী মন যেন গ্রহণ যন্ত্রের[২] সহিত তুলনীয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বহির্জগতের সহিত সংযোগ আছে, মনের তা নেই, তা দেহের আভ্যন্তরে অবস্থিত। এই ভাবে দূরে অবস্থিত থাকলেও সংগৃহীত তথ্য যাতে তার নাগালে পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে সংগৃহীত তথ্যকে স্নায়বিক তরঙ্গরূপে মনের কাছে পাঠিয়ে দেবার। অপর পক্ষে মনের ক্ষমতা আছে সেই তরঙ্গকে জ্ঞানেন্দ্রিয় যেভাবে তথ্যকে পেয়েছিল সেইরূপে তথ্যকে রূপান্তরিত

১ Broadcusting set ২ Receiving set

করবার। এই ব্যবস্থার ফলে জ্ঞানেন্দ্রিয় যা পায় মনও তাই পায়। এইভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞেয় বস্তুর সহিত যে নিবিড় সংযোগ তাও মনের সহিত সোজাসুজি প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় যে সুবিধা পায় জ্ঞাতারূপী মনও সেই সুবিধা পায়। সেই কারণে প্রত্যক্ষভাবে আমরা জ্ঞেয় বস্তুকে সোজাসুজি দেখি বলে অনুভব করি। শিল্পীর সোজাসুজি গান শোনার সঙ্গে রেডিওর মাধ্যমে গান শোনার যে পার্থক্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মনের পুনর্গঠিত তথ্যের সেইটুকু মাত্র পার্থক্য বর্তমান।

(৩)

পরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি

আমরা ইতিপূর্বে পরোক্ষজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে তার মূল কথাগুলি এখানে আর একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রত্যক্ষজ্ঞান ও একটি বাক্য। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হল বিশেষ জ্ঞেয় বস্তু। সেখানেও সাধারণত একটি সার্বিক সংজ্ঞার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। পরোক্ষজ্ঞানে যে জ্ঞানবাক্য পাই তাতে উভয় পদই সার্বিক হয়। অর্থাৎ এখানে সামান্যের বা একটি সমগ্র জাতি সম্বন্ধে বা তার অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জিত হয় আর একটি জাতির সহিত তার সম্বন্ধ নির্ণয় করে। তাও দুই শ্রেণীর হতে পারে প্রয়োগের ক্ষেত্রের অনুপাতে। যেখানে একটি জাতির অংশ সম্বন্ধে বিধেয় পদের সম্বন্ধ সূচিত হয়, সেখানে তার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়। যেমন 'কোন কোন মানুষ শ্বেতকায়'। বিধেয় পদ যখন উদ্দেশ্য পদ যে জাতি বা সামান্যকে সূচিত করে তার অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষকে সূচিত করে তখন তার প্রয়োগক্ষেত্র যতখানি সম্ভব ব্যাপক হয়। তাই তাকে পাশ্চাত্য দর্শনে সামগ্রিক জ্ঞানবাক্য[১] বলা হয়।

এই সার্বিক জ্ঞানের মধ্যেই পরোক্ষজ্ঞানের পরিণত রূপটি আমরা পাই। তাকে অবলম্বন করেই অনুমান গড়ে ওঠে। দু একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। সার্বিক জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রের ব্যাপকতার কমবেশী আছে। সেটা নির্ভর করে উদ্দেশ্যপদের ব্যাপকতার ওপর। সামান্য বা জাতির অন্তর্ভুক্ত

১ Universal judgment

প্রজাতি থাকে, তার অন্তর্ভুক্ত অন্য প্রজাতি থাকে। এই ভাবে সব থেকে ব্যাপক সামান্য সম্পর্কিত জ্ঞানকে তার অন্তর্ভুক্ত প্রজাতির ওপর প্রয়োগ করে নূতন জ্ঞান অর্জন করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই সার্বিক জ্ঞানবাক্য পাব, কিন্তু তাদের প্রয়োগক্ষেত্রের ব্যাপকতা ভিন্ন হবে। আমরা বলতে পারি 'পাখীর ডানা আছে'। তা হতে এই অনুমান করতে পারি 'কাকের ডানা আছে', কারণ কাকও এক শ্রেণীর পাখী। আবার অনুরূপরীতিতে সার্বিক জ্ঞানের আশ্রয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক সার্বিক আরোপ করে বিশেষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। যেমন 'রাম বাংলাভাষী' কারণ সে জাতিতে বাঙালী এবং 'সকল বাঙালী বাংলা ভাষায় কথা বলে'। এই ধরণের অনুমানে ব্যাপকতর সম্বন্ধ হতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সম্বন্ধের জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। এখানে এইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে বলে এই ধরণের অনুমানকে অবরোহমূলক অনুমান[১] বলা হয়। সুতরাং দেখা যাবে যে এই ধরণের ব্যাপক সমগ্র জাতি সম্পর্কিত জ্ঞানবাক্যই সকল আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি।

সুতরাং সার্মগ্রিক জ্ঞানের উৎপাদন কি করে ঘটে সেই প্রশ্নটি আনুমানিক বা পরোক্ষ জ্ঞানের মূল প্রশ্নের স্থান অধিকার করে বসে। এখানে যে প্রক্রিয়াটি সুরু হয় তা উপরের প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। যাকে আমরা অবরোহ মূলক জ্ঞান বলেছি তাতে দেখেছি সব থেকে ব্যাপক সার্মগ্রিক জ্ঞানকে অবলম্বন করে আমরা কম ব্যাপক সার্মগ্রিক জ্ঞান যেমন লাভ করতে পারি, তেমন কোন সামান্য বা জাতির অন্তর্ভুক্ত বিশেষ সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করতে পারি। অর্থাৎ যা বড ছিল তাকে ভেঙে ভেঙে ছোট করে নিয়ে আসি, ব্যাপকতর জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে করে তার অংশ সম্বন্ধে জ্ঞানে উপনীত হই। এই কারণে এই রীতিতে অর্জিত জ্ঞানকে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান[২] বলা হয়ে থাকে। অপর পক্ষে যে ব্যাপক সামগ্রিক জ্ঞানকে অবলম্বন করে তার বিশ্লেষণের ফলে এই আংশিক জ্ঞান লাভ করি, তা গড়ে ওঠে ঠিক এর বিপরীত রীতিতে। একটি বিশেষের জ্ঞানকে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানকে অবলম্বন করে এই ধরণের সামগ্রিক জ্ঞান ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে ব্যবহৃত একটি প্রচলিত উদাহরণ এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে। আমরা বহু ক্ষেত্রে নজর করি যে ইন্ধনে অগ্নিসংযোগ করলে ধূম নির্গত হয়। নিজেদের

১ Deductive inference

২ Analytic judgment

অভিজ্ঞতায় জানি এই ঘটনার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তা হতে এই সামগ্রিক জ্ঞানে উপনীত হই 'ইন্ধনে আগুন ধূম উৎপাদন করে'। এখানে এইভাবে বিশেষের সম্বন্ধে জ্ঞান থেকে এমন একটি সামগ্রিক জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সুতরাং সামগ্রিক জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে যেভাবে জ্ঞান উৎপাদিত হয় তার বিপরীত ভাবে। সেখানে জ্ঞান অর্জন হয় ব্যাপক হতে বা সমগ্র হতে নিম্নস্তরের সার্বিক বা বিশেষ সম্বন্ধে। এখানে জ্ঞান অর্জিত হয় বিশেষ হতে সমগ্র সম্বন্ধে। এই জন্য এই জ্ঞানকে আরোহমূলক রীতিতে অর্জিত জ্ঞান[১] বলা হয়। আর এক ভাবে দেখতে গেলে তাকে সংশ্লেষণাত্মক রীতিতে গড়ে-ওঠা জ্ঞান বলা যায়। কারণ, তা বহু বিশেষ সম্বন্ধে জ্ঞানকে একত্রিত করে গড়ে ওঠে। এই কারণে তাকে সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানবাক্যও[২] বলা হয়ে থাকে।

এখন এই সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান দুই শ্রেণীর হতে পারে। একশ্রেণীর জ্ঞান অর্জিত হতে পারে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষের লক্ষণ লক্ষ্য করে তার ভিত্তিতে। যেমন একটি পরিবারের সকল মানুষেরই রঙ কালো দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই পরিবারের সকল মানুষ কৃষ্ণকায়। ঠিক বলতে কি এই ধরণের সার্বিক জ্ঞানে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় হয় না। প্রতি বিশেষের জ্ঞানের যোগফলে তা পাওয়া যায়। তাই তাতে নূতন অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ হয় না। অপর পক্ষে সকল সম্ভাব্য বিশেষকে লক্ষ্য করে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলে তাকে গণনা ভিত্তিক আরোহমূলক জ্ঞান[৩] বলা হয়। এই জ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যায় না। এমনও হতে পারে যে সেই পরিবারে একটি গৌরবর্ণ শিশু জন্ম গ্রহণ করল। তখন সঙ্গে সঙ্গেই এই সামগ্রিক জ্ঞান মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। সুতরাং এই শ্রেণীর সামগ্রিক জ্ঞানকে প্রকৃত সংশ্লেষণাত্মক সার্বিক জ্ঞান বলা যায় না।

যে সামগ্রিক জ্ঞান প্রকৃত সংশ্লেষণাত্মক তার প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। তা যে জ্ঞানবাক্য স্থাপন করে তার প্রয়োগের সীমা থাকে না; তা অতীতে যেমন সত্য, বর্তমানে তেমন সত্য, ভবিষ্যতেও তেমন সত্য। আমি যখন বলি 'মানুষ মরণশীল' আমি বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল মানুষ সম্বন্ধেই এই

১ **Inductive knowledge**

২ **Synthetic judgment**

৩ **Induction by Simple Enumeration**

জ্ঞানকে ব্যবহার করি এবং বিশ্বাস করি সকল ক্ষেত্রেই তা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। অপরপক্ষে এই জ্ঞান একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষকে লক্ষ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জ্ঞান সঞ্চয় করা সম্ভব নয়, এমন কি বর্তমানেও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষকে জানা জ্ঞাতার সাধ্যাতীত। সুতরাং এখানে বাধ্য হয়েই কয়েকটি বিশেষকে পর্যবেক্ষণ করে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তার ওপর নির্ভর করেই একটি সমগ্র জাতি সম্বন্ধে সার্বিক জ্ঞান অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হয়। অর্থাৎ এখানে এরিসটটল যেমন বলেছেন কয়েকটি বিশেষকে অবলম্বন করে একটি সমগ্র জাতি সম্বন্ধে ঝুঁকি নিয়ে অনুমান করতে হয়[১]। ফলে যে জ্ঞানলাভ হয় তা প্রত্যক্ষকে ডিঙিয়ে অতিমাত্রায় ব্যাপকতা পায়। এইখানেই তার উৎকর্ষ। কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল নয় বলে তা সেখানে প্রত্যক্ষপূর্ব জ্ঞান[২] বলেও পরিগণিত হয়। অপরপক্ষে তা বিশেষের জ্ঞানকে সংযোজিত করে ব্যাপক জ্ঞান গড়ে তোলে বলে তাকে সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানও[৩] বলা হয়। এই ধরণের যে জ্ঞান প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল নয় তাকে প্রত্যক্ষ-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান বলা হয়[৪]। এর সব থেকে সুন্দর উদাহরণ মেলে গাণিতিক জ্ঞানে। গণিতের সংখ্যা, বিশেষের সম্পর্ক বর্জিত। যখন বলি 'দুয়ে দুয়ে চার হয়' তা বিশুদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক আনুমাণিক জ্ঞান। জ্যামিতিক জ্ঞানও অনুরূপ প্রকৃতির।

এই পরিস্থিতিতে অনুমানভিত্তিক জ্ঞান সম্বন্ধে মূল প্রশ্নটির একটু রূপান্তর ঘটে। প্রথম অবস্থায় তার রূপটি হল আনুমানিক জ্ঞান কিভাবে উৎপাদিত হয়। নূতন পরিস্থিতিতে তার পরিবর্তিত রূপটি হল: সংশ্লেষণাত্মক প্রত্যক্ষপূর্ব জ্ঞান কি করে গড়ে ওঠে বা কিভাবে সম্ভব হয়?[৫] তার কারণ আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি হল সংশ্লেষণাত্মক প্রত্যক্ষপূর্ব জ্ঞান; তাকে অবলম্বন করেই প্রত্যক্ষপর সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানসহ অন্য আনুমানিক জ্ঞান গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য দর্শনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই প্রশ্নটির একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে উদ্ভব হয়। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব শেষে কাণ্ট-এর উপর এসে পড়ে। তিনি যা

১ Dictum de omni et nello
২ A-priori knowledge
৩ Synthetic judgment
৪ Synthetic judgment a-priori
৫ How are Synthetic judgments a-priori possible

উত্তর দিয়েছিলেন তা জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছিল তা বিজ্ঞানের জগতে আইনস্টাইন-এর কীর্তির সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের দেশেও যে এই প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি, তা নয়; তবে তা এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। প্রসঙ্গত এ বিষয় কিছু আলোচনা হয়েছে। তবে তার ফলে যে চিন্তা গড়ে উঠেছিল তা ভিন্ন রূপ নিয়েছিল এবং বর্তমান সমস্যাটির সমাধানে তার ভূমিকার মূল্য বোধ হয় তুলনায় কম।

আমরা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রথমে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার আলোচনা করব। ভারতীয় দর্শনে প্রশ্নটি মূলত এক হলেও একটু ভিন্নরূপে স্থাপিত হয়েছে। আমরা এখনি যে ভাবে প্রশ্নটি স্থাপন করলাম তা কাণ্ট-এর অনুসরণে। ভারতীয় দর্শনে এই প্রশ্ন অন্যরূপে স্থাপিত হয়েছিল। কাণ্ট-এর প্রশ্ন ছিল সংশ্লেষণাত্মক প্রত্যক্ষপূর্ব জ্ঞান কি ভাবে সম্ভব হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা কিসের ওপর নির্ভর করে। ভারতীয় দর্শনে একই প্রশ্ন একটু ভিন্নভাবে স্থাপিত হয়েছিল। সেখানেও লক্ষ্য করা হয়েছিল যে সামগ্রিক জ্ঞানবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে যে সম্বন্ধ সূচিত হয় তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সামগ্রিক সম্বন্ধটিকে ভারতীয় পরিভাষায় বলা হয় ব্যাপ্তি, কারণ একটি পদার্থ অন্য পদার্থকে একটি বিষয় সম্পর্কে ব্যাপ্ত করে থাকে। যা ব্যাপ্ত করে তা ব্যাপক আর যা ব্যাপ্ত হয় তা ব্যাপ্য। একটি নিত্য ব্যবহৃত উদাহরণ দেওয়া যাক, 'মানুষ মরণশীল'। এখানে মরণশীলতা ব্যাপক এবং তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল ব্যাপ্তি। সুতরাং প্রাচ্য পরিভাষায় ব্যাপ্তি বলতে বুঝি উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতা, এক কথায় সার্বিকতা[১]। বিধেয় পদ ব্যাপক এবং উদ্দেশ্য ব্যাপ্য। এখন ভারতীয় দর্শনে প্রশ্নটি এইভাবে স্থাপিত হয়েছে: সামগ্রিক জ্ঞানবাক্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান গড়ে ওঠে কি করে? প্রসঙ্গত তার নিশ্চয়তা নির্ভর করে কি ভাবে তাও পরোক্ষভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে তা যেমন সোজাসুজি আলোচিত হয়েছে ভারতীয় দর্শনে সেভাবে আলোচিত হয় নি।

সুতরাং ভারতীয় দর্শনে বর্তমান প্রসঙ্গে মূল সমস্যা হল ব্যাপ্তিজ্ঞানের উদ্ভব হয় কি করে? আমরা কেমন করে জানি যে মানুষ মরণশীল হয় বা যেখানে ধূম আছে সেখানেই অগ্নির অস্তিত্ব আছে? এর উত্তর নানাভাবে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। মোটামুটি এর উত্তর তিন ধরণের পাই। এক ধরণের উত্তর বলে এই

১ Universality

সামগ্রিক জ্ঞানের ভিত্তি হল ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধের অভিজ্ঞতা। বেদান্ত দর্শন এই মত পোষণ করে। দ্বিতীয় ধরণের মত বলে যে এই সম্বন্ধের ভিত্তি হল তাদের স্বাভাবিক বাস্তব সম্বন্ধ। বৌদ্ধ দর্শনের মত এর পরিপোষক। তৃতীয় মতটি এদের মধ্যবর্তী। তা বলে ব্যাপ্তিজ্ঞান উদ্ভূত হয় উভয় ভাবেই। একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা তার ভিত্তিতে হতে পারে তেমন অপর দিকে এই সম্বন্ধের একটি বাস্তব ভিত্তিও আছে। এই উভয়ের মিলনের ফলেই ব্যাপ্তির সম্বন্ধের নিশ্চয়তা গড়ে ওঠে। এই মতটি গড়ে উঠেছে ন্যায় দর্শনের আলোচনায়। ন্যায় দর্শনে শুধু ব্যাপ্তিজ্ঞানের উদ্ভব হয় কি করে তার মীমাংসা করা হয় নি, তার নিশ্চয়তা কিসের ওপর নির্ভর করে পরোক্ষভাবে সে বিষয়েও কিছু ইঙ্গিত করা হয়েছে। এইবার আমরা এই দর্শনগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

বেদান্তের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উৎপত্তি অবাধিত সহকার দর্শনেব ভিত্তিতে। আমাদের অভিজ্ঞতাই তার ভিত্তি। ব্যাপ্য এবং ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সর্বক্ষেত্রেই তার সমর্থন হয় দেখে এই সার্বিক সম্বন্ধের বিষয় আমরা ধারণা করি। তাদের সহকারিতায় কোথাও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। প্রতিপাদ্যটি অনেকটা হিউম-এর এই প্রশ্ন সম্বন্ধে উত্তরের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি অবশ্য স্পষ্ট করে বলেছিলেন অবাধিত অভিজ্ঞতাই এই সামগ্রিক জ্ঞানের ভিত্তি। তার অতিরিক্ত ভাবে তার নিশ্চয়তার কোন কারণ তিনি খুঁজে পান নি। বেদান্তও এই অতিরিক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু বলে নি।

বৌদ্ধ দর্শন সামগ্রিক জ্ঞানের, অর্থাৎ ব্যাপ্তি জ্ঞানের কারণ সন্ধান করেছে অন্য পথে। অবাধিত অভিজ্ঞতার কথা তা উত্থাপিত করে নি। তা এই ব্যাপ্তির একটি বাস্তব ভিত্তি খুঁজতে চেষ্টা করেছে। এই অনুসন্ধানের ফলে তা দুটি ভিত্তির সন্ধান পেয়েছে। একটি হল তাদাত্ম্য এবং অপরটি তদুৎপত্তি। যখন একটির সহিত অপরটির স্বাভাবিক সম্বন্ধ এমন নিগূঢ় হয় যে তাদের একাত্মতা গড়ে ওঠে, তখন আমরা তাদাত্ম্য পাই। যেমন একটি জাতির সহিত তার অন্তর্ভুক্ত প্রজাতির সম্বন্ধ। আমরা যখন বলি 'অশ্বত্থ একটি বৃক্ষ' তখন এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধ পাই। এখানে ব্যাপ্য ব্যাপকের মধ্যে বিধৃত হয়েছে, কারণ তাদের স্বাভাবিক নৈকট্য অত্যন্ত বেশী। আর আমরা তদুৎপত্তির সম্বন্ধ পাই কার্য কারণের সম্বন্ধের মধ্যে। কার্য কারণেরই রূপান্তর। তাই তাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেইজন্য কার্য থাকলে কারণ থাকতে বাধ্য। তাদের এই নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান বলেই তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।

ন্যায় দর্শনে সামগ্রিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে তুলনায় বিস্তারিত এবং তাৎপর্য-পূর্ণ আলোচনা হয়েছে। তার সিদ্ধান্তে উপরের দুটি তত্ত্বের যেন সমন্বয় ঘটেছে। সামগ্রিক জ্ঞানের উৎপত্তি ও নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তা অভিজ্ঞতার ওপর যেমন নির্ভর করেছে, তেমন নিশ্চয়তার ভিত্তি খুঁজতে বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধের বাস্তব প্রকৃতির ওপরও নির্ভর করেছে। তা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের পক্ষ হতেই বিষয়টি আলোচনা করেছে। অর্থাৎ তার ইঙ্গিত হল এই যে সার্বিকজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা শুধু জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতির উপরও প্রতিষ্ঠিত। তার তাৎপর্য খুব গভীর এবং সম্ভবত আমাদের বর্তমান প্রশ্নের সমাধানে তা আলোকপাত করতে পারবে। সে কথা পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে ন্যায় দর্শনের সামগ্রিক জ্ঞানের উৎপত্তি ও নিশ্চয়তা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থাপন করা যেতে পারে।

আনুমানিক জ্ঞানের গঙ্গেশ এই সংজ্ঞা দিয়েছেন যে তা হল সেই জ্ঞান যা অন্য জ্ঞান হতে উৎপাদিত হয়[১]। অর্থাৎ তার প্রকৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপরীত, কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর। অন্য ভারতীয় দর্শনের মত ন্যায় দর্শন ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে সামগ্রিক জ্ঞানকে বুঝতে চেষ্টা করেছে। তাই তা বলে যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধকে ভিত্তি করেই[২] সামগ্রিক জ্ঞান গড়ে ওঠে। সামগ্রিক জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে একটি জ্ঞান বাক্য। তা দুটি সার্বিক সংজ্ঞার মধ্যে একটি গুণের অস্তিত্ব সূচিত করে, এমন একটি সম্বন্ধ আরোপিত করে। যে গুণ আরোপিত হয় তা হল ব্যাপক, যার ওপর আরোপিত হয় তা ব্যাপ্য, তার যে সম্বন্ধটি উভয়কে ব্যাপ্ত করে আছে তাই হল ব্যাপ্তি। সুতরাং ব্যাপ্তির সম্বন্ধে যে সার্বিকের ভূমিকা প্রধান তা সর্বথা স্বীকার্য।

গৌতম তিন শ্রেণীর অনুমানের কথা বলেছেন: পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্য-তোদৃষ্ট। পূর্ববৎ অনুমানে অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। যেমন মেঘ দেখলে বলা যায় বৃষ্টি হবে। শেষবৎ হল একটি বর্তমান অবস্থাকে অবলম্বন করে অতীতের ঘটনাকে অনুমান করা। এখানে সাধারণত কার্য হতে কারণ অনুমান করা হয়। যেমন বন্যা হতে অনুমান করা যায় বৃষ্টি হয়েছিল। সামান্যতোদৃষ্ট হল সেই অনুমান যা অনবচ্ছিন্ন একই প্রকারের অভিজ্ঞতা হতে গড়ে ওঠে। যেমন যেখানে অগ্নি আছে সেখানেই

১ তত্ত্ব চিন্তামণি ॥ ২

২ ন্যায়বার্তিক ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩১

উত্তাপ আছে সর্বক্ষেত্রে দেখে অনুমান করা যায় অগ্নি হতে উত্তাপ আসে। তা যে সর্বক্ষেত্রে কার্য কারণের সম্বন্ধকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে তাও নয়। সহাবস্থিতির ভিত্তিতেও গড়ে উঠতে পারে। যেমন যেখানে জল আছে সেখানে সারস দেখা যায়। প্রথম দুটি শ্রেণী সার্থক অনুমানের দৃষ্টান্ত নয়। তৃতীয়টিই সার্থক অনুমানের দৃষ্টান্ত। সুতরাং সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান যেভাবে গড়ে ওঠে তার আলোচনা আমরা এখন করব।

এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান গড়ে ওঠে দুইভাবে। প্রথমে দুটি পদার্থের অনবচ্ছিন্ন উপস্থিতি লক্ষিত হয়। তাকে বলা হয় নিয়ত সাহচর্য। সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধিও ঘটে যে কোন ক্ষেত্রেই একটি বা অপরটির অভাব ঘটে না। তাকে বলে অভিন্নতারূপ সম্বন্ধ। সুতরাং সব ক্ষেত্রে উভয়ের উপস্থিতি একদিকে এবং অনুপস্থিতি অন্যদিকে এই দুটি উপলব্ধির ভিত্তিতে তা গড়ে ওঠে। তা পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের যুগ্মরীতির[১] সহিত তুলনীয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে এই শ্রেণীর অনুমানের ভিত্তি হল 'সাহচর্য জ্ঞান ও ব্যাভিচার জ্ঞান বিরহ'।[২]

ন্যায় দর্শন এই বলেই ক্ষান্ত হয় নি। এই শ্রেণীর জ্ঞানের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য অতিরিক্তভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে সার্বিক দুটির নিত্য সম্বন্ধের প্রমাণের জন্য তর্কেরও আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। সেই তর্কের রীতিটি হল যা প্রতিপাদ্য তার বিপরীতকে সত্য ধরে নিয়ে তার ফল যে অত্যন্ত অসন্তোষজনক হয় তাই দেখানো। তর্কশাস্ত্রে সাধারণত ব্যবহৃত একটি উদাহরণ দিয়ে তা দেখানো যেতে পারে। ধরা যাক আমাদের প্রতিপাদ্য হল আগুন উত্তাপ দেয়। এখন যদি বলি আগুন উত্তাপ দেয় না এমনও হয়, তা হলে আমাদের দেখাতে হবে যে আগুন জ্বেলে আর রান্না করা যাবে না, শীত নিবারণ করা যাবে না ইত্যাদি। তা হলে জীবন রীতিমত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের অসম্ভাব্যত্ব প্রমাণের রীতির[৩] তা অনুরূপ। এই রীতিটিই ন্যায়সূত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে[৪]।

তারপর ন্যায় দর্শন আরও গভীরে প্রবেশ করেছে। তা বলে সামগ্রিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা শুধু অনবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, তার

১ Joint Method of Experiment in Presence and in Absence

২ তর্কসংগ্রহ দীপিকা

৩ Reductio ad absurdum

৪ ন্যায়সূত্র ৷১৷১৷৩১

একটি বাস্তব ভিত্তিও আছে। তার ধারণায় সার্বিকগুলির অবস্থিতি শুধু মনে নয়, তারা শুধু মানসিক পদার্থ নয়, তাদের বাস্তব অবস্থিতি আছে। বস্তুর গুণাবলীর মধ্যে তা অনুস্যূত। মনে হয় প্লেটো যে অর্থে সার্বিকগুলিকে বাস্তব বলেছেন, সে অর্থে ন্যায়শাস্ত্রে তাকে বাস্তব বলা হয় নি। সম্ভবত তা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে বিভিন্ন সার্বিক যে অবস্থা সূচিত করে তার একটি বাস্তব ভিত্তি আছে, তা শুধু মনের ধারণা নয়। তাই বলা হয় সার্বিক জ্ঞানের নিশ্চয়তার ভিত্তি হল সামান্যের বস্তুরূপপ্রকৃতি[১]। শুধু তাই নয়, ন্যায়দর্শন আরও বলে যে সামগ্রিক জ্ঞানবাক্যে দুই সার্বিককে অবলম্বন করে যে সম্বন্ধটি সূচিত হয় সেই সম্বন্ধেরও একটি স্বাভাবিক বা বাস্তব ভিত্তি আছে[২]। সেই সম্বন্ধ মন নিজ হতে গড়ে তোলে না, তার একটা স্বাভাবিক ভিত্তি আছে বলেই মনে তা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই মন্তব্যের তাৎপর্য খুবই সুদূরপ্রসারী। সে বিষয় পরে আলোচনা করা হবে।

পাশ্চাত্য দর্শনে সামগ্রিক জ্ঞানের উৎপত্তি ও নিশ্চয়তা সম্বন্ধে প্রশ্নটি অনেক পরে এসেছিল, কারণ জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় দর্শনের দৃষ্টি ভালভাবে আকৃষ্ট হয় বর্তমান যুগের প্রথমে। কিন্তু একটি নাটকীয় পরিবেশের মধ্য দিয়ে তা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয় যে ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে তা শুধু একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে নয়, দার্শনিক জ্ঞানে মানবজাতির একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হয়েছিল। সুতরাং ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি নানাভাবে চিত্তাকর্ষক। এই আলোচনায় যে তিন মনীষী প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন লক, হিউম ও কান্ট। আমাদের বর্তমান আলোচনা তাঁদের চিন্তাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে।

ইংরেজ দার্শনিক লক অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের বোধশক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভে[৩] জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কে কিছু সারগর্ভ তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় ছিল জ্ঞানের উৎস কি, তা কি জ্ঞেয় বস্তু হতেই সম্পূর্ণ আসে, না জ্ঞাতৃরূপী মনেরও কিছু দেয় থাকে? আলোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে এখানে মনের কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই, জ্ঞানের এক মাত্র উৎস হল জ্ঞেয় বস্তু। মানুষ যখন

১ সামান্যস্য বস্তুভূতত্বাৎ (তর্কভাষা)

২ স্বাভাবিকস্তু সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ (তর্কভাষা)

৩ Essay on Human Understanding

জন্মায় তখন তার মন যেন একটি অলিখিত শ্লেটের মত।[১] জ্ঞেয়বস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাতে যা লিখে দেয়, তাই হল আমাদের জ্ঞান। মনের এখানে কোন ভূমিকা নেই, মন খালি গ্রহণ করে মাত্র। কাজেই তিনি বললেন, মনে এমন কিছু পাওয়া যায় না যা প্রথমে অনুভূতির মধ্যে ছিল না[২]।

এর পর এলেন স্কচ দার্শনিক হিউম। তিনিও একই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে একখানি গ্রন্থ লিখলেন। তা দর্শনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। মৌচাকে ঢিল ছুঁড়লে যেমন মধু ঝরে তেমনি তাঁর এই গ্রন্থে তিনি যে মতটি স্থাপন করলেন তারই আঘাতে কাণ্ট প্রবর্তিত বিখ্যাত জ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্বটি আত্মপ্রকাশ করল। তা কাণ্ট-এর স্বীকৃতি মতেই তাঁর অন্ধ বিশ্বাস রূপ ঘুম হতে তাঁকে জাগিয়ে তুলল।[৩] হিউম স্বীকার করলেন যে জ্ঞান-ক্রিয়াতে মনের ভূমিকা একটি আছে, তবে তাঁর মতে সে ভূমিকা গৌণ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহির্জগত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। মনের কাজ হল এই ইন্দ্রিয়দত্ত অভিজ্ঞতা ও তথ্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে স্থাপন করা। জ্ঞানের উৎস হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, মন তাতে কিছু যোগ করে না।

এই প্রসঙ্গেই তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সেটি হল এই সামগ্রিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি সাবিক সংজ্ঞার মধ্যে একটি নিত্যবর্তমান সম্বন্ধের অস্তিত্ব সূচিত হয়। সে সম্বন্ধ যেমন অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত তেমন ভবিষ্যতেও নিশ্চিত ঘটবে, এরূপ একটি ধারণা আমাদের থাকে। অর্থাৎ সে সম্বন্ধ আবশ্যিক। কিন্তু কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাত এমন আবশ্যিক জ্ঞান দিতে পারে না। সুতরাং এমন ধারণা হতে পারে যে সামগ্রিক জ্ঞান উৎপাদনে মনেরও একটি ভূমিকা আছে। তার প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এই ধারণা সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। সুতরাং তিনি বিশেষভাবে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত করলেন যে সামাগ্রিক জ্ঞানে, বিশেষভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধ মূলক জ্ঞানে, যে একটি নিত্য সম্বন্ধের ধারণা বর্তমান আছে, অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন সূত্র হতে তার সমর্থন পাওয়া যায় কি?

১ Tabla rasa

২ "There is nothing in the mind except what was first in the senses."
Essay on Human Understanding

৩ Roused me from my dogmatic slumber

এর উত্তরে তিনি বললেন এরকম কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। কার্য কারণ সম্বন্ধসূচক জ্ঞানবাক্যে যে সম্বন্ধ সূচিত হয়, তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অর্থাৎ তার মধ্যে আবশ্যিকতা[১] খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তিনি এই যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ধারণায় কার্য-কারণ সম্বন্ধের মূল কথা হল একই ধরণের কারণ হতে একই ধরণের কার্য সংঘটিত হবে, এইটি আমরা ধরে নিয়ে থাকি। তিনি বলেন, এখানে নিশ্চিত একটা রীতির দ্বারা আমরা পরিচালিত হই, কিন্তু সে নীতি সামগ্রিক জ্ঞানের আভ্যন্তরীণ আবশ্যিকতাবোধ নয়, তার ভিত্তি আমাদের এই ধরণের চিন্তা করার অভ্যাস[২]। তার ভিত্তি হল আমাদের অভিজ্ঞতা। আমরা অভিজ্ঞতা হতে দেখেছি যে দুটি পদার্থের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আরোপ করলে তার ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অভিজ্ঞতার অনবচ্ছিন্নতা এবং ব্যতিক্রমের অভাবকে ভিত্তি করেই আমাদের অভ্যাস গড়ে ওঠে, অনুরূপ ফল আশা করবার। এই অভ্যাসই আবশ্যিকতা সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলে, প্রকৃতপক্ষে আবশ্যিকতার কোন যুক্তি-সঙ্গত ভিত্তি নেই[৩]।

এখন এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য খুব সুদূরপ্রসারী। সামগ্রিক জ্ঞান যে শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, অথচ তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, এই ধারণাকে ভিত্তি করেই দর্শন ও বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ভিত্তি হল কার্য-কারণ সম্বন্ধসূচক জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা। তার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে যদি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া না যায়, তা হলে বিজ্ঞান ভেঙে পড়ে। হিউম বললেন, কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবশ্যিকতা বর্তমান নেই, তা আমরা অভ্যাসবশে অনুমান করে নিই মাত্র। সুতরাং তাঁর এই প্রতিপাদ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মনের একটি বদ্ধমূল ধারণাকে প্রচণ্ড আঘাত হানল। কাণ্ট-এর মনের ওপর এই আঘাত হানা হয়েছিল বলেই তিনি হিউম কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নকে নূতন করে আলোচনা করলেন। দীর্ঘকাল ধরে ভাবনা ও চিন্তার ফলে তিনি তার প্রত্যুত্তর পেলেন। সেই প্রত্যুত্তর লিখিত হল

১ Necessity

২ "This principle is custom or habit." An Enquiry Concerning Human Understanding

৩ Beyond the constant conjunction of similar objects and the consequent inference from one to the other, we have no notion of any necessity or connection." Ibid

তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আটশত পৃষ্ঠাব্যাপী সেই গ্রন্থে যার নাম তিনি দিলেন "বিশুদ্ধ চিন্তা সম্পর্কিত নিরীক্ষা।"[১] গ্রন্থখানি দর্শনের জগতে নিশ্চিত অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ। তা যে শুধু জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করল, তাই নয়, পাশ্চাত্য দর্শনে একটি যুগান্তর সংঘটিত করল। শোপেনাহাওয়ের-এর মতে এটি জার্মান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ[২]। এই গ্রন্থের আমাদের বর্তমান আলোচনা সম্পর্কে যা প্রাসঙ্গিক তা সংক্ষেপে স্থাপন করা হবে। তার আগে কাণ্ট কি ভাবে এই প্রশ্নটিকে স্থাপন করেছিলেন সে বিষয় কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন হবে। কাণ্ট-এর দর্শনকে বুঝতে তাঁর প্রবর্তিত কতকগুলি পরিভাষার সঙ্গেও আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেই এই প্রাথমিক কথার অবতারণা।

কাণ্ট প্রথমেই আনুমানিক জ্ঞানকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: প্রথম, অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞান[৩] এবং দ্বিতীয়, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞান[৪]। অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞান বলতে তিনি বোঝেন সেই জ্ঞান যা অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যা অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কিছু দিতে পারে না। অপরপক্ষে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল তা নিশ্চয়তার জন্য অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না, তার নিজস্ব প্রকৃতি হতেই তা আবশ্যিক জ্ঞানে পরিণত হয়[৫]। একেই তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান বলেছেন, কারণ তা ইন্দ্রিয়বাহিত অভিজ্ঞতার সহিত মিশ্রিত নয়।

বিশুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে আবার তিনি দুটি ভাগ টেনেছেন: প্রথম, বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান[৬] এবং দ্বিতীয় সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান[৭]। তিনি এই প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন:

(১) বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান—সকল বস্তুর অবস্থিতি আছে।

(২) সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান—সকল বস্তুর ওজন আছে।

১ Critique of Pure Reason

২ "The critique is the most important work in German Literature" World as Will and Idea, Vol. II

৩ A-posteriori   ৪ A-priori

৫ "Neccessity and strict universality, therefore, are infallible tests for distinguishing pure from empirical knowledge." Critique of Pure Reason, Chap. II

৬ Analytic judgment   ৭ Synthetic judgment

প্রথমটি যা বলে তা বস্তুর প্রকৃতিদ্বারাই সূচিত হয়, কারণ বস্তু হলে তার স্থানে অবস্থিতি থাকা প্রয়োজন। তাই তা বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান। দ্বিতীয়টি সংশ্লেষণাত্মক, কারণ যে গুণটি আরোপিত হয়েছে তা স্বাভাবিক গুণ নয়, তা নূতন সংযোজন। প্রথম ক্ষেত্রে জ্ঞান গড়ে উঠেছে ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিরপেক্ষ ভাবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেই এই জ্ঞান আহৃত, কিন্তু বহু অভিজ্ঞতাকে জড়িয়ে নিয়ে গড়ে ওঠে বলে তা সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান[১]। কিন্তু এই শ্রেণীর জ্ঞানকে তিনি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞান বলতে প্রস্তুত নন।

তাঁর মতে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান হল তাই যা অভিজ্ঞতার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে না, তাকে বর্জন করে গড়ে ওঠে[২]। এখানে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই, মানুষের মন নিজ শক্তিবলে তাদের গড়ে তোলে। এই ধরণের জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর মতে গাণিতিক জ্ঞান। কারণ, এই জ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র যেমন সামগ্রিক, তেমন তার আবশ্যিকতাও স্বতঃ-প্রমাণিত। আমি যখন বলি, 'পাঁচ আর সাতে বারো হয়' তখন পাঁচটি বস্তুর সঙ্গে সাতটি বস্তু এক সাথে গুণে বলি না। বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে সংখ্যা এখানে আমাদের জ্ঞানবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ। তার যোগফলও অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবস্থাটি একটু ভিন্ন। আমরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান গড়ে তুলি যেমন 'লোহা ভারি পদার্থ', তা নিশ্চিত সংশ্লেষণাত্মক, কিন্তু অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞান নয়, কারণ তার প্রয়োগের সার্মগ্রিকতা গড়ে উঠেছে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে যে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতির নীতি গ্রহণ করা হয়, সেগুলি নিশ্চিত অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। তিনি এই প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন :

১) জড় জগতে সকল পরিবর্তনে জড়বস্তুর সামগ্রিক পরিমাণ অপরিবর্তিত থেকে যায় ;

২) গতির সংক্রমণে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়।

এখানে দেখা যাবে এই নীতিগুলি বৈজ্ঞানিক সংশ্লেষাত্মক যে সমস্ত জ্ঞানবাক্য

১ **"Judgments of experience as such are always synthetical."**

Op. Cit. IV

২ **"But to synthetic judgments a-priori such aid is entirely wanting."**

Ibid

গড়ে তুলি, তাদের ভিত্তির ভূমিকা গ্রহণ করে। অথচ তারা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি। এই তালিকার সঙ্গে আরও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নীতি সংযুক্ত হতে পারে। তারা বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিক জ্ঞানের অবলম্বন। তারা হল[১] :

১) একত্বের নীতি : যা আছে তা আছে ;

২) বিরোধের নীতি : কোন বস্তু একই সময় আছে এবং নেই হতে পারে না ;

৩) তৃতীয়কে পরিহারের নীতি : একটি বস্তু হয় আছে না হয় নেই।

এগুলি অভিজ্ঞতা-নির্ভর নীতি নয়। মনের মধ্যেই স্বতঃসিদ্ধ নীতি হিসাবে তাদের উদ্ভব। তারা সকল চিন্তা বা আনুমানিক জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে তাদের 'চিন্তার নীতি' বলা হয়[২]।

দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে কাণ্ট-এর ধারণাও একটু স্বতন্ত্র ছিল। তাঁর ধারণায় বিশ্বের মৌলিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে মানুষের জানবার একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে। সুতরাং দর্শনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে ভাবে দর্শনের আলোচনা হয় তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তা অন্তহীন বিতর্কের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তাই তাঁর ধারণা হয়েছিল দর্শনকে এমন একটি আলোচনার ক্ষেত্র দিতে হবে যেখানে তা স্পষ্ট নির্ভরযোগ্য জ্ঞান দিতে সক্ষম। অর্থাৎ দর্শনকে বিজ্ঞানের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। তাই তাঁর ধারণায় দর্শনের বিবেচনার যোগ্য সমস্যা হওয়া উচিত বিজ্ঞান রূপে দর্শন কিভাবে গড়ে উঠতে পারে[৩]। এই পথেই চিন্তা করে তিনি দর্শনের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে কেবল জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে সীমিত রাখবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে কথা বর্তমান আলোচনায় ঠিক প্রাসঙ্গিক নয় বলে তার আলোচনার প্রয়োজন হবে না। তাঁর ধারণায় আদর্শ বিজ্ঞান রূপে দর্শনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান হওয়া উচিত[৪]।

১ (১) The Law of Identity ; (২) The Law of Contradiction ;
(৩) The Law of Excluded Middle.

২ Laws of Thought

৩ "How is metaphysics possible as a Science."
Op. Cit. VI

৪ "Thus metaphysics according to the proper aim of the Science consists merely of synthetical propositions a-priori." Op. Cit. V

এইবার আমরা কাণ্ট-এর জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক মূল আলোচনায় চলে আসতে পারি। হিউম সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তারা যে অভিজ্ঞতা হতে পৃথক ভাবে উৎপাদিত হতে পারে তা স্বীকার করেন নি। তিনি আরও বলেছিলেন যে এই জ্ঞানের আবশ্যিকতা গুণ নেই; আবশ্যিকতা আমরা অভ্যাসবশে ধরে নিয়ে থাকি। কাণ্ট হিউম-এর এই প্রতিপাদ্যকে খণ্ডন করাই কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে দেখালেন যে সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞান আছে। তাদের প্রকার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখনই দেওয়া হল। তারপর তিনি যে প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার নিয়েছেন তা হল: কি ভাবে সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞান সম্ভব হয়?[১] এই প্রসঙ্গে তিনি যে আলোচনারীতি প্রয়োগ করেছিলেন তারও কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবার জন্য তিনি তার নাম দিয়েছিলেন অতিক্রমীরীতি[২]। তার কারণ তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও আনুমানিক জ্ঞানকে অতিক্রম করে, তাদের যে তর্কশাস্ত্র সম্মত নীতি সম্ভব করে তার আবিষ্কার করে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ আনুভূতিক জ্ঞান বা সামগ্রিক জ্ঞানকে অতিক্রম করে তাদের অন্তর্নিহিত যে ধারণাগুলি আছে, তাদের তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন[৩]। এইবার তাঁর ধারণায় এই প্রকৃতির জ্ঞান কি ভাবে সম্ভব হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করব।

জ্ঞান কর্মের একদিকে জ্ঞাতা অপরদিকে জ্ঞেয়। উভয়ের প্রকৃতি কি সে প্রশ্ন বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে তাঁর এ বিষয় মত বলে রাখা ভাল। তাঁর মতে তাদের প্রকৃতি জানা যায় না। তারা নিজের মধ্যে অবস্থিত সত্তা[৪]। তারা জ্ঞানের নাগালের বাহিরে থেকে যায়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংস্পর্শে প্রথমে সঞ্জাত হয় ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। তারপর তাদের ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সার্বিকের সম্বন্ধ-নির্ভর আনুমানিক জ্ঞান। এই দুই প্রকারের জ্ঞান কিভাবে সম্ভব হয় তার তিনি পৃথক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রথমে আমরা পাই ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞান। তার বিষয় তাঁর গ্রন্থের যে অংশে

১ How are synthitic judgments a-priori possible ?

২ Transcendental Method.

৩ A-priori concepts of objects

৪ Thing-in-itself

-আলোচনা হয়েছে তার তিনি নাম দিয়েছেন ইন্দ্রিয়ানুভূতি-অতিক্রমী তত্ত্ব।[১] তার কারণ এখানে আলোচনার বিষয় হল ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত, তা কিভাবে উৎপাদিত হয় তা জানতে তিনি তাকে অতিক্রম করে যে রীতি ক্রিয়া করে তার সাহায্যে তাকে ব্যাখ্যা করেছেন। বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য আনে তা এমন জট-পাকানো যে তাদের অর্থগ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বা বিন্যাস স্থাপিত না হলে তাদের গ্রহণ করা যায় না। কান্ট বলেন সেই শৃঙ্খলা ও বিন্যাস মন কর্তৃক আরোপিত না হলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। একজন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তির কাছে ধরা যাক অনেক মানুষ এক সঙ্গে মৌখিক আবেদন জানাচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি কারও বক্তব্যই বুঝতে পারবেন না। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা আগে পরে দাঁড়িয়ে যাও এবং এক এক করে তোমাদের আবেদন জানাও। সেই রীতি প্রয়োগ করলে প্রত্যেকের আবেদন গ্রহণ করা সহজ হয়ে পড়ে।

কান্ট বলেন প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাহিরের বস্তুর পরিচয় গ্রহণকে সহজ করবার জন্য মন ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির ওপর শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে। তবেই তাদের পরিচয় গ্রহণ করা সহজ হয়। যে বিন্যাস প্রয়োগ হয় তাকে তাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের কাঠামো[২] বলা হয়েছে। এইভাবে স্থান ও কালের বিন্যাস তাদের ওপর আরোপিত হয়। তার ফলে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কাছে যারা স্থাপিত হয় তারা সুবিন্যস্ত আকারে সজ্জিত হয়ে যায়। যে বস্তুগুলি সম্বন্ধে তথ্য বাহিত হয় তারা একই স্থানে অবস্থিত হলে তাদের একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে ঘটনার মধ্যে কোনটি আগে কোনটি পরে সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা হয়।

তাই কান্ট বলেন স্থান ও কাল বাস্তব পদার্থ নয়, তারা মনের সৃষ্ট একটি ছাঁচ যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির ওপর আমাদের মন আরোপ করে। সাধারণ মানুষ এমন কি দর্শন ও বিজ্ঞান স্থান ও কালকে একটি বাস্তব পদার্থ বলে ধরে নিয়ে এসেছে। তাদের যথাক্রমে সকল বস্তুর ও সকল ঘটনার আধার

১ **Transcendental Aesthetic**

এখানে কান্ট Aesthetic শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে। অর্থাৎ তা অনুভূতিকে সূচিত করে। সুতরাং তা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সমার্থবোধক।

২ **Forms of perception**

বলে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর এই প্রতিপাদ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে বলে রাখা যেতে পারে কেন তাদের তিনি মানসিক ধারণা বলে গ্রহণ করেছেন। কাণ্ট তাঁর এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে দুধরনের প্রমাণ ব্যবহার করেছেন: তাত্ত্বিক[১] এবং অতিক্রমী[২]। দেশ ও কাল হতে সমস্ত বস্তু এবং ঘটনা সরিয়ে দিলেও আমাদের মনের মধ্যে তাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা বর্তমান থাকে। অথচ তাদের ধরে না নিলে প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, দেশ ও কালকে প্রত্যক্ষ-পূর্ব বলে ধরে না নিলে শুদ্ধ গণিতের পরিকল্পনা সম্ভব নয়। গণিতের জ্ঞানের সামগ্রিকতা গুণ এবং অবশ্যিকতা গুণ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি। তার বিষয় হল স্থান ও কাল। সুতরাং স্থান ও কালকে মানসিক সৃষ্টি না ধরে দিলে গণিতের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না।

দ্বিতীয় স্তরে আমরা পাই আনুমানিক জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ভিত্তি করেই আমরা আনুমানিক জ্ঞান বা সার্বিকের জ্ঞান গড়ে তুলি। এটা কি করে সম্ভব হয় তা আলোচনা করতেও তিনি তাঁর নিজস্ব অতিক্রমী রীতি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের যে অংশে তা আলোচিত হয়েছে তাই তার নাম দেওয়া হয়েছে অতিক্রমী তর্কশাস্ত্র[৩]। আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে তা গড়ে উঠেছে বলে তাকে জ্ঞান-অতিক্রমী[৪] বিশ্লেষণ বলা হয়েছে। এখন প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে যে সব বস্তু বা পদার্থের পরিচয় পাই, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করে তাদের ঐক্যমণ্ডিত করে তবেই সুসংবদ্ধ আনুমানিক জ্ঞান গড়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানের তখনই তাৎপর্য খুঁজে পাই যখন তাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে আমরা সার্বিক সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলি। সার্বিকের সহিত সংযুক্ত না হলে বিশেষের প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্থহীন হয়ে পড়ে[৫]।

এখন এবিষয় অনুসন্ধান করে কাণ্ট দেখেছেন যে সামগ্রিক জ্ঞানে দুটি পদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আরোপ করা হয় তাদের কতকগুলি প্রকার আছে। তারা অভিজ্ঞতা হতে সঞ্জাত নয়, অভিজ্ঞতা হতে সঞ্জাত বহু জ্ঞানকে একত্রিত করে

১ Metaphysical ২ Transcendental

৩ Transcendental Logic

৪ Transcendental Analytic

৫ Perceptions without conceptions are blind

একটি সামগ্রিক জ্ঞান রচনায় তা সাহায্য করে। তারা মন থেকেই গড়ে ওঠে। তাই তারা অভিজ্ঞতা-পূর্ব। এদের তাই কাণ্ট বিশুদ্ধ ধারণা[১] বলে অভিহিত করেছেন। সার্বিক জ্ঞানবাক্য যে যে শ্রেণীর সম্বন্ধ সূচিত করে তারাই হল এই বিশুদ্ধ ধারণা। অর্থাৎ একটি জ্ঞানবাক্যে উদ্দেশ্য পদের ওপর বিধেয় পদ যে সম্বন্ধটি আরোপ করে তার তা রূপ বা ছক। কাণ্ট এদের প্রকার[২] নাম দিয়েছেন; কারণ জ্ঞানবাক্যে কত প্রকার সম্বন্ধ সূচিত করে তারা তার পরিচয় দিতে পারে। তিনি এইভাবে বারোটি প্রকারের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদের চারটি মূলপ্রকারের অন্তর্ভুক্ত করে তিনটি তিনটি করে সাজিয়েছেন। এ বিষয় পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। সুতরাং এইটুকু বললেই এখানে চলবে।

সুতরাং কাণ্ট প্রদত্ত বিশ্লেষণ অনুসারে আমরা পাই যে জ্ঞান দুই পর্যায়ে গড়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞান পাই। সেখানে জ্ঞেয় যা দেয় তাকে সোজাসুজি মন গ্রহণ করতে পারে না। তার ওপর স্থান ও কালের ধারণা আরোপ করে তাকে সুবিন্যস্ত আকারে সাজিয়ে তারপর বিশেষ বিশেষ জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞান সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষ সম্বন্ধে জ্ঞানকে আরও সুবিন্যস্তভাবে সাজাবার জন্য এবং সংশ্লেষণভিত্তিক জ্ঞান গড়ে তোলার জন্য মনের নূতন ভূমিকা এসে পড়ে। প্রথমে সার্বিক সংজ্ঞা গড়ে তুলতে হয়। তারপর তাদের যুক্ত করে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাপকতর সর্বজনীন, সর্বকালীন জ্ঞান গড়ে তুলতে হয়। সেটা সম্ভব হয় জ্ঞানবাক্যগুলির ওপর কতকগুলি বিশেষ প্রকারের সম্বন্ধ আরোপ করে। সুতরাং এখানে প্রশ্ন এসে পড়ে, যা বিশুদ্ধভাবে মনের জিনিস তা কি ভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর প্রযুক্ত হতে পারে। প্রকার[৩] সম্পূর্ণ মানসিক, অপরপক্ষে ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পূর্ণ বহির্বিশ্ব হতে সঞ্জাত। তারা বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সংযোগ কি করে সংঘটিত হয়। কাণ্ট বলেন তা কালের একটি বিশেষ গুণের দ্বারা সাধিত হয়। কাল একাধারে প্রকারের প্রকৃতির অনুরূপ আবার প্রত্যক্ষের প্রকৃতির অনুরূপ। কালের একটি রূপ হল যৌগপদ্য[৪]। এই ধারণা প্রত্যক্ষ-পূর্ব। সুতরাং এই হিসাবে তা প্রকারের সমপ্রকৃতির। অপরপক্ষে সকল ঘটনা বা দ্রব্যই কালে অবস্থিত। সুতরাং কালের সহিত বস্তুর নিবিড় সংযোগ আছে। কালের মধ্যস্থতার সাহায্যেই প্রত্যক্ষজ্ঞান হতে সার্বিকের জ্ঞান গড়ে ওঠে। কালের এই ভূমিকাকে কাণ্ট

১ Pure notions
২ Categories of knowledge
৩ Category
৪ Simultaneity

নাম দিয়েছেন অতিক্রমী রূপ[১]। এই প্রতিপাদ্যটি মনে হয় কষ্টকল্পনা প্রসূত। তবু বর্তমান আলোচনাকে একটি সম্পূর্ণ রূপ দেবার জন্য এখানে তার উল্লেখ করা হল।

উপরে কাণ্ট-এর মতে প্রত্যক্ষজ্ঞান ও আনুমানিক জ্ঞান কি ভাবে উৎপাদিত হয়, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। এখন আমরা দেখতে পারি কাণ্ট যে প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য স্থাপন করেছিলেন তার সম্বন্ধে কি উত্তর পাওয়া যায়। তাঁর পূর্ববর্তী দুজন দার্শনিকের চিন্তাই জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম লক বলেছিলেন যে জ্ঞানের উৎপাদনে জ্ঞেয় বস্তুই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং মন একটি অক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। মন যেন একখানি শ্লেট; জ্ঞেয় তার ওপর নিজেকে লিখে দিয়ে যায়। তার উত্তরে কাণ্ট বলেন জ্ঞানের উৎপাদনে মনের ভূমিকা খুবই সক্রিয়। প্রথমত ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান ধরা যাক। সেখানে একথা স্বীকার্য যে ইন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য পায় তা জ্ঞেয় বস্তুই তাদের নিকট স্থাপন করে। কিন্তু তা হতেই সোজাসুজি জ্ঞান উৎপাদিত হয় না। তার ওপর মন শৃঙ্খলা আরোপ করলে তবে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এই শৃঙ্খলা আরোপিত হয় স্থান ও কালের ধারণার সহিত তাদের সংযুক্ত করে। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকা সমান সক্রিয়।

তারপর আসে হিউম-এর প্রতিপাদ্য। তিনি বলেছিলেন আনুমানিক জ্ঞানে যে নিশ্চয়তাবোধ জাগে, তা অনবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আবশ্যিকতা আরোপের অভ্যাস হেতু। প্রকৃতপক্ষে তার কোন ভিত্তি নেই। তিনি অতিরিক্ত-ভাবে আরও বলেছিলেন যে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান পাওয়া যায় না। তিনি অবশ্য এক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ-পূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গাণিতিক জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে গাণিতিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ-পূর্ব। কিন্তু তিনি বলেন তা প্রকৃত সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান নয়, তা যা আছে তারই পুনরুল্লেখ মাত্র। যখন বলি 'দুই আর দুয়ে চার হয়' তখন তাদের যোগফল হতেই তাকে পাওয়া যায়। তা নূতন জ্ঞান সৃষ্টি করে না, যা জানা আছে তাকেই নূতন রূপে স্থাপন করে। কিন্তু তাঁর এই

১ Transcendental Schema.

Schema-এর ধাতুগত অর্থ হল রূপ। কাল এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞানের বাহিরে থেকে তাদের মধ্যস্থতা করে, এই অর্থই এখানে সূচিত হচ্ছে মনে হয়।

প্রতিপাদ্য-অন্য দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন দুটি গাণিতিক সংখ্যার পৃথক অবস্থিতি হতে যে জ্ঞান তাদের যোগফলের মধ্যে তার অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায়। এই মন্তব্য সত্যই যুক্তিসম্মত। দুটি সংখ্যার যোগফল হতে যা পাই, তা তাদের পৃথক অবস্থিতি হতে স্বতন্ত্র। যোগফলে তাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না তারা একটি ভিন্ন প্রকৃতির গাণিতিক পরিমাণ সূচিত করে। সুতরাং তা নিশ্চিত সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান।

হিউম-এর মন্তব্যের প্রতিবাদ কাণ্ট দুই ভাবে করেছেন। প্রথম তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যক্ষ-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানবাক্য আছে। তার উদাহরণস্বরূপ তিনি প্রথমে গাণিতিক জ্ঞানবাক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর সকল চিন্তা ও যুক্তির নিয়ামক যে স্বতঃসিদ্ধ নীতিগুলি আছে, তাদের উল্লেখ করেছেন। তারাই প্রমাণ করে যে এই প্রকৃতির জ্ঞানবাক্য আছে। তারপর তিনি এই অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে এই শ্রেণীর জ্ঞানবাক্যের পদদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ সূচিত হয়, তার আবশ্যিকতা কি ভাবে সংঘটিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়েই তিনি হিউম-এর দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

উত্তরে তিনি বলেছেন আনুমানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকা শুধু বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় না, এক অবস্থায় সমগ্র অনুমান ক্রিয়াটি মন কর্তৃক সম্পাদিত হয়। অভিজ্ঞতাভিত্তিক সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানে প্রত্যক্ষের কিছু ভূমিকা থাকে, তবে মনই বেশী সক্রিয় শক্তি হিসাবে কাজ করে। আমি যখন বলি 'গরু এক শ্রেণীর চতুষ্পদ জীব' দুটি সার্বিকের মধ্যে সংযোগ সাধনের কাজটি মনই সম্পাদন করে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দরকার তা আসে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হতে। আরও উপরের স্তরের জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যেমন গাণিতিক জ্ঞান বা স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতির তত্ত্বের জ্ঞান আহরণে অভিজ্ঞতার কোন ভূমিকাই থাকে না; সেখানে মনই একমাত্র ক্রিয়াশীল শক্তি। এই জ্ঞানের দুটি দিক আছে। প্রথম হল যে দুটি পদের মধ্যে এই শ্রেণীর জ্ঞানবাক্যে সম্বন্ধ সূচিত হয়, তাদের সম্বন্ধে ধারণা এবং যে সম্বন্ধের ছাঁচে এদের ফেলা হয় তার উৎপাদন। উভয় ক্ষেত্রেই মনই ক্রিয়াশীল থাকে। সার্বিক সংজ্ঞা মন আবিষ্কার করে; যে সম্বন্ধ আরোপিত হয় তাও মনের নিজস্ব সৃষ্টি। যে ভিন্ন প্রকৃতির সম্বন্ধগুলি জ্ঞান-বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়পদের মধ্যে আরোপিত হয় তাদের কাণ্ট প্রকার[১] বলেন। এই প্রকার ও মনের সৃষ্ট ছাঁচ। তিনি বলেন মনের সৃষ্ট ছাঁচ এখানে আরোপিত

১ Categories of knowledge

হয় বলেই এই সম্বন্ধ নির্ভরযোগ্য এবং আবশ্যিক রূপ ধারণ করে। মনের বাহিরের বস্তুদ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে এই সম্বন্ধ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে নিশ্চিত জ্ঞানে পরিণত হয়।

এখন আমরা কাণ্ট-এর প্রতিপাদ্যের সমালোচনা করব। তা দুই ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথমত প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, মনই স্থান-কালের দৃষ্টি-ভঙ্গি ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর আরোপ করে, অর্থাৎ স্থান ও কালের বাস্তব সত্তা নেই, তারা মানসিক সৃষ্টি। এই প্রতিপাদ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য প্রথমে তা দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ সংশ্লেষণাত্মকজ্ঞান সম্বন্ধে যে নিশ্চয়তা বোধ সৃষ্টি হয়, তার তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা কতখানি গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা করে দেখতে হবে। এখানে মনই একমাত্র ক্রিয়াশীল শক্তির ভূমিকা নেয় বলেই কি তাতে আবশ্যিক সম্বন্ধের প্রকৃতি সঞ্চারিত হয়, না তার অতিরিক্ত কিছু কারণ আছে? এই প্রশ্নটির মীমাংসা করবার প্রয়োজন হবে।

আমরা প্রথম আলোচনা করব স্থান ও কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে। তাদের কি বাস্তব অস্তিত্ব আছে, না তারা মনের দ্বারা আরোপিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সাজানোর একটি রীতি? এই হল এখানে প্রশ্ন। আমরা দেখব কি প্রাচ্য দর্শনে, কি পাশ্চাত্য দর্শনে উভয় শ্রেণীর মতই আছে। এক শ্রেণী বলে তাদের বাস্তব সত্তা আছে, তারা মানসিক পদার্থ নয়। অপরদিকে আর এক শ্রেণীর মত আছে যা বলে তাদের বাস্তব সত্তা নেই, তারা মানসিক সৃষ্টি। আমরা প্রথমে দুই শ্রেণীর মত গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তারপর তারা যে আলোকপাত করে তার সাহায্যে প্রশ্নটির মীমাংসা করতে চেষ্টা করব। আমরা প্রথমে ভারতীয় দর্শনের মতগুলি স্থাপন করব।

জৈন দর্শনের মতে স্থান ও কাল, উভয়েরই বাস্তব সত্তা আছে। তাই তাদের তা দ্রব্য বলে। স্থান অস্তিকায় দ্রব্য তবে অজীব, অর্থাৎ তার ব্যাপ্তি আছে তবে সজীব পদার্থের মত প্রাণ নেই; সুতরাং জড় পদার্থের অনুরূপ। স্থান প্রদেশবৎ দ্রব্যের আধার, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের আয়তন আছে তাদের সকলকে তা ধারণ করে। তাকে সোজা অনুভব করা যায় না; তার অস্তিত্ব অনুমান করে নিতে হয়। কালের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ধরণের। প্রথমত তার স্থানে অবস্থিতি নেই; তাই অনস্তিকায় দ্রব্য। দ্বিতীয়ত তার কাজ হল বস্তুসকলের বর্তনা সূচিত করা। বর্তনা একটি পারিভাষিক শব্দ। তা বোঝায় বস্তুর

স্থিতিশীলতা ধর্ম, অর্থাৎ যা ছিল তাই থেকে যাওয়া, পরিণাম, অর্থাৎ রূপের পরিবর্তন, ক্রিয়া, পরত্ব, অর্থাৎ নবত্ব এবং অপরত্ব অর্থাৎ পুরাতনত্ব সূচিত করা। স্থানের মত সময়েরও প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় না, তাও অনুমানগম্য[১]।

ন্যায় দর্শন ও স্থান ও কাল সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। তার মতে তাদের মন-নিরপেক্ষভাবে বাস্তব সত্তা আছে। তাই বিশ্বকে ন্যায়-বৈশেষিক যে নয়টি পদার্থের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে তাদের অন্যতম হিসাবে এরা স্বীকৃতি লাভ করেছে। ন্যায় দর্শনের প্রতিপাদ্য হল তারা সর্বব্যাপী এবং সকল বস্তুর ধারক। সুতরাং স্থান ও কাল তার মতে নিত্য এবং অসীম দ্রব্য, তারা প্রকৃতিতে অভৌতিক, কিন্তু ভৌতিক বস্তুর সহিত তারা সর্বদা জড়িত; কারণ ভৌতিক বস্তুর অবস্থিতি এবং ক্রিয়া তাদের অবলম্বন করেই সম্পাদিত হয়[২]।

সাংখ্য দর্শনের বিখ্যাত ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর কিন্তু ধারণা অন্যরকম। তাঁর ধারণায় তারা মানসিক সৃষ্টি, প্রত্যক্ষবস্তুর অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে বিমূর্ত ধারণা হিসাবে তারা গড়ে উঠেছে। পুরুষ-তত্ত্বের সংস্পর্শে এসে প্রকৃতি-তত্ত্বের যখন ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্পর্কযুক্ত বিশ্বরূপে বিকাশ ঘটে তখন যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয় তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ তারা সূচিত করে। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে সাংখ্য দর্শন বয়সে প্রাচীন হলেও তার চিন্তা অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার সহিত সংগতি রক্ষা করে। আধুনিক বিজ্ঞান ও বস্তুকে স্থান কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘটনা বলে কল্পনা করে[৩]। বিজ্ঞানভিক্ষুও যেন মনে হয় বস্তুর রূপান্তরহীন অবস্থিতি[৪] অপেক্ষা তার বিকাশশীলতার দিকে বেশী নজর দিয়েছেন। সেই কারণে স্থান ও কাল তত্ত্বকে একত্রিত করে বস্তুর গতিশীলতার উপর তাদের সংযুক্তভাবে আরোপ করেছেন। স্থান ও কালের ধারণা যে মানসিক তার সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে বিজ্ঞানভিক্ষু এই যুক্তি প্রয়োগ করেছেন যে অসীম কাল ও অসীম স্থান সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতি নেই, তাদের অস্তিত্ব আমাদের অনুমান করে নিতে হয়[৫]।

পাশ্চাত্য দর্শনে স্থান ও কালকে বাস্তব সত্তা হিসাবে গ্রহণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাই আমরা আলেকজাণ্ডার-এর দর্শনে। তাঁর দর্শনে স্থান ও কালকে যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তা অনন্যসাধারণ। তাঁর ধারণায় স্থান ও কাল শুধু মন-

১ এই প্রসঙ্গে পঞ্চাস্তিকায়-সময়-সার দ্রষ্টব্য

২ প্রশস্তপাদ, পদার্থ সংগ্রহ

৩ Space-time continuum

৪ Static existence

৫ সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য ॥২॥১০ ও ২॥১২

নিরপেক্ষ নিত্য পদার্থ নয়, তাই হল বিশ্বের মৌলিক পদার্থ। তা হতেই বিশ্ব-বিকাশলাভ করেছে। সাধারণত দর্শনে এই মৌলিক ভূমিকা আরোপ করা হয় জড়পদার্থের উপর, না হয় চেতন পদার্থের উপর। আলেকজাণ্ডার তা করেন নি, যদিও মনে হয় তাঁর পক্ষপাত জড়পদার্থের উপর। সে বিষয়ে আলোচনা এসে পড়বে আমাদের সত্যের প্রকৃতি আলোচনার প্রসঙ্গে। এখানে এই বললেই চলবে যে তিনি স্থান ও কালকে এমন মৌলিক পদার্থ বিবেচনা করেছেন যে তাকে বিশ্বের মৌলিক উপাদান বলে গ্রহণ করেছেন।

স্থতরাং তাঁর পরিকল্পনায় স্থান ও কাল হল বিশ্বের মূলীভূত উপাদান[১]। স্থান ও কালকে তিনি দুটি পৃথক সত্তা বলে ধরেন নি, তাদের একটি যুক্তসত্তা বলে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয় আইনস্টাইন-এর ধারণার সঙ্গে তাঁর মতের কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু দুজনের ধারণার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। সেটা বোঝা যাবে যখন আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিক বাদ নিয়ে আলোচনায় আমরা একই প্রসঙ্গে জড়িয়ে পড়ব। এখানে এইটুকু বললে চলবে যে আইনস্টাইন-এর ধারণায় স্থান-কালের বাস্তব সত্তা নেই, তা মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার প্রকৃতির দিক হতে তাদের সাদৃশ্য কাণ্ট-এর ধারণার সঙ্গে। আলেকজাণ্ডার-এর ধারণায় তা দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তা সত্তা, ঠিক বলতে বিশ্বের মৌলিক উপাদান। আইনস্টাইন প্রবর্তিত তত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বসম্পর্কিত[২] আর আলেকজাণ্ডার প্রবর্তিত তত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব[৩] সম্পর্কিত।

এই স্থান-কাল রূপ যুগ্মসত্তাকে আলেকজাণ্ডার কল্পনা করেছেন পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বনকারী দুটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত সত্তার মত। দম্পতীর সম্পর্ক হতেও তা ঘনিষ্ঠ। সম্ভবত একটা স্থূল তুলনা চলে। দুটি দড়ি পরস্পরকে জড়িয়ে যেমন পরস্পরকে বল সঞ্চার করে, এ বোধ হয় তেমনি। কালের ধারাবাহিকতা পরিস্ফুট হয় না আয়তন-বিশিষ্ট পদার্থের ওপর তার প্রভাব না লক্ষ্য করলে, আবার আয়তন-বিশিষ্ট পদার্থের ক্রিয়া বা অবস্থিতি স্থচিত হয় না কালের মধ্যে তা প্রতিফলিত না হলে। তারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আলেকজাণ্ডার বলেন স্থান স্বভাবতই কাল-প্রকৃতি যুক্ত এবং কাল স্বভাবতই স্থান-প্রকৃতি যুক্ত[৪]। স্থান-কালের ক্ষুদ্রতম অংশকে তিনি

১ Matrix ২ Epistemological ৩ Ontological

৪ "Space in its very nature is temporal and time spatial,"

Space, Time and Deity, Vol I, p. 44

বিন্দু ঘটনা বলেছেন[১]। তা একাধারে আয়তিস্থচক এবং বর্তনস্থচক। বাস্তবে তা অবিভাজ্য। তা মানসিক ধারণা নয়। এই স্থান-কাল মৌলিক পদার্থ হতেই সমস্ত বিশ্ব গড়ে উঠেছে। বিশ্বের বিকাশের মধ্যে স্তর আছে। প্রথম স্তরে উৎপাদিত হয়েছে গতি, তারপর ভৌতিক জড়, তারপর গৌণগুণ বিশিষ্ট জড়, তারপর প্রাণ এবং শেষে মন। তাঁর মতে বিকাশ এখনও শেষ হয় নি। পরবর্তী অবস্থায় তা ঈশ্বরত্ব লাভ করবে।

আধুনিক যুগে স্থান ও কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা দর্শনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তার কারণ এই দুটি পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ক্রিয়া-কলাপের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে পদার্থ বিজ্ঞান যত গভীরে প্রবেশ করেছে তত তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছে। এইভাবেই আধুনিক কালে পদার্থ বিজ্ঞান দার্শনিক তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করেছে। এই ভাবেই মহাবিশ্বে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্র-আদির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করতে গিয়ে নিউটন সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থান-কালের প্রকৃতি নির্ণয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। পরবর্তীকালে আরও নূতন বিস্ময়কর তথ্যের আবিষ্কারের ফলে আইনস্টাইন নিউটন কল্পিত ব্যাখ্যার সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এই সম্পর্কেই স্থান ও কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই দুই মনীষীর স্থাপিত তত্ত্ব আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে স্থাপন করার চেষ্টা হবে।

নিউটন মহাবিশ্বের ক্রিয়াবিধি সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে তুলেছিলেন তা এই রকম। মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র আছে। তারা এক মহাশূন্যে বিধৃত। তা সকল আকাশচারী মহাবস্তুর আধার। তার একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তাদের পরস্পরেরের প্রতিক্রিয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়। শক্তি দূর হতে এক মুহূর্তেই ক্রিয়াশীল হয়, তা সময়সাপেক্ষ নয়। যা বর্তমান মুহূর্ত[২] তা সমগ্র মহাবিশ্বেই এক। পৃথিবীতে যা বর্তমান মুহূর্ত তা অনন্ত বিশ্বের প্রান্তে অবস্থিত নক্ষত্রের উপরও প্রযোজ্য। মোটামুটি তাঁর পরিকল্পনায় স্থান ও কাল মন-নিরপেক্ষ পৃথক সত্তা। নিউটন স্থাপিত এই যন্ত্রবৎ ক্রিয়াশীল মহাবিশ্ব সম্বন্ধে ধারণা দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের জগতে অবধারিত সত্য হিসাবে সম্মানিত হয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি

Point event

Now

নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে তার ভিত্তি শিথিল হয়ে গেল। তাই এই নূতন তথ্যের ভিত্তিতে আইনস্টাইন নূতন তত্ত্ব স্থাপন করতে বাধ্য হলেন।

যে নূতন তথ্যগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাদের সংক্ষেপে এখানে স্থাপন করা হবে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আইনস্টাইন যে নূতন তত্ত্বটি স্থাপন করেছেন তার দুটি অংশ আছে। একটিকে বলা হয় বিশেষ আপেক্ষিক বাদ[১] এবং অপরটিকে বলা হয় সাধারণ আপেক্ষিক বাদ[২]। প্রথমটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যতীত অন্য বিশ্বগত ঘটনার রীতি নির্ধারণ করে। দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং তা বিশেষ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রকৃতি নির্ণয় করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। প্রথমটিই আমাদের আলোচনার বিষয়; কারণ সেখানেই স্থান ও কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। তার বিশেষ আপেক্ষিক বাদের অন্তর্ভুক্ত স্থান-কাল সম্পর্কিত তত্ত্বটির এখন একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে।

পদার্থ-বিজ্ঞানে যে বিশেষ স্থানে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সমানভাবে সকল আধেয় বস্তু ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর প্রভাব রক্ষা করে তাকে একটি বিশেষ নাম দ্বারা চিহ্নিত করে বলা হয় দেশ-বিন্যাস[৩]। কারণ সেই দেশের অন্তর্ভুক্ত ঘটনাগুলি প্রকৃতির নিয়মাধীনে একই ভাবে ক্রিয়া করে। সেটা সম্ভব করতে এই দেশ-বিন্যাসের চক্রাকার ঘূর্ণন বা গতিবেগ বৃদ্ধি ঘটলে চলবে না। দেশ-বিন্যাসের এই গুণকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় সমাবস্থায় স্থিতিশীলতা বলা হয়।[৪] দেশ-বিন্যাসের এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে দুটি পরিবেশে। প্রথম, দেশ-বিন্যাস তুলনায় নিশ্চল অবস্থায় থাকলে এই সমাবস্থায় স্থিতিশীলতা পাওয়া যায়। আবার মূল দেশ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অন্য একটি দেশ-বিন্যাস যদি সরল রেখায় একই নির্ধারিত গতিতে চলে তা হলে সমাবস্থায় স্থিতিশীলতা পাওয়া যায়।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের পৃথিবী একটি বিরাট আকারের দেশ-বিন্যাস। তার মধ্যে সমাবস্থায় স্থিতিশীলতাগুণ বর্তমান। তার মধ্যে

১ Special Theory of Relativity

২ General Theory of Relativity   ৩ Co-ordinate system

৪ "A Co-ordinate syetem admitted by mechanics must be free from rotation and acceleration and is called an inertial system."

Einstein, Ideas and Opinions. What is the Theory of Relativity ?

সংঘটিত সকল ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়ম একইভাবে পালন করে। ধরা যাক একটি জাহাজ তার সমুদ্রে ভাসছে। তা যদি অচল অবস্থায় ভাসমান থাকে, তাহলে পার্থিব দেশ বিন্যাসের তা অঙ্গীভূত হয়ে যায়। আবার তা যদি স্থির সমুদ্রে একটি নির্ধারিত গতিতে সরল রেখায় চলে তা হলে তা একটি পৃথক দেশ-বিন্যাসে পরিণত হলেও পৃথিবীর সমাবস্থায় স্থিতিশীলতার যে গুণ তা তখন ও তার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকবে। এমন কি জাহাজের বাহিরে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করি, তা হলে জাহাজ যে চলছে তা বুঝতে পারব না। যদি তা মোড় ঘোরে বা গতির হার পরিবর্তিত করে তবেই তার গতিশীলতা আমরা অনুভব করব।

দেশবিন্যাসের এই সমাবস্থায় স্থিতিশীতার ধর্ম নিউটনও লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার একটি দিক মাত্র নজর করেছিলেন। পৃথিবী ও জাহাজকে পৃথকভাবে লক্ষ্য করলে যে অবস্থাটা দাঁড়ায় তিনি শুধু তার ভিত্তিতেই সমাবস্থায় স্থিতিশীলতার তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। একই নির্দিষ্ট গতিতে জাহাজ সরল রেখায় চললে যে পৃথিবীর সমাবস্থায় স্থিতিশীলতার ধর্ম জাহাজেও সংক্রামিত হতে পারে তিনি তা লক্ষ্য করেন নি। তিনি তাই এই তথ্যটিকে একটু সংকুচিত আকারে স্থাপন করে বলেছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে স্থাপিত বিভিন্ন বস্তুর গতি একই ভাবে ক্রিয়া করবে; সেই দেশ স্থিতিশীল অবস্থায় থাকুক বা সরল রেখায় একই গতিতে চলুক তার ব্যতিক্রম হবে না।[১] আইনস্টাইন এই তত্ত্বটিকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাকে আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যাতে মূল দেশ-বিন্যাসের সহিত সম্পর্কিত একটি পৃথক দেশ-বিন্যাসের ওপর তা প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি তাই বললেন যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি মূল দেশ-বিন্যাসে যে ভাবে কাজ করে তার সম্পর্কিত একটি পৃথক দেশ-বিন্যাস যদি একই গতিতে চলতে থাকে, তার মধ্যে ও অনুরূপ ভাবে কাজ করবে।

আইনস্টাইন-এর বিশেষ আপেক্ষিক বাদের মূল প্রেরণা হল আলোকের গতি সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আলোকের গতি নিশ্চিত ভাবে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬, ২৮৪ মাইল বলে নির্ধারিত হয়। এখন আশ্চর্যের কথা এই যে দেখা গেল, আলোকের গতি অন্য বস্তু বা পদার্থের গতি যে ভাবে কাজ করে সে ভাবে করে না। ধরা যাক আমরা একটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

১ "The motions of bodies included in a given space are the same among themselves, whether the space is at rest or moves uniformly forward in a straight line."

সেখান দিয়ে একটি গাড়ী দ্রুত গতিতে চলে যাবে কিন্তু থামবে না। এখন এই অবস্থায় আমরা দেখব যে গাড়ীর বাঁশীর ধ্বনি যখন গাড়ী স্টেশনের অভিমুখে আসবে তখন তার স্বাভাবিক গতি হতে দ্রুততর হবে। কারণ শব্দের গতির সঙ্গে গাড়ীর গতি এখানে যুক্ত হবে। আবার গাড়ী যখন স্টেশন ছাড়িয়ে দূরে সরে যেতে থাকবে তখন বাঁশীর ধ্বনির গতি হ্রাস পেয়ে যাবে। কারণ তখন শব্দের গতির বিরুদ্ধে গাড়ীর নিজস্ব গতি প্রতিকূলভাবে কাজ করবে। কাজেই ধ্বনি শুনতে দেরী হবে।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে আলোকের গতিও এইভাবে কাজ করে। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেলজোন ও মরলি নামে দুই মার্কিন বৈজ্ঞানিক একটি পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন যে আলোকের গতির ওপর তার উৎসের গতি বা পর্যবেক্ষকের গতি কোন ক্রিয়া করে না। পৃথিবীর দিকে আলো ছুটলে পৃথিবীর গতি তার গতিকে বর্ধিত করে না, আবার পৃথিবীর বিপরীত দিকে আলো ছুটলেও তার গতির বেগের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ আলো এমনভাবে কাজ করে যে তার উৎসের গতি বা পর্যবেক্ষক যেখানে আছে তার গতি আলোর গতির হারের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না ; সব ক্ষেত্রেই তা ১৮৬, ২৮৪ মাইল হয়। এই আবিষ্কার পরবর্তী কালের পর্যবেক্ষণেও সমর্থিত হয়েছে। যেমন যুগ্ম নক্ষত্রের ক্ষেত্রে। যুগ্ম নক্ষত্রের দুটি নক্ষত্র পরস্পরকে কেন্দ্র করে পরস্পরের চারিদিকে বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়। তারা পরস্পর হতে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। লক্ষ্য করা গেছে তাদের উভয়েরই আলো একই সঙ্গে পৃথিবীতে পৌছায়। অর্থাৎ তারা কখনো পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে এবং কখনো দূরে সরে যাচ্ছে ; কিন্তু তার প্রভাব আলোকের গতির ওপর লক্ষিত হয় না।

আইনস্টাইন এই আবিষ্কারের মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য আছে তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বললেন সকল অবস্থাতে আলোর গতির বেগের স্থিরতা দুটি তথ্য প্রতিষ্ঠিত করে। আলোর সম্পর্কে কোন বস্তুর গতি যত বেশী হবে তার সময়ের হারও সেই অনুসারে কমে যাবে এবং গতি মাপবার মাপকাটিও তত ছোট হয়ে যাবে। আমরা সাধারণত ঘড়ি দিয়ে সময় মাপি। আমাদের পৃথিবীর গতি যদি ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মাইল হত তা হলে আমাদের ঘড়ির কাঁটা অনেক আস্তে চলত এবং সেই অনুপাতে ঘড়ির আকারও ক্ষুদ্র হয়ে যেত। এই অবস্থার তাৎপর্য খুব গভীর। তা বলে যে স্থান ও কালের কোন অবস্থা-নিরপেক্ষ

মাপ্‌কাটি নেই। তা নির্ভর করে আলোর সম্পর্কে দেশ-বিন্যাসের গতির ওপর। এই হল সংক্ষেপে আপেক্ষিক তত্ত্ব।[১]

কাল যে ঘটনাকে গ্রহণ করবার একটি বিশেষ মানসিক রীতি, তার মন-নিরপেক্ষ নিজস্ব সত্তা নেই সেটা প্রমাণ করতে তিনি এই ধরণের মন্তব্য করেছেন। ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতায় মানুষ ঘটনা পরম্পরাকে একটির আগে বা পরে বলে স্থাপন করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপ্তি কতখানি সে বিষয় কারও স্পষ্ট ধারণা নেই। সেটা খানিকটা আন্দাজ করা হয় অভিজ্ঞতায় কম বা বেশী ঘটনা উপলব্ধি করার ওপর। তাই তিনি বলেন প্রতি ব্যক্তিবিশেষের সময় বোধের[২] ওপর তা নির্ভর করে। এটা সম্পূর্ণ মানসিক বোধ। তা একটা বাস্তবরূপ পায় ঘড়ি ব্যবহার করবার ফলে। ঘড়ির কাঁটা বাস্তবভাবে নির্দেশ করে দেয় কখন কতটা সময় অতিবাহিত হল। কিন্তু ওপরের আলোচনায় দেখা গেল যে ঘড়ির দেওয়া সময়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। তা যে দেশবিন্যাসে অবস্থিত আলোকের অনুপাতে তার গতির উপর নির্ভর করে। আলোকের আনুপাতিক প্রভাব কি রকম হবে তা লরেঞ্জ অঙ্ক কষে বার করেছেন।[৩]

অন্যদিকে বিশ্বে 'এখন'[৪] বা বর্তমান সময় বিন্দু বলতে যা বুঝি তার কোন সর্ত-নিরপেক্ষ রূপ নেই। অর্থাৎ পৃথিবীর 'এখন' অন্য দেশ-বিন্যাস বা গ্রহ-নক্ষত্রের 'এখন' হতে পৃথক হবে। বর্তমান মুহূর্ত বলতে আমি যা বুঝি সৌরমণ্ডল হতে লক্ষ লক্ষ আলোক বৎসরের ব্যবধানে অবস্থিত যদি কোন প্রাণী থাকে সে তা বুঝবে না। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও তাই দেখি। সূর্যে বর্তমান মুহূর্তে যে বিস্ফোরণ ঘটে তা আমাদের চোখে ধরা পড়ে আট মিনিট পরে। কারণ আলোকবাহিত হয়ে সেই খবর আসতে ওই সময় লাগে।

যুগপত্তা[৫] যে অবস্থার ভিন্নতা হেতু ভিন্ন হয়, তার একটি দৃষ্টান্ত আইনস্টাইন আমাদের উপহার দিয়েছেন। তা বিষয়টি সহজবোধ্য করবার জন্য এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। ধরা যাক একটি রেলগাড়ী চলেছে। তার মধ্যস্থলে ছাদের ওপর একজন পর্যবেক্ষক বসে আছে। আর তার মুখোমুখি লাইনের ধারে মাটিতে আর একজন পর্যবেক্ষক বসে আছে। এমন সময় রেলগাড়ীর দুপাশে একসঙ্গে দুটি বজ্রপাত ঘটল। এখন প্রশ্ন হল, তারা যে যুগপৎ ঘটনা তা

১ Lincoln Barnett এর The Universe and Dr. Einstein এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২ I-time

৩ Lorenz Transformation

৪ Now

৫ Simultaneity

কি দুই পর্যবেক্ষকের কাছেই অনুভূত হবে? আইনস্টাইল বলেন, হবে না। যে পর্যবেক্ষক স্থিতিশীল অবস্থায় মাটিতে বসেছিল তার কাছে মনে হবে তারা যুগপৎ ঘটেছে; কিন্তু যে চলন্ত গাড়ীতে ছিল তার মনে হবে গাড়ীর পেছনে যে বজ্রপাত ঘটেছিল তা পরে ঘটেছিল। এই অনুভূতির পার্থক্য সংঘটিত হয়েছিল রেলের গতির জন্য।

সুতরাং বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ বলে, স্থান ও কালের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাদের সম্পর্কে ধারণা আলোকের গতির স্থিতিশীলতার[১] ওপর নির্ভর করে। দেশ-বিন্যাসের গতির ওপর বস্তুর পরিমাপ এবং কালের পরিমাপও নির্ভর করে। বিশেষ অবস্থায় তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে বলেই তার আপেক্ষিক তত্ত্ব[২] বলে নামকরণ হয়েছে। তার তাৎপর্য হল বস্তু ও ঘটনাকে সাজাবার রীতি হিসাবেই তাদের অস্তিত্ব। সুতরাং তারা মানসিক পদার্থ। বিষয়টির তাৎপর্য আইনস্টাইন-এর নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকার লিংকন বারনেট এইভাবে স্থাপন করেছেন:

যে সমস্ত বস্তুর অবস্থিতি স্থানের মধ্যে আমরা উপলব্ধি করি তাদের বিন্যাস-রীতির অতিরিক্তভাবে স্থানের কোন বাস্তব সত্তা নেই। আর কালের যে সমস্ত ঘটনাকে তার মধ্যে স্থাপন করি তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের রীতির অতিরিক্ত ভাবে পৃথক অস্তিত্ব নেই।[৩]

বিষয়টি দুরূহ হওয়ায় তাকে আরও বোধগম্য করার জন্য আইনস্টাইন বর্ণিত তাঁর তত্ত্বের ব্যাখ্যার একটি অনুবাদ এখানে স্থাপন করলে সুবিধা হবে মনে হয়। তাঁর অনুবাদটি নীচে স্থাপিত হল:

"পদার্থ-বিজ্ঞানে যে জিনিসটি দেশগত সম্পর্কে ঘটনা-পরম্পরার সহিত যুক্ত হয় তাকে বলা হয় দেশ-বিন্যাস[৪]। যন্ত্রবিজ্ঞান বলে দেশ-বিন্যাস যখন চক্রাকারে ঘূর্ণন বা গতির হারের বৃদ্ধি হতে মুক্ত অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলা হয় সমাবস্থায় স্থিতিশীল বিন্যাস[৫]। একটি দেশ বিন্যাস যদি একটি সমাবস্থায় স্থিতি-

১ Constancy of the speed of light

২ Theory of Relativity

৩ "Space has no objective reality except as an order or arrangement of the objects we perceive in it and time has no independent existence apart from the order of events by which we measure it.

The Universe and Einstein, 2

৪ Co-ordinate system ৫ Inertial system

শীল বিন্যাসের সম্পর্কে সমান গতিতে সরল রেখায় চলে তাও একটি সমাবস্থায় স্থিতিশীল বিন্যাসের মত কাজ করে। আপেক্ষিকতার বিশেষ নীতির অর্থ হল এই ব্যাখ্যাকে এমনভাবে ব্যাপক করা যাতে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা তার মধ্যে স্থান পায়। অর্থাৎ 'সি' চিহ্নিত দেশ-বিন্যাসে যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি প্রয়োগ করা যায় সেগুলি 'সি' চিহ্নিত দেশবিন্যাসের ওপরও প্রযোজ্য হবে, যদি তা 'সি' সম্পর্কে সমান গতিতে চলতে থাকে।

এই বিশেষ তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতি হল, মহাশূন্যে আলোকের গতির স্থিতিশীলতা : তা বলে যে শূন্যে বিকির্ণ আলোর, পর্যবেক্ষকের বা আলোর উৎসের গতি-নিরপেক্ষভাবে একটি নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে।

এই দুটি নীতি অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হলেও যুক্তি দিয়ে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করা যায় না। বিশেষ আপেক্ষিক বাদ গতিবাদ[১] অর্থাৎ স্থান ও কালের নিয়ন্ত্রণ রীতির তত্ত্বের পরিবর্তন সাধন করে তাদের যুক্তি সম্মত রূপ দেয়। একটি বিশেষ দেশ-বিন্যাসের সম্পর্কে প্রযুক্ত না হলে দুটি ঘটনার যৌগপত্যের কোন অর্থ হয় না এবং যে গতিতে ঘড়ি চলে তাও নির্ভর করে দেশ-বিন্যাসের সম্পর্কে তাদের গতির ওপর।"[২]

এখন স্থান ও কাল সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনার আলোকে পরিস্থিতি কি রকম দাঁড়ায় তা দেখা যেতে পারে। ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় তিনটি অবস্থা পাই। প্রথম অবস্থা ন্যায় দর্শন সূচিত করে। সেখানে স্থান ও কালকে বিশ্বের মৌলিক দ্রব্যগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। তা বলে তারা সকল কায়বিশিষ্ট পদার্থের আধার। পরের অবস্থা পাই জৈন দর্শনে। সেখানে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি হতে স্থান ও কাল সম্পর্কিত ধারণা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। স্থান ও কালকে এখানেও দ্রব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু বলা হয়েছে তারা প্রত্যক্ষ দ্রব্যের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অনুমানের সাহায্যে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রদেশবৎ দ্রব্যের পরিচয় হতে স্থানের ধারণা আসে আর বস্তুর যে পরিবর্তন ঘটে তা হতে বর্তনের বা কালের ধারণা আসে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মত আরও দূরে সরে এসেছে। তিনি বলেন তারা মানসিক ধারণা ; প্রকৃতির বিকাশে ঘটনা পরম্পরাকে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে। তা কান্ট-এর প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করে বলা

১ Kinematics

২ Ideas and Opinions, What is the Theory of Relativity ?

যায়। আরও লক্ষ্য করবার এই যে স্থান ও কালের যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় না, এই অভিজ্ঞতাকেই তাদের মানসিকতার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কাণ্টও অনুরূপ যুক্তি ব্যবহার করেছেন।

আলেকজাণ্ডার স্থাপিত তত্ত্ব ভিন্ন শ্রেণীতে পড়ে। তিনি স্থান ও কালকে এক করে দেখেছেন। এখানে তিনি আইনস্টাইন-এর অনুসরণ করেছেন; কিন্তু আইনস্টাইন যে অর্থে কালকে স্থানের একটি অতিরিক্ত আয়তি রূপে কল্পনা করেছেন, তিনি তা করেন নি। প্রকৃত পক্ষে তিনি জড়বাদী। স্থান ও কালকে একত্রিত করে তার ওপর জড়ের প্রকৃতি আরোপ করে তাকে তিনি বাস্তব সত্তার রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তা কষ্টকল্পনা-দোষ-দুষ্ট। তাই তাঁর কল্পিত বিশ্বের মৌলিক উপাদান হিসাবে বিন্দু ঘটনার[১] পরিকল্পনায় সংগতির অভাব দেখা যায়। তাতে দেশও আছে আবার কালেরও বিন্দু আছে। কিন্তু বিন্দুর সঙ্গে কালের মৌলিক অংশকে এক করলে তাও যে স্থিতিশীল প্রকৃতি পেয়ে যায়।

মোট কথায় কালকে যে সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় না, তা সত্যই তার বাস্তবতার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাকে সহজে অনুভব করবার জন্যই স্থান ও কালের ধারণা ব্যবহার করা হয়। তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করবার একটি রীতি বিশেষ। কাণ্ট সেই কথাই বলেছেন। আলোকের গতির স্থিতিশীলতাকে ভিত্তি করে আইনস্টাইনও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে স্থান ও কাল সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। একটি বিশেষ দেশ-বিন্যাস সম্পর্কে স্থান ও কালের ধারণা নির্ভর করে আলোকের অনুপাতে তার গতির ওপর। সুতরাং তাদের বাস্তব সত্তা নেই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে তাঁর তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। তাও কাণ্ট-এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

আমাদের বক্তব্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। ধরা যাক একটি দার্শনিক গ্রন্থ লেখা হচ্ছে। গ্রন্থকারের অনেক বক্তব্য আছে, মূল প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করবার জন্য অনেক আনুষঙ্গিক প্রতিপাদ্য এসে পড়ে। তাদের প্রত্যেকটি সমর্থন করবার জন্য অনেক তথ্য স্থাপন করতে হয়। এখন লেখা যদি সুবিন্যস্ত না হয়, তা হলে তা বোধগম্য হয় না। তাই জন্য গ্রন্থকার লেখার বস্তুকে সুসংবদ্ধভাবে স্থাপনের জন্য

১ Point event.

বিভিন্ন অধ্যায়ে এবং অধ্যায়ের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করেন। এই বিন্যাস রীতি লেখকের প্রতিপাদ্যকে পাঠকের পক্ষে বোঝা সহজ করে। এই অবস্থাটির সঙ্গে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের ব্যাপারটির তুলনা চলে। প্রকৃতি যেন একটি বিরাট গ্রন্থ। তা নিজের সম্বন্ধে যা পরিচয় দিতে চায় তা বস্তু ও ঘটনা রূপে প্রকট। তাদের সঙ্গে গ্রন্থের বিভিন্ন বাক্য ও পদের সহিত তুলনা চলে। শৃঙ্খলাবদ্ধ আকারে স্থাপিত না হলে মানুষের মন তাদের অর্থগ্রহণ করতে পারে না। স্থানের ধারণা ও কালের ধারণা হল সেই বিন্যাস যা তাদের ওপর শৃঙ্খলা আরোপ করে। ফলে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি তাদের সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ অবস্থায় কেউ বলবেন না যে গ্রন্থটির বিষয় বস্তুর বিন্যাস ও তার উপাদান। প্রকৃত অবস্থা হল বাক্যগুলিই গ্রন্থের উপাদান, তাদের স্থাপন-রীতি নয়। আলেকজাণ্ডার কিন্তু অনেকটা সেই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন স্থান ও কালই হল বিশ্বের মূল উপাদান। জড়বাদী দর্শন বিশ্বের ব্যাখ্যায় যাকে জড় পদার্থ বলে তিনি স্থান ও কালের ওপর তার প্রকৃতি আরোপ করে তাদের সত্তাবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন।

আমরা এখন কাণ্ট-এর দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যের কথা আলোচনা করব। কাণ্ট বলেছেন যে প্রত্যক্ষ-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান হিউম স্বীকার না করলেও আছে, যেমন গাণিতিক জ্ঞান, যেমন আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে যে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ নীতি গ্রহণ করা হয় সেইগুলি। তারপর প্রশ্ন ওঠে তারা যে আবশ্যিক-ভাবে নিশ্চিত জ্ঞান রূপে প্রমাণিত হয় তার কারণ কি? হিউম আনুমাণিক আরোহমূলক জ্ঞানেই[১] তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কাণ্ট অতিরিক্ত ভাবে দেখিয়েছেন এমন শ্রেণীর জ্ঞান পাওয়া যায় যার আবশ্যিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যেমন গাণিতিক জ্ঞান ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। তিনি এই অবস্থায় প্রশ্ন করেছেন, সেগুলি নিশ্চিত জ্ঞান হয় কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছেন যে তার কারণ হল এখানে জ্ঞানের রূপটি মন ঠিক করে দেয়। অর্থাৎ মন তাদের ওপর আবশ্যিক রূপ আরোপ করে বলেই তা আবশ্যিক হয়। তাঁর এই প্রতিপাদ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন। পাউল সেন ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর প্রাতিপাদ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। উভয়েই বলেন জ্ঞানের আবশ্যিকতা যদি মনের ওপর নির্ভরশীল হয়; মনের

১ Induction

প্রকৃতির পরিবর্তন, ঘটলে জ্ঞানেরও প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে।[১] আমাদের দেখতে হবে কাণ্ট-এর প্রতিপাদ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য।

কাণ্ট যাদের প্রত্যক্ষ-পূর্ব এবং সংশ্লেষাত্মক অথচ নিশ্চিত[২] জ্ঞানরূপে চিহ্নিত করেছেন তারা তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে :

(১) জ্যামিতিক জ্ঞান ;

(২) সংখ্যা সম্পর্কিত গাণিতিক জ্ঞান ;

(৩) আনুমাণিক জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এদের প্রকৃতির মধ্যেও ভিন্নতা আছে। এদের মধ্যে জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রকৃতি অন্য দুই শ্রেণীর জ্ঞান হতে পৃথক। জ্যামিতিক জ্ঞানের বিষয় হল বিন্দু, রেখা, ক্ষেত্র প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান যে স্বতঃসিদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কতকগুলি মনের সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতিকে ভিত্তি করে। এ পদার্থগুলির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাও মনের কল্পিত। যেমন ধরা যাক বিন্দুর সংজ্ঞা বা সরল রেখার সংজ্ঞা। বিন্দু হল এমন বস্তু যার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নেই। বাস্তব জগতে তার অস্তিত্ব নেই। সরল রেখার সংজ্ঞা হল দুটি বিন্দুকে সংযুক্ত করে এমন হ্রস্বতম রেখা। তার ও বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। আমরা জানি জাহাজ যখন সমুদ্রে চলে তখন এই নীতি অনুসরণ করে না। তা অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা দ্বারা নির্ধারিত দুটি বিন্দুতে যেতে একটি গোলাকার বৃত্তের পরিধিকে অবলম্বন করে। সুতরাং জ্যামিতির ক্ষেত্রে দেখি কতকগুলি মনের সৃষ্ট পদার্থের মনের আরোপিত প্রকৃতিকে ভিত্তি করে জ্যামিতিক জ্ঞান লাভ করা যায়। বাস্তবের সহিত তার কোন সংযোগ নেই। উদাহরণ স্বরূপ জ্যামিতিক জ্ঞানের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। জ্যামিতির একটি প্রতিপাদ্য হল একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল হল দুটি সমকোণ। এখন পৃথিবীর বিষুব রেখাকে বাহু করে যদি এমন একটি ত্রিভুজ আঁকা যায় যার মাথার বিন্দু থাকবে উত্তর মেরুতে, তা হলে দেখা যাবে তার কোণ তিনটির যোগফল দুই সমকোণের বেশী হবে। সুতরাং এখানে জ্ঞানের যা বিষয় তাও মানসিক দৃষ্টি ; বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই এবং বলা বাহুল্য জ্ঞানের ওপর যে প্রকার[৩] আরোপিত হয় তাও মনের কল্পিত ছাঁচ।

১ "Our descendants or even I myself might become equipped with different forms of conception." Paulsen, Introduction to Philosophy. Book II, Chap. 2

২ Necessary ৩ Categories

গাণিতিক জ্ঞান বা জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ নীতিগুলির[১] সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা খাটে না। একথা স্বীকার্য যে গাণিতিক সংখ্যাগুলির বিশেষ বস্তুর সহিত সংযোগ নেই, তারা বিমূর্ত সংজ্ঞা। তা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে তাদের বাস্তব ভিত্তি আছে। সেগুলি মন-নিরপেক্ষ বিশেষ বস্তুর ওপর আরোপ করা যায়। দুই, চার প্রভৃতি সংখ্যা-সূচক ধারণাগুলি মন থেকে গড়ে ওঠে নি। তারা বিশেষের সমষ্টির ওপর এবং বিশেষের ওপর প্রযোজ্য। সার্বিক সংজ্ঞার যেভাবে বিশেষের সহিত একটি নিবিড় সম্পর্ক থাকে, তারা বিশেষকে ব্যাপ্ত করে থাকে এবং তাকে সূচিত করবার ক্ষমতা রাখে, গাণিতিক সংখ্যাগুলিও তেমন ক্ষমতা রাখে। সুতরাং জ্যামিতিক সংজ্ঞার সঙ্গে গাণিতিক সংখ্যাগুলির প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। জ্যামিতিক সংজ্ঞাগুলির ব্যাপ্তি মনের সৃষ্ট বিশেষের ওপর, আর গাণিতিক সংজ্ঞাগুলির ব্যাপ্তি বাস্তব জগতে অবস্থিত বিশেষের ওপর। অনুরূপভাবে গাণিতিক জ্ঞান যে সম্বন্ধ সূচিত করে তা বাস্তব জগতে অবস্থিত বস্তুর বা বস্তুসমষ্টির সম্বন্ধগত পরিচয়। অপর পক্ষে জ্যামিতিক জ্ঞানবাক্য যে সম্বন্ধ সূচিত করে তা মানসিক পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধের পরিচয় বহন করে। জ্যামিতিক জ্ঞান বাস্তব জগতের সম্পর্ক বর্জিত। গাণিতিক জ্ঞান বাস্তব জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ নীতিগুলির প্রকৃত গাণিতিক জ্ঞানের অনুরূপ। তারা যে সার্বিকের সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে সে সার্বিকগুলি বাস্তব জগতের সহিত জড়িত। তারা যে সম্বন্ধ সূচিত করে তাও বাস্তব জগতে অবস্থিত বস্তু ও তাদের ক্রিয়ার পরিচয় দেয়। আমাদের বক্তব্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য একটি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সম্পর্কিত নীতি গ্রহণ করা যাক। যেমন একত্বের নীতি। তা বলে 'যা আছে তা আছে'। এই জ্ঞান বাস্তব জগতে অবস্থিত পদার্থের পরিচয়-সূচক, তা মানসিক পদার্থের পরিচয়সূচক নয়। জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রকৃতি তা হতে ভিন্ন।

এখন কাণ্ট-এর প্রতিপাদ্য হল যে এই সব শ্রেণীর প্রত্যক্ষ-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান যে নিশ্চিত প্রকৃতির[২] হয় তার কারণ হল, তাদের ওপর আরোপিত সম্বন্ধের রূপটি মন কর্তৃক আরোপিত হয়। এই শ্রেণীর জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তা হতে দেখা যাবে, তাঁর এই প্রতিপাদ্য ঠিক

১ Self-evident Principles of Knowledge

২ Necessary Knowledge

সমর্থিত হয় না। এই শ্রেণীর জ্ঞানের নিশ্চিত প্রকৃতি ততটা মনের আরোপিত জ্ঞানের রূপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, যতটা যাদের বিষয় জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে তাদের প্রকৃতির দ্বারা হয়। কেবল যেখানে জ্ঞানের বিষয় মনের সৃষ্ট পদার্থ, সেখানে তার নিশ্চয়তা জন্মায় তার প্রকৃতিকে যেভাবে কল্পনা করা হয়েছে তার গুণে। জ্যামিতিক জ্ঞান তার সুন্দর উদাহরণ। আমরা যখন বলি 'দুটি বিন্দুর মধ্যে সব থেকে হ্রস্ব রেখা হল সরল রেখা' তখন সরলরেখার যে সংজ্ঞা মনে কল্পিত হয়েছে তার দ্বারাই তার নিশ্চয়তা নির্ধারিত হয়। অপর পক্ষে গাণিতিকজ্ঞানের নিশ্চয়তা সঞ্জাত হয় বিশেষ-গুলির গোষ্ঠীবদ্ধ হবার প্রকৃতি হতে। দুটি বিশেষ আর দুটি বিশেষ একত্রিত হলে চারটির গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই তাদের প্রকৃতি। গাণিতিকজ্ঞান এই প্রকৃতির পরিচয় দেয় বলেই তা নিশ্চিতজ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সম্পর্কিত নীতি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। একত্বের নীতি যখন বলে 'যা আছে তা আছে', তা সত্তার একটি মৌলিক প্রকৃতি উদ্ঘাটিত করে। তাই এই জ্ঞান নিশ্চিতজ্ঞান। এখানে বস্তু মানসিক সৃষ্টি হক বা সত্তাবান হক উভয়ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। জ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি জ্ঞানের নিশ্চয়তা নির্ধারণ করে, মনের আরোপিত সম্বন্ধের রূপ বা 'ক্যাটিগোরি'[১] নয়।

সুতরাং কাণ্ট-এর প্রতিপাদ্য ঠিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা এক সার্থক এবং তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা। তা জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে যতখানি আলোকপাত করেছে, আর কোন দার্শনিকের চিন্তা তার ধারে কাছেও আসে নি। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মন একটি সক্রিয় দর্শক নয়, তারও একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। তিনি বিভিন্ন আনুমানিক জ্ঞানের প্রকৃতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আনুমানিক জ্ঞান কোথায় সংশ্লেষণাত্মক, কোথায় বিশ্লেষণাত্মক তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান কোথায় প্রত্যক্ষ-পূর্ব, কোথায় নয়, তাও সুস্পষ্টভাবে সূচিত করেছেন। এক শ্রেণীর আনুমানিক জ্ঞান যে প্রত্যক্ষ-পূর্ব এবং সংশ্লেষণাত্মক হয়েও তাদের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রাখে না, তাও তিনি দেখিয়েছেন। কাজেই তিনি যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তা তাঁর মনীষার স্বীকৃতির পরিচয় দেয়। তাঁর তীক্ষ্ণধার

১ Categories of knowledge

বুদ্ধি এবং গভীর মনীষা দর্শনের একটি জটিল বিষয়ে নূতন আলোকপাত করে মানুষের জ্ঞানকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে অভাবনীয়ভাবে প্রসারিত করে দিয়েছে।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হল জ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি জ্ঞানবাক্যের নিশ্চয়তা নির্ধারণ করে, মানুষের মন তার ওপর যে রূপ, বা কাণ্ট-এর পরিভাষায় প্রকার আরোপ করে, তার এখানে কোন ভূমিকা নেই। জ্যামিতির ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয়গুলির প্রকৃতি যেমন জ্যামিতিকজ্ঞানের নিশ্চয়তা নির্ধারণ করে, তেমন গাণিতিকজ্ঞান ও স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলির ক্ষেত্রে তা নির্ধারিত হয় জ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতির দ্বারা। জ্যামিতির ক্ষেত্রে বিষয়ের প্রকৃতি মনের সৃষ্ট, আর অন্য দুই ক্ষেত্রে বিষয়ের প্রকৃতি স্বভাবতঃই গড়ে উঠেছে। মনে হয় ন্যায়দর্শন এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করে। আমরা আর একবার এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে ফিরে যেতে পারি। ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে যে সামগ্রিক জ্ঞানবাক্যে দুই সার্বিকের মধ্যে যে সম্বন্ধ সূচিত হয় তার একটি স্বাভাবিক বা বাস্তব ভিত্তি আছে।[১] এই সম্বন্ধ মন নিজ হতে গড়ে তোলে না, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাকে আবিষ্কার করে এবং জ্ঞানবাক্যে তাকে স্বীকৃতি দেয়। জ্ঞানের যে সম্বন্ধ তা একটি বাস্তব সম্বন্ধকে অবলম্বন করে গড়ে না উঠলে, তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নির্ভর করা যায় না। সুতরাং জ্ঞানের নিশ্চয়তা সঞ্চারিত হয় জ্ঞেয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হতে, মনের দেওয়া রূপ হতে নয়। মন এমন রূপ দেয় যা এই সম্বন্ধকে সূচিত করে? যাকে কাণ্ট প্রত্যক্ষ-পর সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান[২] বলেছেন তার নিশ্চয়তার কারণও মনে হয় একই। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষকে নির্ভর করে অনুমানের ভিত্তিতে যে প্রাকৃতিক সম্বন্ধগুলি আবিষ্কার করে তারা এই শ্রেণীতে পড়ে। হিউম যা বলেছেন তা ঠিক নয়। এই শ্রেণীর জ্ঞান মানসিক অভ্যাস বশে আবশ্যিক জ্ঞান হয় না, সম্বন্ধের বাস্তব ভিত্তি আছে বলেই হয়।

(৪)

সত্যতার প্রকৃতি

আমরা জ্ঞানতত্ত্বের আর একটি জটিল প্রশ্নের আলোচনায় এবার প্রবেশ করব। প্রশ্নটি জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা জানি জ্ঞান একটি জ্ঞানবাক্যের আকারে সূচিত হয়। এমন কি প্রত্যক্ষজ্ঞানেও

১ স্বাভাবিকস্তু সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ। তর্কভাষ্য

২ Synthetic judgment a-posteriori.

তার ব্যতিক্রম নেই। দুটি পদের মধ্যে তা একটি সম্বন্ধ সূচিত করে। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ একটি বিশেষকে সূচিত করে এবং বিধেয় পদ সাধারণত একটি সার্বিককে সূচিত করে। আর আনুমানিকজ্ঞানে উভয় পদই সাধারণত সার্বিক হয়। শুধু সম্বন্ধ সূচিত হলেই জ্ঞানের জ্ঞানত্ব স্থাপিত হয় না। তা প্রকৃত তথ্য বহন করে এই বিশ্বাসও তার সহিত যুক্ত হওয়া চাই। অর্থাৎ তার প্রকৃতি এমন হওয়া চাই যাতে তা জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় দিতে পারে। একেই জ্ঞানের সত্যতা[১] বলা হয়। তা জ্ঞানের অঙ্গীভূত প্রকৃতি।

এখন প্রশ্ন ওঠে এই সত্যতা নির্ভর করে কিসের ওপর। সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে সেইটিই মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এবং এই প্রশ্নটিই আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় হবে। এই প্রসঙ্গে দুই শ্রেণীর মত গড়ে ওঠে। একটিকে বলা হয় সঙ্গতি তত্ত্ব[২]। তা বলে জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানের বাহিত তথ্যের সঙ্গতির ওপর জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করে। অপরটিকে বলা হয় সুমিতি তত্ত্ব[৩]। তা বলে যে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সঙ্গতির প্রশ্ন এখানে ওঠে না। বিভিন্নজ্ঞান যে তথ্যগুলি বহন করে তাদের পারস্পরিক সুমিতির ওপরই জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করে। এই তত্ত্বগুলির প্রয়োগ সাধারণ ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় জ্ঞেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শনের সম্ভাব্যতার দ্বারা। যদি মনে হয় প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় সম্ভব নয়, তা হলে জ্ঞান বাহিত তথ্যের সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গতি আছে কিনা, তা মিলিয়ে দেখাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন খণ্ড-জ্ঞানের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সুমিতি স্থাপন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সত্যতা নির্ধারণ করবার উপায় থাকে না।

আমাদের প্রতিপাদ্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য একটি উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। ধরা যাক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি রচনার জন্য একজন চিত্রশিল্পীকে নিয়োগ করা হল। যাঁর প্রতিকৃতি আঁকা হবে তিনি তাঁকে সামনে বসিয়ে তা আঁকবেন। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে প্রতিকৃতি মূলব্যক্তির পরিচয় দেয় কিনা তার মীমাংসা প্রতিকৃতির সঙ্গে তাঁর চেহারা মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। এখানে প্রতিকৃতির যথার্থতা বা সত্যতা প্রমাণিত হয় পরস্পরের সঙ্গতি লক্ষ্য করে। অপরপক্ষে এমনও হতে পারে, যে ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকবার

১ Truth ২ Correspondence Theory
৩ Coherence Theory

প্রশ্ন উঠেছে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার উৎকর্ষ নির্ধারণ করতে হয়। একটা কল্পিত অবস্থা ধরা যাক। প্রকাশ্য স্থানে দশজন উপস্থিত ব্যক্তির চোখের সামনে গুলি করে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। এখন কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হল হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। তাকে বার করতেও তার চেহারা কেমন জানা দরকার। তখন যারা উপস্থিত ছিল তাদের কাছে আলাদা করে চেহারার পরিচয় নেওয়া হল। তার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তি হতে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তাকে জুড়ে জুড়ে চিত্রশিল্পী মনে হত্যাকারী সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তুলে তার ভিত্তিতেই তার প্রতিকৃতি আঁকলেন। এমনও ঘটে থাকে যে তার সাহায্যে অপরাধী ধরা পড়ে। এটি হল পরোক্ষজ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে জ্ঞান সঞ্চয়ের উদাহরণ। এর সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সুমিতি তত্ত্বের সুন্দর তুলনা চলতে পারে।

আমরা এখনই বলেছি যে যেখানে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্ভব নয় সেখানেই সুমিতি তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়। কথাটিকে আর একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। পাশ্চাত্য দর্শনে এমনও কতকগুলি সত্যতা সম্পর্কিত দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে যারা একটি স্বতন্ত্র অবস্থাতে সুমিতিতত্ত্বকে গ্রহণ করেছে। এখন প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পৃথক অস্তিত্ব সাধারণত স্বীকৃত হয়ে থাকে। সেখানে সঙ্গতি তত্ত্ব প্রয়োগের অবকাশ আছে; কিন্তু এমনও দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে ওঠে যা অন্যভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের সম্পর্ক স্বীকাব করে না। তা বলে জ্ঞেয়ই একমাত্র সত্তা, যাকে জ্ঞাতা বলি তা তার অঙ্গীভূত। অর্থাৎ জ্ঞাতৃরূপী মনের ভূমিকা অস্বীকার করে তা কেবল জ্ঞেয়ের সাহায্যে জ্ঞান-ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে। উদাহরণস্বরূপ নববস্তুবাদ[১] বা আলেকজাণ্ডার-এর প্রাসঙ্গিক মতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয়েই জ্ঞানক্রিয়ার ব্যাখ্যায় জ্ঞাতাকে অস্বীকার করে। ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে সঙ্গতিবাদের প্রয়োগের অবকাশ থাকে না। জ্ঞাতা যদি একরকম জ্ঞেয়ের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তা হলে জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার সঙ্গতি সন্ধান করার প্রশ্ন ওঠে না। তাই এই ধরনের দার্শনিক মত ও আভ্যন্তরীণ সুমিতি নির্দেশক তথ্যের সাহায্যে সত্যতার প্রকৃতি নিরূপণ করতে চেষ্টা করে। এদের বিষয়ও যথাস্থানে বর্তমান অনুচ্ছেদে আলোচনা হবে।

১ New Realism

আমরা এখন সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক মতগুলি স্থাপন করব। প্রথমেই ভারতীয় দর্শন হতে প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব স্থাপিত হবে, কারণ প্রশ্নটি ভারতীয় দর্শনে আলোচিত হয়েছিল প্রাচীনকালে। পাশ্চাত্য দর্শনে প্রশ্নটি দার্শনিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিংশ শতাব্দীতে। জ্ঞানক্রিয়ার ক্ষেত্রেও জটিল পথে একত্ববাদ প্রয়োগের[১] চেষ্টা হতে প্রশ্নটি এখন বিতর্কমূলক এবং জটিল রূপ ধারণ করেছে। এ বিষয় প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে প্রতিপক্ষের মত খণ্ডনের চেষ্টায় যে বিতর্কের ধূমজাল সৃষ্টি করা হত তার সঙ্গে বর্তমান যুগের এই বিতর্কমূলক আলোচনা তুলনীয়। সেইকারণেও তার আলোচনা পরে করা বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান আলোচ্য বিষয়টি নানা বিতর্ক জালে জড়িত হয়ে বেশ জটিল রূপ ধারণ করেছে। তাই তাকে সহজবোধ্য করবার জন্য দুটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন মনে হয়। তাতে আমাদের চিন্তার স্বচ্ছতা গুণ বর্ধিত হবে। প্রথম কথা, আমাদের এখানে মূল আলোচ্য বিষয় হল জ্ঞানের সত্যতার সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ কিরূপ। সুতরাং সোজাসুজি প্রশ্ন ওঠা উচিত সত্যতা কি জ্ঞানের প্রকৃতি সূচিত করে, যেমন বুদ্ধিমত্তা মানুষজাতির প্রকৃতি সূচিত করে? কিন্তু বিষয়টি সূক্ষ্ম হওয়ায় অনেক সময় তার সঙ্গে জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলি জড়িত হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে জ্ঞানের সত্যতা বলতে কি বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ কি—এই প্রশ্নটি জড়িত হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে জ্ঞানের সত্যতা বলতে কি বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হয়েছে যার পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সেই পরিচয়ের সঙ্গতি বা বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সুমিতি। এই রকমভাবে কয়েকটি প্রশ্ন জড়িয়ে পড়বার কারণ হল তাদের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম স্তরের। প্রথমত জ্ঞানের প্রকৃতির সঙ্গে জ্ঞানের সত্যতা বোধ জড়িত। জ্ঞান বলতে বুঝি দুটি পদের মধ্যে সম্বন্ধসূচক একটি উক্তি এবং তার সত্যতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত একটি বিশ্বাস। অর্থাৎ বলতে পারি দুই পদের মধ্যে সত্য সম্বন্ধ সূচক উক্তি হল জ্ঞানবাক্য। প্রসঙ্গত প্রশ্ন ওঠে সত্যতা বলতে কি বুঝি। তখন বলতে হয় জ্ঞান মনের বিশ্বকে জানবার চেষ্টা হতে জন্মায়; তা বিশ্ব নয়, বিশ্বের পরিচয়। সত্যতা বলতে বুঝি সেই পরিচয়ের নির্ভরযোগ্যতা। এই প্রসঙ্গেই অতিরিক্ত প্রশ্ন ওঠে নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয় কিসে। পূর্বেই বলা হয়েছে তার উত্তর দুই রকম হতে পারে। এক, যার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে

১ Epistemological Monism

তার সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গতি দ্বারা তা প্রমাণিত হতে পারে ; সেটা বোঝা সম্ভব না হলে বিভিন্ন খণ্ডজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সুমিতি দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। সুতরাং এখানে দুটি বিভিন্ন প্রশ্ন যে ওঠে সে বিষয় আমাদের অবহিত থাকতে হবে। প্রথম প্রশ্ন হল সত্যতা জ্ঞানের অঙ্গীভূত প্রকৃতি কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ কি। আমরা বর্তমান আলোচনায় দেখব বিভিন্ন দর্শনে এই দুটি আলোচনা জড়িয়ে গিয়ে কোথাও কোথাও এক হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় কথা মনে রাখতে হবে যে জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। মূলত জ্ঞান দুই শ্রেণীর হতে পারে: প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং পরোক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সত্যতা বা ভ্রান্তির প্রমাণ এক ধরণের হতে পারে। আবার পরোক্ষজ্ঞানের সত্যতা বা ভ্রান্তির প্রমাণ অন্য ধরণের হতে পারে। কারণ তাদের প্রকৃতি ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ সালম্বন ভ্রমের[১] কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর ভ্রান্তি কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানেই সম্ভব, পরোক্ষ জ্ঞানে তার প্রয়োগ নেই। তাই আলোচনার স্বচ্ছতার জন্য এই দুই শ্রেণীর জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ কি হবে, তার আলোচনা পৃথকভাবে হওয়া উচিত। আমরা দেখব অনেক স্থলে দার্শনিক আলোচনায় এ বিষয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নি বলে আলোচনা সহজবোধ্য হয় নি।

এখন আমরা ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা করব। আমরা দেখতে পাব যে জ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে সত্যতার প্রমাণের সঙ্গে সত্যতার প্রকৃতি এখানে জড়িয়ে গেছে। ভারতীয় দর্শনে ভ্রমের প্রশ্নটিও বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। তার কারণ একাধিক দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের সত্যতাই অস্বীকার করা হয়েছে, যেমন শংকরাচার্যের মায়াবাদে কিম্বা বৌদ্ধ দর্শনের যোগাচার শাখায়। সুতরাং মনের বাহিরে অবস্থিত বিশ্বের ইন্দ্রিয় জাত জ্ঞান যে ভ্রান্ত, দর্শনের বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত অঙ্গকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাকে প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রতিপাদ্যকে সমর্থনের জন্য জ্ঞানতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য দর্শনেও যে নেই তা নয়। আধুনিক যুগের নব বস্তুবাদ[২] তার সুন্দর দৃষ্টান্ত। তবে ভারতীয় দর্শনে তার প্রয়োগ আরও ব্যাপক। তাই তার আলোচনাও অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং সালম্বন ভ্রমের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনাও এই প্রসঙ্গে এসে পড়বে।

১ Illusion ২ New Realism

জৈন দর্শনে জ্ঞানের সত্যতা প্রসঙ্গে সত্যতার প্রমাণের প্রশ্নটিই বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। জৈন দর্শন পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞানের উল্লেখ করে। তাদের মধ্যে কেবল প্রথমটি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। তা হল মতি এবং যাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলি এবং আনুমানিক জ্ঞান বলি উভয়েই তার অন্তর্ভুক্ত। এই দুই শ্রেণীর জ্ঞানেই ভ্রান্তি ঘটতে পারে। জ্ঞান সত্য হয় তখন যখন তা কোন বস্তুর সঠিক পরিচয় দেয়। আর যখন সঠিক পরিচয় দেয় না তখন তা হয় ভ্রান্ত জ্ঞান। এই কথা উভয় শ্রেণীর জ্ঞান সম্পর্কেই খাটে। জৈন দর্শন বাস্তব জগতের সহিত সঙ্গতি বা বিভিন্ন খণ্ডজ্ঞানের মধ্যে সুমিতি, এদের কোনটিকেই জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে নি। সত্যতা প্রমাণের জন্য তা ব্যবহারিক সুবিধাকেই মানদণ্ড[১] হিসাবে ব্যবহার করেছে। যা ভাল তাকে পেতে যা সাহায্য করে এবং যা অনিষ্টকর তাকে বর্জন করতে সাহায্য করে তাই সত্য। অর্থাৎ সত্যতার মানদণ্ড হল ব্যবহারিক সাফল্য[২]।

ন্যায় দশনের অভিমত জৈন দর্শনের অনুরূপ। তার দৃষ্টিও সত্যতার প্রমাণের ওপর আকৃষ্ট হয়েছে। তাও সত্যতার প্রমাণের মাপকাটি হিসাবে ব্যবহারিক সুবিধাকেই গ্রহণ করেছে। ন্যায় দর্শন বলে জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ হল সঙ্গতির সম্বন্ধ। অর্থাৎ জ্ঞানবাক্যের কাজ হল জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় বহন করা। তার প্রমাণ নির্ভর করে তার ব্যবহারিক সাফল্যের ওপর। যে জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে কাজে সাফল্য লাভ করা যায় তাই হল সত্য জ্ঞান। জল যে তপ্ত হলে বাষ্প আকারে স্ফীতিলাভ করে তা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাদ্বারা নির্ধারিত হবে না, তা প্রমাণিত হবে বাষ্পের ইঞ্জিনকে চালানো সম্ভব হলো[৩]।

মীমাংসা দর্শনে একটি নূতন সুর পাওয়া যায়। তা জ্ঞানের প্রকৃতি নিরূপণ করতে জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ খোঁজবার প্রশ্ন তোলে না। তা বলে জ্ঞানের প্রকৃতিই এমন যে প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তা সত্যরূপে গৃহীত হয়। জ্ঞানের মধ্যেই জ্ঞানের সত্যতা গ্রথিত ; জ্ঞান 'স্বতঃ প্রমাণ'। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতিই হল তার সত্যতা। সত্যতা জ্ঞানের অঙ্গীভূত অংশ। জ্ঞানের স্বপ্রকাশের ক্ষমতা তার মধ্যে নিহিত আছে বলে তার সত্যতার প্রমাণ তার মধ্যেই গ্রথিত[৪]। তা হলে

১ *Test* ২ পঞ্চাস্তিকায়সময়সার

৩ প্রবৃত্তি সামর্থ্যাৎ ॥ ন্যায়সূত্র ॥১॥১॥১৭

৪ তত্র গুরূণাং মতে জ্ঞানস্য স্বপ্রকাশরূপত্বাৎ তদ্‌জ্ঞান প্রামাণ্যং তেনৈব গৃহ্যতে॥ সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী॥ ১৩৫

কি প্রমাণের প্রশ্ন আদৌ ওঠে না? মীমাংসা দর্শন বলে ওঠে, তবে গৌণভাবে। সাধারণ ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রমাণের প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তা স্বতঃপ্রমাণ। তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যদি তার সত্যতা অপ্রমাণ করে বা বিভিন্ন খণ্ডজ্ঞানের মধ্যে যদি অসঙ্গতি এসে পড়ে, তবে জ্ঞানকে প্রয়োজন মত পরিবর্তন করে নিতে হয়। স্বভাবতই জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য, তবে ব্যতিক্রম লক্ষ্যে আসলে তা অপ্রমাণিত হয়ে যেতে পারে। তাই মীমাংসা দর্শন বলে জ্ঞানের প্রমাণযোগ্যতা আপনা হতেই আসে, তবে বাহিরের তথ্য দ্বারা তা অপ্রমাণিত হতে পারে[১]।

প্রত্যক্ষজ্ঞানে সালম্বন ভ্রমের আলোচনা ভারতীয় দর্শনে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এ বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে এই সম্পর্কিত আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আলোচনাটিকে সহজবোধ্য করবার জন্য প্রথমে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। সালম্বন বিপর্যয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানে একটি বিষয়ের সঙ্গে ভুলক্রমে দুটি বিষয় জড়িত হয়ে পড়ে। সম্পর্কিত আলোচনায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত দৃষ্টান্তটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। শুক্তিতে অনেক সময় রজতভ্রম হয়, অথচ তারা পৃথক। এখানে আমাদের চক্ষু যে তথ্য সংগ্রহ করে তার ব্যাখ্যা ঠিক মত না হওয়ার ফলে তার ওপর রজতের ধারণা আরোপিত হয়। একে তাই বলা হয় বিপর্যয়। শংকর তাই বলেন এখানে জ্ঞেয় বস্তুকে যা নয় তাই ভাবা হয়।[২] তাকে খ্যাতিও বলা হয়; কারণ একটি বস্তুর ওপর আর একটি বস্তুর গুণ আরোপ করা হয়। সেই কারণে যে সমস্ত তত্ত্ব সালম্বন ভ্রম কেন হয় তার ব্যাখ্যা করে তারা বিভিন্ন খ্যাতিবাদ বলেও পরিচিত। ভারতীয় দর্শনে অনেকগুলি খ্যাতিবাদ গড়ে উঠেছিল। ডঃ ননীলাল সেন চোদ্দটি খ্যাতিবাদের উল্লেখ করেছেন।[৩] তাদের মধ্যে সাধারণত পাঁচটি খ্যাতিবাদ ভারতীয় দর্শনে বিশেষভাবে সম্মানিত। আমরা তাদের মধ্যেই বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তারা হল: (১) আত্মখ্যাতি (২) অসংখ্যাতি (৩) অখ্যাতি (৪) অন্যথাখ্যাতি ও (৫) অনির্বচনখ্যাতি[৪]। আমরা এখন এদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

১ জ্ঞানস্য প্রামাণ্যং স্বতঃ অপ্রমাণ্যং পরতঃ॥ শ্লোকবার্তিক॥ ২॥ ৮৭

২ অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ॥ ব্রহ্মসূত্রে॥ শারীরক ভাষ্য

৩ Nanilal Sen, A Critique of the Theories of Viparjaya

৪ আত্মখ্যাতিরসংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথানির্বাচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥

বৌদ্ধ দর্শনের যোগাচার শাখায় আত্মখ্যাতিবাদ জন্মগ্রহণ করে। এই দর্শনের বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যোগাকার শাখা বিজ্ঞানবাদী। তার প্রতিপাদ্য হল মনের বাহিরে কোন বস্তু নেই। সুতরাং আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব সূচিত করে তারা সকলেই ভ্রান্ত দর্শন অর্থাৎ সালম্বন ভ্রমের উদাহরণ। জ্ঞাতার বাহিরে যখন কিছু নেই তখন জ্ঞাতাই জ্ঞেয় রূপে প্রকাশ হয়। সুতরাং জ্ঞাতাই জ্ঞেয়ের ওপর নিজেকে আরোপ করে। এই তত্ত্বে যে একটি আভ্যন্তরীণ অনৈক্য আছে, তা সহজেই বোঝা যায়। সালম্বন ভ্রমের একটি ভিত্তি থাকে। সেখানেই নিরালম্বন ভ্রমের সহিত তার পার্থক্য। এখানে একটি বস্তুর ওপর তার নিজস্ব প্রকৃতি হতে একটি ভিন্ন প্রকৃতি আরোপ করা হয়। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য বহন করে তাদের ব্যাখ্যায় যে সার্বিক আরোপ করা হয়, তা সেখানে প্রযোজ্য নয়। একটি দড়ির মত বস্তুর অনুভূতি ইন্দ্রিয় আমাকে এনে দিল। তার ওপর ভুল করে সর্পের ধারণা আরোপ করলাম। এখানে মনে হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতিই যখন অস্বীকার করা হচ্ছে তার ওপর কোন ধারণার বা 'খ্যাতির' আরোপ করার প্রশ্ন ওঠে না।

অসৎখ্যাতিবাদ বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যমিক শাখার সহিত সংযুক্ত তত্ত্ব। তা জোর দেয় যা দেখি তার ওপর নয়, যার ধর্ম আরোপ করা হয় তার অনস্তিত্বের ওপর। আমি যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শুক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি, অথচ তার ওপর রৌপ্যের ধর্ম আরোপ করি, তখন যা নেই তার ধর্ম যা আছে তার ওপর আরোপ করি। এখানে রৌপ্য নেই, অথচ তার ধর্ম শুক্তির ওপর আরোপ করছি। যা নেই তা অসৎ। সুতরাং এখানে যা আছে তার ওপর একটি অসৎ বস্তুর ধর্ম আরোপ করা হচ্ছে। তাই এর নাম অসৎখ্যাতি।

অখ্যাতিতত্ত্ব মীমাংসা দর্শনের প্রভাকর সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত বলে কথিত আছে। চর্বাক দর্শনের একটি সম্প্রদায় ও তার সমর্থন করে বলে কথিত আছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানকে খ্যাতি বলে। কিন্তু খ্যাতিবাদ বলতে বোঝায় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ দর্শনের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব। আসলে যা ঘটে তা বিপর্যয়, অর্থাৎ একটিকে ভুল করে অন্য বলে ভাবি। সুতরাং বিপর্যয়বাদ বললেই চিন্তার সুস্পষ্টতা আসে। বর্তমান ক্ষেত্রে অখ্যাতির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই ধরা হয়েছে। অর্থাৎ খ্যাতি অর্থে প্রত্যক্ষজ্ঞান। অখ্যাতির অর্থ তা হলে দাঁড়ায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাব। তার মানে দাঁড়ায় অখ্যাতিবাদ বলতে চায় যে প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞান

আদৌ সংঘটিত হয় না। তার সপক্ষে যুক্তি হল সংক্ষেপে এই: আমি যখন শুক্তিকে রৌপ্য বলে ভ্রম করি আমি তখন একটি রৌপ্যখণ্ডের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, অথচ বাস্তবে সে রৌপ্যখণ্ড নেই। তা এ ও বোঝায় না যে রৌপ্য উপলব্ধিতে নেই; তা না হলে ভ্রান্ত জ্ঞান হয় না যে। শুক্তির উপস্থিতিও সূচিত হয় না, কারণ তা হলে সঠিক জ্ঞান লাভ হত। এমনও বলা যায় না যে শুক্তিকে রৌপ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ তাদের ধর্ম বিপরীত, কাজেই উপলব্ধি সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে যা উপলব্ধি ঘটে তার মধ্যে কোন গ্রহণযোগ্য বস্তু নেই; কাজেই প্রকৃতপক্ষে কোন উপলব্ধি ঘটেনি বলতে হয়। এখানে এই মন্তব্য করার লোভ সংবরণ করা যাচ্ছে না যে এই তত্ত্বটি বিষয়টির প্রকৃতি ঠিক অনুধাবন করতে পারে নি এবং সেই কারণে অর্থহীন তর্কজালে জড়িয়ে পড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে।

তারপর আসে অন্যথাখ্যাতি। এটি ন্যায় দর্শনের প্রবর্তিত তত্ত্ব। কিন্তু তার প্রতি আনুগত্য অনেক দার্শনিক সম্প্রদায় স্বীকার করেন। বাচস্পতি মিশ্র, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ভট্ট সম্প্রদায়, যোগদর্শনের পাতঞ্জল সম্প্রদায়, মাধব সম্প্রদায়, জৈন সম্প্রদায় এবং রামানুজের অনুবর্তী সম্প্রদায় প্রভৃতি তার আনুগত্য স্বীকার করে। কাজেই তাকে সব থেকে জনপ্রিয় খ্যাতিবাদ বলা যায়। প্রতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সূক্ষ্ম মতগত পার্থক্য আছে। তার এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে তার মৌলিক প্রতিপাদ্যটি এখানে সংক্ষেপে স্থাপন করা যেতে পারে। অন্যথাখ্যাতি বলে ভ্রান্ত দর্শনে একটি প্রকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় ঠিক; তার ওপর যে ভিন্ন বস্তুর ধর্ম আরোপিত হয়, সে বস্তু যে আছে তাও ঠিক। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতির দোষ হেতু অনুভূত বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর একটি অলৌকিক সম্বন্ধ আরোপিত হয়। অর্থাৎ যাকে দেখি তাকে অন্যভাবে দেখি. তাই জন্যই তার নাম অন্যথাখ্যাতি।

অনির্বচনীয় খ্যাতি শংকরের স্থাপিত তত্ত্ব। যোগাচার দর্শনের আত্মখ্যাতির মত তা তাঁর প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত তত্ত্ব। তাঁর দর্শনের প্রতিপাদ্য হল ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা (একমেবাদ্বিতীয়ম্); সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে বহু বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বের পরিচয় এনে দেয় তা ভ্রান্ত পরিচয়। সুতরাং সকল ইন্দ্রিয় জাত জ্ঞানই ভ্রম। যাদের দেখি, তারা যে নেই তা নয়; কারণ মূলত তারা ব্রহ্মই। তাদের একক সত্তারূপে না দেখে বহুরূপে দেখি, সেইটিই ভ্রান্তি। সেইকারণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুদ্বারা বিখণ্ডিত বিশ্বকে অসৎ বা একেবারেই নেই বলে

উড়িয়ে দিতে চান না। কারণ, তা আছে তবে তাকে ভুল করে বহুরূপে দেখি। ব্রহ্ম তার ভিত্তি, তাই মূলত তা সৎ। বহুত্ব তার মিথ্যা, তাই বহুত্ব অসৎ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে তিনি তাই সদসৎ বলেছেন। তার প্রকৃতি হল যা একত্বসূচক তার ওপর বহুত্ব আরোপিত হচ্ছে। তাঁর মতে এই ভ্রান্ত দর্শনের কারণ দুটি। যখন শুক্তিকে দেখি তখন অন্তঃকরণের বৃত্তি তার একটি পরিচয় পায়; কিন্তু অন্তঃকরণের অবিদ্যারূপ আর একটি বৃত্তি তার শুক্তির প্রকৃতিকে আংশিকভাবে আবৃত রেখে তার ওপর রজতের ধর্ম আরোপ করে।

এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে ভ্রান্ত উপলব্ধির ব্যাখ্যায় যে সমস্ত খ্যাতিবাদের বিবরণ দেওয়া হল, তাদের মধ্যে আত্মখ্যাতি ও অনির্বচনীয়খ্যাতি-বাদ, এ দুটি বিশেষ দর্শনের অঙ্গীভূত তত্ত্ব। মূলত এই দুটি দর্শন বিশ্বতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছে, কিন্তু বিশ্বতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগতের ঠিক মত স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। যোগাচার দর্শন বিজ্ঞানবাদী, কাজেই মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অদ্বৈত দর্শন বহির্বিশ্বের বহুত্ব স্বীকার করে না। তাদের বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক প্রতিপাদ্য ইন্দ্রিয়-জাত জ্ঞানদ্বারা সমর্থিত হয় না বলেই এই জ্ঞানকে ভ্রান্ত জ্ঞানরূপে প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূল তত্ত্বের সমর্থনের জন্য তাদের বিশেষ খ্যাতিবাদ স্থাপন করতে হয়। মূল তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণই তার প্রেরণা। মূল বিশ্বতত্ত্ব যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তা আপনি ভেঙে পড়ে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্ব হিসাবে তাদের ভূমিকা গৌণ। সেই কারণে বর্তমান আলোচনায় তাদের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না।

এইবার আমরা পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানের সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তার পরিচয় দেব। বর্তমান অনুচ্ছেদের আরম্ভে আমরা উল্লেখ করেছি যে জ্ঞানের সত্যতার প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে সত্যতার প্রমাণের প্রশ্নও জড়িত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে দুই শ্রেণীর মত গড়ে উঠেছে। এক শ্রেণীর মত বলে সত্যতা প্রমাণিত হয় জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞানের সঙ্গতিদ্বারা।[১] অপর শ্রেণীর মত বলে তা প্রমাণিত হয় বিভিন্ন খণ্ডজ্ঞানের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সুমিতি স্থাপনের দ্বারা।[২] সেটা নির্ভর করে জ্ঞান কিভাবে সংঘটিত হয় খানিকটা তার ওপর কিম্বা খানিকটা জ্ঞান ক্রিয়াতে জ্ঞাতার ভূমিকা স্বীকার

১ Correspondence

২ Coherence

করার ওপর। যদি প্রমাণিত হয় যে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে না, তা হলে জ্ঞেয়ের সহিত সঙ্গতি হল কিনা জানার উপায় থাকে না। সুতরাং সুমিতির সাহায্যেই সত্যতা প্রমাণিত হয়। চেতনবাদী দর্শক-গুলির এই কারণে সুমিতিবাদের ওপর পক্ষপাত বেশী। আবার যদি বিশ্বাস থাকে যে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় সম্ভব তা হলে সঙ্গতিবাদ সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তাকে তাই সমর্থন করে।

আবার এমন হয় যেখানে জ্ঞাতারূপী মনের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, সেখানেও সঙ্গতিবাদের প্রয়োগের অবকাশ থাকে না। কারণ সঙ্গতিবাদ প্রয়োগ করতে তিনটি পৃথক পদার্থের প্রয়োজন। প্রথম, একদিকে জ্ঞাতা থাকবে; দ্বিতীয়, অন্যদিকে জ্ঞেয় থাকবে; তৃতীয়, জ্ঞেয় সম্বন্ধে পরিচয় লাভের জন্য জ্ঞান থাকবে। জ্ঞান ক্রিয়াতে এই তিনটি পদার্থের একত্র সমাবেশ যে অপরিহার্য তা প্রভাকরের ত্রিপুটী তত্ত্বে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। তিনি বলেন জ্ঞান ক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের অস্তিত্ব যুগপৎ সূচিত হয়। জ্ঞান ক্রিয়াকে তাই তিনি 'ত্রিপুটী সংবিৎ' বা 'ত্রিপুটী জ্ঞান' বলেছেন। অবশ্য জ্ঞান বাক্যে জ্ঞাতার উপস্থিতি প্রচ্ছন্ন থাকে, তবু তার উপস্থিতি অনস্বীকার্য। জ্ঞাতার কারণেই ত জ্ঞান, জ্ঞাতা না থাকলে জ্ঞানের প্রশ্ন ওঠে না। এখন বর্তমান যুগে এক শ্রেণীর দর্শন পশ্চিমে গড়ে উঠেছে যা জ্ঞানক্রিয়াতে জ্ঞাতার ভূমিকা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে নব বস্তুবাদ[১] এবং আলেকজাণ্ডার-এর জ্ঞানতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। উভয়েই এই ধরণের মত প্রকাশ করে। সুতরাং তা যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতেও সঙ্গতিবাদের প্রয়োগের অবকাশ থাকে না। জ্ঞান যখন মনের সম্পর্কিত বিষয় হয় এবং জ্ঞেয় হতে পৃথক হয় তখনই তার প্রয়োগ সম্ভব। জ্ঞান যদি জ্ঞাতা হতে পৃথক হয়ে জ্ঞেয়বস্তুর অঙ্গীভূত হয়ে যায় তখন সঙ্গতির প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই আমরা দেখি এই স্বতন্ত্র পরিবেশে সুমিতির অনুরূপ তত্ত্ব সত্যতার প্রমাণ হিসাবে এখানে গৃহীত হয়েছে। এইবার আমরা এইদুটি তত্ত্ব এখানে সংক্ষেপে স্থাপন করব।

নববস্তুবাদের প্রবর্তিত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা পূর্ববর্তী পর্যায়ে করা হয়েছে। কাজেই তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে স্থাপন করার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই হবে যে তার প্রতিপাদ্য হল যে জ্ঞানে জ্ঞাতা বলে কোন

১ New Realism

পৃথক সত্তার ভূমিকা নেই। জ্ঞান একটা বাস্তব ঘটনার সমস্থানীয়, তা বস্তুর মধ্যে সংঘটিত হয়। মনে যে জ্ঞান উপলব্ধি হয় বলে মনে হয়, তা আদৌ মানসিক নয়, তা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞেয়ের অঙ্গীভূত। সুতরাং জ্ঞান মানসিক পদার্থ নয়। জ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং জ্ঞেয় একই পদার্থ। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে এক বিস্ময়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই দর্শনের মতে অস্তিত্বের[১] কোন তাৎপর্য নেই। জ্ঞান যখন বস্তুর অঙ্গীভূত, ভ্রান্তিও বস্তুর অঙ্গীভূত। উভয়েরই অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সত্য ও মিথ্যাকে নববস্তুবাদ যথাক্রমে বাস্তব[২] ও অবাস্তব[৩] বলেছে। এই দুটি শব্দকে একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছে। বিশ্বে যা আছে তা আছে, কিন্তু সবই বাস্তব নয়।[৪] বাস্তবতার প্রমাণ হল বিরোধভাবের অভাব।[৫] সুতরাং যা বাস্তব তাই সত্য, যা বাস্তব নয় তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তা মিথ্যা। সত্যতার প্রমাণ তা হলে জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয়ের সঙ্গতি নয়, জ্ঞানের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধের অভাব, অর্থাৎ সুমিতি।

নববস্তুবাদে মনকে অস্বীকার করবার চেষ্টা হতে একটি অসঙ্গতি এসে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তা একটি বস্তুবাদী দর্শন। সাধারণত বস্তুবাদের সমর্থন করা হয় মানসিক ক্রিয়াকে বস্তুরই ক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করে, যেমন বৈজ্ঞানিক জড়বাদে করা হয়। এখানে সে রীতি অবলম্বন করা হয় নি। চৈতন্যবাদের আক্রমণ হতে বস্তুবাদকে মুক্ত করবার ইচ্ছা হতে জ্ঞানক্রিয়াতে যে মনের কোন ভূমিকা নেই, জ্ঞানক্রিয়া আদৌ মানসিক ক্রিয়া নয়—এইটি দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। সে চেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। জ্ঞানক্রিয়াতে জ্ঞাতার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। মনের বাহিরে আছে জ্ঞেয় বস্তু ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ। মনের, তাদের নির্ভরযোগ্য পরিচয় সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাই জ্ঞানক্রিয়া আসে। জ্ঞান বস্তু নয়, বা বস্তুদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নয়, এক কথায় জ্ঞেয় নয়, তা হল মনের জ্ঞেয়ের সম্বন্ধে ধারণা। মনকে বাদ দেবার চেষ্টা হতে এমন অসঙ্গতি এসে পড়ে যে নববস্তুবাদ মিথ্যাকে বাস্তব জগতের অঙ্গীভূত করতে বাধ্য হয় এবং ফলে মিথ্যার ও বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই মতটি নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। বস্তু বা জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই, কাজেই মিথ্যারও অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে মানসিক ধারণাই সত্য হতে পারে বা ভ্রান্ত হতে পারে। সত্যতা বা ভ্রান্তি

১ Existence ২ Real ৩ Not real

৪ New Realism, pp. 358 60 ৫ Non-contradiction

বাস্তব জগতের ওপর প্রযোজ্য নয়, তার সম্বন্ধে মানসিক ধারণার ওপর প্রযোজ্য।

আলেকজাণ্ডার-এর জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে নববস্তুবাদের কিছু সাদৃশ্যও আছে পার্থক্যও আছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদী। তিনিও জ্ঞানক্রিয়াতে মনের পৃথক ভূমিকা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তবে তিনি মনের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তিনি স্বীকার করেন একদিকে জ্ঞাতারূপী মন আছে এবং অপর দিকে জ্ঞেয়রূপে বাস্তব জগৎ আছে। তবে জ্ঞানক্রিয়াকে মানসিক বলে তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন, তিনি বলেন জ্ঞানক্রিয়া বাস্তব জগতের অঙ্গ হিসাবে তার মধ্যেই উপস্থিত থাকে। তিনি জ্ঞানক্রিয়াকে মন হতে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জ্ঞেয়ের সহিত যুক্ত করেছেন। জ্ঞানক্রিয়ার সঙ্গে জ্ঞেয়ের এই সংযোগ সূচিত করতে তিনি একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা হল 'সংযুক্ত অবস্থিতি' বা 'কম্‌প্রেজেন্স'।[১] তাঁর প্রতিপাদ্য বোঝাবার জন্য তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। ধরা যাক একটি কাঠি আছে। তার কাছে যদি একটি লতাগাছ রোপণ করা হয়, তা হলে সেই লতা কাঠিটি জড়িয়ে ধরবে। এখানে কাঠি যেন জ্ঞেয়বস্তু এবং মন যেন লতা এবং জড়িয়ে ধরা যেন জ্ঞান। জ্ঞানকে মন হতে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টায় তিনি আরও কিছু কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানক্রিয়ার ফলে যে সম্বন্ধসূচক ধারণাটি গড়ে ওঠে তাকে তিনি মানসিক পদার্থ বলতে প্রস্তুত নন, তাকে তিনি একটি প্রক্রিয়া বলেন[২]। সুতরাং জ্ঞানের বিষয়ীভূত ধারণাকে আমরা বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণ করি না আমরা তাকে ভোগ করি মাত্র[৩]। জ্ঞানক্রিয়ার ফলে মানুষ কোন ধারণা সংগ্রহ করে না, ক্রিয়াকে ভোগ করে মাত্র; যেমন আমরা নিদ্রা ভোগ করি বা খেলা ভোগ করি।[৪] কাজেই জ্ঞানক্রিয়ার ফলে যে বিভিন্ন বস্তুসম্পর্কিত সম্বন্ধের ধারণা গড়ে ওঠে তা মানসিক নয়, তা বাস্তব জগতের অঙ্গীভূত।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে তিনি জ্ঞানবাক্যের সত্যতার প্রশ্ন বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন প্রত্যক্ষজ্ঞানে যে ভ্রান্তি আসে তার জন্য দায়ী আমাদের মন। সালম্বন ভ্রমের ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রিয় বস্তু সম্বন্ধে যে পরিচয় এনে দেয়, তার যে ভুল ব্যাখ্যা করে বসি, তার কারণ আমরা বস্তুর দিকে

১ Compresence ২ Contemplation ৩ Enjoyment

৪ Space, Time and Deity, Vol. I pp. 12-13.

ট্যারা চোখে চাই[১] বলে। জ্ঞাতার চোখের কোনো দোষ হেতু এই ভাবে হলদে ফুলকে সাদা ফুল বলে ভ্রম করি। জ্ঞানবাক্য তাঁর মতে যে একটি বাস্তব অবস্থারই অঙ্গীভূত, তা মানসিক ধারণা নয়, সে বিষয় এখনই বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানবাক্য বাস্তব; কিন্তু তার সত্যতার সঙ্গে বাস্তবতার কোন সংযোগ নেই। তারা ভিন্ন মহলের জিনিস। সত্য-মিথ্যাবোধ মানুষের মনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত ব্যাপার।[২] সত্য জ্ঞানবাক্য তাঁর মতে বাস্তবের অঙ্গ; মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে অবাস্তব হতে। সুতরাং সত্যজ্ঞানবাক্যও বাস্তব কিন্তু তার সত্যতা বাস্তব নয়।

আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি যে আলেকজাণ্ডার প্রদত্ত জ্ঞান ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় এবং সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের ব্যাখ্যায় নানা অসঙ্গতি এসে পড়ে। জ্ঞান ক্রিয়াকে প্রথমত তিনি নববস্তুবাদের অনুসরণে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত এক করে দেখেছেন। এ সম্বন্ধে নববস্তুবাদের অনুরূপ প্রতিপাদ্যের সমালোচনায় আমরা যে মন্তব্য করেছি তা এখানে প্রযোজ্য। জ্ঞানবাক্য একটি ক্রিয়া নয়, বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে পরিচয় সূচক একটি মানসিক ধারণা। কাজেই তা বাস্তব নয়। সুতরাং তাকে আমরা ভোগ করি না, বুদ্ধি শক্তিদ্বারা গ্রহণ করি। আলেকজাণ্ডার পরোক্ষভাবে তা স্বীকার করেন। তাই তিনি জ্ঞানকে বাস্তব জগতের অঙ্গ হিসাবে দেখেও তার সত্যতা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন মনের সক্রিয় ভূমিকার সাহায্যে। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে বাস্তব জগতে অসঙ্গতি থাকে না, মনের একটা ভূমিকা থাকে বলেই অসঙ্গতি এসে পড়ে। অবশ্য তিনি স্পষ্ট স্বীকার করতে পারেন নি যে অসঙ্গতি মানসিক ধারণা বলেই জ্ঞানের মধ্যে এসে পড়ে। এতখানি স্বীকার করলে তাঁর প্রতিপাদ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। তিনি বলেছেন জ্ঞানবাক্যের সত্যতা বাস্তবের অঙ্গ নয়। তা হলে কি তা মনের জিনিস? সত্যতা যদি মনের জিনিস হয় তা হলে জ্ঞানবাক্য হবে না কেন? তাদের মধ্যেও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।[৩]

রাসেল সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন করেছেন। সত্যতা

১ Squint.

২ "There is no property of coherence in reality itself. Coherence is a property of the perspective which we have ourselves selected."

Space, Tuine and Deity, Vol. II, p. 263

৩ True proposition belongs to reality; false ones introduce elements from elsewhere. True propositions are also real but their truth is different from their reality.

জ্ঞানবাক্যের অঙ্গীভূত গুণ কিনা সে বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। তিনি সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা করেছেন। এখানে যা সব থেকে চোখে পড়ে তা হল তাঁর আলোচনায় তাঁর মন একটি দোটানার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে দেখা যায়। তাঁর যুক্তিবাদী মন সত্যতার লক্ষণ সম্বন্ধে এক ধরণের সিদ্ধান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপরপক্ষে তাঁর মতিগতি তাঁকে অন্য ধরণের ধারণায় টেনে নিয়ে যায়। বিভিন্ন জ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা করে তিনি তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: পরিচয় ভিত্তিক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বর্ণনা-ভিত্তিক জ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান। তাঁর ধারণায় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাতজ্ঞানে ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য[১] পরিচয় ভিত্তিক জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞেয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। কিন্তু তাঁর ধারণায় তার ভিত্তিতে যে বস্তু সম্পর্কিত প্রত্যক্ষজ্ঞানের[২] উদ্ভব হয় তা বর্ণনা ভিত্তিক জ্ঞান। টেবিলের প্রত্যক্ষজ্ঞান তাঁর মতে বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান।[৩] তাঁর ধারণায় তা পরোক্ষজ্ঞান, কারণ একটি সার্বিকের সহিত সংবেদনজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সংযোগে তা উৎপাদিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানও যখন জ্ঞেয়ের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় এনে দিতে পারে না, তখন সত্যতা জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয়ের সঙ্গতির ভিত্তিতে[৪] গড়ে উঠতে পারে না। তিনি তাই স্বীকার করেন যে সত্যতা বলতে যদি ধরা হয় যে জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বহির্ভূত বস্তুর এক সঙ্গতি সূচিত হয় তা হলে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে কিনা তা মন কখনও জানতে পারবে না।[৫] তা সত্বেও সত্যতার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সঙ্গতিবাদকে গ্রহণ করেছেন সুমিতিবাদকে গ্রহণ করেন নি। ফলে তাঁর প্রতিপাদ্যের ব্যাখ্যা খুব সন্তোষজনক হয় নি। সেই বিষয় তিনি যে অবহিত ছিলেন না তা নয়। তাও একরকম তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁর এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে চেষ্টা করেছেন যে জ্ঞানবাক্যের যে সম্বন্ধ মন ধারণা করে তার সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর সাদৃশ্যই অর্থাৎ সঙ্গতি তার সত্যতা নির্দ্ধারণ করে। এই ভাবে আলোচনা

১ Sense data ২ Perceptual Knowledge

৩ "My knowledge of the table is of the kind which we shall call knowledge by description." The problems of Philosophy, Chap V

৪ Correspondence

৫ "If truth consists in a correspondence of thought with something outside thought, thought can never know when truth has been attained.

The Problems of Philosophy. Chap. XII

শেষ করে তিনি মন্তব্য করেছেন যে তাঁর প্রতিপাদ্যকে তিনি ভ্রান্ত বলতে প্রস্তুত নন, তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে তা অসম্পূর্ণ।[১]

এইবার আমরা সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করব যে তাঁর স্বীকৃতি মতেই বিশ্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় অসম্ভব হলেও কি ভাবে তাঁর মতে সঙ্গতিবাদকে জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যায়। তাঁর ধারণায় জ্ঞানবাক্য দুই শ্রেণীর হতে পারেঃ প্রথম, পদসমন্বয়সূচক জ্ঞানবাক্য[২] আর দ্বিতীয়, মূর্তিসমন্বয়সূচক জ্ঞানবাক্য[৩]। একই জ্ঞানবাক্য দুই রীতিতেই বর্ণনা করা যায়। ধরা যাক একটি ঘরে দরজার বাঁ পাশে জানালা আছে। আমি পদসমন্বয় সূচক রীতি অবলম্বন করে বলতে পারি 'ঘরে দরজার বাঁ দিকে জানালা,' আবার মনে মূর্তি গড়ে ভাবতে পারি 'এই দরজা আর এই জানালা'। এই দুই জ্ঞানবাক্যের আধেয়[৪] ভিন্ন, কিন্তু উভয়েই একই বস্তুকে[৫] সূচিত করে। রাসেল-এর ধারণা জগতে বস্তু বা পদার্থের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান তার সঙ্গে যাকে তিনি মূর্তিভিত্তিক জ্ঞান বলেছেন তার বেশী সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সঙ্গতি খুঁজতে হবে এই মূর্তিভিত্তিক জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর। এই যুক্তির ভিত্তি হল একটি বিশ্বাস। তাঁর ধারণায় 'মানস মূর্তি' যা সূচিত করে তাদের সহিত তা সাদৃশ্য রক্ষা করে।[৬] তাঁর আরও বিশ্বাস 'মানস মূর্তিগুলি' সংবেদনের প্রতিমূর্তি স্থানীয়।'[৭] বলা বাহুল্য তাঁর এই ব্যাখ্যা কোন অতিরিক্ত আলোকপাত করে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে জ্ঞেয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে না, তা হলে সঙ্গতিবাদ সেখানে প্রয়োগ করা যায় না। যার বিষয় পরিচয় দেওয়া হচ্ছে তা যদি প্রত্যক্ষগোচর না হয়, পরিচয় তার প্রকৃতির সঙ্গে যে মিলছে তা জানব কি করে?

এইবার আমাদের বর্তমান আলোচনার মীমাংসার সময় হয়েছে। বর্তমান অনুচ্ছেদে তিনটি প্রশ্নের আলোচনা হয়েছে :

১ "I do not believe that the above formal theory is untrue but I do believe that it is inadequate." Analysis of Mind, p. 275

২ Word Proposition ৩ Image Proposition

৪ Content ৫ Objective

৬ "Images resemble what they mean."
Proceedings of Aristoblian Society 1919

৭ "Images are said to be copies of sensations," Ibid

(১) জ্ঞানের প্রকৃতি কি? এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে সত্যতা কি জ্ঞানের অঙ্গীভূত গুণ না তার প্রমাণ?[১]

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন হল সত্যতা জ্ঞানের অঙ্গীভূত হক বা নাই হক তার প্রমাণ কি উপায়ে নির্ধারিত হতে পারে? এই প্রসঙ্গে আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির উত্তর স্থাপিত হয়েছে। সঙ্গতিবাদ বলে যে তা নির্ভর করে জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞানের সঙ্গতির ওপর। সুমিতিবাদ বলে তা নির্ভর করে খণ্ডজ্ঞানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সুমিতির ওপর। আরও একটি প্রমাণের রীতি প্রস্তাবিত হয়েছে। তা বলে তা নির্ভর করে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে ব্যবহারিক জীবনে তার কার্যকারিতার ওপর। এদের যুক্তিযুক্ততা আমাদের বিবেচনার বিষয় হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে জ্ঞান দুই শ্রেণীর: এক, প্রত্যক্ষ এবং দুই, পরোক্ষ বা আনুমানিক জ্ঞান। এমনও হতে পারে যে সত্যতার নির্ধারণ-রীতি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবে। তাও আমাদের আলোচনার বিষয় হবে।

(৩) তৃতীয়ত সত্যতার সঙ্গে ভ্রান্তির প্রশ্ন জড়িত। জ্ঞানে ভ্রান্তি কেন অনুপ্রবেশ করে তাও আমাদের আলোচনার বিষয় হবে। ভ্রান্তির সংজ্ঞাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং পরোক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবে কি না তাও আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথম প্রশ্ন হল সত্যতা কি জ্ঞানের অঙ্গীভূত গুণ না জ্ঞানের প্রামাণ্যতা? আমরা দ্বিতীয় মতটির একাধিক উদাহরণ উপরের আলোচনায় পেয়েছি। তাঁরা প্রধানত বলেন সত্যতা হল জ্ঞানের প্রামাণ্যতা। তবে তার ব্যতিক্রম আছে। তা পাই মীমাংসা দর্শনে। তা বলে সত্যতা জ্ঞানের অঙ্গীভূত। জ্ঞান স্বতঃ প্রমাণ হয়, তার অতিরিক্তভাবে পরীক্ষা করে সত্যতা প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় না। পাশ্চাত্য দর্শনে লুই আর্নোড রীড-ও এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেন কি প্রত্যক্ষজ্ঞান, কি পরোক্ষজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের সত্যতা জ্ঞানের মধ্যেই গ্রথিত, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যখন মানুষের মন ঠিক মত জ্ঞেয় বস্তুর পরিচয় লাভ করতে সমর্থ হয় তখনই জ্ঞান উৎপাদিত হয়। তাই তিনি বলেছেন সত্যের সংজ্ঞা হওয়া উচিত জ্ঞানের জ্ঞেয় সম্বন্ধে সফল পরিচয়লাভের ক্ষমতা।[২] জ্ঞান মানেই সত্য-সম্বন্ধ-সূচক জ্ঞান। কাজেই

সত্যতার সহিত জ্ঞেয়ের সঙ্গে সঙ্গতি বা জ্ঞানের আভ্যন্তরীণ সুমিতি জড়িত করার প্রশ্ন ওঠে না।[১]

মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিদ্বারা সমর্থনযোগ্য। একটি জ্ঞানবাক্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা চারটি উপাদান পাই। তার মধ্যে আছে দুটি পদ, তার পর আসে তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি সম্বন্ধ নির্ণয় এবং চতুর্থত সেই সম্বন্ধের সত্যতার ওপর একটি বিশ্বাস। আমরা আলোচনা করলে দেখতে পাব এই সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এমন একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে যা জ্ঞানবাক্যের সত্যতা নিশ্চিত করে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় ধরা যাক। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও জ্ঞাতার মন ঠিক মত কাজ করলে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। তার নিশ্চয়তা এত বেশী যে আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষজ্ঞানকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিই। পরোক্ষজ্ঞান অর্জনেও আমরা কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করি যার ফলে ভ্রান্তি বর্জন করা সম্ভব হয়। আরোহমূলক জ্ঞানেব ভিত্তি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সেই পরিমাণে তা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। অবরোহমূলক জ্ঞানের ভিত্তি প্রথমত আরোহমূলক জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত সেই আরোহমূলক জ্ঞানের সহিত অনুমানের আভ্যন্তরীণ সুমিতি। তৃতীয়ত, অনুমান কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণেই যুক্তি শাস্ত্রের নীতি পরিচালিত হলেই তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্যতা গুণ স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

তবে কি ভ্রান্তি হয় না? তা হয় বৈ কি। প্রত্যক্ষজ্ঞানেও হয় পরোক্ষ-জ্ঞানেও হয়। তখন ভ্রান্তি হয়েছে কিনা নির্ধারণ করতে জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখতে হয়। · সেই পরীক্ষাব জন্য তিনটি নীতি প্রস্তাবিত হয়েছে। প্রথম, জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি। দ্বিতীয়, খণ্ডজ্ঞানগুলির মধ্যে পরস্পর সুমিতি। তৃতীয়, জ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যকারিতা। এদের পরস্পরের উপযোগিতা এবং প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

প্রথমেই তৃতীয় তত্ত্বটি আলোচনা করা যাক। তা বলে জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারিত হয় তার ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর। জৈন দর্শন এবং ন্যায়দর্শন এই মতের সমর্থক। যা আমাদের কল্যাণ সাধন করে সত্যজ্ঞান তা পেতে সাহায্য

১ Is true knowledge in any sense correspondence or coherence? No, rather truth is just the quality of knowing as it performs efficiently its function." [Ibid, Chap. VIII, Sec. 1]

করে এবং যা অনিষ্ট করে তা বর্জন করতে সাহায্য করে—এই হল জৈন দর্শনের মত। ন্যায় দর্শন বলে সত্যজ্ঞান কার্যে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনে উইলিয়ম জেমস প্রবর্তিত সত্যের সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তারও দৃষ্টিভঙ্গি অনুরূপ। তিনি যে তত্ত্ব স্থাপন করেছেন তার নাম দিয়েছেন ব্যবহারিক সুবিধাবাদ[১]। নামকরণ হতেই তাঁর প্রতিপাদ্য অনুমান করা যায়। তাঁর ধারণায় সত্যতার প্রমাণ সঙ্গতি বা সুমিতির ওপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে তার ব্যবহারিক সুবিধার ওপর। তাঁর মতে সত্যতা হল একটি ধারণার নগদ মূল্য।[২] তাঁর ধারণায় নীতির ক্ষেত্রে যেমন সৎকর্ম সুবিধা এনে দেয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমন সত্যজ্ঞান ব্যবহারিক সুবিধা এনে দেয়। এই অর্থে তারা সমধর্মী। সুতরাং তাকেই সত্য বলা উচিত যা মানুষের ভাল করে।

এই তত্ত্বের মধ্যে একটি সত্য উপাদান আছে। যা সত্য তা ব্যবহারিক কাজে নিশ্চিত লাগে। তার সুন্দর প্রমাণ মানুষের প্রযুক্তিক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য। কিন্তু তা হল তাদের পরোক্ষ ফল। তা জ্ঞানের প্রকৃতিও নির্ধারণ করে না, জ্ঞানের সত্যতাও নির্ধারণ করে না। জ্ঞানের আকর্ষণ অহৈতুক, তা সাধারণ ক্ষেত্রে কোন ব্যবহারিক সুবিধা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এ বিষয় আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়ত, এই পরীক্ষা সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়। এমন জ্ঞান আছে যা কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে না। যেমন আইনস্টাইন প্রবর্তিত বিশেষ আপেক্ষিকবাদ। তার প্রয়োগ মহাকাশে অবস্থিত আকাশচারী মহাবস্তুর ক্রিয়ার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। তা কোন ব্যবহারিক সুবিধা এনে দিতে পারে না। বেশীর ভাগ দার্শনিক তত্ত্বও এই শ্রেণীর। তাদের ওপর এই প্রমাণের রীতি প্রয়োগ করা যায় না।

মনে হয় সঙ্গতি ও সুমিতি উভয়েরই সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্র আছে। জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ হলেও এ কথা সত্য। প্রত্যক্ষজ্ঞানে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ঠিক কাজ করলে জ্ঞান অভ্রান্ত হয় নিশ্চিত, কিন্তু সব সময়ত তা হয় না। তা না হলে সালম্বন ভ্রম ঘটবে কেন? অনুরূপভাবে যুক্তি শাস্ত্রের নিয়ম পালন করে গেলে আনুমানিক জ্ঞান অভ্রান্ত হবে। কিন্তু তা খণ্ড জ্ঞান দেয়। তাদের

১ **Pragmatism**

২ **"Truth is one species of good and not, as is usually supposed, a category distinct from good and co-ordinate with it. The true is the name of whatever proves itself to be good in the way of belief.**

Pragmatism, p. 222

মিলিত করে ব্যাপক জ্ঞান গড়তে তারা সামান্যই সাহায্য করে। সে ব্যাখ্যায় মতিগতিও প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং ব্যাপক আনুমানিক জ্ঞানের নির্ভরশীলতা পরীক্ষার স্বতন্ত্র প্রয়োজন থাকে। তবে সঙ্গতি ও সুমিতির প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্ভবত বিভিন্ন। সঙ্গতির প্রয়োগ সেইখানেই সম্ভব যেখানে জ্ঞেয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। আনুমানিক-জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান হতে সরে আসে। তা অন্য জ্ঞানকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। তাই বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন তা হল পরিচয়মূলক জ্ঞান। আনুমানিক জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ সুমিতি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তা তিন শ্রেণীর হতে পারে; আরোহমূলক জ্ঞান, অবরোহমূলক জ্ঞান এবং বিভিন্ন খণ্ড জ্ঞানের সংযোজনে উৎপাদিত জ্ঞান। আরোহমূলক জ্ঞান সংশ্লেষণাত্মক এবং তা যে সামগ্রিক জ্ঞানবাক্য গড়ে তোলে তা সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে প্রযোজ্য। সুতরাং প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করা এক্ষেত্রে অসম্ভব। অবরোহমূলক জ্ঞান যদি বিশেষের জ্ঞান না হয়, তার সম্পর্কেও সে কথা খাটে। বিশেষের জ্ঞান হলে অবশ্য তাকে প্রত্যক্ষ দেখে তার সহিত সঙ্গতি নির্ধারণ করা যায়। যদি বলি বসন্ত রোগে রাম অন্ধ হয়েছে, তাকে দেখে সন্দেহ ভঞ্জন করা যায় সে অন্ধ কিনা। বিভিন্ন খণ্ড জ্ঞান জুড়ে আমরা বিভিন্ন দর্শন বা বিজ্ঞান গড়ে তুলি। সেখানে খণ্ড জ্ঞানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বা সুমিতিই সেই সংযুক্তজ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবস্থাটি স্বতন্ত্র। এখানে জ্ঞেয় বিষয় একটি বিশেষ। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় তার পরিচয় আমাদের মনের কাছে বহন করে আনে। এখানে সঙ্গতিবাদ প্রযুক্ত হবে না সুমিতিবাদ প্রযুক্ত হবে, তা নির্ভর করে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকৃতির ওপর। প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রথম আসে সংবেদন। তার পর সংবেদন যে তথ্য আনে তার ওপর সার্বিক সংজ্ঞার প্রয়োগ করে জ্ঞেয় বস্তুর পরিচয় ঘটে। এখানে আমরা যদি বলি প্রত্যক্ষজ্ঞানও এই কারণে অনুমানভিত্তিক, তা হলে সঙ্গতিবাদ প্রয়োগ করা যায় না। রাসেল তা সত্ত্বেও সঙ্গতিবাদ প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে নিজেই নানা অসঙ্গতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম দিকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ সংযোগ না ঘটলেও মন অর্থাৎ জ্ঞাতা একরকম প্রত্যক্ষ পরিচয়ই পায়; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ব্যবধান

সৃষ্টি করে না। যা সংঘটিত হয় তা অনেকটা বেতার যন্ত্রে শিল্পীর সঙ্গীত শোনার মত। সুতরাং আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষজ্ঞানের সত্যতা জ্ঞেয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয় কিনা তার দ্বারা সূচিত হতে পারে। তার সুন্দর পরিচয় পাই সালম্বন ভ্রমের ক্ষেত্রে। আমি অন্ধকারে একটি দড়ি দেখে ভাবলাম তা সাপ। আলো এনে দেখলাম তা সাপ নয়, দড়ি। ভাল করে প্রত্যক্ষ করে তার মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়ে গেল।

তৃতীয় প্রশ্ন হল ভ্রান্তির সংজ্ঞা। এখানেও মনে হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে মিথ্যাত্ব প্রমাণের রীতি হবে বিভিন্ন। আনুমাণিক জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ যখন আভ্যন্তরীণ সুমিতির উপর নির্ভর করে তখন আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, যে এক্ষেত্রে সুমিতির অভাবই মিথ্যাত্ব সূচিত করে।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভ্রান্তি দুই শ্রেণীর হতে পারে। নিরালম্বন ভ্রান্তি[১] ও সালম্বন ভ্রান্তি।[২] নিরালম্বন ভ্রান্তিতে মনের বাহিরে কোন জ্ঞেয় বস্তু থাকে না। যেমন স্বপ্নের অভিজ্ঞতা বা আকাশকুসুম রচনা। তার মিথ্যাত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়। তার বাস্তব ভিত্তি না থাকাই তার মিথ্যাত্বের লক্ষণ। তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই।

সালম্বন ভ্রান্তির একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। এ বিষয় ভারতীয় দর্শনে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচটির আলোচনা আমরা বর্তমান অধ্যায়েই করেছি। আমরা তাদের মধ্যে আত্মখ্যাতিবাদ ও অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদকে বর্জন করব, কারণ তারা দুটি বিশেষ দর্শনের বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যার অঙ্গীভূত। বাকি তিনটির আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। সালম্বন ভ্রমে প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যে যে উপাদানগুলি ক্রিয়া করে তারা সকলেই বর্তমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞানক্রিয়া ঠিক মত সম্পাদিত হয় না। জ্ঞেয়-বস্তুর সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয় এবং তার ওপর একটি সার্বিকও আরোপিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সার্বিক আরোপিত হওয়া উচিত ছিল তার পরিবর্তে তার অনুরূপ একটি সার্বিক আরোপিত হয়। সচরাচর গৃহীত উদাহরণ রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্তই এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ভ্রান্তির কারণ আলোকের অভাব। তার ফলে ইন্দ্রিয় যে তথ্য বহন করে খানিকটা অস্পষ্ট হয় এবং তার ওপর তাই ঠিক সার্বিক

১ Hallucination ২ Illusion

প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। তাই ভ্রান্তি ঘটে। ভ্রান্তির কারণ বাহিরের পরিবেশও হতে পারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দুর্বলতার কারণেও সংঘটিত হতে পারে। যেমন যার ন্যাবা রোগ হয়েছে সে জিনিসকে হলদে দেখে। মোটামুটি পরিচয়ের জন্য সার্বিক আরোপ করতে গিয়ে আমরা সুস্পষ্ট সঠিক তথ্য পাই না তাই ভ্রান্তির উদয় হয়।

এখন আমরা দেখতে পারি অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতির কোন তত্ত্বটি আমরা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করতে পারি। অসৎখ্যাতি বলে যা নেই তাই দেখি। এটা ঠিক ব্যাখ্যা দেয় না। যা দেখি তাতে প্রকৃত বস্তুসম্বন্ধে কিছু তথ্য নিশ্চয় পাই, তবে তা আংশিক ভাবে বিকৃত হতে পারে বা অস্পষ্ট হতে পারে। কাজেই সালম্বন ভ্রমে যে সার্বিক প্রয়োগ করা উচিত নয় তাকে প্রয়োগ করে বসি। সার্বিক সংজ্ঞা সৎও নয় অসৎও নয়, তার এক সূক্ষ্ম পর্যায়ে অস্তিত্ব আছে। কাজেই সালম্বন ভ্রমে যা দেখি তাকে ভুল সার্বিকের সঙ্গে যুক্ত করে বিকৃত ভাবে দেখি। অখ্যাতিবাদও সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ তা বলে কোন সার্বিকই আরোপিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে কিছু ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য এখানে সংগৃহীত হয়। অন্যথাখ্যাতিকে সমর্থন করা যায়, ; কারণ তা বলে যা আরোপ করা উচিত তা না করে অন্য জিনিস অর্থাৎ অন্য সার্বিক এখানে আরোপ করি।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান তত্ত্ব

জ্ঞানের রীতি

১

বিশ্বসত্তাকে জানবার প্রস্তাবিত বিভিন্ন রীতি

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা অনুমানিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণাও আমাদের হয়েছে। মোটামুটি আমরা দেখেছি যে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে এমন একটি বস্তু বা ঘটনা, যেখানে আমাদের বুদ্ধিশক্তি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাদের সহিত সোজাসুজি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সেখানেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্র। আর বিভিন্ন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশেষ যে জ্ঞান সংগৃহীত হয় তাদের সংযুক্ত করে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে যে জ্ঞান আহৃত হয় তাই পরোক্ষ বা আনুমানিক জ্ঞান। নানা অভিজ্ঞতায় আমরা আগুনের দাহিকা শক্তি প্রত্যক্ষ করে আমরা এই আনুমাণিক জ্ঞান সঞ্চয় করি যে আগুনের দাহিকা শক্তি আছে। একটা বিরাট বস্তুকে জানতে অনুরূপভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞানের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। একটি বিরাট বাড়ী কেমন দেখতে এক দর্শনে ধারণা করা যায় না। তার চারিপাশে ঘুরে বিভিন্ন দিক হতে তাকে দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার সম্বন্ধে যে খণ্ডজ্ঞান সঞ্চয় করি মনের মধ্যে তাদের সংযুক্ত করে তবেই তার একটা সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এইভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে পরোক্ষজ্ঞান গড়ে ওঠে। প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা প্রধান, তাই সেখানে যা দেখি খুব স্পষ্ট দেখি। পরোক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা থাকে না, বুদ্ধি শক্তিই সেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করে। তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে একটা স্পষ্ট অনুভূতির বোধ বর্তমান থাকে পরোক্ষজ্ঞানে তা থাকে না। আবার বিভিন্ন পরোক্ষজ্ঞানকে ভিত্তি করে ব্যাপকতর পরোক্ষজ্ঞান গড়ে ওঠে। এইভাবেই ত বিভিন্ন দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে।

কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পরোক্ষজ্ঞানকে অবলম্বন করেই বিশ্বসত্তা সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে। তা ছাড়া অন্য প্রশস্ত পথ নেই। বিশ্বসত্তা সব থেকে

বিরাট, সব থেকে ব্যাপক। সকলকালের সকল মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই তার পরিচয় বহন করে। কাজেই যা এমন বিরাট তাকে জানবার প্রধান অবলম্বন অনুমানকেই করা উচিত। অবশ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার ভিত্তি, কিন্তু যেহেতু তা খণ্ডজ্ঞান মাত্র দেবার সামর্থ্য রাখে, তাকে অবলম্বন করে আনুমাণিক জ্ঞানেরই মূল ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে।

কিন্তু দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় এমন কয়েকজন মনীষী আছেন যারা আমাদের এই প্রতিপাদ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে আনুমানিক রীতির জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা আছে কিনা সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন দার্শনিক পড়েন। এই প্রসঙ্গে ব্র্যাডলি, যোগ দর্শনের স্থাপয়িতা পতঞ্জলি, অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক শংকরাচার্য, সৃষ্টিধর্মী ক্রমবিকাশ বাদের প্রবর্তক বের্গসঁ এবং রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ভিত্তিতে এঁদের মধ্যে একটি দাগ টানা যায়; অর্থাৎ তাঁদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটিতে পড়েন ব্র্যাডলি এবং অন্যটিতে পড়েন বাকি সকলে। তার কারণ এই। ব্র্যাডলির ধারণায় জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে যে অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে তাই বিশ্বসত্তার উপাদান কিন্তু তা যেহেতু খণ্ডজ্ঞান সেই হেতু তা প্রকৃত বিশ্বসত্তার পরিচয় দিতে পারে না। তা প্রকৃতির অবাস্তব রূপ বা প্রতিভাস[১]। জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বিভাগকে অতিক্রম করে সকল মানুষের সকল মনের সকল অভিজ্ঞতার সুসমঞ্জস অবস্থিতিই বিশ্ব সত্তার প্রকৃতরূপ[২] সূচিত করে। কিন্তু তা জ্ঞাতরূপী মনের অলভ্য। তাকে ধরতে হলে জ্ঞানকে প্রকৃত সত্তায় রূপান্তরিত হতে হবে। কাজেই জ্ঞান ক্রিয়ার সাহায্যে প্রকৃত সত্তার নাগাল পাওয়া যায় না। তিনি এইভাবে বুদ্ধিশক্তির অক্ষমতা সূচিত করেই থেমেছেন। অতিরিক্তভাবে প্রকৃত সত্তার পরিচয়ের জন্য কোন নূতন জ্ঞানমার্গ স্থাপন করতে চেষ্টা করেন নি। এইভাবেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে।

অন্য মনীষীরা কিন্তু ঠিক এ পথে যান নি। তারা প্রধানত পরোক্ষ জ্ঞানের ওপর আস্থা হারিয়েছেন এবং অতিরিক্তভাবে একটি নূতন রীতির প্রস্তাব করেছেন যা তাঁদের ধারণায় মৌলিক সত্তার প্রকৃত পরিচয় এনে দেবার ক্ষমতা রাখে। এই যে নূতন রীতি তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন তার প্রকৃতি পরোক্ষ বা আনুমানিক জ্ঞানের প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাদের ঠিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের

১ Appearance ২ Reality

মতও বলা যায় না, তবে অনেকটা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত। তাঁরা যে রীতিগুলি নির্দেশ করেছেন তা তাঁদের ধারণায় প্রত্যক্ষজ্ঞানে যেমন জ্ঞেয় বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে সেই ধরণের পরিচয় দিতে সক্ষম। সেই রীতিগুলি কোথাও মূল সত্তার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কোথাও বা নিবিড় পরিচয় দিতে পারে বলে দাবী করা হয়েছে। মোটামুটি বলা হয়েছে তারা পরোক্ষজ্ঞানের মত অস্পষ্ট নয় এবং ঠিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের মত না হলেও তাতে যেমন বস্তুর পরিচয় অনুভব করা যায় সেই রকম মূল সত্তার পরিচয় অনুভব করা যায়। তা ঠিক ততটা বুদ্ধি শক্তির জানার মত নয় যতটা হৃদয়বৃত্তির অনুভূতির মত। তাই এই শ্রেণীর জ্ঞানমার্গকে পরোক্ষানুভূতিও বলা হয়ে থাকে।

একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে সব দার্শনিক মতগুলি পড়ে তারা সকলেই বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে মৌলিক সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেই প্রকৃতিকে আনুমানিক জ্ঞান ঠিক ধারণা করবার উপযোগী নয়, এই বিবেচনা হতেই একটি নূতন মার্গের তারা অন্বেষণ করেছেন এবং সন্ধানও দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের দার্শনিক মতের সঙ্গে তাঁদের প্রস্তাবিত রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এক রকম বলা যায় তাঁদের বিশেষ দার্শনিক মতের প্রভাবেই এই নূতন রীতির উৎপত্তি ঘটেছে। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে এই রীতিগুলি কি ভাবে তাঁদের নিজস্ব দর্শনের সহিত জড়িত তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা প্রথমে যোগদর্শনের কথা দিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। যোগদর্শন সাংখ্য দর্শনের সহিত যুক্ত। উভয়েই বিশ্বের ব্যাখ্যা করে কয়েকটি তত্ত্বের সাহায্যে। সাংখ্যে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব রূপে ঈশ্বরের উল্লেখ নেই। যোগদর্শনে এই অতিরিক্ত তত্ত্বটি সংযুক্ত হয়েছে। যোগের পরিকল্পিত ঈশ্বর কিন্তু আমরা যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা করি তার মত নয়। তিনি অন্য নানা অপ্রধান তত্ত্বের মধ্যে একটি। এই যুগ্ম দর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি হল প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি সক্রিয় শক্তি, পুরুষ চিন্ময় নির্বিকার। সাম্যাবস্থায় উভয়ে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং তখন জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সমন্বিত বিশ্ব থাকে না। তাদের সংযোগ হলেই প্রকৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পুরুষের ওপর অহংকার বোধ আরোপ হয়। তখনই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্বের অনুভূতি ফুটে ওঠে। এই তত্ত্ব সাংখ্য ও যোগ উভয়েই গ্রহণ করে।

যোগদর্শনের বৈশিষ্ট্য হল তা পুরুষের বিশুদ্ধরূপ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় কিভাবে পাওয়া যায় তার একটি পদ্ধতি উদ্ভব করেছে। তাই হল যোগ সাধনা। তার লক্ষ্য হল মানুষের মনকে সংযত করে ধীরে ধীরে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যাতে শেষ অবস্থায় পুরুষ তত্ত্বের বিশুদ্ধ প্রকৃতির সহিত তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। এইভাবে দেখতে গেলে যোগদর্শন সাংখ্যের পরিপূরক এবং তার বিশেষ কাজ হল এমন একটি রীতি গড়ে তোলা যাতে বিশ্বের অন্যতম মৌলিক তত্ত্ব পুরুষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যায় যে এই বিশেষ রীতির বা জ্ঞানমার্গের উদ্ভব ঘটেছে এই যুগ্ম দর্শনের অন্যতম মৌলিক তত্ত্ব পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাবার জন্য। প্রকৃতি যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন বুদ্ধি বা মহৎ, অহংকার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞেয় ও ভোগ্য বস্তুর বিকাশ ঘটবার ফলে যে পরিবেশের অভিজ্ঞতা হয় তা হতে মনকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে সমাধিস্থ করে, তার সাহায্যে পুরুষের প্রকৃতরূপের পরিচয় জানতে চেষ্টা করা হয়। সুতরাং এই জ্ঞানরীতি এই যুগ্ম দর্শনের দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার প্রকৃতি হতেই এই বিশেষ রীতির উদ্ভব হয়েছে। তাদের দার্শনিক তত্ত্বই যেন এই রীতির প্রেরণা।

যে কথা যোগদর্শনে উদ্ভাবিত জ্ঞানরীতির সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা এই শ্রেণীর অন্য রীতিগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আমরা এর পর শংকরাচার্যের প্রস্তাবিত বিশেষ মার্গের কথা আলোচনা করতে পারি। তিনি ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করে বেদান্তের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর চিন্তা একান্তভাবেই মৌলিক এবং নিজস্ব। ঠিক বলতে ভাষ্য আকারে একটি নূতন অনন্যসাধারণ দর্শন তিনি গড়ে তুলেছিলেন। তা বলে, বিশ্বে একটি মাত্র সত্তার স্বীকৃতি দেওয়া যায়, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই এবং তাঁর প্রকৃতি হল চিৎ স্বরূপ। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখি যেখানে চেতনা আছে, সেখানে চেতনার ধারণার জন্য জ্ঞেয়বস্তু আছে। তাঁর ধারণায় এখানে চিৎ প্রকৃতির একটি মাত্র সত্তাই আছেন, জ্ঞেয়রূপে দ্বিতীয় কিছু নেই যা তাঁর জ্ঞানের বিষয় হবে। তিনি বলেন সূর্য যেমন গ্রহণ করবার কিছু থাক বা না থাক মহাকাশে কিরণ ছড়িয়ে দেয়, এই চিন্ময় একক সত্তাও তেমন তাঁর চৈতন্য প্রকৃতি নিয়ে একা বিরাজমান। এই জন্যই তাঁর দর্শনের নাম অদ্বৈতবাদ

এই দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। কারণ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিশ্বের পরিচয় পাই তা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়ে বহু ও বিচিত্ররূপে প্রকাশ। শংকরাচার্য বলেন তা বিশ্বসত্তা সম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান দেয় না, তা তাঁর সম্বন্ধে একটি বিকৃত পরিচয় দেয়। এই রকম ঘটে মিথ্যা জ্ঞানের ফলে। এটা তাই অবিদ্যা। আমি আছি বোধ, ভোগ্য বস্তুর অস্তিত্ববোধ, দেহের অস্তিত্ববোধ—এরা সবাই অবিদ্যা।[১] তিনি বলেন, 'আমি', 'আমার' বোধ সমন্বিত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যুক্ত না হয়ে জ্ঞান থাকতে পারে না। কারণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব নয়, আবার দেহ ব্যতীত জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহিত জ্ঞান মনের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায় না। এ সবই যা প্রকৃত পক্ষে একক সত্তা তাকে বহুরূপে প্রকট করে। সুতরাং তা অবিদ্যা।[২]

কাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞানরীতি উভয়েই তার কাছে অর্থহীন। তারা কেবল অধ্যাসের প্রভাবে মূলত যা একক সত্তা তার বহু ও খণ্ডিতরূপে এক বিকৃত পরিচয় দেয়। তাই তাদের সাহায্যে যা পাই তা অবিদ্যা। তারা মৌলিক সত্তার প্রকৃত পরিচয় দিতে অক্ষম। সেই জন্যই তিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভের রীতি হিসাবে একটি নূতন মার্গের প্রস্তাব করেছেন। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা একত্র পাওয়া যায় না। প্রধানত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে তার কিছু ইঙ্গিত আছে। এই রীতির তিনি নাম দিয়েছেন 'অনুভব'। তা প্রত্যক্ষ বা অনুমান রীতি হতে স্বতন্ত্র, কারণ উভয়েই জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে দ্বৈতবোধ দ্বারা প্রভাবান্বিত। তার উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মের নির্বিশেষ চিৎস্বরূপ প্রকৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় এনে দেওয়া।

সুতরাং দেখা যাবে এখানেও এই নূতন রীতি শংকরাচার্য স্থাপিত বিশুদ্ধ একবাদী দর্শনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্রহ্মের প্রকৃতি মূল দর্শনে যেমন বর্ণিত হয়েছে তাকে তেমন রূপে পাবার জন্যই এই বিশেষ রীতির প্রয়োজনীয়তা। সাধারণত ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ বা অনুমান রীতিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তা দ্বৈতভাবকে স্বীকার করে নিয়ে গড়ে উঠেছে।

এবার আমরা বের্গসঁ প্রস্তাবিত বিশেষ রীতিটির আলোচনা করতে পারি। তাঁর দার্শনিক মতের সহিত ইতিমধ্যে আমরা পরিচিত হয়েছি। সুতরাং

১ দেহাদিষু অনাত্মসু অহমস্মীতি আত্মবুদ্ধির বিদ্যা॥ শারীরিক ভাষ্য॥ ১॥ ৩॥ ২

২ শারীরিক ভাষ্য, ভূমিকা

বর্তমান প্রসঙ্গে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই চলবে। তিনি দ্বৈতবাদী। তাঁর ধারণায় বিশ্বে দুটি মৌলিক তত্ত্ব আছে—একটি জড় শক্তি, অপরটি প্রাণ শক্তি। জড়শক্তি অক্রিয়, প্রাণশক্তি সক্রিয়। জড়ের মধ্যে যেটুকু স্থিতি-স্থাপকতা আছে, তাকে ব্যবহার করে প্রাণশক্তি জড়ের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের অভিযান সুরু করে। সেই অভিযান নিত্য বিকাশধর্মী, সুতরাং একান্তভাবেই গতিশীল। তাঁর ধারণায় গতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতাই তার বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু তাঁর মতে আমাদের বুদ্ধিশক্তি বিশ্বের এই গতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার ঠিক পরিচয় দিতে অক্ষম। কারণ তার প্রকৃতি তার অন্তরায়। তা গতিশীল বিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করে জানতে অভ্যস্ত এবং পরে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে তাকে জোড়া দিয়ে দিয়ে তার সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ঠিক সফল হয় না, তা ধারাবাহিকতার একটি নেতিবাচক ধারণা[১] এনে দেয়। যা ঘটে তা অনেকটা সিনেমার ছবি দেখার মত। এখানে একটি ধারাবাহিক ঘটনাকে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের নিকট স্থাপন করবার জন্য তার অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন ছবি তোলা হয়। তার পর আলোক রশ্মির সামনে সেই ছবিগুলিকে দ্রুতগতিতে পরপর স্থাপন করে তাদের ছায়া ফেলা হয়। সেই ছায়া একটি ধারাবাহিকতার ভ্রম দর্শকের নয়নে সৃষ্টি করে যা প্রকৃত ঘটনা তা হতে পৃথক। প্রকৃত ধারণার আস্বাদ দিতে তা অক্ষম। এই কারণে দর্শনে সাধারণত ব্যবহৃত বুদ্ধিবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত যুক্তিমার্গের বিশ্বের প্রকৃত রূপের পরিচয় দেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সন্দেহ পোষণ করেন। এখন আমাদের উপরের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে এখানে বের্গসঁ-এর নিজস্ব কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্থাপন করা যেতে পারে।

বের্গসঁ বলেছেন বুদ্ধিবৃত্তির সার্থক প্রয়োগ ক্ষেত্র হল জড়বস্তু, কারণ সেখানে প্রাণের গতিশীলতা লক্ষণীয় নয়। সেই জন্যই পদার্থ বিজ্ঞানে তা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারে।[২] সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত হল যা গতিশীল নয়, স্থিতিশীল তার সম্বন্ধেই বুদ্ধিবৃত্তিকে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা যায়।[৩]

১ Negative

২ "When we pass in review the intellectual functions, we see that the intellect is never quite at its ease, except when it is working upon inert matter, more particularly upon solids."
Creative Esslution, chap II, Inteligence and Instinct

৩ "Suffice it was to say that to the stable and the unchangeable our intellect is attached by virtue of its natural disposition. Of immobility alone does the intellect form a clear idea." Ibid

যখন তা গতিশীল প্রাণশক্তির পরিচয় দিতে চেষ্টা করে, তা তাকে প্রথমে খণ্ডিত করে এবং পরে জোড়া দিয়ে দিয়ে তার একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি গড়ে তুলতে চেষ্টা করে।[১] সেই কারণে তা ধারাবাহিকতার যে পরিচয় সংগ্রহ করে, তা নেতিবাচক।[২]

সুতরাং বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় দিতে বুদ্ধিবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানমার্গ মোটেই উপযুক্ত নয়। তাঁর ধারণায় বিশ্বের প্রকৃতরূপ প্রকট হয়েছে জড় বস্তুকে আশ্রয় করে প্রাণ শক্তির বহু ও বিচিত্ররূপে প্রকাশের মধ্যে। তা নিত্য পরিবর্তনশীল, তা গতিধর্মী। তার পরিচয় দিতে বুদ্ধিবৃত্তি নিতান্তই অক্ষম। সেই জন্য তিনি এক নূতন জ্ঞানরীতির প্রস্তাব করেছেন। তা জীব দেহে প্রোথিত বৃত্তির ধরণের।[৩] এই বৃত্তি জীব দেহের অভ্যন্তরে তার অঙ্গীভূত হয়ে কাজ করে। তিনি এই রীতিকে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান এই নাম দিয়েছেন। তা প্রত্যক্ষজ্ঞানের মত নয়। কারণ সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগের প্রয়োজন। তা বাহির হতে লব্ধ জ্ঞান। আনুমানিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতেও দুর্বল, কারণ তা শুধু বাহির হতে লব্ধ জ্ঞান নয়, তা জোড়া দিয়ে দিয়ে জানে। এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান অন্তর হতে আপনি উদ্ভাসিত হয় এবং তাঁর ধারণায় গতিধর্মী বিকাশপরায়ণ প্রাণশক্তির প্রকৃত পরিচয় দিতে সক্ষম। সুতরাং এখানেও এই নূতন রীতির প্রয়োজনীয়তাবোধ অনুভূত হয়েছে, বের্গসঁ পরিকল্পিত তাঁর নিজস্ব দর্শনের প্রকৃতি হতে এবং তাই এই নূতন জ্ঞানরীতির প্রেরণার ভূমিকা নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে একটু স্বতন্ত্র। তাকে ঠিক সোজাসুজি তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতের সহিত সংযুক্ত করা যায় না। সেটা তার মতিগতির পথে গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন মূলত কবি। তাই হৃদয় বৃত্তি তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল এবং সেই কারণে বুদ্ধিশক্তি-নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানমার্গ হতে অনুভূতির পথে বিশ্বসত্তার পরিচয় পেতে তিনি বেশী উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। প্রথমত তিনি লক্ষ্য করেছেন দৈনন্দিন জীবনে নানা বস্তুর সহিত নিত্য যে পরিচয় ঘটে, মনন শক্তির সাহায্যে তাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করি, তা

১ "Suffice it to say that the intellect is characterised by the unlimited power of decomposing according to any law and recomposing into any system." Ibid

২ "the intellectual representation of contiguity in negative" Ibid

৩ Instinct

হতে অনুভূতিবৃত্তির সাহায্যে যে জ্ঞান পাই, তা আরও পরিস্ফুট, তা হৃদয়কে আরও আলোকিত করে। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে দেখলে একটি ফুল শুধু ফুল ; কিন্তু হৃদয়বৃত্তি দিয়ে দেখলে তা অতিরিক্ত ভাবে সুন্দর এবং আমাদের আনন্দ দেবার ক্ষমতা রাখে। এই অনুভূতি বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ প্রেমে বা পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে।

তাঁর ধারণায় মনন শক্তির সাহায্যে যে সত্যকে পাই তা শুষ্ক, তা নীরস, তা বস্তুর বাহিরের পরিচয় এনে দিতে সক্ষম, কিন্তু অন্তরের নাগাল পায় না। মনন শক্তির সাহায্যে আমরা জ্ঞেয়কে জানি মাত্র, তাকে পাই না। প্রেম-সিক্ত অনুভূতিতে আমরা জ্ঞেয়কে পাই, জ্ঞেয় সেখানে আমাদের প্রেমাস্পদরূপে ধরা দেয়।

তাই তাঁর মতে বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান বা তার মধ্যে শক্তির আবিষ্কার বাহিরের জিনিস। তা সত্তার অন্তরের নাগাল পায় না। তাঁর ধারণায় জ্ঞানের বস্তুগুলি আমাদের, তাদের জ্ঞাতাদের থেকে অনন্ত ব্যবধান বক্ষা করে চলে। কারণ জ্ঞান মিলন আনতে সক্ষম নয়। সেই কারণে মুক্তির বিভিন্ন জগৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা কবে সেইখানেই, যেখানে আমরা সত্যকে পাই ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করে নয়, আমাদের যুক্তির সাহায্যে জেনে নয়, প্রেমের পথে মিলনেব দ্বারা।[১]

তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট করতে একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। ধরা যাক এক ডাক্তারের একটি পুত্র আছে। এই ছেলের যখন অসুখ করে এবং ডাক্তার হিসাবে তার শারীরিক পরীক্ষা করেন, তখন তিনি যা পান তা হল মনন শক্তির সাহায্যে লব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। আবার পিতা-পুত্র সম্বন্ধের ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে যে ভালবাসার যোগসূত্রটি বর্তমান, তার আতিশয্যে তিনি যখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, তখন পাই প্রীতির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান। প্রথমটি হল তাঁর মতে জানা এবং দ্বিতীয়টি হল পাওয়া। তিনি বিশ্বসত্তার সহিত পরিচয়ের জন্য দ্বিতীয় পথটিকেই উপযুক্ততর বিবেচনা করেছেন।[২]

সুতরাং তাঁর মতি-গতি এবং কবি প্রকৃতিই এই নূতন রীতির প্রতি তাঁকে

১ "Knowledge is not union. Therefore, the further world of freedom awaits there where we reach truth not through feeling it by our senses, knowing it by our reason, but through the union of perfect sympathy."

Religion of Man, The Teacher

২ 'In his intimate feeling for his son he touches an ultimate truth—the truth of relationship, the truth of a harmony in the universe, the fundamental prniciple of creation." Religion of Man, The Vision

আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু প্রীতির সম্বন্ধে বিশ্ব সত্তাকে পাওয়া নির্ভর করে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির উপর। তিনি যদি সর্বেশ্বরবাদ পরিকল্পিত নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হন, তাঁর সঙ্গে প্রীতির আদান-প্রদান সম্ভব নয়। একটি জাতির সহিত তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বিশেষের প্রীতির আদান-প্রদানের সম্পর্ক সম্ভব নয়। সুতরাং প্রীতির সম্বন্ধের পথে বিশ্বসত্তাকে শুধু জানা নয়, পেতে হলে, তাঁকে ব্যক্তিরূপী সত্তা বলে গ্রহণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতিগতি এইভাবে তাঁর সাধন জীবনে ঈশ্বরের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে উৎসাহ দিয়েছিল। অপরপক্ষে তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষের চিন্তায় ব্রহ্মের যে নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াশীল রূপটি পরিস্ফুট হয়েছিল, তাকেও তিনি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। এই দোটানার তিনি সমাধান করেছিলেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বিশ্বসত্তার একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ সম্ভব। এক অবস্থায় বিশ্বের ধারক ও নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হিসাবে ক্রিয়া করেন। অন্য অবস্থায় তিনি ব্যক্তিরূপী সত্তা হয়ে প্রতি মানুষের সহিত প্রীতির আদান-প্রদান করতে উৎসুক। প্রথমটি হল কাজের প্রকাশ। সেখানে তিনি বুদ্ধিশক্তির দ্বারা গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়টি হল তাঁর আনন্দের প্রকাশ। সেখানে তিনি ব্যক্তিরূপী সত্তা এবং প্রীতির সম্বন্ধেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্যটি তাৎপর্য পূর্ণ : "এই জন্য বিশ্ব-প্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে এবং আনন্দের মূর্তি দেখতে পাই সৌন্দর্যে।"[১] বিশ্বসত্তার প্রথম রূপটিকে তিনি বলেছেন 'বিশ্বদেবতা' এবং দ্বিতীয়টিকে বলেছেন 'জীবনদেবতা'। এই জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য করেই তাঁর গীতাগুলির কবিতাগুলি রচিত।

২

বিভিন্ন প্রস্তাবিত রীতির পরিচয় ও আলোচনা

উপরের আলোচনায় কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞানের অতিরিক্তভাবে একটি নূতন জ্ঞানমার্গের প্রয়োজনীয়তা-বোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেন এই প্রয়োজনীয়তা-বোধ তাঁদের মনে অনুভূত হয়েছিল তার কারণও উপরে নির্ধারণ করবার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত আনুমানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে সকলেরই বিরাগ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

১ শান্তিনিকেতন, সৌন্দর্য

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতে যে দ্বৈত বোধ আছে তাকে অতিক্রম করতে পারে না। দ্বৈত বোধকে অতিক্রম করতে পারে না বলেই শঙ্করাচার্য তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তা খণ্ড অভিজ্ঞতা এনে দেয় বলে ব্র্যাডলি তার প্রদত্ত জ্ঞানকে অবভাস[১] বলে নিকৃষ্ট জ্ঞানের পর্যায়ে ফেলেছেন। যোগ দর্শন প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্ট অহংবোধ হতে জাত বলে, তাকে পুরুষের নিজস্ব রূপ সম্বন্ধে ধারণা দিতে অক্ষম বিবেচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানকে উচ্চ মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নন, কারণ তাঁর ধারণায় তা বস্তুর অন্তরে পৌঁছে দিতে পারে না। বের্গসঁ তার প্রতি আস্থাশীল নন, কারণ তা বিশ্বের গতিশীলতার স্বরূপ প্রকট করতে অক্ষম। পরোক্ষ জ্ঞান ত এঁদের চোখের আরও নিকৃষ্টতর স্তরের জ্ঞান, কারণ তা প্রত্যক্ষ নয়, তা বিশ্লেষণ করে করে তার পর জোড়া দিয়ে জানে। কাজেই তা দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বস্তু হল, যাঁরা সচরাচর ব্যবহৃত বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানের ওপর আস্থা হারিয়ে নূতন জ্ঞানের রীতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের এই উদ্যোগের প্রেরণা এসেছে তাঁদের নিজস্ব দর্শনের প্রকৃতি হতে। মৌলিক সত্তার তাঁরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত জ্ঞান তার সঠিক পরিচয় দিতে পারে না বা বিরুদ্ধ পরিচয় দেয় বলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বের্গসঁ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই কারণে যে তাঁর ধারণায় বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত জ্ঞান জৈবশক্তির গতিশীলতার পরিচয় দিতে অক্ষম। শঙ্করাচার্য তাকে গ্রহণ করেন নি এই ধারণায় যে তা যে জ্ঞান দেয় তা তাঁর পরিকল্পিত ব্রহ্মের অদ্বৈত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এই রীতিগুলি গড়ে উঠেছে এই সব বিশেষ দর্শনগুলির প্রতিপাদ্যকে সমর্থনের জন্য তার অঙ্গ হিসাবে। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তাঁর বিপর্যয়বাদের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে তুলনীয়। দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব গড়ে ওঠে তা যে সালম্বন ভ্রান্তির[২] সঙ্গে তুলনীয় তা তাঁর দর্শনের অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছে। ঠিক সেইভাবে এখানে বিভিন্ন জ্ঞানরীতিগুলিও বিশেষ দর্শনগুলি মৌলিক সত্তার যে ব্যাখ্যা দেয় তার সঙ্গে তাদের সঙ্গতি রক্ষার জন্য গড়ে উঠেছে।

এর ব্যতিক্রম কেবল একটি জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। তা পাই ব্র্যাডলির দর্শনে। আমাদের বুদ্ধিশক্তি যে বিশ্বের প্রকৃতরূপের পরিচয় দিতে ক্ষমতা

১ Appearance ২. Illusion

রাখে না, তা দেখিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে নূতন রীতির অন্বেষণ করেন নি। তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা বিশ্বসত্তা সম্বন্ধে অবভাসিক জ্ঞান[১] দিতে সক্ষম, কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে না। তা অবভাসকে স্থাপন করে, প্রকৃত সত্তাকে[২] স্থাপন করে না। কারণ, প্রকৃত সত্তার প্রকৃতি এমন যে তাকে জানতে গেলে জ্ঞান আর জ্ঞান থাকে না, তাকে সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে আত্মহত্যা করতে হয়।[৩] তবু তিনি নূতন রীতি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেন নি। মনের মত না হলেও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তাঁর ধারণায় তার একটি রূপ গড়ে তোলা যায়। তা খুব সন্তোষজনক না হলেও প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে একটি ধারণা বুদ্ধিবৃত্তির সীমিত ক্ষমতার মধ্যে করা যায়, এই তাঁর বিশ্বাস। তা পরিপূর্ণ না হক, সজীব না হক, তা সম্ভব। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে সেই চেষ্টাই করেছেন।[৪]

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন ওঠে তিনি কেন বলেছেন যে বিশ্বসত্তার প্রকৃত পরিচয় পেতে গেলে জ্ঞানের আত্মহত্যা করে সত্তায় পরিণত হতে হয়। এই মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে হলে তাঁর ধারণায় বিশ্বসত্তার প্রকৃতি কিরূপ তার সম্বন্ধে একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তা বোধ হয় বর্তমান আলোচনায় নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্র্যাডলির পরিকল্পনায় বিশ্বসত্তার প্রকৃতি এই রকম দাঁড়ায়।

তাঁর দর্শনের মূল কথা হল বিশ্বসত্তা জ্ঞান নয়, জ্ঞেয় নয়, বিশ্বসত্তা হলেন সকল জ্ঞাতার সকল অভিজ্ঞতার সুসমঞ্জস সমষ্টি। প্রতি ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় দেয় না, তা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, তা সমগ্র হতে বিচ্ছিন্ন। তার পৃথক অস্তিত্ব নেই, তা সমগ্রের সহিত জড়িত। সুতরাং বিচ্ছিন্ন জ্ঞান যে অভিজ্ঞতা দেয় তা বিশ্বসত্তার প্রকৃত পরিচয় দেয় না, তা অবভাস। প্রকৃত পরিচয় পাই সকল জ্ঞাতার সকল অভিজ্ঞতার সুসমঞ্জস একীভূত মিলনের মধ্যে। তাই হল প্রকৃত সত্তা। খণ্ড অভিজ্ঞতা নিজে

১ Appearance ২ Reality

৩ "Fully to realise the existence of the Absolute is for finite beings impossible. In order thus to know we should have to be and then we should not exist." Appearance and Reality, Chap. XIV

৪ "But to gain an idea of its own features—an idea true so far as it goes though abstract and incomplete—is a different endeavour. And it is a task, so far as I see, in which we may succeed." Ibid

একটি স্বতন্ত্র সত্তা নয়। তা বিশ্বসত্তা হতে পৃথক নয়, তার সঙ্গে তা যুক্ত। সুতরাং খণ্ড অভিজ্ঞতা, যাকে তিনি অবভাস বলেছেন তা প্রত্যাখ্যানের যোগ্য। কিন্তু এই বহু অবভাসের সুসমঞ্জস অবস্থিতি নিয়েই ত মূল সত্তা গঠিত। তাদের ব্যাপ্ত করেই তার অবস্থিতি, তাদের থেকে পৃথকভাবে তার অস্তিত্ব নেই।[১] কাজেই বিশ্বসত্তা হলেন সকল সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সমষ্টি। খণ্ড অভিজ্ঞতার সমষ্টি নিয়েই প্রকৃত সত্তা; কাজেই উপাদান হিসাবে তার বাহিরে খণ্ড অভিজ্ঞতার পৃথক অস্তিত্ব নেই। অপর পক্ষে অবভাস হতে মূল সত্তার পৃথক অস্তিত্ব নেই। উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে একটি সম্বন্ধ বর্তমান।[২]

সুতরাং দেখা যায় ব্র্যাডলি বিশুদ্ধভাবে চৈতন্যধর্মী এবং চৈতন্য এখানে স্বয়ং-নির্ভর জ্ঞানে রূপান্তরিত। কাজেই জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জড় এদের স্বীকৃতি তাঁর দর্শনে নেই। মানসিক জ্ঞানের বাহিরে তিনি কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। মানসিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই। বিশ্বসত্তা এই অভিজ্ঞতা পরম্পরার সুসংবদ্ধ ঐক্যমণ্ডিত সমষ্টি।[৩] এই হল ব্র্যাডলির দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন বোঝা যায় কেন তিনি বলেছেন যে জ্ঞান আত্মহত্যা করে সত্তায় রূপান্তরিত না হলে প্রকৃত সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত মার্গে তার একটি পরোক্ষ কিন্তু অসম্পূর্ণ পরিচয় নিয়েই তাঁর মতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এইভাবে আমরা অন্য দর্শনগুলি মৌলিক সত্তার প্রকৃত পরিচয়ের জন্য যে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের রীতি প্রস্তাব করেছে তাদের একে একে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি। সেই সঙ্গে তাদের প্রস্তাবিত রীতির উৎকর্ষ কতখানি এবং তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র কোথায় সে বিষয়ও আলোচনা করতে পারি। রীতিগুলির প্রাচীনতা অনুসারে আমরা তাদের আলোচনা করব। সুতরাং আলোচনার ক্রম হবে প্রথমে যোগের রীতি, তার পর শংকরাচার্য প্রস্তাবিত

১ "The Absolute is its appearance, it really is all and every one of them." Appearance and Reality, Chap. XXVI

২ "Appearance without reality would be impossible, for what then could appear? And reality without appearance would be nothing, for there certainly is nothing outside appearance.

Appearance and Reality, Chap. XXVI

৩ "Our conclusion so far, will be this that its contents are nothing but sentiant experience." Appearance and Reality, Chap. XIV

অনুভব রীতি, তার পর বের্গসঁ প্রস্তাবিত বৃত্তিভিত্তিক স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানরীতি[১] এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সম্বন্ধে মৌলিক সত্তাকে পাবার রীতি।

কোন দার্শনিক তত্ত্বের পরিবেশে যোগরীতির উদ্ভব হয়েছিল তা এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে বলা হয়েছে। এখানে যৌগিক রীতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে। তার আগে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় দুটি পক্ষের সংযোগে। এক দিকে ব্যক্তির মন ও অপর দিকে বিশ্ব। তাদের সাধারণ ভাষায় জ্ঞাতা[২] ও জ্ঞেয়[৩] বলা হয়ে থাকে। উপনিষদে তাদের ভোক্তা ও ভোগ্য বলা হয়ে থাকে। তার অর্থ আরও ব্যাপক। সাংখ্য-যোগদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষের সংস্পর্শেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের উৎপত্তি এবং তারা গঠিত হয় তেইশটি অতিরিক্ত তত্ত্ব নিয়ে। একদিকে অহংকার, মন এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন—এই তেরটি তত্ত্ব নিয়ে জ্ঞাতা গড়ে উঠেছে। তারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত, কিন্তু পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত বলে ধারণা হয়। অপর দিকে আছে পাঁচ তন্মাত্র ও পাঁচ মহাভূত। এদের নিয়ে জ্ঞেয় বস্তু তথা ভোগ্য বস্তু গড়ে উঠেছে। তেরটি তত্ত্ব নিয়ে যে জ্ঞাতাকে পাই, তাই যোগদর্শনের চিত্ত। এই চিত্তের কাজ হল জ্ঞেয়ের সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। সুতরাং তাকে চিত্তবৃত্তি বলা হয়। এই চিত্তবৃত্তি পুরুষে প্রতিভাত হলে তাকে বলা হয় জ্ঞান।

সুতরাং পুরুষকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় হতে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তা সম্ভব হয় চিত্তবৃত্তিকে জ্ঞেয়বস্তু হতে সরিয়ে নিয়ে এসে সংহত করলে। তাই যোগকে বলা হয়েছে 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ'।[৪] এই চিত্তবৃত্তি নিরোধকে পরিপূর্ণভাবে সফল করতে যোগদর্শন যোগীকে আটটি অবস্থার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার একটি পদ্ধতি নির্ণয় করে দিয়েছে। সুতরাং এই রীতিটি দীর্ঘকাল ধরে ধৈর্য সহকারে অভ্যাস করে তবে সাফল্য লাভ হয়। এ যেন ধাপে ধাপে ওপরে ওঠার মত। যে আটটি সোপানের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছাতে হবে তারা হল: (১) যম (২) নিয়ম (৩) আসন (৪) প্রাণায়াম (৫) প্রত্যাহার (৬) ধারণা (৭) ধ্যান এবং (৮) সমাধি।[৫] এদের মধ্যে প্রথম দুটির

১ Intuition based on instinct ২ Subject ৩ Object

৪ যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ ॥ যোগসূত্র ॥১॥২

৫ যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি ॥ যোগসূত্র ॥২॥২৯

অর্থ সহজেই বোধগম্য। প্রথম চাই সংযত আচরণ এবং দ্বিতীয়ত নিয়মানুবর্তী জীবন। তারা প্রস্তুতি পর্বের সমস্থানীয়। তার পর সুরু হয় সেই প্রক্রিয়াগুলি যাদের সাহায্যে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করে পুরুষের নিজস্ব প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। সেইদিকে প্রথম পদক্ষেপ হল আসন। তেমন ভাবে বসতে হবে যাতে মনের ওপর স্থিরভাব আরোপ করা সহজ হয়। তার পর আসে প্রাণায়াম। তার উদ্দেশ্য হল নিশ্বাস ও প্রশ্বাসকে নিয়মিত করে মনকে একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর নিবিষ্ট করবার উপযুক্ত করে তোলা। এর ফলে মনকে বহির্বিশ্ব হতে সরিয়ে নিয়ে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখার ক্ষমতা আসে। মনকে বহির্বিশ্ব হতে সরিয়ে নেওয়া হয় বলেই এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে প্রত্যাহার। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় হতে মন সরে আসে।

এর পরে মনকে ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তার সহিত তা তন্ময় হয়ে তার সহিত একীভূত হয়ে যায়। সেদিকে প্রথম পদক্ষেপ হল ধারণা। একটি বিশেষ ভাবকে মনে চিন্তা করে তার উপরেই মনের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। সে চিন্তার গভীরে ডুবে তন্ময় হয়ে গেলে পাই ধ্যান[১]। এই ধ্যানের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েই শেষ অবস্থায় যোগী সমাধিতে উপনীত হন। সমাধির মধ্যে আবার দুটি অবস্থা সূচিত হয়েছে। একটিকে বলা হয় সবিকল্প বা সংপ্রজ্ঞাত সমাধি। এখানে মন বহির্বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন হলেও জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং তাদের সংযোগে জ্ঞানের একেবারে বিলয় ঘটে না। এখানে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান সম্ভব। আরও গভীরে গেলে পাওয়া যায় সমাধির দ্বিতীয় অবস্থা। তাকে বলা হয় অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধি। একে নির্বীজ সমাধিও বলা হয়। এখানে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানেরও বিলয় ঘটে যায়। পুরুষ তখন নিজের প্রকৃতরূপের মধ্যে ডুবে যায় এবং প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। পুরুষ এখানে কেবল নিজের মধ্যেই সমাহিত হয় বলে সম্ভবত একে কৈবল্যপ্রাপ্তি বলে।[২]

এই হল সংক্ষেপে যোগদর্শনের উদ্ভাবিত বিশেষরীতি। সাধনা করে যে সমাধির অবস্থায় মনকে নিয়ে যাওয়া যায় তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। তবে প্রশ্ন হল, তাতে কি বিশ্বসত্তার প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়? প্রক্রিয়ার

১ Meditation

২ এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা J. C. Banerjee রচিত Fundamentals of Modern Psychology, Part I, Chap. 4 এ পাওয়া যাবে।

উদ্দেশ্যই হল জ্ঞাতৃরূপী মনকে জ্ঞেয় বস্তু হতে সরিয়ে নিয়ে এমন অবস্থায় স্থাপন করা যেখানে তা কেবল জ্ঞাতৃরূপে বর্তমান থাকে। এটি নিশ্চয় একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কিন্তু তা যে জ্ঞান আহরণ করে তা একান্ত সংকুচিত। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতে যে বিশ্বকে পাই তাকে এই রীতি পরিহার করে। এই রীতি বিশ্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। তা জ্ঞাতা হতে জ্ঞেয়কে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তার সার্থকতা সাংখ্যযোগ দর্শনে যে দুটি মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্বের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে তা সঙ্গতি রক্ষা করে। এই দর্শনের একটি ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে। তা হল কর্মফল এবং জন্মান্তরের বন্ধন হতে মুক্তি। এই যুগ্ম দর্শনের প্রতিপাদ্য হল, তা সম্ভব হয় প্রকৃতি হতে পুরুষকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে। যোগরীতি এই বিষয় সহায়। সুতরাং এই রীতির সার্থকতা নির্ভর করে এই দর্শনের প্রতিপাদ্যের গ্রহণ যোগ্যতার ওপর। সে বিষয় বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছি সেখানেই উত্তর পাওয়া যাবে।

শঙ্করাচার্যের অনুভব রীতি তাঁর প্রবর্তিত অদ্বৈত দর্শনের অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছে। সে বিষয়ও ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। তিনি জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে আমরা পাই তাকে অবিদ্যা বলেছেন এবং সেই কারণেই বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত মার্গকে ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকৃত পরিচয় দিতে অক্ষম বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর ধারণায় বিশ্বসত্তার প্রকৃতি চিৎস্বরূপ এবং তিনি ছাড়া দ্বিতীয় সত্তা নেই। সুতরাং তাঁকে জানতে হবে ভিন্ন পথে। সে পথের তিনি নাম দিয়েছেন অনুভব। কারণ তিনি বুদ্ধি-বৃত্তিকে অতিক্রম করে ব্রহ্মবোধের সহিত মনকে তন্ময় করে তার প্রকৃতির পরিচয় পেতে চেয়েছেন। রাধাকৃষ্ণন বলেন এই অনুভব আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহিত তুলনীয় নয়। এখানে জ্ঞেয় এবং তার জ্ঞান একীভূত হয়ে অনুভূত হয়। তা শিল্পানুভূতির সঙ্গে তুলনীয়।[১]

শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রের উপর রচিত ভাষ্যে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত আকারে এই অনুভব রীতির উল্লেখ করেছেন। তা হতে তার সম্বন্ধে যে ধারণা করা যায় তা এখানে সংক্ষেপে স্থাপন করা যেতে পারে। এই অবস্থায় তাঁর মতে জ্ঞাতা

১ "*Anubhava* is not the immediacy of an uninterrupted sensation, where the existence and the content of what is apprehended are not separated. It has kinship with artistic insight rather than animal perception." Indian Philosophy; Vol. II. Chap. VII, XXI

জ্ঞেয়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং এই তন্ময় ভাবের বলে কেবল আত্মা বা ব্রহ্মের বিশুদ্ধ চৈতন্য প্রকৃতিই অনুভূত হয়। তাই জন্য একে 'নিত্যজ্ঞান' বলা হয়। অবশ্য যা পাওয়া যায় তা ঠিক জ্ঞান নয়, অনুভূতির মত। তা এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদকে অতিক্রম করে আত্ম-বোধে মন তন্ময় হয়ে যায়। এই অবস্থাকে শঙ্করাচার্য তাই 'সাক্ষাৎকার' বলেছেন, এখানে ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। একে তিনি 'সম্যগ্‌দর্শন' ও বলেছেন, কারণ তাঁর মতে এই অনুভবের সাহায্যেই ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।[১] সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে তিনি এই বিশেষ রীতিকেই অবলম্বন করবার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ তাঁর পরিকল্পিত দর্শনে সাধারণ-বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত জ্ঞান মার্গ ব্রহ্মের বিকৃত পরিচয় দেয়। যা এক এবং দ্বিতীয়-বিহীন তার ওপর বহু ও বিচিত্র রূপ আরোপ করে। এই অনুভব-রীতির সমর্থনে তিনি উপনিষদের বচনেরও উদ্ধৃতি করেছেন, কারণ তাঁর ধারণায় আপ্তবাক্যও একটি শক্তিমান যুক্তি। তাই তিনি বলেছেন উপনিষদে আছে 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম', সুতরাং তাঁকে পেতে হবে অপরোক্ষানুভূতির মধ্য দিয়েই।[২]

শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত এই নূতন রীতির গ্রহণযোগ্যতা মূলত নির্ভর করে তাঁর স্থাপিত অদ্বৈতবাদের গ্রহণ যোগ্যতার উপর, কারণ তা গড়ে উঠেছে বিশ্বসত্তার তাঁর দর্শনে যে রূপ তিনি কল্পনা করেছেন তা সাধারণ জ্ঞানমার্গে পাওয়া যায় না বলে। তার গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বের প্রকৃতির বিষয় যে অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে, তাতেই বিবেচিত হয়েছে। তা বহুকে অস্বীকার করে বিশ্ব সত্তার ওপর বিশুদ্ধ একত্ব আরোপ করতে চেয়েছে। তা যুক্তি দ্বারা কতখানি সমর্থন করা যায়, তা বিশেষভাবে বিবেচনারযোগ্য। তিনি উপনিষদের বচনেব ওপর নিজের প্রতিপাদ্য সমর্থনের জন্য নির্ভর করেছেন। কিন্তু মূল উপনিষদ-গুলির বচনের মধ্যে সর্বত্র সঙ্গতি দৃষ্টি হয় না। ব্যাখ্যাও ভাষ্যকারের মতিগতি-দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এমন বচনও আছে যা বলে মনীষীরা বিজ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মের বিশ্বে প্রকট আনন্দরূপ হৃদয়ঙ্গম করেন।[৩]

১ শারীরক ভাষ্য ॥ ১॥১৩

২ "অনুভাবরূঢ়ং তু জ্ঞানফলম্ 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ" ॥ শঙ্কর ভাষ্য ॥ ৩॥ ৩ ॥ ৩২

৩ তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি মুণ্ডক ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৭

এখন আমরা বের্গসঁ প্রবর্তিত বিশেষ রীতির আলোচনা করতে পারি। তাঁর ধারণায় বিশ্বের প্রকৃত রূপ প্রকট হয় সৃষ্টিধর্মী, বিকাশপরায়ণ, গতিশীল প্রাণ-ধারার মধ্যে। জড়বস্তুর ভূমিকা গৌণ; তা অক্রিয় শক্তি। অপরপক্ষে তাঁর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত প্রচলিত জ্ঞানরীতি স্থিতিশীল জড়ধর্মী বস্তুকে বুঝতেই বেশী উপযোগী। পদার্থবিজ্ঞানে তার প্রশস্ত ক্ষেত্র মেলে। সেই কারণেই তাঁর ধারণা, প্রাণধর্মী সত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভের জন্য ভিন্ন রীতির প্রয়োগের প্রয়োজন আছে।

তাঁর ধারণায় তার সন্ধান পাওয়া যায় জীবদেহে প্রোথিত বৃত্তির মধ্যে।[১] বুদ্ধিবৃত্তি বিশ্বকে বোঝবার চেষ্টা করে বাহির হতে। কিন্তু বৃত্তিগুলি প্রাণশক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তা ভিতরের বস্তু। বুদ্ধিবৃত্তি যান্ত্রিক ভাবে বস্তুর আলোচনা করে। অপরপক্ষে বৃত্তি প্রাণীর অঙ্গ হিসাবে ভিতরে কাজ করে।[২] সুতরাং প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রোথিত বৃত্তিকে ভিত্তি করে যদি জ্ঞানরীতি উদ্ভব করা যায়, তা প্রাণশক্তির গতিশীলতার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারবে। তিনি কিন্তু লক্ষ্য করেছেন, বৃত্তির আকর্ষণ কর্মের প্রতি, জ্ঞানের প্রতি নয়। তা জীবকে প্রাণ ধারণে সহায়তা করবার জন্য নানা কর্মে প্রণোদিত করে। তবে তার মধ্যে জ্ঞানশক্তি সুপ্ত থাকে, তা না হলে জীবের কর্মকে ঠিক পথে বৃত্তি কি করে নিয়ন্ত্রিত করে? বৃত্তির মধ্যে সুপ্ত সেই জ্ঞানশক্তিকে যদি জাগিয়ে তোলা যায় এবং তার ভিত্তিতে একটি নূতন জ্ঞান মার্গ গড়ে তোলা যায়, তাই হবে মৌলিক সত্তার প্রকৃত পরিচয় পাবার প্রকৃষ্ট রীতি।[৩]

এই পথে তিনি যে নূতন রীতির প্রস্তাব করেছেন তার তিনি নাম দিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান।[৪] তাঁর ধারণায় তা গড়ে ওঠে প্রাণীর মনে প্রোথিত বৃত্তিগুলির পরিবর্ধন করে, তাদের কর্ম নয়, জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ করে। এইভাবে যেখানে বৃত্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন জ্ঞান পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

১ Instinct

২ "While intelligence treats everything mechanically instinct proceeds, so to speak, organically."

Creative Evolution, Chap. II, The Nature of Inatched

৩ "If the consciousness that slumbers in it (instinct) should awake if it were wound up into knowledge, instead of being wound off into action —it would give up to us the most intimate secrets of life." Ibid

৪ Intuition

আত্মসচেতন হয়েছে এবং নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে তা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানে' পরিণত হতে পারে।[১]

এই হল সংক্ষেপে বের্গসঁ প্রবর্তিত নূতন জ্ঞানরীতি। বলা বাহুল্য তাঁর প্রস্তাবিত দর্শনের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর দর্শন দ্বৈতবাদী। তা দুটি মৌলিক তত্ত্বকে স্বীকার করে: জড়শক্তি ও প্রাণশক্তি। দ্বৈতবাদ কতখানি গ্রহণযোগ্য তার ওপর পরোক্ষভাবে তাঁর প্রস্তাবিত রীতির উৎকর্ষ নির্ভর করে। ধরে নেওয়া যাক যে যেখানে জড়শক্তির সহিত প্রাণশক্তির সংযোগ হয়, সেখানে তা প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণে বিকাশধর্মী ও গতিশীল হয়ে ওঠে। তাঁব অভিযোগ, বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত প্রচলিত জ্ঞানমার্গ তার গতিশীলতার সঠিক পরিচয় দিতে পারে না, কারণ তার জানবার রীতি হল খণ্ড খণ্ড করে আবার জোড়া দিয়ে জ্ঞানের বিষয়কে জানা। এইভাবে যে গতিশীলতা সম্বন্ধে প্রচলিত জ্ঞান মার্গ একেবারেই ধারণা করতে পারে না, তিনি তা বলেন না। তিনি বলেন ভালভাবে জানতে পাবে না। তিনি বলেছেন তার ব্যাখ্যা নেতিবাচক।[২] অপব পক্ষে তিনি এও স্বীকার করেন যে জড়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানমার্গের রীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। সুতরাং বলা যায় তিনি দুটি রীতিকেই স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন। তবে তিনি বলতে চান যে তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র বিভিন্ন। বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে প্রচলিত জ্ঞান মার্গের উৎকর্ষ তিনি স্বীকার করেন। বিকাশধর্মী প্রাণশক্তির ক্ষেত্রে তিনি নূতন রীতির প্রস্তাব করেছেন। তিনি তাই বলেছেন যে প্রচলিত জ্ঞানমার্গকে একেবারে বর্জন করে তিনি নতন নীতি স্থাপন করতে চান নি। তিনি এও দাবী করেন না যে বুদ্ধিবৃত্তি হতে জৈব বৃত্তিব উৎকর্ষ বেশী।[৩] তিনি তাদের জন্য পৃথক প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্দেশ করেছেন।

এর পরেও আর একটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রাণীর মনে প্রোথিত বৃত্তিকে বিকশিত করে তিনি যে নূতন জ্ঞানরীতির প্রস্তাব করেছেন তা কি সম্ভব? তিনি নিজেই স্বীকার করেন তার ভূমিকা কর্ম নিয়ন্ত্রণে, তা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত

১ "By intuition I mean instinct that has become disintreested, self-conscious, capable of reflecting upon its object and of enlarging it indefinitely." Ibid

২ Negative.

৩ "I have never maintained that it was necessary to put some thing different in the place of intellect or to set instinct above it."

Introduction to Metaphysics, p. 14

কিন্তু সে বুদ্ধি আত্মসচেতন নয়। যার মতি-গতি কর্মের দিকে, যা আত্মসচেতন নয়, তাকে কি ভাবে আত্মসচেতন করে জ্ঞানমুখী করা যায় তা ভেবে পাওয়া যায় না। বের্গসঁ এর উত্তর দেন নি। সেখানেও তাঁর প্রস্তাবিত নূতন রীতির দুর্বলতা বেশ ধরা পড়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত রীতির সঙ্গে এক বিষয় বের্গসঁ-এর প্রস্তাবের আংশিক তুলনা চলে। বের্গসঁ ছিলেন দ্বৈতবাদী। তাঁর ধারণায় জড়শক্তি ও প্রাণ-শক্তির পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিকাশধর্মী প্রাণ প্রবাহ গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সে পথে যান নি। তিনি উপনিষদে প্রবর্তিত সর্বেশ্বরবাদ এক রকম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন সত্তা সেই হেতু ব্যক্তিরূপী হতে পারেন না। অপর পক্ষে তাঁর হৃদয়বৃত্তি চায় এমন মৌলিক সত্তা যার সঙ্গে প্রীতির আদানপ্রদান সম্ভব। কাজেই তিনি সর্বেশ্বরবাদকেও বর্জন করতে পারেন নি, আবার ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিলেন। এই দোটানার ফলে তিনি একটি নূতন দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করেন সর্বেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদের সহাবস্থিতি স্বীকার করে। তিনি বলেন বিশ্বসত্তার প্রকাশ দুই পর্যায়ে। এক, কাজের প্রকাশ। সেখানে তিনি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা এবং জ্ঞানের পথে সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে যেখানে তার ভাবের বা আনন্দের প্রকাশ সেখানে তিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা হয়ে ভক্তের সঙ্গে প্রীতির বিনিময় করতে উৎসুক। এইখানেই প্রীতির বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাকে শুধু জানা নয়, পাওয়া যায়।

সুতরাং বের্গসঁ এর দৃষ্টি ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। জ্ঞানমার্গকে তাঁর মত রবীন্দ্রনাথ একেবারে বর্জন করেন নি, তার প্রয়োগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র নির্দেশ করেছেন। অপর পক্ষে বিশ্বসত্তার তাঁর ধারণায় যেখানে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ ঘটে সেখানে প্রীতির সূত্রে অনুভূতি মার্গই তাঁর মতে প্রশস্ত। দুই মার্গেরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। তার রীতিকে আমরা অনুভূতিভিত্তিক প্রীতিমার্গ বলতে পারি।

এখন প্রশ্ন হল বিশ্বসত্তার ওপর কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় কিনা। স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত কবি ; তাই ঈশ্বরকে প্রীতির সম্বন্ধে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা এক জিনিস আর তা সত্যই থাকা আর এক জিনিস। যে বস্তু আকাঙ্ক্ষিত তা আছে ভাবায় তৃপ্তি আছে, কিন্তু তার থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। বাস্তবে তা না থাকলে যতই কল্পনা

করি তা আছে, তাকে পাব না। যা প্রিয় তাকে সত্য বলে ভুল ধারণা হতে পারে, এই সম্ভাবনাকে মনে রেখে আমাদের বিষয়টি আলোচনা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার কতকগুলি গুণ থাকে। প্রথম, তা তার পরিবেশ হতে বিচ্ছিন্ন এবং সেই বিচ্ছেদবোধ সম্বন্ধেও তা সচেতন। দ্বিতীয়, তা অন্য ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। প্রতি মানুষ একটি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার সুন্দর উদাহরণ। তার চেতনা আছে, সে পরিবেশ হতে বিচ্ছিন্ন। তাকে ঘিরেই তাব আমিত্ববোধ। সে শুধু ভাবে, ভালবাসে, জানে নয়, সে জানে সে এইসব ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি ব্যক্তিবিশেষ। সে জানে তার মত অন্য ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা আছে। তারা জড় পদার্থ হতে পারে না, কাবণ তাদের চেতনা নেই। তাবা নিকৃষ্ট স্তরের জীবও হতে পারে না, কারণ তাদেব চেতনাশক্তি থাকলেও তারা আত্মসচেতন নয়, তাদের ব্যক্তিত্ববোধ নেই।

জড়, জীব ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা ভিন্ন আর এক ধরণের সত্তা আছে। তাব অবস্থিতি আরও সূক্ষ্ম পর্যায়ে এবং তার প্রকৃতি আরও জটিল। জনতা তাব একটি উদাহরণ। বহু মানুষ একত্রিত হয়ে যখন একটি বিশেষ ভাবের দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তারা জনতায় পরিণত হয়। এব উপাদান দুটি। প্রথম, যে বিশেষ ভাব জনতার প্রতি ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তাই এবং দ্বিতীয়, সেই জনতার অঙ্গ হিসাবে যে ব্যক্তিগুলি আছে তারা। যতক্ষণ প্রভাব আছে ততক্ষণ তার প্রকাশ আছে এবং তা একটি সত্তারূপে অভিব্যক্ত। তাব পৃথক অস্তিত্ব নেই, জনতার অন্তর্ভুক্ত মানুষ এবং তাদের উপর প্রভাবকে অবলম্বন করেই তার প্রচ্ছন্ন পরিব্যাপ্ত প্রকাশ। এই ধরণের সত্তাকে আমবা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বলতে পারি। একটি জাতিও এই ধরণের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তার অবস্থিতি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষকে জুড়ে এবং তাদেব সম্মিলিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, আকৃতি জড়িয়ে। এই ধরণের সত্তার প্রকৃতি এমন জটিল, প্রকাশ এমন সূক্ষ্ম পর্যায়ে এবং ক্রিয়া এমন ব্যাপক ক্ষেত্রে যে তাব ব্যক্তিত্বগুণ থাকতে পারে না।

বিশ্বসত্তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারলে তবেই রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত রীতিতে তাঁর সহিত প্রত্যক্ষভাবে প্রীতির সংযোগ স্থাপন সম্ভব। সুতরাং তার সার্থকতা নির্ভর করে এই প্রশ্নের মীমাংসার ওপর। এই গ্রন্থে পরবর্তী প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে এ বিষয় সবিস্তার আলোচনা হবে। সেখানে আলোচনার

ফলে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছে যে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি অবস্থা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। পরম সত্তা এমন সূক্ষ্ম, এমন জটিল, এমন ব্যাপক যে তাঁকে মন দিয়ে অবধারণ করাই একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে সত্তা এমন ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম পর্যায়ে ক্রিয়াশীল, তাঁর নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ব্যক্তিত্বের পরিস্ফূরণের জন্য চাই খানিক পরিমাণ সীমাবদ্ধভাব, খানিক পরিমাণ আমিত্ববোধ। দুটি গুণই বিশ্বসত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয় না। যিনি সকল দেশে, সকল কালে, সকল বস্তুতে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল, তাঁকে ব্যক্তির সীমার মধ্যে ধরে রাখা যায় না।

মনে হয় পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রতিপাদ্য হতে দূরে সরে এসেছিলেন। যতদিন তাঁর মনে জীবনদেবতাতত্ত্ব ক্রিয়াশীল ছিল ততদিন নিজের মনে বিশ্বসত্তাকে ব্যক্তিরূপে স্থাপন করে তিনি 'সীমার মাঝে অসীমের' লীলা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সে আকর্ষণ শিথিল হয়ে যায়। তার মূল কারণ মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে যে আদর্শ তাঁর মনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে তা সঙ্গতি রক্ষা করে না। তাঁর ধারণায় আদর্শ ধর্ম হবে তাই যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির প্রয়োগের সমান সুযোগ দেবে। জীবনদেবতাতত্ত্বে কেবল হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র আছে, অন্য দুটির নেই। সেই কারণে দেখি তিনি তাঁর নিজস্ব মানুষের ধর্মের আদর্শের ব্যাখ্যায় ক্রমশ এই পথ হতে সরে এসেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ। বুদ্ধিশক্তির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁকে প্রীতি করে এবং তাঁর সেবা করেই ঈশ্বরকে সব কটি বৃত্তি দিয়ে পাওয়া যায়। এই ভাবে তাঁর সাধনজীবনে যে পরিণত মতটি গড়ে উঠেছিল তা মানবিকতাবাদী হয়ে উঠেছিল।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন: "আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, কর্মবৃত্তি আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রকাশ করিলে, তবে আমাদের পক্ষে আমাদের অধিকার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মদ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই।"[১] এই প্রসঙ্গেই তাঁর মতটি আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেছেন:

"মাতা যেমন একমাত্র মাতৃ সম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা

১ ধর্ম

প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর ও অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি।"

সেই কারণে পরবর্তীকালে তাঁর প্রীতির ক্ষেত্র জীবনদেবতায় সীমাবদ্ধ না হয়ে বিশ্বমানবের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বমানবের সহিত প্রীতি বিনিময় জীবনদেবতার সহিত প্রীতি বিনিময়ের স্থান অধিকার করে নিয়েছিল; নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশ তাঁর এই পরিবর্তিত মতটির প্রেরণা :

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।[১]

(৩)

মনন মার্গের উৎকর্ষ

এখন আমরা বিশ্বসত্তার প্রকৃতি জানবার রীতি প্রসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত মনন মার্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। প্রথমেই একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। মনন মার্গ দুটি অবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করে। প্রথম অবস্থায় তা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় বিশ্ব সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আংশিক জ্ঞান লাভ করে। সেই জ্ঞান খণ্ডজ্ঞান কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞান। তাদের অবলম্বন করে আনুমানিক জ্ঞান গড়ে ওঠে। যেখানেই ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সেখানেই আনুমানিক জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে। আনুমানিক জ্ঞানে সার্বিক সংজ্ঞার ভূমিকা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এমন কি প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও যে সার্বিক সংজ্ঞার একটি ভূমিকা আছে তাও আলোচিত হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বহির্জগতের সংযোগ ঘটলে মন যা পায় তা হল ইন্দ্রিয়বাহিত তথ্য মাত্র।[২] তাকে প্রত্যক্ষজ্ঞানে[৩] পরিণত করতে একটি সার্বিকের সহিত তাকে যুক্ত করতে হয়।

১ গীতাঞ্জলি, ৯৮ ২ Sense data ৩ Perception

দ্বিতীয় কথা হল মনন মার্গের জ্ঞান এইভাবে দুই পর্যায়ে গড়ে উঠলেও এবং উভয় ক্ষেত্রেই সার্বিক সংজ্ঞার একটি সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও, তাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি পার্থক্য টানা যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান খুব স্পষ্ট, তা অনেকটা হৃদয়বৃত্তির অনুভূতির সঙ্গে তুলনীয়। আমি যখন কারও জন্য প্রীতি অনুভব করি, তা যেমন প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়, আমি যখন চোখের সামনে একটি গাছ দেখি বা কাণে মেঘের ডাক শুনি, তাও প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। সেই জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বলা হয়। তুলনায় আনুমানিক জ্ঞানে এই প্রত্যক্ষ বোধের অনুভূতি নেই। তাতে যেন মনন বৃত্তির ভূমিকাটিই প্রধান। তাই তা তত স্পষ্ট নয়; তা সূক্ষ্ম পর্যায়ের জ্ঞান এবং তাই নীরস।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক দিকে যেমন প্রত্যক্ষজ্ঞানের তুলনায় আনুমানিক জ্ঞান নীরস হয় এবং জ্ঞেয় বিষয় হতে দূরে সরে আসে, অপরদিকে তেমন আনুমানিক জ্ঞানের একটি বিশেষ উৎকর্ষ আছে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্র অতি সীমাবদ্ধ। যেটুকু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাগালের মধ্যে আসে সেটুকুই প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। অপরপক্ষে আনুমানিক জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাহীন। তা সকল মানুষের, সকল কালের, সকল দেশের অভিজ্ঞতাকে পরিব্যাপ্ত করবার ক্ষমতা রাখে।

উপরে যে আলোচনা হয়েছে তা হতে দেখা যাবে যে যাঁরা প্রচলিত জ্ঞান মার্গের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, আনুমানিক জ্ঞানই তাঁদের বিশেষ সমালোচনার বিষয় হয়েছে। আনুমানিক জ্ঞানের যা দুর্বলতা তাই তাঁদের তার প্রতি বিরূপ করেছে। অবশ্য একথাটি ঠিক যে তাঁদের প্রস্তাবিত জ্ঞান অর্জনের রীতিগুলি তাঁরা যে বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন এবং সেখানে বিশ্ব-সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেছেন তার উপযুক্ত করেই তাঁদের রীতিগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আনুমানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁদের যে মূল অভিযোগগুলি আছে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সেই অভিযোগগুলি হল এই: (১) আনুমানিক জ্ঞানে প্রত্যক্ষজ্ঞান বা অনুভূতির স্পষ্টতা বা জ্ঞেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে না; (২) পরোক্ষজ্ঞান খণ্ড জ্ঞানকে জুড়ে জুড়ে ব্যাপক জ্ঞানের বিস্তার ঘটায়; জোড়া দিয়ে দিয়ে জানায় যে সামগ্রিকতাবোধ এক দৃষ্টিতে জানার সামগ্রিকতা হতে তা অস্পষ্ট; পরোক্ষজ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর বাহিরে যেতে পারে না, কাজেই তার সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করা

দুঃসাধ্য ; (৩) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্ভব নয় ; যেমন প্রাণ ধারার গতিশীলতার পরিচয় দেবার বা নির্বিশেষ চিৎস্বরূপ অদ্বৈতবাদের ব্রহ্মের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করবার ক্ষমতা তার নেই।

এদের মধ্যে শেষের অভিযোগটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অদ্বৈতবাদের বিমূর্ত একত্ববাদ[১] যদি যুক্তি দ্বারা সমর্থনযোগ্য না হয়, আনুমানিক জ্ঞানের অক্ষমতার কোনো প্রশ্নই উঠে না। প্রাণধারার গতিশীলতা সম্বন্ধে ধারণা করতে যে আনুমানিক জ্ঞান একেবারেই অক্ষম বের্গসঁ ঠিক সে কথা বলেন না। তিনি বলেন তা নেতিবাচক জ্ঞান দেয়। বৃত্তি ভিত্তিক স্বপ্রকাশ জ্ঞান[২] যেমন ভিতর থেকে তাকে অনুভব করতে পারে, আনুমানিক জ্ঞান তা পারে না—সম্ভবত এই তাঁর অভিযোগ। তা পরোক্ষ জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম।

এ কথা ঠিক যে পরোক্ষ আনুমানিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মত জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সংযোগ ঘটায় না এবং কাজেই তা তুলনায় এত স্পষ্ট নয়। তার প্রকৃতি হেতুই এই দুর্বলতা এসে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল সেই কারণে কি আনুমানিক জ্ঞানকে বর্জন করতে হবে ? বর্জন করার প্রশ্ন বিবেচনার যোগ্য হত, যদি তার পরিবর্তে কোন উপযুক্ততর বিকল্পরীতির সন্ধান পাওয়া যেত। কিন্তু উপরের আলোচনা হতে দেখা যাবে তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। সুতরাং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত মনন মার্গ ছাড়া গতি নেই। মনন মার্গ মানেই প্রত্যক্ষ বা আনুমানিক জ্ঞানের সহযোগে জ্ঞান-অর্জনের রীতি। প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয় হতে জ্ঞান তার উপাদান সংগ্রহ করে এবং তাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে আনুমানিক জ্ঞান। এই আনুমানিক জ্ঞানের বিস্তারের সীমা নেই। সেই জন্যই বিশ্ব সত্তার মত ব্যাপক বিষয়ের পরিচয় পেতে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত মনন মার্গ ই আমরা অবলম্বন করতে বাধ্য।

মনন মার্গে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান ও আনুমানিক জ্ঞানের ভূমিকা হল পরস্পরের সহযোগিতার ভূমিকা। তারাই পরস্পর হাত ধরাধরি করে সম্মিলিত চেষ্টার ফলে দুস্তর জ্ঞান সাগর পাড়ি দেবার ক্ষমতা রাখে। সেটা ভাল বোঝা যায় তাদের পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকা হতে। সুতরাং এখানে তার একটু সবিস্তার পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১ Abstruct Monism

২ Intuition based on instinct

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সঞ্জাত প্রত্যক্ষজ্ঞান বাহিরের বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঘটায়। সেই জন্য তা এত রঙীন, তা এত স্পষ্ট। আবার সেই কারণেই তার জ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত। আমাদের প্রতিপাদ্যকে সহজবোধ্য করতে একটি সচরাচর দৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। ধরা যাক, আমরা একটি প্রকাণ্ড অজানা সহরের মধ্যে স্থাপিত হয়েছি। সেখানে বড় বড় রাস্তা, বড় বড় বাড়ী, সুদৃশ্য উদ্যান প্রত্যক্ষ করছি। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা একটি বিশেষ বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান, প্রত্যেকেই বেশ সজীব অনুভূতি, কিন্তু প্রত্যেকেই পৃথক। তারা সমগ্র সহরের একটা ধারণা এনে দেবার ক্ষমতা রাখে না। এই খানেই আসে আনুমানিক জ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্র। তা সেই ভিন্ন অবস্থায় আহৃত বিভিন্ন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সংগ্রহ করে, পরস্পর সংযুক্ত করে সাজিয়ে সমগ্র সহর সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তোলে। এই ভাবেই মানসপটে তাদের পরস্পর সংযোগ স্থাপিত হলে আমাদের মনে এই সহর সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ছবি গড়ে ওঠে। তখন সহরের কোথাও গেলে দিগ্‌ভ্রান্ত হতে হয় না। তার কোন অংশে আছি বোঝা যায় এবং বিশেষ গন্তব্য স্থানে পৌছানো সহজ হয়। এই রূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ভিত্তি করে মনন শক্তির সাহায্যে লব্ধ ব্যাপক জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা একটি বিরাট বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞানের সহযোগিতায়ই সেটা সম্ভব হয়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানকে ব্যবহার করে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত যে মনন শক্তি ক্রিয়া করে তার কর্মক্ষেত্র কত ব্যাপক, তা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেও আর ও ভালভাবে বোঝা যাবে। আমরা কোন বস্তুকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি, কোন কোমল অনুভূতিকে হৃদয়বৃত্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি, আবার এদের বিষয় চিন্তা ও করতে পারি। এইভাবে শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয় সংগৃহীত প্রত্যক্ষজ্ঞান নয়; হৃদয়বৃত্তি অনুভূত অভিজ্ঞতা ও মনন ক্রিয়ার বিষয় হতে পারে। হৃদয় বৃত্তির অনুভূতি, যেমন দয়া, মায়া, মমতাবোধ; ধর্ম সম্পর্কিত অনুভূতি, যেমন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ; এবং শিল্পবস্তুর রসগ্রহণ হতে যে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি ঘটে[১]—তারা ও মনন শক্তির নাগালে এসে পড়ে। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষজ্ঞান বা এই সকল বিশেষ শ্রেণীর অনুভূতি শুধু নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, নিজেদের অতিক্রম করে তারা অন্য বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হবার ক্ষমতা রাখে না। যা অপ্রত্যক্ষ, জ্ঞানেন্দ্রিয় জাত

১ Aesthetic Emotion

প্রত্যক্ষজ্ঞান তার পরিচয় দিতে পারে না। হৃদয়বৃত্তির কাছে যা ধরা দেয় না, তা হৃদয়বৃত্তির নাগালের বাহিরে। ধর্মানুভূতি বা শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। একমাত্র মনন শক্তিই সর্বত্র চলবার, সব কিছু জানবার, সকল বিচিত্র ক্ষেত্রে লব্ধ বিভিন্ন খণ্ডজ্ঞানকে একত্রিত করে ব্যাপক জ্ঞান গড়ে তোলবার ক্ষমতা রাখে। এমন কি মনন শক্তিকে ও মনন শক্তি জানবার ক্ষমতা রাখে। কোন বিরাট বস্তুকে জানতে প্রত্যক্ষজ্ঞান[১] বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি[২] যথেষ্ট নয়। তারা যে তথ্য সংগ্রহ করে তার ওপর মননশক্তির প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তা না হলে সামগ্রিক জ্ঞান সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষজ্ঞান বা অনুভূতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, আনুমানিক জ্ঞানের ক্ষমতার সীমা নেই।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে জ্ঞানেন্দ্রিয় জাত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন আনুভূতিক অভিজ্ঞতা সরল বটে, উজ্জ্বল বটে, কিন্তু তাদের ক্ষেত্র অতি সীমাবদ্ধ। আমরা এক দৃষ্টি ক্ষেপে যেটুকু দেখি বা হৃদয় বৃত্তি দিয়ে যেটুকু অনুভব করি, সেটুকু ভালই দেখি বা ভালই অনুভব করি ; কিন্তু তার বাহিরে যেতে পারি না। একাধিক দৃষ্টিক্ষেপে বিভিন্ন সময় যা দেখেছি বা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি, আমি ব্যতিরেকে অন্য যা দেখেছে বা অনুভব করেছে—সকলের খণ্ড প্রত্যক্ষজ্ঞান বা পৃথক অনুভূতিকে ভিত্তি করে যে ব্যাপক জ্ঞান সম্ভব তা মনন শক্তির সাহায্যে আনুমানিক জ্ঞানকে অবলম্বন করেই সংগ্রহ করতে হবে।

আমাদের প্রতিপাদ্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত একটি গল্প এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পটি হল এই : বনে একটি জীব বাস করত। সেই বনের ভিতর দিয়ে নানা মানুষ নানা সময় যাতায়াত করত। তাদের মধ্যে একদিন সেই জীবটির গায়ের রঙ নিয়ে আলোচনা হল। কেউ বলল তার রঙ লাল, কেউ বলল সবুজ, কেউ বলল নীল ইত্যাদি। প্রত্যেকেই নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়, কাজেই সমস্যার মীমাংসা হয় না। তখন ভাগ্যক্রমে এসে পড়ল একটি নূতন মানুষ। সে বলল নিজে সব সময় বনের মধ্যেই বাস করে ; কাজেই তার বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সমস্যার সমাধান করবার ক্ষমতা রাখে। সে বলল, রামকৃষ্ণের ভাষায়, "তোমরা যা যা বলেছ সব সত্য—সে কখনও লাল, কখনও

১ Perceptual knowledge
২ Emotive Experience

সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল আরও সব কত কি হয় বহুরূপী। আবার কখনও দেখি কোন রঙ নেই।"[১]

শেষের ব্যক্তিটি যে এইরূপে বহুরূপী সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বিবরণ দিতে সমর্থ হয়েছিল তার কারণ সে মননশক্তির সাহায্যে বিভিন্ন খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছিল। কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে থাকলে সে বিভ্রান্ত হত, নানা খণ্ড অনুভূতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে, তাদের উৎপাদক বস্তুর একত্ব উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তার থাকত না। এইখানেই আনুমানিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞান বা হৃদয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত নানা অনুভূতি যে অভিজ্ঞতা আনে, তারা বিশ্ব সম্বন্ধে খণ্ডিত পরিচয়ই দেবার সামর্থ্য রাখে। আপাত দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য, জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে তাকে খণ্ডন করেই তবে আমরা ব্যাপক জ্ঞানের পথে অগ্রসর হই। মনন মার্গ খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশ্লেষণ করে ঠিক, কিন্তু সেখানে তার কাজ শুধু আরম্ভ হয়, তারপর তাদের জোড়া দিয়ে দিয়ে তা ব্যাপক জ্ঞান সঞ্চয় করে। তা ছাড়া কোন বিরাট বস্তুকে জানবার ভিন্ন উপায় নেই।

সুতরাং প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় জাত জ্ঞান এবং অনুভূতি বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত খণ্ড অভিজ্ঞতার কাজ যেখানে হয় সারা, মনন মার্গের কাজ সেখানে হয় সুরু। প্রত্যক্ষজ্ঞান বা বিভিন্ন শ্রেণীর অনুভূতি একবারের চেষ্টায় সমগ্র বিশ্বের পরিচয় পায় না বলেই মননমার্গের প্রয়োজন হয়। পরস্পরের মিলিত চেষ্টাতেই বিশ্বসত্তা সম্বন্ধে ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান সম্ভব। তারা পরস্পরের সহযোগিতা না করে পৃথক পথে গেলে তা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র খণ্ডজ্ঞান বা খণ্ড অনুভূতি নির্ভর অভিজ্ঞতা বিশ্বসত্তার খণ্ড পরিচয় এনে দিতেই সক্ষম। অপর পক্ষে আনুমানিক জ্ঞান শূন্যের উপর কাজ করে না, খণ্ডজ্ঞান বা অনুভূতিকে অবলম্বন করেই তা গড়ে উঠতে পারে। এইখানেই মননশক্তির বিশেষ উৎকর্ষ। তা খণ্ডজ্ঞান ও খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করে, তাদের মধ্যে পরস্পার সঙ্গতি স্থাপন করে মানসপটে একটি বিরাট বস্তুর অখণ্ড মূর্তি গড়ে তুলতে পারে। তার মধ্যেই তার সমগ্ররূপের পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। আমরা ভারতের

১ রামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭১

মানচিত্র ভূগোলের বইতে দেখেছি। মানস নেত্রে তার একটি ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। এই মানচিত্রকে ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠেছে। তার সাহায্যে সমগ্র ভারতের একটি অখণ্ড রূপের পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু একটি মাত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যে যেমন তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হত না, তেমন অসংখ্য মানুষের ভারতের বিভিন্ন অংশের খণ্ড জ্ঞানকে পৃথক করে রাখলে ও তা সম্ভব হত না। সরজমিনে কত বিভিন্ন জরিপকারক তার বিভিন্ন অংশের পৃথকভাবে জরিপ করেছে। তারপর যে খণ্ড খণ্ড নকসাগুলি গড়ে উঠেছে তাদের পরস্পরের মিল করে এবং সংযুক্ত করে, তাদের একত্র সাজিয়ে তারপর আমরা পেয়েছি ভারতের অখণ্ড মানচিত্র।

আমরা আবার বলব যে কোন বিরাট বস্তুকে জানতে হলে আমাদের এই পথই অবলম্বন করতে হয়। ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং হৃদয় বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত খণ্ড অনুভূতি বিশ্ব সম্বন্ধে খণ্ড পরিচয় এনে দেয়। মনন শক্তি সেই খণ্ড অভিজ্ঞতা গুলিকে জোড়া দিয়ে দিয়ে আবিষ্কার করে তার সমগ্র অখণ্ড রূপ। সুতরাং জোড়া দিয়ে দিয়ে এককে পাওয়া যায় না, সে কথা ঠিক নয়। বরং প্রত্যক্ষজ্ঞান বা অনুভূতিবৃত্তি খণ্ড অভিজ্ঞতা নিয়েই পড়ে থাকত যদি না মননশক্তি তাদের সংযুক্ত করে অখণ্ড রূপে তাদের গড়ে তুলত। জোড়া না দিয়ে সামগ্রিক জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় পথ নেই। রাজমিস্ত্রি বাড়ী তৈরি করে। উপাদান হিসাবে সে পায় ছোট ছোট ইট। তাদের বালি আর সিমেন্টের মসলার সাহায্যে জুড়ে জুড়ে সে একটি সমগ্র বাড়ী বানায়। মননশক্তির কাজ অনেকটা তার অনুরূপ। প্রত্যক্ষজ্ঞান বা হৃদয় বৃত্তির অনুভূতি এক একটি পৃথক ইটের মত। তাদের যোগসূত্র আবিষ্কার করে, তাদের জুড়ে মননশক্তি সামগ্রিক জ্ঞানের বাড়ী গাঁথে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি যা দেয় তা খণ্ড আকারে পাই বলেই তাদের জোড়া দিয়ে অখণ্ড জ্ঞান গড়ে তুলতে হয়।

মননশক্তির বিরুদ্ধে এমনও একটা অভিযোগ আসে যে এখানে যে শক্তি ক্রিয়া করে তা বিশ্বের অঙ্গীভূত। যা একটি বস্তুর অঙ্গীভূত তার পক্ষে সেই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। এই ধারণা বেড়ে উঠেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য পরিচিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা হতে। এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পৃথক। জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। জ্ঞেয় বস্তু বাহির হতে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যে তথ্য দেয় তার সাহায্যেই জ্ঞাতা তাকে জানে। সুতরাং যা বিশ্বের অঙ্গীভূত তা বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারবে না। কাণ্ট এই

ধবণেব অভিমত পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের একটি বচনে ও তার প্রতিধ্বনি পাই। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

বাহিরে যাহার
কিছুতে নারিব যেতে আদি অন্ত তার,
অর্থ তার, তত্ত্ব তার বুঝিব কেমনে
নিমেষের তরে ?[১]

যার বাহিরে যাওয়া যায় না তাকে যে জানা অসম্ভব, এ কথাও আমাদের অভিজ্ঞতা সমর্থন করে না। আমাদের মনের মধ্যেই তার প্রতিবাদ করবার মত প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের মন সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করি তার কথাই ধরা যাক না। আমাদের যে মন চিন্তা করে, মনন করে, বাহিরে অবস্থিত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেই মন নিজের সম্বন্ধে নিজেই জ্ঞান আহরণ করবার ক্ষমতা রাখে। তার জন্যও তার নিজের বাহিরে যাবার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বে সব থেকে ঘনিষ্ঠতম বা প্রত্যক্ষতম জ্ঞান যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তা হল নিজের মনের সম্পর্কে জ্ঞানই। সেই কাবণেই দেকার্ত আত্মজ্ঞানকে ভিত্তি করেই তাঁর দর্শনকে গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছিলেন। মননশক্তির এই বিস্ময়কর ক্ষমতা তার উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।

অপর পক্ষে যা এত দূরের বস্তু বা যার সহিত কালের অনেক ব্যবধান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা হৃদয় বৃত্তির অনুভূতি তা নাগালের বাহিরে। এদের প্রয়োগ ক্ষেত্র কেবল বর্তমানকালে প্রত্যক্ষ পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মননশক্তি অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলেই তার প্রয়োগ ক্ষেত্র অতীতে ও ভবিষ্যতে এবং অপ্রত্যক্ষলোকে বিস্তারিত হতে পারে। অনুমানের সাহায্যেই পৃথিবীর অতীতের ইতিহাস বা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হবে বিজ্ঞান বা দর্শন যে রীতি প্রয়োগ করেছে তার থেকে উৎকৃষ্টতর রীতি পাওয়া যায় না। তা মানুষের প্রকৃতিগত শক্তিকে ভিত্তি করে এবং পরিবর্ধিত করে গড়ে উঠেছে। তার কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক জ্ঞান আহরণ করতে, বিশেষ করে দার্শনিক জ্ঞান সংগ্রহ করতে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান এবং অনুভূতিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতাকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে, মননশক্তির সাহায্যে আনুমানিক জ্ঞানই আমাদের সব থেকে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।

১. নৈবেদ্য, ৮৮

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মতত্ত্ব

১

ধর্মবোধের প্রকৃতি ও তার সম্পর্কিত সমস্যা

ধর্মবোধ মানুষের একটি সহজাত মৌলিক বৃত্তি। তার উৎপত্তি ঘটেছে খানিকটা তার প্রকৃতি হতে এবং খানিকটা তার পরিবেশ হতে। প্রথমত দেখা যেতে পারে তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রখর। সেই কারণে দ্বিতীয়ত, সে তার পরিবেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে ভয় পায়। সে অতীতকে স্মরণে ধরে রাখতে পারে, ভবিষ্যতের চিন্তা করতে পারে। তাই তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিপদ আশঙ্কা করে আতঙ্কিত হয়। অপরদিকে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাও মনে পোষণ করতে পারে। এই বিভিন্ন অবস্থার সমাবেশ এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রভাবেই মানুষের ধর্মবোধ গড়ে উঠেছে।

বিষয়টি ভাল করে বোঝা যাবে ইতর জীবের সহিত এ বিষয় তার তুলনা করলে। অন্য জীবের বুদ্ধিশক্তি মানুষের মত প্রখর নয়। তারা অতীত বা ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে না। সার্বিক সংজ্ঞার প্রয়োগ করবার ক্ষমতা তাদের নেই; কাজেই পরোক্ষ ব্যাপক জ্ঞান তাদের নাগালের বাহিরে। তাদের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের ভার প্রকৃতিই নিজ হস্তে গ্রহণ করেছে। আত্মপুষ্টি, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার কাজে তাদের মানুষের মত চিন্তা করে কাজ করতে হয় না। তাদের জৈবিক ক্রিয়া বর্তমানে সীমাবদ্ধ। তাই তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি মানুষের থেকে প্রখর। তাদের ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি মানুষের থেকে বেশী প্রখর। খাদ্যসংগ্রহের জন্য বা শত্রু হতে আত্মরক্ষার জন্য এগুলির শক্তিমান হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তারা অতীতকে মানুষের মত স্মরণ শক্তির সাহায্যে ধরে রাখতে পারে না, ভবিষ্যতের ভাবনা ও ভাববার তাদের প্রয়োজন নেই। সুতরাং বুদ্ধিশক্তি অত্যন্ত সংকুচিত ক্ষেত্রে কাজ করে। অনুরূপভাবে বংশরক্ষার প্রয়োজনে যেটুকু হৃদয়বৃত্তির দরকার হয় তাতেই তাদের দয়া, মায়া, মমতাবোধ সীমাবদ্ধ। হৃদয়বৃত্তির পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজন নেই। কারণ সন্তানকে মানুষ করতে নিজের মধ্যে প্রোথিত বৃত্তি[১] দ্বারা তারা

১. Instinct.

পরিচালিত হয়। পাখী বাসা বাঁধে বৃত্তি পরিচালিত হয়ে। স্তন্যপায়ী জীব সন্তানকে পুষ্টি দেয় বৃত্তি পরিচালিত হয়ে। সন্তানদের শৈশব মানুষের তুলনায় অতি অল্পকাল স্থায়ী। অতি দ্রুত তারা আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। কাজেই প্রকৃতি এ বিষয় মূল ভূমিকা নেবার ফলে হৃদয়বৃত্তির প্রসারের সুযোগ তাদের ঘটে না। সন্তানের জন্য খানিকটা মমত্ববোধ থাকে। উচ্চতর পর্যায়ের অনুভূতি, যেমন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি—এগুলি তাদের নাগালের বাহিরে।

মানুষের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। সে বৃত্তিচালিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে না। জীবনে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সে বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে তাদের সমাধানের চেষ্টা করে। সে সাধারণ জীব হতে অনেক বেশী জানে, অনেক বেশী বোঝে। তার হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রখর। সে উচ্চ ধরণের অনুভূতি অনুভব করবার ক্ষমতা রাখে। সে প্রীতি করতে পারে, ভক্তি করতে পারে, শ্রদ্ধা করতে পারে। মনে যাকে ধারণা করা যায় না, তার কথা ভেবে তার বিস্ময়বোধ জাগে। তার কৌতূহলবৃত্তি, তার জানবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রখর। তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়, যার সে ঠিক উত্তর খুঁজে পায় না। এই যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সে কোথা হতে আসে সে জানে না। মৃত্যুর গভীর রহস্য সে ভেদ করতে পারে না। গীতায় তাই বলা হয়েছে জীবনের আদিও রহস্যে আবৃত, অন্ত ও রহস্যে আবৃত ; মাঝখানে খালি একটুখানি আলো। তাকে ঘিরেই আমাদের জীবন। সেই জীবন স্থাপিত হয়েছে নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। অন্য জীবের প্রতিকূলতা ত আছেই, অতিরিক্ত আছে প্রকৃতির প্রতিকূলতা। ঝড়ের তাণ্ডব, বিদ্যুতের দাহিকা শক্তি, ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার সহিত সে পরিচিত। এই পরিবেশের মধ্যে অবলম্বনের জন্য সে সহায় খোঁজে। বিপদ হতে মুক্তির জন্য, নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সে অন্য বৃহত্তর শক্তির সহায়তা কামনা করে। এই অবলম্বনের আকূতিই হল ধর্মবোধের বীজ। তার বুদ্ধি তাকে বৃহত্তর শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে, তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বোধ তার মনকে সেই শক্তির আশ্রয় নিতে উন্মুখ করে। সেই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাবোধ আবার পরিস্ফুট হয় তার অসহায় ভাবের জন্য। হৃদয়বৃত্তিই তার জনক। শান্তির জন্য, নির্ভরের জন্য, মনোবল সঞ্চয়ের জন্য তার শক্তি প্রয়োজন। এই ভাবে তার পরিবেশ, বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে অবলম্বন করে তার ধর্মবোধ অঙ্কুরিত হয়।

প্রথম অবস্থায় মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত।

তা একেবারেই ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তার মধ্যে দুটি আকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করত। প্রথমত প্রতিকূল পরিবেশ হতে আত্মরক্ষার জন্য সে শক্তিমত্তর সত্তার সাহায্য কামনা করত। হিংস্র জন্তু হতে বিপদ, শত্রুপক্ষের আক্রমণ হতে বিপদ তাকে আশঙ্কাগ্রস্ত করত। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির প্রতিকূলতাও তাকে সন্ত্রস্ত করত। বন্যার তাণ্ডব, ঝড়ের ধ্বংস মূর্তি, ভূমিকম্পের আক্রমণ হতে ও সে পরিত্রাণ চাইত। সে ভাবত এগুলি এক প্রচ্ছন্ন প্রতিকূল শক্তির অত্যাচার। সুতরাং দুটি প্রয়োজন সে বোধ করত। প্রথম, এই শক্তিকে সন্তুষ্ট করা এবং দ্বিতীয়, তার সাহায্যে শত্রুর বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষায় সহায়তা লাভ করা। এই হল প্রথম আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা আতঙ্কদ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, তা অনুপ্রাণিত আত্মপ্রসারের ইচ্ছাদ্বারা। আমি ভাল থাকব, আমার ঐহিক সমৃদ্ধি ঘটবে, আমার সম্পদ বাড়বে, এই ধরণের ইচ্ছা। বৃহত্তর শক্তি হতে এ বিষয় সহায়তা ও তার বিশেষ আকাঙ্খার বস্তু ছিল। এখন এই দুটি প্রয়োজনবোধই ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে, তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়ে, প্রথম অবস্থায় এই দুই ধরণের আকাঙ্খা পূরণের জন্যই প্রার্থনা নিবেদিত হত। ধর্মবোধের বহিঃপ্রকাশ তখন এইভাবে এক শক্তিমান সত্তার আবিষ্কার করে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য, তাঁর পূজা ও সন্তোষ উৎপাদনের পর বিপদ হতে ত্রাণ এবং সমৃদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা নিবেদিত হত।

এখন প্রশ্ন হল কার কাছে এই ধরণের প্রার্থনা নিবেদিত হবে। তাও ঠিক হয়েছে ধীরে ধীরে। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই উপাসনা ও প্রার্থনার পাত্র হিসাবে একদিন মানুষ ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছে। কিভাবে এই আবিষ্কার ঘটেছিল সে বিষয় নানা দার্শনিকের নানা মত। যেখানে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য নেই সেখানে এমন মতানৈক্য ঘটাই স্বাভাবিক। তবে যুক্তির ওপর নিভর করে তার একটি সম্ভাব্য ইতিহাস আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

আমাদের আলোচনাটি হার্বার্ট স্পেন্সার-এর মত দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। তাঁর ধারণায় সকল ধর্মের মূলে আছে পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের রীতি।[১] কিন্তু এই মত বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না।

১. "ancestor worship is the root of every religion," Principles of Sociology Vol. I.

কারণ মানুষ পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের আকৃতি অনুভব করে তাঁদের সহিত একটি ব্যক্তিগত প্রীতির সম্বন্ধ থাকার জন্যই। কিন্তু এখনি যে আলোচনা হল তা হতে দেখা যাবে যে উচ্চতর শক্তির সহায়তা মানুষ যখন তার শৈশবের যুগে খুঁজত তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার বা প্রীতির মনোভাব পোষণ করবার মত মানসিক পরিণতি বা হৃদয় বৃত্তির প্রসার তখন ও তার ঘটে নি। পরবর্তী আলোচনা হতে বুঝব সেই বোধ এসেছিল অনেক পরে।

তবে মনে হয় প্রথম অবস্থায় মানুষের মনে এমন একটি চেতনা এসেছিল যে মানুষকে সাহায্য করতে পারে বা তার অনিষ্টসাধন করতে পারে এমন বৃহত্তর শক্তি বিশ্বে আছে। তা বিভিন্ন জড়বস্তুকে অবলম্বন করে থাকতে পারে, তা পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রে আবিষ্কৃত হতে পারে। জড় বস্তুতে কোন শক্তির অবস্থান ঘটেছে এই ধারণায় জড় বস্তুই পূজা উপাসনার পাত্র হতে পারে। তাকে বলা হয় ভৌতিক বাদ[১]। এতে ধারণা করা হয় যে কোন জড় বস্তুকে ভৌতিক শক্তি আশ্রয় করেছে, সুতরাং সেই জড়বস্তুকে পূজা করা যেতে পারে। একে প্রতীক পূজাও[২] বলা হয়। এই শব্দটি পর্তুগীজ 'ফিটিকো'[৩] শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। তার অর্থ হল মাদুলী বা বিগ্রহ। যে অর্থে তা প্রয়োগ করা হয় তা একটু স্বতন্ত্র। তার অর্থ ব্যাপক। তা ধারণা করে যে কোন জড় বস্তুকে অবলম্বন করে বা মন্ত্রসিদ্ধ বস্তুকে অবলম্বন করে উন্নততর শক্তির আবির্ভাব হয়। যেমন এক খণ্ড পাথর বা হাড় বা একটি মনুষ্য নির্মিত মূর্তি। এই শক্তির নিকট পূজা দিয়ে বিপদ হতে ত্রাণ পাওয়া যায় বা মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আদিম উপজাতিদের মধ্যে এ প্রথা এখনও বর্তমান।

দ্বিতীয় অবস্থায় দেখি একান্তই জড়বস্তুর উপর কৃত্রিম ভাবে কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করে মানবোত্তর শক্তি আরোপ না করে, এমন জড় শক্তির ওপর তা আরোপ করা হয় যেখানে শক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং এখানে বুদ্ধি বৃত্তির প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই প্রাকৃতিক শক্তির কেন্দ্রগুলির ওপর শুধু মানবোত্তর শক্তি নয়, মানুষের অনুরূপ ব্যক্তিত্ব ও আরোপ করা হয়। তখন তাদের ওপর স্পষ্টতই দেবত্ব আরোপিত হয়। এই ভাবে বায়ু, সমুদ্র, আকাশ, অগ্নি—এদের ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট দেবতারূপে কল্পনা করা হয় এবং এদের উদ্দেশ্যে পূজার ব্যবস্থা হয়। এর সুন্দর উদাহরণ মেলে বৈদিক দেবতাদের পরিকল্পনায় এবং গ্রীকদের পৌরাণিক দেবতাদের পরিকল্পনায়।

১. Animism ২. Fetishism ৩. Feitico

উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে দু একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। গ্রীক দেবতা এপোলো-র সঙ্গে বৈদিক দেবতা মিত্রের তুলনা করা যেতে পারে। উভয়েই সৌরকিরণ বিচ্ছুরিত করে অন্ধকারকে পরাহত করেন। অনুরূপভাবে ইন্দ্রের সঙ্গে জিউস এর তুলনা চলতে পারে। উভয়েই মেঘদের নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বজ্র নিক্ষেপ করেন।

এইভাবে দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যক্তিরূপী বহুদেবতার কল্পনা এসে পড়ে এবং বহুদেবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় অবস্থায় দেখা যায় বহু শক্তিকে একত্রিত করে একই মহাসত্তার মধ্যে তাদের স্থাপিত করার চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলেই ধর্ম তার পরিণত রূপটি পায়। মানুষ বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে অনুভব করে যে বিশ্ব ত বহুশক্তির বিচ্ছিন্ন সমাবেশ নয়, একই শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করেছেন। এই পথেই চিন্তা করে মানুষ একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশ্বের মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, এক মানবোত্তর শক্তির ক্রিয়াশীলতা যা মানুষকে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে স্থাপন করেছে—এই বোধ ফুটে উঠলে তখন মনে হয়েছে বিশ্ব একই মহাশক্তির বিকাশ।

পরের অবস্থায় মানুষের ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা দুই বিভিন্ন পথ ধরে। একটি পথে বহু দেবতা ত্যাগ করে ঈশ্বরের একত্ব স্বীকৃত হয় এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তা আছে ধরে নেওয়া হয়। এখানে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বগামী এবং সমগ্র বিশ্বের নিয়ামক শক্তি বলে স্বীকৃত হলেও তিনি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তা বলে কল্পিত হন। সুতরাং বিশ্বের স্রষ্টা হয়েও তিনি তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব ও মানুষ হতে পৃথক হয়ে পড়েন। কাজেই তাঁর মধ্যে একটি দ্বৈতভাব প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। আরব দেশে উৎপন্ন তিনটি মূল ধর্মই এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের প্রকৃতি এদিক হতে মূলত এক। তিন ক্ষেত্রের ঈশ্বরের একত্ব স্বীকৃত, তাঁর সর্বশক্তিমত্তা স্বীকৃত, কিন্তু তাঁর ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপিত। একেই একেশ্বরবাদ বলা হয়।[১]

আরও একভাবে এই একত্বের ধারণা গড়ে ওঠে। তা আরও সর্বাত্মক। তা বলে সমগ্র বিশ্বকে যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন, ধারণ করেন এবং পোষণ করেন, তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তাঁকে তাঁর সৃষ্টি হতে পৃথক করে কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থেকে তিনি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বেদের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদের ব্রহ্মবাদ। বেদের সংহিতায় প্রকৃতির

১. Theism

নানা শক্তির ওপর দেবত্ব আরোপ করে যে নানা দেবতা কল্পিত হয়েছিলেন, তাঁরা উপনিষদের যুগে এক সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। একে তাই বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ, কারণ তা বলে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব এবং জীব হতে পৃথক নন, তাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। তাঁর পৃথক অস্তিত্ব নেই। তা একেশ্বরবাদের মধ্যে যে দ্বৈতাভাব আছে তাকে বর্জন করেছে। একেশ্বরবাদ হতে পৃথক করবার জন্য তাকে বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ।[১]

সুতরাং ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে আমরা তিনটি অবস্থা পাই। প্রথম, জড় পূজা। এখানে যে কোন জড় বস্তুর মধ্যে অতিমানব শক্তির অধিষ্ঠান হয়েছে কল্পনা করে তার পূজা করি। দ্বিতীয় অবস্থা হল বহুদেবতাবাদ। সেখানে নানা প্রকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করে এবং তাদের ব্যক্তিরূপী কল্পনা করে পূজা করি। শেষে একটি মহাশক্তি উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করে তাঁর উপাসনা করি। এই একক মহাশক্তি কোথাও ব্যক্তিরূপী বলে স্বীকৃত হয়েছেন, কোথাও নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে পরিকল্পিত হয়েছেন। আমাদের এই প্রতিপাদ্য মনে হয় মোটামুটি জার্মান দার্শনিক পাউলসেন-এর অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। তিনিও ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে তিনটি অবস্থা লক্ষ্য করেছেন। প্রথম, ভূতাশ্রিতজ্ঞানে পূজা[২]; দ্বিতীয় বহু-ঈশ্বরবাদ[৩]; এবং তৃতীয় একেশ্বরবাদ[৪]। তিনি আরও বলেছেন যে কেবল যুক্তিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হলে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট একেশ্বরবাদ নৈর্ব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদে[৫] পরিণত হয়।[৬]

এই বিশ্লেষণ হতে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে শেষের দিকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রেরণা ক্রমশঃ ভক্তের মন হতে দূরে সরে গেছে। যখন তৃতীয় অবস্থায় মানুষ উন্নীত হল তখন ঈশ্বরের একত্ব এবং সর্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁর ব্যক্তিত্বের ধারণার সংযোগ মানুষের উন্নততর হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের সুযোগ এনে দিল। তাঁর মহিমা ভক্তের হৃদয়কে এমন আচ্ছন্ন করল যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠল। তিনি ব্যক্তিরূপী বলে তাঁর সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির আদান প্রদান ও সম্ভব মনে হল। এর ফলেই বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ গড়ে ওঠবার সুযোগ এল। এমন ভক্ত জুটলেন যিনি ব্যবহারিক প্রয়োজনের উর্দ্ধে উঠে ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুক ভক্তি নিবেদনেই তৃপ্তি পেলেন। সর্বেশ্বরবাদের ধারণায় ভক্তির ক্ষেত্র স্বভাবতই

১ Pantheism ২ Fetishism ৩ Polytheism
৪ Monotheism ৫ Pantheism
৬ Introduction to Philosophy, Bk I, Chap, II, See, 10.

সংকুচিত হয়ে পড়ে; কারণ তা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে না। তা সত্ত্বেও তার বিরাটত্ব, তার ব্যাপক ক্ষেত্রে ক্রিয়ার পরিচয় ভক্তের মনকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট হবার সুযোগ দিল। তিনিও ব্যবহারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা অতিক্রম করে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে শিখলেন।

এই প্রসঙ্গে গীতার একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি করা যেতে পারে। তাতে ভক্তের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর এমন সুন্দর বিশ্লেষণ আছে যে ধর্মের পরিণতির পথের বিকাশের ধারাটির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই শ্লোকে চার শ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ করা হয়েছে: (১) আর্ত, (২) অর্থার্থী, (৩) জিজ্ঞাসু ও (৪) জ্ঞানী।[১] তাঁকে আর্ত বলা হয় যে ভক্ত বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। যিনি অর্থার্থী তিনি মনের বিশেষ অভিলাষ পূরণের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। উভয়েই ব্যবহারিক প্রয়োজনে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। কাজেই তা ধর্মের অপরিণত অবস্থায় ভক্ত যে মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার পরিচয় দেয়। যিনি জিজ্ঞাসু তিনি ঈশ্বরের প্রকৃতি কি তা জানতে চান। ইনি মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আকাশ ভরা সূর্য তারা আর বিশ্ব ভরা প্রাণ তাঁর মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। যে শক্তি তাদের ধারণ করে আছেন তাঁর রহস্য ভেদ করতে তিনি উৎসুক। বিস্ময় হতে উৎপাদিত কৌতূহলই তাঁর প্রেরণা। আর যিনি জ্ঞানী তিনি হলেন সেই শ্রেণীর ভক্ত যিনি ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য নয়, শুধু শ্রদ্ধার প্রেরণায় ঈশ্বরকে ভক্তি করেন।[২] এঁদের মনে অহৈতুক ভক্তির বিকাশ ঘটেছে।

এই প্রাথমিক আলোচনার পর ধর্ম সমস্যার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নগুলি কি হতে পারে, সে বিষয় একটা ধারণা করে নেবার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি। মোটামুটি মনে হয় ধর্ম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ধর্মের পরিণত রূপের প্রসঙ্গেই তাদের উদ্ভব হয়। তবে ব্যবহারিক প্রয়োজন হতে এ অবস্থায় যে ধর্ম মুক্ত তা নয়। এ অবস্থাতেও ব্যবহারিক প্রয়োজন ক্রিয়াশীল থাকে বিশেষ করে একেশ্বরবাদের পরিকল্পনার এই প্রয়োজন-বোধকে তৃপ্তি দেবার যথেষ্ট উপযুক্ততা আছে। এখানে ঈশ্বর ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট রূপে কল্পিত। তিনি পিতৃরূপী বা মাতৃরূপী। তিনি যেমন শাসন করেন

১ চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা। ৭। ১৬

২ পরবর্তী শ্লোক দ্রষ্টব্য: তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

তেমন কৃপাবর্ষণও করেন, বিপদ হতে রক্ষাও করেন। কাজেই সকল প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী ধর্মেই ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধ এবং হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি দুই কাজই সম্পাদিত হতে পারে। সন্তান দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে তার আরোগ্য কামনা করা যায়, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানানো যায় আবার বিশুদ্ধ অহৈতুক শ্রদ্ধা হেতু ভক্তি নিবেদনও করা যায়।

এখন আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিবে আসা যাক। ধর্ম সম্বন্ধে যে দুটি মূল প্রশ্ন মীমাংসার দাবী করে তাদের এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

(১) নাস্তিকতার সহিত একেশ্বরবাদের সংঘাতের মীমাংসা,

(২। একেশ্বরবাদের সহিত সর্বেশ্বরবাদের সংঘাতের মীমাংসা।

প্রথম সমস্যাটি হল দুই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির সংঘর্ষের মীমাংসা। নাস্তিকতাবাদ বলে বিশ্বে ব্যক্তিরূপী কোন নিয়ন্ত্রক শক্তি নেই। একটি অন্ধ যান্ত্রিক শক্তি বিশ্বে ক্রিয়া করছে। তার মধ্যে দয়া, মায়া, মমতাবোধ নেই। তার কাছে প্রার্থনা জানানো একটি যন্ত্রের কাছে প্রার্থনা জানানোর সমস্থানীয়। অপরপক্ষে একেশ্বরবাদ বলে বিশ্ব একটি চৈতন্যময় মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত। তিনি ব্যক্তিরূপী সত্তা এবং সকল গুণের আধার। তিনি যেমন ন্যায়দণ্ড ধারণ কবে মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করেন, তেমন ভক্ত বিপথগামী হলেও তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন। বিপদে আশ্রয়ের জন্য তাঁর ওপর নির্ভর করা যায়। এখন প্রশ্ন হল এদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির কোন সমন্বয় সাধনা করা যায় কিনা।

(২ এক অবস্থায় যেমন নিরীশ্বরবাদের সহিত একেশ্বরবাদের একটি ভিন্নতা আছে, তেমন একেশ্বরবাদের সহিত সর্বেশ্বরবাদেরও একটি সংঘাত আছে। গীতার ভাষায় বলা যায় একেশ্বরবাদে পাই ভক্তের ঈশ্বর এবং সর্বেশ্বরবাদে পাই জিজ্ঞাসুর ঈশ্বর। তাদের মূল পার্থক্য ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে। একেশ্বরবাদে ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ হয়; কাজেই তাঁর, হৃদয়বৃত্তিকে অবলম্বন করে ভক্তের সাহত একটি ভক্তির সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে। সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরকে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা রূপে কল্পনা করে বলে সেখানে ভক্তির সম্বন্ধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এখানে হৃদরবৃত্তি হতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বেশী। শ্রদ্ধা এবং কৌতূহলবোধই জিজ্ঞাসুর হৃদয়কে স্পর্শ করে; ভক্তের সর্বাত্মক ভক্তি যেমন তাকে আলোড়িত করে তেমন ভাবে আলোড়িত করতে পারে না।

(২)

নিরীশ্বরবাদ বনাম একেশ্বরবাদ

আমরা এইবার প্রথম প্রশ্নটির আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। প্রথমেই নিরীশ্বরবাদের আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে। সেটা হল এই যে নিরীশ্বরবাদী দর্শনগুলি এমন কথা বলে না যে বিশ্ব কোন মৌলিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তারা সকলেই বলে না যে বহু বিচ্ছিন্ন শক্তির সমাবেশে তা গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যেও নানা দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য আছে। এমনও বলা হয়েছে যে বহু বিশ্লিষ্ট শক্তির আকস্মিক সমাবেশে বিশ্ব গড়ে উঠেছে, তারা অন্ধ। আবার এমনও বলা হয়েছে যে বিশ্ব কতকগুলি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; তবে সকলেরই এ বিষয় ঐক্যমত্য লক্ষ্য করা যায় যে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এইভাবে তারা সকলেই নিরীশ্বরবাদী হলেও তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে এই নিরীশ্বরবাদী তত্ত্বগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) চার্বাক দর্শন। তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর জ্ঞানের বৈধতা স্বীকার করে না। তা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জড়ের সাহায্যেই চৈতন্যের ব্যাখ্যা করে। বহু পদার্থের আকস্মিক সংযোগে বিশ্বের ব্যাখ্যা করে।

(২) বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। তার দৃষ্টিগুলি চার্বাক দর্শনের অনুরূপ। এক-রকম বলা যায় তা যেন চার্বাক দর্শনের মার্জিত রূপ।

(৩) নৈরাশ্যবোধ হতে উৎপাদিত অন্ধ শক্তিতে বিশ্বাস। ওমর খৈয়ম-এর দর্শন তার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

(৪) ঈশ্বরের স্বীকৃতি না দিয়ে বিশ্বের ব্যাখ্যা। এই শ্রেণীর মতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত, কিন্তু ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন এই শ্রেণীতে পড়ে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির প্রাসঙ্গিক অংশে এই বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বগুলির প্রয়োজন মত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। সুতরাং উপরের দর্শনগুলির সবিস্তার ব্যাখ্যার এখানে আর নূতন করে প্রয়োজন হবে না। কেবল তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু অংশ বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হবে।

চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নয়; কাজেই তার মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তা বিশ্বের ব্যাখ্যা করে চারটি মহাভূতের আকস্মিক সমাবেশের সাহায্যে। তারা হল পৃথিবী, জল, তেজ বা অগ্নি এবং বায়ু। এদেরই নানাভাবে সমাবেশের ফলে জড় বস্তু, উদ্ভিদ, প্রাণীর দেহ—সবই গড়ে উঠেছে। মানুষের যে মন আছে, তার যে চৈতন্য শক্তি আছে চার্বাক দর্শন তা স্বীকার করে না। তাই এ দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নি। দেহ জড় শক্তিরই রূপান্তর। তার মধ্যে যে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে বলে আমরা মনে করি, তা জড়েরই আনুষঙ্গিক ফলের মত। যেমন গুড়, চাউল ইত্যাদির মধ্যে মাদক দ্রব্য উৎপাদনের শক্তি আছে, তাদের পচিয়ে মদ্য উৎপাদন করা যায়, তেমন জড় ভূতের মধ্যে চৈতন্য শক্তি আছে, অনুকূল পরিবেশে তার আবির্ভাব হয়। প্রকৃত পক্ষে তা জড়েরই রূপান্তর।

আমরা এখনি বলেছি যে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক জড়বাদের মধ্যে চার্বাক দর্শনের একটি সংস্কৃত ও মার্জিত রূপ যেন আমরা পাই। আমাদের এই মন্তব্যটি কতখানি যুক্তি সম্মত তা এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের স্বীকৃতি দেয় না। বৈজ্ঞানিক জড়বাদ অবশ্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। তা অনুমানকে অবলম্বন করে নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিন্তু অনুমানের প্রয়োগের ক্ষেত্রকে তা খুব সীমাবদ্ধ করে রাখে। মূলতঃ তা প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভরশীল। যে অনুমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি বা যার সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় না, তাকে তা গ্রহণ করে না। সেই কারণে তা কল্পনা ভিত্তিক অনুমানের[১] সমর্থন করে না। এইখানেই দার্শনিক চিন্তার সহিত তার পার্থক্য। তা আনুমানিক জ্ঞানকে স্বীকার করে, কিন্তু তার প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত করে। এদিক হতে চার্বাক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়ত চার্বাক দর্শনে চারটি মহাভূতের সাহায্যে জড় ও চেতন উভয়শ্রেণীর সত্তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই চারটি মহাভূত হল পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু। সেকালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তত অগ্রসর হয় নি বলেই এদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সকলেই জড় পদার্থের সমস্থানীয়। এই দর্শন বলতে চায় জড়

১ Speculative thought.

পদার্থকে নির্ভর করেই বিশ্বের ব্যাখ্যা করা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জড়-বাদেরও প্রতিপাদ্য তাই। তা সকল মিশ্র ও মৌলিক জড পদার্থকে অণুতে বিশ্লেষণ করে অণুর নানা বিন্যাসে আকস্মিক সমবায়ের সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে[১]। এখানেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

তৃতীয়ত চার্বাক দর্শন চেতন সত্তাকেও জড শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। শর্করা জাতীয় পদার্থের পচন ক্রিয়ার ফলে যে মাদকতা শক্তি সঞ্চারিত হয়, তার সঙ্গে জড় পদার্থ দিয়ে গঠিত দেহে চৈতন্যের ক্রিয়ার তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ চেতনা জড়েরই ভিন্ন রূপ। বৈজ্ঞানিক জডবাদও ঐ ধরণের কথা বলে। তা চেতনা শক্তিকে জড়ের আনুষঙ্গিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করে[২]। বাতি জাললে যেমন আলো দেখা যায়, অথচ তা জড়েরই মিশ্রণ ক্রিয়া সম্পর্কে সংঘটিত একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা, তার মতে প্রাণীর দেহে চৈতন্যের বিকাশও জড শক্তির নানা প্রক্রিয়ার আনুষঙ্গিক ফল।

এই পর্যায়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সেই প্রকৃতির দর্শন যা নৈরাশ্য হেতু শ্বরকে অস্বীকার করে। তার দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে এই রকম দাঁড়ায়। মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অনেক অন্যায়, অনেক অনাচারের প্রতিবিধান ঘটে না। আবার দেখা যায় নিরীহ সৎপ্রকৃতির মানুষের ভাগ্যেও অনেক দুর্ভোগ ঘটে। তার ফলে নৈরাশ্যবোধ হতে এই ধারণা জন্মায় যে বিশ্ব কোন সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, ন্যায়বুদ্ধিমণ্ডিত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অন্ধ ভাগ্যই এখানে যেন মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনাস্থা আসে।

এর সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কবি-দার্শনিক ওমর খৈয়ম-এর দর্শনে। তিনি বলেন এক অন্ধশক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। তা মানুষের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন। যে দাবা খেলে তার যেমন দাবার বড়েগুলির ভাগ্য সম্বন্ধে কোন বিবেচনা নেই, সেই অন্ধ শক্তিও তেমন মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করে। তাঁর প্রসিদ্ধ রুবাইয়াত-এর একটি স্তবকের এই প্রসঙ্গে বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

তারপরেতে জিজ্ঞাসিনু আকাশ পানে চাহি,
ধরার শিশু পথ চলি আর হোঁচট শুধু খাই ;
ভাগ্যদেবী রাখেন নি কি প্রদীপ মোদের তরে ?
বাণী এল, অন্ধ শক্তি আছে শুধু, আর কিছু ত নাই।

১ Fortuitous combinations of atoms ২ Epiphenomenon

চতুর্থ শ্রেণীর নিরীশ্বরবাদী দর্শনগুলি কেবল জড়ের উপর নির্ভর করে বিশ্বের ব্যাখ্যা করে না, এমন কি এমন দর্শনও আছে যা জড়ের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তা এও স্বীকার করে না যে বিশ্ব একটি অন্ধ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে তারা বিশ্বের যে ব্যাখ্যা দেয় তাতে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের কোন ভূমিকা আছে বলে মনে করে না। এই শ্রেণীতে পড়ে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন। এই দুটি দর্শন সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সবিস্তার আলোচনা হওয়ায়, এখানে পুনরায় বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন দেখি না। কেবল আমাদের বর্তমান প্রতিপাদ্যের সমর্থনে যেটুকু বিবরণ একান্তই প্রাসঙ্গিক, তার মধ্যেই আমাদের বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

জৈন দর্শনে বিশ্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে দুটি মৌলিক সত্তার সাহায্যে। একটি হল পুদ্গল বা জড পদার্থ এবং অন্যটি হল আত্মা বা চেতন পদার্থ। উভয়েই নিত্য এবং সনাতন। আত্মা অনন্ত জ্ঞান, দর্শন শক্তি ও আনন্দের আধার। কিন্তু কর্মফলের আকর্ষণে তা পুদ্গল পরমাণু সংগ্রহ করে দেহ ধারণ করে। ফলে পুদ্গল পরমাণু দ্বারা আবৃত হয়ে তা ভোগী জীবে পরিণত হয়। তা হতে মুক্তি ঘটে দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারা এবং পবিত্র জীবন যাপনের দ্বারা। এই পবিত্র জীবনের আদর্শ হিসাবে জৈন ধর্মে পাঁচটি মহাব্রতের নিদেশ দেওয়া হয়েছে। তা হল অহিংসা, সত্য ভাষণ, অস্তেয় অর্থাৎ পরস্ব অপহরণ হতে বিরতি, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগৃহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা। বিশ্বের এই ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বরং ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে প্রমাণ করা যায় না, সেই কথাই জৈন দর্শনে বলা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তার দৃষ্টিভঙ্গির এখানে সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। তা ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে বর্জন করেই বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে মুলত চেতন ও জড, এই দুই তত্ত্বের ভিত্তিতে।

বুদ্ধপ্রবর্তিত দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিও জৈন দর্শনের অনুরূপ। তাও বিশ্বের ঈশ্বর তত্ত্বকে বর্জন করে ব্যাখ্যা করেছে। তবে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এইখানে যে জৈন দর্শন জড সত্তাকে স্বীকার করে, বুদ্ধের দর্শন তা করে না। যেহেতু বহির্বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের উপর নির্ভরশীল, তাদের পৃথক অস্তিত্ব তা স্বীকার করে না। সে কারণে তা বিশুদ্ধভাবে চৈতন্যবাদী।

বৌদ্ধধর্মের চারটি আর্যসত্যের দ্বিতীয় আর্যসত্য হল দ্বাদশ নিদান। তা কার্য কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে বিশ্বসম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করে। তাকেই

প্রতীত্য সমুৎপাদ বলা হয়। তার আলোচনা পূর্বে হয়েছে। এখানে এই দ্বাদশ নিদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দিলেই চলবে। এই দ্বাদশ নিদান ব্যাখ্যা করে কিভাবে মানুষ জন্ম হতে জন্মান্তরে কার্যকারণ পরম্পরা যোগে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যা কার্য তা পরবর্তী স্তরে কারণ রূপে ক্রিয়া করে। এই নিদানগুলির মধ্যে মূলতঃ চারটি অবস্থা পাই: প্রথম, পূর্বজন্ম হতে লব্ধ সংস্কার যা অবিদ্যাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় জ্ঞাতা ও ভোক্তারূপে দেহ ধারণ করে সংসারে জন্মগ্রহণ। তার অন্তর্ভুক্ত হল বিজ্ঞান (চেতনা), নামরূপ (জীব শরীর), ষড়ায়তন (পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন)। তৃতীয় অবস্থা হল তৃষ্ণাবোধ ও উপাদান (সংসারে আসক্তি)। এটি ঘটে বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে। বুদ্ধ তাকে বলেন 'বেদনা'। এর থেকেই আবার পুনরায় জন্মগ্রহণের ইচ্ছা হয়। ফলে আসে ভবিষ্যত জীবন (জাতি)। এইভাবে কার্যকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জীব চক্রাকারে জন্ম হতে জন্মান্তরে ঘোরে বলে এই ঘূর্ণমান জীবন পরম্পরাকে বলা হয় ভবচক্র।

(৩)

একেশ্বরবাদ

উপরের দর্শনগুলিতে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে বর্জন করেই বিশ্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে তাদের সাধারণ শ্রেণীতে নাম নিরীশ্বরবাদ। একেশ্বরবাদ বলে একটি ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে অবলম্বন না করলে বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিকোণ হতে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় না। মানুষের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির তৃপ্তির জন্যই যে বিশ্বের মৌলিক শক্তিকে ব্যক্তিসত্তারূপে কল্পনা করার প্রয়োজনবোধের উৎপত্তি হয়, তা বুঝতে কিছু তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে ধারণা হতে পারে যে ঈশ্বরের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ আমাদের ঈশ্বরের ওপর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপের ইচ্ছা হেতু[১] ঘটে থাকে। এই রকম ধারণা করবার সপক্ষে যুক্তিও কিছু পাওয়া যায়। মানুষ পরিচিত বস্তুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই অপরিচিতকে জানতে চেষ্টা করে। মানুষ নিজেও স্রষ্টা বা নির্মাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। তা হতে তার অভিজ্ঞতা আছে যে সৃষ্ট বস্তু হতে পৃথক থেকেও সৃষ্টি করা সম্ভব। কাজেই সেই দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করে ঈশ্বরকেও

১. **Anthropomorphic**

তাঁর সৃষ্টি হতে পৃথক করে ভাবতে শেখে। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাহেতু ও তাঁকে জগতের সংস্পর্শ হতে দূরে রাখতে মানুষের ইচ্ছা এসেছে। মর্ত্যে পাপ আছে, দুঃখ আছে, আবর্জনা আছে। কাজেই ঈশ্বরের যে সেখানে স্থান হতে পারে তা কল্পনাতীত। তাই জন্য তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল স্বর্গে। এই কল্পনায় সেকালের সামাজিক জীবনেরও প্রভাব দেখা যায়। তখনকার যুগে মানুষে মানুষে বড় রকমের ভেদের প্রাচীর ছিল। একদিকে ছিলেন রাজা, অপরদিকে প্রজা। রাজা শাসক, প্রজা শাসিত। রাজা থাকতেন প্রাসাদে, প্রজা কুটীরে। এই আদর্শের প্রভাবেই যেন ঈশ্বর নির্বাসিত হলেন স্বর্গে এবং তাঁর শাসিত জীব পড়ে রইল ভূমিতে।

কিন্তু গভীরভাবে আলোচনা করলে মনে হবে ঈশ্বরের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ শুধু অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করবার ইচ্ছা হতেই ঘটেনি। তার অতিরিক্ত শক্তিমান কারণ বর্তমান ছিল। মোটামুটি মনে হয় মানুষের ধর্মবোধকে কেন্দ্র করে কতকগুলি আকৃতি পূরণ করবার জন্যই এই ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রথমতঃ অন্যায়ের শাস্তির প্রয়োজনীয়তাবোধ মানুষ তীব্রভাবে অনুভব করেছে। তা না হলে সমাজ রক্ষা করা যায় না। অন্যায় যে করে তার যদি দণ্ডবিধান না হয়, তা হলে অন্যায়কে দমন করা যাবে না শুধু নয়, যে অত্যাচারিত তার মনে হতাশা আনবে। তাই বিশ্বশক্তির ন্যায়দণ্ড ধারণ করে বিচারকের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি জীবনে অন্যায় আচরণ হতে বিবেকের দংশন হেতু পাপবোধ একটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক অবস্থা। মনে শাস্তির আতঙ্ক এবং অস্বস্তিবোধ দুইই পীড়াদায়ক। তা হতে মুক্তির জন্য, পাপের পরিত্রাণের জন্য ক্ষমার প্রয়োজনীয়তাবোধও এখানে ক্রিয়াশীল। সর্বশেষে যিনি বিশ্বের ধারক, যিনি একাধারে মহাশক্তি ধারণ করেন এবং তাকে পালন করে নিজের কল্যাণরূপের পরিচয় দেন, তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ উদ্বেলিত হওয়াই স্বাভাবিক। এই অনুভূতিই ত ধর্মবোধের জনক। এই অনুভূতির তৃপ্তির জন্যই ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট বলে কল্পনা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জড়শক্তিকে বা নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। চতুর্থতঃ যাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি তাঁকে সেবার আকৃতিও এসে পড়ে। এই আকৃতির প্রভাবেই নিরাকার ঈশ্বরকে প্রতীকের সাহায্যে সাকার রূপ দেবার রীতি গড়ে ওঠে।

আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ধর্মের

মধ্যে এই আকৃতিগুলির তৃপ্তি সাধনের যে একটা ব্যবস্থা হয়েছে তা লক্ষ্য করতে পারি। তারা হল ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম। এদের মধ্যে ঐতিহাসিক কারণে প্রথম তিনটির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তারা একই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের যাঁরা স্থাপন করেছেন তারা মোটামুটি একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সকলেই ব্যক্তিরূপী একক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তিনটি ধর্মেই ন্যায়ের ধারক হিসাবে ঈশ্বরের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের আশ্রিত যে একেশ্বরবাদ তা একটি বিষয়ে এদের থেকে রীতিমত পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রথম তিনটি ধর্ম ঈশ্বরকে নিরাকার হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁকে মূর্তিধারী হিসাবে কল্পনা করতে প্রস্তুত নয়। হিন্দু ধর্ম ঈশ্বরকে নিরাকার হিসাবে গ্রহণ করে ও তাঁকে বিগ্রহ আকারে কল্পনা করে সাকার রূপ দিতে প্রস্তুত। অপর তিনটি ধর্মের মতে তা পৌত্তলিকতার সমস্থানীয়। এখন আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি, এই চারটি একেশ্বরবাদী ধর্মে—মানুষের ধর্মবোধকে ভিত্তি করে যে চারটি আকৃতি গড়ে উঠেছে, তাদের কোনটির কতখানি অধিকার পূরণ হয়েছে।

মোজেস স্থাপিত ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের ন্যায়ানুবর্তিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি ন্যায়দণ্ডধারী। পাপীর তিনি কঠোরভাবে বিচার করেন, তাঁর এই ভূমিকাটি যেন এই ধর্মে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের মধ্যেও ঈশ্বরের বিচারকের ভূমিকাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম কথাটির অর্থ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুবর্তী হওয়া। যে এই ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই মুসলিম। সুতরাং ন্যায়ানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর এই ধর্মে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

খ্রীষ্ট ধর্মে ঈশ্বরের যে রূপটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট তা হল তাঁর ক্ষমাশীলতা। তিনি শুধু কঠোর বিচারক নন, তিনি করুণাময়। কাজেই পাপীরা তাঁর কাছে ক্ষমা পাবার আশা পোষণ করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই পাপমুক্তি-তত্ত্ব[১] খ্রীষ্টধর্মে গড়ে উঠেছে। ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের এত ভালবাসেন যে তাঁর পুত্র যীশুকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছিলেন পাপ হতে পরিত্রাণের পথ নির্দেশের জন্য। তিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন সাধারণ পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য। এইসব তত্ত্ব এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ঈশ্বরের

১. Doctrines of Redemption

ক্ষমাশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে পাপবোধের বেদনা হতে মুক্তির আকৃতির তৃপ্তির বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। খ্রীষ্টধর্মের দৈনিক প্রার্থনার অন্যতম আবেদন হল ঈশ্বর যেন ভক্তের অন্যায় আচরণ ক্ষমা করেন।[১]

মনে হয় হিন্দুধর্মে যে একেশ্বরবাদের বিকাশ ঘটেছে সেখানে ঈশ্বরকে ভক্তি করবার এবং সেবা করবার আকৃতিকে বিশেষ সুযোগদানের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাবোধ বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদে তাই ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদরূপে কল্পনা করে তাঁকে মধুরসের সম্পর্কে পাবার অকাঙ্খা বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছে। একই পেরণার প্রভাবে শাক্তধর্মে ঈশ্বরকে মাতৃ-রূপে কল্পনা করে বাৎসল্যরসের মাধ্যমে তাঁর সহিত মিলনের ব্যবস্থাকরা হয়েছে। ভক্তিপ্রকাশের আকৃতিকে আরও বিস্তারিত ক্ষেত্রে প্রয়োগের ইচ্ছা হতেই মনে হয় হিন্দুধর্মে বিগ্রহরূপে ঈশ্বরের পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। যিনি ঐকান্তিক ভক্তির পাত্র তাঁকে শুধু ভক্তি করে ভক্তের তৃপ্তি হয় না। অতিরিক্তভাবে তাঁকে সেবা করবার আকৃতি প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু যিনি নিরাকার তাঁর কাছে সেবা পৌছে দেওয়া যায় না। তাই যাঁকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তাঁকে বিগ্রহরূপে কল্পনা করে নাগালের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ভক্ত সেবা করবার সুযোগ পেতে পারে। এই ভাবেই পৌরাণিক হিন্দুধর্মে বিগ্রহের নানা ভাবে সেবা এবং আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে পূজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

সুতরাং এই চারটি আকৃতি পূরণের জন্যই ঈশ্বরের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপের ইচ্ছা মানুষের মনে প্রবল হয়ে উঠেছে। মানুষের ন্যায়বোধ এবং হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তিসাধনের জন্যই একেশ্বরবাদে ঈশ্বর ব্যক্তিরূপী বলে কল্পিত হন। কিন্তু দেখা যায় এমন দর্শন আছে যা ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ঈশ্বরের স্বীকৃতি না দিয়েও বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছে। নিরীশ্বরবাদী দর্শনগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমরা পরিচিত হয়েছি। এইভাবে নিরীশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের মধ্যে একটি পরস্পর বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে। নিরীশ্বরবাদের সম্ভাব্য আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য কাজেই ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের বিশেষ প্রয়োজন একেশ্বরবাদী দর্শনে অনুভূত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে যে প্রমাণগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং বিশুদ্ধ যুক্তি হিসাবে তাদের মূল্য কতখানি সে বিষয় আলোচনা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা এখানে প্রধান যুক্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার প্রস্তাব করি। এই আলোচনা তিনটি

১ **Forgive us our tresspasses**

দার্শনিক মতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে। কারণ তাদের মধ্যেই মূল যুক্তিগুলি পাওয়া যায়। ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপক আলোচনা প্রথম করেন বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক টমাস একুইনাস। তারপর আমরা দার্শনিক লাইবনীটজ-এর আলোচনায় তার একটি বিজ্ঞানসম্মত রূপ পাই। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের বেশীরকম আগ্রহ লক্ষিত হয় না। তার কারণ পৌরাণিক যুগের আগে ভারতীয় দর্শন মূলত হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গীতার ভাষায় ভক্তের নয়, জিজ্ঞাসুর। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদে সর্বেশ্বরবাদের জন্ম হয়েছিল এবং পরাবিদ্যাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ষড়দর্শনের যুগেও জ্ঞানমার্গই প্রশস্ত পথ বলে স্বীকৃত ছিল। তাই দেখি যোগ দর্শন ও ন্যায় দর্শন ব্যতীত অন্য দর্শনে ঈশ্বরের আলোচনা মূল গ্রন্থে, অর্থাৎ সূত্রে পাওয়া যায় না। কেবল ন্যায় দর্শনেই একেশ্বরবাদ পরিকল্পিত ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের আলোচনা পাওয়া যায়। সুতরাং এই তিনটি আলোচনাকে অবলম্বন করেই আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের বিষয়টি আলোচিত হবে।

ন্যায়দর্শন দিয়েই আমাদের আলোচনা সুরু হতে পারে। এই দর্শনে অনেকগুলি যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান হল এইগুলি :[১]

(১) কার্যত্বলিঙ্গক—কাজ থাকলেই তার কারণ থাকবে। সৃষ্ট জগৎ একটি কার্য। সুতরাং তার কারণ থাকবে। সেই কারণ হলেন ঈশ্বর। অনুমান করা যায় এখানে নিমিত্ত কারণরূপেই ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয়েছে।

(২) অদৃষ্টলিঙ্গক—মানুষের কর্মফল ভোগ করতে হবে এই ধারণা উপনিষদের পরবর্তী দর্শনে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বরূপে গৃহীত হয়েছে। তার ওপর এই প্রমাণ স্থাপিত। তা বলে যেহেতু কর্মফলভোগ একটি আবশ্যিক ব্যবস্থা, তার প্রয়োগের জন্য একটি নিয়ন্ত্রক শক্তির প্রয়োজন। সেই নিয়ন্ত্রক শক্তি হলেন ঈশ্বর।

(৩) বেদপ্রামাণ্য—বেদ এত সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কিত রচনা যে তা মানুষের শক্তির অসাধ্য। এই ধারণার ভিত্তিতে আমাদের দেশে একটা সংস্কার গড়ে উঠেছে যে বেদ অপৌরুষেয়। তা মানুষের দ্বারা রচিত হয়নি। ঈশ্বরই তার কারণ। এই ধারণাকে ভিত্তি করেই এই যুক্তিটি প্রয়োগ করা হয়েছে। বেদের কারণ হিসাবে বেদের অস্তিত্বই সূচনা করে যে ঈশ্বর আছেন।

১ এই প্রসঙ্গে উদয়নের 'কুসুমাঞ্জলি' দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্রুতিপ্রমাণ—উপনিষদের অনেক বচনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। আমাদের দেশে শব্দপ্রামাণ্যও একটি প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত। সুতরাং শ্রুতিতে যা স্বীকৃত তা গ্রহণযোগ্য।

এই তালিকায় দেখা যাবে প্রথম প্রমাণটি ছাড়া অন্য প্রমাণগুলি কতকগুলি বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; কিন্তু সেই বিশ্বাস বা সংস্কারগুলি বিতর্কের বিষয়। সেই কারণে অনেক দার্শনিক তাদের সম্মান দিতে প্রস্তুত হবেন না। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস না থাকলে অদৃষ্টলিঙ্গক প্রমাণ প্রয়োগ করা যায় না। অনুরূপভাবে বেদ যে অপৌরুষেয় এই বিশ্বাস না থাকলে বেদপ্রামাণ্যের কোন মূল্য থাকে না। শ্রুতিতে বলেছে বলে, তা যুক্তিদ্বারা সমর্থিত কিনা না দেখে যিনি যুক্তির ওপর নির্ভরশীল, তিনি তা মানতে রাজী হবেন না। এই প্রমাণেরও ভিত্তি যুক্তি নয়, বিশ্বাস। সুতরাং বুদ্ধি সম্মত দার্শনিক আলোচনায় তার বিশেষ মূল্য দেওয়া যায় না। কাজেই প্রথম প্রমাণটি ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের বিশেষ মূল্য নেই।

টমাস একুইনাসই প্রথম ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রমাণকে একত্র গুছিয়ে স্থাপন করেছিলেন। তাদের বিবরণ এখন সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে। সেগুলি এই:

(১) ঈশ্বর হলেন তিনি যিনি নিজে অবিচলিত থেকে বিশ্বকে চালিত করেন[১];

(২) ঈশ্বর হলেন বিশ্বের প্রথম কারণ[২];

(৩) ঈশ্বর হলেন যা কিছু আবশ্যিকভাবে ঘটে তার উৎস[৩],

(৪) ঈশ্বর হলেন পরিপূর্ণভাবে ত্রুটিহীন;[৪]

(৫) বিশ্বে যে সব অজীব পদার্থ আছে তারা নিশ্চিত তাদের বাহিরে অবস্থিত কোন মৌলিক শক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

তারপর দেখি লাইবনীটজ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে যে প্রমাণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের প্রথম একটি যুক্তিসম্মত রূপ দেন। তিনি চারটি যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তারা হল এই:

(১) ত্রুটিহীনতা ভিত্তিক প্রমাণ[৫]। তার বক্তব্য হল আমাদের ধারণা মতে

১ Unmoved mover

২ First Cause

৩ Ultimate source of all necessity

৪ Completely perfect

৫ Ontological argument

ঈশ্বর সকল আদর্শগুণের সমাবেশ। তাঁর মধ্যে অনবদ্যভাবে সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং যাঁর এত গুণ তাঁর যে অস্তিত্ব থাকবে না তা কল্পনা করা যায় না। এখানে পরিপূর্ণ গুণের সমাবেশের ধারণা হতে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। এর সঙ্গে টমাস একুইনাস-এর চতুর্থ প্রমাণটি তুলনীয়।

(২) কারণভিত্তিক প্রমাণ[১]। যা ঘটে তার নিশ্চয় একটি উপযুক্ত কারণ আছে। বিশ্ব আছে কাজেই তার একটি কারণ আছে। এই যুক্তিটির মধ্যে একুইনাস প্রযুক্ত প্রথম তিনটি কারণকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। কারণ এই তিনটি প্রমাণই কার্যকারণ সম্বন্ধকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

(৩) নিত্যসত্যভিত্তিক প্রমাণ[২]। তা বলে বিশ্বে কতকগুলি নিত্যসত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। সত্যকে ধারণা করতে চৈতণ্যগুণবিশিষ্ট মনের দরকার হয়। সুতরাং তাদের ধারণা করবার জন্য একটি শাশ্বত মনের প্রয়োজন। স্পষ্টতই দেখা যায় ঈশ্বরের চৈতন্যরূপ প্রমাণ করবার জন্যই এই প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

(৪) উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রমাণ[৩]। এই যুক্তি বলে বিশ্বের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য-মূলক শক্তি যে ক্রিয়াশীল তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। জড়ের বিকাশ, প্রাণের বিকাশ প্রভৃতি তার লক্ষণ। সুতরাং তা প্রমাণ করে এক নিয়ন্ত্রক শক্তি বিশ্বে ক্রিয়া করেছেন। তিনিই ঈশ্বর। এমন একটি শক্তির অস্তিত্ব যে অনুমান করা যায় তা অনস্বীকার্য; কিন্তু তা যে ব্যক্তিরূপী সত্তা হবে এবং বাহির হতে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে এমন নাও হতে পারে।

কাণ্ট নিজে ছিলেন ধার্মিক, ঈশ্বরে বিশ্বাসপরায়ণ মানুষ। তিনি এই যুক্তি-গুলিকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে অসমর্থ। তাঁর 'বিশুদ্ধ চিন্তার আলোচনায়'[৪] এ বিষয় সবিস্তার ব্যাখ্যা আছে। এখানে যে যুক্তিগুলি প্রয়োগ করে এই প্রমাণগুলির দুর্বলতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন, তাদের চুম্বকে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম যুক্তি হল ক্রটিহীনতা ভিত্তিক প্রমাণ। ঈশ্বর হলেন আমাদের ধারণায় সব থেকে পূর্ণাঙ্গ সত্তা; সুতরাং তাঁর অস্তিত্বও ধরে নিতে হয়। সংক্ষেপে

১. Cosmological argument
২. Argument form eternal truths
৩. Teleological argument, Argument from design.
৪, Critique of Pure Reason

এই হল তার যুক্তি। কাণ্ট বলেন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হতে অস্তিত্বের অনুমান করা যায় না।[১] যার অস্তিত্ব আছে তার নিশ্চয় গুণ আছে; কিন্তু গুণের চিন্তা করলেই অস্তিত্বের ধারণা আসে না। সুতরাং অস্তিত্ব বস্তুর বিধেয় পদ হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রমাণ হল কারণ ভিত্তিক প্রমাণ। কাণ্ট প্রথমে বলেন কার্যকারণ সম্বন্ধ দৃশ্যমান জগতের ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাকে প্রাতিভাসিক জগতের বাহিরে প্রয়োগ করা যায় না।[২] দ্বিতীয়ত তিনি বলেন এ যুক্তি প্রথম যুক্তিরই রূপান্তর। অর্থাৎ গুণের সমাবেশ হতে অস্তিত্বের অনুমানের চেষ্টা এখানেও হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় যত কিছু বস্তুর অস্তিত্ব আছে তাদের তা উৎস; কাজেই তাও আছে।

তৃতীয় যুক্তি হল নিত্যসত্যের ধারক হিসাবে চৈতন্যময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। এও কারণ ভিত্তিক প্রমাণের সমস্থানীয়। এখানে ধরা হচ্ছে যার অস্তিত্ব আছে তার কারণেরও অস্তিত্ব আছে। কাজেই কারণত্ব হতেই অস্তিত্ব সূচিত হচ্ছে। রাসেল বলেন এও ক্রটিহীনতা ভিত্তিক প্রমাণের রূপান্তর।[৩]

চতুর্থ যুক্তি হল উদ্দেশ্য ভিত্তিক প্রমাণ। কাণ্ট বলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যত যুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এটি তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। তবে তাঁর মতে এ প্রমাণেরও দুর্বলতা আছে। তা প্রমাণ করে না যে এই শক্তি অসীম এবং সর্বশক্তিমান। তা এইটুকু স্থচিত করে যে এমন একটি শক্তি আছে যার উদ্দেশ্য দ্বারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত। তা কেবল তাঁর নিমিত্ত কারণত্ব প্রমাণ করে। যে উপাদান এই উদ্দেশ্যকে রূপ দেবার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তা ও যে ঈশ্বরের সৃষ্ট তা প্রমাণিত হয় না। তা প্রমাণ করতে আবার সে ক্রটিহীনতা ভিত্তিক প্রমাণের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

এই সব আলোচনার ফলে কাণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একেশ্বরবাদের ঈশ্বরকে যুক্তিমার্গে পাওয়া যায় না। তাই তিনি তাঁকে যুক্তিমার্গে না পেয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যুক্তির ভিত্তিতে যিনি তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ করতে অক্ষম

১ Existence is not a predicate of quality

২ Transcendental use of Categories

৩ "This argument is really only another form of cosmological argument." History of Western Philosophy, Book II, Chap. XI

হয়েছিলেন, নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি তাঁকে অন্যভাবে প্রমাণিত করেছেন। সংক্ষেপে তার যুক্তি হল এই।

তিনি বলেছেন বিশুদ্ধ চিন্তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা যায়।[১] অর্থাৎ আমাদের নৈতিকবুদ্ধি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবে তার নির্দেশ দেয়। তা যা বলে তা নির্দেশস্বরূপ।[২] তা হয় ত ভঙ্গ করি। সত্য কথা বলা উচিত বুঝেও হয়ত সত্য কথা বলি না ; কিন্তু নির্দেশ অমান্য করেও বলতে পারি না সত্য কথা বলা উচিত নয়। এই নির্দেশবোধ হতে এইরূপ অনুভূতিও আমাদের মনে আসে যে আমরা ইচ্ছামত কাজ করতে পারি। আমরা অনুভব করি আমাদের মনের অবস্থা নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে আমরা অনুভব করি যে আমাদের জীবন ইহলোকে সমাপ্ত হয় না, তা পরলোকেও বিস্তৃত। ইহলোকে অনেক সৎকর্মের সুফল লাভ হয় না, অনেক অসৎ কর্ম দণ্ডিত হয় না। সুতরাং ন্যায় বিচারে সামঞ্জস্য আনবার জন্য পরলোকের প্রয়োজনবোধ মনে উপলব্ধি হয়। তা হতেই পরলোকের ধারণা আসে। কাজেই দেখতে পাই কর্তব্যবোধের সঙ্গে পরলোকের অস্তিত্ববোধ জড়িত হয়ে পড়ে। কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থার প্রয়োজন। তার জন্য এক নিয়ামক শক্তির প্রয়োজনবোধ আসে। তাকে ভিত্তি করেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রতিপাদ্য বলে গ্রহণ করা যায়।[৩] এ হল যুক্তিমার্গে তাঁকে পাওয়া নয়, নীতিবোধের ভিত্তিতে তাঁকে পাওয়া। আমাদের নীতিবোধ যেন নির্দেশ দেয় যুক্তিমার্গে ঈশ্বরকে না পেলেও তাঁর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে।

৪

সর্বেশ্বরবাদ

যুক্তিকে ভিত্তি করে এটা অনুমান করা যায় যে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে একটি মাত্র শক্তিই ক্রিয়াশীল, তার শক্তির উৎস একটি। যে তত্ত্ব এই প্রতিপাদ্য

১. "Pure reason can be practical i.e. can of itself determine the Will independently of anything emperical." Critique of Practical Reason.

২. Categorical Imperative

৩. "The postulate of immortality······must lead to the supposition of the existence of a cause adequate to this effect ; in other words, it must postulate the existence of God." Critique of Practical Reason

গ্রহণ করে তাকে আমরা একবাদ বলেছি। তারপর প্রশ্ন ওঠে, সেই উৎস কি সৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন এবং তাঁর ওপর কি ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায়? একেশ্বরবাদ বলে তা যায়। ফলে একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধ একবাদ থাকে না। একটি পরিবারের নিয়ামক শক্তি তার কর্তা, সে যে বিভিন্ন ব্যক্তি দিয়ে পরিবারটি গঠিত তাদের সঙ্গে একীভূত নয়। তার ইচ্ছা শক্তি তাদের সকলের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে এই পর্যন্ত। একেশ্বরবাদের পরিকল্পনায় একবাদ এই সংকুচিত অর্থে তার একত্ব সংরক্ষিত করতে সক্ষম। যুক্তি দিয়ে দেখলে যে তাকে সমর্থন করা শক্ত হয়ে পড়ে, তা ওপরের আলোচনা হতে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু অনুভূতি-বৃত্তির এই রকম একটি ধারণার যে প্রয়োজন আছে তাও অনস্বীকার্য। একেশ্বরবাদের এই বিশেষ উৎকর্ষের কথার আলোচনায় আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে। তার আগে দেখা যেতে পারে যুক্তিমার্গের সাহায্যে আমরা ঈশ্বরের কি ধরণের মূর্তি গড়ে তুলতে পারি।

মনে হয় যুক্তিকে ভিত্তি করে চিন্তা করলে সর্বেশ্বরবাদের দাবী অপ্রতিরোধনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে বিশ্ব বিরাট হলেও তা একই শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখন প্রশ্ন ওঠে সেই শক্তি বিশ্বকে যে সৃষ্টি করেন বা পোষণ করেন, তাও কি মানুষের রীতিতে? মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা হতে দেখে যে সে নির্মাণ করে বাহির হতে সংগৃহীত কতকগুলি উপাদান দিয়ে। তারপর তাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় বাহির হতে। যেমন মানুষ মটর গাড়ী নির্মাণ করে এবং নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের সাহায্যে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধ বাহিরের। তারা পৃথক সত্তা। একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সৃষ্টি হতে ঈশ্বরের এইরূপ একটি পৃথক ভাব কল্পিত হয়। কিন্তু যুক্তি তাকে সমর্থন করে না। দার্শনিক বলেন এখানে মানুষ বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি[১] আরোপ করে বলেই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করলে মনে হবে যে শক্তি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তিনি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকেই কাজ করছেন। এই দার্শনিক তত্ত্বকেই সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়।

সর্বেশ্বরবাদের প্রকৃতি বুঝতে আমরা এরিসটটল কল্পিত চার শ্রেণীর কারণের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি দেখতে পারি। তিনি যে চারশ্রেণীর কারণের উল্লেখ করেছেন তারা হল: নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ, রূপ কারণ ও চূড়ান্ত

১. **Anthropomorphism**

কারণ।[১] এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক হবে প্রথম তিনটি কারণ; অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ এবং রূপ কারণ। ভারতীয় দর্শনে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কেউ যখন একটি বাড়ী করতে চায় সে তখন প্রথমে একটা নক্সা করে, তারপর ইট, চুণ, সুর্কি, সিমেণ্ট প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহ করে তারপর মিস্ত্রি লাগিয়ে বাড়ী করে। এখানে নক্সা হল রূপ কারণ, ইট, চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট প্রভৃতি উপাদান কারণ, আর মিস্ত্রি নিমিত্ত কারণ।

সর্বেশ্বরবাদের যুক্তি হল এইরূপ কার্য কারণ সম্বন্ধ বিশ্বের কারণের ওপর আরোপ করা যায় না। কার্য বা সৃষ্টির বাহিরে তার নিয়ামক শক্তির পৃথক অস্তিত্ব নেই। তা সৃষ্টির মধ্যে থেকেই তাকে বিকশিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং মৌলিক শক্তি বিশ্বের একাধারে উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ এবং রূপ কারণ। যে শক্তি আমাদের কাছে বিশ্বরূপে প্রকট তা বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকেই স্রষ্টারূপে ক্রিয়াশীল। নিয়ামক শক্তি হিসাবেও ক্রিয়াশীল। সব কিছু নিয়ে, সব কিছু জড়িয়ে তা প্রচ্ছন্ন ভাবে এবং অপৃথক ভাবে বর্তমান বলেই তাকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। এই সর্বেশ্বরবাদ একটি পরিণত দার্শনিক তত্ত্বরূপে সুন্দরভাবে বিকাশ লাভ করেছিল প্রাচীন উপনিষদের মধ্যে। সুতরাং উপনিষদে তার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেই আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তা যথেষ্ট হবে।

উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের জন্ম কিন্তু বেদের সংহিতার অংশে। ঋগ্‌বেদ সংহিতা একাধারে ধর্ম এবং দর্শন। তাতে যেমন নানা দেবতার প্রশস্তি আছে, তেমন দার্শনিক তত্ত্বেরও আলোচনা আছে। তার মধ্যেই উপনিষদে বিকশিত সর্বেশ্বরবাদের বীজ আকারে অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং পরবর্তী কালে উপনিষদের মধ্যে তার পরিণত রূপটির বিকাশ ঘটেছে। সেই বিকাশের ইতিহাসটি বড় বিচিত্র। তা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

প্রথম অবস্থায় দেখি প্রকৃতির মধ্যে যেখানে শক্তির বা সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা গিয়েছে, সেখানেই বেদের ঋষি তার উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। এইভাবে সূর্য দেবতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, অগ্নি ও অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আকাশের দেবতা দ্যৌ এসেছেন, বায়ু এসেছেন, বরুণ এসেছেন। এই ভাবেই

১. Efficient Cause, Material Cause, Formal Cause and Final Cause

বেদের সংহিতা অংশে দার্শনিক চিন্তাধারা তথা ধর্মের যুগপৎ বিকাশ সুরু হয়েছে এই দেবতারা কিন্তু পরস্পর বিশ্লিষ্ট, তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বলবান, কিন্তু কারও মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এইভাবে প্রথম অবস্থায় বেদের ঋষির নয়নে বিশ্ব বহু বিচ্ছিন্ন শক্তির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলে মনে হয়েছে।

পরের অবস্থায় দেখা যায় এই বিচ্ছিন্ন দেবতাদের পৃথক অবস্থিতি বেদের ঋষিকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তাঁরা প্রকৃতির মধ্যে একটি নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করেছেন, উদ্দেশ্যের ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করেছেন। বিভিন্ন ক্রিয়া যেন একই মহাশক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়েছে। প্রথম উপলব্ধির সঙ্গে ত এই অবস্থার সামঞ্জস্য নেই। তাই তাঁরা এমন এক বিশেষ দেবতার সন্ধান করেছেন যিনি বহু দেবতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেন। তাঁর অতিরিক্ত কাজ হবে ধর্মের পথে সকলকে পরিচালিত করা। তাঁরা বরুণের মধ্যে এই বিশেষ গুণগুলির আবিষ্কার করে তাঁকে এই অতিদেবতার পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সকল দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করবার ব্রত গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি 'ধৃতব্রত'[১]। তিনি অন্যায় হতে সকলকে রক্ষা করেন তাই তিনি 'ধর্মস্য গোপ্তা'। তিনি 'ঋতের' ধারক[২]। এই ভাবে বহু বিশ্লিষ্ট দেবতা হতে এক অতিদেবতার উপলব্ধি এল। এইখানেই ভারতে একেশ্বরবাদের জন্ম হল।

ঋগ্‌বেদের ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তার কিন্তু এখানেই সমাপ্তি ঘটে নি। তা আরও এগিয়ে গেছে। একেশ্বরবাদের ঈশ্বর সৃষ্টি হতে পৃথক। এই অবস্থা বেদের ঋষির কাছে সন্তোষজনক মনে হয় নি। গভীরতর অনুসন্ধানের ফলে তিনি প্রথম এই উপলব্ধিতে উপনীত হলেন যে বহু দেবতাকে নিয়ে এক অতিদেবতার কল্পনা যুক্তিসম্মত নয়। একটি মাত্র মহাশক্তিই বিশ্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল। তাঁর বিভিন্ন প্রকাশকে আমরা বিভিন্ন দেবতা বলে ভুল করি। একই মহাসত্তা আছেন, তাঁকেই বিভিন্ন দেবতার নামে ডাকি[৩]। সুতরাং একটি মহাসত্তাই আছেন বহু দেবতা নেই। শুধু তাই নয় তিনিই সব কিছু হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন[৪]। এই হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই ভাবে বহু দেবতা হতে এক দেবতাবাদ, একদেবতাবাদ হতে সর্বেশ্বরবাদের দ্বারপ্রান্তে এসে বেদের সংহিতা অংশে দার্শনিক চিন্তার সমাপ্তি ঘটেছে।

১. ঋগ্‌বেদ ॥১॥২৪॥৯ ২. ঋগ্‌বেদ ॥১॥২৫॥৮

৩. একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ঋগ্‌বেদ ॥১॥১৬৪॥৪৬

৪. একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্ ॥ ঋগ্‌বেদ ॥৪॥৮॥৫৮

বেদের সংহিতা অংশ যে সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষ হয়েছে, তাই নিয়ে উপনিষদের চিন্তা সুরু হয়েছে। সংহিতার শেষ সিদ্ধান্ত হল এক সর্বব্যাপী সত্তা বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন। সেখানে তাঁকে 'পুরুষ' বলা হয়েছে। তাঁকে উপনিষদে ব্রহ্ম বা ভূমা বলা হয়েছে। উভয়েরই অর্থ এক। যা সকল কিছু ব্যেপে আছে, তাই ব্রহ্ম। যা সব থেকে বিরাট, তাই ভূমা। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ এই ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, যে শক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর সৃষ্টির রীতি মানুষের সৃষ্টির রীতি হতে বিভিন্ন। এখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টা পৃথক নন, সৃষ্টির মধ্যেই তিনি ক্রিয়াশীল। সৃষ্টির প্রবাহ তিনি সৃষ্টির মধ্যে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব প্রচার করে এমন বাণী প্রাচীন উপনিষদগুলির সর্বত্রই পাওয়া যায়। তাদের কয়েকটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ঈশ উপনিষদ আরম্ভ হয়েছে এই কথা দিয়ে যে এই বিশ্বে যা কিছু বিরাজমান সবই ঈশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদিত।[১]

শ্বেতাশ্বর উপনিষদে আছে তাঁর পাণি এবং পাদ সর্বত্র, তাঁর অক্ষি, শির এবং মুখ সর্বত্র, তাঁর শ্রবণশক্তি সর্বত্র বর্তমান, তিনি সকল বস্তুকে আবৃত করে বিরাজমান।[২] মনে হয় ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তের ভাবের দ্বারা এই রচনাটি অনুপ্রাণিত।

মুণ্ডক উপনিষদেও অনুরূপ ভাবধারা পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বের অনন্তবিস্তারের মধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই। তিনিই সর্বত্র প্রসারিত।[৩]

বিরাট বৃহদারণ্যক উপনিষদের বক্ষেও এই চিন্তার পরিবর্দ্ধন আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে যেমন উর্ণনাভি হতে তন্তু উৎপাদিত হয়, যেমন অগ্নি হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমন এই আত্মা হতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা, সকল জীব উৎপাদিত হয়।[৪]

১. ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিং চ জগত্যাং জগৎ ॥ ঈশ ॥১

২. সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্ ॥
সর্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৩।১৬

৩. ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ
অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদম্ ॥ মুণ্ডক ॥২॥২॥১

৪. স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ
সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥ বৃহদারণ্যক ॥২॥১॥২

ব্রহ্মের যে বিশ্ব হতে পৃথক অবস্থিতি নেই, তিনি যে তার সৃষ্টিকে ব্যাপ্ত করে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান সেটি ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হয়েছে। লবণকে জলে ফেলে দিলে তার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। জলের সহিত তা এমন ভাবে মিশে যায় যে তাকে দেখাও যায় না। জলে লবণের আস্বাদই তার অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয়। ব্রহ্মও সেই রূপ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে মিশে গেছেন যে সৃষ্টি হতে তাঁকে পৃথক করে পাওয়া যায় না। তিনি অদৃশ্য অবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান।[১]

ব্রহ্মকে আশ্রয় করেই যে বিশ্ব আছে এবং ব্রহ্মই যে বিশ্বের পশ্চাতে নিয়ামক শক্তি এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যেমন রথনাভি ও রথনেমিতে রথের চক্রের সমস্ত অরগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই রকম এই আত্মার মধ্যেই সকল জীব, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ এবং সকল জীবাত্মা আশ্রিত হয়ে আছে।[২] ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, আমাদের অভিজ্ঞতায় যা জানি, সবই ব্রহ্মের প্রকাশ, তাঁকে আশ্রয় করেই সব কিছুর বিকাশ, সব কিছুর অবস্থিতি এবং তাঁর মধ্যেই সব কিছুর বিলয় ঘটে।[৩] ঈশ উপনিষদে আছে যে শক্তি বিশ্বকে ধারণ করেন, তিনি সব কিছুর জন্য যেখানে যেমন ব্যবস্থার প্রয়োজন শাশ্বত কালের জন্য তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৪] এই বচনগুলি হতে সর্বেশ্বরবাদের তিনটি মূল তত্ত্ব আমরা পাই। প্রথম, বিশ্বকে বিশ্বসত্তা ব্যাপ্ত করে ধারণ করে আছেন। তিনিই বিশ্বের আশ্রয়। দ্বিতীয়, তাকে অবলম্বন করেই বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। তৃতীয়, তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রচ্ছন্ন থেকে বিশ্বকে তার পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

উপনিষদের এই সর্বেশ্বরবাদ পরবর্তীকালে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সমর্থিত হয়েছে। তার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় শেলিং এর দর্শনে। তাঁর মতে বিশ্ব একটি বিরাট সত্তার অভিব্যক্তি স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক-ইতিহাসকার থিলি-এর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটির অনুবাদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন :

১. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ষষ্ঠ অধ্যায়

২. বৃহদারণ্যক ।।২।।৫।।১৫

৩. সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি ।। ছান্দোগ্য ।।৩।।১৪।।১

৪. কবি মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূ র্যা থাতথ্যতো ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।। ঈশ ।।৮

"পরিণত অবস্থায় শেলিং-এর দর্শন এমন একপ্রকার সর্বেশ্বরবাদ প্রচার করে, যা বিশ্বকে একটি জীবন্ত, বিকাশশীল, সুগঠিত সত্তা হিসাবে কল্পনা করে। তার প্রত্যেক অঙ্গের তার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং তারা সমগ্রকে শক্তি আধান করে। এই অর্থে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, বস্তু এবং তার রূপ, মানসিক এবং বাস্তব সত্তা—সবই এক এবং অভিন্ন হয়ে যায়। একই বহু হয় এবং বহু এক হয়। যেমন কোন দেহ হতে আমরা তার অঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না, কিম্বা তাদের বাদ দিয়েও দেহকে বুঝতে পারি না, সেই রকম।"[১]

দর্শনের কল্পনাভিত্তিক অনুমানকে এইভাবে অবলম্বন করে সর্বেশ্বরবাদ গড়ে উঠেছে। যুক্তিমার্গে যে এই সিদ্ধান্তই প্রশস্ত, তার সমর্থন আমরা বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক চিন্তা হতেও পাই। এই প্রসঙ্গে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন-এর এ বিষয় মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি। তাঁর মতেও সর্বেশ্বরবাদই বিশ্বের সব থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"চিন্তা করতে এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে দেখতে উৎসাহ দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কুসংস্কার হতে মানুষের মনকে মুক্তি দিতে পারে। এটা নিশ্চিত সত্য যে ধর্মবোধের অনুরূপ একটি বিশ্বাস যে বিশ্ব বুদ্ধিসম্মতভাবে গঠিত এবং মনন শক্তির প্রয়োগে তাকে বোঝা যায়—এই রূপ ধারণা উচ্চস্তরের সকল বৈজ্ঞানিক কাজে অন্তর্নিহিত আছে।

এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং তার সঙ্গে জড়িত একটি গভীর উপলব্ধি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে উচ্চস্তরের ধীশক্তি বিশিষ্ট একটি মন আত্মপ্রকাশ করছে—এই দুই নিয়ে ভগবান সম্বন্ধে আমার ধারণা গঠিত। সাধারণ ভাষায় তাকে সর্বেশ্বরবাদ বলে বর্ণনা করা যায়।"[২]

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিমার্গ প্রয়োগ করে ঈশ্বরকে ধারণা করতে গিয়ে সর্বেশ্বরবাদকে গ্রহণ করেছেন। আশ্চর্যের কথা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কবিও অনুরূপভাবে সর্বেশ্বরবাদের গলায় বরমাল্য দিয়েছেন। কবির জানবার রীতি যুক্তি নয়, অনুমান নয় ; তা হল হৃদয়বৃত্তি প্রভাবিত সম্বিৎ। তা শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতির সহিত তুলনীয়। তারও সিদ্ধান্ত একই। এই প্রসঙ্গে কবি

১. Thilly, History of Philosophy, P, 455

২. "This firm belief, bound up with a deep feeling in a superior mind that reveals itself in the world of experience, represents my conception of God. In common parlance this may be described as Pantheistic. Ideas and opinions, Scientific Truth

ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর এ বিষয় উপলব্ধির উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি উপলব্ধি করেছেন "অতি গভীর ভাবে পরিব্যাপ্ত একটি সত্তার অলৌকিক অনুভূতি, যার আবাস অস্তোন্মুখ রবির রাঙা আলোয়, গোলাকার মহাসমুদ্রে, চঞ্চল সমীরণে, সুনীল আকাশে ; এমন একটি গতিশীল অশরীরী শক্তি যা সকল মননশীল সত্তা, সকল জ্ঞানের বস্তু এবং সবকিছুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।"[১]

ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর অনুভূতির অনুরূপ উপলব্ধি আমরা শেলী এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও পাই। তাদের উদ্ধৃত করে বর্তমান আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করবার প্রয়োজন নেই। সুতরাং যুক্তির পথে যা পাই অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত সম্বিৎ-এর পথেও তা সমর্থিত হয়। এর ফলে সর্বেশ্বরবাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করা শক্ত হয়ে পড়ে।

তা সত্ত্বেও সর্বেশ্বরবাদের একটি দুর্বলতা রয়ে যায়। তা ঘটেছে তা যুক্তি মার্গকে একান্তভাবে আশ্রয় করেছে বলেই। সর্বেশ্বরবাদ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রচুর তৃপ্তি দেয়, এমন কি খানিক পরিমানে হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়িত করে। যেমন বিশ্বসত্তার বহু ও বিচিত্র রূপে প্রকাশ, তাঁর বিরাটত্ব আমাদের মনে বিস্ময়-বোধ ফুটিয়ে তোলে এবং শ্রদ্ধা বোধ জাগায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর যে কবিতার অংশ উদ্ধৃত হয়েছে তারও প্রেরণা ছিল অনুরূপ অনুভূতি। তা সত্ত্বেও তার একটি দুর্বলতা রয়ে যায়।

তা হল তা ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করার সুযোগ দেয় না। সর্বেশ্বর-বাদের ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। তাঁকে ভক্তি করা, তাঁর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয় না। অথচ ধর্মবোধের উন্নততর বিকাশে এই ধরণের একটি আকুতি প্রবল হয়ে পড়ে। অহেতুক ভক্তির প্রেরণায় ভক্তির পাত্র হিসাবে মানুষের মন তাঁকে পেতে চায়। সর্বেশ্বরবাদ ভক্তের এই তৃষ্ণা নিবারণ করতে অক্ষম। যেখানে সর্বেশ্বরবাদের দুর্বলতা সেখানে একেশ্বরবাদের ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সবলতা। এই সবলতার গুণেই যুক্তি মার্গে হেরে গিয়েও একেশ্বরবাদের আকর্ষণ শিথিল হয় না। তা সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলে।

১. **"A motion and a spirit, that impels**
All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things,"

Tintern. Abbey, Lines 99—101.

তার সুন্দর উদাহরণ আমাদের দেশের ধর্মের ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমরা জানি ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার ভিত্তি হল নীতি সম্মত জীবন যাপনের আদর্শ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সেখানে স্বীকৃত নয়। কাজেই ভক্তি নিবেদনের সুযোগ সেখানে ছিল না। এই কারণেই একদিন বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মের বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেল। দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরে তাঁর বাণীকেই তার ভক্তেরা পালন করল। তারপর তাদের ভক্তি নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা এমন প্রবল হয়ে উঠল যে ভগবান বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপ করে, তাঁকে মন্দিরে স্থাপন করে, তাঁর অর্চনা আরম্ভ করে দিল। এই ভাবেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের একদিন জন্ম হয়েছিল।

প্রায় সমসাময়িক কালে হিন্দুধর্মেরও একটি অনুরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হল। আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি বেদের সংহিতা অংশে বহু দেবত্ব বাদ হতে সর্বেশ্বরবাদের পথে বিকাশ ঘটেছে এবং উপনিষদে সর্বেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় তার ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার পরিণতি ঘটেছে। ষড়দর্শনের যুগেও ভক্তি হতে জ্ঞানের প্রতি ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার প্রবলতর আকর্ষণ ছিল জ্ঞানমার্গে মুক্তিই তখন পুরুষার্থ বিবেচিত হত। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির প্রভাব একদিন এমন প্রবল হয়ে উঠল যে ভক্তিমার্গে ঈশ্বরকে পাবার জন্য হিন্দুধর্মের চিন্তায় একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা এল। এই ভাবেই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উদ্ভব সংঘটিত হয়।

(৫)

সমন্বয়ের পথ নির্দেশ

একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের প্রতিযোগিতা এইভাবে মনে দাঁড়ায় ধর্ম নির্ধারণে বুদ্ধি বৃত্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হবে, অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হবে, না ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হবে। ধর্ম সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তায় আমাদের দেশে এদের মধ্যে একাধিক সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। প্রশ্ন সে সমন্বয় কতখানি গ্রহণযোগ্য। বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা তার এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

সোজাসুজি সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে দুই পথে। একটি পথ বলে অনুসারে দুটির একটিকে ভক্ত নির্বাচন করে নিতে পারে। যার জিজ্ঞা মনোভাব প্রবল তিনি সর্বেশ্বরবাদকে গ্রহণ করুন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এ

পথে মীমাংসার চেষ্টা করেছেন। আর একটি মত বলে বিশ্ব সত্তার একই সঙ্গে দুই বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ। এক স্তরে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হিসাবে কাজ করেন এবং আর এক স্তরে তিনি ব্যক্তিরূপী সত্তা রূপে ভক্তের সহিত প্রীতির আদান প্রদান করতে পারেন। এই অভিনব তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের। একেই তিনি জীবন দেবতা তত্ত্ব বলেছেন। আমরা প্রথমে তাঁদের সংক্ষেপে পরিচয় দিতে পারি।

উনবিংশ শতাব্দীকে ধর্ম নিয়ে বাংলা দেশে তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক আদর্শে বিগ্রহ পূজার রীতির সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের নিরাকার উপাসনার রীতির একটি সংঘাত ঘটেছিল। কাজেই সাকার উপাসনা গ্রহণযোগ্য কিনা এই প্রশ্ন বাঙালী হিন্দুর মনকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। কেহ সাকার উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলে নিন্দা করে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, কেহ নিরাকার উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। এই সূত্রেই ব্রাহ্ম ধর্মের জন্ম হয়। এই বিতর্কের পরিবেশেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। তাঁর মধ্যে একটি উদার মনোভাব ছিল। তাই তিনি বিতর্কে জড়িত হয়ে না পড়ে একটি মীমাংসার সূত্র বার করেছিলেন।

সমস্যার তিনি সমাধান করতে চেয়েছিলেন সকল ধর্মমতের সহাবস্থিতির যোগ্যতা স্বীকার করে। কোন বিশেষ ধর্ম যে অন্য কোন ধর্ম হতে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, এ প্রশ্ন তাঁর মতে অবান্তর। প্রয়োজন হতে নানা ধর্মের উৎপত্তি। ঈশ্বর-তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য নানা ব্যবস্থা হয়েছে। সেই তৃষ্ণা নিবারণ করবার শক্তি থাকলেই যে কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য। যার তৃষ্ণা পেয়েছে সে জল পান করতে চায়। সে জল পুষ্করিণী থেকে এল, কি নদী থেকে এল, কি কূপ থেকে এল, তাতে কিছু আসে যায় না। তৃষ্ণানিবারণী শক্তি তাদের সকলের মধ্যেই বর্তমান। এই কারণে ধর্ম সম্বন্ধে একদেশদর্শী মনোভাবকে তিনি 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলতেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"আন্তরিক হইলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।······কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। এসব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি, অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ধর্ম মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়।"[১]

বিভিন্ন ধর্মরীতির সহাবস্থিতির প্রসঙ্গের সঙ্গে দুটি যুক্তি আছে। প্রথম, মানুষের রুচি কে কোন ধর্মমত গ্রহণ করবে, তা মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করে।

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ

দ্বিতীয়ত তার বোধ শক্তিও খানিকটা তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে। যার মনন শক্তি দুর্বল তার কাছে দার্শনিক আলোচনা অর্থহীন। এই দুটি অবস্থা কার কোন ধর্মমত গ্রহণে যোগ্যতা আছে, তা নির্ধারণ করে দেয়। একে ভারতীয় দর্শনে অধিকার ভেদ বলা হয়। অধিকার ভেদ অনুসারে যে ভিন্ন মানুষের ভিন্ন রীতির ধর্মের প্রয়োজন আছে, তা বোঝাতে তিনি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই এখানে তা স্থাপন করা যেতে পারে:

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এনেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন, যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলাও, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে, যেটি যার পেটে সয়। বুঝলে?"[১]

তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজবোধ্য করবার জন্য এই মন্তব্য করেছেন:

"চিকিৎসকেরা যেমন বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্ন ভাবে করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন তিনি ও তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন রকম সাধনা নির্দেশ করতেন। সাধারণত তিনি দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা না দেওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। তবে তিনি আমায় অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন।"[২]

উপরের মন্তব্য হতে বোঝা যায় তাঁর আকর্ষণ বেশী ছিল একেশ্বরবাদের প্রতি। তাকেই বিবেকানন্দ দ্বৈতবাদ বলেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি বেদান্তের বিমূর্ত একবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে আপত্তি দেখেন নি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই চিন্তাধারার সঙ্গে গীতার একটি কথার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। সেটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যে যেমন ভাবে আমাকে চায়, আমি তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করি; ধর্মের বিভিন্ন পথ ধরে তারা আমারই অনুমোদিত পথকে অবলম্বন করে।[৩] এই ভাবে বিভিন্ন ধর্মসম্পর্কিত মতের সহাবস্থিতির নীতি এখানেও স্বীকৃত হয়েছে। তবে মনে হয় রামকৃষ্ণ নিজস্ব চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, ১ম ভাগ
২, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড
৩. যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ গীতা॥ ৪॥ ১৬

রবীন্দ্রনাথ সর্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা খুঁজেছিলেন একটি অভিনব পথে। তিনি বলতে চেয়েছেন যে বিশ্বসত্তার একই সঙ্গে দুই পর্যায়ে প্রকাশ। একটি হল কাজের প্রকাশ এবং অপরটি আনন্দের প্রকাশ। যেখানে তাঁর কাজের প্রকাশ সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। এখানে সর্বেশ্বরবাদ স্বীকৃত। যেখানে আনন্দের প্রকাশ সেখানে তিনি ব্যক্তিরূপী সত্তা হয়ে ভক্তের প্রীতি আকর্ষণ করেন। এখানে একেশ্বরবাদের স্বীকৃতি। তাঁর মনের ধারণা, বিশ্বে এত যে অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি তার মধ্যে আমরা বিশ্বসত্তার আনন্দের পরিচয় পাই। সেগুলি যেন ব্যক্তিরূপী বিশ্বসত্তার প্রেমের লিপি। তিনি বলেছেন :

"নানাছলে, নানা কথায়, বিশ্বের সর্বত্র আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়েছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও।"[১]

এই প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি বলেছেন, "এই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে এবং আনন্দের মূর্তি দেখতে পাই সৌন্দর্যে।" এই আনন্দের প্রকাশকেই তিনি 'জীবনদেবতা' রূপে কল্পনা করেছেন। কারণ, তিনি যেন মানুষের অন্তরে বসে, মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে আনন্দ পান। ভক্তের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের তিনি তুলনা করেছেন নাট্যের প্রযোজকের সঙ্গে অভিনেতার সম্বন্ধের সহিত। তাঁর এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় উপসংহারে তিনি বলেছেন যে এখানে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের সহিত বৈষ্ণবদর্শনের ভক্তিবাদের সামঞ্জস্য ঘটেছে। তা উভয় তত্ত্বকেই স্বীকার করে। তাঁর মতে এই তত্ত্বের দুটি অঙ্গ আছে। একটি তত্ত্ব বৈষ্ণবদর্শনের একেশ্বরবাদের অনুসরণে ঈশ্বর ও ভক্তের ব্যক্তিরূপে পৃথক অবস্থিতি স্বীকার করে নেয়। অপরটি উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের মত প্রচ্ছন্ন একটি সর্বব্যাপী সত্তাকেও গ্রহণ করে। ঈশ্বর একাধারে দুই। এক রূপে তিনি ভক্তের প্রেমাস্পদ এবং অপররূপে উপনিষদের পরিকল্পিত সকল বস্তুর ধারক সত্তাও বটে।[২]

১. শান্তিনিকেতন, সৌন্দর্য।

২. "The idea has a double strand. There is the Vaisnava dualism always keeping the separateness of the self and there is the upanishadic monism. God is wooing each individual and God is also the ground reality of all as in the vedantic unification."

Tagore's letter to Dr. Thompson.

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই স্বীকার করেন তাঁর এই জীবনদেবতা তত্ত্ব কোন দার্শনিক চিন্তা হতে উদ্ভূত হয় নি। তার ভিত্তি হল একটি দিব্য অনুভূতি।[১] তিনি এই সিদ্ধান্তকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করতে চান নি। এটি তাঁর গভীর উপলব্ধি হতে সঞ্জাত। সুতরাং এই তত্ত্ব ততখানি যুক্তির উপর স্থাপিত নয়, যতখানি বিশ্বাসের ওপর। ঠিক বলতে কি ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না। এ বিষয় পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। সুতরাং পুনরায় সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই হবে যে বিশ্বসত্তার মত বিরাট ব্যাপক সত্তার নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হবার সম্ভাবনাই বেশী। এদিক থেকে দেখলে মনে হয় রামকৃষ্ণের সমাধান যুক্তির বেশী সমর্থন আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের যুক্তি নির্ভর হওয়া নিরপেক্ষ ভাবে মানুষের রুচিবোধের ভিত্তিতে এখানে বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের সহাবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে একটি তৃতীয় পথেও এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। তাকে আমরা মানবিকতার পথ বলতে পারি। কোঁত প্রবর্তিত মানবিকতার সহিত তার একটি প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। তিনি ধর্ম ও দর্শনের ওপর আস্থা হারিয়ে কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভিত্তি করেই তাঁর নৈশ্চিত্তিক দর্শন[২] গড়ে তুলেছেন। ধর্মবোধের সঙ্গে মানুষের দুটি মূল বৃত্তি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একটি অনুভূতি বা হৃদয়বৃত্তি এবং অপরটি সেবাবৃত্তি। ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপী সত্তা জ্ঞানে প্রীতি করে হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি, আর তাকে সেবা করবার আকৃতির তৃপ্তির জন্য তাকে বিগ্রহরূপে পরিকল্পনা। কোঁত এই দুটি বৃত্তির তৃপ্তি খুঁজেছেন অন্যপথে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে, তাঁকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। কাজেই তাঁর নূতন পরিকল্পনায় ভক্তির পাত্র হিসাবে স্থান নিয়েছেন বিশেষ বিশেষ মহামানব এবং সেবার পাত্র হিসাবে স্থান নিয়েছে সাধারণ মানুষ।

ভারতবর্ষে যে মানবিকতা গড়ে উঠেছে তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তা ঈশ্বরকে বর্জন করে নি ঈশ্বরকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। মোটামুটি তার যুক্তি হল এই : ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ কোথাও নেই, কারণ তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সকল জীবে, সকল বস্তুর মধ্যে অপ্রত্যক্ষ বিরাজ করেন। সে ক্ষেত্রে মানুষের নিকট তাঁর যে প্রকাশ ঘনিষ্ঠতম, তার মধ্যেই তাকে আবিষ্কার করে, তাকে প্রীতি

১. Religion of Man, The Vision.
২. Positive Philosophy

করে এবং তার সেবা করে ধর্মবোধের তৃপ্তি খোঁজা বিধেয়। এই পরিকল্পনার একটি বিশেষ উৎকর্ষ এইখানে যে তা ধর্মবোধের তৃপ্তিসাধনে মানুষের তিনটি মৌলিক বৃত্তির প্রয়োগের স্থযোগ দেয়। প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আমরা আবিষ্কার করি যে মানুষরূপেই মানুষের নিকট বিশ্বসত্তার ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর জ্ঞানে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে আমরা হৃদয়-বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করতে পারি। তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের সেবা করে, বিশেষ করে অবহেলিত মানুষের সেবা করে আমরা সেবাবৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থাপন করতে পারি। বিগ্রহ পূজা কেবল ভক্তের তৃপ্তি সাধন করে, কিন্তু দরিদ্রনারায়ণ, বা নরনারায়ণের সেবা অতিরিক্তভাবে মানব কল্যাণের সহায়ক হয়। সাম্প্রতিক কালে দুই ভারতীয় মনীষী এই প্রকারের মানবিকতা-তত্ত্ব প্রচার করে সর্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসার প্রয়াস করেছেন। তাঁরা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের পরিকল্পিত মানবিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে।

অদ্বৈত বেদান্তের বিশুদ্ধ একত্ববাদের গলায় বরমাল্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ একটি দোটানার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিশ্ব যদি প্রপঞ্চময় হয়, তা যদি স্বপ্নের মত অলীক হয়, তা হলে মানুষের জীবনে দুঃখকষ্ট ভোগও ত অলীক। সে ক্ষেত্রে তার ওপর হৃদয়বৃত্তির অপব্যয়ের কোন অর্থ থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি যা বলেছিল তার হৃদয়বৃত্তি তাকে অনুমোদন করতে পারে নি। সেই জন্যই এই দোটানার একটি সমাধান তাঁকে খুঁজতে হয়েছিল। ফলে তিনি একটি নূতন সমাধানের পথও খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন যে ইন্দ্রিয়গোচর বৈচিত্র্যময় বিশ্ব ত পরমসত্তা হতেই উদ্ভূত এবং তাঁকে অবলম্বন করেই বর্তমান; স্থতরাং তাও সত্য, তা ঠিক প্রপঞ্চময় নয়। কাজেই মানুষ সত্য, মানুষের দুঃখ-কষ্ট-ভোগ সত্য এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রণোদিত হয়ে মানুষের সেবা করা হৃদয়বৃত্তির বৃথা অপচয় নয়।

এই ভাবে হৃদয়বৃত্তির রসে সিঞ্চিত হয়ে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ বিবেকানন্দের হাতে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করল। তিনি বললেন বিশ্বে যা কিছু দেখি তা ত ঠিক মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যা দেখি, যা শুনি, যা অনুভব করি সবই ত পরমসত্তার পরিণাম। একরকম বলতে গেলে তারা স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপ। তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে পরমসত্তা সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে থাকলেও মানুষের নিকট তার বিশেষ প্রকাশ মানুষ রূপেই। তিনি বললেন :

"ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে তিনি মানুষের ভিতরেই প্রকাশিত।"[১]

এইভাবে অদ্বৈত বেদান্তের আশ্রয়ে যাকে বলা হয়ে থাকে ব্যবহারিক বেদান্ত তার জন্ম হল। বেদান্তীর কর্মক্ষেত্র সাধনেই সীমাবদ্ধ রইল না, তা আরও বিস্তার লাভ করল। বিশ্ব মানবের সেবা ও কল্যাণ সাধন হয়ে পড়ল তাঁর স্থাপিত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সাধনার অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে তাঁর উপদেশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"বেদান্ত বলেন এইরূপ কার্য কর, সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রেরিত, এমন কি ঈশ্বর রূপে চিন্তা কর—জানিয়া রাখ, ইহাই কেবল আমাদের কর্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা—কারণ ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইবে।"[২]

রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাধন জীবনের পরিণতিতে একটি অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বর্তমান প্রসঙ্গেই কি ভাবে তিনি সর্বেশ্বরবাদের এবং একেশ্বরবাদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা করেছিলেন তার কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা হতেই তাঁর জীবনদেবতা তত্ত্বের জন্ম। তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরিণতিতে দেখা যায় তিনি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁর ধারণায় তাই হবে আদর্শ ধর্ম যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং সেবা বৃত্তির প্রয়োগের সমান সুযোগ দেয়। সর্বেশ্বরবাদ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না ; কারণ তাতে হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের সুযোগ নেই। জীবনদেবতা তত্ত্ব অনুভূতি বৃত্তিকে তৃপ্তি দেয় প্রচুর, কিন্তু সেবাবৃত্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র সেখানে পাওয়া যায় না। যে দেবতা ধরা দেন না, যিনি আড়ালে থেকে ভালবাসেন তাঁর কাছে ত সেবা পৌঁছে দেওয়া যায় না। অথচ যাকে ভালবাসি তাকে সেবা করতেও মন চায়। তাই তিনি পরম-সত্তাকে এমন রূপে আবিষ্কার করতে চাইলেন যেখানে তাঁকে সেবার পাত্র রূপেও পাওয়া যাবে। এই চিন্তার পথেই তাঁর মানবিকতার জন্ম।

তাঁর এক নূতন উপলব্ধি হল যে বিশ্বসত্তা যখন সব কিছু জুড়ে প্রকাশ নিয়েছেন তখন তাঁকে সেই রূপেই সেবা করতে হবে যে রূপে তিনি মানুষের নিকট ঘনিষ্টতম রূপে প্রকাশ। তাঁর সেই রূপ রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের রূপ।

১ ভক্তি রহস্য ২ জ্ঞানযোগ

তাঁর আরও ধারণা হল যে মানুষের মধ্যে যারা অবহেলিত, দরিদ্র এবং রিক্ত তাদের মধ্যে যেন পরমসত্তার বিশেষ প্রকাশ। যারা সবার নীচে, সবার পিছে তাদের মধ্যেই তিনিই বিশেষভাবে আসন নিয়েছেন। তিনি বললেন,

যেথায় থাকে সবার অধম
দীনের হতে দীন,
সেইখানেতে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে
সব হারাদের মাঝে [১]।

সুতরাং পরম সত্তার সেবা করতে হলে তাঁকে মানুষ রূপে, বিশেষ করে অবহেলিত মানুষ রূপেই সেবা করতে হবে। তাই তাঁর পরিণত সিদ্ধান্ত হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করে বিশ্বজনীন কর্মই আদর্শ ধর্ম। তার ধারণায় এই পথে মানুষের তিনটি বৃত্তিরই প্রয়োগে সুযোগ দেওয়া যায়। জ্ঞানের পথে বিশ্বসত্তার সর্বব্যাপিত্ব আমরা সাধারণভাবে উপলব্ধি করতে পারি। জল-স্থল-আকাশ নিয়ে যে জড়প্রকৃতি তার সঙ্গে হৃদয়ের আদান-প্রদান চলে না। অন্যজীবের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। মানুষের সঙ্গে সে ক্ষেত্রের বিস্তার অনন্ত। অপর পক্ষে মানুষের সেবা, বিশেষ করে অবহেলিত মানুষের সেবা সব থেকে তৃপ্তিকর। তাই তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত হল :

"আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রকাশ করিলে তবে আমাদের পক্ষে আমাদের অধিকার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মদ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই"[২]।

উপসংহারে কয়েকটি মন্তব্য করে এই অধ্যায়টি শেষ করা যেতে পারে। আর্ত ও অর্থার্থীর ঈশ্বরকে আশ্রয় করে নিম্নস্তরের ধর্ম, স্বার্থ প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রেরণা। তুলনায় একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে ঈশ্বরের ভক্তি এবং জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁকে জানার চেষ্টায় সর্বেশ্বরবাদকে গ্রহণ—এ দুটিই উন্নত স্তরের ধর্মের রূপ। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ অহৈতুক। তাদের পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গির। ভক্তিবাদ হৃদয়বৃত্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত, সর্বেশ্বরবাদ কৌতূহল বৃত্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত। ভক্তিবাদের ভিত্তি বিশ্বাস, সর্বেশ্বরবাদের ভিত্তি যুক্তি। রুচিভেদে মানুষ দুইকেই গ্রহণ করবে। তবে সমন্বয় করতে হলে সর্বেশ্বরবাদের ভিত্তিতে মানবিকতার মধ্যেই তা সম্ভব। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি, উভয়েরই প্রয়োগ ক্ষেত্র থাকে অথচ তা সর্বথা যুক্তিদ্বারা সমর্থিত।

১. গীতাঞ্জলি ২. ধর্ম

নবম অধ্যায়

নীতিতত্ত্ব

(১)

প্রাথমিক কথা

মানুষের যেমন ধর্মবোধ আছে তেমন নীতিবোধ আছে। তা তার প্রকৃতির মধ্যেই গ্রথিত। ধর্মবোধের মূল অবলম্বন হল হৃদয়বৃত্তি। বিশ্বসত্তার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনে উৎসুক হয়। ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধানের বিষয় হল মানুষের এই ধর্মবোধের তৃপ্তি কোন আদর্শে সব থেকে ভালভাবে সাধিত হবে। অনুরূপভাবে নীতিবোধের অবলম্বন হল মানুষের আর একটি মৌলিক বৃত্তি। তা হল ইচ্ছাবৃত্তি। এই ইচ্ছাবৃত্তিই মানুষের সকল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মের প্রেরণা। মানুষের প্রকৃতি ; পরিবেশ ও রুচির ভিন্নতা অনুসারে নানা প্রকার ইচ্ছা চরিতার্থ করবার আকাঙ্খা জাগে। সেই ইচ্ছাগুলি আবার অনেক সময় পরস্পরের বিরোধী হয়। বিরোধ নানা ভাবে আসতে পারে। ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব স্বার্থেও দ্বন্দ্ব আসতে পারে। মানুষের দেহ আছে, মন আছে। তাদের মধ্যে কার দাবী অগ্রাধিকার পাবে? আবার মানুষ সামাজিক জীব। অন্যের স্বার্থ এবং গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেও তার বাস করতে হয়। সেখানেও নানা স্বার্থের দ্বন্দ্ব এসে পড়ে। এখন প্রশ্ন ওঠে এই যে নানা ইচ্ছার সংঘাত, তাদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে?

মানুষের মনের মধ্যেই যে একটি নিয়ন্ত্রক শক্তি ক্রিয়া করে সে বিষয় আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। একটা মন্দ ইচ্ছা পূরণ করতে উদ্যত হলে মনের এক অংশ বলে, এটা কোরোনা, ভাল হবে না, অন্যায় হবে ইত্যাদি। তাকেই আমরা বিবেক বলে থাকি। আবার হঠকারিতার সঙ্গে কিছু করে বসলে পরে অনুশোচনা আসে, কেন করে বসলাম, না করলেই ভাল হত— এই ধরণের কথা মনে উদয় হয়। তাকে বলা হয় বিবেকের দংশন। সুতরাং মানুষের মনের মধ্যেই একটি নীতিবোধ প্রোথিত আছে, এ কথা বলা যায়। এই নীতিবোধেরই মুখপাত্র যেন মানুষের বিবেক।

নীতিতত্ত্বের মূল সমস্যা হল কোন আদর্শদ্বারা আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করব। নিয়ন্ত্রণের জন্য দর্শনে একটি মৌলিক আদর্শ স্থাপনের

চেষ্টা হয়, যা ব্যাপক ভাবে আমাদের বিভিন্ন কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা রাখে। এই প্রসঙ্গকে জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং যে প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা হয় তা হল আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষা একই সমস্যাকে দেখেছেন। সুতরাং তাঁরা বলেন নীতি তত্ত্বের মূল প্রশ্ন হল মানুষের পুরুষার্থ[1] কি, অর্থাৎ জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য দর্শনেও অনুরূপ সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে[1]।

প্রথমেই একটা প্রশ্ন ওঠে যা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। নৈতিক তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়, ব্যক্তি বিশেষের কি কর্তব্য নির্বাচনে স্বাধীনতা আছে, না সে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে তার এ বিষয়ে কোন স্বাধীনতা নেই? এই ভাবে নীতিতত্ত্বের আলোচনার আরম্ভেই একটি বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়ঃ কর্মে স্বাধীনতা আছে[2] না কর্ম প্রাক নিয়মিত[3]? এই বিতর্কটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হলেও তার সমাধানের উপর নৈতিক আলোচনা নির্ভর করে না। কারণ, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা হক বা না হক, ব্যবহারিক জীবনে আমাদের প্রতিনিয়তই দুই বিকল্প কর্মের একটিকে নির্বাচন করে নিতে হয়। কাজেই আলোচনাটি সংক্ষেপে সেরে নিলেই চলবে।

যারা কর্তব্য নির্বাচনে স্বাধীনতা অস্বীকার করেন তাঁরা মোটামুটি বলেন, আমাদের অতীত, আমাদের পরিবেশ, আমাদের ঝোঁক প্রভৃতি বিকল্প কর্মের একটি নির্বাচনে স্বাধীনতা দেয় না, একটি নির্বাচন করতে বাধ্য করায়। আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের ইচ্ছাদ্বারা, আমাদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের উদ্দেশ্য দ্বারা এবং আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের অতীত জীবনদ্বারা।

এই যে যুক্তিগুলি প্রদত্ত হল, এগুলি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যেন তা প্রকৃত পক্ষে বাকচাতুরির অতিরিক্ত কিছু নয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে দুটি বিকল্প কর্মের একটির নির্বাচনের কাজ ব্যক্তি বিশেষকে করতেই হয়। সুতরাং নির্বাচন যে একটা ঘটে সেটা স্বীকৃত। বলা হয় যে ভাবে নির্বাচন হয় তা নিয়ন্ত্রিত হয় অতীতের দ্বারা। কিন্তু অতীতেও ত ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা তার কর্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সুতরাং অতীতেও তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি

১. Sumum bonum ২. Freedom of action ৩. Determinism

প্রয়োগ একটি উপাদান। তাই মনে হয়, এই কর্তব্য নির্বাচনে স্বাধীনতার অস্বীকার অনেকটা একটি দৃষ্টিভঙ্গির ফল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেমস জীনস এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন[১]।

এই প্রসঙ্গে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে আমাদের দুটি বিকল্প কর্মের মধ্যে একটি নির্বাচন করবার স্বাধীনতা আছে। আমরা অনুভব করি তাদের একটিকে আমরা ইচ্ছামত নির্বাচন করতে পারি। তার সমর্থক অভিজ্ঞতাও আমাদের মনে আছে। একটি বিশেষ কাজ করে তৃপ্তিবোধ বা তার পরিণতি খারাপ হলে অনুশোচনা, এই বিশ্বাসের সমর্থন করে। তারপর আমাদের মধ্যে যে দায়িত্ব বোধ আছে তাও এই বিশ্বাসের সমর্থন করে। সবার বড় কথা, কর্মে স্বাধীনতা আছে ধরে না নিলে আমাদের কর্মজীবন অচল হয়ে যায়। কান্ট-এর অনুসরণে বলা যায় যে নীতির ক্ষেত্রে কর্মনির্বাচনে স্বাধীনতাকে একটি স্বতঃসিদ্ধ[২] বলে গ্রহণ করতেই হয়। এইটুকু বলেই এই প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টেনে দিলে অসঙ্গত হবে না মনে হয়।

এখন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যেতে পারি। নৈতিক তত্ত্বের মূল প্রশ্ন হল মানুষের পুরুষার্থ কি। তা নিয়ে নানা মত উদ্ভূত হয়েছে। তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। তাদের ভিত্তি হল মানুষের প্রকৃতির গঠন। সেই প্রকৃতির চতুর্মুখী গতি এবং সেই চারটি গতির মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী। প্রথমত মানুষের দুটি দিক আছে, এক দিক মন এবং অন্য দিক দেহ। এদের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর বিরোধী। দেহ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তা ভোগের প্রতি আকৃষ্ট। মন আকৃষ্ট হয় চিন্তা ও জ্ঞানের প্রতি, তা ইন্দ্রিয় হতে দূরে সরে যায়। সুতরাং দেহ যা চায় মন তা চায় না এবং মন যা চায় দেহ তাকে আমল দেয় না। দেহ চায় ইন্দ্রিয় সুখ, মন চায় জ্ঞান আলোচনা। দেহ চায় ভোগে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে, মন চায় ইন্দ্রিয় সংযম। দেহ হয়ে পড়ে ভোগবাদী[৩], আর মন হয়ে পড়ে সন্ন্যাসবাদী[৪]।

এদিকে মানুষ আবার সামাজিক জীবও বটে। সে একা বাস করে না, গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করে। এই অবস্থাকে ভিত্তি করে তার মনে দুটি বিরোধী

১ "To some extent the whole matter is one of jiggling in words."
Physics and philosophy,
Some Problems of Philosophy.

২ Postulate of Morality.

৩ Hedonism. ৪ Asceticism

ইচ্ছা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ব্যক্তি মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বার্থ খুঁজবে, না সমগ্র সমাজের কল্যাণ খুঁজবে, এই হয়ে দাঁড়ায় সমস্যা। মানুষের মনের একটি দিক বলে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড়, সমাজ ত বাহিরের জিনিস। আর অন্যটি বলে ব্যক্তিগত স্বার্থ খোঁজা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয়; চাই নিজ স্বার্থ ত্যাগ, চাই সমাজের জন্য আত্ম বলিদান। যে মত বলে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড জিনিস, ব্যক্তিগত স্বার্থকেই প্রাধান্য নিতে হবে তাকে স্বার্থবাদ[১] বলতে পারি। যে মত বলে পরার্থে আত্মত্যাগই বড জিনিস তাকে পরার্থবাদ[২] বলতে পারি। নীতির বিভিন্ন সম্ভাব্য আদর্শকে এই ভাবে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একমত অনুসারে যে কাজ ভাল, অন্যমত অনুসারে তা মন্দ; আবার অন্যমত অনুসারে যা ভাল তা আর একমত অনুসারে মন্দ। এমনি পরস্পর বিরোধী সব তত্ত্ব।

বিষয়টির আরও গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখব যে এই দুই জোডা বা চারটি পরস্পর বিরোধী মতকে এক জোডা বা দুটি পরস্পর বিরোধী মতে ভাগ করতে পারি। দেহ যা চায় তা হল প্রতি মুহূর্তের ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ। আবার ইন্দ্রিয় সুখ অর্থেই ব্যক্তি বিশেষের ইন্দ্রিয় সুখ, তা ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। কাজেই ব্যক্তি স্বার্থের অন্বেষণ এবং ইন্দ্রিয় সুখ অন্বেষণ—এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি একই হয়ে দাঁড়ায়। এই দুটি আদর্শের সংযোগে যে যুক্ত আদর্শটি পাই তাকে প্রেয়বাদ বলে নাম দিতে পারি। কারণ যা আপাত মধুর এবং ইন্দ্রিয় সুখকর তাই হল প্রেয়। তার সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে স্বার্থপর করে গডে তোলে এবং পরার্থ সম্বন্ধে উদাসীন করে।

অপর দিকে মনের দেহের প্রতি একটি বিরোধ ভাব আছে। ইন্দ্রিয়সুখে মনকে কাজ করবার অবসর দেয় না। তাই তা ইন্দ্রিয় সংযম চায়। দৈহিক সুখ ভোগকে তা অতি স্থূল বস্তু মনে করে। তাই ইন্দ্রিয় সুখ তার অবজ্ঞার বিষয়, তার আকর্ষণ সংযম ও ইন্দ্রিয় নিরোধের প্রতি। কাজেই মন ব্যক্তিগত সুখে উদাসীন। ফলে তা সমষ্টিগত কল্যাণের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল হয়। সন্ন্যাসীরা সহজেই সাধারণের কল্যাণের কাজে তাই সহজেই আকৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের তাই সর্বজনীন কল্যাণমূলক কাজে এত উৎসাহ। সুতরাং সন্ন্যাসবাদের সহিত

১. Egoism ২. Altruism

পরার্থবাদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। তার ভিত্তিতে তাদের একই শ্রেণীতে ফেলে তাদের নাম দিতে পারি শ্রেয়বাদ। তার আদর্শ সামগ্রিক কল্যাণ, তার আদর্শ ইন্দ্রিয় সংযম। সুতরাং তাকে শ্রেয়বাদ বলা যুক্তিসম্মত।

উপনিষদে এই ধরণের নামকরণের নজির আছে। কঠ উপনিষদের নচিকেতা ও যমের কাহিনীর সহিত সকলেই পরিচিত। সেখানে বলা হয়েছে যম যখন নচিকেতাকে বললেন, যে সমস্ত কামনা সহজে পূরণ করা যায় না তাই একে একে চাইতে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ভোগে মানুষের অন্তরাত্মার তৃপ্তি নেই।[১] তিনি বললেন দার্শনিক তত্ত্বের জ্ঞানই তাঁর কাছে বেশী আকর্ষণের বস্তু। যম তখন খুশী হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন যে নচিকেতা প্রেয়কে প্রত্যাখ্যান করে শ্রেয়কে নির্বাচন করেছেন দেখে তিনি খুসী হয়েছেন। তিনি বললেন প্রেয় ও শ্রেয় মানুষকে ভিন্ন পথে আকর্ষণ করে। শ্রেয়কে গ্রহণ করলে কল্যাণ হয় এবং প্রেয়কে গ্রহণ করলে মানুষ পুরুষার্থ বা জীবনের লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হয়।[২] সুতরাং যা ব্যক্তি স্বার্থের ও ইন্দ্রিয় সুখের সমর্থক তাই প্রেয়, কারণ মন তার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। অপর দিকে যা সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয় সংযমের পক্ষপাতী, তা আপাতদৃষ্টিতে চিত্তহারী নয়, মন দিয়ে বুঝে তাকে গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু পরিণতিতে তা সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে। তাই তাকে শ্রেয় বলা যায়। উপনিষদের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে আমরা নৈতিক চিন্তার মধ্যে দুটি মূল বিভাগ টেনে তাদের প্রেয়বাদী ও শ্রেয়বাদী তত্ত্ব বলতে পারি।

ইয়োরোপীয় দর্শনের চিন্তায় ঠিক অনুরূপ পরিভাষা পাওয়া যায় না, তবে অনুরূপ চিন্তা আবিষ্কার করা যায়। যে তত্ত্ব ভোগ বাদকে সমর্থন করে তাকে ইয়োরোপীয় দর্শন 'হেডনিজম'[৩] বলে। যা ভোগবাদী নয় তাকে 'ইয়ুডিমনিজম'[৪] বলে। জেমস সেথ তার অর্থ করেছেন তা সেই তত্ত্ব যা ব্যক্তির দেহ ও মনকে জড়িয়ে সমগ্র সত্তার বিকাশ ঘটায়।[৫] কথাটি কিন্তু প্রথম

১. ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ ॥

কঠ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ২৭

২. 'অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ তয়োঃ শ্রেয় আপদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ কঠ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১

৩. Hedonism ৪. Eudaemonism.

৫. "Which self is to be realised ?......Eudaemonism, the total, rational and sentient." Seth, Study of Ethical Principles, Chap III, Sec 4

এরিসটটল প্রয়োগ করেন। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল তৃপ্তি। নৈতিক তত্ত্ব হিসাবে তা সেই আদর্শ সূচিত করে যা ইন্দ্রিয় সুখ না এনে ব্যক্তিগত তৃপ্তি সাধন করে[১]। সুতরাং শ্রেয়ের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে 'ইয়ুডিমনিজম'কে ঠিক ব্যবহার করা যায় না।

তবে মনে হয় এরিসটটল যে অর্থে তৃপ্তি শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা শ্রেয়ের অনুরূপ। তিনি বলেছিলেন, রুচিসম্পন্ন নয় এমন সাধারণ মানুষ সুখের[১] সঙ্গে তৃপ্তির[২] পার্থক্য অনুভব করতে পারে না। তারা সুখের জন্য ইন্দ্রিয়ভোগ চায় কিন্তু তারা তাকে তৃপ্তি বলে ভুল করে। কিন্তু তাঁর ধারণায় সুখ আসে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ হতে। তৃপ্তি আরও উচ্চস্তরের জিনিস। তাতে ভোগের প্রতি আসক্তি নেই। তা তাই চায়, যা কোন বিশেষ কারণে আকর্ষণীয় হয় না, নিজের কারণেই হয়। অর্থাৎ তা ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে না, সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে।[২] সুতরাং প্রেয়ের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে আমরা 'হেডনিজম' বা 'প্লেজার থিওরি'[৩] ব্যবহার করতে পারি এবং শ্রেয়ের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে এরিসটটল-এর অনুসরণে 'ইয়ুডিমনিজম'[৪] বা 'হ্যাপিনেস থিয়োরি' ব্যবহার করতে পারি। এই দুই অর্থেই আমরা যথাক্রমে বর্তমান আলোচনায় প্রেয় ও শ্রেয়কে ব্যবহার করব।

(২)

ভোগবাদ বনাম ত্যাগবাদ বা সন্ন্যাসবাদ

ভোগবাদ বনাম সন্ন্যাসবাদ ও স্বার্থবাদ বনাম পরার্থবাদ—এই দুই জোড়া পরস্পর বিরোধী মতের মধ্য দিয়ে আমরা শ্রেয় বনাম প্রেয়ের আলোচনার প্রস্তাব করি। যদিও শ্রেয় বনাম প্রেয়ের সংঘাতে উভয়েই উপাদান হিসাবে

১. "The theory that the aim of right action is personal well-being or happiness."

D. D. Rumes, Dictionary of Philosophy

২. "We call final without qualification that which is always desirable in itself and never for the sake of something else. Now such a thing is happiness held to be, for this we choose always for itself."

Nicomachean Ethics

৩. Hedonism or Pleasure Theory

৪. Eudaemonism or Happiness Theory

বর্তমান আছে তবু এই দুই জোড়া বিরোধী মতের মধ্যে কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। সেই কারণে তাদের পৃথক আলোচনা করে তারপর শ্রেয় বনাম প্রেয়ের আলোচনা করতে আমাদের সুবিধা হবে।

আমরা প্রথমেই ভোগবাদী নৈতিক আদর্শগুলির আলোচনা করতে পারি। দেখা যায় তাদের প্রেরণা জুগিয়েছে তিনটি জিনিস। প্রথম, প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বে অবিশ্বাস। কাজেই পরলোক বা ঈশ্বরে অবিশ্বাস। এই দৃষ্টিভঙ্গি দায়িত্ববোধকে দুর্বল করে দেয়। দ্বিতীয়, একই দৃষ্টিভঙ্গি হতে জড়বাদে বিশ্বাস জন্মায়। জড়বাদ মনকে ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি আকৃষ্ট করে। তৃতীয়, একটি হতাশার মনোভাবও এখানে সক্রিয় হয়। দেখা যায়, মৃত্যু জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দেয়। সৎলোক হলেই যে তার কল্যাণ হয়, সে বিষয় নিশ্চয়তা নেই। কাজেই পাপ-পুণ্যের কোন তাৎপর্য থাকে না। এই বিশ্ব এক অন্ধ নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই ধরণের মনে একটা ধারণা আসে। হতাশা হেতুও মনে হয় নগদ বা স্থূল যে সুখ জীবনে আদায় করে নেওয়া যায় তাই হওয়া উচিত জীবনের আদর্শ বা পুরুষার্থ। আমরা দেখব বিভিন্ন ভোগবাদী দর্শনে এই ধরণের চিন্তাগুলি অল্প বিস্তর ক্রিয়াশীল হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই ভারতীয় লোকায়ত দর্শনের নৈতিক আদর্শের কথা আলোচনা করতে পারি। তা প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য জ্ঞানে আস্থা রাখে না। তা জড় বস্তুকেই একমাত্র তত্ত্ব হিসাবে বিশ্বাস করে। তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তার ধারণা মৃত্যুর সঙ্গেই জীবনের ওপর যবনিকাপাত হয়। সুতরাং উপরে উল্লিখিত তিনটি প্রেরণাই এখানে বর্তমান দেখা যায়। এক্ষেত্রে লোকায়ত দর্শন বলে মানুষের পুরুষার্থ হওয়া উচিত যতখানি সম্ভব ইন্দ্রিয় সুখভোগ করা। দেহ দিয়ে যতখানি সম্ভব সুখভোগ করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরলোকে কল্পিত সুখের আশায় ইহজীবনে সুখ ত্যাগ করা মূর্খের কাজ। কাজেই যে কাজে সুখ পাওয়া যায় তাই নীতিসম্মত কাজ। মানুষের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত যতকাল জীবন ধারণ করবে সুখভোগ করবে, দরকার হলে ঋণ করেও ঘি খাবে। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

প্রসিদ্ধ ফারসী কবি ও দার্শনিক ওমর খৈয়ম তাঁর কাব্যে যে নৈতিক আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন তাও ভোগের আদর্শ। তবে তার মূল প্রেরণা হল হতাশা বোধ। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে মানুষের জ্ঞান অর্জনের শক্তি তাকে বেশী দূর

নিয়ে যেতে পারে না, চারিদিকে বড় আঁধার, সবই যেন অনিশ্চিত, সবই অজানা। জগতে শৃঙ্খলা যেন নেই, ন্যায়-অন্যায় বিচার যেন নেই, জগতের স্রষ্টা যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি বিশেষ নজর দেন না মনে হয়; তিনি অন্ধ নিয়তির মত চলেন। কুম্ভকার যেমন তার উৎপাদিত মৃৎপাত্রগুলি সম্বন্ধে উদাসীন, তিনিও তাঁর সৃষ্ট মানুষেব প্রতি সমান উদাসীন। সবই অনিশ্চিত, তবু তার মধ্যে একটি কথা অবধারিত সত্য, জীবনকে ধরে রাখা যায় না, তা নিয়তই অনিরোধ্য গতিতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তাঁর রুবাইয়াত-এর ভাষায়,

> জানিনা ত স্বর্গ কোথায়, নরক কোথায় আর,
> জীবন বহে যায় যে জানি এই কথাটি সার;
> একটি কথা সত্য শুধু, আর সকলি মিছে,
> যে ফুল ফুটে ঝরে গেছে শেষ হয়েছে তার।

কাজেই ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত, সামনে যা পাওয়া যায় তাই দুহাত পুরে লুঠে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ইন্দ্রিয় সুখকেই জীবনের পুরুষার্থ বলে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। তিনি তাই বলেন:

> এই জীবনে কেউ বা চাহে যশের গৌরবে,
> কেউ বা চাহে পরলোকে স্বর্গ যেন লভে।
> নগদ যা পাও তাই নিয়ে দাও আসল যাহা ছেড়ে
> দূরের ঢাকের বাদ্য রবে কাণ দিয়ে কি হবে?

পশ্চিমে গ্রীক দর্শনে এরিসটিপ্পাস প্রবর্তিত সিরিনেয়কবাদও[১] অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে। ইনি বলেন মানুষের পুরুষার্থ হল নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় সম্ভোগ। তার প্রকৃতি চায় সুখকর অনুভূতির ভোগ। ইনিও ধরে নেন যে মৃত্যুর পর জীবনের ওপর যবনিকাপাত হয়; সুতরাং পরলোকের ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমাদের জীবন অনিশ্চিত; কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করে বর্তমানের সদ্ব্যবহার করা। সব সুখই সমান, তাদের পার্থক্য অনুভূতির তীব্রতায়। বর্তমানে যা অনুভব করি তাই নির্ভরযোগ্য সত্য। ভবিষ্যত অনিশ্চিত। কাজেই ইন্দ্রিয় সুখে আত্মনিয়োগ করে প্রতি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমরা ক্ষণস্থায়ী জীব; কাজেই বর্তমানে যা নগদ পাই তাই আদায় করে নিতে হবে। সুতরাং এরিসটিপ্পাস-এর দৃষ্টিভঙ্গি

১ Cyrenaicism

লোকায়ত দর্শন ও ওমর খৈয়ম-এর দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। তাঁর আদর্শ হল সহজ, সরল, বিশুদ্ধ এবং চিন্তা ও বিবেচনা বর্জিত ভোগের জীবন।[১]

সিরিনেয়ক দর্শন পরবর্তী কালে এপিকিউরাস-এর প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বিরামহীন, অন্ধ ইন্দ্রিয় ভোগকে তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি। অবশ্য তিনিও স্বীকার করতেন যে মানুষের পুরুষার্থ হল সুখ ভোগ; কিন্তু সে পথে সিদ্ধিলাভ করবার জন্য তিনি বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি বলতেন মানুষের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে তার প্রকৃতি-সম্মত অভিলাষের চরিতার্থতায়। তার প্রকৃতিগত ইচ্ছা হল সুখকর অনুভূতির সম্ভোগ। অনুভূতি হয় সুখপ্রদ, নয় দুঃখপ্রদ হয়। দুঃখপ্রদ অনুভূতিকে আমাদের এড়িয়ে যেতে হবে এবং সুখপ্রদ অনুভূতির অব্যাহত সংঘটন যাতে সম্ভব হয় তার চেষ্টা দেখতে হবে। সাধারণ মানুষ সামনে যা সুখকর অনুভূতি পায় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেটা ঠিক নয়। আমাদের বিবেচনা শক্তির প্রয়োগ করতে হবে। যে অনুভূতি আপাত মধুর, কিন্তু পরে দুঃখপ্রদ, তাকে ত্যাগ করতে হবে। যে অনুভূতি ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে দুঃখ ঘটাবে না সেই অনুভূতিই আমাদের বেশী কাম্য। অর্থাৎ মনকে ও দেহের কাজে লাগাতে হবে। এই কারণে তিনি বুদ্ধিসম্মত বিবেচনার প্রয়োগের ওপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ধারণায় সুবিবেচনা শক্তি সব থেকে মহৎ গুণ; ভোগের জীবন বিবেচনা নিয়ন্ত্রিত না হলে প্রকৃত সুখের হয় না।[২]

উপরে কতকগুলি প্রধান ভোগবাদী দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। এবার কতকগুলি বিশিষ্ট ত্যাগবাদী বা সন্ন্যাসবাদী দর্শনের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তাদের মূল প্রেরণা হল এই বোধ যে ইন্দ্রিয় সুখ আপাত দৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষক হলেও তা পরিণতিতে দুঃখ আনে। সুখের থেকে বেদনা আরও দুঃখদায়ক। কাজেই দুঃখ বা বেদনাকে পরিহার করাই প্রকৃত পুরুষার্থ। এই ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দার্শনিকের মন ত্যাগবাদী নৈতিক আদর্শের প্রতি

১. "A life of feeling; pure and simple, heedless and unthinking undisturbed by reason such is the Cyrenaic ideal."

James Seth, A Study of Ethical Principles, Part I, Chap. I

২. "He cannot lead a life of pleasure which is not also a life of prudence, honour and justice, nor lead a life of prudence, honour and justice which is not a life of pleasure."

Wallace's Epicureanism, Letters of Epicurus

আকৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য চিন্তায় ত্যাগবাদের তাই হল মূল প্রেরণা। ভারতীয় চিন্তায় তা একটি স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। ষড়দর্শনের যুগে সব জড়িয়ে মানুষের জীবন যে দুঃখময় এই ধারণা ভারতীয় দর্শনে একটি বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। কাজেই কি বেদের অনুগত দর্শন, কি জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন মুক্তি বা নির্বাণকেই জীবনের পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করেছিল। তার সহায়ক হিসাবে এই দর্শনগুলি সন্ন্যাসবাদকে গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টধর্মে যে সন্ন্যাসবাদ পরবর্তীকালে প্রচারিত হয় তা অনেকটা এ বিষয় ভারতীয় তত্ত্বগুলির সমধর্মী।

ভারতীয় সন্ন্যাসবাদী দর্শনগুলির মধ্যে জৈন দর্শন সবার প্রাচীন এবং সব থেকে কঠোর আদর্শের সমর্থক। জৈনরা ইন্দ্রিয় সুখভোগও চান না, মানসিক সুখানুভূতিও চান না। তাঁরা চান সকল ভোগ হতে নিষ্কৃতি বা মুক্তি। কারণ যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ মানুষের ভাগ্য দু:খ দ্বারা বিড়ম্বিত। জৈন দর্শন বলে মুক্তিলাভ হয় 'ত্রিরত্নের' চিন্তায়। তা হল সত্য জ্ঞান, সত্য বিশ্বাস ও সত্য আচরণ। 'সত্য ধর্ম হল স্পৃহা ও ঘৃণা নির্বিশেষে বাহ্য জগতের প্রতি নিস্পৃহ আচরণ'।[১] জন্ম বন্ধন হতে মুক্তির জন্য চাই পুণ্য সঞ্চয়। তা অর্জিত হয় অহিংসা, সত্য কথন, দান, অনবদ্য আচরণ, মনের পবিত্রতা ও ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগে। এইগুলি অভ্যাস করলে মনে শান্তি আসে এবং মন কামনার তাড়নায় বিচলিত হয় না। অহিংসা অভ্যাস করতে আদর্শ জৈন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে চলেন, পাছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাসিকায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবাণু মারা যায়। তিনি যখন চলেন তখন সামনে ঝাঁট দিতে দিতে যান, পাছে কোন জীবকে মাড়িয়ে ফেলেন। মোটকথা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস করে কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তিনি পর জন্মকে খণ্ডন করতে চান।

ভারতীয় হিন্দু দর্শনে সন্ন্যাসবাদের উৎপত্তি হয়েছিল দুটি কারণে। প্রথম, এগুলি জ্ঞানমার্গে পরজন্ম হতে মুক্তির উপায় খুঁজেছিল। কাজেই মনকে দার্শনিক জ্ঞান লাভের যোগ্য করে গড়ে তোলবার জন্য ইন্দ্রিয় নিরোধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়েছিল। ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে না পারলে চিত্ত বিক্ষেপ ঘটবে, তত্ত্ব জ্ঞানের আলোচনায় মনঃ সংযোগ করা যাবে না। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের আরম্ভেই ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যোগ দর্শন পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য একটি বিশেষ মার্গ স্থাপন করেছে। তা হল যোগ সাধনার দ্বারা সমাধিস্থ

১. পঞ্চাস্তিকায় সময় সার

অবস্থায় পরম তত্ত্বের পরিচয় লাভ। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় সংযম এবং আত্মদমনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছিল। কাজেই যোগ দর্শনের প্রেরণায় দ্বিতীয়ত সন্ন্যাসবাদের উৎপত্তি হয়েছিল।

যোগ দর্শনের প্রেরণায় রচিত কয়েকটি অপ্রাচীন উপনিষদে সন্ন্যাসবাদের একটি ভাল পরিচয় পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাদের প্রতিপাদ্য হল এই যে জীবন অত্যন্ত দুঃখের। কাজেই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণই হল সার্থক নৈতিক আদর্শ। মানুষকে সংসারের প্রতি, ভোগ সুখের প্রতি আকৃষ্ট করে নারী জাতি। কাজেই নারী জাতির সংস্পর্শ ত্যাগ করতে হবে, তাদের সর্বথা বর্জন করতে হবে। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে এখানে দু একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। নারদ পরিব্রাজক উপনিষদে বলা হয়েছে, লোকে প্রমদাকে দেখে উন্মত্ত হয় এবং সুরাপান করেও উন্মত্ত হয়। সেই কারণে দৃষ্টিবিষ নারীকে দূর হতে বর্জন করা উচিত।[১] এই উপদেশের যুক্তি কি তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মহোপনিষদে। সেখানে বলা হয়েছে যার স্ত্রী থাকে তার ভোগে ইচ্ছা জন্মায়, যার স্ত্রী নেই তার ভোগে আকর্ষণ নেই। কাজেই নারীকে ত্যাগ করতে পারলে জগৎকে ত্যাগ করা যায় এবং জগৎ ত্যাগ করলে মানুষ সুখী হয়।[২]

পাশ্চাত্য দর্শনে ত্যাগবাদী নৈতিক আদর্শের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় সিনিক সম্প্রদায়ের দর্শনে। তা এথেন্সের এনটিথিনিস কর্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন সক্রেটিস-এর বন্ধু। এই সম্প্রদায়ের নৈতিক তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। তাদের মূল নীতি হল মানুষের কাছে তাই ভাল যা তার নিজস্ব আর যা মানুষের কাছে একান্ত নিজস্ব তা হল তার মন, অর্থাৎ তার বুদ্ধিশক্তি।[৩] কাজেই তাদের ধারণায় তৃপ্তি[৪] খুঁজতে হবে

১. মাদ্যতি প্রমদাং দৃষ্ট্বা সুরাং পীত্বা চ মাদ্যতি।
তস্মাদ্ দৃষ্টিবিষাং নারীং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ॥
নারদ পরিব্রাজক॥ ৫॥

২. যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগৎ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥
মহোপনিষদ॥ ৩॥ ৪৮

৩. 'for each being that alone can be good which belongs to it, and the only thing which belongs to man is mind or reason.
Quoted in Seth's Study of Ethical Principles Part I, Chap 2

৪. Happiness

মানুষের অন্তরের মধ্যে, বাহিরে নয়। প্রজ্ঞা[১] এবং তৃপ্তি একই জিনিস এবং প্রাজ্ঞের জীবন হবে বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত বাসনা মুক্ত জীবন। বাসনা হতে মুক্ত হলে মানুষ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় বাসনার উচ্ছেদ করে এবং সুখ-দুঃখ উভয়ের প্রতি সমান উদাসীন হয়ে। আমাদের দৈহিক অভাববোধ যতখানি সম্ভব সংকুচিত করতে হবে, সকল বিলাস দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং যতখানি সম্ভব সরল, সহজ জীবন যাপন করতে হবে। এই ভাবেই সমাজের বা আর্থনীতিক পরিবেশের দাসত্ব হতে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারব। এখানে বিলাস বর্জিত, নিস্পৃহ ত্যাগের জীবনকেই নৈতিক আদর্শ হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে।

সিনিকদের বহির্জগত হতে নিজেদের সরিয়ে নেবার ইচ্ছা জন্মেছিল তাদের দুঃখবাদ হতে। চারিদিকে দুঃখ ছড়ানো, তাকে বর্জন করতেই তারা সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। স্টয়িকরা অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণা পেয়েছিল কিন্তু একটি ভিন্ন আদর্শ হতে। দুঃখ তার প্রেরণা নয়, মহৎ আদর্শ তার প্রেরণা। সে আদর্শ বলে মানুষের বৈশিষ্ট্য হল সে মননশীল জীব, সে চিন্তা করতে পারে। কাজেই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন। সুতরাং সেখানে ইন্দ্রিয় চর্চার কোন স্থান নেই। ভোগের জীবন বিশৃঙ্খলা আনে, তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত। কাজেই তাকে পরিহার করাই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁরা বলেন প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জীবন ধারণের অর্থ হল বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ভাবে জীবনকে পরিচালিত করা, কারণ মূলত সমগ্র প্রকৃতিই বুদ্ধি শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[২] কাজেই ভোগের প্রতি আকর্ষণকে বর্জন করতে হবে, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে, দমন করতে হবে। বাহিরের পরিবেশের প্রভাব হতে যতখানি সম্ভব নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং বুদ্ধি বৃত্তির চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

স্টয়িক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি গ্রীস দেশে হলেও দেখা যায় রোমানদের মধ্যেই তার বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। মনে হয় রোমে তা পরিণত রূপটি লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে দুজন দার্শনিকের নাম করা যেতে পারে। তাঁরা

১, Reason

২. "Live according to nature means; Live according to that rational order which is the deepest nature of things,"

J. Scth, Study of Ethical Principles Part I, Chap II

হলেন এপিকটেটাস ও মার্কাস অরেলিয়াস। এপিকটেটাস ছিলেন ক্রীতদাস। তাঁর জন্ম হয় এপিরাসে। তিনি নিজের মনীষার গুণে একজন বিশিষ্ট দার্শনিকের মর্যাদা পান। মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ। তিনি রোমান সম্রাট ছিলেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি দার্শনিক হিসাবে।

এপিকটেটাস উপদেশ দিতেন যতখানি সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হতে এবং অভাব বোধকে যতখানি সম্ভব সংকুচিত করে পরিবেশের অধীনতা হতে মুক্ত হতে। তিনি তাই বলতেন, নিজের নিয়ন্ত্রণের অধীনতার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা বিধেয়। সেই মানুষই নিজের প্রভু যে নিজের ইচ্ছার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে।[১] সুতরাং তিনি উপদেশ দিতেন যে দৈহিক অভাববোধ যতখানি সম্ভব সংকুচিত করতে হবে; কেবল দেহ ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বিলাস দ্রব্য সর্বতোভাবে বর্জন করতে তিনি উপদেশ দিতেন।[২]

মনে হয় মার্কাস অরেলিয়াস-এর চিন্তায় স্টয়িক আদর্শ তার পরিণত রূপটি পেয়েছিল। তিনি জীবনের সকল দিকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে গেছেন এবং বলেছেন জীবনে যা সত্যই তৃপ্তিদায়ক তা হল দার্শনিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ। কারণ, দেহ যার পরিচয় দেয় তা স্থিতিশীল নয়, আত্মা যা দেয় তা স্বপ্নের মত অসার, জীবন যেন প্রবাসে বাস করা, খ্যাতি মূল্যহীন।[৩] শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত তাঁর চিন্তার খানিকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ের কাছেই পরমার্থ হল দার্শনিক জ্ঞানের চর্চা। মানুষকে এই আদর্শের উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্য তিনিও শঙ্করাচার্যের মত দেহের অভাববোধ-গুলিকে সংকুচিত করতে বলেছেন এবং বিলাস বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

ইয়োরোপীয় চিন্তায় বর্তমান যুগে খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যেই এখনও সন্ন্যাসবাদের আদর্শ সংরক্ষিত রয়েছে। খ্রীষ্ট নিজে সন্ন্যাসবাদের প্রচার করেন নি বা দৈহিক

১. Each man's master is the man who has authority over what he wishes. The Manual of Ethics

২. "For your body just take so much as your bare need requires, such as food, drink, clothing, house, servants, but cut down all that tends to luxury and outward show". Ibid

৩. "And to say all in all in a word, everything which belongs to the body is a stream and what belongs to the soul is a dream and life is a warfare and a stranger's sojourn and after fame is oblivioun. What then is that which is able to conduct a man? One thing and only one, Philosophy," Marcus Aurelins, The Meditations.

ভোগ বর্জন করতে বলেন নি। তবে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর আচরিত জীবনই যেন এ বিষয় তাঁর ভক্তদের অনুপ্রাণিত করেছিল মনে হয়। ধর্মের স্বার্থে প্রয়োজন হলে আত্মবিসর্জন করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি ; যে ক্রুশে তিনি বিদ্ধ হয়েছিলেন তা নিজেই বহন করেছিলেন। এর মধ্যে যেন তাঁর বাণী অন্তর্নিহিত ছিল। স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য ইহজীবনে আত্মত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণই প্রকৃষ্ট রীতি। স্বয়ং যীশু নিজেই বলেছেন, "যে জীবনকে রক্ষা করে চলে সে তাকে হারায় এবং যে হারায় সে তাকে পায়।"[১] এই ভাবধারা হতেই পরে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসবাদের উৎপত্তি। ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তা বেশী বিকাশলাভ করেছে। তাদের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন এবং সকল ভোগ বর্জনের আদর্শ তার সুন্দর উদাহরণ।

এই ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে মনে হয় উপনিষদে একটি সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে প্রসঙ্গত দেওয়া যেতে পারে। দেহ ও মন নিয়ে মানুষ। মন দেহাশ্রয়ী। দেহকে পঙ্গু করলে মন কাজ করবার ক্ষমতা হারায়, আবার কেবল ভোগে দেহকে নিযুক্ত করলে মনকে উপবাসে রাখা হয়। ভোগবাদ এবং সন্ন্যাসবাদ পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করায় তাদের আদর্শগুলি একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে। যা প্রয়োজন তা হল দেহ-মন দিয়ে গঠিত সমগ্র মানুষের সার্থক জীবনের আদর্শ। শুধু দেহাশ্রয়ী আদর্শ বা মন-আশ্রয়ী আদর্শ সে সার্থক আদর্শকে গড়ে তুলতে অক্ষম। তাইজন্য একটি সমন্বয়ধর্মী আদর্শের প্রয়োজন।

মনে হয় উপনিষদে এইরূপ একটি আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। এই ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে উপনিষদ কোন পক্ষের সমর্থন করেনি। উপনিষদে বলে জীবনে ত্যাগেরও প্রয়োজন আছে ভোগেরও প্রয়োজন আছে ; উভয়ের সামঞ্জস্যের মধ্যেই জীবন সার্থকতামণ্ডিত হয়। ভূমিকে উর্বর করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সে ভূমিকে ভালভাবে কর্ষণ করা। সেই কর্ষণ হল জীবনের ত্যাগের দিক। কিন্তু কর্ষণ করে ত জমি ফেলে রেখে দেবার কোন অর্থ হয় না। তাতে বীজ বপন করতে হয়, শস্য উৎপাদন করতে হয়, তবেই তা সার্থক হয়। সেই রকম জীবনে ত্যাগটাই সর্বস্ব নয়। ত্যাগের পর যে পথে ভোগ জীবনকে সার্থকতা মণ্ডিত করবে সে পথে ভোগের প্রয়োগ আছে। ইন্দ্রিয়গুলির

১৭. "Who so ever will save his life shall lose it and who so ever will lose his life shall find it." St. Mathew, Chap. XVI

বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে সত্য, কিন্তু তাই বলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ আমাদের আদর্শ হবে না। আমাদের আদর্শ হবে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে নির্বাচিত বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করা। ইন্দ্রিয়ের দমনের প্রয়োজন নেই, আছে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণের। মনে হয় প্রাচীন উপনিষদের আলোচনায় এই ধরণের নৈতিক আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

উপনিষদে যে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নয়, ইন্দ্রিয় সংযমের দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হত তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে। সেকসপীয়ার প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে উপদেশ বাণী খুঁজে পেতেন। উপনিষদের ঋষি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে নীতিগর্ভ বাণী খুঁজে পেতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গল্প আছে প্রজাপতি সমাবর্তনের দিনে তিন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দ দ দ' অর্থাৎ আত্মদমন কর, দয়া কর, দান কর। তাই নাকি বর্ষার দিনে আকাশের বুকে যখন বিদ্যুৎ খেলা করে এবং মেঘ গুরু গুরু গর্জন করে, তখন প্রজাপতির উপদেশ তারা বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১] এখানে আত্মদমনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সন্ন্যাসের কথা বলা হয় নি।

সেকালে আত্মদমনের জন্যই শিক্ষাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা ছিল। তা সন্ন্যাসের প্রস্তুতি নয়, গৃহস্থ জীবনের প্রস্তুতি। এ বিষয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় ব্রহ্মচর্য আশ্রমেব শেষে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের ঠিক পূর্বে আচার্য অন্তেবাসীকে যে উপদেশ দিচ্ছেন তাতে আছে ঃ

"সত্য কথা বলবে। ধর্ম আচরণ করবে। বেদপাঠ হতে বিরত হবে না। আচার্যকে প্রিয় উপহার দেবে। বংশ ধারাকে অব্যাহত রাখবে।"[২]

এখানে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার উপদেশটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শিষ্য ব্রহ্মচর্যের পর আদর্শ সংসারী রূপে সংসার ধর্ম পালনের উপযুক্ত হয়েছেন। তাই তাঁকে গুরু উপদেশ দিচ্ছেন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে। পূর্বে কৃচ্ছ্র সাধন করে শিষ্য ভোগের জীবন যাপনের উপযুক্ত হয়েছেন। ভোগের জন্যই

১. তদেতদেবৈষা দেবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নু র্দ দ দ ইতি
দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং
দয়ামিতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৫॥২॥৩

২. সত্যংবদ॥ধর্মংচর॥স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ॥আচার্যায প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ॥
তৈত্তিরীয় ॥ ১॥২

কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন, যেমন শস্যের জন্য ভূমিকর্ষণের প্রয়োজন। জীবনে ত্যাগেরও স্থান আছে, ভোগেরও স্থান আছে। শুধু ভোগ বা শুধু সন্ন্যাস উভয়েই কাম্য নয়।

(৩)

স্বার্থ বনাম পরার্থ

মানুষের সাধারণত নিজের স্বার্থ সংরক্ষণই বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে থাকে। তবে এ কথাও বলা যায় না যে পরার্থে সাধারণ মানুষ উদাসীন থাকে। পরার্থের প্রতি আকর্ষণও সাধারণ মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে; এমন কি সাধারণের বিবেচনায় যে অসৎ প্রকৃতির লোক তারও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে তার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। যে নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ বা পরস্ব অপহরণ করতে যার বাধে না, সেও নিজের সন্তানের স্বার্থ রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে। তবে একথা সত্য যে সাধারণত স্বার্থের প্রতিই মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ। পরার্থের প্রতি আকর্ষণ আসে স্নেহ, মায়া, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি বোধ হতে। ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে তাদের অল্পবিস্তর সমাবেশ দেখা যায়। তারপর পরিবেশ বা মতিগতির প্রভাবে একটির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে এবং অপরটির প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে যায়।

তবে একথা সত্য যে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ স্বার্থ পরিবর্ধনের প্রতি; কারণ মানুষ স্বভাবতই নিজেকে ভালবাসে বেশী। তার ওপর যার ভোগ সুখে আকর্ষণ বেশী সে মতিগতির প্রভাবে একান্তভাবে স্বার্থপর হয়ে ওঠে। সে ক্রমশ পরার্থের ওপর উদাসীন হয়ে পড়ে। দয়া, মায়া, প্রীতি বোধগুলি যেমন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যায় তেমন সে সম্পূর্ণভাবে পরার্থ বিরোধী হয়ে পড়ে। মানুষ তখন একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক হয়। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে না যে ভোগবাদের সঙ্গে স্বার্থবাদ বিশেষভাবে সংযুক্ত। তাই দেখি ভোগবাদীরা আত্মকেন্দ্রিক। চার্বাক দর্শনের নৈতিক আদর্শ, সিরিনেয়কদের নৈতিক আদর্শ সেই কারণে একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থবাদী।

পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদ বর্তমান যুগে সমাজকেন্দ্রিক পরার্থবাদের দিকে ঝুঁকি নিয়েছে। তার মূল কারণ সমাজ বিদ্যা[১] শিক্ষার প্রসার। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন হার্বার্ট স্পেনসার। তিনিই প্রথম নৈতিক

১. Sociology

আদর্শের বিকাশের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে নীতির বিকাশে আত্মত্যাগ আত্মরক্ষার আকৃতি হতে কম মৌলিক নয় এবং অহংবাদের সঙ্গে পরার্থবাদ প্রতিযোগিতা করে বরাবর বিকাশলাভ করেছে।[১] ব্যক্তির ওপর সমাজের আধিপত্য যেমন বাড়তে লাগল গোষ্ঠীর স্বার্থও তার দাবী স্থাপন করতে সুরু করল। এই ভাবেই ব্যক্তি যে সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন নয়, সমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং উভয়ের স্বার্থ পরস্পরের পরিপূরক এই ধারণা পরিস্ফুট হল। সমাজ যে একটি অবয়ব বিশিষ্ট অঙ্গী[২] এই প্রতিপাদ্য বেশ সবলভাবে প্রথম স্থাপিত হয় লেসলি ষ্টিফেন এর নীতির বিজ্ঞান'[৩] নামক গ্রন্থে। এই পথেই নীতির ক্ষেত্রে বর্তমান কালে পাশ্চাত্য চিন্তার 'ব্যাপক উপকারিতাবাদ'[৪] এর উৎপত্তি। তার এই নামকরণ হয়েছে, কারণ ভোগবাদীদের মত তারও লক্ষ্য হল সুখ[৫]। যা সুখ দেয় তাই উপকারক।[৬] তবে তা ব্যক্তি বিশেষের সুখকে প্রাধান্য দেয় না, যতখানি সম্ভব বেশী সংখ্যক মানুষের সুখই তার কাম্য। এই অর্থেই তার নাম হয়েছে ব্যাপক উপকারিতাবাদ।

এই তত্ত্বটি উনবিংশ শতাব্দীতে বেনথাম, জেমস মিল ও তাঁর পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল-এর চিন্তায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তার পরিণত রূপটি শেষোক্ত দার্শনিকেব চিন্তায় পাওয়া যায়। তার এখানে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। তার ভোগবাদের[৭] সঙ্গে দুটি মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রথমত তা বিভিন্ন সুখকর অনুভূতির মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করে। অতীতেব ভোগবাদী দর্শন তা করত না। সব সুখানুভূতির তার কাছে এক মূল্য। নূতন তত্ত্বটি বলে অভিজ্ঞতা হতে বোঝা যায় সুখানুভূতির উৎকর্ষগত পার্থক্য আছে। ইতর জীব যাতে সুখ পায় তা নিকৃষ্ট স্তরের। যে সব বিশেষ ধরণের সুখ মানুষের অধিগম্য তারা গুণে তার থেকে উৎকৃষ্ট। জ্ঞানে আকর্ষণ, দয়া-মায়া প্রভৃতি উন্নত প্রকৃতির হৃদয়ানুভূতি—এগুলির উৎকর্ষ স্বীকার করতেই হয়। অবশ্য মানুষের এই উন্নত রুচি অনেক সময় অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তবুও তা বিশেষ

১. "self-sacrifice is no less primordial than self-preservation"
"Altruism has been evolving simultaneously wirh .egoism."

Principles of Ethics, Vol. I

২. Social organism
৩. Science of Ethics
৪. Utilitarianism
৫. Pleasure
৬. Useful.
৭. Cyrenaicism

কামনার বস্তু। একটি সন্তুষ্ট ইতর জীব হতে অসন্তুষ্ট অবস্থায় সক্রেটিস-এর মত জীবন যাপন করা ভাল।[১]

তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়েছে। পুরাতন ভোগবাদ ব্যক্তি বিশেষের সুখ নিয়েই চিন্তা করেছে। নূতন ভোগবাদ সমাজের সামগ্রিক সুখের চিন্তা করেছে। ব্যক্তি নয় সমাজের সুখ বিধানই তার লক্ষ্য। মিল তাই বলেছেন, ব্যাপক উপকারিতাবাদের আদর্শ হল ব্যক্তি বিশেষের অধিকতম সুখ নয় সকলের জড়িয়ে অধিকতম সুখ।[২] তার যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে যে প্রতি ব্যক্তি বিশেষেরই সুখ কাম্য, কাজেই আমি যেমন নিজের সুখ খুঁজি তেমন অন্যের সুখও আমার খোঁজা উচিত। এ বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের আদর্শের অনুগামী হতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, অন্যে তোমার প্রতি যেমন ব্যবহার করুক তুমি চাও, তোমারও অন্যের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করা উচিত। পরের সুখ আমাদের বিবেচনার বিষয় হতে পারে দুটি কারণে। প্রথম, বাহিরের প্রভাব, যেমন রাষ্ট্র বা ধর্মের নির্দেশ বা জনমত। দ্বিতীয় হল অন্তরের প্রভাব। অন্যের সুখ সংবর্ধনের ইচ্ছা মানুষের মধ্যে গ্রথিত[৩] না হলে ও মিল-এর ধারণায় তা একটি স্বাভাবিক[৪] ইচ্ছা। তাকেই তিনি সামাজিক বোধ[৫] বলেছেন। তাঁর ধারণায় তাই হল ব্যাপক উপকারিতাবাদের ভিত্তি।[৬]

ব্যাপক উপকারিতাবাদে[৭] একটি উদারতার সুর যে লক্ষ্য করা যায় তা অনস্বীকার্য। তা ব্যক্তি সুখকে একেবারে ত্যাগ করেনি, তবে অন্যের সুখের প্রতিও নজর দিয়েছে। কাজেই এই তত্ত্ব ঠিক স্বার্থবাদকে সম্পূর্ণ পরিহার করে পরার্থবাদকে গ্রহণ করেনি, তবে পরার্থবাদের দিকে ঝুঁকেছে। সেই কারণে এই তত্ত্বটিকে স্বার্থবাদের ঠিক বিপরীতধর্মী বলা যায় না, বরং তার বেশী ঝোঁক

১. It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied, better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied"
J. S. Mill, Utilitarianism, Chap. II

২. "The utilitarian standard is not the agent's own greatest happiness but the greatest amount of happiness altogether.' Ibid

৩. Innate

৪. Natural

৫. Social feelings of mankind

৬. "basis of powerful natural sentiment for utilitarian morality,"
J. S. Mill, Utilitarianism, Chap. III

৭. Utilitarianism

সমন্বয়ের দিকে। ঠিক বলতে কি স্বার্থবাদের একেবারেবিপরীত পরার্থবাদের দৃষ্টান্ত নৈতিক তত্ত্বের চিন্তায় পাওয়া যায় না। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিষয় যা লক্ষ্য করবার, তা হল মানুষের নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য এই তত্ত্ব যে আদর্শ স্থাপন করে, তা কিভাবে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ হবে সে বিষয় নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র পাওয়া যায় না। গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের সুখ কিসে, দুটি বিকল্প কর্মের একটি নির্বাচনে এ আদর্শ কিভাবে প্রয়োগ হবে—এর উত্তর এই তত্ত্বে দেওয়া নেই। একজন রোগী অত্যন্ত অসুস্থ। আমি তার সেবা করব, না ইস্কুলে গিয়ে আমি আজ অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দান করব? শিক্ষক হিসাবে আমার হয়ত একদিন এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। ব্যাপক-উপকারিতাবাদের নীতি অনুসারে দ্বিতীয় কাজটির প্রতি পক্ষপাত দেখানো উচিত মনে হবে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করা যেন বেশী ভাল হত মনে হয়।

স্বার্থবাদ এবং পরার্থবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের সুন্দর চেষ্টা বাটলার-এর চিন্তায় পাওয়া যায়। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইয়ুডিমনিজম'[১]। আমরা তাকে বাংলায় সৎকার্যবাদ বলতে পারি।[২] এখানে তাঁর পরিকল্পিত সৎকার্যবাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

তিনি দেখেছেন মানুষের মধ্যে দুটি বৃত্তি কাজ করে। তার একটি হল আত্মপ্রীতি[৩] এবং অপরটি হল পরপ্রীতি[৪]। দুটিই মানুষের মধ্যে একসঙ্গে বর্তমান। প্রথমটি তাকে স্বার্থ সিদ্ধির পথে আকর্ষণ করে এবং দ্বিতীয়টি তাকে অন্যের কল্যাণ সাধনে উৎসাহ দেয়। সুতরাং তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি বিরোধের ভাব দেখা যায়। সাধারণ মানুষ তাদের একটির প্রতি পক্ষপাত দেখায় বেশী। ফলে সে হয় অন্ধভাবে স্বার্থান্বেষী হয়, না হয় বিশুদ্ধভাবে পরার্থান্বেষী হয়। এই দুই প্রবৃত্তির মধ্যে তারা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে না। ফলে মানসিক তৃপ্তি হতে তারা বঞ্চিত হয়।[৫]

১. কথাটি গ্রীক শব্দ eu অর্থ কল্যাণ এবং daimon অর্থ আত্মা, এই দুটি শব্দের সংযোগে উৎপন্ন। তা সূচিত করে মানুষের আত্মার তৃপ্তি যাতে হয় সেই আদর্শ। সৎকর্ম সম্পাদনই সেই তৃপ্তি দিতে পারে।

২. Eudaemonism ৩. Self-love ৪. Benevolence

৫. "Men in fact, as much as often contradict that part of their nature which respects self......as they contradict that part of it which respects society." Sermons, I, Sec. 14

এখন এই দোটানার সমাধান কি? তাঁর ধারণায় তার সমাধান হল মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবন যাপন করা। তাই হল তাঁর মতে সৎ জীবন বা বিবেক সম্মত জীবন যাপনের সমস্থানীয়। তিনি বলেন নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তি হল মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি। ঘড়ি যেমন নির্মিত হয় সময় নির্দেশ করতে, মানুষ তেমন জন্মেছে সৎ জীবন যাপন করতে। সৎ জীবন যাপন করলেই প্রকৃত মানসিক তৃপ্তি আসে। এই বিষয় তাকে নির্দেশ দেবার জন্য তার বিবেক রয়েছে। স্বার্থ এবং পরার্থের দ্বন্দ্বে এই বিবেকই তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করে। তাঁর মতে আমরা এমনভাবে গঠিত যে নৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি প্রোথিত আছে। তা আমাদের বিকল্প কাজের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, কোনটি বর্জনীয় সে বিষয় সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবার ক্ষমতা রাখে।[১] তার নিয়ন্ত্রণে চলাই হল সৎ জীবন যাপন করা। বিবেকের নির্দেশে চলার অর্থ হল মানুষের স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা। তা স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য স্থাপন করে। ফলে ব্যক্তি স্বার্থ এবং সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ এক সঙ্গে সংবর্ধিত করে তা এক সঙ্গে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মনে তৃপ্তি সঞ্চার করবার ক্ষমতা রাখে।

(৪)

শ্রেয়বাদী চিন্তা

উপরে আমরা নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরোধী তত্ত্বগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য তাদের দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বিরোধ দুই ভাবে আসে। এক, দেহ ও মনের দাবীর বিরোধ। উভয় শ্রেণীর মতই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। এই অবস্থায় নৈতিক চিন্তায় গোষ্ঠী বা সমাজের কল্যাণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। দেহ ও মনের বিরোধকে ভিত্তি করে যে বিপরীত তত্ত্বগুলি গড়ে উঠেছে তাদের ভোগ বনাম ত্যাগ নামে একটি অনুচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিরোধ এসে পড়ে ব্যক্তি স্বার্থ এবং পরার্থ বা সমাজের স্বার্থের মধ্যে। এখানে সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধে নৈতিক

১. "There is a principle of reflection in men by which they distinguish between, approve and disapprove their own actions. We are plainly constituted such sort of creatures as to reflect upon our own nature."

Butler, Dissertation, on the Nature of Virtue, Sec. I

চিন্তা সচেতন হয়ে উঠেছে বলেই নূতন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব উদ্ভুত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে বিরোধী তত্ত্বগুলি আছে তাদের আলোচনা হয়েছে স্বার্থ বনাম পরার্থ নামে একটি পৃথক অনুচ্ছেদের মধ্যে।

আমরা আলোচনার আরম্ভে বলেছি যে নৈতিক তত্ত্বগুলির আলোচনায় এই দুই জোড়া নীতির পরিবর্তে মাত্র এক জোড়া নীতি প্রয়োগ করে আলোচনার আরও সরল রূপ দেওয়া যায়। তা যে করা হয়নি তার কারণ, সেটা সম্ভব প্রথম স্তরে দুই জোড়া বিরোধের দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনা করবার পর। মনে হয় এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে যখন এই দুই জোড়া বিরোধকে একটি মাত্র বিরোধের অবস্থায় রূপান্তরিত করে আলোচনা সম্ভব। আমরা প্রস্তাব করেছিলাম এই বিরোধকে প্রেয়ের সহিত শ্রেয়ের বিরোধ বলা যায়। কেন বলা যায় এখন সেটা বোঝা সহজ হবে। মোটামুটি দেখা যায় বিরোধ বা বিতর্ক দুই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। প্রথম, দেহের সঙ্গে মনের বিরোধ এবং দ্বিতীয়, স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের বিরোধ। আমরা যদি কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি সমস্যাটি আরও সরল রূপ নেয়। মূল প্রশ্ন হল ব্যক্তির সুখ বা তৃপ্তি নয়, গোষ্ঠীর সুখ বা তৃপ্তি নয়, ব্যক্তির কল্যাণ ও গোষ্ঠীর কল্যাণ। দেহ ও মনের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান যে উভয়ের কল্যাণ পরস্পর জড়িত। সুতরাং ভোগ ও ত্যাগের সমাধান নির্ভর করে সমগ্র ব্যক্তির কল্যাণের ওপর। অনুরূপ ভাবে ব্যক্তি সমাজ হতে পৃথক নয়, তার অঙ্গীভূত। ঠিক বলতে কি তাদের মধ্যে মূলত বিরোধ নেই। ব্যক্তির কল্যাণে সামগ্রিক কল্যাণ বর্ধিত হয়। আবার সমাজের কল্যাণ ব্যক্তির কল্যাণকেও পরিবর্ধন করে। সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি হতে একটা বিরোধ এসে পড়ে। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তার সমাধান করতে হয়। তাকে আমরা সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পারি।

এখন দেখব যাকে প্রেয় বলি তা, কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, কি সমাজের ক্ষেত্রে, সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি হতে প্রেরণা পায়। দেহের স্বার্থ মনের স্বার্থ হতে আপাত দৃষ্টিতে বেশী আকর্ষণ করে, তাই তা প্রেয়। অনুরূপ ভাবে সমাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ সামগ্রিক কল্যাণের থেকে আপাত দৃষ্টিতে বেশী আকর্ষণের বস্তু। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সমগ্র ব্যক্তির কল্যাণ এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ—দুয়ের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই সমাধান পাওয়া যায়। তাই হল শ্রেয়। শ্রেয় আপাত দৃষ্টিতে আকর্ষণ করে না, বুদ্ধি শক্তি দিয়ে তার কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করলে তবেই তা আকর্ষণের বস্তু হয়। সুতরাং শ্রেয়ের মধ্যেই নৈতিক

সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়। আমরা এখন শ্রেয়বাদী নৈতিক আদর্শ গুলির সহিত পরিচয় করব।

শ্রেয়বাদী নৈতিক আদর্শগুলির বৈশিষ্ট্য হল তারা একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জিনিসটি দেখতে চেষ্টা করে। তাই ব্যক্তির প্রসঙ্গে দেহের দাবী বড় কি মনের দাবী বড়, সেই ভিত্তিতে নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে না। অপর পক্ষে ব্যক্তি-স্বার্থ প্রাধান্য পাবে কি গোষ্ঠী স্বার্থ প্রাধান্য পাবে সে দৃষ্টিকোণ হতে সমস্যাটিকে দেখে না। এই আদর্শগুলি আরও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এমন একটি নীতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করে যা, কি ব্যক্তি বিশেষের দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, কি স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব, উভয়কেই এমন একটি সাধারণ নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে স্থাপন করে, যাতে উভয় ক্ষেত্রেই মীমাংসা সম্ভব হয়। এই শ্রেণীর তিনটি দার্শনিক চিন্তা আমরা পাই: গীতার নৈতিক আদর্শ, কাণ্ট-এর নৈতিক আদর্শ এবং প্রাচীন উপনিষদের নৈতিক আদর্শ। এদের মধ্যে প্রথম দুটির খানিকটা সমধর্মিতা দেখা যায়, কারণ উভয়েই নৈতিক আচরণে অনুভূতি বৃত্তির বর্জন করবার পক্ষপাতী। উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। তা যেমন বুদ্ধি-বৃত্তির ব্যবহার করে তেমন অনুভূতি বৃত্তিরও সাহায্য নেয়। প্রত্যেকটি আদর্শ বিশ্লেষণ করলে আমাদের এই প্রতিপাদ্য গ্রহণযোগ্য কিনা বোঝা যাবে।

আমরা প্রথমে গীতার নৈতিক আদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। যে প্রসঙ্গে গীতায় এই প্রশ্ন উঠেছে তা হতেই দেখা যায় যে এখানে অনুভূতির সঙ্গে কর্তব্যের সংঘাতের সমস্যাটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিশক্তি বলে, দুর্যোধনের সঙ্গে হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, তা কর্তব্য। হৃদয় বলে, তাতে যে আত্মীয়কে হত্যা করতে হয়। তার পরিণতি যে ভরাবহ, তা যে অত্যন্ত বেদনা দায়ক। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করে কর্তব্য বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ধর্মযুদ্ধ হতে ক্ষত্রিয়ের মহত্তর কর্তব্য কিছু নেই।[১] তার ফলে পরিণতিতে সুখ আসতে পারে, দুঃখও আসতে পারে। উভয়ের সম্বন্ধেই উদাসীন হতে হবে। আদর্শ নীতির নির্দেশ হল কর্তব্য কর্মেই মানুষের অধিকার, তার ফলে নয়; কর্মফল কি হবে বিবেচনা করে কর্তব্য নির্ধারণ হবে

১. ধর্ম্যাদ্ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥
গীতা ॥২॥৩১

না, কর্মকে ত্যাগ করাও উচিত হবে না।[১] নির্বিকারচিত্তে নিজের ধর্মের যা নির্দেশ তাই পালন করাই আদর্শ নীতি। এই আদর্শে তাই কর্মফলের ত্যাগকে সব থেকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই হল যোগ সাধনা, কারণ যে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করে সেই যোগী।[২] তা সন্ন্যাসের থেকে উৎকৃষ্ট; কারণ সন্ন্যাসে কাম্য কর্মের ত্যাগের নির্দেশ আছে; তার থেকে মহত্তর ত্যাগ হল সকল কর্মের ফল ত্যাগ।[৩]

গীতায় কর্মফল ত্যাগ করে কর্তব্য সাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কর্তব্য কি সে বিষয় স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। অবশ্য চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম কি আর অকর্ম কি সে বিষয় প্রশ্ন উঠেছে; কিন্তু সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা দেখা যায় না। মোটামুটি বলা হয়েছে এ বিষয় বুদ্ধিশক্তি নির্দেশ দেবে, জ্ঞানই আলোকপাত করবে; কারণ জ্ঞানের মত পবিত্র জিনিস আর কিছু পাওয়া যায় না।[৪] অবশ্য স্বধর্ম যে কর্তব্য নির্দেশ করে তা করতে বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল ধর্ম সম্মত যুদ্ধ করা। তাই অর্জুনকে যুদ্ধ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাসঙ্গিক হলে ও সকল ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ওপর প্রয়োগ করা যায় এমন নির্বাচন নীতি দেয় না।

এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কাণ্ট-এর নৈতিক চিন্তা পূর্ণতর। তিনি শুধু হৃদয় বৃত্তিকে বর্জন করে বিবেকের নির্দেশ পালন করতে বলে ক্ষান্ত হন নি, অতিরিক্তভাবে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য একটি নীতিও দিয়েছেন, যার সাহায্যে দুটি বিকল্প কর্মের মধ্যে কোনটি কর্তব্য বা বিবেকের অনুমোদিত, তা নির্বাচন করে নেওয়া যায়। কাণ্ট বলেন, মানুষের বৈশিষ্ট্য হল সে দুই জগতের মানুষ। একদিকে অন্য জীবের মত সুখানুভূতির প্রতি আকৃষ্ট, অপর দিকে তার বুদ্ধিশক্তি আছে যার আলোকে সে কর্তব্য নির্ধারণ করে নিতে পারে। সেইটিই তার মহত্তর দিক। তাই তার কাজ হল অনুভূতি চালিত হয়ে, সুখকর কামনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, কর্তব্য বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিজের ওপব

১. কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেচু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ গীতা ॥ ২॥৪৭

২ সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ গীতা ॥২॥৪৮

৩ কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োঃ বিদুঃ ॥
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ গীতা ॥১৮॥২

৪ ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। গীতা ॥৪॥৩৮

নিজেই নির্দেশ আরোপ করা। নীতির কথা হল, 'এটা তোমার করা উচিত' নয়, 'তোমার এটা করতে হবে'।[১] কাজেই নৈতিক চিন্তা যা নির্দেশ দেয় তা অবশ্য পালনীয়।[২] মানুষ হল বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত জীব।[৩] তার এই প্রকৃতি হতেই কর্তব্যের অবশ্য পালনীয়তা গুণ উদ্ভূত হয়। তার সর্বক্ষেত্রে কর্তব্য হল এমন ভাবে কাজ করা যা তার বুদ্ধি বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। এই নির্দেশ স্বয়ংনির্ভর। কাজেই কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার সংযোগ থাকতে পারে না—না সুখ, না দুঃখের সঙ্গে তাকে জড়িত করা উচিত হবে। কাজেই হৃদয়বৃত্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। সুখঃ দুঃখ বোধের উর্ধ্বে উঠে কর্তব্য পালন করতে হবে। কর্মের পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে হবে। এখানে গীতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কাণ্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দর মিলে যায়। উভয়েই নৈতিক সমস্যার সমাধানে কর্মফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

গীতা এখানেই থেমে গিয়েছে। কাণ্ট এখানেই থামেন নি। তিনি অতিরিক্তভাবে একটি নীতি স্থাপন করেছেন যার সাহায্যে দুটি বিকল্প কর্মের মধ্যে কোনটি কর্তব্য বলে গৃহীত হবে সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এমনভাবে কাজ কর যাতে মানুষের—নিজে হক, অন্য ব্যক্তি হক—সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, কখনও অন্য উদ্দেশ্যের সাধক হিসাবে ব্যবহার না করা হয়।"[৪] এই নীতির একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, নীতির সমস্যায় যে দুই জোড়া বিরোধ এসে পড়ে, উভয়ের ক্ষেত্রেই কর্তব্য নির্বাচনের জন্য তার প্রয়োগ করা যায়। ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব সমস্যা হল দেহের দাবী প্রাধান্য পাবে, না মনের দাবী প্রাধান্য পাবে। এই নীতি দেহ ও মনকে পৃথক ভাবে দেখে নি; সমগ্র মানুষকে দেখেছে। সমগ্র মানুষের যাতে কল্যাণ হয় তাই এখানে করণীয়; তাতে দেহের দাবী উপেক্ষিত হতে পারে, নাও পারে। অনুরূপভাবে স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের সমাধানেও তাকে প্রয়োগ করা যায়। এই নীতি অনুসারে স্বার্থ বড়, না পরার্থ বড়—এ প্রশ্ন অবান্তর। সকল মানুষেরই কল্যাণ দেখতে হবে। যে কর্তব্য পালন করে সে

১. Thou shalt ২. Categorical imperative.

৩. Rational being.

৪. "So act as to regard humanity, whether in thine own person or in that of another, always as an end, never as a means."

Critique of Practical Reason

যেমন নিজের কল্যাণ দেখবে, তেমন অন্যব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিরও কল্যাণ দেখবে। যা সামগ্রিকভাবে সকলের কল্যাণ দেখে, তাই আমাদের কর্তব্য। এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগের ফলে তা একটি উৎকৃষ্ট শ্রেয়বাদী দর্শন হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

উপনিষদে যে নৈতিক আদর্শ স্থাপিত হয়েছে তা গীতা ও কাণ্ট-এর আদর্শের খানিকটা অনুরূপ, খানিকটা নয়। তাও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি হতে নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। তাই তা যা প্রেয়, যা আপাতদৃষ্টিতে সুখকর তার প্রতি আকৃষ্ট হতে নিষেধ করেছে। তা শ্রেয়কেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। এ বিষয় বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভেই আলোচনা হয়েছে। শ্রেয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এই দিক থেকে তার কাণ্ট বা গীতার আদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। এখানে কাণ্ট-এর মত অতিরিক্ত ভাবে শ্রেয়ের পথ কি ভাবে নির্বাচন করতে হবে, তারও একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। এই পর্যন্ত তাদের সাদৃশ্য। অপর পক্ষে গীতা ও কাণ্ট অনুভূতি বৃত্তিকে বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন, উপনিষদ কিন্তু অনুভূতিকে বর্জন করে নি। হৃদয়বৃত্তির যা উন্নততর বিকাশ সেই প্রীতিবোধকে নৈতিক আদর্শে বর্জন না করে সম্মানের স্থান দিয়েছে। উপনিষদের নৈতিক আদর্শের বিশ্লেষণ করলে আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

উপনিষদ বিভিন্ন বিকল্পকর্মের মধ্যে কোনটি কর্তব্য কর্ম হিসাবে নির্বাচন-যোগ্য সে বিষয় যে একটি সুস্পষ্ট নীতি দিয়েছে, তার বর্ণনা পাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে। সেখানে দেখা যায় আচার্য সমাবর্তনের দিনে শিষ্যকে যে উপদেশ দিচ্ছেন তাতে এ বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বলছেন যা অনবদ্য[১] তাই হল কর্তব্যকর্ম। তাকেই গ্রহণ করতে হবে এবং যা অনবদ্য নয় তাকে বর্জন করতে হবে। এখানে দেহের স্বার্থ বা মনের স্বার্থের প্রশ্ন ওঠে না. কাণ্ট-এর মত সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি নীতি স্থাপিত হয়েছে। তাই হল অনবদ্য যার কোন দৃষ্টিভঙ্গি হতেই দোষ ধরা যায় না। তা একাধারে স্বার্থ এবং পরার্থ, দেহ ও মন—সকলেরই কল্যাণকর। অর্থাৎ যা সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর তাই হল অনবদ্য কর্ম। গুরু এই প্রকৃতির কর্মকেই কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করতে অন্তবাসীকে উপদেশ দিয়েছেন।

অতিরিক্তভাবে উপনিষদ হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করে নি। কেন করে নি সেটি

১. যান্যনবদ্যানি কর্মাণি ॥ তানি সেবিতব্যানি ॥ নো ইতরাণি ॥ তৈত্তিরীয় ॥১॥১১॥২

বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জ্ঞানের সঙ্গে নীতির যেমন একটা সংযোগ আছে তেমন হৃদয়বৃদ্ধির সহিতও নীতির একটা সংযোগ আছে। একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে তা সহজে বোঝা যায়। মায়ের সন্তানের প্রতি ভালবাসা স্বতঃই প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাঁর সেই কল্যাণ-পরায়ণতা সার্থক হয় না, যদি না তিনি জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হন। যার কল্যাণ করব কোথায় তার কল্যাণ জানলে তবেই তার কল্যাণ করা যায়। আবার হৃদয়বৃত্তির সহিত সম্পর্কবিহীন কর্ম তেমন সার্থক হয় না। শুধু কর্তব্যবোধে যে কাজ সম্পাদিত হয় তার থেকে ভালভাবে সম্পাদিত হয়, যদি যার কল্যাণে কাজ করা হচ্ছে তার সহিত একটি প্রীতির সম্পর্ক থাকে। হাসপাতালে নার্স শিশুর যে ভাবে সেবা করবে, শিক্ষিত মাতা তার থেকে ভাল করবে। কারণ সেখানে নার্সের বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে মায়ের ভালবাসা সংযুক্ত হয়। সুতরাং নীতির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি চালিত কর্তব্য বোধের সহিত প্রীতির যোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধিবৃত্তি করে পথ নির্দেশ কিন্তু প্রীতি জনিত শুভেচ্ছা তার সঙ্গে একত্রিত হলে তবেই কর্ম সার্থক হয়ে ওঠে। এখানে শক্তি ও হৃদয়বৃক্তির সংযোগ ঘটে। ফলে শক্তি পূর্ণভাবে কল্যাণধর্মী হয়। নীতির ক্ষেত্রে হৃদয়বৃত্তির ব্যবহার এই যুক্তিতেই উপনিষদে করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নীতির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত হৃদয়বৃত্তির সংযোগ ঘটানো যায় ভালবাসার বা প্রীতির বিস্তারের দ্বারা। এই প্রীতিই হল তাদের মধ্যে সখ্য স্থাপনের রাখী। মানুষ যদি অন্য মানুষকে আপনার জ্ঞানে ভালবাসতে শেখে, তা হলে সন্তান যেমন তার মার কাছে প্রিয় তেমন তার প্রিয় হয়ে উঠবে। সে যদি প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় তা হলে উভয়ের স্বার্থই তার কাছে সমান সম্মান পাবে। তা হলে আর স্বার্থের সংঘর্ষ থাকে না। প্রেমিক যে প্রেমিকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে উন্মুখ হয়, তার কারণ প্রেমিকাকে সে নিজের মতই ভালবাসে। আমাদের তা হলে প্রয়োজন ভালবাসার বিস্তারের। প্রীতির ক্ষেত্র যত পরি-বর্ধিত হবে স্বার্থবোধ ততই পরিশোধিত হবে। আমরা যদি বিশ্বের সকলকে ভালবাসতে পারি, আমরা বিশ্বের সকলের মঙ্গল কামনা করব। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। হৃদয়বৃত্তি দিয়ে পরিচালিত হয়ে আমরা যা সকলের কল্যাণ সাধন করে তাই করতে উদ্বুদ্ধ হব। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরি-চালিত হয়ে কান্ট-এর প্রবর্তিত নীতি প্রয়োগ করে যে কর্ম নির্বাচন করব,

হৃদয়বৃত্তিও সেই কর্ম নির্বাচন করবে। সুতরাং পরিণতিতে যা উপনিষদের ভাষায় অনবদ্য কর্ম বা কান্ট-এর ভাষায় সকল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি হতে সমর্থন-যোগ্য কর্ম, তাই প্রীতি-প্রণোদিত কর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং চাই ভালবাসার বিস্তার, প্রীতির বিস্তার। উপনিষদ বলে দার্শনিক জ্ঞানের বিস্তারের ফলে এই প্রীতির বিস্তার সংঘটিত হয়। উপনিষদের সর্বেশ্বর-বাদ এই সূত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তা বলে বিশ্বসত্তা সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে বিরাজমান। দৃশ্যমান জগতে যা কিছু পাই সবই ত ব্রহ্ম। তা যদি হয় তা হলে আমরা এক মহান বিরাট সত্তার অঙ্গ। একই পরিবারে বিভিন্ন মানুষ থাকে। তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান, কারণ তারা নিজেদের একই পরিবারের অঙ্গ বলে মনে করে। সেই কারণে পরিবারের কোন মানুষের স্বার্থের হানি করে এমন কাজ কেউ করবে না, পরিবারের প্রতি তার প্রীতি তাকে নিরস্ত করবে। সাধারণভাবে সমাজ জীবনেও একথা খাটে। আমাদের মনে যদি এই ধারণা বলবতী হয় যে সমাজের সকল মানুষ আমাদের আপনার জন, কারণ সকলেই ত একই সর্বব্যাপী সত্তার অঙ্গীভূত, তা হলে সকল মানুষের প্রতিই আমাদের প্রীতির বিস্তার ঘটবে। এই ভাবে সকলকে প্রীতির চোখে দেখলে সকলের স্বার্থকেই কেবল হৃদয়বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা সম্মান করব। কর্তব্যবুদ্ধি যা বলে হৃদয়বৃত্তি তার সমর্থন করবে। এইভাবে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ববোধকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে একটি প্রীতির যোগসূত্র আবিষ্কার হয়। ফলে হৃদয়বৃত্তির বিস্তারের সাহায্যে স্বার্থবোধের শোধন হয়।

সুতরাং আমাদের প্রতিপাদ্য হল যে উপনিষদ জ্ঞানের ভিত্তিতে হৃদয়বৃত্তির প্রসার চেয়েছে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সমর্থনকে ভিত্তি করে স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চেয়েছে। তার সমর্থনে এখন কিছু প্রাসঙ্গিক বাণী উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন পতির কারণেই যে পতি প্রিয় হয় তা নয়, একই ব্রহ্ম (আত্মা) উভয়ের মধ্যে—বিরাজমান আছেন বলেই হয়; জায়ার কারণেই যে জায়া প্রিয় হয় তা নয়, একই ব্রহ্ম (আত্মা) উভয়ের মধ্যে বিরাজমান আছেন বলেই তা হয়।[১]

১. ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।

বৃহদারণ্যক ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৫

মোট কথা তিনি বলতে চেয়েছেন, একই বিরাট সত্তা সমগ্র সৃষ্টিরূপে প্রকাশ হয়েছেন; কাজেই সমস্ত জীব পরস্পরের সহিত একই যোগসূত্রে গ্রথিত। সেই কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি প্রবাহিত হয়। একত্ববোধ এই ভাবে প্রীতির বিস্তার ঘটায়।

এই যোগসূত্রকে ভিত্তি করে প্রীতিবোধ ফুটিয়ে উপনিষদে স্বার্থ ও পরার্থবোধের দ্বন্দ্বের মীমাংসার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এমন ভাবে ভোগ করতে হবে যাতে অন্যের স্বার্থহানি না হয়। অন্যের স্বার্থহানি করব না কেন? তার কারণ, অন্য জন ত সত্যই আমা হতে পর নয়, সেও আপনজন, সেও ত আমারই মত ব্যাপক সত্তার অঙ্গ। কাজেই ঘরের মানুষের সঙ্গে ত আর পরের মত আচরণ করা যায় না। এই হল উপনিষদের বক্তব্য। তা ঈশ উপনিষদের একেবারে প্রথম অংশে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে: বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই কারণে ত্যাগের সহিত ভোগ করা উচিত। কারও সম্পদ অপহরণ করা উচিত নয়।[১] উপদেশ হল পরস্ব অপহরণ করবে না, কারণ তা হলে অপরের স্বার্থহানি হবে। সেই জন্যই সংযমের সহিত ভোগ করতে হবে। অপরের স্বার্থের প্রতি এতখানি সম্মান দেখাবো কেন? তার কারণ কেউ ত পর নয়, সকলেই আপন জন, সকলেই এক ব্যাপক সত্তার অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির একটি কবিতার অংশ মনে পড়ে যায়। তা যেন এই কথারই প্রতিধ্বনি। কাব্যাংশটি এই:

> ভাই যে তুমি ভায়ের মাঝে প্রভু,
> তাদের পানে তাকাইনে ত তবু।
> সবার সাথে ভাগ করে মোর ধন
> তোমার মুঠা কেন ভরি নে?

এখন আমরা শ্রেয়বাদী তিনটি নৈতিক আদর্শের আলোচনা শেষ করেছি। কাজেই তাদের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। তিনটি তত্ত্বই একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি হতে নৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজেছে। এই খানেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য। অপরপক্ষে গীতার আদর্শও কান্ট-এর আদর্শের মধ্যে একটি সাদৃশ্য পাওয়া যায় এবং সেই সাদৃশ্য উপনিষদের আদর্শ

১. ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিংচ জগত্যাং জগৎ॥ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্॥ ঈশ ॥১

হতে তাদের পৃথক করে। গীতা ও কাণ্ট উভয়েই নীতির ক্ষেত্র হতে হৃদয়-বৃত্তিকে বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে বুদ্ধিশক্তি বা বিবেক যা নির্দেশ দেবে তাই পালন করতে হবে এবং তার ফল সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কর্মফলের প্রশ্ন নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে অবান্তর। তারা হৃদয়-বৃত্তির দাবীকে এইভাবে উপেক্ষা করে। অপরপক্ষে উপনিষদ হৃদয়বৃত্তির দাবীকে স্বীকার করে তাকে সাদরে নীতির রাজ্যে গ্রহণ করে বিশিষ্ট ভূমিকা দেয়। উপনিষদ বলে মানুষ মানুষকে ভালবাসুক, ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি করে সকলে পরস্পরের সহিত একত্ব ও আত্মীয়তা অনুভব করুক। ফলে কর্তব্য সম্পাদনে হৃদয়বৃত্তির অনুমোদন মিলবে। কর্তব্য পালন সহজ হবে।

প্রশ্ন ওঠে উপনিষদের এই দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি সমর্থনযোগ্য। এ বিষয় একটি মীমাংসায় আসতে হলে কিছু প্রাথমিক কথার প্রয়োজন। মানুষের মনটি বড় জটিল বস্তু। তার সহিত তিনটি মূলবৃত্তি গ্রথিত : বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত কর্মবৃত্তি। এই তিনটি বৃত্তি ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত এবং পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করবার ক্ষমতা রাখে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি নির্দেশ দেবে তার কর্তব্য কি, তার কর্মবৃত্তি তাকে সেই কর্তব্যে নিযুক্ত করবে আর তার হৃদয়বৃত্তি তার কর্মশক্তিকে প্রেরণা দেবে। তবেই মানুষ কর্তব্য সম্পাদানের উপযুক্ত শক্তি অর্জন করতে পারে। মানুষের হৃদয়বৃত্তিই তার কাজে মানুষের প্রেরণা এবং উৎসাহ এনে দেয়। মানুষের কাজ করবার ক্ষমতা তার প্রেরণার গভীরতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। কোন অত্যাচারের গুরুত্ব আমরা যে পরিমাণে অনুভব করি, তাকে প্রতিরোধ করবার ইচ্ছা সেই পরিমাণে শক্তি-মান হয়। কর্তব্য হিসাবে যা করি তা যন্ত্রচালিত হয়ে করি। প্রেরণার বশে যা করি তা প্রাণপণে করি। সুতরাং অনুভূতি শক্তি নৈতিক জীবনকে পূর্ণতা দেয়। তা নৈতিক জীবনের এক আবশ্যক উপাদান। কর্তব্যের নির্দেশ যদি হয় নীতির কঙ্কাল, অনুভূতি শক্তি হল তার দেহ। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সংযোগেই নৈতিক জীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হয়।

সুতরাং আমাদের যা প্রয়োজন তা অনুভূতি শক্তিকে বর্জন করা নয়, তাকে মার্জিত করা ; স্বার্থবোধকে উৎপাটিত করা নয়, তাকে বিস্তৃত করে পরার্থকে ও তার মধ্যে স্থান করে দিয়ে তাকে শোধিত করা। অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হল প্রীতি বা ভালবাসা। ভালবাসার বিস্তার ঘটিয়ে স্বার্থকে সংকীর্ণতা দোষ হতে মুক্ত করা যায়। ফলে, স্বার্থ ও পরার্থ একীভূত হয়ে যায়। হৃদয়বৃত্তি

বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সংযুক্ত হয়ে কর্মশক্তিকে বলাধান করে। অপরপক্ষে হৃদয়-বৃত্তিকে যদি বর্জন করি তা হলে কর্মশক্তি অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, অনুভূতি শক্তিকে নির্বাসিত করলে জীবনের মাধুর্য, কর্মের সৌন্দর্য হারিয়ে যায়। ফলে মানুষ হয়ে পড়ে যন্ত্রচালিত জীবের মত। কর্তব্য সম্পাদনে তার তৃপ্তিবোধ থাকে না, কর্তব্য নিতান্তই রসহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং নৈতিক জীবনে হৃদয়বৃত্তির একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। উপনিষদ তার নৈতিক চিন্তায় হৃদয়বৃত্তিকে নির্বাসিত না করে বুকে টেনে নিয়েছিল বলে তার স্থাপিত তত্ত্ব গীতা বা কান্ট-এর তত্ত্ব হতে পূর্ণতর রূপ পেয়েছে। তার আদর্শ অনুসারে নীতিবোধের নির্দেশ শুধু ঈশ্বরের কঠোর বাণী[১] নয় তা নিজের অন্তরেরও নির্দেশ। এইখানেই উপনিষদের নৈতিক আদর্শের অতিরিক্ত সার্থকতা।

১. Stern Daughter of the Voice of God.

দশম অধ্যায়

শিল্পতত্ত্ব

(১)

প্রাথমিক কথা

মানুষেব মনের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বোধ গ্রথিত আছে। তারা গড়ে উঠেছে মানুষের মনের গঠন প্রকৃতিকে ভিত্তি করে। তিনটি মূল বৃত্তি নিয়ে তার মন গঠিত—বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তি। বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে তার কৌতুহলবোধ গড়ে উঠেছে। কৌতুহলবোধকে অবলম্বন করে তার বিজ্ঞান-দর্শন গড়ে উঠেছে। হৃদয় বৃত্তিকে অবলম্বন করে তার মৌলিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে। সেই আকাঙ্খাকে অবলম্বন করে তার ধর্মবোধ জেগে উঠেছে। তা হতে ধর্মতত্ত্বের জন্ম। তার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত কর্ম-বৃত্তিকে অবলম্বন করে তার নীতিবোধ ফুটে উঠেছে। সেই নীতিবোধকে অবলম্বন করে নানা নৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। তাদের অতিরিক্তভাবে আরও একটি বোধ মানুষের মনে গ্রথিত। তা হল শিল্পবোধ। তাও একটি সর্বজনীন বৃত্তি। বর্ষার সন্ধ্যায় যখন অস্তগামী সূর্যের কিরণ সিক্ত হয়ে মেঘ নানা বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়, তখন কার মনকে না তা স্পর্শ করে? একটি সুন্দর ফুল কার না দৃষ্টি আকর্ষণ করে? একটি মধুর সঙ্গীত কার না মনকে মুগ্ধ করে? এরা সবই শিল্পের উদাহরণ, কোনটি নিসর্গজাত, কোনটি মানুষরচিত শিল্প।

অন্য বোধগুলির তুলনায় এই শিল্পবোধের প্রকৃতি ভারি জটিল। অন্য বোধের প্রেরণায় মানুষ এক একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করে তার তৃপ্তি খোঁজে। দর্শন বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে; ধর্ম হৃদয়বৃত্তিকে অবলম্বন 'করে; নীতি কর্মবৃত্তিকে অবলম্বন করে। কিন্তু শিল্পবোধ কোন বৃত্তিকে যে অবলম্বন করে না, তা বলা যায় না। ঠিক বলতে কি তা সব কটি বৃত্তিকেই অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, বিশেষ করে মানুষের রচিত শিল্পে। তার হৃদয়বৃত্তি তাকে প্রেরণা দেয়, তার বুদ্ধিবৃত্তি তাকে নির্দেশ দেয়, আর তার কর্মবৃত্তি সেই প্রেরণা ও নির্দেশকে অবলম্বন করে কল্পনার আশ্রয়ে রূপকর্ম বা শিল্পবস্তু সৃষ্টি করে। সেই কারণেই শিল্পতত্ত্ব বড় জটিল আকার গ্রহণ করে বসে। তার সঙ্গে মানুষের যে সব মৌলিক বৃত্তিগুলিই জড়িত, তা বোঝা যাবে দু একটি উদাহরণ স্থাপন করলে।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা নেওয়া যাক। আমরা প্রথমে নির্বাচিত কবিতাখানি মনোযোগ দিয়ে পড়ে তার অর্থ গ্রহণ করি। এখানে বুদ্ধিবৃত্তি কাজে লেগে যায়। তারপর বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি যে কল্পনার সঙ্গে সুন্দর ভাষা ও অলঙ্কার মিশিয়ে তিনি নিজের অনুভব করা একটি অনুভূতির এখানে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কবিতাটির উদ্দেশ্য হল কবির নিজস্ব অনুভূতিকে কল্পনা ও ভাষার সাহায্যে প্রকাশ দেওয়া। তার অর্থ এই নয় যে কবি চান তিনি নিজে যা অনুভব করেছেন আমরাও তাই অনুভব করি। কোন কবিতার বর্ণনীয় বিষয় হয়ত সুখের। তা পড়ে আমাদের মনে সেই সুখানুভূতি সংক্রামিত হয় না। অপরপক্ষে এও হতে পারে যে কবিতাটি একটি দুঃখের অনুভূতিকে অবলম্বন করে রচিত। তা পড়ে সে দুঃখও আমাদের মনে সংক্রামিত হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই কবিতা ভাল লাগলে আমরা বলি চমৎকার হয়েছে। ফলে অমোদের মনে যা ঘটে তা একটি অপূর্ব জিনিস। কবিতার সামগ্রিক রূপটি উপলব্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে একটি নূতন অনুভূতির সঞ্চার হয়। তা যে অনুভূতি কবিতার বিষয় তা হতে স্বতন্ত্র। তা সুখ-দুঃখ-আদি অনুভূতির মত নয়, তা হতে অনেক সূক্ষ্ম, অথচ অনুভূতি শ্রেণীর। সেই বিশেষ শ্রেণীর অনুভূতিকে আমরা আপাতত নন্দিত হওয়া বলতে পারি। সুতরাং এই বিশ্লেষণ হতে বোঝা যায় যে শিল্পকর্মকে ভিত্তি করে যে স্বতন্ত্রধরনের অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা যেমন জটিল জিনিস, শিল্পবস্তুটিও তেমন জটিল জিনিস। তাদের নানা সূক্ষ্ম দিক আছে, যারা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। আরও একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় ; শিল্পের সঙ্গে আমাদের তিনটি মৌলিক বৃত্তিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উপরের উদাহরণে একটি মাত্র অনুভূতিকে অবলম্বন করে একটি শিল্পবস্তু গড়ে উঠেছে। এটি শিল্পের একটি সরল রূপ। শিল্পের আরও জটিল রূপ দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে শেক্সপীয়ার-এর একটি নাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধরা যাক আমরা ‘টেমপেস্ট’ পড়ছি। তাতে কত বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র, কত ঘটনার সংঘাত, কত বিপরীতধর্মী মনের সংঘর্ষ। ভ্রাতৃ বিদ্বেষ, সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পিতা ও পুত্রীর নির্বাসন। সেখানে এরিয়াল ও ক্যালিবান-এর মত দুই বিপরীত চরিত্রের সহিত পরিচয়। শেষে ঝড় এবং জাহাজ ডুবির ভিতর দিয়ে একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে ফার্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডার কুমারী হৃদয়ের প্রণয় ও মিলনে তার আনন্দদায়ক পরিসমাপ্তি

ঘটেছে। এখানে প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা আছে, নানা নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ আছে। নানা চরিত্রের হৃদয়ে উদ্বেলিত নানা অনুভূতি আছে। সব জড়িয়ে এই নাটক। তার মূল উপাদান হল মানব হৃদয়ের অনুভূতি, অন্যগুলি তার আনুষঙ্গিক বস্তু। সেই নিয়ে শিল্পকর্মরূপে প্রকট এই নাটকটি পাঠ করে বা তার অভিনয় দেখা শেষ করে শিল্পরসিকের মনে একটি অনুভূতি জাগে। তাকে আমরা নন্দিত হওয়া বলেছি। পশ্চিমের কোন কোন দার্শনিক তাকে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি[১] বলেছেন।

উপরে যে দুটি দৃষ্টান্ত দেখানো হল তার অবলম্বন বা উপাদান অনুভূতি বা অনুভূতি সমষ্টি। তারাই হল শিল্প বস্তুর প্রেরণা বা ভাব। কবিতার ক্ষেত্রে তা একটি অনুভূতি, নাট্যের ক্ষেত্রে তা একটি প্লট বা কাহিনী বিন্যাস। বাহিরে কবিতা বা নাট্য আকারে তার যে শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে তা সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি। একদিকে ভাব, অপরদিকে তার প্রকাশ; একটি আধেয়, অপরটি আধার—এই নিয়েই একটি শিল্পবস্তু গড়ে ওঠে। একে আমরা ভাবের সহিত সংযুক্ত শিল্প বলতে পারি।[২] শিল্পের প্রকাশ আর একভাবে ঘটতে পারে, যেখানে তা ভাব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রূপ সবস্ব হয়ে পড়ে। তাকে বিমূর্ত শিল্প[৩] বলা হয়ে থাকে। কতকগুলি শিল্প এমন যে সেখানে ভাবের সহিত তার প্রকাশের এমন নিবিড় সংযোগ যে তারা বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে একথা প্রয়োজ্য।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, মহাকাব্য ইত্যাদি রস-সাহিত্য শ্রেণীর শিল্প। এসব ক্ষেত্রে ভাবের সঙ্গে প্রকাশের এমন নিবিড় সংযোগ যে বিমূর্ত আকারে এই প্রকৃতির শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। আর এক শ্রেণীর শিল্প আছে যেখানে তারা সংযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে আবার তা হতে বিযুক্ত হয়েও গড়ে উঠতে পারে। চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য এই শ্রেণীতে পড়ে। চিত্রে আমরা কোন বিশেষ বস্তুর প্রকাশ দিতে পারি বা ভাবের প্রকাশ দিতে পারি। সেখানে ভাবের সহিত রূপের সংযুক্ত প্রকাশ পাই। আবার ভাব হতে বিচ্ছিন্ন করে কেবল রূপসর্বস্ব চিত্রও আঁকা যায়। যেমন লোকশিল্পের আলপনা বা অতি আধুনিক শিল্পীর ভাবমুক্ত রূপ বিন্যাস। সঙ্গীতেও দুটি রূপ সম্ভব। ভাবের সহিত সুরের মিলনে যে সঙ্গীত গড়ে ওঠে তা হল ভাব ও সুরের যুক্ত প্রকাশ। আমাদের বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত বা রবীন্দ্রসংগীত তার সুন্দর উদাহরণ। আবার ভাব

১ Aesthetic Emotion. ২ Concrete Art ৩ Abstract Art

হতে মুক্ত হয়েও সঙ্গীত গড়ে ওঠে। তার ভাল উদাহরণ যন্ত্র-সঙ্গীত। কণ্ঠ সঙ্গীতেও তার নিদর্শন পাওয়া যায় উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে, যেমন আলাপে। নৃত্যেও অনুরূপভাবে দুটি ভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। ভাব হতে বিযুক্ত হয়ে কেবল অঙ্গভঙ্গির বিন্যাসে নৃত্য গড়ে উঠতে পারে। তখন তা বিমূর্ত। ভরত মুনি তার সংযুক্ত রূপ হতে তাকে পৃথক করবার জন্য তাকে নৃত্ত বলেছেন, আর ভাবের সহিত সংযুক্ত রূপকে নৃত্য বলেছেন। তখন তা অভিনয়ের বাহন হতে পারে, যেমন আমাদের দেশের কথাকলি নৃত্য এবং পশ্চিমের ব্যালে নৃত্য। এসব ক্ষেত্রে যুক্ত এবং মুক্ত রূপ স্বাভাবিক। রস-সাহিত্য ভিত্তিক শিল্পে যুক্ত রূপই স্বাভাবিক। কোথাও কোথাও সেখানেও মুক্তরূপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু স্বভাব বিরুদ্ধ হওয়ায় তা উৎকৃষ্ট শিল্পের পর্যায়ে উঠতে পারে না।[১]

শিল্পতত্ত্বের জটিলতা আর একদিক হতেও সূচিত হয়। উপরের আলোচনা হতেই বোঝা যায় যে শিল্প কত বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে। শিল্পতত্ত্বে শিল্পকে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সাজাবার নানা চেষ্টা হয়েছে। তাদের যা বাহন অর্থাৎ স্থান ও কাল তার ভিত্তিতে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা যায়, আবার তারা যে রূপ নেয় তার ভিত্তিতেও তাদের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এই দুটি নীতিকে এক সঙ্গে জড়িয়ে বোধহয় তাদের এমন একটি শ্রেণীবিভাগ সম্ভব যা তাদের প্রকৃতির সাদৃশ্য কোথায় এবং পার্থক্য কোথায় তার মৌলিক পরিচয় দিতে পারে। তা অতিরিক্তভাবে শিল্পের প্রকৃতি ও প্রকার সম্বন্ধেও কিছু আলোকপাত করতে পারবে বলে মনে হয়। সুতরাং এই পথে তার একটি শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টা করা যেতে পারে। এখানে মূলনীতি হবে শিল্পকর্ম পরিণতিতে যে রূপ নেয় তাকে ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করা। তারপর যে বস্তু তার বাহন তার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। শিল্প পরিণতিতে যে রূপ নেয় তা দুই শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম তা এমন স্থিররূপ নিতে পারে যাতে তাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায়। ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিল্পরসিক তাকে দেখে তার রসগ্রহণ করতে পারেন। চিত্র শিল্প তার সুন্দর উদাহরণ। একটি চিত্র অঙ্কিত হলে শত শত বৎসর তাকে সংরক্ষিত করা যায় এবং পুরুষানুক্রমে তার রসগ্রহণ করা যায়। এখানে শিল্প একরকম স্থান

১ এই প্রসঙ্গে Nonsense Verse বা Absurd Drama-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। নামকরণ হতেই বোঝা যায় তারা বিকৃত রূপ।

ভিত্তিক। আর এক রকম শিল্প আছে যা এক সঙ্গে সমগ্র রূপটি ধারণ করতে সক্ষম হয় না ; তা সময়কে অবলম্বন করে অভিব্যক্তি লাভ করে এবং পূর্ণতা পাবামাত্রই তার সমাপ্তি ঘটে, তাকে ধরে রাখা যায় না। তার সুন্দর উদাহরণ একটি সঙ্গীত। তার বিন্যাস সময়কে প্রধানত ভিত্তি করে। তার উপাদান এমন সূক্ষ্ম প্রকৃতির বস্তু যে তাকে ধরে রাখা যায় না। তাই এই শ্রেণীর শিল্প একসঙ্গে অনেক রসিকের শুনতে বা দেখতে হয় ; তা না হলে তা নাগালের বাইরে চলে যায়। সঙ্গীত তার সুন্দর উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার মনে হয়। এই শ্রেণী বিন্যাসে যে সব শিল্পকে স্থান দেওয়া হবে তাদের মধ্যে যা প্রকৃত শিল্প নয় তাকে বর্জন করা হবে। এক শ্রেণীর রূপকর্ম আছে যা শিল্পের মত অথচ শিল্প নয় ; যেমন স্থাপত্য। এখানে একটি বিশেষ ধরণের গৃহ নির্মাণই মূল উদ্দেশ্য ; তাকে সুদৃশ্য বা মনোরম করবার জন্য একটি সুঠাম রূপ দেওয়া হয়। একে কোন কোন শিল্পতাত্ত্বিক শিল্পের মর্যাদা দিতে অন্তত আংশিকভাবে প্রস্তুত। কিন্তু তা দিলে পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে যে কারুকার্যের সংযোগ ঘটে তাকেও শিল্পের মর্যাদা দিতে হয়। যেমন বস্ত্র শিল্পে নানা নকসা এবং চীনা মাটির বাসনে নানা বৈচিত্র্য। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর রূপকর্মকে প্রকৃত শিল্প হতে পৃথক করবার জন্য কারুকার্য বলা হয়। এই কাজ যাঁরা করেন তাদের বলা হয় কারিকর[১]। আর প্রকৃত শিল্প যেমন চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি তাদের চারুশিল্প বলা হয় এবং যিনি তা রচনা করেন তাঁকে শিল্পী বলা হয়[২]।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিল্প হতে তাদের পৃথক করবার প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। পণ্য দ্রব্যের সঙ্গে বা বিশেষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত যে কারুকার্য তাকে প্রকৃত শিল্প হতে পৃথক করবার জন্য তিনি প্রথমটি নির্মাণ বলেছেন এবং দ্বিতীয়টিকে সৃষ্টি বলেছেন। তাদের পৃথক করবার জন্য তিনি একটি নীতিও প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন যার ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে তা নির্মাণ এবং যার ব্যবহারিক প্রয়োজন নেই, শিল্পীর শিল্পবোধের তৃপ্তির জন্যই যা করা হয় তা হল সৃষ্টি। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে তাহা সকলেই জানে।"[৩]

১. Artisan ২. Artist ৩. সাহিত্যের উদ্দেশ্য

সুতরাং আমাদের শ্রেণী বিন্যাস হতে এই শ্রেণীর কারুকার্যকে বাদ দেওয়া হবে। এখন বিন্যাসের কাঠামোটি নীচে দেওয়া যেতে পারে :
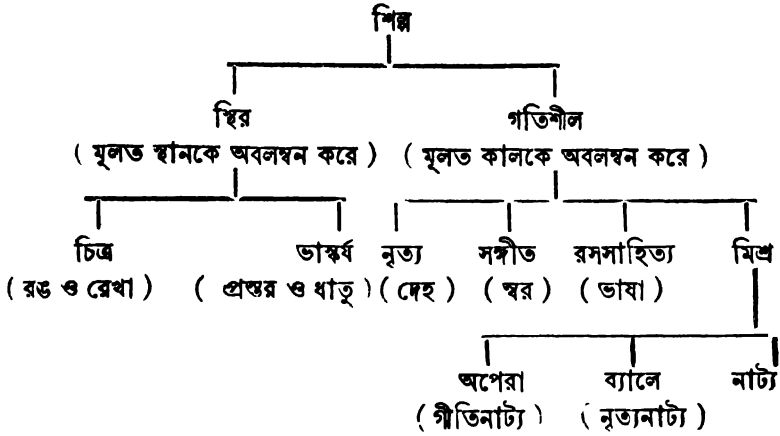
উপরের শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে দেখা যাবে বিভিন্ন শিল্পগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের যা বাহন তা ব্র্যাকেটে তার তলায় উল্লিখিত হয়েছে। যেমন চিত্রের বাহন রঙ ও রেখা, নৃতের বাহন দেহভঙ্গি, সঙ্গীতের বাহন স্বর ইত্যাদি। যারা মিশ্র শ্রেণীতে পড়ে দেখা যাবে তারা সকলেই গতিশীল, অর্থাৎ স্থায়ীরূপ ধারণ করবার ক্ষমতা রাখে না। তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তারা একাধিক শিল্পকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। যেমন গীতিনাট্যে বাচিক অভিনয়ের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সংযোগ ঘটেছে, নৃত্যনাট্যে যন্ত্রসঙ্গীতের সহিত দেহভঙ্গি বা আঙ্গিক অভিনয় সংযুক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য শ্রেণীর নৃত্যনাট্যে অর্থাৎ ব্যালেতে[১] যন্ত্রসঙ্গীতের সহিত দেহভঙ্গির সংযোগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত নৃত্যনাট্যে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে দেহভঙ্গির সংযোগ ঘটেছে। সাধারণ নাট্যে বাচিক অঙ্গ প্রধান হলেও তার মধ্যেও কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য প্রয়োগ এবং দেহভঙ্গিও অল্পবিস্তর অনুপ্রবেশ করে। রাগ প্রকাশ করতে স্বর উচ্চ হয়, প্রীতি প্রকাশ করতে স্বর কোমল হয়। তেমন কথার সঙ্গে নানা দেহভঙ্গিও সংযুক্ত হয়। সেই কারণে নাট্যাভিনয়কে মিশ্র শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে ফেলাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। রস সাহিত্যের অবলম্বন ভাষা। অক্ষরের সজ্জায় তাকে পরোক্ষভাবে স্থায়ীরূপ দেওয়া সম্ভব হলেও তাকে গতিশীল বলাই যুক্তিসম্মত, কারণ তার রসগ্রহণ করতে তাকে পড়তে বা শুনতে হয়। কণ্ঠ

১.. Ballet

সঙ্গীতকেও রেকর্ডে পরোক্ষভাবে স্থায়ীরূপ দেওয়া যায়। তা বলে তার গতিশীলতা নষ্ট হয় না।

উপরের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আলোচনা আমাদের দুটি বিষয় সাহায্য করবে। তা শিল্পের বৈচিত্র্য এবং তার উপাদানের জটিলতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু পরিচয় দেবে। অতিরিক্তভাবে শিল্পের ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা গড়তে আমাদের সাহায্য করবে।

শিল্পতত্ত্বের জটিলতার আরও একদিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা হলে শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করা অনেক সহজ হবে। শিল্পতত্ত্বের নানা দিক আছে। প্রথমেই একথা বলে নেওয়া যেতে পারে যে শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হল শিল্পবস্তু[১] তাকে ঘিরে শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন দিককে সাজানো সম্ভব। তাকে অবলম্বন করেই শিল্পের নানা দিকের পরিচয় সহজবোধ্য হয়। সেই পথেই আমরা আলোচনা করব।

একটি শিল্পবস্তু আমাদের কাছে স্থাপিত হলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে তার বাহিরের রূপের প্রতি। তারপর আমরা সন্ধান করব তা কি প্রেরণা বহন করে তাই। একটি কবিতার কথা ধরা যাক। তার বাহিরের রূপ হল তার সুন্দর অলঙ্কার ভূষিত ছন্দোবদ্ধ ভাষা। তা যাকে প্রকাশ দিচ্ছে তা একটি বিশেষ অনুভূতি। তাই হল তার প্রেরণা। সুতরাং শিল্পবস্তু প্রথম দর্শনেই মনে করিয়ে দেয় তার দুটি দিকের কথা—রূপ এবং তার প্রেরণা। প্রথমটি আধার[২], দ্বিতীয়টি হল আধেয়[৩]। এই দুটি হল তার মৌলিক উপাদান।

তারপর মনে পড়বে যিনি শিল্পকর্ম সৃষ্টি করলেন সেই শিল্পীর কথা। শিল্পী যে সৃষ্টি করেন তা শিল্পবোধের[৪] তৃপ্তির জন্য। শিল্প রচনা কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, রচনাতেই শিল্পীর তৃপ্তি। কিন্তু শিল্পবস্তুকেও তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্য সৃষ্টি করেন না; তিনি চান শিল্পরসিক তা দেখুক, দেখে আনন্দ পাক। কাজেই শিল্পবস্তুর দুটি পক্ষ আছে। এক দিকে শিল্পী; তিনি সৃষ্টি করেন। অপর দিকে শিল্পরসিক; তিনি তার উৎকর্ষ উপলব্ধি করে তৃপ্তি পান। সুতরাং শিল্পবস্তু যেন দুটি পক্ষের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করে। যে আনন্দ, যে তৃপ্তি শিল্পবস্তু রচনা করে শিল্পী পান, তা শিল্পরসিকের মনে সঞ্চারিত হয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পীর অতিরিক্ত তৃপ্তি এনে দেয়।

১. Art object ২. Form ৩. Content ৪. Aesthetic sense

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে শিল্প রচিত হয় কেন? তা কোন উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত? ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে শিল্পের কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন নেই এবং তার ভিত্তিতে পণ্যদ্রব্যকে আশ্রয় করে যে সব কারুকার্য গড়ে ওঠে তাদের নির্মাণ-বলেছি, তাদের শিল্পের মর্যাদা দিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করেছি। শিল্প রচনায় তবু অতিরিক্তভাবে একটা কিছু সুখানুভূতি আছে কি না, তা নিয়ে শিল্পতত্ত্বে তুমুল বিতর্ক এসে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে তা সুখ দেয় বলে মনে হবে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে সে কথা ঠিক নয়। সুখের বিপরীত দুঃখ। শিল্পবস্তু অনেক সময় দুঃখকর অনুভূতিও এনে দেয়। বিয়োগান্তক নাটক দেখে আমরা দুঃখ পাই। প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখবোধকে অতিক্রম করে একটি অনুভূতি শ্রেণীর উপলব্ধি শিল্পবস্তু হতে উৎপত্তি হয়। তার প্রকৃতি নিরূপণ করা শক্ত; তবে এটুকু এখনই বলা যেতে পারে যে সুখ-দুঃখ, সুন্দর-কুৎসিত প্রভৃতি বিপরীতধর্মী বস্তু তার উপাদান হয়ে যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণ অনুভূতি হতে তাকে পৃথক করবার জন্য বলা হয় শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি[১]। আমাদের দেশে তাকে আনন্দ বলা হয়।

উপরের আলোচনা হতে বোঝা যাবে শিল্পতত্ত্ব বিষয়টি কত জটিল, তার কত দিক আছে। সুতরাং এটা দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে শিল্পতত্ত্বের নানা দিক নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে বিষয়টিকে আরও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। পরিস্থিতি সত্যই অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। তা অনেকটা গল্পে কথিত পাঁচ অন্ধের হাতী সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টার সঙ্গে তুলনীয়। প্রত্যেকে হাতীর দেহের যে অংশের সহিত পরিচিত হচ্ছে, তার ভিত্তিতেই হাতীকে সে বুঝতে চেষ্টা করছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী মত গড়ে উঠেছে। শিল্পতত্ত্বের জটিলতা হতে এবং বিভিন্ন মনীষীর মতিগতির প্রভাব তার বিশেষ দিকের প্রতি বেশী দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় একটি অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তার সুন্দর পরিচয় মেলে শিল্পতত্ত্বের নামকরণ নিয়ে যে বিতর্ক গড়ে উঠেছে তার মধ্যে।

পাশ্চাত্য দর্শনে শিল্পতত্ত্বের নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈসথেটিকস'। তার অর্থ দাঁড়ায় তা হল যা সুন্দর তার দর্শন।[২] বাংলায় তার নামকরণ হয়েছে

১. Aesthetic Emotion

২. "Aesthetics means the Philosophy of the Beautfful,"

Bosanquet, History of Aesthetics

সৌন্দর্যতত্ত্ব, কান্তিবিদ্যা এবং নন্দনতত্ত্ব। প্রথম দুটি শব্দ ইংরাজি শব্দটির হুবহু অনুবাদ। তৃতীয়টি বিষয়টিকে সূচিত করবার চেষ্টা করেছে রসিকের মনের ওপর শিল্পবস্তু যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার দ্বারা। এগুলির কোনটিই মৌলিক বস্তুর সঠিক পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে না, তার অংশকে মাত্র সূচিত করে। মানুষের পরিচয় দিতে তাকে দ্বিপদ বিশিষ্ট জীব বলে বর্ণনা করার মত। সৌন্দর্য বা কান্তি শিল্প কর্মের একটি উপাদানের মাত্র পরিচয় দেয়, কিন্তু তাও সঠিক ভাবে নয়, কারণ যা সুন্দর নয় তাও শিল্পকর্মের বিষয় হতে পারে। অনুরূপভাবে নন্দন শব্দটি শিল্পরসিকের মনের ওপর শিল্প কর্মের প্রতিক্রিয়াটি মাত্র সূচিত করে; তা বলে যে শিল্পকর্ম দেখে শিল্পরসিক নন্দিত হল। অন্য বিষয় তা নীরব। কোন ক্ষেত্রেই মূল উপাদানের ভিত্তিতে সমগ্র বিষয়টির একটি পরিচয় সূচিত হয় না। উপরেই দেখানো হয়েছে যে স্রষ্টারূপী মানুষের রচিত শিল্পের নানা দিক আছে এবং তার কেন্দ্রীভূত বিষয়টি হল শিল্পকর্ম। তাকে ঘিরেই তার নানা দিক। সুতরাং বিষয়টিকে শিল্পতত্ত্ব বলাই প্রশস্ত মনে হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শব্দটির এই অর্থে ব্যবহার আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। বিশিষ্ট শিল্পতাত্ত্বিক ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য বিষয়টিকে সূচিত করতে এই পারিভাষিক শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।[১]

উপরের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এখন সাধারণভাবে শিল্পতত্ত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নিতে সক্ষম হয়েছি। এখন শিল্পতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি কি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার সময় হয়েছে। শিল্পতত্ত্বের সকল সমস্যাই শিল্পবস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মূল সমস্যাগুলির প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। তারপর তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। মূল সমস্যাগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায়ঃ

(১) প্রেরণা ও রূপের সমস্যা;

(২) শিল্পী ও শিল্পরসিকের পারস্পরিক সম্বন্ধের সমস্যা;

(৩) সুখ বনাম আনন্দের সমস্যা;

(৪) শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতির কারণের সমস্যা।

প্রথম সমস্যাটিতে যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে পড়ে তা হল শিল্পের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে অন্তরের প্রেরণার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব শিল্প জগতে সম্প্রতি ক্রোচের দর্শনে

১. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, শিল্পতত্ত্বের কথা

উত্থাপিত হয়েছে। এর সহিত জড়িত আর একটি দ্বন্দ্ব শিল্প আলোচনায় এসে পড়ে, যা হল আধার ও আধেয়ের দ্বন্দ্ব, ভাব ও রূপের দ্বন্দ্ব। শিল্পবস্তুর একটি বাহিরের রূপ থাকে আর তা ধারণ করে একটি ভাবকে। প্রশ্ন ওঠে ভাব বড় না রূপ বড়[১]। এই প্রশ্ন প্রসঙ্গত অন্য সূত্রে আলোচিত হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রশ্ন কিন্তু ভিন্ন। তা বলে শিল্পকর্মের পরিণত রূপ শিল্পীর মনেই গড়ে ওঠে, না তা বহিঃপ্রকাশের অপেক্ষা রাখে? ক্রোচে বলেন অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং শিল্পকর্ম গৌণ জিনিস হয়ে পড়ে। এর বিপরীত তত্ত্ব হল ভারতীয় রসতত্ত্ব। তা বলে মনে যা ঘটে তা পরিণত রূপটি পায় রূপকর্মের মধ্যে। প্রথমটিকে তা ভাব বলে এবং তার বাহিরের প্রকাশকে রস বলে। কোনটির ভূমিকা গৌণ নয়, উভয়ে মিলে শিল্পকর্মের পরিসমাপ্তি।

দ্বিতীয় সমস্যা হল শিল্পীর সঙ্গে শিল্পরসিকের সম্বন্ধ নিয়ে। সম্বন্ধ যে একটা আছে তা আপাতদৃষ্টিতে নজরে পড়ে। শিল্পী ত নিজের জন্য শিল্পকর্ম রচনা করেন না, শিল্পরসিক তা দেখে আনন্দ পাক, তাঁর আনন্দের ভাগী হক, এই তিনি চান। কাজেই শিল্প সম্পূর্ণতা পায় শিল্পরসিকের হাতে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিল্পের এই দিকটি খুব প্রকট হয়ে ওঠে। শিল্পী মঞ্চে অভিনয় করেন দর্শকদের দেখানোর জন্য, দর্শক না থাকলে নাট্য অভিনয় অর্থহীন। এখানে শিল্পীর ভূমিকা আপাতদৃষ্টিতে সক্রিয় এবং শিল্পরসিকের ভূমিকা আপাতদৃষ্টিতে অক্রিয়। এখানে বিতর্ক ওটে শিল্পীর ভূমিকাই প্রধান কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে। কোন তত্ত্ব বলে শিল্পীর অন্তরের ভাবকে মুক্তি দেওয়াই হচ্ছে শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, শিল্পরসিকের মুখ চেয়ে কিছু করবার প্রশ্ন ওঠে না। পশ্চিমের চিন্তায় প্রকাশ বাদ[২] এই ধরণের কথা বলে। অপর পক্ষে আর একটি মত আছে যা বলে যে শিল্পকে সার্থক করতে হলে শিল্পরসিকের ও একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। শিল্প-রসিকের সহৃদয়তা তার একটি আবশ্যিক উপাদান। আলংকারিক আনন্দবর্ধন এই ধরণের মত পোষণ করেন।

শিল্পতত্ত্বের তৃতীয় মূল সমস্যা হল শিল্পবস্তু দেখে মনে যে অনুভূতির উদয় হয় তার প্রকৃতি কি? তা কি সুখ দেয়, না অন্য ধরণের অনুভূতির উৎপাদন করে। পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাচীনকাল হতে দীর্ঘকাল একটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে তা যে অনুভূতি দেয় তা সুখের অনুভূতি। স্বয়ং এরিস্টটল এই মতের

১. Form versus Content

২. Expressionism

পরিপোষক। পরবর্তীকালে তা পরিবর্তিত হয়ে এই চেতনা ফুটে ওঠে যে তা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর অনুভূতি। তা সুখের অনুভূতিও নয়, দুঃখের অনুভূতিও নয়। তাকে সাধারণ অনুভূতি হতে বিশিষ্ট করে চিহ্নিত করবার জন্য ক্লাইভ বেল তার নাম দিয়েছেন শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি[১]। আমাদের দেশের শিল্পতত্ত্বে তাকে আনন্দ বলা হয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল শিল্পবস্তু দেখা বা শোনার বা পড়ার ফলে শিল্পরসিকের মনে যে বিশেষ অনুভূতির উদ্রেক হয় তার প্রকৃতি কি।

শেষ মূল প্রশ্ন হল এই শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতিকেই কেন্দ্র করে। প্রশ্ন ওঠে কি কারণে এই বিশেষ অনুভূতির উদ্ভব হয়। এ বিষয় নানা বিপরীত তত্ত্ব উত্থাপিত হয়েছে। কেহ বলেন তা জীবনকে অনুকরণ করে বলে এই অনুভূতি উৎপাদিত হয়। একে বলা হয় অনুকরণবাদ[২]। এরিস্টটল এই তত্ত্ব প্রথম স্থাপন করেছিলেন। কেহ বলেন শিল্পকর্ম সুন্দর বলে এই ধরণের অনুভূতি জাগে। একে সৌন্দর্যবাদ বলা যায়। এই ধারণাকে ভিত্তি করেই শিল্পতত্ত্বের নাম পাশ্চাত্য জগতে 'ঈসথেটিকস' হয়েছে। চিন্তা আরও গভীরে প্রবেশ করলে এই প্রশ্নের উত্তর অন্য ভাবেও দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শিল্পবস্তু খানিকটা অনুকরণ বটে, খানিকটা কাল্পনিকও বটে। উভয় উপাদানই তার মধ্যে বিদ্যমান। অনুরূপভাবে ব্যাপক অভিজ্ঞতা হলে দেখা যায় যে শিল্পবস্তু হতে সুখের অনুভূতিও জাগে দুঃখের অনুভূতিও জাগে, যেমন বিয়োগান্তক নাটকে। তাই বলা হয়েছে শিল্পবস্তু হতে যে বিশেষ অনুভূতি উৎপাদিত হয় তার কারণ হল রূপগত সুমিতি।[৩] অসবর্ণ এই তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। কেউ কেউ এই সুমিতিকে কেবল শিল্পকর্মের রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে রূপ ও ভাবকে, শিল্পের আধার ও আধেয়কে জড়িয়ে নিয়ে যে সামগ্রিক সুমিতি ফুটে ওঠে তাকেই এই অনুভূতির কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই মতের সমর্থন করেন। একই অর্থে কোন কোন পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্ববিৎ তার অঙ্গাঙ্গীর সুমিতি[৪] বলে নামকরণ করেছেন। আমরা এইবার প্রত্যেক সমস্যার পৃথক আলোচনা করতে পারি।

১. Aesthetic Emotion
২. Mimetic Theory
৩ Configuration Theory
Organic unity

(২)

প্রেরণা বনাম রূপ

আমরা প্রথমেই ক্রোচের শিল্পতত্ত্ব নিয়ে বর্তমান আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। তিনি বলেন শিল্পের কাজ মনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বাহিরে অতিরিক্ত একটি শিল্পবস্তু সৃষ্টি হয়। তা না হলেও চলে, তার ভূমিকা গৌণ। আমরা শিল্পকর্মকে একটি বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। শিল্প ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রকাশ না নিলে আমরা তার রসগ্রহণ করতে পারি না। রূপকর্ম হিসাবে প্রকট না হলে আমাদের কাছে তার কোন মূল্য নেই। এই রকম একটা বাহিরের প্রকাশ যে ঘটে ক্রোচে তা অস্বীকার করেন না, কিন্তু তার কোন মূল্য দেন না। তাঁর মতে সেটা গৌণ বস্তু, শিল্পকর্মের মৌলিক অংশ নয়। তা না হলেও চলে।

তিনি কেন একথা বলেছেন সেটা বুঝতে আমাদের তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। তাঁর কথা দিয়েই আমরা সে আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। শিল্পকর্মকে তিনি চারটি পৃথক অবস্থার মধ্য দিয়ে দেখেছেন। এই অবস্থাগুলির পরিচয় তিনি এই ভাবে দিয়েছেন :

"সৌন্দর্য সৃষ্টির সমগ্র কাজটি চারটি পৃথক অবস্থায় চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ (ক) অনুভূতি[১], (খ) অভিব্যক্তি[২] বা মানসিক শৈল্পিক সমন্বয় সাধন; (গ) সুখকর অনুভূতির সহাবির্ভাব, বা সৌন্দর্য বোধের সুখ (শিল্পতাত্ত্বিক সুখ), (ঘ) শিল্পবস্তুকে বহির্জাগতিক ঘটনায় রূপান্তরিত করা, যেমন শব্দ, স্বর, ভঙ্গি, রেখা ও রঙের বিভিন্ন সংযোগ প্রভৃতি। যে কোন মানুষ বুঝতে পারেন যে মূলবস্তু বা প্রকৃতপক্ষে যা শিল্পতাত্ত্বিক এবং সত্যই বাস্তব তাকে আমরা পাই (খ) এর মধ্যে ; তাকে আমরা বাহিরের প্রকাশ বা রচনার মধ্যে (যাকে রূপক ভাষায় অভিব্যক্তি) বলা হয় তার মধ্যে পাই না।"[৩]

তিনি একই গ্রন্থের আর এক জায়গায় আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন, "শিল্প-কর্ম (সৌন্দর্য সৃষ্টি) সর্বক্ষেত্রে মনের ভিতরের জিনিস। আর যাকে আমরা বাহিরের বলি তা শিল্পকর্ম নয়।"[৪]

১, Impression ২. Expression.

৩. Bendetto croce, Aesthetic, Physical Beauty

৪, "It is usual to distinguish the internal from the external work of art : the terminology seems to us infelicitous, for the work of art (the the aesthetic work) is always internal : and what is called external is no longer a work of art. Ibld, Theoretic and Practical Activity

তাঁর উদ্ধৃত মন্তব্য হতে বেশ বোঝা যায় মনের বাহিরে যে শিল্পকর্ম রচিত হয় তাকে তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তাকে তিনি প্রকৃত শিল্পকর্মের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নন। একথাও তিনি স্বীকার করেন যে শিল্পকর্মে প্রেরণা ও তার অভিব্যক্তি দুই আছে, কিন্তু তাঁর ধারণা মনের মধ্যেই উভয় ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে যায়। তাঁর বিশ্লেষণে এই দুটি (ক) ও (খ) রূপে চিহ্নিত হয়েছে। তাঁর ধারণায় অনুভূতি বা প্রেরণার মধ্যেই বীজ আকারে তার অভিব্যক্তি থাকে এবং একই প্রক্রিয়ার মধ্যে অনুভূতি[১] অভিব্যক্তিতে[২] মনের মধ্যেই রূপান্তরিত হয়। কাজেই রূপকর্মের সমাপ্তি মনের মধ্যেই ঘটে যায়। বহির্বিশ্বে তাকে যে রূপ দেওয়া হয় তা না হলে ও চলে, তাকে বাদ রেখেও রূপকর্ম সম্পূর্ণতা পায়। বাহিরে রূপ দেওয়াকে তাই তিনি অনুবাদের[৩] সমস্থানীয় বলেছেন।

ক্রোচে-এর দৃষ্টিভঙ্গি ভাল করে বুঝতে আমরা একটি উদাহরণ স্থাপন করতে পারি। আমরা সকলেই কালিদাস রচিত 'মেঘদূত' নামে কবিতাটির সহিত পরিচিত। আমরা এই কবিতাটি পাঠ করে অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করি। ক্রোচে-এর মতে এটি প্রকৃত রূপকর্ম নয়, এটি তার অনুবাদের মত। প্রকৃত রূপ কর্ম ক্ষণিকের মত এই কাব্যের রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের মনে উদিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আমরা বলব এইটুকু হল মনের প্রেরণা। তারপর কালিদাসের আকূতি জেগেছিল তাকে একটি দীর্ঘ গীতি কবিতার আকারে প্রকাশ দেবার। তারই আকর্ষণে তিনি কল্পনার সাহায্যে নানা বিচিত্র দৃশ্য এবং মানসিক অবস্থার সমাবেশ রচনা করে, তাকে অনবদ্য ভাবা দিয়ে, ছন্দে অলংকৃত করে কাব্য গ্রন্থ রূপে প্রকাশ দিয়েছিলেন। প্রথম প্রেরণায় যেটুকু পেয়েছিলেন সেটুকু তার মূল ভাবটি এবং রচনার সময় তাই বিস্তারিত হয়ে সেই রূপটি নিয়েছিল। ক্রোচে কিন্তু তা স্বীকার করবেন না।

এর বিপরীত মতটি পাই ভারতীয় প্রাচীন শিল্পতত্ত্বে। তা মোটামুটি বলে বহির্জগতে শিল্পকর্ম রূপে প্রকাশ না নিলে শিল্পকর্ম সম্পূর্ণতা পায় না। তা পরিণত রূপটি পায় বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে। প্রথমে শিল্পীর মনে একটি প্রেরণা জাগে, সেটি হল একটি বিশেষ অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলবার প্রেরণা। তাকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি মনে মনে নানা কল্পনা গড়ে তোলেন। এইগুলি ঘটে শিল্পীর মনের মধ্যে। তারপর আসে তাকে বাহিরে প্রকাশ দেবার কাজ।

১. Impression ২. Expressoin
৩. Translation

সেখানে শিল্পকর্মের মধ্যে অভিব্যক্তি পেয়ে তা পরিণতি লাভ করে। এই তত্ত্বটি স্থাপিত হয়েছে ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণে'। এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হবে।

মনের মধ্যে যে প্রেরণাটি ফুটে ওঠে আমাদের দেশের শিল্পশাস্ত্রে তাঁকে বলা হয় ভাব, আর বাহিরে যে রূপে তা প্রকট হয় তাকে বলা হয় রস। উভয়েই শিল্পীর রচনা, কিন্তু প্রথমটি শিল্পরসিকের অগোচরে থেকে যায়। তাঁর সম্পর্ক কেবল রসের সঙ্গেই। ভাব হল তাই যা শিল্পীর মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। তাকে বাহিরের জগতে প্রকাশ না দিলে তা শিল্পরসিকের নাগালের মধ্যে আসে না। যাদের সাহায্যে শিল্পী তা প্রকাশ করেন তারা হল বিভাব ও অনুভাব। আর তাদের প্রয়োগের ফলে যে রূপে তা শিল্পরসিকের গ্রহণযোগ্য রূপে প্রকট হয় তাই হল রস। ভাবের আকৃতি হল নিজেকে ভাবিত করবার। 'ভাবয়তি ইতি ভাবঃ'। আর রসের আকৃতি হল শিল্পরসিককে রসের সহিত পরিচিত করে রসিত বা নন্দিত করবার দিকে। 'রসয়তি ইতি রসঃ'। তাই তাদের যথাক্রমে নাম দেওয়া হয়েছে ভাব ও রস।

ভাবের এই রসে রূপায়িত হবার ব্যাপারটি কি ভাবে সংঘটিত হয় তা বুঝতে আমাদের বিভাব ও অনুভাবের সহিত পরিচিত হতে হবে। ভরতমুনি বলেন যাকে বিভাব প্রবর্ধিত করে এবং অনুভাব বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা সূচিত করে তাই হল ভাব।[১] সুতরাং যাকে শিল্পকর্ম রূপে প্রকাশ দেওয়া হয় তাই হল ভাব। তাকে পরিস্ফুট করতে যা সাহায্য করে তাই হল বিভাব। আর তাকে বাহিরে প্রকাশ দিতে শিল্পী যে সব উপায়গুলি অবলম্বন করেন তাই হল অনুভাব। এদের ব্যাখ্যা আরও বিস্তারিতভাবে আমরা পাই বিশ্বনাথ কবিরাজের বিশ্লেষণে।

তিনি বলেন রতি আদি ভাবকে যা ফুটিয়ে তোলে তাই বিভাব।[২] তিনি আরও বলেন বিভাব দুই উপায়ে ভাবের পরিবর্ধন ঘটাতে পারে। প্রথম, তা ভাবের অবলম্বন হয়ে কাজ করতে পারে। যেমন রতির ক্ষেত্রে প্রীতির অবলম্বন হবে নায়ক-নায়িকার চরিত্র, রূপ এবং গুণ। সেই জন্যই এই শ্রেণীর বিভাবকে আলম্বন বিভাব বলা হয়। আবার ভাবের উদ্দীপক হিসাবে ও তা করতে

১. বিভাবেনাহৃতো হর্থো হ্যনুভাবৈস্তু গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ভরতনাট্যম্ ॥৭॥১

২. রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ। সাহিত্যদর্পণম্ ॥৩॥৬১

পারে। সেটা করা যায় অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। যেমন রতির ক্ষেত্রে বসন্তকালীন সুন্দর পরিবেশ বা উন্মনাকরা বর্ষামুখর রাত্রি। তাকে উদ্দীপক শ্রেণীর বিভাব বলা হয়েছে।

ভাবকে প্রকাশ দিতেই অনুভাবের ব্যবহার। সুতরাং শিল্পী অন্তরের ভাবকে পরিস্ফুট করতে যে সব উপায় প্রয়োগ করেন তাই হল অনুভাব। আমরা অন্তরের ভাবকে প্রকট করি মৌখিক ভাষায়, ইঙ্গিতে, দেহভঙ্গিতে ও রূপসজ্জায়। তাই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে এইগুলিকেই অভিনয়ের অঙ্গ বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাতে সবগুলিই বর্তমান। তবে বিভিন্ন শিল্পে একটি বিশেষ অঙ্গ প্রাধান্য পায়। যেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে বাচিক অনুভাব প্রাধান্য পায়। নৃত্যে আঙ্গিক অনুভাব প্রাধান্য পায়; দেহভঙ্গিই নৃত্যের ভাষা। নাট্যে যা খাটে উপন্যাসেও তাই। কেবল পার্থক্য এই যে নাট্যে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে যা ফোটানো হয় উপন্যাসে বর্ণনার সাহায্যে তা ব্যক্ত করা হয়। চিত্রে বাচিক অনুভাবের প্রয়োগের অবকাশ নেই, কিন্তু দেহভঙ্গি ও মুখভঙ্গি সেখানে ভাবপ্রকাশের অঙ্গ হয়। মুখভঙ্গি সাত্ত্বিক বিভাবের অন্তর্গত।

সুতরাং শিল্পকর্মের দুটি দিক আছে। একটি শিল্পীর অন্তরের দিক; তাই হল ভাব। আর একটি আছে, তিনি বাহিরে শিল্পরসিকের রসগ্রহণের জন্য যে শিল্পকর্ম রচনা করেন তাই; তাই হল রস। প্রাচীন শিল্পতত্ত্বে প্রতি ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি রসের উল্লেখ আছে। যেমন রতিভাবের বাহিরের প্রকাশকে বলা হয় শৃঙ্গার রস; ক্রোধ ভাবের সহিত সংযুক্ত হয়ে আছে রৌদ্র রস ইত্যাদি।

সুতরাং ক্রোচে-এর মতের সহিত রসতত্ত্বের সংঘাত এসে পড়ে। ক্রোচে শিল্পের বহিঃ প্রকাশকে কোন মূল্য দিতে চান না। তিনি বলেন শিল্পের তা অপরিহার্য অঙ্গ নয়। ভারতীয় রসতত্ত্ব তা বলে না। তা বলে শিল্প দুটি দিক নিয়ে সম্পূর্ণতা পায়। তার একটি থাকে শিল্পীর মনের প্রেরণা রূপে এবং অপরটি প্রকাশ পায় তাঁর মনের বাহিরে শিল্পকর্মরূপে। ক্রোচে যা বলেন তা যে শিল্পীর অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত নয় তা সহজেই বোঝা যায়। এটা কল্পনা করা অসাধ্য যে শিল্পের পরিপূর্ণ রূপটি মনের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে যায়। তা হলে বিশ্বাস করতে হয় কালিদাসের মনের মধ্যে যখন মেঘদূতের প্রেরণা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বিন্যাস ও মনের মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল। শিল্পীর অভিজ্ঞতা এ তত্ত্বকে সমর্থন করতে পারে না। গল্প আছে লিয়োনার্দো

দা বিঞ্চিকে যখন যীশু খৃষ্টের 'শেষ নৈশভোজ' শীর্ষক চিত্রখানি আঁকবার জন্য পোপ নির্দেশ দেন, তিনি নাকি কয়েকদিন ধরে পন্টিয়াস পাইলেট-এর মুখখানা কেমন হবে তাই ভেবেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

সুতরাং এটা দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে যাঁরা একাধারে বিশ্বের বিশিষ্ট শিল্পী এবং শিল্পতত্ত্ববিৎ তাঁরা ক্রোচে-এর মতকে সমর্থন করেন নি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর ধারণায় মনের ভাবের বাহিরে প্রকাশ শিল্পের একটা আবশ্যিক অঙ্গ। তাঁর ধারণায় অন্তরের প্রেরণাকে বাহিরে প্রকাশ দিতে না পারলে শিল্পীর মুক্তি নেই। তাঁর মন্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

"শরীরের পিপাসা ছাড়া আর একটা পিপাসা মানুষের আছে। সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য মানুষের হৃদয়ে সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে 'আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে, রঙে, সুরে, বাণীতে, নৃত্যে। যে যেমন করে পারো আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত করে দাও'।"[১]

মনে হয় টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের মতের সমর্থক ছিলেন। তিনি শিল্পবস্তুর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার তাঁর মতে অন্যতম উপাদান হল তার শিল্পরসিকের মনকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা।[২] ঠিক বলতে কি এই গুণটির ওপরেই তিনি বেশী জোর দিয়েছেন। সেই জন্যই তাঁর স্থাপিত শিল্পতত্ত্বকে সঞ্চারবাদ[৩] বলা হয়। সুতরাং তাঁর বিবেচনায় শিল্পে শিল্পকর্মই মূল ভূমিকাটি অধিকার করে। মনের বাহিরে প্রকাশ না নিলে তার শিল্পরসিকের মনকে স্পর্শ করবার প্রশ্ন ওঠে না।

(৩)

শিল্পী বনাম শিল্পরসিক

উপরের আলোচনা হতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে শিল্পবস্তুর ভূমিকা গৌণ নয়। তা শিল্পীর মনের ভাবের বাহিরের অভিব্যক্তি এবং শিল্পরসিকের সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ আছে। একদিকে শিল্পরসিক, অন্যদিকে শিল্পী ; মাঝখানে শিল্পবস্তু। তা যেন উভয়ের মধ্যে মিলন সেতু। মানুষ যখন শিল্পী হয়

১. সাহিত্যের পথে, তথ্য ও সত্য

২. Infective quality of art

৩. Communication Theory

তখন তার মূল প্রেরণা হয় আত্মপ্রকাশের আকৃতি। কিন্তু তিনি যা সৃষ্টি করেন তা নিজের একার জন্য নয়। কারণ প্রকাশ মানেই হল নিজের মনের ভাবকে অপরের নিকট প্রকট করা। কাজেই এখানে শিল্পকর্মকে সার্থক করতে হলে দুটি পক্ষের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার একদিকে আছেন স্বয়ং শিল্পী আর অপর দিকে আছেন শিল্পরসিক। শুধু প্রকাশ হলেই শিল্পবস্তু সম্পূর্ণতা পায় না। শিল্পবস্তুকে দেখে তার অন্তর্নিহিত রসকে উপলব্ধি করে আনন্দ পাবার লোক না থাকলে শিল্প সম্পূর্ণতা পায় না, তা সার্থক হয় না। প্রকাশের আনন্দ যদি ধ্বনি হয়, রসোপলব্ধির আনন্দ তার প্রতিধ্বনি। এই ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনির সংযোগ না হলে শিল্পকর্ম সার্থক হয় না। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের মোটামুটি শিল্পতত্ত্ববিদ্‌দের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থন আছে। কাজেই এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

পরোক্ষ সমর্থন প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রত্যক্ষ সমর্থন হিসাবে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন :

"রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবল মাত্র নিজের জোরে সে নিজেকে সপ্রমাণ করতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন, কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়েছিলেন তেমনি রসভারতী স্বয়ংবর সভায় সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।"[১]

সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় শিল্পরসিকের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা তা নয়, তা হল শিল্পবস্তু সম্পর্কে শিল্পীর ও শিল্পরসিকের বিশেষ কর্তব্য আছে কিনা তাই। অর্থাৎ শিল্পবস্তুকে সার্থক করে তুলতে শিল্পীরই বা কি ভূমিকা, শিল্পরসিকেরই বা কি ভূমিকা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে শিল্পীর ভূমিকা সক্রিয় ও মুখ্য এবং শিল্পরসিকের ভূমিকা অক্রিয় এবং গৌণ। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনা হতে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উভয়ের ভূমিকাই সক্রিয়। কাজেই শিল্পকর্মকে সার্থক করতে একদিকে যেমন শিল্পীর রসিকের গ্রহণযোগ্য করে তাকে স্থাপন করবার প্রয়োজন আছে, তেমন শিল্পী-রসিকের দিক থেকেও একটি সহৃদয় মনোভাব নিয়ে শিল্পবস্তুর রসগ্রহণের চেষ্টা করতে হয়। এক কথায় শিল্পীর ও শিল্পরসিকের একটি পরস্পর সহায়ক ভূমিকা

১. সাহিত্যের পথে, বাস্তব

আছে।[১] আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে এখন কিছু তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা টলস্টয়-এর মন্তব্য স্থাপন করতে পারি। তিনি শিল্পবস্তুর অন্যতম উপাদান হিসাবে তার শিল্পীর মনের ভাবের রসিকের মনে সংক্রমণের ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে শিল্পবস্তুর উৎকর্ষ নির্ভর করে তা কতখানি ভালভাবে শিল্পীর মনের ভাবকে রসিকের মনে সঞ্চারিত করতে পারে। এই বিষয়টির ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন বলে তাঁর স্থাপিত শিল্পতত্ত্বকে সঞ্চারবাদ[২] বলা হয়। এখানে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন শিল্পের উদ্দেশ্য নয় কেবল মনের ভাবকে প্রকাশ দেওয়া, কিম্বা সুখদায়ক বস্তুর সৃষ্টি করা। শিল্পকর্মের কাজ হল একই অনুভূতির সূত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপন করা।[৩]

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই এই মত প্রকাশ করেছেন যে শিল্প সার্থক হয় শিল্পী ও শিল্পরসিকের সহযোগিতায়। তিনি বলেন প্রকাশ শূন্যে হয় না। শিল্পীর সৃষ্টিকে দেখে তার অন্তর্নিহিত রসকে উপলব্ধি করবার মানুষ না থাকলে প্রকাশ সম্পূর্ণতা পায় না। কারণ শিল্পকর্মের সেইখানেই সার্থকতা। তাই তিনি বলেন যে শিল্পকর্মের স্বয়ংপ্রকাশ হবার ক্ষমতা থাকে না, তার জন্য রসিকের প্রয়োজন হয়। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে তার সারাংশটির অনুসরণে বলা যেতে পারে 'রসভারতী স্বয়ংবর সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।'[৪]

সুতরাং শিল্পবস্তুকে রসিকের নিকট সহজবোধ্য করবার জন্য শিল্পীর যেমন একদিকে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন, তেমন শিল্পরসিকেরও শিল্পী যা দিচ্ছেন তাকে নিরপেক্ষ উদার মন নিয়ে গ্রহণ করবারও প্রয়োজন আছে। এ বিষয় উভয়েরই কিছু কর্তব্য রয়ে যায়। শিল্পী চাইবেন শিল্পকে রসিকের মনে পৌঁছে দিতে আর রসিক চাইবেন তাকে সাদরে গ্রহণ করতে। তবেই শিল্পবস্তুর পরিপূর্ণ রসগ্রহণ সম্ভব।

১. Symbiotic relation

২. Communication Theory

৩. "it (Art) is means of union among men joining them together in the same feeling, and indispensable for the life and progress towards well-being of individuals and humanity." What is Art ?, P 123

৪. সাহিত্যের পথে, বাস্তব

আমরা প্রথমে শিল্পীর দিক হতে কি করণীয় তার কিছু পরিচয় দিতে পারি এই প্রসঙ্গে অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিল্পীর কর্তব্যের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ এটি এমন শিল্প যেখানে শিল্পী ও শিল্পরসিকের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে। অভিনয়কে সহজগ্রাহ্য করবার জন্য তার আনুষঙ্গিকের ব্যবস্থা আছে। পৃথক্ রঙ্গ মঞ্চ রেখে তাকে সজ্জিত করা, ঘটনার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে রঙ্গমঞ্চ সাজানো, আলোক ক্ষেপণের বিশেষ ব্যবস্থা করা, কত কি। কিন্তু তার মধ্যে মুখ্য ভূমিকা রয়ে যায় শিল্পীর। আদর্শ শিল্পীর কর্তব্য হল তিনি যে চরিত্র অভিনয় করবেন তার মধ্যে নিজেকে তন্ময়[১] করে দেওয়া। তবেই তা রসিকের মনকে স্পর্শ করতে পারে।

অনুরূপভাবে রসসাহিত্যেও শিল্পীর একটি বিশেষ কর্তব্য এসে পড়ে। তা হল এমন রচনারীতি প্রয়োগ করা যা পাঠকের কাছে মনের ভাবকে স্বচ্ছ, সবল ও স্পষ্টরূপে স্থাপন করতে পারে। এ বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বে চিন্তায় আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যরীতির কি গুণ থাকা উচিত সে বিষয় বিভিন্ন অলংকারিকের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বৈদভীরীতির দশটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাকেই আদর্শ রীতি বলে গ্রহণ করা হয়, কারণ কালিদাসের রচনা তার অনুবর্তী। তাদের মধ্যে ছয়টি গুণের কাজ হল রচনাকে সহজবোধ্য এবং চিত্তাকর্ষক করা। তারা হল শ্লেষ, প্রসাদ, মাধুর্য, সুকুমারত্ব, অর্থব্যক্তি ও কান্তি।

সমরসেট মম একজন বিখ্যাত রসসাহিত্যিক। ছোট গল্পের লেখক হিসাবে ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অবিসম্বাদিতভাবে শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। তিনি বলেন উৎকৃষ্ট সাহিত্যরীতির তিনটি গুণ থাকা উচিত: ভাষায় প্রাঞ্জলতা, সরলতা ও শব্দমাধুর্য।[২] তিনি বলেন দুরূহ বিষয়কেও সহজ করে বোঝানো যায়। সুতরাং অস্পষ্টতা সর্বথা পরিহার করতে হবে।

বিখ্যাত সমালোচনা তাত্ত্বিক হ্যারল্ড অসবর্ণ ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তিনিও উৎকৃষ্ট রচনার তিনটি মৌলিক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা হল সুস্পষ্ট নির্দেশনা[৩], বর্ণনার সংক্ষেপ[৪] এবং শব্দ যোজনায় শ্রুতিমাধুর্য।[৫] তিনি

১. Empathy

২. "On taking thought, it seems to me that I must aim at lucidity, simplicity and euphony." On Summing up, Chap. X

৩. Precision ৪. Conciseness

৫. Euphony

চান যা বলা হবে তার অর্থ সুস্পষ্ট হবে, তা অল্পকথায় বলতে হবে এবং শব্দচয়ন এমন ভাবে হবে যাতে অর্থ পরিষ্কার থাকবে অথচ রচনা শ্রুতিমধুর হবে।[১]

তুলনা করলে দেখা যাবে মম যাকে প্রাঞ্জলতা বলেছেন তার সঙ্গে দণ্ডী বর্ণিত প্রসাদ ও অর্থব্যক্তি গুণের তুলনা চলে। মম এবং অসবর্ণ যাকে শব্দ মাধুর্য বলেছেন তার সঙ্গে দণ্ডীর মাধুর্য ও সুকুমারত্ব গুণ মিলে যায়। আর অসবর্ণ যাকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বলেছেন তার সঙ্গে দণ্ডী বর্ণিত অর্থব্যক্তি ও কান্তিগুণের তুলনা চলে। অর্থব্যক্তির অর্থ সুস্পষ্টতা আর কান্তি বলতে দণ্ডী অত্যুক্তির বিপরীত বুঝিয়েছেন। অত্যুক্তি বর্জন করলে নির্দেশনা সুস্পষ্ট হয় বৈকি। অসবর্ণ যাকে বর্ণনায় সংক্ষেপকরণ বলেছেন তার সঙ্গে দণ্ডীর শ্লেষের তুলনা চলে। যে বর্ণনা ঘনসন্নিবিষ্ট হয় তা সংক্ষিপ্ত না হয়ে যায় না। বলা বাহুল্য এখানে এই গুণগুলিদ্বারা রচনাকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হল শিল্পীর বক্তব্যকে শিল্পরসিকের নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষনীয় করা।

অনুরূপভাবে শিল্পরসিকেরও ভূমিকা অক্রিয় নয়। তাঁকেও এমনভাবে মনকে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে তা শিল্পবস্তুর রসকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। শিল্পী ও শিল্পরসিকের পরস্পর সহযোগিতাই যেন এখানে বিশেষভাবে কামনার বস্তু। এ বিষয় আদর্শ শিল্পরসিক কেমন হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে শিল্পরসিকের কর্তব্য হল রসকে অর্থাৎ শিল্পবস্তুকে সঠিকভাবে গ্রহণ করা। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রকারদের মতে উদার এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে শিল্পরসিক হওয়া যায় না। তাই তাঁরা বলতেন রসকে গ্রহণ করবার অধিকারী হতে হলে শিল্পরসিকের সহৃদয় হতে হবে। আনন্দবর্ধন বলেছেন রসজ্ঞতাই সহৃদয়ত্ব।[২] তাঁর ভাষ্যকার অভিনব গুপ্ত সহৃদয় কথাটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কাব্যের অনুশীলনের অভ্যাসহেতু যাঁদের বিশদ মনোমুকুরে বর্ণনীয় বিষয়ে তন্ময়ীভূত হবার যোগ্যতা আছে, এমন ভাবে যাঁরা নিজেদের হৃদয়ের সংবাদ রাখেন, তাঁরাই সহৃদয়।[৩] বলা বাহুল্য বিশেষ করে রসসাহিত্য সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযুক্ত হলেও তা সাধারণ ভাবে সকল শিল্প কর্মের ওপরেই প্রয়োগ করা যায়।

১. Aesthetics and Criticism, Chap.X, Anatomy of Literature

২. রসজ্ঞতা এবং সহৃদয়ত্বম্ ॥ ধ্বন্যালোক ॥ ৩ ॥ ১৬

৩ "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূত মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে স্বহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ ॥ ধ্বন্যালোক লোচন ॥ ১ ॥ ১

আমরা জানি যে অতিরিক্তভাবে শিল্পরসিকের দিক হতে খানিকটা জানিত-ভাবে আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন আছে ; তা না হলে শিল্পের মায়াজাল রচিত হয় না। দুই ধরণের ঘটনা হতে পারে। এক ধরণের হল যা হয় না বলা যায় না ; তাকে সম্ভব[১] বলতে পারি। আর এক ধরণের ঘটনা আছে যা হতে পারে ; তাকে সম্ভাব্য[২] বলতে পারি। শিল্পরসিক যা সম্ভাব্য তাকে ত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবেন, যা ক্বচিৎ সম্ভব তাকেও গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। শিল্প-রসিকের এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনার[৩] সুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে অভিনয়ের ক্ষেত্রে। আমরা জানি রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় দেখানো হচ্ছে তা আদৌ প্রকৃত নয়। কিন্তু গোড়া হতেই যদি দর্শক হিসাবে তার অবাস্তবতা আমাদের মনে বেশী সজাগ থাকে, তা হলে আমরা তার রসগ্রহণ করতে সমর্থ হব না। সেই অবাস্তব ঘটনাকেই খানিকটা আত্মপ্রবঞ্চনা করে স্বেচ্ছায় বাস্তব বলে গ্রহণ করলে তবেই অভিনয় হতে রসগ্রহণ করতে অধিকারী হব।

একথা উপন্যাস সম্বন্ধেও খানিকটা খাটে। উপন্যাসের যা কাহিনী তাকে পাঠকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য খানিকটা বাস্তবধর্মী হতে হয়। পাঠক লেখককে খানিকটা স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু অত্যন্ত অসম্ভব ঘটনার অবতারণা করলে পাঠকের মন আঘাত খাবে এবং রসভঙ্গ হবে। আমরা অনেক সময় দেখি উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার বারবার নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে যাচ্ছে। তা পাঠক সহ্য করে। কিন্তু সম্ভবের গণ্ডি ছাড়িয়ে তার অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি ঘটালে পাঠকের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ফলে রসভঙ্গ হয়

(৪)

সুখ বনাম আনন্দ

শিল্পবস্তুকে দেখে শিল্পরসিক কি অনুভব করেন, তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাই হল আমাদের বর্তমান অনুচ্ছেদের আলোচনার বিষয়। এ বিষয় মতের পার্থক্য আছে। কেউ বলেন তার ফলে রসিকের মনে সুখের উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ সুখকর অনুভূতি হতে যে ধরণের সুখ অনুভব করি এই প্রতিক্রিয়া সেই ধরণের। ইয়োরোপীয় শিল্পতাত্ত্বিক চিন্তায় এই ধারণা দীর্ঘকাল বদ্ধমূল

১. Possible ২. Probable
৩. Conscious self-deception

ছিল। অনেক কাল পরে অতি সম্প্রতি নূতন ধারণা ফুটে উঠেছে যে সাধারণ সুখের অনুভূতি হতে তা এক পৃথক শ্রেণীর অনুভূতি, তা ঠিক সুখানুভূতি নয়। সুতরাং এই সমস্যার মীমাংসা প্রসঙ্গে শিল্প বস্তু হতে সঞ্জাত অনুভূতি সম্বন্ধে শিল্পরসিকের ধারণা কেমনভাবে পরিবর্তিত হল, তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তনের মধ্যেই এই বিতর্কের মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমরা যে শিল্পবস্তু উপভোগ করে সুখ পাই এই ধারণার উল্লেখ প্রথমে পাই এরিস্টটল-এর আলোচনায়। শিল্পবস্তু সম্বন্ধে মোটামুটি তাঁর ধারণা ছিল এই যে শিল্পী সৃষ্টি করেন নকল জিনিস আর কারিগর নির্মাণ করেন ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য। যেমন আলেখ্য হল শিল্পকর্ম, কারণ তা প্রকৃতির অনুকরণ; আর স্থাপত্য শিল্প নয়, কারণ তা বাস করবার বা অন্যভাবে ব্যবহারের জন্য গৃহ নির্মাণ করে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে মানুষ অনুকরণ করে কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে মানুষ অনুকৃতি দেখতে সুখ পায়। অনুকৃতি মূল বস্তুর বা বিষয়ের যত সুন্দরভাবে নকল করবে, সুখবোধও তত বাড়বে। তাঁর মতে মানুষের স্বভাবই হল অনুকরণ করা এবং অনুকরণ দেখলে সে সুখ পায়।[১]

শিল্পবস্তু উপভোগ করে যে শিল্পরসিক সুখ অনুভব করেন, এই ধারণা পাশ্চাত্য শিল্প চিন্তায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। এমন কি কাণ্ট-এর ধারণা ছিল যে যদিও শিল্পবস্তু কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত নয়, তবু তার যে প্রতিক্রিয়া শিল্পরসিকের মনে ঘটে তাকে সুখ[২] বলেই বর্ণনা করা যায়। তিনি শিল্পবস্তুর প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করতে চারটি নীতি প্রয়োগ করেছেন। তারা হল:

(১) তাই হল সুন্দর যা স্বার্থের সহিত জড়িত না হয়ে সুখ দেয়।

(২) তাই হল সুন্দর যা সার্বিক প্রয়োগ ব্যতীত সুখ দেয়।

(৩) তাই হল সুন্দর যা কোন উদ্দেশ্যের সহিত সংযুক্ত না হয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপ পায়।

১. "and no less universal is the pleasure felt in things imitated. We have evidence of this in the facts of experience. Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate when reproduced with minute fidelity." Butcher, The Poetics of Aristotle

২. Pleasure

(৪) তাই হল সুন্দর যা সকল মানুষের সুখের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।[১]

মোটামুটি তিনি বলতে চেয়েছেন শিল্পবস্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত। প্রথম, তা কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে না। দ্বিতীয়ত, মননশক্তি প্রয়োগ না করেই শিল্পবস্তুর রসগ্রহণ করা যায়, এখানে সার্বিক সংজ্ঞার সহিত সংযুক্ত করে তাকে জানতে হয় না। তৃতীয়ত, তা যে সুখ দেয় তা অহৈতুক। আর চতুর্থত, তার আবেদন সর্বজনীন। সকল মানুষকেই তা সুখ দেবার ক্ষমতা রাখে। এখানে যেটি লক্ষ্য করবার তা হল সকল ক্ষেত্রেই তিনি শিল্পবস্তুকে সুখদায়ক বস্তু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কাজেই এ বিষয় তাঁর এরিস্টটলের মতের সহিত কোন পার্থক্য নেই।

পাশ্চাত্য শিল্পতাত্ত্বিকদের মধ্যে টলস্টয়ই প্রথম উপলব্ধি করেন যে শিল্পবস্তুর রসগ্রহণ করে আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয় তাকে সুখের অনুভূতি বলা যায় না। তার প্রকৃতি তা হতে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, শিল্পকর্মের কাজ 'সুখকর বস্তু উৎপাদন করাও নয় এবং দুঃখকর অনুভূতি উৎপাদন করাও নয়'।[২] তিনি তারপর বেশী জোর দিয়েছেন তার এই বৈশিষ্ট্যের ওপর যে শিল্পবস্তু একটি বিশেষ প্রকারের অনুভূতি দ্বারা শিল্পী ও শিল্পীরসিককে পরস্পর সংযুক্ত করে। তিনি বলেন শিল্প হল বিভিন্ন মানুষকে একই অনুভূতিদ্বারা সংযুক্ত করে, তাদের মধ্যে মিলন সাধনের একটি উপায়।[৩]

শিল্পবস্তুর রসিকের মনের ওপর প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি কি, এ বিষয় এটি একটি মধ্যবর্তীকালীন অবস্থা সূচিত করে। ক্রোচে-এর চিন্তায় ও একটি অনুরূপ অবস্থা পাই। টলস্টয় শিল্পকর্ম হতে সঞ্চারিত অনুভূতিকে সুখ[৪] হতে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখেছেন, যদিও তার স্বরূপ তিনি বর্ণনা করেন নি।

১. That is beautiful which pleases without interest.
That is beautiful which pleases without concept,
That is beautiful which has the form of finality without the representation of an end.
That is beautiful which is the object of universal pleasure.
Critique of Judgment

২. Leo Tolstoy, what is Art ?

৩. "A work of art is then finished when it has been brought to such clearness that it communicates itself to others and evokes in them the same feeling that the artist experienced while creating it," On Art III

৪. Pleasure

অপরপক্ষে ক্রোচে প্রাচীন পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্ববিদদের মত এই অনুভূতিকে সুখ বলেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রসঙ্গত তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তাকে ঐশ্বরিক উল্লাসের [১] সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ধারণায় শিল্পকর্ম মূলত শিল্পীর মনের ব্যাপার। তিনি যখন শিল্পকর্ম সম্বন্ধে প্রথম চেতনা লাভ করেন তখন তিনি ক্ষণিকের জন্য শিল্পতাত্ত্বিক সুখ [২] অনুভব করেন, তারপর তা যখন শিল্প চেতনায় [৩] পরিণত হয় তখন তাঁর মুখমণ্ডল ঐশ্বরিক উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়।[৪]

মনে হয় ক্রোচে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতির প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু ধারণার অস্পষ্টতা হেতু উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করতে পারেন নি। এই বিষয় ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্লাইভ বেল-এর চিন্তায়। তিনি উপলব্ধি করেন এই অনুভূতির প্রকৃতি সাধারণ সুখবোধ হতে স্বতন্ত্র এবং তার স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করবার জন্য তিনি তার নাম দেন শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি।[৫] তিনি এর বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে শিল্পতত্ত্বের আলোচনা সুরু হওয়া উচিত শিল্পকর্ম যে অনন্যসাধারণ অনুভূতি সঞ্চার করে তাই দিয়ে এবং এই অনুভূতিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবার জন্য তার নাম হওয়া উচিত শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি।[৬] অসবর্ণ তাঁর এই প্রতিপাদ্যকে একরকম স্বীকার করে নিয়েছেন মনে হয়। সাধারণ অনুভূতি হতে তাকে পৃথক করবার জন্য তিনি বলেন যে এটি এমন একটি সর্বাত্মক উপলব্ধি যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না এবং অনুভূতির ধরণের।[৭]

ভারতীয় শিল্পতাত্ত্বিক চিন্তায় অতি প্রাচীনকাল হতেই শিল্পবস্তু সঞ্চারিত অনুভূতিকে সুখানুভূতি হতে পৃথক করে আনন্দানুভূতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. Divine Joy   ২. Aesthetic pleasure   ৩. Impression

৪. "When his impression takes form and his countenance is irradiated with the divine joy of the creator."

Aesthetic, Aesthetic Feeling

৫. Aesthetic emotion

৬. "The starting point for all systems of Aesthetics must be the personal experience of a peculiar emotion......This emotion is called the aesthetic emotion." Clive Bell, Art.

৭. "It is an act of universalised awareness so intense and so overcharged that it merges into an emotion."

Aesthetic and Criticism, Chap. IX, Beauty in Cofiguration.

এই ধারণা উপনিষদের যুগ হতেই প্রচলিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে বিশ্বস্রষ্টা শুধু রসস্বরূপ নন, তিনি সৃষ্টি করে রস উপলব্ধি করেন এবং এতে তাঁর আনন্দ হয়[১]। উপনিষদের ধারণায় বিশ্ব একটি শিল্পকর্ম, তাই তা সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না জন্ম-মৃত্যু সব জড়িয়ে নিয়ে একটি আনন্দরূপ[২] ধারণ করে আছে। বিশ্বের সামগ্রিক ঐক্য উপলব্ধি করে আমরা আনন্দ উপলব্ধি করি। তা সুখ দুঃখ হতে পৃথক, সুখ দুঃখ তার উপাদান। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই অর্থেই আনন্দকে গ্রহণ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন সুখ ও আনন্দ সমার্থবোধক শব্দ নয়। আমরা ট্র্যাজিডিতে দুঃখের অভিনয় দেখে সুখ পাই না, কিন্তু আনন্দ পাই। যে শিল্পবস্তু আমাদের আনন্দ দেয় তা সুন্দর হতে পারে অসুন্দর হতে পারে, সুখের হতে পারে দুঃখের হতে পারে। তিনি তাই বলেছেন :

"এটা মনে রাখা চাই যে সুখের বিপরীত দুঃখ ; কিন্তু আনন্দের বিপবীত নয়, বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভুক্ত। কথাটা শুনতে স্বতঃবিরুদ্ধ, কিন্তু সত্য।"[৩]

প্রসিদ্ধ আলংকাবিক বিশ্বনাথ কবিরাজ রূপকর্ম হতে সঞ্জাত যে আনন্দ তার একটি সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন রূপকর্ম দর্শনের ফলে যে রস আস্বাদিত হয় তা নিজের মনের অভিন্ন অংশেব মত হয়ে যায়, তা অখণ্ড-ভাবে আত্মপ্রকাশের আনন্দে ভাস্বর, তা অন্য অনুভূতির স্পর্শ বিরহিত এবং ব্রহ্মের আস্বাদের সমস্থানীয়।[৪] অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে শিল্পকর্মের অখণ্ড রূপটি মনকে আনন্দে এমন তন্ময় করে যে অন্য কোন বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান তখন থাকে না ; ব্রহ্মোপলব্ধি যেমন মানুষকে অভিভূত করে তন্ময় করে তোলে এও তেমন ভাবে তন্ময় করে। তাই এ অনুভূতি ব্রহ্মস্বাদের সগোত্র। মনে হয় তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন অসবর্ণ তাঁর মন্তব্যে সেই কথাটি আরও সংক্ষেপে বলেছেন।

১, রসো বৈ সঃ ॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ২॥৭

২, তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ মুণ্ডক ॥২॥৭

৩, সাহিত্যের পথে, সাহিত্য তত্ত্ব

৪, সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশনন্দ চিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ।
লোকোত্তর চমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে ॥ সাহিত্য দর্পণ ॥৩॥৩৪

এইভাবে শিল্পকর্ম সঞ্জাত অনুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিতর্ক তার আপনা হতেই সমাধান হয়ে যায়। ইয়োরোপীর শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসে এই সম্বন্ধে ধারণা, কেমন ধীরে ধীরে শিল্পবস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং আলোচনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে, তা উপরে দেখানো হয়েছে। তাতে যে মতটি পরিণতিতে স্বীকৃতি লাভ করেছে তাই এর মীমাংসা। তা বলে শিল্পবস্তু রসিকের মনে যে অনুভূতি সঞ্চারিত করে তা সুখ হতে ভিন্ন। এই অনুভূতির বিশিষ্টতা চিহ্নিত করবার জন্য ভারতীয় শিল্পতত্ত্ব তাকে আনন্দ বলেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার উপযুক্ত প্রতিশব্দ ইংরাজিতে পাওয়া যায় না। তাই কেউ তার বিশিষ্টতা নির্দেশ করে ক্ষান্ত হয়েছেন, কেউ তাকে ঐশ্বরিক উল্লাস [১] বলেছেন।

(৫)

শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতির কারণ

শিল্পকর্ম দেখে শিল্পরসিকের মনে যে অনুভূতি জাগে, তার প্রকৃতি কি ধরণের, তা নিয়ে পূর্বের অনুচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে। তাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে তা একটি বিশেষ শ্রেণীর অনুভূতি এবং তা সুখানুভূতি হতে পৃথক। ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের অনুসরণে আমরা তার নাম দিয়েছি আনন্দ। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় তাকে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি না বলে আনন্দের অনুভূতি বলব। এখন বর্তমান আলোচনায় আমাদের শেষ মৌলিক প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে: শিল্পকর্ম যে আমাদের আনন্দ দেয় তার কারণ কি? এ বিষয় শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় তিনটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া হয়েছে। সব থেকে প্রাচীন মতটি বলে যে শিল্পকর্ম হতে আমরা আনন্দ পাই তা অনুকরণধর্মী বলে। এরিসটটল এই তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে তার সমর্থন আছে। তারপর আর একটি মত বলে, শিল্পবস্তু আনন্দ দেয় তা সুন্দর বলে। রবীন্দ্রনাথ এক অবস্থায় এই মত পোষণ করতেন। তৃতীয় মত বলে শিল্পবস্তুর সংস্পর্শে এসে আমরা আনন্দ পাই তার কারণ তার মধ্যে একটি সুমিতি আছে। অসবর্ণ এই মত পোষণ করেন। এই সুমিতির প্রকৃতি কি তা নিয়েও বিতর্ক আছে। তা কি কেবল রূপগত অর্থাৎ রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ, না ভাব ও রূপকে নিয়ে ব্যাপক সুমিতি, এই প্রশ্ন ওঠে। প্রথমটিকে

১. Divine joy

অনুকৃতিবাদ [১] বলা হয়। যে তত্ত্ব কেবল রূপের মধ্যে সুমিতিকে আবদ্ধ রাখবার প্রস্তাব করে, তাকে রূপগত সুমিতিবাদ[২] বলা হয়। আমরা এখন এদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তারপর তাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এরিসটটল-এর ধারণা যে শিল্পবস্তু অনুকরণধর্মী। তিনি বলেন সকল শিল্পই অনুকরণ ভিত্তিক। কাব্য, নাটক, কবিতা, সঙ্গীত সবই অনুকরণ, তবে তাদের অনুকরণের রীতি বিভিন্ন। তাদের প্রকাশের বাহন, তাদের বিষয় এবং তাদের অনুকরণের ভঙ্গি শিল্পের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন প্রকারের হয়[৩]। তিনি আরও বলেন যে অনুকরণ যত নিখুঁত হবে শিল্পরসিক ততই বেশী অভিভূত হবে। এ বিষয় তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

এই তত্ত্বটির আংশিক সমর্থন আমাদের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্র অভিনয়কে 'লোকবৃত্তানুকরণম্' বলা হয়েছে। বিষ্ণু ধর্মোত্তরম্ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে যেমন নৃত্যে তেমন চিত্রে ত্রিলোকের অনুকরণ করা হয়ে থাকে[৪]। তবে এটা স্পষ্ট যে ভরত শিল্পকে বিশুদ্ধভাবে অনুকরণধর্মী বলতে প্রস্তুত নন। ইতিপূর্বে তাঁর রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা হতেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি মনের অনুভূতিকে পরিস্ফুট করাকেই নাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলেছেন। সেটা করা হয় অভিনয়ের সাহায্যে, কিন্তু অভিনয় যে কাহিনী ফোটায় তা সম্পূর্ণভাবে অনুকরণধর্মী নয়।

এরিস্টটল যে বলেছেন যে শিল্প অনুকরণধর্মী তা খানিকটা সত্য; কিন্তু তাই বলে শিল্প বিশুদ্ধ অনুকৃতি নয়। শিল্পীর উদ্দেশ্য হল মনের অনুভূতি শিল্পকর্মের মধ্যে পরিস্ফুট করা। শিল্পীর এই অনুভূতিগুলিকে বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ দিতে হয়। নাট্যে প্রকাশ করা হয় অভিনয় দ্বারা, নৃত্যে দেহভঙ্গিদ্বারা। কাব্যে বা উপন্যাসে যা সোজাসুজি নাট্যে দেখানো হয় তার ভাষায় বর্ণনা দেওয়া হয়। চিত্রেও একই রীতি অবলম্বন করা হয়। দেহভঙ্গি

১. Mimesis Theory ২. Configuration Theory

৩. "Epic Poetry and Tragedy, Comedy also and Dithyrambic Poetry and the music of the flute and the lyric in most of their forms are all in their general conception modes of imitation. They differ however from one another in three respects—the medium, the objects and the manner or mode of imitation, being in each case distinct.

Butcher, The Poetics of Aristotle

৪. যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা। বিষ্ণুধর্মোত্তরম্। ৩য় খণ্ড। চিত্র সূত্র

বা মুখের ভাবকে ফুটিয়ে তুলে চিত্রে অন্তরের ভাবকে প্রকাশ দেবার চেষ্টা হয়। কাজেই সকল ক্ষেত্রেই প্রাত্যহিক জীবনে যেমন ভাবে মনের ভাব প্রবাশ করি তার অনুসরণ করতে হয়। সেই কারণেই শিল্পকে আপাত দৃষ্টিতে অনুকরণধর্মী মনে হয়।

কিন্তু তাই বলে শিল্প ঠিক অনুকরণধর্মী নয়। কারণ তার উদ্দেশ্য হল বহির্জগতের বাস্তব পরিচয় দেওয়া নয়, তার উদ্দেশ্য একটি বিশেষ অনুভূতিকে রূপকর্মের মধ্যে প্রকাশ দেওয়া। তা তথ্য সংগ্রহ করে না, তা শিল্প সৃষ্টি করে। যা সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ তার ভাল উদাহরণ হল আলোকচিত্র। তা যান্ত্রিক উপায়ে বহিজগতের কোন বস্তুকে আমাদের চোখে যেমনটি দেখে ঠিক তেমনটি দেখায়। বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করে আমরা যখন বহির্জগতের পরিচয় গ্রহণ করি, আমরা তখন তাই করি। কিন্তু শিল্প বাস্তবকে পরিবর্তিত করে গ্রহণ করে। তা জীবনে যেমনটি তেমনটি দেখায় না, তা যেমন হতে পারে তেমন দেখায়। নাট্য হক, চিত্র হক, কাব্য হক, উপন্যাস হক, সর্বত্রই আমরা একটি কল্পনার রাজত্ব সৃষ্টি করি। তবে সে জগৎ বাস্তব জগতের অনুরূপ। তার মত, কিন্তু ঠিক তার অনুকরণ নয়। সেখানে সত্যের সঙ্গে কল্পনা এসে যোগ দেয়. ফলে সত্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। সাহিত্যে যে অর্থলঙ্কারের এত বেশী প্রয়োগ করা হয় তা তার সুন্দর উদাহরণ। কবিতায় মেঘকে মানবধর্ম আরোপ করে দূত-রূপে নিয়োগ করা হয়, নদী হয় নটিনী, পাহাড় হয় ধ্যানী ঋষি। তাই দেখি রসসাহিত্যে রূপক ও সমাসোক্তির এত বেশী প্রয়োগ। যা সত্য তার সঙ্গে এখানে কল্পনার যোগ হয়। এমন কি চিত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। ঘোড়ার দৃপ্ত ভঙ্গি দেখাবার জন্য হয়ত শিল্পী তার গ্রীবাকে অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ করে দিলেন। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে শিল্প খানিকটা অনুকরণধর্মী, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অনুকরণ নয়; অনুকরণের সঙ্গে কল্পনা এখানে সংযুক্ত হয়, সত্য এখানে কল্পনা দ্বারা রঞ্জিত হয়ে পরিবর্তিত আকারে আসে। তাই যদি হয় তা হলে একথা বলা চলে না যে শিল্প অনুকরণধর্মী বলে আমাদের আনন্দ দেয়।

দ্বিতীয় তত্ত্ব হল শিল্পকর্ম আমাদের আনন্দ দেয় তা সুন্দর বলে। এই রকম ধারণা গড়ে ওঠবার একটা কারণ আছে। সাধারণ ক্ষেত্রে যা সুন্দর তা আমাদের আনন্দ দেয়। তাই মনে হয় শিল্পকর্ম সুন্দর হয় বলেই আনন্দ দেয়। এই ধারণার প্রতিধ্বনি কবির বচনেও পাই যখন তিনি বলেন, যা সুন্দর তা

স্থায়ী আনন্দের কারণ [১]। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বাউমগার্টেন শিল্প তত্ত্বের নাম দিয়েছিলেন 'ঈসথেটিক' অর্থাৎ সৌন্দর্যতত্ত্ব। তার তাৎপর্য হল শিল্প তত্ত্বের কাজ হল যা সুন্দর তার আলোচনা করা। তারই অনুসরণে শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস রচয়িতা বোসাংকে বললেন, 'ঈসথেটিকস হল সুন্দর বস্তুর দর্শন'। ক্রমশ মানুষের একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে যা সুন্দর তাই শিল্পতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়; কাজেই শিল্পবস্তু সুন্দর হয় বলেই আমরা আনন্দ পাই.। মনে হয় এই ভ্রান্তির সহযোগিতা করেছে আর একটি জিনিস। শিল্পবস্তু আমাদের আনন্দ দেয় বা ভাল লাগে বলে তাকে অনেক সময় সুন্দর বলে বসি। বিষয় অসুন্দর হলেও তাকে বলি সুন্দর হয়েছে। একটি বেদনা ক্লিষ্ট মুখের চিত্র দেখলেও বলি সুন্দর হয়েছে আবার একটি সুন্দরী রমণীর কমনীয় কান্তি দেখলেও বলি সুন্দর হয়েছে। এখানে বিষয়ের সৌন্দর্য আমরা ইঙ্গিত করি না, শিল্পের মনের ওপর প্রতিক্রিয়ার কথা বোঝাতে চাই।

এর কারণ সুন্দর কথাটিকে বড় শিথিল ভাবে আমরা ব্যবহার করি। যা সুন্দর তাকেও সুন্দর বলি, আবার যা সুন্দর নয় তাকেও সুন্দর বলি। উপরের উদাহরণটি ধরা যাক। দুঃখের চিত্রের বিষয়টি সুন্দর নয়, তবু সুন্দর বলি এই অর্থে যে তা খুব দক্ষতার সহিত চিত্রিত হয়েছে। আর সুন্দরী রমণীর চিত্রটিকে সুন্দর বলি প্রধানত বিষয়টি সুন্দর বলে। এই কারণেই শিল্পবস্তুর যা প্রকৃত গুণ অর্থাৎ প্রকাশের উৎকর্ষ তাকেও তার বিষয়বস্তু নির্বিশেষে সুন্দর বলে বসি। এই ভাবে চিন্তার একটি অস্বচ্ছতা আসার কারণেই আমাদের ধারণা হয় শিল্পবস্তু সুন্দর হয় বলে আমরা আনন্দ পাই। বলা উচিত শিল্পবস্তুর উৎকর্ষের জন্যই আমরা আনন্দ পাই।

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণার অধীন হয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা যখন অল্প ছিল তখন তিনি ভাবতেন শিল্পকর্ম সুন্দর হয় বলেই আমরা আনন্দ পাই, অর্থাৎ সৌন্দর্যই আনন্দের কারণ। শিল্পকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের ফলে তিনি দেখলেন তাঁর নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই প্রতিপাদ্য মেলেনা। সুন্দর জিনিস যেমন আমাদের আনন্দ দেয়, তেমন যা সুন্দর নয় তাও আমাদের আনন্দ দেয়। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে দুই শ্রেণীর শিল্পকর্ম হতে পারে। একটি সরল, অপরটি জটিল। এই ধরণের রূপকর্ম প্রকৃতির মধ্যেও পাওয়া যায়, মানুষের শিল্পেও পাওয়া যায়। একটি ফুল সরল রূপকর্মের

১. A thing of beauty is joy for ever

উদাহরণ, কালবৈশাখীর ঝড় জটিল রূপকর্মের উদাহরণ। গীতি কবিতা সরল রূপকর্মের উদাহরণ, একটি ভাস্কর্য মূর্তি সরল শিল্পকর্মের উদাহরণ। একটি নাটক বা উপন্যাস জটিল শিল্পকর্মের উদাহরণ। তাতে কত ঘটনা, কত চরিত্র, কত বিপরীতধর্মী মানুষের সংঘর্ষ। সরল রূপকর্মের বিষয় সাধারণত সুন্দর হয়ে থাকে, কিন্তু জটিল রূপকর্মের মধ্যে সুন্দর অসুন্দর মিশিয়ে থাকে। শেকসপীয়ার-এর রচিত টেমপেস্ট-এ যেমন ক্যালিব্যান আছে, তেমন এরিয়াল আছে। সুতরাং জটিল রূপকর্মে সুন্দর-অসুন্দর, ভাল-মন্দ উপাদান হয়ে মিশিয়ে থাকে। তাই তিনি ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর পূর্বের ধারণাকে পরিবর্তিত করে বললেন :

"একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলাম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সহিত সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না। দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল।"

সুতরাং শিল্পকর্ম সুন্দর হয় বলে যে আমরা আনন্দ পাই, একথা বলা চলে না। সুন্দর ও অসুন্দর উভয়েই তার উপাদান হতে পারে। অথচ সচরচার ব্যবহৃত ভাষায় আমরা সুন্দর কথাটির ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যে শিল্পবস্তুর বিষয় সুন্দর তাকেও সুন্দর বলি, আবার যার বিষয়বস্তু কুৎসিৎ তাও যদি ভাল ভাবে চিত্রিত হয়ে থাকে তাকেও সুন্দর বলি। এই আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান যে অসামঞ্জস্য তাকে উপেক্ষা করেও যে সুন্দর বলি তার কারণ এখানে সুন্দর কথাটির ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। কুৎসিতের বিপরীত যে সুন্দর এ সুন্দর সে সুন্দর নয়। সুন্দর-কুৎসিত-নির্বিশেষে আমাদের আনন্দ দেয় বলেই আমরা তাকে সুন্দর বলি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বের মতকে পরিবর্তিত করে বলেছেন, "বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"[১]

সুতরাং শিল্পবস্তু সুন্দর হয় বলে যে তা আমাদের ভাল লাগে, একথা বলতে পারি না। আমাদের অন্য পথে এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হবে। ইয়োরোপীয় শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে অতি প্রাচীনকাল হতে শিল্পবস্তুর একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি শিল্পতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। সেটিকে আমরা তার আভ্যন্তরীণ সুমিতি বলে আপাতত বর্ণনা করতে পারি। দেখা যাবে ঘটনাচক্রে এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই আমাদের

১. সাহিত্যের পথে

এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং অজানিতে শিল্পবস্তুর এই নূতন পরিচয়ের মধ্য দিয়েই তাঁরা ধীরে ধীরে সমাধানের পথে এগিয়ে এসেছেন। আমরা এখন এই চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের একটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি।

শিল্পবস্তুর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এরিসটটল-এর। কথাটা উঠেছিল ভিন্ন প্রসঙ্গে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন রূপকর্ম আয়তনে অতি ক্ষুদ্র হলে চলে না, কারণ একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্যকে ফুটিয়ে তুলতে হলে অতি ক্ষুদ্র জিনিস চলবে না; শিল্পকর্মের খানিক পরিমাণ আয়তন থাকা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন যে শিল্পকর্মের সার্থকতা নির্ভর করে বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি সুমিতি গড়ে তোলার ওপর। তাই তিনি বলেছেন জীবন্ত দেহরূপে হক বা নানা অংশ দিয়ে গঠিত একটি শিল্পকর্ম হক, তাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি সুসমঞ্জস ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন এবং তাকে সম্ভব করতে একটি নির্দিষ্ট আয়তন থাকাও প্রয়োজন।[১]

আমরা দেখি টলস্টয়ও একটি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি জোর দিয়েছেন শিল্পবস্তুর সামগ্রিকতার ওপর। একটি শিল্পবস্তুর বিভিন্ন অংশ থাকতে পারে, কিন্তু তারা পরস্পরের সহিত এমন সুসংবদ্ধভাবে মিলিত হতে পারে যে মনে হয়, যেখানে যা প্রয়োজন তা সেখানেই আছে, কোন অংশকে বাদ দেওয়া যায় না। তাঁর ধারণায় আদর্শ শিল্পকর্মে অংশগুলির মধ্যে এমন একটি সামঞ্জস্য ফুটে উঠবে যে কোন অংশকে সরিয়ে অন্য স্থানে বসাতে গেলে রসহানি ঘটবে। যেমন একটি সজীব দেহের এক অংশ হতে একটি অংশ উচ্ছেদ করে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায় না।[২] এই কারণে পরবর্তী কালে দার্শনিক ম্যাকটেগার্ট

১. "A beautiful object whether if be a living organism or any whole composed of parts, must not only have an orderly arrangement of parts, but must also be of a certain magnitude, for beauty depends on magnitude and order." Aristotle, Poetics

২. "In a true work of Art—poem, drama, picture, song or symphony —it is impossible to extract one line, one scene, one figure or one sound from its place and put it in another without infringing the significance of the whole work, just as it is impossible without infringing the life of an organic being to extract an organ from one place and insert it somewhere else." What is Art, Chap XIII

রূপকর্মের এই বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করতে তার নাম দিয়েছেন সাংগঠনিক ঐক্য।[১]

আমাদের দেশের আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন এই আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যকে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। একটি সুন্দরী রমণীর দেহকে ঘিরে যে লাবণ্য বিরাজ করে, তার অবস্থিতি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, যে তাকে বিভিন্ন অঙ্গ সৌষ্ঠবের মধ্যে আলাদাভাবে খুঁজলে পাওয়া যাবে না— তা বিভিন্ন অঙ্গসৌষ্ঠব হতে পৃথক। সকল অঙ্গসৌষ্ঠবকে পরিব্যাপ্ত করে যে একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্য বিরাজমান, তাই হল নারীর লাবণ্য।[২]

শিল্পতাত্ত্বিক অসবর্ণ এই সাংগঠনিক ঐক্যের একটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন শিল্পকর্ম রসিকের নিকট যা স্থাপন করে তার মধ্যে এমন একটি সাংগঠনিক ঐক্য আছে, যা তাঁর কাছে এক নজরে ধরা দেয়। বিষয়টির সামগ্রিক রূপের উপলব্ধিই প্রথম আসে। এই ঐক্যের প্রকৃতি কি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অতিরিক্তভাবে বলেছেন যে শিল্পবস্তু একটি অত্যন্ত জটিল জিনিস এবং তা হল রূপগত বিন্যাসের[৩] একটি অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ের সংগঠন। তা এমনভাবে সুবিন্যস্ত যে তা একটি সমগ্র বিশেষ বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়।[৪] তিনি অতিরিক্তভাবে আরও বলেছেন, এই সাংগঠনিক ঐক্যের উপলব্ধি হতেই যাকে বলা হয় শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি তার উদ্ভব হয়। তা অনুভূতির শ্রেণীর কিন্তু সাধারণ অনুভূতির মত নয়। সুতরাং তিনি আবিষ্কার করেছেন যে একটি সাংগঠনিক ঐক্যের উপলব্ধি হতেই পশ্চিমে যাকে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি বলা হয়, আমাদের দেশে যাকে আনন্দ বলা হয় তার উৎপত্তি ঘটে।[৫] মনে হয় আমাদের বর্তমান প্রশ্নের মীমাংসায় এইটিই

১. Organic unity. Mc. Taggart, Nature of Existence, Chap. XX

২. আনন্দবর্ধন, ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত

৩. Organisation of configurational patterns

৪. "And works of art are by definition presentational fields which are organic wholes. A work of art is a very complex and subtle organisation of configurational patterns into a single organic whole and its apprehension with immediacy as an individual."

Aesthetics and criticisim, Chap. IX, Beauty in Configuration.

৫. "The act of entering into awareness of a complex aesthetic whole often indeed appears to introspection as emotion. But it is an emotion different in character. I bid.

নির্ভরযোগ্য সমাধান। শিল্পকর্ম দেখে আমরা আনন্দ পাই তার সাংগঠনিক ঐক্যের জন্য। আমরা আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

সুতরাং অসবর্ণ-এর সিদ্ধান্ত হল এই যে এই আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য হেতু যে সাংগঠনিক ঐক্য শিল্পবস্তুকে ব্যাপ্ত করে বিরাজ করে তাই শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি বা আনন্দের কারণ। তিনি কিন্তু মনে হয় এই সুমিতি বা সামঞ্জস্যকে কেবল বাহ্যিক রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার প্রস্তাব করে তার একটি সংকুচিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ তিনি স্পষ্টই বলেছেন, এই সাংগঠনিক ঐক্য কেবল রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অনুভূতি বা ভাব বা ভাবের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই।[১]

তাঁর এই ধারণা কিন্তু যুক্তি দিয়ে সমর্থনযোগ্য নয়। অবশ্য কেন এই ধারণা হল তা খানিকটা বোঝা যায়। সাধারণত ভাব বা অনুভূতির সঙ্গে রসের বা বাহিরের রূপের একটা সংযোগ থাকলেও কয়েকটি শিল্পের মধ্যে ভাব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রূপসর্বস্ব হয়ে গড়ে ওঠবার একটি ঝোঁক দেখা যায়। তাদের তাই বিমূর্ত শিল্প বলা হয়। এটা স্বভাবতই সম্ভব হয় নৃত্যে, সঙ্গীতে ও চিত্রে। ভরতনাট্যে বর্ণিত নৃত্ত বিমূর্ত নৃত্যের উদাহরণ। যন্ত্রসঙ্গীত বিমূর্ত সঙ্গীতের সুন্দর উদাহরণ। এমন কি কণ্ঠ সঙ্গীতেও তার উদাহরণ পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আলাপ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চিত্রে বিমূর্ত রূপ 'সুর-রিয়ালিজম্'-এ পাওয়া যায়। কিন্তু রসসাহিত্যে বা অভিনয়ে ভাবের সঙ্গে রূপের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে এখানে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কাজেই সেখানে ভাবকে জড়িয়ে নিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে শিল্প সার্থক হয় না। অসবর্ণ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সত্যতা স্বীকার করতে হলে এদের শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। কাজেই তাঁর ব্যাখ্যা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁর তত্ত্বকে আমরা রূপগত সুমিতিবাদ[২] বলতে পারি। যেখানে শিল্পের বিমূর্ত প্রকাশ সম্ভব সেখানেই তা প্রযোজ্য; কিন্তু যেখানে ভাব হতে রূপকে বিযুক্ত করা সম্ভব নয়, যেমন রসসাহিত্য, সেখানে তা প্রযোজ্য নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত অসবর্ণের স্থাপিত সংজ্ঞা অনুসারে শিল্পপদবাচ্য নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাব ও সুরের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে ব্রতী হয়েছেন।

১, "absolute value of abstract properties independent of senfiment, feeling or representstion", Aesthetic and Criticism, Chap XI

২, Configuration Theory.

মনে হয় অসবর্ণ তাঁর দেওয়া সংজ্ঞার অসম্পূর্ণতার বিষয় নিজের অজ্ঞাতে অবহিত ছিলেন, কিন্তু নজর করেন নি। আমরা দেখতে পাই রসসাহিত্যের আলোচনায় তিনি স্বীকার করেছেন যে কেবল রূপগত সুমিতিকে ভিত্তি করে রসসাহিত্য গড়ে ওঠে না। সেখানে রূপের সঙ্গে ভাবের সুমিতির ওপরেই রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে বলে তিনি স্বীকার করেছেন।[১]

এই বিষয় রবীন্দ্রনাথ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মনে হয় তা আরও যুক্তিসম্মত। তিনিও স্বীকার করেন শিল্পকর্মকে পরিব্যাপ্ত করে একটি সুমিতি বিরাজমান। সেখানেই শিল্পকর্মের উৎকর্ষ এবং এই সুমিতির উপলব্ধি হেতুই রসিকের মনে আনন্দ উৎপাদিত হয়। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই। এই সুমিতিতেই প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ, এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা।"[২]

তিনি এও বুঝেছিলেন যে এই সুমিতি কেবল রূপকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে পারে, আবার ব্যাপক ক্ষেত্রে রূপ ও ভাবের মধ্যেও ঐক্য স্থাপন করে গড়ে উঠতে পারে। প্রথমটি সাধারণত সরল শিল্পবস্তু ও দ্বিতীয়টি সাধারণত জটিল শিল্পবস্তুর রূপ নেয়। যেখানে তা সরল রূপ নেয় সেখানে শিল্পবস্তুর অংশগুলি অল্প এবং পরস্পরের সঙ্গতি সরলভাবে বিন্যস্ত। অপর ক্ষেত্রে সঙ্গীত জটিল আকার ধারণ করে। সরল সুমিতির দৃষ্টান্ত বিমূর্ত শিল্পেও[৩] পাওয়া যায় মূর্তশিল্পেও[৪] পাওয়া যায়। প্রথমটির উদাহরণ জ্যামিতিক নকসা, যেমন আলপনা। দ্বিতীয়টির উদাহরণ গীতি কবিতা। জটিল শিল্পের উদাহরণ পাই নাট্য এবং উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমটিকে একমহলা বাড়ীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, আর দ্বিতীয়টির সঙ্গে তিনি বহু মহল বিশিষ্ট বাড়ীর তুলনা করেছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার একটা স্তর আছে, যেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলা-ওয়ালা, এর মধ্যে সদর-অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে

১. "In the most highly organised examples of literary art the beauty of the words and the beauty of the meanings are, it is claimed, organically co-ordinated and enformed into a higher second degree unity."

op. cit. chap. X, Anatomy of Literature.

২. সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের মাত্রা

৩. Abstract Art

৪. Concrete Act

না। কিন্তু এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংশ্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়, তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না।[১]

এইবার আমরা আমাদের চতুর্থ সমস্যাটির আলোচনা শেষ করে নিতে পারি। স্পষ্টতই বোঝা যায় অসবর্ণ প্রতিপাদিত রূপগত সুমিতি তত্ত্ব[২] এ প্রশ্নের আংশিক ব্যাখ্যা দেয়। তা বলে শিল্পবস্তু আমাদের আনন্দ দেয় তার রূপগত সুমিতির জন্য। কিন্তু দেখা যায় এমন শিল্পবস্তু আছে যেখানে সুমিতি আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত; যেমন নাটক বা উপন্যাস। সেখানে কত ঘটনা, কত চরিত্র, কত সংঘাত, কত হৃদয়বৃত্তির আলোড়ন। এখানে সুমিতি আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। এমন কি একটি গীতি-কবিতাতেও সুমিতি কেবল রূপে সীমাবদ্ধ নয়, ভাবের সঙ্গে রূপের সুমিতিও এখানে একান্তভাবে আবশ্যক। অসবর্ণ নিজেও একথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হবে কেবল রূপগত সুমিতি নয়, ভাব ও রূপকে জড়িয়ে যে সুমিতি গড়ে ওঠে বা ক্ষেত্র বিশেষে কেবল রূপকে অবলম্বন করে যে সুমিতি গড়ে ওঠে, তাই শিল্পকর্মে আনন্দদায়ক হবার শক্তি সঞ্চার করে। শুধু রূপগত সুমিতি নয় ভাবও রূপকে জড়িয়ে সামগ্রিক সুমিতিই আনন্দের কারণ।

১. সাহিত্যের পথে, সাহিত্য তত্ত্ব

২. Configuration Theory.

নির্ঘণ্ট